যাও পাখি
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

যাও পাখি

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

“রা-স্বা”

শ্রীতুলসী সেনগুপ্ত
শ্রীমতী কৃষ্ণা সেনগুপ্ত
করকমলেষু

“রা-স্বা”

গ্রন্থকারের নিবেদন

এই গ্রন্থের প্রথম উদ্ধৃতিটি আমার পরমারাধ্য গুরুদেব পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের। কাহিনীর আখ্যান ও সংলাপ অংশে তাঁর আরও অনেক বাণী ব্যবহৃত হয়েছে।

আমার শ্রদ্ধেয় ইষ্টভ্রাতা পরলোকগত হিরন্ময় মুন্সীর “ইসলাম দীপ্তি” গ্রন্থ থেকে প্রচুর সাহায্য গ্রহণ করেছি।

‘দেশ’ পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার সময়ে বহুল অংশে পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত হয়েছে।

"তুমি ঠিক ঠিক জেনো যে তুমি
তোমার, তোমার নিজ পরিবারের,
দশের এবং দেশের বর্তমান ও
ভবিষ্যতের জন্য দায়ী।"

সূচিপত্র

চব্বিশ

পঁচিশ

ছাব্বিশ

সাতাশ

আঠাশ

উনত্রিশ

ত্রিশ

একত্রিশ

বত্রিশ

তেত্রিশ

চৌত্রিশ

পঁয়ত্রিশ

ছত্রিশ

সাঁইত্রিশ

আটত্রিশ

উনচল্লিশ

চল্লিশ

একচল্লিশ

বিয়াল্লিশ

তেতাল্লিশ

চুয়াল্লিশ

পঁয়তাল্লিশ

ছেচল্লিশ

সাতচল্লিশ

আটচল্লিশ

উনপঞ্চাশ

পঞ্চাশ

একান্ন

বাহান্ন

তিপ্পান্ন

চুয়ান্ন

পঞ্চান্ন

ছাপ্পান্ন

সাতান্ন

আটান্ন

উনষাট

ষাট

একষট্টি

বাষট্টি

তেষট্টি

চৌষট্টি

পঁয়ষট্টি

ছেষট্টি

সাতষট্টি

আটষট্টি

উনসত্তর

সত্তর

একাত্তর

বাহাত্তর

তিয়াত্তর

চুয়াত্তর

পঁচাত্তর

ছিয়াত্তর

সাতাত্তর

আটাত্তর

উনআশি

॥ এক ॥

সোমেন জানে, প্রেমের মূলেও আছে ভিটামিন।

ব্যাপারটা সে টের পেল শনিবার সকালে, বৈঁচী স্টেশন থেকে আড়াই মাইল উত্তরে গোবিন্দপুর গাঁয়ে বহেরুর কিচেন গার্ডেনে বসে। কিচেন গার্ডেন বললে অবশ্য কিছুই বলা হয় না। বহেরু তার বিশাল পরিবারের সবজিটা এই ক্ষেতে ফলিয়ে নেয়। আড়েদিঘে ক্ষেতটা চার-পাঁচ বিঘে হেসেখেলে হবে। বহেরু আদ্যিকালের চাষা নয়, কেমিক্যাল সার, ইনসেকটিসাইডসের সব বৃত্তান্ত জানে। জানে ব্যাঙ্কের সুদের হার, রাইটার্স বিল্ডিংস বা বি-ডি-ও অফিসে গিয়ে মুখচোরা জোড়হাত চাষার মতো ঈশ্বর ভরসায় বসে থাকে না চোটেপাটে কথা বলে কাজ আদায় করে আসে। বহেরু যে উন্নতি করেছে তা তার এই সবজিক্ষেতের উন্নত সতেজ সবুজ রং সংকেতে জানিয়ে দিচ্ছে। একটু দূরেই চলছে পাঁচ-ঘোড়ার পাম্পসেট। ডিজেলের গন্ধ আর ফটফট শব্দ। বছরে বার-দুই সে ভাড়া করে ট্যাক্টর। বহেরুর পরিবারের নামে বা বেনামে কত জমি আছে তার হিসেব সোমেন জানে না। আন্দাজ করে দেড় দুশো বিঘে হবে। অনেক আগে যখন এখানে আসত সোমেন তখন অত বাড়বাড়ন্ত দেখেনি। মাঠের ধান উঠে গেছে। পড়ে আছে ন্যাড়া মাথায় সদ্য গজানো চুলের মতো কাঁটা কাঁটা ধানের গোড়া। তবু সেই ক্ষেত সারা সকাল ধরে দেখিয়েছে তাকে বহেরু। দু-চার জায়গায় আগুনের চিহ্ন পড়ে আছে মাটিতে। এ জায়গায় আখের চাষ হয়। বহেরু মোটা সুতির একটা ভাগলপুরী চাদর গায়ে, পরনে ধুতি আর পায়ে বাটা কোম্পানির মজবুত একজোড়া খাকি রঙের হকিবুট পরে ঘুরে ঘুরে তাকে খানিকটা জমিজিরেত দেখাল। একবার দাঁড়িয়ে পড়ে সখেদে একটা ঢেলা বুটের ডগায় উলটে দিয়ে বলল—মাটির কি আর নিজের দুধ আছে।

—কি বল বহেরু? সোমেন জিজ্ঞেস করল।

—মাটির নিজের রস হল মায়ের বুকের দুধের মতো। কেমিক্যাল সার হচ্ছে গুঁড়ো দুধ, সেই নকল দুধ মায়ের বুকে ভরে দেওয়া। ছেলেবেলা যেমন স্বাদ পেতেন সবজিতে, এখন আর পান?

সোমেন মুশকিলে পড়ে যায়। শাকসবজির স্বাদ নিয়ে সে মাথা ঘামায় না, পাতে দিলে সে মটর শাকের সঙ্গে খেসারির শাকের তফাত বুঝতে পারে না। চুপ করে রইল।

—এ মাটি হচ্ছে এখন ওষুধের জোরে বেঁচে থাকা রুগি। নিজের জোর বল নেই। ওষুধ পড়লে বছর-বিয়োনী বাঁজা বনে যাবে।

খালধার পর্যন্ত যেতে যেতে রোদ চড়ে গেল। বহেরু ভাগলপুরী চাদরখানা খুলে ফেলল গা থেকে। গায়ে একটা ফতুয়া। সত্তরের কাছাকাছি বয়েস কে বলবে? হাতে বুকে ঢিলে চামড়ার তলা থেকে ডিম-ডিম পেশি পিছলোচ্ছে। গর্দানখানা ভাল খাঁড়া দিয়েও এক কোপে নামানো যাবে না, এত নিরেট। চুলে পাক ধরেছে কিন্তু চোখ দুখানা এখনও রোদে ঝিকোয়। বিশাল লম্বা বহেরু। চাদরখানা খুলে মাটির বাঁধের ওপর যখন দু-পা ফাঁক

করে দাঁড়াল তখনই অস্পষ্টভাবে সোমেন ভিটামিনের কার্যকারিতা বুঝতে পেরেছিল। ঢালুতে দাঁড়িয়ে সোমেন দেখে বাঁধের ওপরে শীতের ফিরোজা আকাশের গায়ে বিশাল স্তম্ভের মতো উঠে গেছে বহেরুর শরীর। এখানে রোদে বাতাসেও ভিটামিন ভেসে বেড়ায় নাকি? সেই সঙ্গে ক্যালসিয়াম, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিনও? কতকাল ধরে বহেরু প্রায় একরকমের আছে। নিমের দাঁতনে মাজা স্টেনলেস স্টিলের মতো শক্ত দাঁত দেখিয়ে হেসে বহেরু হাত তুলে খালধারে একটা অনির্দিষ্ট এলাকা দেখিয়ে বলল—এই হচ্ছে আপনাদের জমি, একলপ্তে পাঁচ বিঘে। পোটাক উজিয়ে গেলে আরও এক বিঘে আছে আপনাদের, সে কিন্তু অনাবাদি, মরা জমি। ঠাকরুনকে বলবেন, সে জমিতে চাষ দিতে এখনও দু-তিন বর্ষা লাগবে।

গতকাল তাড়াতাড়ি কিট ব্যাগ গুছিয়ে দুপুরের বর্ধমান লোকাল ধরেছে সোমেন। তাড়াহুড়োয় ভুলভ্রান্তি হয়। আজ সকালে দেখে টুথব্রাশ আনেনি। বহেরুর ছেলে শক্ত দেখে নিমডাল কেটে দিয়েছিল, সকালে সেটা আধঘণ্টা চিবিয়ে মাড়ি ছড়ে গেছে, মুখে বিদঘুটে স্বাদ। বহেরুর সত্তর বছরের পুরনো আসল দাঁতগুলোর দিকে চেয়ে সোমেন মুগ্ধ হয়ে গেল। ক্লোরোফিলের কাজ।

কাল রাতে তার সম্মানে বহেরু মুরগি মেরেছিল। এরা ব্রাহ্মণের পাতে নিজেদের হাতের রান্না দেয় না। সোমেনকে নিজে বেঁধে নিতে হয়েছে। খুব তেল-ঘি-রসুন-পেঁয়াজ-লংকা দিয়েছিল বটে, কিন্তু তেমন কষায়নি বলে মাংসটা জমেনি তেমন। খিদের মুখে একপেট সেই ঝোলভাত খেয়েছে। এগারো ঘণ্টা পর আজ সকালে সেই মাংসের একটা ঢেকুর উঠল। সোমেন হাতের পাতায় চোখের রোদ আড়াল করে ধু-ধু মাঠ ময়দান দেখে।

ফেরার পথে সোমেন জিজ্ঞেস করল—বাবা এখানে এসে করে কী?

বহেরু সামনে হাঁটছে। লাঠিয়াল চেহারা। কাঁধে চাদর ফেলা। উত্তরে বাতাস দিচ্ছে টেনে। রোদ ফুঁড়ে বাতাসের কামড় বসে যাচ্ছে শরীরে। বহেরুর ভ্রূক্ষেপ নেই। লং ক্লথের ফতুয়ার আড়ালে চওড়া কাঁধ। অহংকারী চেহারা। খুলনা জেলার গাঁয়ে সে ছিল কখনও কামলা, কখনও ডাকাত, কখনও দাঙ্গাবাজ, আবার কিছু কিছু ভাগের চাষও করত, শীতের নদীতে মাছ ধরতে যেত, আবার সোমেনদের দেশের বাড়িতে ঘরামি বা মুনিশও খেটে গেছে। দেশ ভাগাভাগির সময়ে সে একটা সুযোগ নেয়। যশোর আর খুলনার রাস্তায় ঘরছাড়া মানুষদের ওপর হামলা করে সে কিছু কাঁচা পয়সার মুখ দেখে। শোনা যায়, নিজের দলের গোটা চারেক লোককে কেটে সে ভাগীদার কমিয়ে ফেলে। গোবিন্দপুরে এসে এক মুসলমান চাষির সঙ্গে দেশের জমি বদলাবার অছিলায় তাকে উচ্ছেদ করে জমির দখল নেয়। তারপর এই উন্নতি। সেই উন্নতিটাই কঠিন এবং সহজ শরীরের অহংকারে ফুটে উঠেছে এখন।

মুখটা না ফিরিয়েই জবাব দিল বহেরু—কী আর করবেন! বুড়ো মানুষ। এমনভাবে 'বুড়োমানুষ' কথাটা বলল যেন বা সে নিজে তেমন বুড়োমানুষ নয়। একটু ভেবেচিন্তে সাবধানে বলে—সারাদিন পুঁথুপত্রই নাড়াচাড়া করেন, খুড়োমশাইয়ের কাছে সাঁঝ সকাল খোলের বোল তোলেন, কচি-কাঁচাগুলোকে লেখাপড়াও করান একটু-আধটু, রোগেভোগে ওষুধপত্র দেন। মাঝে মাঝে বাই চাপলে এধার-ওধার চলে যান। যেমন এখন গেছেন।

—কোথায় গেছে কিছু বলে যায়নি?

বহেরু মাথা নাড়ল—কথাবার্তা তো বলেন না বেশি। বলাকওয়ার ধার ধারেন না। আমরা ভাবলাম বুঝি কলকাতাতেই গেলেন, ঠাকরুন আর ছানাপোনাকে দেখা দিয়ে আসবেন। গেছেন তো মোটে চারদিন।

—না বহেরু, একমাস হয় আমরা কোনও খবরবার্তা পাইনি!

বহেরু দুশ্চিন্তাহীন গলায় বলে—আছেন কোথাও। উদাসী মানুষ। যেদিন মন হবে ফিরে আসবেনখন। ভাববেন না।

বহেরুর কথাটায় একটু তাচ্ছিল্যের ভাব আছে। বাবার প্রতি নয়, তার প্রতি বা তাদের প্রতি। যেন বা বাবা কোথায় আছে তা জেনেও বলার চাড় নেই বহেরুর। বহেরু কি বুঝে গেছে যে বাবার খোঁজে সোমেনদের আর সত্যিই দরকার নেই? খোঁজখবর করাটা বাহুল্য মাত্র?

মাঠটা পার হয়ে এল তারা। বড় রাস্তাটা অন্তত পঁচিশ ত্রিশ বছরের পুরনো, পাথরকুচির রাস্তা। কোনওকালে বোধ হয় মেরামত হয়নি, গোরুর গাড়ির চাকায় আর গত বর্ষার জলে চষা জমির মতো এবড়ো-খেবড়ো হয়ে আছে, তারই পাশে একা দাঁড়িয়ে আছে বহেরুর খামারবাড়ি। আশেপাশে আর গাঁ-ঘর নেই। গোবিন্দপুরের বসত আরও কিছু উত্তরে। বহেরুর খামারবাড়িতে আটচালা, চারচালা, দোচালা মিশিয়ে দশ-বারোখানা ঘর। আর আছে গোশালা, ঘানিঘর, ঢেঁকিঘর, কাঠের মাচানের ওপর জাল দেওয়া একটা হাঁস-মুরগির পোলট্রিও। প্রায় স্বয়ম্ভর ব্যবস্থা। জামাকাপড় আর শৌখিন জিনিসপত্র ছাড়া বহেরুদের প্রায় কিছুই কিনতে হয় না।

বাড়ির হাতায় পা দিয়ে বহেরু হাত তুলে উত্তর দিকটা দেখিয়ে বলল—ওই গোবিন্দপুরের লোকগুলো খচ্চর। আমি এখানে নিজের মতো একখানা গাঁ করব। বহেরু গাঁ।

চোখ দুটো আবার রোদে ঝিকলো। ঠাট্টার কথা নয়, বহেরু হয়তো বা পারে। সে ভাগচাষি বা বরগাদার নয়। সে নিজস্ব জোতের মালিক, পয়সায় সোমেনদের কেনাবেচা করার মতো ধনী। তবু যে সে সোমেনদের জমি চষে দেয়, ফসলের দাম দেয়, সে তার দয়া। একসময়ে সে সোমেনদের বাপ-দাদুর নুন খেয়েছে। বাড়ির চাকরবাকরের মতো ছিল। দান উলটে গেছে এখন। সোমেনের বাবা বোধ হয় এখন বহেরুরই একজন কর্মচারী মাত্র, বাচ্চাদের পড়ায়, তার অর্থ প্রাইভেট টিউটর, হিসেবনিকেশও বোধ হয় কিছু করে দেয়। তার মানে, বাবা এখন বহেরুর ম্যানেজার কিংবা নায়েব। এ পর্যন্ত যখন বহেরু পেরেছে, নিজের নামে একখানা গাঁয়ের প্রতিষ্ঠা করতেও পারবে। জ্ঞাতিগুষ্টি মিলিয়ে বহেরুর পরিবারেই প্রায় এক গাঁ লোকজন।

উঠোন থেকে খোলের শব্দ আসছে। কাল সন্ধেবেলাও শুনেছিল খোলের শব্দ, আবার খুব ভোরে। বহেরুর নব্বই বছর বয়সি জ্ঞাতি খুড়ো দিগম্বরের ওই এক শখ। এ বাড়িতে বোধ হয় ওই লোকটিই স্বার্থশূন্য এক বাতিক নিয়ে আছে। ক্ষেতখামার, বিষয়-আশয় বোঝে না। বোঝে কেবল খোলের শব্দ। তাতেই মাতাল হয়ে আছে। ভোররাতে সোমেন ঘুম ভেঙে প্রথমে বিরক্ত হয়েছিল। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে কাত হয়ে শুয়ে কানে বালিশ চাপা দিয়ে শব্দটা আটকাবার চেষ্টা করল কিছুক্ষণ। কিন্তু দূরাগত মেঘের গুরু গুরু ধ্বনির মতো শব্দটা খুব সহজেই তার বুকে ঘা মারতে থাকে। চারদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে ওই শব্দটা যেন ওই নিস্তব্ধতারই একটা স্পষ্ট রূপ। বাজনার কিছুই জানে না সোমেন। কিন্তু ক্রমে ওই শব্দ তাকে কিছুক্ষণের জন্য অন্য সব শব্দের প্রতি বধির করে দিল। না-টানা সিগারেটের ছাই লম্বা হয়ে ঝুলে থাকে। সে অনুভব করে তার হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক ডুবডাব শব্দ আস্তে আস্তে বদলে যায়। বহেরুর বুড়ো খুড়োর আঙুলের টোকায় টোকায় নাচে তার আনন্দিত হৃৎপিণ্ড।

সকালে উঠেই সে তাই প্রথমে বুড়ো লোকটাকে খুঁজে বের করে।

—বড় ভাল বাজান তো আপনি!

ঘোলাটে ছোট ছোট দুই চোখ, বেঁটেখাটো চেহারা এ বয়সেও মজবুত, আঙুলগুলোর ডগায় কড়া, ঝুপ্‌পুস এক নোংরা তুলোর কম্বল মুড়ি দিয়ে রোদে বসেছিল মহানিম গাছটার তলায়। হাতে কাঁসার গ্লাসে চা। সোমেনের কথা শুনে কেঁপে ওঠে বুড়ো, হাতের চা চলকে যায়। বলে—আমি?

আপনিই তো বাজালেন।

বুড়ো থরথরিয়ে কেঁপে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। হাত বাড়িয়ে সোমেনের হাত দুটো সাপটে ধরে ককিয়ে ওঠে—আমি না বাবু, আমি না। গুরু বাজাইছে। মাঝেমইধ্যে গুরু ভর করে শরীলে...

কথার টান শুনে বোঝা যায় দিগম্বর ঢাকা বা ওদিককার পুব দেশের লোক। যশোর বা খুলনার নয়। তবু কেন যে তাকে জ্ঞাতি বা খুড়ো বলে চালাচ্ছে বহেরু তা কে জানে! সোমেন শুনেছে, বহেরু নানা জায়গার সব গুণী, কিম্ভূত বা অস্বাভাবিক লোক এনে তার নিজের কাছে রাখে। এটাই ওর বাতিক। কী পরিষ্কার টনটনে আওয়াজে ওই খোল বাজছে এখন। কী একটা কথা ফুটি-ফুটি হয়ে উঠছে। ঠিক বোঝা যায় না। আবার বোঝাও যায়। বহেরুর বিশাল সংসারের নানা বিষয়কর্মের শব্দ উঠছে। কুয়োয় বালতি ফেলার শব্দ, পাম্পসেটের আওয়াজ, শিশুদের চিৎকার, বাসনের শব্দ। কিন্তু সব শব্দের ওপরে খোলের আওয়াজ বধির করে দিচ্ছে পৃথিবীকে।

হলুদ কুঞ্জলতায় ছেয়ে আছে কাঁটাঝোপের বেড়া। সোনা রঙে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। তার পাশে বহেরু দাঁড়িয়ে উৎকর্ণ হয়ে শোনে একটু। তারপর হঠাৎ ফিরে বলে—খুলোমশাইয়ের খোল কি বলছে বুঝছেন?

সোমেন অবাক হয়ে বলে—না তো! কী?

—ভাল করে শুনুন।

সোমেন শোনে। বলছে বটে, কিন্তু ঠিক বোঝা যায় না।

বহেরুর বিষয়ী চোখ দুটো হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায়। তাতে একটা বৈরাগ্যও এসে যায় বুঝি। মাথা নেড়ে বলে—ঘুঘু তাড়া, ঘুঘু তাড়া, ঘুঘু তাড়া...

হাসে বহেরু।

কিন্তু সোমেন আবাক হয়ে শোনে। সত্যিই পরিষ্কার ভাষাটা বুঝতে পারে সে। ঘুঘু তাড়া ঘুঘু তাড়া ঘুঘু তাড়া...

আবার পালটে যায় বোল। বহেরু হাঁটতে হাঁটতে বলে—এখন বলছে চিঁড়ে আন, চিঁড়ে আন, চিঁড়ে আন.... পরমুহূর্তেই আবার পালটে যায় বোল। বাঙ্ময় খোলে বহেরুর খুড়ো আর একটা কী কথা বলে যেতে থাকে।

বহেরু হাঁটতে হাঁটতে ধুঁধুল লতায় অন্ধকার শুঁড়িপথ ধরে বলে—এবার বলছে মাখিজুখি, মাখিজুখি, মাখিজুখি...

দু-তিনটে সনের শব্দ ওঠে। খোল বোল পালটাচ্ছে।

বহেরু শ্বাস ছেড়ে বলে, শুনুন, বলছে—দে দই, দে দই, দে দই...

সোমেন দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর হাঁটে আবার। খোল ততক্ষণে ফিরে ধরেছে প্রথম বোল। ঘুঘু তাড়া ঘুঘু তাড়া ঘুঘু তাড়া...

একটু হতাশায় ম্লান হাসি হেসে বহেরু মাথা নেড়ে বলে—সারাদিনই শুনবেন ওই আওয়াজ। যান আপনি বিশ্রাম করেন।

মটরশাকের ক্ষেতে সাদা ফুল প্রজাপতির মতো আলগোছে ফুটে আছে। বহেরু যখন ক্ষেতটা পার হচ্ছে, তখন গাছগুলি শুঁড় বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করতে চাইছে, এই দৃশ্যটা দাঁড়িয়ে দেখল সোমেন।

বিশ্রাম করার কিছু ছিল না। বহেরু বয়স্ক লোক, তার ওপর দেশের মানুষ। সিগারেটটা এতক্ষণ ইচ্ছে করেই খায়নি সে। একটা সিগারেট খাবে বলে ঘরে ঢুকল। বাবার ঘর। এই ঘরটায় রাত কাটিয়েছে সোমেন। বড় কষ্ট গেছে।

সরগাছের বেড়ার ওপর মাটি লেপা, ওপরে টিনের চাল। সারা রাত ফাঁক-ফোকর দিয়ে বাতাস ঢুকেছে, আর শব্দ উঠেছে টিনের চালে। একধারে বাঁশের মাচানে বিছানা। গদির বদলে চটের ভিতরে খড় ভরে গদি বানানো হয়েছে, তার ওপর শতরঞ্জি আর পাতলা তোশকের বিছানা। গায়ে দেওয়ার জন্য একটা মোটা কাঁথা। একটা শক্ত বালিশ।

একটা হলদি কাঠের সেলফে কিছু কাচের জার, শিশি, বোতল। কৃষি বিজ্ঞানের কয়েকটা বই। একটা ছোট টেবিল, লোহার চেয়ার। দুটো ঝাঁপের জানালা খুলে আলো হাওয়ার রাস্তা করে দেওয়া হয়েছে। তবু ঘরটা আবছা। দীর্ঘ বৃষ্টির দিনে যেমন ঘরের আসবাবে, বিছানায় একটা সোঁদা গন্ধ জমে ওঠে, এ ঘরে তেমনই এক গন্ধ। মাটির মেঝেয় ইঁদুরের গর্ত, বাঁশের খুঁটির নীচে ঘুণপোকায় কাটা বাঁশের গুঁড়ো। উইয়ের লাইন গেছে কাঠের তক্তার পাটাতন পর্যন্ত। বাবার বউল-ওলা খড়ম জোড়া আর একটা পিতলের গাড়ু মাচানের নীচে। তার পাশে বড় একটা টিনের, আর একটা চামড়ার স্যুটকেশ। দুটোই বিবর্ণ। মশারিটা চালি করে রেখে গেছে কে, ঘরটা ঝাঁটপাটও দিয়েছে, কিন্তু কিছুমাত্র উজ্জ্বলতা ফোটেনি। এই ঘরে তার বাবা থাকে। দিনের পর দিন। এবং প্রায় অকারণে। ভাবতে, বহুকাল বাদে বাবার জন্য একটু করুণা বোধ করে সোমেন।

চেয়ারটায় বসতেই টিনের চেয়ারের কনকনে ঠান্ডা শরীরের নানা জায়গায় ছ্যাঁকা দেয়। তবু বসে থাকে সোমেন। একটা সিগারেট ধরায়।

গত এক মাসে বাবাকে দুটো চিঠি দেওয়া হয়েছে। একটারও জবাব পায়নি। বাবা চিঠি দেবে না, এ তাদের জানাই ছিল। কিছু লোক থাকে যারা ঘর-জ্বালানি কিন্তু পর-ভুলানি। নিম্পর লোকেরা নাম শুনলে কপালে জোড়হাত ঠেকিয়ে বলে সাক্ষাৎ দেবতা। অমন পরোপকারী মানুষ হয় না। কিন্তু ঘরের লোক জানে, ওরকম খেয়ালি, নিষ্ঠুর, স্বার্থপর মানুষ আর নেই। এরকমই একজন ঘরজ্বালানি লোক হচ্ছে বাবা, যাকে বাড়ির লোক বাদে আর সবাই সম্মান করে। পরোপকারী? হবেও বা। বাবার খুব বেশি রহস্য জানা নেই সোমেনের। সে মার কাছে শুনেছে, ভরা যৌবনে স্ত্রীকে রাতে-বিরেতে পাড়াপড়শির ভরসায় ফেলে রেখে বাবা যাত্রা-থিয়েটারে যেত। যাত্রা-থিয়েটারে পার্টও করত না, দেখতেও যেত না। যেত, স্টেজ বাঁধতে যাত্রাদলের সুখসুবিধের ব্যবস্থা করতে। ফুটবল খেলতে না জানলেও গাঁয়ের ম্যাচ-এ বাবা ছিল প্রধান জোগাড়ে মানুষ। গ্রাম দেশে প্রথা আছে, গোলপোস্টের পিছনে একজন কোনও নিষ্কর্মাকে গোলজাজ হিসেবে বসিয়ে দেওয়ার। বাবার কোনও যোগ্যতা ছিল না বলে 'গোলজাজ' হত বরাবর। এরকম কোনওখানে কিছু একটা হচ্ছে জানলেই সেখানে ছুটে যেত মহা

ব্যস্ততায়, দরকার থাক না থাক, সামান্য যে কোনও দায়িত্ব নিয়ে সাংঘাতিক ডাক হাঁক পাড়ত। পাড়াপড়শিদের ফাইফরমাশ খাটত বিনা দ্বিধায়। আশপাশের বিশ গাঁয়ের লোকের কাছে ব্রজগোপাল ছিল অপরিহার্য লোক। ব্রিজ খেলার কারও পার্টনার না জুটলে ব্রজগোপাল তিনক্রোশ বর্ষার গেঁয়ো রাস্তা ঠেঙিয়ে যেত। খেলতে পারত না তেমন, ভুলভাল ডাক দিত। পার্টনার রাগারাগি করলে অমায়িক হাসত। সবাই জানে, এমন নিরীহ লোক হয় না। কিন্তু বাড়িতে সে লোকের অন্য চেহারা। পুরুষ সিংহ যাকে বলে। সোমেনরা মার কাছে শুনেছে, বারোটা রাতে দেড়সের মাংস আর তিনজন উটকো অতিথি জুটিয়ে এনে মাকে দিয়ে সেই রাতেই রাঁধিয়ে ভোর রাতে খেয়ে বিছানায় গেছে। তিথি-না-মানা অতিথির জ্বালায় মা অতিষ্ঠ, বাড়ির লোকজন জ্বালাতন। সারা যৌবন বয়সটা বাবাকে রোজগার করতে কেউ দেখেনি। দাদুর জমিজিরেত আর সেরেস্তার চাকরির আয়ে সংসার চলত। নেশাভাঙ ছিল না বটে, কিন্তু বাড়ির জিনিসপত্র, এমনকী নিজের বিয়ের শাল, আংটি, ঘড়ি পরকে বিলিয়ে দিতে বাধেনি।

সোমেনরা জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই দেখেছে বাবা বাড়ি ফিরলেই মার সঙ্গে ঝগড়া লাগে। প্রথম প্রথম সে ঝগড়ার মধ্যে মান-অভিমান ছিল। মানভঞ্জনও তারা লুকিয়ে দেখে হেসে কুটিপাটি হয়েছে। বাবা মার পায়ে মাথা কুটেছে, আর মা খুশিয়ালি মুখে ভয়-পাওয়া-ভাব ফুটিয়ে বলছে, পায়ে হাত দিয়ে আমায় পাপের তলায় ফেলছ, আমি যে কুষ্ঠ হয়ে মরব! কিন্তু ক্রমে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা দেখেছে ঝগড়ার রকম পালটাচ্ছে। তখন দাদু বেঁচে নেই, দেশ ভাগ হয়েছে। অপদার্থ বাবা কোনওখানে জমি দখল করতে পারল না। ভাড়াটে বাড়িতে সংসার পেতেছে। তবু ধাত পালটায়নি। দু-তিনরকমের চাকরি করেছে বাবা সে সময়ে। প্রথমে ভলান্টিয়ার, তারপর রেশনের দোকান, কাপড়ের ব্যাবসা। কোনওটাই সুবিধে হয়নি। তবে প্রচুর লোকের সঙ্গে পরিচয় থাকার সূত্রে, সবশেষে বেশি বয়সে একটা সরকারি কেরানিগিরি জুটিয়ে নেয়। কিন্তু বার-ছুট নেশা ছিল সমান। সোমেন মনে করতে পারে, তারা শিশু বয়সে দেখেছে দিনের পর দিন বাবা বাড়ি নেই। বনগাঁ থেকে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় বাবা যেত উদ্বাস্তুদের তদারক করতে কিংবা কোনও মচ্ছবের ব্যবস্থায়, সংকীর্তনের দলে। কোনওটাই কাজের কাজ নয়। বাড়িতে মা আর চারটি শিশু-সন্তান একা। তখন মা আর বাবার ঝগড়ায় মান-অভিমান মরে যেতে লাগল। এল গালাগালি। মা বলত শয়তান, বেইমান, বাবা বলত নিমকহারাম, ছোটলোক। তখন বাবা বাড়িতে না এলেই তারা ভাল থাকে। পরস্পরের প্রতি আক্রোশ দেখে তাদের মনে হত, মা-বাবার এবার মারামারি লাগবে। মারামারি লাগত না। কিন্তু বাবা আরও বারমুখে হয়ে যেতে লাগল। পাঁচজনে বলত, ব্রজগোপালের মতো সচ্চরিত্র লোক হয় না, অমন নিরীহ আর মহৎ দেখা যায় না। সোমেনরাও সেটা অবিশ্বাস করত না। বাইরে লোকটা তাই ছিল। নেশাভাঙ বা মেয়েমানুষের দোষ নেই, ঝগড়া কাজিয়া মেটায়, পাঁচজনের দায়ে-দফায় গিয়ে পড়ে। অমায়িক, মিষ্টভাষী, অক্রোধী। তাকে ভালবাসে না এমন লোক নেই। মা ছিল একটিমাত্র মানুষ যার সংস্পর্শে এলেই বাবার চেহারা যেত পালটে। এবং ভাইস ভার্সা।

বড় হয়ে তারা ভাই-বোনেরা বাবা-মায়ের স্থায়ী ঝগড়াটা মিটিয়ে দেবার অনেক চেষ্টা করেছে। বাবা কিংবা মা আলাদাভাবে কেউই লোক খারাপ ছিল না। দাদা একবার মা-বাবাকে টাকা-পয়সা দিয়ে বুড়ো বয়সে লেট হানিমুন করতে পাঠালে পুরীতে। বিশ্বাস ছিল, সমুদ্রের বিশাল বিস্তারের সামনে, আর তীর্থের গুণে যদি

দুজনের মধ্যে একটা টান জন্মায়। কিন্তু মা বাবা খড়্গপুর পার হতে পারেনি। সেখান থেকে ফিরতি ট্রেনে দুই আলাদা কামরায় চড়ে দুজনে ফিরে এল। বাসায় ফিরল আলাদা ট্যাক্সিতে। কথা বন্ধ।

বাবা রিটায়ার করার পর অবস্থা উঠল চরমে। তখন বাবা কিছু বেশি সময় বাসায় থাকত। তখন ঝগড়াটা দাঁড়াল, মা বাবাকে বলত, তুমি মরো, বাবা মাকে বলত—আমি মরলে বুঝবে, দুনিয়াটা হাতের মোয়া নয়। লজ্জার কথা এই, ততদিনে দাদার বউ এসেছে, তাদের ছেলেপুলে হয়েছে। দিদিদের শ্বশুরবাড়ির লোকেরা, জামাইরা আসাযাওয়া করে। তখন মা-বাবা দুজনেই ছেলেমেয়েদের নিজের নিজের দিকে সাক্ষী মানতে শুরু করেছে। বুড়ো বয়সের স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ায় সবচেয়ে বড় দরকার হয় সাবালক ছেলেমেয়েদের সমর্থন। মার পাল্লাই ছিল ভারী। বাবা অভিমানে বাড়ি ছাড়ল। বাবার বাড়ি ছাড়াটা তখন নিতান্তই প্রয়োজন।

একথা সত্যি যে, একমাত্র দাদা ছাড়া বাবার প্রতি তাদের আর কোনও ভাইবোনেরই তেমন টান নেই। ছেলেবেলা থেকেই তারা মাকে জানে। বাবার সঙ্গ তারা কদাচিৎ পেয়েছে। কাজেই, বাবা বাড়ি ছাড়ায় কেউ তেমন দুঃখ পায়নি। দাদাও না।

বাবা লোকটা বাউণ্ডুলে হলেও তার একটা খুব বড় শখ ছিল। জমি। দেশ গাঁয়ের লোকের জমির টান থাকেই। বাবার কিছু বেশি ছিল। মার গায়ের কিছু গয়না বেচে বহেরুর হাতে দিয়েছিল সেই দেশ ভাগাভাগির কিছু পরেই। বহেরু মার নামে ছ'বিঘে চাষের জমি কিনেছিল। আর নিজের খামারবাড়ির পাশে একটু বাস্তুজমিও। সেই জমিটা তারের বেড়ায় ঘেরা হয়ে পড়ে আছে। রিটায়ারমেন্টের সময়ে বাবা প্রায়ই ছেলেমেয়েদের এবং মাকেও বলত গোবিন্দপুরে বাড়ি করে সকলে মিলে থাকার কথা। কিন্তু ততদিনে তার ছেলেরা কলকাতার জীবনের স্বাদ পেয়ে গেছে। কেউ এল না। বাবা গৃহত্যাগ করে এল একা। মাঝে মাঝে যায়। দু'মাসে ছ'মাসে একবার। চিঠিপত্র দেয় মাঝে মাঝে। দাদা কয়েকবার দেখা করে গেছে। কেউ এলে বাবা অভিমান করে রাগ করে বলে—কেন এসেছ? আমি বেশ আছি।

সোমেন জানে, সংসারের প্রতি, পরিবারের প্রতি বাবার কোনও টান আর নেই। তারাও বাবার কথা ভাবে না বড় একটা। আর পাঁচজন নিষ্পর লোকের মতো বাবাও একজন। কোনও টান ভালবাসা, দেখার ইচ্ছে কখনও বোধ করেনি সোমেন। গত পাঁচ-ছ বছরের মধ্যে সে বাবাকে দেখেছে এক-আধবার। বুড়ো মতো, টান-টান চেহারার একজন গ্রাম্য লোক, ঢোলহাতা পাঞ্জাবি আর ধুতি পরা, সদর থেকে বউদি বা দাদার ছেলেমেয়ে, কিংবা ঝি-চাকরের কাছে বাড়ির লোকের কুশল জিজ্ঞাসা করে চলে যাচ্ছে। ঘরে ঢুকত না, বাড়ির জলটলও খেত না। কিন্তু ফিরে আসবার সময় সিঁড়ি ভাঙত আস্তে আস্তে। দু-একবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাত। জোরে গলা খাঁকারি দিত। এ দৃশ্য সোমেন নিজেই দেখেছে। কিন্তু কাচালে বুড়োর সঙ্গে আগ বাড়িয়ে কথা বলার ইচ্ছে হয়নি।

বলতে কী, বাবার চেহারাটা ভুলেও গেছে সোমেন। দেখা হলে হয়তো চট করে চিনতেই পারবে না। সোমেনের জামার বুকপকেটে বাবাকে লেখা মার একটা ছোট্ট চিরকুট আছে। তাতে লেখা—তোমার কাছে কোনওদিন কিছু চাইনি। আমাকেও কিছু দিলে না তুমি। তোমার ইন্সিওরেন্সের পলিসিটা পেকেছে। আমার ইচ্ছা, ওই দশ হাজার টাকায় এখানে একটু জমি কিনি, আমাকে না দাও, রণেনকে অন্তত দাও। ভাড়া বাড়িতে আর থাকতে ইচ্ছা করে না। ইতি প্রণতা ননী।

বোধ হয় বাবাকে লেখা মার এই প্রথম চিঠি। শেষ বয়সে। খোলা চিঠি, পড়তে কোনও বাধা নেই। আদর ভালবাসার কোনও কথা না থাক, তবু কেমন চমকে উঠতে হয় 'প্রণতা ননী' কথাটা দেখে। 'প্রণতা' কথাটাকে বড় আন্তরিক বলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় সোমেনের। এই চিরকুটটা বাবার হাতে দিতে সোমেনের বড় লজ্জা করবে। আবার একটু ভালও লাগবে। ভাল লাগবে ওই 'প্রণতা' টুকুর জন্য। লজ্জা করবে টাকার প্রসঙ্গ আছে বলে। বাবা প্রভিডেন্ড ফান্ডের এক পয়সাও কাউকে দেয়নি। ইন্সিওরেন্সের টাকাটা কি দেবে? দাদাও আপত্তি করেছিল। কিন্তু মা শুনল না। বলল—আমাকে যখন নমিনি' করেছে তখন ও টাকা আমাদেরই প্রাপ্য, কোনওদিন তো কিছু দেয়নি। প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকাটা বহেরুই পাবে শেষ পর্যন্ত, তোরা বাপেরটা কিচ্ছু পাবি না। বাপের সবকিছু থেকে বঞ্চিত হবে কেন? ও পাগলের কাছ থেকে টাকা নিলেই মঙ্গল। নইলে পাঁচ ভূতে লুটে খাবে।

তাই মার চিঠি নিয়ে আসা সোমেনের।

টেবিলের ওপর কাগজপত্র পড়ে আছে, একটা স্বর্ণসিন্দুর খাওয়ার খল-নুড়ি, একটা দশবাতির ল্যাম্প, কিছু চিঠিপত্র, একটা সস্তা টাইমপিস টক টক বিকট শব্দ করে চলছে। চিঠিপত্রগুলো একটু ঘেঁটে দেখল সোমেন। কলকাতার কয়েকটা নার্সারির চিঠির সঙ্গে তাদের দেওয়া চিঠিও আছে। আর আছে আজেবাজে ক্যাটালগ, ক্যাশমেমো, কয়েকটা একসারসাইজ বুকের পৃষ্ঠায় সাঁটা কিছু গাছের পাতা, পাশে নামগোত্র লেখা। পুরনো মোটা একটা বাঁধানো খাতা। তার পাতা খুলে দেখল, প্রথম পৃষ্ঠায় বড় করে লেখা—ডায়েরি। তার পরের পৃষ্ঠায় লেখা—পতিত জমিটায় ভেষজ লাগাইব। তার পরের পৃষ্ঠাগুলিতে পর পর কুলেখাড়া, ঘৃতকুমারী, কালমেঘ ও পুরাতন চালকুমড়ার গুণাগুণ। একটা পৃষ্ঠায় লেখা—'বুড়োনিমের শিকড় হইতে ন্যাবার ওষুধ হইতে পারে, ফকির সাহেব বলেছেন। তার পরেই লেখা—'তাণ্ডবস্তোত্র জপ করিলে অ্যাজমা সারে।' অন্য এক পৃষ্ঠায়—'ইজরায়েলের এক জ্যোতিষী বলিয়াছেন অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবী শাসন করিবে কিছু শুভ্রবসন পরিহিত, দণ্ডধারী যোগীপুরুষ।'

এরকম কথা সর্বত্র। বোঝা যায়, বাবা কৃষি, ডাক্তারি, জ্যোতিষী, অকাল্ট ইত্যাদি সব কিছুরই চর্চা করে। ছেলেমানুষি ডায়েরির কোনও একটা পৃষ্ঠায় চিঠিটা গুঁজে রাখবে বলে শেষদিকের পাতা ওলটাতেই সোমেন দেখে একটা প্রায় সাদা পৃষ্ঠা। ঠিক তার মাঝখানে গোটা অক্ষরে লেখা—ভগবান, উহারা যেন সুখে থাকে।

খাতাটা বন্ধ করে চুপ করে ভাবে একটু। ঘরভরতি একটি আবছায়ার চৌখুপি। সোঁদা গন্ধ। হঠাৎ ওই গন্ধ আর ওই অন্ধকারটা সোমেনকে চেপে ধরতে থাকে। দমফোট লাগে তার।

বাইরের রোদে এসে সে বুকভরে শ্বাস নেয়। কী সবুজ, কী ধারাল রং প্রকৃতির। কী নিস্তব্ধতা। দিগম্বরের খোলের আওয়াজ এখন আর নেই। দূরে পাম্পসেটটা অবিরল চলেছে।

এইখানে মানুষেরা বেশ আছে। মটর শাকের ক্ষেত পার হতে হতে এই বোধ লাভ করে সোমেন। বড় বড় শুঁটি ঝুলে আছে। একটা-দুটো তুলে দানা বের করে মুখে দেয় সে। মিষ্টি। ভুরভুরে বেলেমাটির একটা ক্ষেত তছনছ হয়ে আছে। আলু ছিল বোধ হয়, উঠে গেছে। মাচানের পর মাচান চলেছে, ধুঁদুল, সিম, বিন! যেন বা কেউ শালিমারের সবুজ এনামেল রঙে গাঢ় পোঁচ দিয়ে গেছে চারধারে। হাতের মুঠোয় ধরা যায় না, বিশাল বড় গাঁদা ফুল জঙ্গলের মতো একটা জায়গাকে গাঢ় হলুদ করে রেখেছে।

মহানিমের তলায় বসে আছে দিগম্বর। গাছের গুঁড়িতে ঠেস। মাথা বুকের দিকে ঝুলে পড়েছে। ঘুম। পাশে বশংবদ খোল। রঙিন সুতোর জাল দিয়ে খোলের গায়ে জামা পরানো হয়েছে। লাল-সাদা পুঁতির গয়না খোলের গায়ে। কয়েকটা গাঁদা ফুল গোঁজা আছে। দিগম্বরের নত মুখ থেকে সুতোর মতো লালা ঝুলে আছে।

শীতের মিঠে রোদ পড়ে আছে গায়ে। ঘুম থেকে উঠে আবার বাজাবে। ঘুঘু তাড়া ঘুঘু তাড়া, ঘুঘু তাড়া।

আমের বোল এসে গেছে। পোকামাকড় ঝেঁপে ধরেছে গাছটাকে। ঝনঝন শব্দ বাজছে। একটা দোচালার নীচে একপাল বাচ্চা বসেছে বইখাতা শেলেট নিয়ে। বুড়োমতো একজন পড়াচ্ছে। পোড়োরা তাকে ছোট ছোট বেলের মতো মাথা ঘুরিয়ে দেখল। সোমেন জায়গাটা পার হয়ে আসে। কুলগাছের তলায় দুটো সাঁওতাল মেয়ে বসে আছে। জায়গাটায় ম ম করছে পাকা কুলের গন্ধ। একটা মেয়ে মুখ থেকে একটা সাদা বিচি ফুড়ুক করে ছুঁড়ে দিল, আর একটা কুল মুখে পুরল। বহেরুর দ্বিতীয় পক্ষের মেজো মেয়েটাকে কাল রাতে একঝলক দেখেছিল। তখন গায়ে ছিল একটা খদ্দরের চাদর। গোলপানা মুখ, শ্যামলা রং, বেশ লম্বা, এছাড়া বেশি কিছু বোঝা যায়নি। সৌন্দর্য ছিল তার চোখে। বিশাল চোখ, মণিদুটো এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত অনেক সময় নিয়ে ঢলে পড়ে। দশবাতির আলোয় চোখ থেকে এক কণা আগুন ঠিকরে এসেছিল সোমেনের হৃৎপিণ্ডে। সেই মেয়েটিকে এই সকালের রোদে আবার দেখা গেল। গায়ে চাদর নেই। সতেজ লাউডগার মতো লম্বাটে শরীর। একটা ঝুড়ি বয়ে এনে উপুড় করে দিল সাঁওতাল মেয়েদুটোর একটার কোঁচড়ে।

সোমেন দেখল, মরা ইঁদুর।

মেয়েদের একজন সন্দিহান চোখ তুলে বলে—বিষ দিয়ে মারোনি তো দিদি?

মেয়েটি কপালের চুলের গুছি সরিয়ে অবহেলা আর অহংকারভরে বলল—বিষ দিয়ে মারব কেন? আছড়ে আছড়ে মেরেছি।

এই কথা বলে সে চোখ তুলে সোমেনকে লক্ষ করে। কিন্তু তেমন ভ্রূক্ষেপ করে না। বহেরুর খামারবাড়িতে সর্বত্র ভিটামিনের কাজ দেখতে পায় সোমেন। লাউডগার মতো ওই মেয়েটির অস্তিত্বের ভিটামিনও কিছু কম নয়। এ যে বহেরুর মেয়ে তা একনজরেই বোঝা যায়। চোখা নাক, দুরন্ত ঠোঁট, আর চোখ দুটোতে নিষ্ঠুরতা। জ্যান্ত ইঁদুর হাতে ধরে আছড়ে মারা ওর পক্ষে তেমন শক্ত নয়।

সাঁওতাল মেয়েদুটো উঠে দাঁড়িয়েছিল। লম্বাজনের পেট-কেঁচড়ে ইঁদুরের স্তূপ। সোমেন কয়েকপা গিয়ে মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করল—খাবে?

অবাক চোখে অচেনা লোকের দিয়ে চায় মেয়েটি। ঘাড় নাড়ল। খাবে।

—কীভাবে খাও? পুড়িয়ে?

সাঁওতাল বলতে যেমন সুঠাম শরীর বোঝায় এ মেয়েটির তা নয়। একটু ঢিলে শরীর, বহু সন্তান ধারণের চিহ্ন, বয়সের মেচেতা, আর ধুলোময়লা-বসা ম্লানভাব। প্রশ্ন শুনে দুধ-সাদা দাঁত দেখিয়ে হাসে। বলে—আগে পুড়িয়ে নিই, তারপর কেটেকুটে রাঁধি, যেমন সবাই রাঁধে।

দাঁড়াল না। বহেরুর বাগান এখানে শেষ, ঢালু একটা পায়ে-হাঁটা-পথ মাঠে নেমে গেছে। সেইদিকে নেমে গেল দুজন। সোমেন মুখ ফিরিয়ে বহেরুর মেয়েকে দেখল। দাঁড়িয়ে আছে এখনও। ব্লাউজের হাতা ফেটে হাতের স্বাস্থ্য ফুটে আছে, ডগবগে শরীরে আঁট করে শাড়ি জড়িয়েছে বলে ধারাল শরীর ছোবল তুলে আছে। পিছনে একটি কামিনী ঝোপের চালচিত্র, পায়ের কাছে কলাবতী ফুলের গাছ।

॥ দুই ॥

বহেরুর চার-পাঁচটা মেয়ের সব কজনারই বিয়ে হয়ে গেছে। তার মধ্যে দুজন স্বামীর ঘর করে, একজনের বর ঘরজামাই, আর দুটো মেয়েকে তাদের স্বামী নেয় না। এ সবই সোমেন জানে। এ মেয়েটা ফেরতদের একজন, বিন্দু। বহেরুর কাছ থেকে ধানের দাম বুঝে নিতে কয়েকবার এসেছে সোমেন। তখন এইসব মেয়েরা ছোট ছিল। ধুলোময়লা মাখা গেঁয়ো গরিব চেহারা। ভিটামিনের প্রভাবে লকলকিয়ে উঠেছে। সিঁথিতে সিঁদুর আছে এখনও। বাকি সিঁদুর, অস্পষ্ট।

মেয়েটা সোমেনকে দেখে একটু ইতস্তত করে। সর্দি হয়েছে বোধ হয়, বাঁ হাতে একটা ন্যাকড়ায় বাঁধা কালোজিরের পুঁটুলি। সেটা তুলে বারকয় শুঁকল। অন্যদিকে চেয়ে বলে— আপনার চা হচ্ছে। ঘরে দিয়ে আসব?

—চা?

—খাবেন না? আপনার জন্যই হচ্ছে।

—দিতে পারো।

—অতদূর নিয়ে যেতে ঠান্ডা মেরে যাবে। আমাদের ঘরে আসুন না, বসবেন।

সোমেন মাথা নাড়ে। একা ঘরে মন টেকে না। এদের ঘরে দু-দণ্ড বসা যেতে পারে। আগেও এসেছে সোমেন, গন্ধ বিশ্বেসের কাছে কত গল্প শুনেছে বসে। বহুকাল আর আসা নেই বলে একটু নতুন নতুন লাগে। বহেরুর তখন এত জ্ঞাতিগুষ্টি ছিল না। একা-বোকা হেলে-চাষা গোছের ছিল তখন। এখন তার উন্নতির সংবাদ ছড়িয়ে গেছে চারধারে। নিষ্কর্মা, ভবঘুরে আত্মীয়রা এসে জুটেছে। সংসার বেড়ে গেছে অনেক। বহেরুও বোধ হয় তাই চায়। ভবিষ্যতের বহেরু গাঁয়ে থাকবে তারই রক্তের মানুষ সব।

পুরো চত্বরটাই বহেরুর বসত, তবু তার মধ্যেও ঘের-বেড়া দিয়ে আলাদা আলাদা বাড়ির মতো বন্দোবস্ত। কামিনী ঝোপটা ডান হাতে ফেলে ধান-সেদ্ধ-করার গন্ধে ভরা একখানা উঠোনে চলে আসে সোমেন, মেয়েটির পিছু পিছু। জিজ্ঞেস করে—গন্ধ বিশ্বেস নেই?

মেয়েটি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়, চোখ ছোট করে বলে—থাকে। তবে পাগলমানুষ।

—কোথায় সে? তার কাছে কত গল্প শুনেছি!

মেয়েটা হাসে—এখনও গল্প বলে। সব আগডুম বাগডুম গল্প। ওই বসে আছে।

হাত তুলে বড় উঠোনের একটা প্রান্ত দেখিয়ে দিল।

কটকটে রোদে সাদা মাটির উঠোনটা ঝলসাচ্ছে। চাটাই পাতা, ধান শুকোচ্ছে অনেকটা জায়গা জুড়ে। তারই একপ্রান্তে বসে আছে বুড়ো-সুড়ো এক মানুষ। বহেরু গাঁয়ে মানুষের আয়ুর যেন শেষ নেই। গন্ধ বিশ্বেস মরে গেছে বুঝি। যখন দাদা বা বাবার সঙ্গে এক-আধদিনের জন্য আসত সোমেন তখন সে হাফপ্যান্ট পরে, গন্ধ

বিশ্বেস তখনই ছিল বুড়ো। এক সময়ে ডাকাবুকো শিকারি ছিল, সাহেবদের সঙ্গে বনে-জঙ্গলে ঘুরেছে কম নয়। গারো পাহাড়, সিলেট, চাটগাঁ—কত জায়গায় ঘুরে ঘুরে ব্যাবসা করেছে। সে সব জায়গার গল্প করত সোমেনের কাছে। উসকে দেওয়ার দরকার হত না, নিজে থেকেই বলত। কবেকার কথা সব। সোমেনের মনে হত, বুঝি বা ইতিহাসের পাতা থেকে খসে পড়েছে গন্ধ। এখনও সেই লোকটা বসে কাক শালিক তাড়িয়ে ধান বাঁচাচ্ছে। হাতে একটা তলতা বাঁশের লগি। আশপাশে গোটা চোদ্দো-পনেরো সাদা সাদা বেড়াল তুলোর পুঁটলির মতো পড়ে রোদ পোয়াচ্ছে। তিন-চারটে দিশি কুকুরও রয়েছে বেড়ালদের গা ঘেঁষে বসে। পাশে একটা শূন্য কলাই-করা বাটি। মুড়ি খেয়েছিল বোধ হয়।

নাম গন্ধ, পদবি বিশ্বাস। কিন্তু সবাই বরাবর ডেকে এসেছে 'গন্ধ বিশ্বেস' বলে, যেন বা নামটা ওর পদবিরই অঙ্গ। শোনা যায়, বুড়ো বয়সে একটা ছুঁড়িকে বিয়ে করে এনেছিল! সে গন্ধর সঙ্গে থাকতে চাইত না। কারণ, গন্ধর বিছানায় বিড়ালের মুত, কুকুরের লোম, বালিশে নাল শুকিয়ে দুর্গন্ধ। কিন্তু বউয়ের মনস্তুষ্টির জন্য কিছু ছাড়ান-কাটান দেবে, এমন মানুষ গন্ধ নয়। বউ তাই এক রাতে সরাসরি গিয়ে দেওর বহেরুর দরজায় ধাক্কা দিল—শুতে দাও দিকিনি বাপু। না ঘুমিয়ে গতর কালি হয়ে গেল। সেই থেকে সে হয়ে গেল বহেরুর দ্বিতীয় পক্ষ।

ঝগড়া-কাজিয়া তেমন কিছু হয়নি। বেড়াল-অন্ত প্রাণ গন্ধ, কুকুর তার ভারী আদরের। বউ তাদের বেশি কিছু নয়। বিয়ে করলেই আবার একটা বউ হয়। কিন্তু গন্ধ বখেরায় যায়নি। একই সংসারে একটু আলাদা হয়ে থেকে গেছে। সেই বউ-ই এখনও ভাত বেড়ে দেয়, বাতের ব্যথায় রসুন-তেল গরম করে দেয়, বকাঝকাও করে। ওদিকে বহেরুর সন্তান ধারণ করে। কিন্তু সিঁদুর পরে গন্ধর নামে।

এরকম যে একটা গোলমেলে সম্পর্কের মধ্যে রয়েছে গন্ধ, তাকে দেখলে মনে হয় না। বৈরাগীর মতো বসে আছে। মুখময় বিজবিজে দাড়ি। ছানি কাটা হয়নি, দু-চোখে স্পষ্ট মুসুরির ডালের মতো ছানি দুটো দেখা যায়। শীতে কাহিল হয়ে একটা কাঁথা জড়িয়ে বসে, গায়ে বহু পুরনো মিলিটারি পুলওভার, নিম্নাঙ্গে ময়লা ধুতি। ধুতিতে ঢাকা আছে ফুটবলের সাইজের হাইড্রোসিল। চলাফেরায় ভারী কষ্ট তার। এই নিয়ে কত হাসাহাসি করেছে সোমেন।

সামনে সামনে বসতেই বেড়ালগুলো মিটমিটে চোখে একটু চেয়েই চোখের ফসফরাস ঢেকে ফেলল। কুকুরগুলো একটু গর-র শব্দ করে শুয়ে-শুয়েই লেজ নাড়ে।

—গন্ধ, চিনতে পারো?

গন্ধ স্থবিরতা থেকে একটু জাগে। রোদ থেকে হাতের পাতায় চোখ আড়াল করে বলে—কিছু দেখি না।

—আমি সোমেন, ব্রজকর্তার ছেলে।

—বড়জন?

—না। ছোট।

হাসে গন্ধ। বুঝদারের হাসি। হাত তুলে একটা মাপ দেখিয়ে বলে—এইটুকুন ছিলেন। আসেন না তো! বাপের জন্য প্রাণ টানে না?

—কলকাতা ছেড়ে আসা হয় না।

একটা শ্বাস ছাড়ে গন্ধ, বলে—সবাই তাই কয়।

—কী কয়?

—কলকাতা ছেড়ে আসা যায় না। সিগারেট নাই?

—আছে। খাবে?

—খাই।

হাত বাড়ায় গন্ধ। সোমেন সিগারেট দেয়। দন্তহীন মুখে সিগারেট বসিয়ে বড় আগ্রহে টানে গন্ধ। কাশে।

—কাশছ তো, খেয়ো না। সোমেন বলে।

হাঁপির টান তুলে কাশে গন্ধ, চোখে জল এসে যায়। হাতের উলটো পিঠে চোখের জল মুছে বলে—যত কষ্ট তত আরাম। এ কাশি আরামের। কতকাল খাই না কেউ দেয় না।

সিগারেটের গোড়া লালায় ভিজে গেছে। থুঃ করে জিভ থেকে তামাকের আঁশ ছিটিয়ে গন্ধ চোখ বুজে টানে। ঝপাস করে ধানের ওপর নেমে আসে কাক। গন্ধ হাত তুলে তাড়ায়—হেঃ ই।

—কেমন আছ গন্ধ?

—ভালই। বহেরু কষ্ট দেয় না।

—চোখটা কাটাও না কেন?

—দেখার কিছু নাই। কাটায়ে হবেটা কী? হাতায়ে হাতায়ে সব বুঝতে পারি। বেলাও ঠাহর পাই ধুয়া ধুয়া। খামোখা কাটায়ে হবেটা কী? খরচ।

—বিনা পয়সায়ও কাটে। সোমেন বলে—ক্যাম্প করে কাটে।

—ঝাঞ্ঝাট।

সিগারেটে প্রাণভরে টান মারে গন্ধ। কাশে। বড় আরাম পায়। সামলে নিয়ে বলে—বহেরুর খুব বাড়বাড়ন্ত দেখলেন সব?

—হুঁ।

—হাতের গুণ। গাছ ওরে ভালবাসে। আমারে ভালবাসে কুত্তা বিড়াল।

বহেরুর মেয়ে বিন্দু পেয়ালা-পিরিচে চা নিয়ে আসে। পিরিচে চা চলকে পড়েছিল, সেটুকু ঢেলে ফেলে দিয়ে পেয়ালা বসিয়ে যত্নে চা দিল। দুটো বিস্কুট।

শব্দে ঠাহর পেয়ে গন্ধ চেয়ে বলে, বিন্দু নাকি? কী দিলি ব্রজকর্তার ছেলেরে? চা?

—কেন? তুমি খাবা?

—খাই।

—দেব।

—ব্রজকর্তার ছেলেরে একটু রস খাওয়াবি না?

—ও রস তো শীতে হিম হয়ে আছে, খেলে ঠান্ডা লাগবে না!

—একটু আমারে দে।

—দেবো।

বলে বিন্দু চলে যায়। আর আসে না।

সোমেনের চা যখন শেষ হয়ে এসেছে প্রায়, তখন গন্ধ বলে, তলানি থাকলে একটু দিবেন।

—এঁটো খাবে?

—সব খাই।

সংকোচের সঙ্গে কাপটা একটু চা সুদ্ধ এগিয়ে দেয় সোমেন। বড় শীত। গন্ধ কাপটা গালে চেপে ধরে তাপটা নেয়। আস্তে আস্তে টুকে টুকে খায়। বলে—বহেরু কষ্ট দেয় না। এরা দেয়। মাগিগুলি বজ্জাত। সব মাগি বজ্জাত। দেবে বলে কিছু দেয় না। উপোস থাকি।

বলে নিবিষ্ট মনে চা খায় গন্ধ। অল্প একটু তলানি, টপ করে ফুরিয়ে যায়। গন্ধ আঙুল দিয়ে কাপের তলার তলানির চিনি খোঁজে। গাঁ ঘরের চা, চিনি একটু বেশিই দেয় ওরা। সবটা গলে না। গন্ধ আঙুলের ডগায় ভেজা চিনি তুলে এনে আঙুল চোষে। একটা বেড়াল নির্দ্বিধায় তার কোলে উঠে আসে, কাপটা শোঁকে। মুখ থেকে আঙুলটা বের করে বেড়ালের মুখে ধরে গন্ধ। বেড়ালটা দু-একবার চাটন দেয়। তারপর নির্জীব হয়ে কোলেই বসে ঘুমোয়।

—ব্রজকর্তার খোঁজে আলেন নাকি?

—হ্যাঁ। কিন্তু বাবা তো নেই।

গন্ধ চুপ করে থাকে একটু। মাঝে মাঝে মাথাটা বোধ হয় ঝিম মেরে যায়। ধানের ওপর শালিখের হুড়াহুড়ি শুনে হাত বাড়িয়ে লগিটা নেয়। বলে—হেঃ ই।

তারপর বলে—আসে যাবেন যে-কোনও দিন। ব্রজকর্তার পায়ের নীচে সুপারি, আছেন ক'দিন?

—আজই চলে যাব। বাড়িতে ভাববে।

—বহেরুর কাণ্ডকারখানা দেখে যাবেন না? কত জমি জোত, ধান-পান, বিশ-তিরিশ মুনিশ খাটে। বহুত পয়সা বহেরুর।

—জানি।

গন্ধ হাত বাড়িয়ে বলে—দেন একটা।

—কী?

গন্ধ হাসে, চোখ ছোট করে বলে—সাদা কাঠি।

সোমেন বুঝতে পেরে একটা সিগারেট দেয়।

গন্ধ সিগারেটটা নাকের কাছে নিয়ে কাঁচা সিগারেটের গন্ধ নেয়। হাত বাড়িয়ে বলে—দেশলাইটা রেখে যান, পরে খাব।

সোমেন দেশলাই দিয়ে দেয়। খালি কাপটা নিয়ে বেড়ালের খেলা শুরু হয়ে গেছে। শক্ত ঝুনো উঠোনে টঙাস করে কাপটা ঢলে পড়ে। গন্ধ মুখ তুলে বলে—ব্রজকর্তারে বুঝয়ে-সুঝায়ে নিয়ে যান বাড়ি। বুড়ো বয়সে কখন কী হয়।

সোমেন চুপ করে থাকে। মনে পড়ে—ভগবান, উহারা যেন সুখে থাকে।

গন্ধ নিচু গলায় বলে—এখানে সব শালা পাজি। বহেরু ভাল। কষ্ট দিতে চায় না। কিন্তু মাগিগুলো—এগারো হাতে কাছা নাই যার—ওই গুলান খচ্চর।

—কত গল্প শোনাতে গন্ধ, সব ভুলে গেছ?

—গল্প?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, পরস্তাব।

গন্ধ ফোকলা মুখে হাসে হঠাৎ।

—মনে থাকে না কিছু।

মানুষের বুড়ো বয়সের কথা ভেবে ভারী একটু দুঃখ হয় সোমেনের। তার বাপ দাদা গন্ধ বিশ্বেসের কাঁধে চড়েছে। সেই আমান মানুষটা কেমন লাতন হয়ে বসে গেছে এখন।

—যাই গন্ধ। বলে সোমেন ওঠে।

পুবের মাঠ রবিশস্যের চাষ পড়ে গেছে। সেই চৈতি ফসলের জমি চৌরস করছে বহেরুর লোকজন। দিগম্বরের খোলের শব্দ ওঠে হঠাৎ। পৃথিবীকে আনন্দিত করে বয়ে যেতে থাকে শব্দ। গাছগাছালির ছায়ায় ছায়ায় রোদের চিকরি-মিকরি। বুনো গন্ধ, মাটির সুবাস।

বেলায় বিন্দু এল তার রান্নার জোগাড় নিয়ে। ঘরের পাশেই বাবার ছোট্ট পাকশাল। কাঠের জ্বালে রান্না হয়। স্তূপ করে কাটা আছে কাঠ, পাঁকাঠি। কাঠের জ্বালে অনভ্যস্ত রান্না রাঁধতে কাল তার চোখ জ্বলে ফুলে গিয়েছিল। বিন্দুকে বলল—আজ তুমিই বেঁধে দিয়ে যাও। আমার ইচ্ছে করছে না।

বিন্দু চোখ বড় করে বলে—আমি রাঁধব? কাকা তা হলে কেটে ফেলবে।

—কাকা? কাকা আবার কে?

বিন্দু মাথাটি নামিয়ে প্যাঁকাটির আগুনে কাঠের জাল তুলতে তুলতে বলে—কে আবার! বহেরু বিশ্বেস।

ভারী অবাক হয় সোমেন। বহেরু ওর কাকা হয় কী করে? সবাই জানে, বিন্দুর মা বহেরুর দ্বিতীয় পক্ষ। বিন্দুও কি জানে না যে ওই বুড়ো, অক্ষম গন্ধ বিশ্বেসের বিকৃত অঙ্গ থেকে ও জন্মায়নি?

বিন্দু মুখ তুলে বলে—চাল ধুয়ে দিয়েছি, তরকারি মাছ সব কোটা আছে, মশলা বেটে দিয়েছি, আমি সব দেখিয়ে দেব, বেঁধেবেড়ে নিন।

—কলকাতায় হোটেলে রেস্টুরেন্টে আমরা বারো জাতের ছোঁয়া খাই।

—সে কলকাতায়। এখানে নয়।

অগত্যা উঠতে হয় সোমেনকে।

গনগনিয়ে আঁচ ওঠে। বড় তাপ, ধোঁয়া। বিন্দু এটা-ওটা এগিয়ে দেয়, উপদেশ দেয়, হাসেও। এত কাছাকাছি এমন ডগবগে মেয়ে থাকলে কোন পুরুষের না শরীর আনচান করে! সোমেনের কিন্তু—আশ্চর্যের বিষয়—করল না। বরং সে কেমন নিবু নিবু বোধ করে মেয়েটার সামনে। কেন যে! সে কি ওই প্রচণ্ড শরীর, প্রচুর ভিটামিন, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ক্লোরোফিলে ভরা অতিরিক্ত উগ্রতার জন্য? হতে পারে। অত যৌবন সোমেনের সহ্য হয় না। ওই উগ্র শরীরের সঙ্গে টোক্কর দেওয়ার মতো ভিটামিন তার নেই। মেয়েটা কিন্তু টোক্কর দিতেই চায়। ছলবল করে কাছে আসে, যেন বা ছুঁয়ে দেবে, ঘাড়ের ওপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলে, ফুলকপিটা আরও সাঁতলান, নইলে স্বাদ হবে না। তার শ্বাস সোমেনের ঘাড়ে লাগে। সোমের সরে বসে, মেয়েটা অমনি জিভ কেটে বলে—ছুঁয়ে দিচ্ছিলাম আর কী! তারপর হাসে। সোমেন নপুংসকের মতো ভীত বোধ করে মেয়েটির কাছে। বহেরুকে ও কাকা ডাকে কেন তা কিছুতেই ভেবে পায় না। গা-টা একটু ঘিন ঘিন করে তার।

নিজের ভিতরে ভিটামিনের বা প্রোটিনের, বা ওইরকম একটা কিছুর অভাব সে চিরকাল বোধ করে এসেছে। বহেরুর খামারবাড়িতে এই যৌবন বয়সে সেটা তার কাছে আর একটু স্পষ্ট হয়।

সোমেন একটু আলগোছে, সতর্কভাবে জিজ্ঞেস করে—শ্বশুরবাড়ি কতদূর?

মেয়েটার মুখভাব পালটায় না, হাসিখুশি ভাবটা বজায় রেখেই বলে—কাছেই। বর্ধমান।

—যাও-টাও না?

—না।

—কেন?

—বনে না।

সোমেনের আর কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় না।

মেয়েটা নিজে থেকেই আবার বলে—আমারই দোষ কিন্তু। আমার শ্বশুর-শাশুড়ি ননদ দেওর কেউ খারাপ না।

—তবে?

—যে-মানুষটাকে নয়ে শ্বশুরবাড়ি সেই লোকটাকেই আমার পছন্দ নয়। এমনি মানুষটা মন্দ না, দেহতত্ত্বটত্ত্ব গেয়ে বেড়ায়, এক বোষ্টমের কাছে নাম নিয়েছে। নিরীহ মানুষ। তবে তার কোনও সাধ আহ্লাদ নেই। মেড়া। সে আমার পা চাটত, এমন বাধুক ছিল।

—তবে?

—সেই জন্যই তো বনে না। আমি লাঠেল মানুষ পছন্দ করি।

সাদা দাঁতে চূড়ান্ত একটা অর্থপূর্ণ হাসি হাসল। সোমেন ভিতরে ভিতরে আরও মিইয়ে যায়।

—সে কীরকম? সোমেন জিজ্ঞেস করে।

—ধামসানো আদর সোহাগ যেমন করবে, তেমনি আবার দরকার মতো চুলের মুঠ ধরবে।

বাঁ হাতের কালোজিরের পুঁটলিটা নাকের কাছে ধরে শ্বাস টানে বিন্দু। চোখে চোখ রাখে। সোমেন চোখটা সরিয়ে নেয়। মেয়েটা পুরুষচাটা। বুকের ভিতরটা গুর গুর করে ওঠে সোমেনের, অস্বস্তি লাগে। একবার ভেবেছিল, আজ রাতটা কাটিয়ে কাল ফিরে যাবে কলকাতায়। বাবার সঙ্গে যদি দেখাটা হয়ে যায়। কিন্তু মেয়েটাকে তার ভাল লাগছে না। রাতবিরেতে এসে যদি ঠেলে তোলে! কিছু বিচিত্র নয়। বহেরুর মেয়ে, নিজের পছন্দমতো জিনিস দখল পেতেই শিখে থাকবে। মনে মনে ঠিক করে ফেলে সোমেন, আজ রাতেই ফিরবে। আটটার কিছু পরে বোধ হয় একটা শনিবারের স্পেশাল ট্রেন যায় হাওড়ায়। বিকেল পর্যন্ত বাবার জন্য দেখে ওই ট্রেনটা ধরতে সুবিধে।

ভিটামিনের অভাব তাকে কতটা ভিতু করেছে তা ভাবতে ভাবতে নেয়েখেয়ে দুপুরে ঘুমলো সোমেন।

বিকেলে জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখছিল, পোষা বেজি কাঁধে বহেরু এল সে সময়ে। বলল—চলে যাবেন?

—হ্যাঁ।

—একটা কথা বলি।

—কী?

—ব্রজকর্তা এখানে থাকে থাক। অযত্ন হবে না। এখানে বামুন মানুষ নেই। ব্রজকর্তাকে তাই ছাড়তে চাই না। আরামেই আছে। সোমেন উত্তর দিল না। উত্তর জানা নেই।

একগোছা টাকা হাতে ধরিয়ে দিল বহেরু। বলল—কোমরে আন্ডারপ্যান্টে গুঁজে নেবেন। ঠাকরুনকে বলবেন এবার ধানের দর ভাল। আপনি না এলে মানি-অর্ডার করে দিতাম। আজ কী কাল।

তিন-চাররকমের ডাল, কিছু আনাজপত্র, এক বোতল ঘানির তেল—এই সব গুছিয়ে দিয়ে যায় বিন্দু। বহেরুর লোক স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। বড় একটা চটের থলিতে ভরে দিয়েছে। বেশ ভারী, তবু বোধ হয় বওয়া যায়। হাত তুলে থলির ওজনটা পরখ করছিল সোমেন, বিন্দু হেসে আঁচল চাপা দেয় মুখে। মেয়েটার সাহস বেড়েছে। বলল—খুব মরদ।

সোমেন বোকা বনে যায় একটু। মনে পাপ। ইচ্ছে হল, থেকে গেলেও হত আজ রাতে। সে এখনও তেমন করে মেয়েমানুষের গা ঘেঁষেনি।

পরক্ষণেই ভাবে, সে ধরেই নিচ্ছে কেন যে বিন্দু তার সঙ্গে আজ রাতেই একটা কিছু হেস্তনেস্ত করতে চায়?

চা খেয়ে সে গেল বিন্দুর সঙ্গে ময়ূরের ঘর দেখতে। বহেরুর বড় শখ, একটা চিড়িয়াখানা করে তার বহেরু গাঁয়ে। আপাতত গোটাকয় পাখি, একটা ময়ূর, দুটো হনুমান নিয়ে ব্যাপারটা শুরু হয়েছে। পরে আরও হবে। উত্তরের সবজিক্ষেতের শেষে বহেরুর সেই সাধের চিড়িয়াখানা। জালে ঘেরা ঘর, উপরে অ্যাসবেস্টাসের ছাউনি। কিছু দেখার নেই। ময়ূর ঝিমোচ্ছে, হনুমান দুটো বিরক্ত। বিচিত্র কয়েকটা পাখি ঠোঁটে নখে নিরর্থক জাল কাটার চেষ্টা করছে। দু'মিনিটেই দেখা হয়ে যায়।

বিন্দু চিড়িয়াখানার পিছনে একটা মখমলের মতো ঘাসজমি দেখিয়ে বলল—মন খারাপ হলে আমি এইখানে এসে বসে থাকি। ভারী নিরিবিলি জায়গা। কেউ টেরই পায় না।

জায়গাটায় দু-চার পা হাঁটে দুজনে। সোমেন ভাবে, প্রেমের মূলেও আছে ভিটামিন। এই ডগবগে মেয়েটার কাছে এখন ইচ্ছে করলেই প্রেম নিবেদন করা যায়। মেয়েটাও মুখিয়ে আছে। অবশ্য এখানে প্রেম বলতে শরীর ছাড়া কী! মেয়েটাও কথার প্রেম বুঝবার মতো মানুষ নয়। কিন্তু ভিটামিনের অভাবে সোমেন শরীরে জ্বর বোধ করে, ভয় পায়, নিজেকে অভিশাপ দেয়।

হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে বিন্দুর মুখের দিকে চায়। মাথার চুলে অ্যামিনো অ্যাসিডের কাজ। ঘন গহীন চুলে সূক্ষ্ম সিঁথি। মেটে সিঁদুরটুকু ঠিক আছে। গায়ে খদ্দরের হলুদ চাদর, পায়ে হাওয়াই। মুখের গোলভাবটুকুর মধ্যে বেড়ালের কমনীয়তা, এবং বেড়ালেরই হিংস্রতা ফুটে আছে। খর চোখ। সোমেন বলতে যাচ্ছিল—ধরো বিন্দু, যদি আজকের দিনটা থেকেই যাই!

বিন্দু দূরের দিকে অকারণ তাকায় মাঝে মাঝে। এখনও তাকিয়ে ছিল। সোমেন কিছু বলার আগেই তার দিকে চেয়ে বিন্দু বলল—ব্রজকর্তা আসছে।

—কই? ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করে সোমেন। টালিগঞ্জের জমিটা তাদের দরকার। বড্ড দরকার।

—ওই যে, মাঠের মাঝ দিয়ে আসছে।

॥ তিন ॥

বিন্দুবৎ একটা মানুষ বহেরুর চৈতালি ফসলের ক্ষেত ধরে আসছে। কাছে এলে তার মন্থরগতি এবং ক্লান্তি বোঝা যায়। কালচে জমি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, তাতে রঙিন আলো, একটু কুয়াশার ভাপ জমে ঝুলে আছে মাথার ওপরে। একটা বিস্তৃতি পিছনে ফেলে আসছে বলেই লোকটাকে ছোট দেখায়। গায়ে র‍্যাপার, ধুতি, হাতে একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ। গেঁয়ো হাটুরে মানুষ একটা। বাবা বলে মনে করতে কষ্ট হয়।

সোমেন বলল—তোমার চোখ সাংঘাতিক! এতদূর থেকে চিনলে কী করে?

—চিনব না কেন! নিজেদের লোক। ওঁর চলন-বলন সবই চেনা।

সোমেনের ভিতরে একটা ছ্যাঁকা লাগে। নিজেদের লোক। তবু, ঠিক কথাই, বাবা আর তাদের লোক তো নয়।

একটু সময় নিয়ে মাঠ পার হয়ে আসেন ব্রজগোপাল। খামারে ঢোকার রাস্তা কিছু উত্তরে। সেই দিকে আড়ালে পড়ে যান।

বিন্দু মুখ ফিরিয়ে বলে—যাই, খবর দিই গে।

বিন্দু চলে যাওয়ার পরও ঘাসজমিটায় কিছুক্ষণ একা একা সিগারেট টানে সোমেন। বাবা জামাকাপড় বদলে স্থিতু হোক, তারপর দেখা করবে। আসলে, তার একটু লজ্জাও করছে। গত কয়েক বছর তারা চিঠিপত্র ছাড়া বাবার খবর নিতে কেউ আগ্রহ বোধ করেনি। বাবাই বরং কয়েকবার গেছে। এতকাল পরে সোমেন এসেছে বটে, কিন্তু সেও খবর নিতে নয়, স্বার্থসিদ্ধি করতে। টালিগঞ্জের জমির প্লটটার সমস্যা দেখা না দিলে সে কোনওদিনই এখানে আর আসত না বোধ হয়।

সিগারেট শেষ করে আস্তে ধীরে ঘরে আসতে আসতে শীতের বেলা ফুরিয়ে যায়। দরজায় দাঁড়িয়ে দেখে, ব্রজগোপাল মেঝেয় উবু হয়ে বসে ল্যাম্প জ্বালাচ্ছেন।

শব্দ পেয়ে ঘাড়টা ঘোরালেন। জ্বলন্ত ল্যাম্পটা রাখলেন টেবিলের উপর। বললেন—এস।

বাবার চেহারাটা বোধ হয় আগের মতোই আছে। মুখে চোখে একটা মেদহীন রুক্ষ ভাব। গালে কয়েকদিনের দাড়ি। গায়ের চামড়া রোদে পোড়া, তাম্রাভ। শীতটা চেপে পড়েছে বলে এর মধ্যেই মাথা কান ঢেকে একটা খয়েরি কম্ফর্টার জড়িয়ে নিয়েছেন। সোমেনের চেয়ে বাবা লম্বায় কিছু খাটো। সোমেন একটা প্রণাম করল।

—শরীর-টরীর ভাল? জিজ্ঞেস করে সোমেন। লজ্জা করে।

—আছে একরকম—প্রেসারটা একটু উৎপাত করে। বাড়ির সবাই কেমন আছে?

—আছে ভালই।

যেন বা দুই পরিচিত লোকের কথাবার্তা। মাঝখানে একটু দূরত্ব কাঁটা ঝোপের বেড়ার মতো।

—আজই চলে যাবে?

সোমেন মুখ নামিয়ে বলে—আজই। নইলে সবাই ভাববে।

—থাকতে বলছি না। যাওয়ার হলে যাবে। বলে বাবা খানিকটা বিহ্বল চোখে সোমেনের দিকে চেয়ে থাকেন। সব পুরুষেরই বোধ হয় একটা পুত্রক্ষুধা থাকে। বাবার চোখে এখন সেই রকমই একটা জলুস। পরক্ষণেই নিবে গেল চোখ, বললেন—কিছু দরকারে এসেছিলে?

—মা একটা চিঠি দিয়েছে ওই ডায়েরিতে গোঁজা আছে।

বাবা একটু তটস্থ হন। হাতড়ে চিঠিটা খোঁজেন। খুবই ব্যগ্র ভাব। সোমেন এগিয়ে গিয়ে চিঠিটা ডায়েরির পাতা থেকে বের করে দেয়।

গলা খাঁকারি দিতে দিতে বাবা চিঠিটা নিবিষ্টমনে পড়েন। ছোট্ট চিঠি, তবু অনেকক্ষণ সময় লাগে। সোমেনের বুকে একটু চাপ কষ্ট হয়। চিঠিটাতে ব্যগ্রভাবে বাবা যা খুঁজছেন তা কি পাবেন? বিষয়ী কথা ছাড়া ওতে কিছু নেই। না, আছে, 'প্রণতা ননী'—এই কথাটুকু আছে। ওইটুকু বাবা লক্ষ্য করবেন কি?

চিঠিটা হাতে নিয়ে বাবা টিনের চেয়ারে বসলেন। মুখের রেখার কোনও পরিবর্তন হল না তেমন। মুখ তুলে বললেন—কলকাতায় বাড়ি করতে চাও?

—মার খুব ইচ্ছে।

দুহাতের পাতায় মুখখানা ঘষে নিলেন বাবা।

—বাড়ি করার জমি তো এখানেই কেনা আছে।

—এ জায়গা তো দূরে। কলকাতাতেই চাকরি-বাকরি সব।

—চাকরি তো চিরকাল করবে না, কিন্তু বসতবাড়ি চিরকাল থাকে। বংশপরম্পরায় ভোগ করে লোক। চাকরির শেষে যখন নিরিবিলি হবে তখন বিশ্রাম নিতে বাড়িতে আসবে।

সোমেন চুপ করে থাকে।

বাবা আস্তে করে বললেন—বাড়ি তো কেবল ইট কাঠ নয়। মনের শান্তি, দেহের বিশ্রাম—এসব নিয়ে বাড়ি। কলকাতায় কি সেসব হবে?

সোমেন এ কথারও উত্তর খুঁজে পায় না।

—কোথায় জমি দেখেছ?

—টালিগঞ্জে।

—কতটা?

—দেড় দুই কাঠা হবে। আমি ঠিক জানি না। বড় জামাইবাবুর এক বন্ধুর জমি। সেই বন্ধু কানাডায় সেটল করেছে। সস্তায় ছেড়ে দিচ্ছে জমিটা।

—সস্তা মানে কত?

—হাজার দশেক হবে বোধ হয়।

—কীরকম জমি?

—কর্নার প্লট। দক্ষিণ-পূর্ব খোলা। বড় জামাইবাবুর বাড়ির পাশেই।

বাবা বড় চোখ করে বললেন—অজিতের বাড়ির পাশে? সেখানে কেন বাড়ি করবে তোমরা? আত্মীয়দের কাছাকাছি থাকা ভাল না, বিশেষ করে মেয়ের শ্বশুরবাড়ির পাশে তো নয়ই। এ বুদ্ধি কার, তোমার মায়ের?

—আপনার অমত থাকলে অবশ্য—সোমেন কথাটা শেষ করে না।

বাবা তার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন। কথাটা সোমেন শেষ করল না দেখে বললেন—আমার মতামতের কি কোনও দাম তোমার মা দেবেন? তিনি যদি মনে করে থাকেন তবে আমার অমত থাকলেও ওই জমি কিনবেনই। তবু অমতটা জানিয়ে রাখা ভাল বলে রাখলাম।

—এত সস্তায় আর কোথাও পাওয়া যাবে না। বড় জামাইবাবুই সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন।

বাবা চিন্তিত মুখে বললেন—আমি টাকা না দিলেও ও জমি তোমরা কিনবেই। ধার-কর্জ করা হলেও, এ আমি জানি। কিন্তু তা হলে এখানকার জমিটার কী হবে?

—এটাও থাকুক।

—তাই থাকে! পৃথিবীতে যত মানুষ বাড়ছে তত জমি নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ছে। দখল যার, জমি তার। বহেরু যতদিন আছে ততদিন চিন্তা নেই, সে আমাদের বাধ্যের লোক। কিন্তু চিরকাল তো সে থাকবে না। তার জ্ঞাতিগুষ্টি অনেক, ছেলেপুলেরা সাবালক। তোমরা দখল না নিলে তারা ক্রমে সব এনক্রোচ করে নেবে। তখন? আমি যক্ষীর মতো আগলে আছি জমিটা, তোমাদের জন্যই। দেখেছ জমিটা ভাল করে? পশ্চিম দিকে সবটা আমাদের। প্রায় দুই বিঘে।

—দেখেছি?

—পছন্দ নয়?

—ভালই তো। কিন্তু বড় দূরের জায়গা।

বাবা মাথা নাড়লেন। বুঝলেন। একটা শ্বাস ফেললেন জোরে।

তারপর আস্তে আস্তে বললেন—কলকাতাতেও পার্টিশানের পরে খানিকটা জমি ধরে রেখেছিলাম। জবর দখল। হাতে-পায়ে ধরে দেশের লোক নীলকান্ত সেখানে থাকতে চায়। দিয়েছিলাম থাকতে, সময়মতো জমি পেলে সে উঠে যাবে—এরকম কথা ছিল। কিন্তু যাদবপুরের ওই এলাকার জমি পাওয়া ভাগ্যের কথা। নীলকান্ত আর ছাড়ল না সেটা। আমি মামলা মকদ্দমা করিনি। কলকাতায় আমার কোনও লোভ নেই। জানি তো, ও শহরটা শিগ্‌গিরই শেষ হয়ে আসছে।

একটু বিস্মিত হয়ে সোমেন বলে—কেন?

—ও শহর শেষ হবেই। অত বাড়িঘর নিয়ে হয় একদিন ডুবে যাবে মাটির মধ্যে, নয়তো মহামারী লাগবে, না হয় ভূমিকম্প। একটা কিছু হবেই। যার বুদ্ধি আছে সে ওখানে থাকে কখনও?

সোমেন মুখ লুকিয়ে হাসে একটু। এতক্ষণ বেশ ছিলেন বাবা, এইবার ভিতরকার চাপা পাগলামিটা ঠেলা দিয়ে উঠছে।

—তুমি বিশ্বাস করো না?

—কী?

—কলকাতায় একটা অপঘাত যে হবেই? আমি যতদিন ছিলাম ততদিন আমার ওই একটা টেনশন ছিল। এত লোক, এত বাড়ি-ঘর, এত অশান্তি আর পাপ—এ ঠিক সইবে না। মানুষের নিঃশ্বাসে বাতাস বিষাক্ত।

ডিফর্মড, ইমমর্যাল একটা জায়গা। ওখানে চিরকাল বাস করার কথা ভাবতেই আমার ভয় করত। নিশুতরাতে ঘুম ভেঙে গেলে শুনতাম, মাটির নীচে থেকে যেন একটা গুড় গুড় শব্দ উঠে আসছে।

—কীসের শব্দ?

—কী করে বলব? মনে হত। পাতালের জল বুঝি ক্ষয় করে দিচ্ছে শহরের ভিত। যেন ভোগবতী বয়ে যাচ্ছে।

সোমেন চুপ করে থাকে।

বাবা মুখ নিচু করে আত্মগত চিন্তায় ডুবে থাকেন একটুক্ষণ। তারপর মুখ তুলে বলেন—মোটে দেড় দুই কাঠা জমি?

—হ্যাঁ।

—ইচ্ছে করলে একটু শাকপাতা কি দুটো কলাগাছও লাগাতে পারবে না! বাক্সের মতো সব ঘর হবে, গাদাগাদি করে থাকবে, সেটাই পছন্দ তা হলে?

—মায়ের ইচ্ছে, বাড়িওয়ালারা বড্ড ঝামেলা করছে।

—কেন?

—ছেলেরা বিয়েটিয়ে করেছে, ওদের ঘর দরকার। বার বার তাগাদা দেয়, নতুন বাসাও পাওয়া যায় না সুবিধে মতো। মা বলে, কষ্ট করে একটু নিজেদের ব্যবস্থা করে নেওয়া যায়, জমিটা যখন সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে—

—টাকা না দিলেও তো তোমরা জমিটা কিনবেই?

সোমেন উত্তর দেয় না। বাবা উৎসুক চোখে চেয়ে থাকেন।

তারপর বললেন—সময় থাকতে যদি ও জায়গা ছেড়ে পালিয়ে আসতে পারতে তবে ভাল হত। একদিন দেখবে কলকাতায় দিন-দুপুরে শেয়াল ডাকছে, মড়ার মাথা পড়ে আছে এখানে-সেখানে, জনমনুষ্য কেউ থাকবে না। একটু ভেবে দেখ।

—আপনি মাকে যা লেখার লিখে দিন।

—এসব কথা চিঠিতে লেখার নয়, তোমার মাকে মুখের সামনে কিছু বলাও মুশকিল। ওঁর সবসময়ে একটাই ভাব ‘এই পেয়েছি ঝগড়ার গোড়া, আর যাব না বালি-ওতরপাড়া।’

—তবে আমি মাকে গিয়ে কী বলব?

এই প্রথম বাবা একটু হাসলেন। বললেন—তোমরা তবু কিছুতেই এদিকে চলে আসবে না?

—আমার কোনও মত নেই।

—তোমরা বড় হয়েছ, মত নেই কেন? এই বয়সে নিজস্ব মতামত তৈরি না হলে আর কবে হবে? তোমাদের যদি এদিকে থাকার মত হয় তবে তোমার মায়েরও হবে। মেয়েরা স্বামীর বিরুদ্ধে যত শক্ত হয়েই দাঁড়াক না কেন, ছেলের বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস পায় না। ওখানে মেয়েরা বড় কাবু।

সোমেন কথাটার সত্যতা বুঝতে পারে। জীবন থেকেই মানুষ কিছু সহজ দার্শনিকতা লাভ করে। বাবার কথাটা মিথ্যে নয়। সে একটু স্মিত হাসল।

বাবা একটু শ্বাস ফেলে বললেন—বুঝেছি। রণেনই চায় কলকাতায় বাড়ি হোক। তোমারও হয়তো তাই ইচ্ছে। বলে বাবা আবার একটু হেসে মাথা নেড়ে বললেন—তোমাদের চেহারায় কলকাতার ছাপ বড় স্পষ্ট। তোমরা আর দেশ গাঁয়ে থাকতে পারবে না। আমার ইচ্ছে করে তোমাদের জন্য কলকাতা থেকে দূরে একটা নকল কলকাতা তৈরি করে দিই। তা হলেও হয়তো বাঁচাতে পারতুম তোমাদের।

বাবা উঠে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞেস করলেন—ক'টার গাড়িতে যাবে?

—যেটা পাই। রাত আটটার গাড়িটা—

পরে ঘড়ি দেখে বললেন—রাত আটটার পর শনিবার গাড়ি খুব ফাঁকা যায়। দিনকাল ভাল নয়, অত রাতের গাড়িতে যাবে কেন? যেতে হলে একটু আর্লি যাও। ভাল হয়, আজ রাতটা কাটিয়ে কাল সকালে গেলে।

—দেরি হলে মা ভাববে। আমার আজই ফেরার কথা।

বাবা চিন্তিতভাবে বললেন—সাড়ে পাঁচটা বাজে, এখন রওনা হলেও রাত আটটার আগে গাড়ি পাবে না।

—কিছু হবে না। ঠিক চলে যাব।

বাবা আবার হাসলেন। গাড়ু-গামছা নিয়ে বৌলওলা খড়মের শব্দ তুলে দরজার কাছে যেতে যেতে বললেন —তোমাদের জন্য আমিও কিছু কম চিন্তা করি না, বুঝলে?

বাবা খড়মের শব্দ তুলে বাইরে বেরিয়ে যান। কুয়োতলার দিকেই যান বুঝি। অদূরে জলের শব্দ হয়। দশবাতির ল্যাম্প-এর নীচে খাতাটা পড়ে আছে, তারই একটা পৃষ্ঠায় লেখা আছে—ভগবান, উহারা যেন সুখে থাকে। কথাটা ভুলতে পারছে না সোমেন। বার বারই মনে পড়ে। কেমন যেন অস্থির লাগে।

বাবা ঘরে নেই, সেই ফাঁকে বিন্দু এল। নিঃশব্দে। খানিকটা চুপি চুপি ভাব ছিল আসায়। একটু আগে যেমন পোশাক ছিল, তেমন আর নেই। একটু সেজেছে বুঝি। দশবাতির আলোয় ভাল বোঝা যায় না, তবু মনে হয়, চোখে কাজল টেনেছে, কপালে সবুজ টিপ, গায়ে একটা রঙিন উলের স্টোল। একটু অবাক হয় সোমেন, স্টোলটা দেখে। তারপর ভাবে, বহেরু তো আর সত্যিই সাধারণ চাষা নয়, তার মেয়ের ফ্যাশন করতে বাধা কী?

গলা নিচু করে বিন্দু বলে—জিনিসপত্র গুছিয়ে দেব?

—গোছানোর কিছু নেই।

—আজ থাকবেন না?

—না

—ব্রজকর্তার সঙ্গে সব কথা হয়ে গেল?

সোমেন একটু হাসে, ম্লান হাসি।

বিন্দু গলাটা বিষণ্ণ করে বলে—ব্রজকর্তা একা একা পড়ে থাকে। আগে রণেনবাবু আসত, আজকাল কেউ আসে না।

সোমেন নীরবে শুনে যায়। কথা বলে না।

—খেয়ে যাবেন না?

—কী খাব?

—ভাত।

—না, দেরি হয়ে যাবে।

—মাঝে মাঝে আসবেন।

সোমেন চোখ তোলে। বিন্দু চেয়ে আছে। চোখে পিপাসা।

সোমেন বলে—কেন?

ব্রজকর্তাকে দেখতে। আবার কেন? বলে হাসে।

সোমেন চোখ নামিয়ে নয়। বুকটার মধ্যে কী একটা মাতামাতি করে।

বিন্দু দু-পা এগিয়ে এসে বলে—ব্রজকর্তার খুব অসুখ করেছিল। সোমেন চমকে উঠে বলে—কী অসুখ?

—বুকের। হার্টের।

—কেউ জানায়নি তো!

—বাবা ভয়ে জানায়নি, যদি আপনারা ব্রজকর্তাকে নিয়ে যান এখান থেকে। বাবা ওঁকে ছাড়তে চায় না।

—অবস্থা খুব খারাপ হয়েছিল?

—হয়েছিল। বৈঁচীর হাসপাতাল, তারপর বর্ধমানেও নিয়ে যেতে হয়েছিল ডাক্তার দেখাতে।

—সসামেন চুপ করে থাকে।

—মাঝে মাঝে আসবেন। আপনাদের জন্য ভেবে ভেবে বুড়োমানুষের বুক ঝাঁঝরা।

একটা শ্বাস ফেলে সোমেন বলে—আচ্ছা, আসব।

—আসবেন কিন্তু।

—রিকশা পাওয়া যাবে না বিন্দু? আমি এবার রওনা হই।

—রিকশা আনতে লোক চলে গেছে গোবিন্দপুর। এসে যাবে যখন-তখন।

খড়মের শব্দটা বাইরে শুনেই বিন্দু পালিয়ে গেল।

বাবা ঘরে আসেন। নিঃশব্দে জামাকাপড় ছাড়েন। কোণের দড়িতে আলগা হলদে রঙের শুদ্ধবস্ত্র আছে, সেটা পরে নিয়ে খুঁটটা গায়ে জড়ান। খালি গা, ধপধপ করছে পৈতেখানা।

—কিছু খেয়েছ-টেয়েছ?

—খেয়েছি।

—কোনও অসুবিধে হয়নি তো?

—না। বহেরু খুব যত্ন করেছে।

—বিছানাপত্র ভাল নয়, রাতে কষ্ট হয়েছিল নিশ্চয়ই?

—তেমন কিছু না। আপনার কি অসুখ হয়েছিল?

—অসুখ?

—শুনলাম হাসপাতাল পর্যন্ত যেতে হয়েছিল। আমাদের জানাননি কেন?

বাবা গম্ভীর মুখে বলেন—তোমাদের জানাব কেন? কলকাতায় ভাল আছ, এত দূরে টেনে এনে কষ্ট দেওয়া।

—কষ্ট কীসের?

—কষ্টই তো! অভিমান করে বাবা বলেন। তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে বলেন—বেশ আছি, অসুখ-টসুখ কিছু নেই। এরা আত্মীয়ের চেয়ে বেশি দেখাশোনা করে। তা ছাড়া, আমিও খাড়া আছি এখনও, বসে যাইনি।

—আমি বরং মাঝে মাঝে আসব।

—কী দরকার! বলে বাবা একটা তিক্ত উত্তর দিতে গিয়েও থেমে যান। বোধ হয় সদ্যযৌবনপ্রাপ্ত তাঁর ছোট ছেলেটির মুখের সুকুমার ডৌলটুকু দশবাতির আলোয় হঠাৎ তাঁর বড় ভাল লাগে। যখন সংসার ছেড়ে এসেছিলেন তখন ছেলেটা পালটে গেছে। সেই পরিবর্তনটুকু বোধ হয় তাঁর ভাল লাগে। পুত্রক্ষুধা টের পান বক্ষ জুড়ে। গলাটা হঠাৎ নরম হয়ে আসে। বলেন—এস। ইচ্ছে হলে এস।

সোমেন এই অভিমান দেখে স্মিত হাসে।

বাবা জিজ্ঞেস করেন—চাকরিবাকরি করছ?

—না। এখনও পাইনি। চেষ্টা করছি। ব্যাঙ্ক অব বরোদায় একটা হতে পারে।

—ভাল।

সোমেন একটু ইতস্তত করে। তাকে কেউ কথাটা বলতে বলেনি। তবু তার বলতে ইচ্ছে করে।

—বাবা, কিছুদিনের জন্য চলুন আমাদের কাছে।

বাবা একটু অবাক হন—তোমাদের কাছে?

—হ্যাঁ।

বাবা একটু হাসেন। বলেন—বরং তুমি চাকরিবাকরি পেয়ে আলাদা বাসা-টাসা করলে ডেকো। যাব।

—আপনি যে আমাদের কাছে থাকেন না সেটা বড় খারাপ দেখায়।

—থাকলে আরও খারাপ দেখাবে। বাসায় কাক-শালিক বসতে পারবে না অশান্তির চোটে। সব দিক ভেবেই আমি চলে এসেছি। যখন আমি আসি তখন তুমি নাবালক ছিলে, তাই তোমার কথা ওঠে না। কিন্তু রণেন আমাকে আটকাতে পারত। সে আটকায়নি।

বাবা গলা খাঁকারি দেন। মুখে চোখে রক্তোচ্ছ্বাস এসে যায় বুঝি! বাবা গলাটা প্রাণপণে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে বলেন—সায়ংকালটা পার হয়ে যাচ্ছে। আমি একটু জপে বসি। তোমার সময় হলে চলে যেও।

সোমেন ঘাড় নাড়ল। উঠে প্রণাম করে নিল।

বিছানায় কম্বলের আসন পেতে বাবা গায়ের খুঁটটায় মাথা মুখ ঢেকে শিরদাঁড়া সোজা করে বসেন। সোমেন চেয়ে থাকে। কঠোর হওয়ার কত চেষ্টা করে লোকটা। পারে না। ঢাকা শরীরটা একটু একটু কাঁপে। শীতে, না নিরুদ্ধ ক্রন্দনে?

সেই প্রথম যৌবনকালের অভিমান আর ভাঙেনি। অভিমানে অভিমানে নষ্ট হয়ে গেছে ভালবাসা। কেউ কাউকে বইতে পারে না, সইতে পারে না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেই অভিমানই হয়েছে আরও কঠিন। যত দিন গেছে তত তা আরও কঠিন হয়েছে। বুকের গভীরে চৈত্রের কুয়োর তলানি জলের মতো কিছু ভালবাসা এখনও পড়ে আছে হয়তো। কিন্তু ওই দুস্তর অভিমান পার হয়ে সেইটুকু স্পর্শ করবে কে? ননীবালা না, রণেন না, সোমেন না। ওই অভিমানটুকুই ব্রজগোপালের অস্তিত্ব বোধ হয়। তার সঙ্গে নিরন্তর চলে অপেক্ষা আর অপেক্ষা। এই কঠিন পাথরের অভিমান ভাঙবার জন্য কেউ আসুক, সবাই আসুক।

মৃত্যু ছাড়া ব্রজগোপালের এই বৃথা অভিমান থেকে মুক্তি নেই। এই কথা ভেবে রিকশায় বসে উত্তুরে বাতাসে কেঁপে ওঠে সোমেন। পাশে-বসা মুনিশ লোকটা একটা বিড়ি ধরায়।

রাতের ট্রেনটা এল। ইলেকট্রিক ট্রেন নয়। কয়লার ইঞ্জিন, কাঠের বগি। আগাপাশতলা গাড়িটা ফাঁকা। দু-একটা কামরায় দু-চারজন আছে। বেশির ভাগ কামরাই জনশূন্য। বাছাবাছির সময় নেই বলে সামনের কামরাতেই মুনিশ লোকটা ব্যাগট্যাগ সুদু তুলে দেয় সোমেনকে।

সোমেন গাড়ি ছাড়লে টের পায় তার কামরাটায় সে একদম একা।

॥ চার ॥

ফাঁকা গাড়ির কামরায় সোমেনের একা বড় ভয়-ভয় করে। কোমরে আন্ডারওয়্যারের দড়ির খোপে কয়েকশো টাকা রয়েছে, বহেরুর দেওয়া। দাদা বিয়েতে নতুন ঘড়ি পেয়ে তার পুরনো ঘড়িটা দিয়ে দিয়েছে সোমেনকে। পুরনো হলেও ভাল ঘড়ি, টিসো। সেই ঘড়িটা সোমেনের কবজিতে বাঁধা। বউদির বড্ড ভুলো মন, স্নানের সময়ে সাবান মাখতে অসুবিধে হয় বলে আংটি খুলে রাখে। তারপর প্রায়দিনই ভুলে ফেলে আসে বাথরুমে। কতবার বাড়ির লোক পেয়ে ফেরত দিয়েছে। সোমেন কয়েকবার আংটি লুকিয়ে রেখে সিনেমার বা সিগারেটের পয়সা আদায় করেছে। অবশেষে বউদি জ্বালাতন হয়ে একদিন বলে—ও আংটি হাতে রাখা মানে হাতি পোষার খরচ। রোজ হারাবে আর রোজ তোমার কাছ থেকে বন্ধকি জিনিস ছাড়াতে হবে। তার চেয়ে ওটা তুমিই আঙুলে পরে থাকে। তাই পরে সোমেন। বউদির মধ্যের আঙুলের আংটি তার কড়ে আঙুলে হয়।

ঘড়ি আংটি দুটোই খুলে পকেটে রাখল সোমেন। দরজা দুটোর লক লাগাতে গিয়ে দেখল, ছিটকিনি ভাঙা। গোটা দুই টিমটিমে আলো জ্বলছে, মাঝে মাঝে উসকে উঠছে আলো, আবার নিবু-নিবু হয়ে যাচ্ছে। ফাঁকা, রহস্যময়, ভৌতিক কামরা। শনিবার রাতের ট্রেন ফাঁকা যায়, বাবা বলেছিলেন। কিন্তু এতটা ফাঁকা, সোমেন ভাবতে পারেনি। আশপাশের কামরাতেও লোক নেই, সোমেন বৈঁচী স্টেশনে গাড়িতে উঠবার সময়ে লক্ষ করেছে, লোক থাকলেও অবশ্য লাভ ছিল না। ডাকাতি ভরাভরতি কামরাতেও হয়। সে সাবধানে কোমরে হাত দিয়ে ফোলা জায়গাটা দেখল। বহেরুর দেওয়া টাকা, একবার ভাবল, পরের স্টেশনে নেমে কামরা পালটে নেবে। কিন্তু বৈঁচীগ্রাম স্টেশনে গাড়ি থামলে দরজা খুলে নামতে গিয়েও সে দমে যায়। এমন ফাঁকা, শূন্য হাহাকার স্টেশন সে কদাচিৎ দেখেছে। দীর্ঘ প্ল্যাটফর্মে জনমানুষের চিহ্নও নেই, শুধু শীতের বাতাস বয়ে যাচ্ছে। অনেক দূরে স্টেশন-ঘরটা ঝিম মেরে আছে আধো অন্ধকারে। কুয়াশায় আবছা। খোলা মাঠে জমে আছে অন্ধকার, ঘুমন্ত, নির্জীব। সোমেন নামবার সময়ও পেল না। ট্রেন ছেড়ে দিল। প্ল্যাটফর্মটা পার হওয়ার সময় সে কেবল একজন বুড়ো কুলিগোছের লোককে দেখল রেলের কম্বলে কোট গায়ে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একা একটা মানুষ, পিছনে প্ল্যাটফর্মের বিশাল নির্জনতা। সোমেন তৃষিতের মতো লোকাকে দেখল। মানুষ যে মানুষের মত আপন তা ওই একা লোকটাকে দেখে সোমেন বুঝতে পারে হঠাৎ।

একটু কাঁপা বুক আর দুশ্চিন্তা নিয়ে সে দরজা থেকে ফিরে এসে বেঞ্চে বসে। কামরা বদলেও লাভ যখন নেই, লোকভরতি কামরাতেও যখন ডাকাতি হয়, আর তাকে যখন এই ট্রেনে ফিরতেই হবে তখন আর কী করার আছে?

পুরনো আমলের গাড়ি। বয়সের জীর্ণতা দেখা যাচ্ছে চারধারে। রঙের ওপর বিবর্ণ রং দিয়ে কামরাটার ব্রিটিশ আমলের জরার চিহ্ন ঢাকা পড়েনি। চলার সময়ে একটা ক্লান্তির ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ তুলছে। অ্যালার্মের

শেকল দুলে দুলে টংটঙাস শব্দ তোলে। বাতি নিবু-নিবু হয়ে আসে, আবার জ্বলে। পরের স্টেশনও পার হয়ে গেল গাড়ি। লোকজনের কোনও শব্দ হল না। ফাঁকা ট্রেন একটা বাঁশি দিয়ে আবার ছাড়ল।

সোমেন বসে থাকে। মনে মনে প্রার্থনা করে, পরের স্টেশনে যেন দু-চারজন লোক ওঠে কামরায়। এত ফাঁকা সে সহ্য করতে পারে না। ভিড়ের কামরা কত বিরক্তিকর, ফাঁকা কামরাও কী অসহ্য! মানুষ যে কোন অবস্থায় সুখী হয়!

চিনেবাদাম, কমলার খোসা পড়ে আছে। দোমড়ানো ঠোঙা, সিগারেট আর বিড়ির টুকরো, দেশলাইয়ের বাক্স ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ মেঝেটা দেখলে হঠাৎ ভয় করে। কত মানুষ ছিল, তারা কেউ নেই। এ কথাটা হঠাৎ চমকে ওঠে বুকের মধ্যে। কলকাতার ভিড়-ভাট্টায়-গা-ঘেঁষা মানুষকে মানুষ কত অপছন্দ করে! আবার কখনও এরকম নির্জনতায় মানুষের বুকে মানুষের জন্যই পিপাসা জেগে ওঠে। সোমেন একটা সিগারেট ধরায়। জানালার ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে বাতাস আসে, ছিটকিনিহীন দরজা বাতাসের দমকায় দড়াম করে খুলে আবার ধীরে ধীরে আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। ভূতুড়ে বাতিগুলো জ্বলে আর নেবে। একটা কালভার্ট বাঁয়ার শব্দের মতো শব্দ তুলে পার হয় গাড়ি। সোমেনের বড্ড শীত করতে থাকে। দাঁতে দাঁতে শব্দ হয়। কোটের কলারটা সে তুলে দেয়, জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকে। অন্যমনস্ক হওয়ার জন্য সে সুন্দর কিছু একটা ভাবতে চেষ্টা করে। আর ট্রেনটা অবিরল 'দিনকাল ভাল নয়, দিনকাল ভাল নয়', শব্দ তুলে ছুটতে থাকে।

চোখ বুজে এখন একটা বাক্য ভাবছিল সোমেন—ভগবান, উহারা যেন সুখে থাকে। কখন, কোন একাকীত্ব বা সহায়তার সময়ে বাবা ওই কথাটা তাঁর ডায়েরির পাতায় লিখে রেখেছিলেন কে জানে। সোমেনের আর কিছু মনে পড়ে না, কেবল ওই বাক্য মনে পড়ে। বাবার জন্য একটু কষ্ট হয়। তাঁর অভিমান যে কত কঠিন হয়ে গেছে তা বাবাও জানেন না। আয়ুর সময় আর বেশি দিন নয়, ততদিন উদ্‌গ্রীব অপেক্ষা করবে বাবা। কেমন ব্যস্তসমস্ত হয়ে মার চিরকুটটুকু পড়ছিল বাবা। হায়, তার মধ্যে বেশি কিছু ছিল না, ছিল 'প্রণতা ননী'। কিন্তু ওই প্রণামটুকু বাবা কি নিয়েছে? নেবে কী করে? চিঠির মধ্যে বড় স্বার্থপর কথা ছিল যে! দশ হাজার টাকা নিজের ছেলেদের বাড়ি করবার জন্য চেয়ে নেওয়া, প্রণামটুকু তার মধ্যেই হারিয়ে গেছে। ওটা শব্দমাত্র, আর কিছু নয়। সোমেন জানে।

সোমেনের বড় ইচ্ছে করে, বাবাকে আবার ফিরিয়ে আনতে। তা হয় না যদিও। ফিরে এলে আবার কাক-শালিক তাড়ানো ঝগড়া হবে। সে ভারী অশান্তি। বাবা বলেছিলেন, সোমেনের আলাদা বাসা হলে আসবেন। আলাদা বাসার কথা সোমেন কল্পনা করতে পারে না। মা আর দাদাকে ছেড়ে আলাদা বাসা করে থাকবে—তা কি হয়?

বাবার কথা ভাবতে ভাবতে তার কলকাতার কথা মনে হয়। কলকাতার ওপর বাবার ভারী রাগ। কলকাতা সম্বন্ধে বাবার মতামত শুনলে হাসি পায় ঠিকই। কিন্তু সোমেনের মাঝে মাঝে মনে হয়, কলকাতার যেন আর কিছু হওয়ার নেই। তার বুকে যতটুকু জায়গা ছিল তার চেয়ে ঢের বেশি মানুষজন আর ইমারত ঠেসে দিচ্ছে চারপাশ থেকে। এ ভার সে আর বইতে পারছে না। রাস্তায় রাস্তায় আজকাল হোর্ডিং লাগিয়ে বিজ্ঞাপন দেয়—কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে। কিংবা—ক্যালকাটা ইজ ফর এভার, কিপ ক্যালকাটা ক্লিন...ইত্যাদি। পাশে আঁকা রক্তবর্ণ গোলাপের ছবি। কিন্তু তার মনে হয়, কলকাতার যতটুকু হওয়ার তা হয়ে গেছে। এখন কেবল অপটিমাম প্রেসারে টান টান টেনশনের ওপর রয়েছে কলকাতা। চারধারে কী একটা

যেন ছিঁড়বে, ভাঙবে, তখন হুড়মুড় করে নগরপতনের ভয়াবহ শব্দ উঠবে। কলকাতার প্রতিটি লোকই বোধ হয় কোনও না কোনও বিহ্বল মুহূর্তে এই কথা ভাবে। কী সেটা তা বোঝা যায় না, অনুভব করা যায়।

আবার একটা নির্জন স্টেশন এল, চলে গেল। শীতের বাতাসে গা-শিরশির করা বাঁশি দিয়ে গাড়িটা নড়ে ওঠে। বুড়ো শরীরের জীর্ণতার শব্দ তুলে চলে। সোমেন সুন্দর কিছু ভাবতে চেষ্টা করে। সুন্দর কিছু মনে পড়ে না। এক হতে পারে বাড়ি গিয়ে সে দেখবে ব্যাঙ্ক অব বরোদার চিঠিটা এসেছে। পরীক্ষা ভাল দিয়েছিল, প্যানেলের উঁচুর দিকেই তার নাম থাকার কথা। চিঠিটা যদি আসে!

ভাবতেই কেমন একটা আনন্দের ধড়ফড়ানি ওঠে বুকে, আর সেই সঙ্গে রিখিয়ার মুখ মনে পড়বেই, পাভলভের থিয়োরিতে কুকুরের ঘটনার মতো, কন্ডিশন রিফ্লেকস। কিন্তু ভেবে দেখলে তার চাকরির সঙ্গে রিখিয়াকে কিছুতেই এক সুতোতে বাঁধা যায় না। এ এক রকমের স্বপ্ন দেখা সোমেনের, তেইশ বছর বয়সে এখনকার ছেলেরা আর এরকম স্বপ্ন দেখে না। সোমেন বালিগঞ্জ সারকুলার রোডে রিখিয়াদের বাড়িটা প্রায় সময়েই মনশ্চক্ষে দেখে। একদম হালফিল কায়দার বাড়ি, যার ডিজাইনটায় অনেকগুলো অসমান কিউবিক প্রকোষ্ঠ। দোতলার বারান্দায় অ্যালুমিনিয়ামের রেলিং। সবুজ খানিকটা জমির ওপর বাড়িটা বিদেশের গন্ধ মেখে দাঁড়িয়ে। ঘরে ঘরে অদ্ভুত সব গন্ধ।

মাকে বলেছিল—তুমি সঙ্গে চলো। মা রাজি হয়নি। বলেছিল, আমার বড় লজ্জা করে। তুই একা যা। সোমেন তবু চাপাচাপি করেছিল—তোমার ছেলেবেলার সই, তার কাছে লজ্জা কী? মা বিষণ্ণ মুখে বলেছে—সংসারের কী অবস্থা, দেখিস তো? মনের এসব অশান্তি নিয়ে কোথাও যেতে ইচ্ছেই করে না। ছেলেবেলার সই, তোর বাবার কথা জিজ্ঞেস করলে বলব কী? কোন কথায় কোন কথা উঠে পড়ে, আমি আবার সাজিয়ে বানিয়ে দুটো মিথ্যে কথা বললে তাল রাখতে পারি না। সব গোলমাল হয়ে যায়, তার ওপর এ চেহারা শৈলী কি আর চিনবে, দেখে আঁতকে উঠবে হয়তো। কী যে এক ঢল চুল ছিল আমার, রংটাও ছিল ফুটফুটে। চেহারা দেখেই সংসারের অশান্তি বুঝে ফেলবে। তুই একা যা। আমার খুব বন্ধ ছিল শৈলী। তোকে আদর-টাদর করবে। সংসারের কথা যদি জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করে তো রেখেঢেকে বলিস।

সেই যাওয়া, পকেটে একটা চিঠি ছিল মায়ের দেওয়া, তাতে লেখা—শৈলী, এই আমার ছোট ছেলে, সোমেন, তোর কাছে পাঠালুম। ওর যাতে একটা চাকরি- বাকরি হয় দেখিস.... ।

দোতলার ঘরে মার সেই শৈলী শুয়ে আছে। পিয়ানোর রিডের মতো চমৎকার সিঁড়ি বেয়ে উঠে দোতলার ঘরটিতে ঢুকে দৃশ্যটা দেখে থমকে গিয়েছিল সোমেন। পড়ন্ত বেলার আলো থেকে বাঁচানোর জন্য শ্যাওলা রঙের শেড টানা ছিল জানালায়, একটা মস্ত নিচু ইংলিশ খাটের উপর উনি শুয়ে, বুক পর্যন্ত টানা একটা পাতলা লেপ। চেহারাটা রোগজীর্ণ, সাদা, রোগা। উঠে বসতে বসতে বললেন—কোন ননী, বগুড়ার ননী? তুমি তার ছেলে? ওমা!

ঘরটায় তেমন কিছু ছিল না। শেড থেকে একটা সবজে আভা ছড়িয়ে আছে আলোর মতোই। পরিষ্কার সাদা শ্বেতপাথরের মতো মেঝে। শিয়রের কাছে একটা ট্রলি, তাতে ওষুধের শিশি, কাটগ্লাসের জগে স্বচ্ছ জল, ভাঁজ করা ন্যাপকিন। একধারে একটা সাদা রেফ্রিজারেটার, ছোট্ট। একটা ড্রেসিং টেবিল। বালিশের পাশে কয়েকটা বই, একটা মহার্ঘ চশমা। একটা বই খোলা এবং উপুড় করা।

—বোসো বাবা। তোমরা কলকাতায় থাকো? কোথায়? বলে উনি ঝুঁকে বসলেন, কোলের ওপর হাত। ঢাকুরিয়া শুনে চোখ বড় বড় করে বললেন, এত কাছে! তবু ননী একদিনও এল না? সেই খুলনায় থাকতে চিঠি দিত মাঝে মাঝে। কতকাল তাকে দেখি না। খুব বুড়ো হয়ে যায়নি তো ননী? আমি যেমন হয়ে গেছি?

সোমেন অস্বস্তির হাসি হেসেছিল। মা-ও বুড়ো হয়ে গেছে ঠিকই। বয়স তো আছেই, আর আছে সংসারের কত তাপ, ব্যথা বেদনা। সেসব কে বোঝে?

অত বড়লোক, তবু শৈলীমাসির কোনও দেমাক দেখেনি সোমেন, বরং বললেন—কতকাল ধরে রোগে পড়ে আছি। সারে না। বড় মানুষজন দেখতে ইচ্ছে করে, কিন্তু এই রোগা-ভোগার কাছে কে এসে বসে থাকবে! ননী এলে কত খুশি হতাম, তবু ননীর বদলে তুমি তো এসেছ! তোমার মুখখানা ননীর মতো, মাতৃমুখী ছেলেরা সুখী হয়।

এ সময়ে রিখিয়া এল। বোধ হয় ইস্কুলের উঁচু বা কলেজের নিচুর দিকে পড়ে। কিশোরী, চঞ্চল, সদ্য শাড়ি ধরেছে। ইস্কুল বা কলেজ থেকে ফিরল বোধ হয়, মুখখানায় রোদ-লাগা লালচে আভা। এলো চুলের জট ছাড়াতে ছাড়াতে ঘরে এল, মায়ের বিছানার কাছে এসে অন্যমনে উঠে-আসা আলগা চুল আঙুলে জড়িয়ে চোখের সামনে তুলে ধরে বলে—ইস, রোজ কতটা করে চুল উঠে যাচ্ছে?

শৈলীমাসির মুখখানার রেখাগুলি নরম হয়ে গেল, বললেন—এই আমার একটামাত্র মেয়ে রিখিয়া। আমি ডাকি রিখি, ওর বাপ ডাকে রাখু। তোমার ভাল নাম কি বললে, সোমেন্দ্রনাথ?

সোমেন মাথা নাড়ে।

শৈলীমাসি হেসে বলেন—পুরনো আমলের নাম। আজকাল আর নামের মাঝখানে নাথ-টাথ কেউ লেখে না। সোজা নাম-টাম লেখে। এখন দেখি ডাকনামের মতো সব ছোট ছোট নামের রেওয়াজ। সেদিন এক বারোয়ারি পুজোর স্যুভেনির দিয়ে গেল, মেম্বারদের নামের মধ্যে দেখি কত মিন্টু ঘোষ, পন্টু রায়, বাবলু সান্যাল—বলতে বলতে মুখ তুলে মেয়ের দিকে চেয়ে বলেন—তাই না রিখি?

রিখিয়া উত্তর না দিয়ে মুখ টিপে অর্থপূর্ণ হাসে। হাসতেই থাকে। বোঝা যায় নামের ব্যাপারটা নিয়ে এ বাড়িতে একটা রসিকতা চালু আছে।

রিখিয়া বলল—রিখিয়া নামটা বিচ্ছিরি।

শৈলীমাসি হাসেন, সোমেন বলেন—রিখিয়ার বড় মামার ছিল বিদঘুটে পেটের ব্যামো, কত ডাক্তার-বদ্যি করেও সারে না, সেবার গেল সাঁওতাল পরগনার রিখিয়াতে হাওয়া বদলাতে। সেখানে সারল, ফিরে এসে দেখে ভাগনি হয়েছে, তাই নাম রাখল রিখিয়া, বলল—শৈলী, তোর মেয়ের যা নাম রাখলাম দেখিস, রোগবালাই সব রুখে দিলাম।

বলে সস্নেহে মেয়ের দিকে কয়েক পলক চেয়ে থেকে মুখ সরিয়ে একটা শ্বাস ফেলে বলেন—বলতে নেই, শরীর নিয়ে রিখি আমাকে একটুও জ্বালায়নি, আমি তো কবে থেকে রোগ-বালাই নিয়ে পড়ে আছি, রিখি শিশুবেলায় যদি ভুগত তো ওকে দেখত কে? বড্ড লক্ষ্মী ছিল রিখিয়া সেই বয়স থেকেই। রিখি, সোমেনকে কিছু খেতে দিবি না? ফ্রিজিডেয়ারে সন্দেশ আছে, দে। এ ঘরে নয়, পাশের ঘরে নিয়ে যাস। রুগির ঘরে খেতে নেই।

সোমেন কয়েক পলকের বেশি রিখিয়াকে তখন দেখেনি। খুব সুন্দরী নয়, তবু হালকা পলকা শরীরে একটা তেলতেলে লাবণ্য পিছলে যাচ্ছে। শ্যামলা রং, মুখখানায় সংসারের টানাপোড়েনের ছাপ পড়েনি বলে ভারী কমনীয়। একটু দুষ্টু ভাব আছে, আছে বেশি হাসার রোগ। একটু জেদ-এর ভাবও নেই কি! তবু সব মিলিয়ে রিখিয়া বড় জীবন্ত।

শৈলীমাসি বলেন—রিখি আমার চুলের গোছ ধরে বলে—মা, তোমার এখনও কত চুল। আমি তখন ননীর কথা ভাবি। ইস্কুলে ননীর নাম ছিল চুলঅলা ননীবালা, দিদিমণিরা পর্যন্ত ওর খোঁপা খুলে চুলের গোছ দেখত। আমরা কত হিংসে করতাম। দড়িদড়া দিয়ে কতবার চুল কত লম্বা তা মেপে দেখেছি, ভারী লক্ষ্মী ছিল ননী, আমরা যতবার ওর চুল মাপতাম ততবার চুপটি করে দাঁড়াত, হাসত, কখনও আপত্তি করত না। দাঁড়াও, তোমাকে একটা জিনিস দেখাই। রিখি, আমার অ্যালবামটা দে তো—

অ্যালবাম এলে শৈলীমাসি সোমেনকে কাছে ডাকলেন। একটা পাতায় গ্রুপ ছবি। হলদে হয়ে গেছে প্রায়। তিন সারি মেয়ে। দাঁড়িয়ে এক সারি, চেয়ারে বসে এক সারি, মাটিতে এক সারি। কারও হাতে এমব্রয়ডারির ফ্রেম—সেলাই করছে, কারও বা হাতে কুরুশকাঠি, চেয়ারে বসা দুজন মেয়ের সামনে সেলাই মেশিন। প্রায় পঁচিশ-ত্রিশজন মেয়ে ছবিতে রয়েছে।

শৈলীমাসি বলেন—ইস্কুলে হাতের কাজের ক্লাসে তোলা ছবি। এর মধ্যে ননী কে বলো তো?

সোমেন মুখ টিপে হাসল। বাঁ ধারে সেলাই মেশিনের পিছনে মা বসে আছে। রোগা, খুব এক ঢাল চুল, নতমুখে, বড় হাতার ব্লাউজ, শাড়ির আঁচল ব্লাউজের কাঁধে পিন করা। এক নজরেই চেনা যায়। তবু বড় অবাক লাগে। তাদের বাড়িতে মার ওই বয়সের কোনও ছবি নেই। কিশোরী মাকে কখনও দেখেনি সোমেন। দেখে অবাক মানে। এই ছিল আমার মা?

শৈলীমাসি মুখের দিকে চেয়েছিল সকৌতুকে। সোমেন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে—এই তো আমার মা।

—ও বাবা! নিজের মাকে চিনতে দেখি একটুও ভুল হয়নি! এখন বলো তো, আমি কোন জন?

ভারী মুশকিলে পড়ে যায় সোমেন। মুহূর্তেই ত্রিশজন মেয়ের ছবি একাকার হয়ে যেতে থাকে। শৈলীমাসির মুখটা কিছুতেই খুঁজে পায় না। তখন টের পায় তার কাঁধে সুগন্ধী এলোচুলের একটা গুছি এসে স্পর্শ করেছে। পরিষ্কার শরীরের সতেজ স্বাস ফেলে রিখিয়া ঝুঁকে পড়ে কাঁধের ওপর দিয়ে, আঙুল বাড়িয়ে বলে—এই তো আমার মা।

সোমেন দেখে, শৈলীমাসিই তো! নীচের সারিতে এমব্রয়ডারির কাঠের ফ্রেম হাতে বসে। ঢলঢলে শরীর, আহ্লাদী মুখ।

শৈলীমাসি বুক পর্যন্ত লেপটা টেনে আবার আধশোয়া হয়ে বলেন—চিনবে কী করে? তখন তো এমন হইনি। তুই ওকে খাবার দিলি না রিখি? দে, ভুলে যাবি পরে। কতদিন পর ননীর খবর পেলাম। বড় দেখতে ইচ্ছে করে। কে কে আছে তোমাদের সংসারে, বলো তো সব, শুনি। ক'ভাই-বোন তোমরা?

সোমেন সতর্ক হয়ে যায়। বাবাকে নিয়েই তাদের যত ভয়। সংসারের কথা একটুআধটু বলল সোমেন। তার দাদা রণেন্দ্রনাথ ফুড ইনস্পেকটর, দুই দিদির বিয়ে হয়ে গেছে, সে ছোট, বাবা রিটায়ার করে জমিজমা দেখছেন।

শৈলীমাসি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—ননীকে আসতে বোলো। খুব ভাল লাগবে। আমার ছেলেটা কতকাল ধরে বিলেতে পড়ে আছে। আসে না। আসবেও না লিখেছে। ওখানেই বিয়ে করবে। মেয়েটাই সম্বল। কিন্তু মেয়ে তো নিজের না, পরের ঘরে যাবে। আমার মাত্র দুটি। ননীকে বোলো যা দেখে গেলে।

—বলব।

—রিখি, ওকে খাবার দে। তুমি ওর সঙ্গে যাও সোমেন, যাওয়ার সময় আমাকে বলে যেও। আমি একটু ঘুমোই।

শৈলীমাসি পাশ ফিরে শুলে সোমেন রিখিয়ার পিছু নিয়ে পাশের ঘরটায় আসে। বসার ঘর। গভীর সব গদিওলা সোফা, একধারে বুক-কেস কালো কাঠের। চার রঙের চারটে দেয়ালে তেলতেলে পালিশ। বুক-কেসের ওপর একটা আসাহি পেনট্যাক্স ক্যামেরা হেলাফেলায় পড়ে আছে।

কোথা থেকে এই সুন্দর বড়লোকি ঘরের কোন কোনা থেকে একটা কুকুর উঠে এল। দিশি কুকুর। তার হাঁটাটুকুর মধ্যে যেন আত্মবিশ্বাস নেই। এই ঘরে একটা দিশি হলদে কুকুর দেখবে। এমনটা আশা করেনি সোমেন। সে এসে রিখিয়ার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মুখটা তোলে। রিখিয়া ঝুঁকে একটু আদর করে ওকে। মুখ ফিরিয়ে সোমেনকে বলে—বসুন।

সোমেন খুব অবাক হয়ে কুকুরটাকে দেখছিল। প্রথমে লক্ষ করেনি। এখন দেখল, কুকুরটা অন্ধ। সোমেন এমন দৃশ্য কখনও দেখেনি।

সন্দেশ আনতে রিখিয়ার অনেক সময় লাগল। কুকুরটাকে আদর করল অনেকক্ষণ। তারপর প্লেট ভরতি ঠান্ডা সাদা সন্দেশ সামনের সেন্টার টেবিলে রেখে বলল—আমার ভাল নামটাও বিচ্ছিরি।

—কী সেটা?

—অপরাজিতা। কিন্তু ওই নামে কেউ ডাকে না।

—রিখিয়া বেশ নাম।

—ছাই, জায়গার নামে মানুষের নাম বুঝি ভাল?

—আমার নামও ভাল নয়। আমার ছোড়দির নাম বুড়ি...

এইভাবে কথা শুরু হয়েছিল। ঠান্ডা, হিম সন্দেশের ডেলা সোমেনের গলা দিয়ে নামছিল না। মেজের ওপর কার্পেট নেই, সোফার সামনে মস্ত মস্ত লাল নীল উলের নরম পাপোশ। পা রাখলে ডুবে যায়। তারই একটাতে রিখিয়ার পায়ের কাছে অন্ধ কুকুরটা শুয়ে আছে।

—কুকুরটা চোখে দেখে না?

—না। অন্ধ।

—কী করে হল?

—জানি না তো, আমরা ওকে এরকমই পেয়েছিলাম। তখন গড়পারের বাড়িতে থাকতাম আমরা। বেশ গরিব ছিলাম। সে সময়ে এটা কোথা থেকে এসে জুটল। রয়ে গেল। এখন বুড়ো হয়ে গেছে।

—ঠিকমতো চলাফেরা করতে পারে?

—একটু একটু অভ্যাস আছে, তবে প্রায়ই এখানে-ওখানে ধাক্কা খায়।

'তুমি' না 'আপনি' কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না সোমেন। অন্ধ কুকুরটা থেকে চোখ তুলে সে আবার বুক-কেসের ওপর আসাহি পেনট্যাক্স ক্যামেরাটা দেখে। কী চকচকে, ঝকঝকে ক্যামেরাটা। মস্ত লেন্স। নিষ্প্রাণ একটি চোখ মেলে চেয়ে আছে সোমেনের দিকে। ঠিক যেন পাহারা দিচ্ছে। বার বার ওই অন্ধ কুকুর থেকে ক্যামেরার একটিমাত্র নিষ্প্রাণ চোখ পর্যন্ত দেখছিল সোমেন। সন্দেশের ডেলাটা গলা দিয়ে নামতে চাইছে না। জল খেতে গিয়ে বিষম খেল। ওই হেলাফেলায় পড়ে থাকা দামি ক্যামেরা তার সঙ্গে দিশি কুকুরটা কেমন যেন বেমানান। ঘরের মধ্যে ওই দুটি জিনিসই সবচেয়ে বেশি লক্ষ করছিল সোমেন।

রিখিয়াকেও কি লক্ষ করেনি? করেছে। তবে তার তেমন কোনও দুর্বলতা নেই মেয়েদের সম্পর্কে। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময়ে কত মেয়ের সঙ্গে তার তুই-তোকারি সম্পর্ক ছিল, আড্ডা দিয়েছে লন-এ বা রেস্টুরেন্টে, ফাঁকা ক্লাসঘরেও। তাই বুক কাঁপছিল না সোমেনের। কিন্তু সেই অপরাহ্নকালে বসবার ঘরে রিখিয়াকে দেখতে তার ভাল লেগেছিল বড়। লাল কার্পেটের ওপর পা রেখে রিখিয়া বসে। একটু ঝুঁকে কুকুরটাকে আদর করছে। বড় মহার্ঘ মনে হয়েছিল তাকে। পাহারা দিচ্ছে অন্ধ কুকুর, ক্যামেরার চোখ। একটু ভয় ভয় করেছিল সোমেনের।

রিখিয়া বলে—আপনি এম-এ পরীক্ষা দেননি?

—না।

—কেন?

—কী হবে পড়ে! চাকরি করা বরং ভাল।

—চাকরি? বলে সকৌতুকে রিখিয়া চেয়ে থাকে। ভাবখানা—ইস, এইটুকু ছেলের আবার চাকরি।

পকেটের চিঠিটা পকেটেই রয়ে গেল সোমেনের। দেওয়া হল না শৈলীমাসিকে। মুখে সে পরিচয় দিয়েছিল —আমি ননীবালার ছেলে, আপনার সই ননীবালা। ব্যস ওইটুকুর জোরেই ওরা গ্রহণ করেছিল তাকে। প্রমাণপত্র চায়নি। চিঠিটা হাতে দিতে বড় লজ্জা করেছিল সোমেনের।

যখন শৈলীমাসির কাছে বিদায় নিয়ে আসে তখনও বুকপকেটের চিঠিটার কথা মনে হয়েছিল। শৈলীমাসি বলেন—আবার এসো। ননীকে আসতে বোলো। আমি তো কোথাও যেতে পারি না।

—আসব মাসিমা। বলেছিল সোমেন।

চমৎকার সিঁড়িটা বেয়ে নেমে আসার সময়ে হঠাৎ শুনল রিখিয়ার স্বর—আবার আসবেন।

মুখ তুলে দেখে, রিখিয়া রেলিং ধরে ঝুঁকে দোতলা থেকে চেয়ে আছে। তার চলে যাওয়া দেখছে।

সোমেন ঘাড় নাড়ল। আসবে। মনে মনে বলল—তোমার কাছেও আসব রিখিয়া। একা তোমার কাছেই। এ তো স্পষ্টই বোঝা যায় যে একদিন সুসময়ে তোমার সঙ্গেই আমার ভালবাসা হবে!

সেই অন্ধ কুকুর, সেই আসাহি পেনট্যাক্স ক্যামেরা বড় মনে পড়ে সোমেনের। ব্যাঙ্ক অফ বরোদার চাকরির কথা মনে হলে রিখিয়ার কথা কেন যে মনে পড়বেই!

গাড়িটা চলেছে তো চলেছেই। একটু ঢিমে গতি, নড়বড় করা শরীরের শব্দ। পাঁচটা স্টেশন গেল। কেউ উঠল না, নামল না। সোমেনের কোমরে গোঁজা টাকা, পকেটে আংটি, ঘড়ি, দিনকাল ভাল নয়, দিনকাল ভাল নয়, বলতে বলতে ট্রেনটা ছুটছে।

একটু ঢুলুনি এসেছিল বুঝি। বেঞ্চের ওপর পা তুলে, ছারপোকার কামড় খেতে খেতে ও ঘুমিয়ে পড়েছিল। সেই ফাঁকে ট্রেনটা থেমেছিল কোথাও।

হঠাৎ আবার চলতেই ঝাঁকুনিতে জেগে যায় সোমেন। এবং চমকে দেখতে পায়, সামনে চারটে ছেলে দাঁড়িয়ে। চারজোড়া চোখ তার মুখের ওপর স্থির।

॥ পাঁচ ॥

যে চারজন সোমেনকে দেখছিল তাদের একজনের নাম মেকো।

চারজনের একজন মেকোকে বলে—মেকো, প্যাসেঞ্জার।

—আই বে। মেকোর উত্তর।

—ও ধারটায় বসি চল, হেভি খাওয়া হয়ে গেছে। বাবুর বাবাটা মাইরি এত খচরা কে জানত।

অন্য একজন বলে—মেকো, মনে দুখ লিস না। তোর কপালটা খারাপ।

মেকো লম্বা, কালো, পরনে নোংরা প্যান্ট, গায়ে একটা মেয়েদের খদ্দরের নকশাদার চাদর। মুখটা সরু, ভাঙা। সোমেনকে একবার স্থির, ক্রূর দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে বলল—না গান্ডু, দুখ কীসের? তোমরা তো চুপকি মেরে ঢুকে খেয়ে এলে, আমার বেলায় হারামি বাবুর বাবা ঠিক আটকে দিল!

চারজন কামরার অন্য দিকে গিয়ে বসে। সোমেনের বয়সিই হবে। জামা প্যান্ট ময়লা, ফরসা কিংবা কালো, লম্বা কিংবা বেঁটে চারজনকে কিন্তু গড়পড়তা একই রকম দেখায়। মেকো এক ঠোঙা চিনাবাদাম বের করে বেঞ্চে নিজের পাশে রেখে বলে—বাবু বলেছিল বাটে ওর বাপটা হারামি আছে।

একজন বলে—বহুত হারামি। বাবু আমাকেও বুধবারে বলেছিল, ওর বোনের বিয়েতে আসতে পারলে একটা সিনেমা দেখাবে। আমি তো যেখানে বিয়েবাড়ি দেখি ঠিক ঢুকে যাই, আর এ তো বন্ধুর বোনের বিয়ে! বাবু তখনই বলল—শুয়োরের বাচ্চা, আমার বাপকে তো চেনো না। বলেছে আমার কোনও বন্ধু ঢুকলে ঘাড় ধরে বের করে দেবে। আমিও বললাম, ঠিক আছে দেখে নেব।

—তোকে কী বলল?

—কী বলবে! প্যান্ডেলের গেট আটকে দাঁড়িয়েছিল উটকো লোক যদি ঢুকে যায় তো আটকাবে! আমাকে কেবল জিজ্ঞেস করল—তুমি কোত্থেকে আসছ? বুদ্ধি করে বলে দিলাম, ছেলের তরফের। সন্দেহ করেছিল বটে, কিন্তু আটকায়নি।

মেকো বেঁটে একজনকে জিজ্ঞেস করে, তোর তো শালা নেমন্তন্নই ছিল।

যাকে জিজ্ঞেস করা সেই হাই তুলে বলে—নেমন্তন্ন মানে! পুরো ফ্যামিলি কার্ড। আমাকেও আটকে ছিল, বাবার নাম বলতেই ছেড়ে দিল। প্রেজেন্টেশনের প্যাকেট-ফ্যাকেট হাতে না থাকলে সন্দেহ করবেই। তুইও আবার মেজাজ নিলি।

মেকো ঠ্যাংটা ছড়িয়ে বলল—দূর বে গান্ডু, মেজাজ নেব না তো কি ওর ইয়ে ধুয়ে জল খাব? খপ করে হাতটা চেপে ধরল যে! বলল—তোমাকে তো চেনা-চেনা লাগছে, তুমি বাবুর বন্ধু না? তখন আমি ভাঁট নিয়ে বললাম—হ্যাঁ বন্ধু তো কী হয়েছে! তখন বলে—কে নেমন্তন্ন করেছে তোমাকে? আমি তখন গরম খেয়ে বললাম—নেমন্তন্ন আপনি করেননি, বাবু করেছে। হারামিটা তখন বলে—বাবু তার কোনও বন্ধুকে নেমন্তন্ন

করেনি, করলে তার হাড় গুঁড়ো করে দেব। দেখি নেমন্তন্নের কার্ড! সে একটা ফ্যাসাদ মাইরি। আরও গরম খেতে যাচ্ছিলাম, লোকজন জুটিয়ে ঠিক একটা ভণ্ডুল করতাম, সে সময়ে বাবু এসে দূর থেকে চোখ টিপে সরে পড়তে বলল। নইলে—

চতুর্থজন সিগারেট ধরাল। বলল—আমাকে কিছু জিজ্ঞেসই করেনি। বাইরে একটু দাঁড়িয়ে রইলাম। স্যুট করে ঢুকে গেলাম এক সময়ে।

মেকো বলে—বাবুকে ঝাড়ব একদিন। এত বিয়েবাড়ি 'রেড' করলাম, সন্দেহ করলেও ভদ্রলোকেরা বেশি কিছু বলে না, কিন্তু এরকম খচাই পার্টি কখনও দেখিনি।

মেকো দ্রুত চিনেবাদামের খোসা ভাঙে। তিনজন তার দিকে চেয়ে হাসে। মেকো হাসে না।

চতুর্থজন বলে—মেজাজটা না নিলে ঠিক ছেড়ে দিত তোকে।

মেকো তাকে একটা লাথি মারল! আচমকা। বলল—বেশ করেছি মেজাজ নিয়েছি।

লাথি খেয়ে চতুর্থজন বলে—তাতে লাভ কী হল? ভরপেট হাওয়া।

তিনজন হাসে।

দ্বিতীয়জন বলে—আসল কথাটা কী জানিস মেকো, তোর ড্রেসটা আজ সব মাটি করেছে। বিয়েবাড়ি ভদ্রলোকের জায়গা। আমাদের রাস্তা-ঘাটে দেখে তো বাবুর বাবা, ছোটোলোকের মতো দেখতে। তুই যদি একটু মেক-আপ নিয়ে যেতিস—

—খচাস না কেলো। ছোট ভাইটাকে বললাম পুলওভারটা রেখে যাস, এক জায়গায় যাব, বিকেলে দেখি সেটা নেই। মেজাজটা সেই থেকে বিলা হয়ে আছে।

তৃতীয়জন হঠাৎ বলে—মেকো, তোকে একটা জিনিস দিতে পারি।

—কী? নিস্পৃহ মেকো জিজ্ঞেস করে।

তৃতীয়জন তার প্যান্টের পকেট থেকে একটা ডেলা বের করে আনে।

—কী রে? মেকো চোখ ছোট করে জিজ্ঞেস করে।

—ফ্রাই। হাতছিপ্পু করে একটা সরিয়েছিলাম।

—কার জন্য?

কার জন্য আবার! এমনি।

মেকো জোর হেসে ওঠে—সুধাকে দিতিস? আলু!

সবাই খ্যা-খ্যা করে হাসতে থাকে।

মেকো আর তার সঙ্গীদের পুরো গল্পটা শোনা হল না। ব্যান্ডেলে ওরা নেমে গেল। সোমেন পকেটে হাত দিয়ে দেখল তার ঘড়ি আংটি, কোমরে টাকা। কিছু বিশ্বাস নেই। এখনও অনেকটা পথ।

হাওড়ায় যখন গাড়ি ঢুকল তখন স্টেশন ফাঁকা। রেল পুলিশ স্টেশনের চত্বর থেকে ভবঘুরেদের সরিয়ে দিচ্ছে, তবু এমন ভাল শোওয়ার জায়গা পেয়ে কিছু লোক এধার-ওধার পড়ে আছে চাদরমুড়ি দিয়ে শবদেহের মতো। শীতের রাত দশটার পরই ঝিমিয়ে গেছে শহর। কয়েকজন মাত্র তোক নিয়ে স্টিমারের মতো প্রকাণ্ড পাঁচ নম্বর বাসটা ছেড়ে যাচ্ছিল, সোমেন দৌড়ে গিয়ে ধরল। হাওড়ার পোল পেরিয়ে শহর ভেদ করে যেতে যেতে কিছুতেই যেন বিশ্বাস হয় না, একটু আগেই সে বহেরুর খামারবাড়িতে ছিল।

রাত এগারোটায় বাড়ি ফিরে এল সোমেন। সবাই তার অপেক্ষায় জেগে বসে আছে। কেউ খায়নি।

খেতে বসলে পর মা জিজ্ঞেস করে—কী বলল রে? দেবে?

—কী জানি। স্পষ্ট কথা বলল না।

মা শ্বাস ফেলে বলে—দেবে না। আমি জানতাম।

দাদা বিরক্ত মুখ তুলে বলে—জানতে যদি তবে আগ বাড়িয়ে চেয়ে পাঠালে কেন? আমি তো বারণই করেছিলাম।

—বুড়ো হয়েছে, এখন যদি মতিগতি পালটে থাকে—সেই আশায়।

দাদা ভাত মাখতে মাখতে বলে—যে লোকটার কোনওকালে মন বলে বস্তু ছিল না তার কাছ থেকে কিছু আশা করা বৃথা। তুমি কোন আক্কেলে যে চিঠিটাতে আমার নাম করে চাইলে! তোমার কি ধারণা, আমার নাম করে চাইলে বাবা গলে যাবে!

—তোকে তো ভালবাসত খুব। সংসারে একমাত্র তোর দিকেই টান ছিল।

—ওসব বাইরের টান, মায়া। সত্যিকারের ভালবাসা নয়...।

বলতে বলতে দাদা লাল হয়ে ওঠে রাগে, অপমানে।

মা দুঃখ করে বলে—অজিত বলছিল জমিটা আর ধরে রাখা যাবে না, ভাল ভাল দর দিচ্ছে লোক। ওর বন্ধুও দাদাকে দিয়ে গত সপ্তাহে চিঠি দিয়েছে।

—বেচে দিক গে। দাদা প্রচণ্ড রাগের গলায় বলে।

মা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। দাদার রাগকে এ বাড়ির সবাই ভয় পায়। দীর্ঘকাল হয় দাদার রোজগারে সংসার চলছে। সাঁইত্রিশ বছর বয়সে দাদা সংসারের পরিপূর্ণ অভিভাবক।

মা হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেঙে বলে—তুই একটু দেখ না!

দাদা অবাক চোখ তুলে বলে—কী দেখব?

—একবার যা, তোর মুখ দেখলে যদি মায়া হয়।

দাদা স্থির দৃষ্টিতে মার মুখের দিকে চাইল। মাও তক্ষুনি কথাটার ভুল বুঝতে পারে। চোখ সরিয়ে নিয়ে প্রসঙ্গ পালটে বলে—না হলে দেখ যেমন করে পারিস, ধারধোর করেও যদি রাখা যায়। আমার একখানা গয়না থাকলেও আজ খুলে দিলাম। কিন্তু ওই রাক্ষস তো সবই খেয়েছে।

দাদা কোনও উত্তর দেয় না, খাওয়ার শেষে উঠে যায়।

সোমেন আর মা এক ঘরে দুটো চৌকিতে শোয়। মশারি ফেলা হয়ে গেছে, সোমেন শোওয়ার আগে সিগারেট খাচ্ছিল। মার সামনেই খায়। মা তার মশারির মধ্যে বসে মশা খুঁজল কিছুক্ষণ। চুলের জট ছাড়াল বসে। তারপর এক সময়ে বলল—কেমন সব দেখে এলি?

—কীসের কথা বলছ? বাবার কথা?

—হুঁ।

—ভালই তো।

—বহেরু মোটে চারশো টাকা পাঠাল, ধানের দর কি এবার কম?

—বলল তো দর ভালই। যা দিল নিয়ে এলাম।

—তুই তো ওরকমই, বাপের মতো ন্যালাক্ষ্যাপা। হিসেব বুঝে আসতে হয়। বহেরু কি সোজা লোক! তোর বাপের প্রভিডেন্ট ফান্ডের আর হাতের-পাতের যা ছিল তা দিয়ে নাকি জমি-টমি কিনিয়েছে। শেষে সব ও নিজেই ভোগ করবে।

সোমেন একটু বিরক্ত হয়ে বলে—লোকটাকেই যখন ছেড়ে দিয়েছ তখন তার টাকার হিসেব দিয়ে কী হবে!

মা চুপ করে যায়। কিন্তু বেশিক্ষণ নিজেকে সামলাতে পারে না, বলে—আমার দুঃখ তোরা তার কিছু পেলি না। দশভূতে লুটে খাচ্ছে।

—খাক গে। আমার ওসব দরকার নেই।

—ঠিক ঠিক কী বললে বল তো?

—একবার তো বললাম।

—আবার বল। খতিয়ে দেখি, কথার মধ্যে কোনও ফাঁক রেখেছে কিনা।

—কলকাতায় আমরা বাড়ি করি তা চান না। গোবিন্দপুরে গেলে বাড়ি করার টাকা দেবে।

—চাকরি-বাকরি ছেড়ে যাবে কী করে!

—সেটা কে বোঝাবে!

—তুই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আসতে পারলি না?

সোমেন নীরব উত্তেজনায় আর একটা সিগারেট ধরাল।

—কিরে? মা জিজ্ঞেস করে আবার।

—বাবার বয়স কত মা?

—কেন?

—বলো না!

—সে হিসেব কি জানি? সে আমলে বয়স-টয়স নিয়ে তো কেউ হিসেব বড় একটা করত না। মনে হয় পঁয়ষট্টি হবে। আমারই তো বোধ হয় ষাট-টাট। কী জানি, ঠিক জানি না।

—এই বয়সে একটা লোক অতদূরে একা পড়ে আছে। সে কেমন আছে তা একবারও জিজ্ঞেস করলে না?

—মা একটু অবাক হয়ে বলে—জিজ্ঞেস করলাম তো! তুই তো বললি ভালই। কেন, কিছু হয়েছে নাকি?

বলতে বলতে মা উদ্বেগে মশারি তুলে বেরিয়ে আসে। মার চুল এখনও সব শেষ হয়ে যায়নি। এলো চুলের ঢলটি এখনও পিছনে কালো প্রপাতের মতো ঝরে পড়ছে। সেই কালোর মধ্যে রোগা সাদা মুখখানা, তাতে বিস্ফারিত চোখ দেখে সোমেনের মায়া হয়।

মাথা নেড়ে বলল—কিছু হয়নি।

—তবে ওসব কী বলছিস। ভাঁড়াস না। ঠিক করে বল।

সোমেন হাসতে চেষ্টা করে। ঠিক ফোটে না হাসিটা। তার মনের মধ্যে একটা কথা বিঁধে আছে—ভগবান, উহারা যেন সুখে থাকে। কোন অসতর্ক মুহূর্তে নাকি মৃত্যুচিন্তায় নিজের ওই আর্তস্বর ডায়েরিতে লিখে রেখেছে বাবা!

মা চেয়ে আছে।

সোমেন বলে—ভেব না, ভালই আছে। টাকার কথাটা বেশি বলতে আমার লজ্জা করেছিল। গত পাঁচবছর আমরা কেউ বাবার খোঁজ নিতে যাইনি।

মার মুখে যেন জল শুকিয়ে যায়। শুকনো মুখে টাকরায় জিভ লাগার শব্দ হয় একটা। মা বলে—গেলে কি খুশি হত নাকি। রণেন যখন যেত-টেত তখন তো উলটে রাগ করেছে! রণেনের অপমান হয় না! ছেলে এখন বড় হয়েছে, ছেলেমেয়ের বাবা তার সঙ্গে কথা বলতে বাপকেও সাবধান হতে হয়। সে লোকটা কী তেমন বাপ। চিরকাল...

মা হাপরহাটি খুলে বলতে যাচ্ছিল। সোমেন বাধা দিয়ে বলে—থাকগে। ওসব শুনে শুনে তো মুখস্থ হয়ে গেছে।

মা রাগ করে বলে—আজ হঠাৎ তার দিকে টানছিস কেন? সে তোর জন্য কী করেছে?

কিছু করেননি। সোমেন তা জানে। কেবল দশবাতির আলোয় মুখ তুলে বাবা একবার তাঁর কনিষ্ঠ ছেলেটির সুকুমার মুখশ্রী বড় ক্ষ্ধাভরে দেখেছিলেন। কী পিপাসা ছিল সেই চোখে!

সোমেন হঠাৎ হালকা গলায় বলে—তোমরা মিস্টার অ্যান্ড মিসেস এবার একটা ফয়সালা করে নাও না।

—কীসের ফয়সালা?

—তুমি কি শুভদৃষ্টির সময়ে টেরছা করে চেয়েছিলে বাবার দিকে?

অন্য সময়ে মা হালকাভাবেই নেয় এসব কথা। এখন উদাস গলায় বলে—কে কাকে টেরছা চোখে চেয়েছে তা সেই জানে।

মা একটু চুপ করে ভাবে। তারপর বলে—আমি তো সবই করেছি। ঘরদোর আগলে, ছেলেমেয়ে মানুষ করে, কোনওটাতেই তো ফাঁক রাখিনি। এখনও আমিই আছি সংসারে। কিন্তু তাকে বাউন্ডুলে হতে হয়েছে। কর্মফল কার ফলল? সে যদি ভালমানুষই হবে, তবে কেন এই সংসারের ঘরে পা দিতে সাহস পায় না? কেন ছেলেরা মেয়েরা জামাইরা তাকে বিষচক্ষে দেখে?

সোমেন মাথা নেড়ে গম্ভীর হয়ে বলে—তোমার বড় গুমোর হয়েছে ননীবালা!

—গুমোর! কীসের গুমোর রে পাজি ছেলে?

—ছেলেমেয়েরা তোমাকে ভালবাসে, বাপকে বাসে না, তার গুমোর।

—গুমোর থাকলে আছে। মায়েদের তো ওই একটাই অহংকারের জায়গা। তাকে ভাল বলার জন্য বাইরের লোক আছে, আমাকে তো বাইরের লোকে জানে না, তোরা জানিস। আমিও তোদের জানি। সে বলুক তো বুকে হাত দিয়ে ছেলেমেয়েদের জন্য কী করেছে!

সোমেন সিগারেটটা পিষে নিবিয়ে মশারির মধ্যে ঢুকে গিয়ে বলে—বাদ দাও। রাত বারোটা বাজে।

মা তবু গুনগুন করতে থাকে—একদিনে তুই এমন কী চিনে এলি লোকটাকে! আমরা সারাজীবন জ্বলেপুড়ে গেলাম—

—আঃ। আলোটা নেবাও তো।

মা আলো নিবিয়ে দেয়, অন্ধকারেও কথা বলে—আমার বাচ্চারা জন্ম থেকে মাকে জানে, বাপ ছিল অতিথিসজ্জনের মতো। আজও তাই আছে। স্বার্থপর বারমুখো, পাগল একটা।

সোমেন ধমকায়, বকবক করো না তো। অনেক ধকল গেছে—

মা চুপ করে যায়। গলা এক পরদা নামিয়ে গুনগুন স্বরে বলে, আরজন্মে আর মেয়ে হয়ে জন্মাব ভেবেছিস? মেয়েজন্ম এবারই ঘুচিয়ে গেলাম। আর না। কী পাপ, কী পাপ!

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা একদম মৌনীবাবা হয়ে আছে। চিঠিপত্র কিছু আসছে না। দিন যায়, সোমেন ভাবে চাকরিটা বোধ হয় হল না। ওদের অফিসে গিয়ে খোঁজ নিতে ভয়-ভয় করে। ইদানীং যে কয়েকটা পরীক্ষা বা ইন্টারভিউ দিয়েছিল তার মধ্যে ব্যাঙ্ক অফ বরোদাই ছিল হট ফেবারিট। যদি না হয় তবে কী যে হবে।

অণিমার সঙ্গে ইউনিভার্সিটির লন-এ অনেক বসেছে সোমেন। মেয়েটা বড় বুদ্ধিমতী। অনেক মেয়ের সঙ্গে আড্ডা দিয়েও, অণিমার সঙ্গে আলাদা বসতে ভাল লাগত। চোখা চেহারা, ভারী চশমা চোখে। দাঁত চমৎকার। মুখটা একটু ভাঙা আর লম্বা বটে, কিন্তু ফরসা রঙে, আর প্রচুর পড়াশুনো করার ফলে একরকমের গাম্ভীর্য এসে গিয়েছিল বলে ওর চেহারাটা ভালই লাগে সকলের। সোমেনের ভাল লাগা কিছু বেশি ছিল। অণিমাও তাকে পছন্দ করেছে বরাবর।

সেবার বউদির সঙ্গে মার ঝগড়াটা খুব চরমে উঠেছিল। বরাবরই ছিল ঝগড়া। মার একটা বিচ্ছিরি স্বভাব আছে, সংসার থেকে জিনিস সরানো। তেমন কোনও কাজে লাগে না, তবু মা একটু চিনি কী আটা, নিজস্ব একটু বাসনপত্র, ছেঁড়া ন্যাকড়াই হল কখনও, যা পাবে সব সরিয়ে লুকিয়ে রাখে। তার ওপর আড়াই ঘরের ফ্ল্যাট বাড়ির যে ঘরখানায় মা আর সোমেন থাকে, সেটা প্রায় সময়েই তালাবন্ধ করে রাখে মা। এই স্বার্থপরতা বউদি প্রথম থেকেই সহ্য করতে পারত না। প্রায় সময়েই বলত—ছেলেমেয়েগুলো জায়গা-বাসা পায় না, এমনিতেই জায়গা কম, তার ওপর আবার একখানা ঘর তালাবন্ধ। মা আবার সে কথার জবাব দিত—আমি বাপু নিজের হাতে ঘর পরিষ্কার করি, ছেলেপুলে নোংরা করলে, তোমরা তো সব পটের বিবি, মুখ ফিরিয়ে থাকবে। সারাদিন খেটেখুটে রাতে একটু পরিষ্কার বিছানা পাব না, তা হবে না।

এইভাবেই ক্রমে ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে দুই যুযুৎসব তৈরি হচ্ছিল। কারণটা কিছুই না, তবু ওই ঘরখানার অধিকারবোধ নিয়ে দুপক্ষের লড়াই। এই ঝগড়ায় বরাবর দাদা এসে মিটমাট করেছে, সোমেন বাড়ি ফিরে মাকে ধমকেছে। আবার পরদিন সব ঠিকও হয়ে গেছে।

কিন্তু সেবার ঝগড়াটা এতই চরমে উঠল যে, মা একটা বাটি ছুঁড়ে মেরেছিল বউদিকে। বউদির বদলে সেটা তার কোলের বাচ্চার হাঁটুতে লাগে। বউদি বাচ্চা ফেলে তেড়ে এসেছিল মাকে মারতে। ঝি আটকায়।

দাদা সেই প্রথম ঝগড়ার মিটমাট করার চেষ্টা করল না। অফিস থেকে ফিরে আসার পর বউদি পাশের ঘরে দাদার কাছে চেঁচিয়ে কেঁদে মার নামে নালিশ করল। অনেক রাত পর্যন্ত অশান্তি। অন্য ঘরে মা তখন ভয় পেয়ে কাঁদছে। সোমেন মাকে ধমকায়নি পর্যন্ত সেদিন। চুপ করে নিজের বিছানায় শুয়েছিল। সেই রাতে বউদি বা মার কারও ওপর তেমন নয়, কিন্তু দাদার ওপর কেমন একটু অবিশ্বাস এসেছিল তার। ছেলেবেলা থেকে যেমন সে দেখে এসেছে, মা-অন্ত প্রাণ দাদাকে, সেই দাদা যেন বা আর নেই। দাদার বিয়ের আগে পর্যন্ত তারা কত সুখী ছিল, এই কথা আলাদা থাকবে। সে রাতে সে মার পক্ষই যে সমর্থন করেছিল তা নয়। সে কেবল ভেবেছিল সংসারটার শান্তি বাঁচাতে ননীবালাকে আলাদা করা দরকার। দাদার রোজগারে যখন সংসার চলে

তখন বউদির প্রাপ্য সম্মান তাকে দিতেই হবে। মা পুত্রঅন্ধ, অধিকারবোধ প্রবল, মা জানে রণেন তারই আছে সবটুকু।

কাউকে কিছু না জানিয়ে সে ইউনিভার্সিটি যাওয়া বন্ধ করে পড়াশুনো আস্তে আস্তে ছেড়ে দেয়। পড়াশুনোর ক্ষতি হয় বলে দাদা তাকে টিউশনি করতে দেয়নি কখনও। ক্রমে সে টিউশনিও খুঁজতে থাকে।

সে সময়ে অণিমার সঙ্গে দেখা একদিন। চাকরির অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ক্যারেকটার সার্টিফিকেট আনতে গিয়েছিল ইউনিভার্সিটিতে, দেখে অণিমা একা জলের ধারে ঘাসে বসে আছে রোদ্দুরে। কোলে খোলা বই। ওকে একা দেখে একটু কষ্ট হল সোমেনের। পাশে তার থাকার কথা এ-সময়ে। কত কথা হত তাদের। চুপ করে থাকাটাও একরকমের পূর্ণই ছিল। সেটা ভালবাসা নয়, বোধ হয় বন্ধুত্বই হবে।

তাকে দেখে চমকাল না অণিমা। আন্তরিক মুখখানা তুলে বলল—ভাবছিলাম, তোমার খোঁজ নিতে যাব। অসুখ-বিসুখ করেছিল?

—না। পড়া ছেড়ে দিচ্ছি।

অনিমা মৃদু হেসে বলে—ছেড়ে দেওয়াই উচিত। একে কি পড়াশুনো বলে!

—আমি ছাড়ছি পেটের ধান্ধায়।

—তাই নাকি? চাকরি পেয়েছ?

—কোথায় চাকরি! টিউশনিই পাচ্ছি না সুবিধা মতো।

অণিমা আন্তরিক উদ্বেগের সঙ্গে বলে—তোমার খুব দরকার টিউশনির?

—খুব।

—এতদিন কী করে চালাচ্ছিলে?

—দাদা দিত। দিত কেন, এখনও দেয়। আমার নিতে ইচ্ছে করে না। এম-এ পাশের কোনও ভবিষ্যৎ নেই, খামোখা খরচা। ছমাস মাইনে দিইনি।

অণিমা অকপটে জিজ্ঞেস করল—তোমার কেউ বার্ডেন নেই তো?

—না, কেন?

—ভাবছিলাম, একশো টাকার একটা টিউশনি হলে তোমার চলে কি না।

—তোমার হাতে আছে?

—আছে। যদি প্রেস্টিজে না লাগে করতে পারো।

—প্রেস্টিজের কী ব্যাপার টিউশনিতে?

—আমার ভাইকে পড়াবে?

অণিমার ভাইকে কেন পড়াতে পারবে না, তার কোনও যুক্তিসিদ্ধ কারণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। অণিমা তো বন্ধু, একই ক্লাসে পড়ে। ওর ভাইকে পড়ালে বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর সাম্যভাবটা নষ্ট হয়ে যাবে—শুধু এইটুকু খারাপ লেগেছিল সোমেনের। কিন্তু অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে হেসে সে বলল—পড়াব না কেন?

অণিমা নিশ্চিন্ত হয়ে বলে—তাহলে কাল থেকেই যেয়ো। ভাইটা সেন্ট লরেন্স-এ পড়ে। ক্লাস সিক্স। ইংরেজিতে বড্ড কাঁচা, ক্লাস ফলো করতে পারে না। স্কুল থেকে চিঠি দিয়েছে, পরের পরীক্ষায় ইংরেজিতে ভাল ফল না করলে নীচের ক্লাসে নামিয়ে দেবে। আমরা তাই একজন ভাল টিউটর খুঁজছি।

—আমি রাজি।

সেই থেকে সোমেন পড়ায় অণিমার ভাইকে। কিন্তু আশ্চর্য, এক'মাসের মধ্যে একদিনও ওদের বাড়িতে অণিমার সঙ্গে দেখা হয়নি। বোধ হয় লজ্জায় অণিমাই সামনে আসে না। সোমেনকে ওরা মাইনে দিয়ে রেখেছে, এটা বোধ হয় অণিমার কাছে সাধারণ ব্যাপার নয়। সোমেনও খোঁজ করে না। যতদিন টিউশনি না করত ততদিন সহজে দেখা হত বরং। এখন অণিমার বাড়িতে রোজ আসে বলে অণিমা রবিঠাকুরের সেই সোনার হরিণ হয়ে গেল বুঝি! পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়।

কিন্তু টিউশনি করে কিছু লাভ হয়নি। মাকে নিয়ে আলাদা বাসা করার সাময়িক চিন্তা সে ছেড়েও দিয়েছে। সংসারের সবটাই তো কেবল কুরুক্ষেত্র নয়, সেখানে আছে একটা অদৃশ্য নিউক্লিয়াস, অণু-পরমাণু সব মানুষ কেন্দ্রাভিগ আকর্ষণে একটা টানক্ষেত্র তৈরি করে নেয়। তাই সংসারের প্রতিদিনকার ভাঙচুরগুলো অলক্ষ্যে এক সারাইকর এসে কিছু কিছু মেরামত করে দিয়ে যায়, ঠুকে ঠুকে যেন বা বাসনপত্রের টোল-পড়া জায়গা তুলে দিয়ে যায়, জোড়া দেয় ফাটা-ভাঙা বাসন। সবটা মেরামত হয় না অবশ্য। নিখুঁতভাবে জোড়া লাগে না। তবুও অদৃশ্য নিউক্লিয়াস টানক্ষেত্রের ধর্ম রক্ষা করে চলে। তাই আবার মা আর বউদি ভাগাভাগি করে সংসারের কাজ করে এখনও। এ ছেলে রাখে তো ও রান্না করে। সোমেন তাই আর আলাদা বাসা করার কথা ভাবে না। কেবল বাবার কথা ভাবলেই সংসারের টানক্ষেত্রটার দুর্বলতা ধরা পড়ে। বাবা যে সত্যিই টানক্ষেত্রটা ছেড়ে গেছে তাও মনে হয় না আবার। সেই কথাটা বিঁধে থাকে সোমেনের মনে—ভগবান, উহারা যেন সুখে থাকে।

টিউশনিটা তাই আর ভাল লাগে না সোমেনের। খামোখা। চাকরিটা পেলে বরং হয়। টিউশনিটা ছাড়লে অণিমাও সহজভাবে কথা বলতে পারে আবার। বড্ড আবেগপ্রবণ মেয়ে। আবার মাসের প্রথমে একশোটা টাকা পাওয়ার অভ্যাসই বা কেমন করে ছাড়ে সোমেন?

সন্ধ্যাবেলা সোমেন গাব্বুকে পড়িয়ে বেরোচ্ছে, হঠাৎ দেখে, অন্যমনে মাথা নিচু করে অণিমা অন্য দরজা দিয়ে বাসা থেকে বেরোচ্ছে। তেমনই আছে অণিমা। ভারী চশমার আড়ালে চোখ, পরনে ছাপা শাড়ি, গায়ে স্টোল, হাতে ব্যাগ, পায়ে চপ্পল। মুখে কোনও প্রসাধন কখনও মাখে না, চুল রুক্ষ।

—এই যে বস, কী খবর?

অণিমা চমকাল না। অণিমা কখনও চমকায় না। অণিমা কখনও চমকাবে না। আচমকা বোমা পড়লেও না। ওর ওই স্বভাব। গম্ভীর মুখখানা তুলে চমৎকার মুখে হাসল—কী খবর! ছাত্র কীরকম পড়ছে?

—ভালই। টার্মের ইনক্রিমেন্ট দেবে নাকি?

—ইনক্রিমেন্ট? ভারি অপ্রতিভ গলায় বলে অণিমা।

তেমনি ঠাট্টার স্বরে সোমেন বলে—ইনক্রিমেন্ট না দিলে ঘেরাও করব।

—একা কি কাউকে ঘেরাও করা যায়?

চোখ নাচিয়ে সোমেন বলে—যায় না?

—কীভাবে শুনি?

সোমেন শব্দহীন হাসি হেসে বলে—যায়। একজনের দুটো হাতে একদিন ঠিকই ঘেরাও হবে তুমি। জানো না?

অণিমা মাথা নেড়ে বলে—না তো! কে সে?

—ধরো, যদি বলি....

॥ ছয় ॥

অণিমা মুখ তুলে হাসে। হাসিটা দুষ্টুমিতে ভরা। অণিমা বলল—থাক, বোলো না।

—বলব না? সোমেন বিস্ময়ের ভান করে—তা হলে কথাটা কি টের পেয়ে গেছ?

—না তো! তবে শুনতে চাইছি না।

সোমেন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—গরিব হওয়ার ওই একটা দোষ। বড়লোকের মেয়েরা পাত্তা দিতে চায় না।

—অ্যাই! তোমাকে আমি পাত্তা দিইনি?

—দিয়েছ? তা হলে শোনোই না কথাটা। ধরো, যদি বলি—

—আঃ। চুপ করো।

—চুপ করব? যদি তোমাদের বাড়ি থেকে ফেরার পথে আজ আমার একটা অ্যাকসিডেন্ট হয় তা হলে কিন্তু কথাটা না বলাই থেকে যাবে। সারাজীবন তুমি ভাববে, সোমেন কী একটা বলতে চেয়েছিল—

বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে আবার হেসে ফেলে অণিমা। বলে—গরিবের ছেলের অনেক দোষ। তার মধ্যে মৃত্যু নিয়ে রোমান্টিসিজম একটা।

অণিমাদের বাগানে চমৎকার ফুল ফুটেছে। বারান্দার ফ্লুরোসেন্ট আলোতে অজস্র ভৌতিক ফুল দেখা যাচ্ছে। আসল রং বোঝা যায় না রাতে, কেমন আলোর তৈরি ফুল সব আধো-অন্ধকার বাগানে নিস্তব্ধ হয়ে ফুটে আছে। সোমেন চলে যাবে বলে বারান্দার দুধাপ সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। বলল—চলি। বলা হল না কিন্তু।

—না হোক। শোনো, কোথায় যাচ্ছ?

—গড়িয়াহাটা।

—হাতে কোনও কাজ নেই তো!

—কী কাজ থাকবে? সারাদিন নৈকষ্যি বেকার। গড়িয়াহাটায় বুকস্টলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু লিটল ম্যাগাজিন দেখব, তারপর বাসায় ফিরব।

অণিমার বাইরে যাবার সাজ। সোমেনের পিছু পিছু নেমে আসতে আসতে বলল—একটা জায়গায় আমার সঙ্গে যাবে?

সোমেন দাঁড়ায়। হেসে বলে—যেতে পারি, যদি কথাটা শোনো—

অণিমা মাথা ঝাঁকিয়ে বলে—কথাটা আর একদিন বললে হয় না! যেদিন বেশ চাঁদটাঁদ উঠবে, ফুল-টুল ফুটবে, দূরে কোথাও যাব আমরা। সেদিন বোলো বাপু!

—সময় কিন্তু বয়ে যাচ্ছে।

—যাকগে। এখন আমাকে পৌঁছে দাও। একা একা ট্যাক্সি চড়তে ভয় করে।

—তাই বলো! নইলে কি আর আমাকে সঙ্গে নিতে!

অণিমা কথা বলে না। ভ্রূকুটি করে।

প্রশস্ত পথটি ধরে ওরা বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের দিকে আস্তে আস্তে হাঁটে। সোমেন সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলে—অত রাতে কোথায় যাচ্ছ একা?

অণিমা বলে—একা তো যাচ্ছি না।

—আমাকে না পেলে তো যেতে।

অণিমা হেসে বলে—তাই যদি যাব তবে গাব্বুর পড়ার ঘরের পাশের ঘরটায় বসে ঘণ্টাখানেক মশা তাড়ালাম কেন? বুঝলে মশাই, ঠিক তক্কে তক্কে ছিলাম কখন তোমার পড়ানো শেষ হবে।

সোমেন বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বলে—তাই বুঝি! তবে কী কথাটা তুমিই বলতে চাও অণিমা। তাই অপেক্ষা করেছিলে ট্যাক্সিতে যেতে যেতে বলবে? নাকি কোথাও দুরের কোনও মাঠে পৌঁছে গিয়ে বলবে।

অণিমা ভয় পাওয়ার ভান করে বলে—না, না, আজ নয়। আজ অন্য জায়গায় যাচ্ছি।

সোমেন ম্লান মুখে হাঁটতে হাঁটতে বলে—কলকাতার কত লোকের কত জায়গা আছে যাওয়ার!

—তোমার নেই বুঝি?

সোমেন মাথা নাড়ে। আস্তে আস্তে আপন মনে বলে—ধরো, পার্ক স্ট্রিটের হোটেলে নাচ-গান হুল্লোড় হয়, বড় রেস্টুরেন্টে হয় বিউটি কন্টেস্ট, কেনেল ক্লাবে ডগ শশা, সাউথ ক্লাবে টেনিস, গোপন আড্ডায় নেশাভাঙ। সব জায়গায় যেতে ইচ্ছে করে। একটা শ্বাস ফেলে বলে—এমন গঙ্গার ঘাটেও যাই না, জাহাজ দেখলে মন খারাপ হয়ে যায়। কোনওদিন বিদেশে যাব না, এই সত্যি কথাটা বড্ড মনে পড়ে।

—আচ্ছা ছিঁচকাঁদুনে ছেলে রে বাবা! আর কী কী ইচ্ছে করে তোমার, একটা লিস্ট করে দিও তো! খেয়াল রাখব।

—এই তো ইচ্ছে করছে একটা কথা বলি। ধরো, যদি বলি....

দু'হাতে কান চাপা দিয়ে অণিমা হেসে ওঠে—ওটা থাক।

—থাকবে?

—বললেই তো ফুরিয়ে গেল। থাক না।

—সময় চলে যাচ্ছে।

—যাকগে। তুমি ট্যাক্সি ধরো তো। এই রাস্তায় ট্যাক্সি বড় কম।

সন্ধে সাতটাও বাজেনি। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড এর মধ্যেই জনহীন, পরিত্যক্ত। হুড়হুড় করে কেবল কয়েকটা গাড়ি ওয়াশ-এর ছবির মতো মিলিয়ে যাচ্ছে।

সোমেন রাস্তার দু'ধার দেখে হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে বলে—প্রাইভেট টিউটর হওয়ার কি গেরো রে বাবা।

—কী হল?

—চাকরি বজায় রাখতে কত ওভার-টাইম খাটতে হচ্ছে।

—ইস! কী যে অসহ্য হয়ে যাচ্ছ না দিনকে দিন!

—সেই জন্যই তো বলছিলাম, আরও অসহ্য হয়ে ওঠার আগেই কথাটা বলে ফেলার একটা চান্স দাও। এমন ফাঁকা রাস্তা, নিঝুম শীতের রাত, লোড শেডিং থাকলে চাঁদও দেখা যেত ঠিক। ধরো, যদি বলি...

—ওই যে ট্যাক্সি সোমেন। ধরো, দৌড়ে যাও...

সোমেন দৌড়োল, এবং চটির একটা স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে ট্যাক্সিটা ধরতে পারল। অবশ্য আর কেউ ট্যাক্সি ধরার জন্য ওত পেতে ছিল না। যতদূর দেখা যায় রাস্তাটা অতিশয় নির্জন।

ট্যাক্সিতে সোমেন একটা সিগারেট ধরাল। হাঁফাচ্ছিল একটু। দুঃখিত স্বরে বলে—সব মুচি ঘরে আসে, সব চটি ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন—

—কী বলে রে পাগলা? অণিমার হাসি চলকায়।

—রাস্তায় এত রাতে মুচি নেই একটাও। তোমার ট্যাক্সি ধরতে গিয়ে চটিটা ছিঁড়েছে মাইরি।

অণিমা শ্বাস ফলে বলে—কী যে কাণ্ড করো না!

—তুমি দৌড়োতে বললে যে! না দৌড়োলে যদি চাকরিটা খাও?

—ইচ্ছে করেই তো বললাম, নইলে তুমি বোকার মতো কথাটা বলে ফেলতে যে!

সোমেন সবিস্ময়ে বলে—কোন কথাটা?

—যেটা বলতে চাইছিলে!

—কী বলতে চাইছিলাম বলো তো!

—ওই যে! ধরো, যদি বলি—

সোমেন বিরসমুখে বলে—থাকগে। বোলো না।

—বলব না?

—অন্য দিন বোলো। সোমেন সিগারেটে টান দিয়ে বলে—যেদিন ফুলটুল ফুটবে, চাঁদ-টাঁদ উঠবে, লোড শেডিং থাকবে, দূরে কোথাও গিয়ে—

দুজনেই হেসে গড়ায়। পাঞ্জাবি ট্যাক্সিওয়ালা ঘাড় না ঘুরিয়েই একটা অস্ফুট শব্দে রাস্তা জানতে চায়। অণিমা হাসি না থামিয়েই বলে—সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ।

অণিমা তার খোঁপা ঠিকঠাক করল, গা ঢাকা দিল, গাড়ির কাচটা তুলে দিল ভাল করে। বলল—শোন, কথাটা একজন বলে ফেলেছে।

—কোন কথা? সোমেন উদাসভাবে জিজ্ঞেস করে।

—সেই কথাটা।

—ও। সোমেন তেমনি নিরাসক্ত। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড পেরিয়ে লোয়ার সার্কুলার রোড ধরে ছুটছে গাড়ি। ডাইনে মোড় নিল একটা। কী চমৎকার সব মস্ত মস্ত ফ্ল্যাটবাড়ি, নিঝুম, অ্যারিস্টোক্র্যাট আর নরম সব আলোর রঙে রঙিন। মুগ্ধ হয়ে দেখে সোমেন।

—সত্যি বলছি। অণিমা বলল।

—কে বলেছে কথাটা।

—ম্যাক্স।

সোমেন একটু অবাক হয়ে বলে—কে বললে?

—ম্যাক্স।

—সে কে?

—একজন অস্ট্রেলিয়ান সাহেব।

—তাকে কোথায় পেলে?

—পেয়ে গেলাম। একটা সেমিনারে আলাপ। সেখান থেকেই পিছু নেয় কলকাতার গলিঘুঁজি দেখবে, বাঙাল রান্না খাবে, সেতার আর তবলা শিখবে। কিছুতেই ছাড়ে না। তাই তার গাইড হয়ে সঙ্গে নিয়ে কিছুদিন ঘুরলাম, নেমন্তন্ন করে খাওয়ালাম, গানের ইস্কুলে নিয়ে গেলাম। সেই থেকে কী যে হয়ে গেল ওর!

সোমেন চোখ মিট মিট করে ট্যাক্সির মধ্যেকার অন্ধকারে আবছা অণিমার মুখের দিকে চায়—বলেছে?

—তোমার গা ছুঁয়ে বলছি। তিন-চারদিন আগে ওর সঙ্গে তারাপীঠ গিয়েছিলাম। মস্ত শ্মশান সেখানে, গাঁজার আড্ডা। ম্যাক্স গাঁজা খেতে গেল, আমি শ্যামলের সঙ্গে এধার-ওধার ঘুরে দেখছিলাম। ম্যাক্স ঘণ্টাখানেক গাঁজা-টাঁজা টেনে এসে সোজা আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল—

কথাটা শেষ না করে ট্যাক্সির ভিতরকার অন্ধকারে অণিমা ভারী রহস্যময়ী হয়ে বসে থাকে।

সোমেন বিরসমুখে বলে—তারাপীঠ জায়গাটাই খারাপ। আর কখনও যেও না—

অণিমা মুখ ফিরিয়ে নিবিষ্টমনে বাইরের দিকে চেয়ে ছিল। স্তিমিত গলায় বলল—কলকাতায় কত সুন্দর সুন্দর বাড়ি অণিমা। আমাদের যদি একটা বাড়ি হয়, আর ব্যাঙ্ক অফ বরোদার চাকরিটা তা হলে একদিন চলো তোমার সঙ্গে তারাপীঠে যাই।

—ওমা! কেন?

—তারাপীঠে না গেলে তুমি শুনবে না কথাটা!

—কোন কথা?

—সেই যে। ধরো, যদি বলি—

—বোলো না, বোলো না—

বলতে বলতে অণিমা হাসতে থাকে। সোমেন তেমনি স্তিমিত গলায় বলে—কতদিন ধরে বলতে চেষ্টা করছি। একবার তারাপীঠে না গেলে—

চিনে রেস্টুরেন্টটার দিনকাল শেষ হয়ে গেছে। তবু বহুকালের পুরনো নিয়মমাফিক আজও একজন আধবুড়ো অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাঞ্জো বা ওই জাতীয় কোনও একটা তারের যন্ত্র বাজায় মিনমিন করে। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের দ্রুতগামী অটোমোবিলের শব্দে কিছু শোনা যায় না। লোকটা তবু প্রাণপণে বাজায়।

বাঁ ধারে শেষ কেবিনটায় ঢুকে সোমেন অবাক হয়। ইউনিভার্সিটি ছাড়ার পর যাদের কোনওদিনই আর দেখবে না বলে ভেবেছিল তাদের কয়েকজন বসে আছে। একধারে অপালা আর পূর্বা। অন্যধারে অধ্যাপক অনিল রায়, শ্যামল আর একজন নীলচোখো, সোনালি চুলো, গোঁফদাড়িওলা অল্প বয়সি সাহেব। তার পরনে খদ্দরের গেরুয়া পাঞ্জাবি, তার ওপর কালো জহর কোট। সাহেব কী বলছিল, অপালা আর পূর্বা তার ইংরেজি কিছুমাত্র না বুঝে হেসে কুটিপাটি।

মুখ তুলেই পূর্বা লাফিয়ে ওঠে—সোমেন! কী রোগা হয়ে গেছিস! রোজ তোর কথা ভাবি। মাইরি!

—আমিও। সোমেন নিরুত্তাপ গলায় বলে।

অপালা বড় বড় চোখ করে চেয়েই হেসে ফেলে—সোমেন, তুই বেশ মোটা-সোটা হয়েছিস তো!

—তুইও।

ওরা সরে বসে জায়গা করে দেয়। অণিমা আর সোমেন বসে। বসেই টের পায়, উলটোদিকে তিন-তিনটে আধো মাতাল চেয়ে আছে।

অধ্যাপক অনিল রায় বলেন—আগন্তুকটি কে অণিমা?

—সোমেন স্যার।

—আমারও তাই মনে হচ্ছিল। মুখটা চেনা-চেনা।

শ্যামল সাহেবের কাঁধের ওপর থেকে হাতটা সরিয়ে সোজা হয়ে বলে—সোমেন, তোর সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। রিগার্ডিং—

বলে ভুলে যায়। হাতটা অসহায়ের মতো উলটে দিয়ে বলে—যাকগে।

সাহেব প্রোটোকলের তোয়াক্কা না করে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে—ম্যাক্স।

সোমেন হাতখানা ধরে নিয়ে বলে—সোমেন।

হাতটা নরম, একটু ঘেমো। আটলান্টিক নীল চোখ দুটোয় কিছু ভিতু ভাব, খরগোশের মতো, হাসিটি লাজুক। পেটরোগা বাঙালির মতোই চেহারা, কেবল রং-টা ফরসা। সোমেন হাতটা ছেড়ে দিল এবং সাবধানে নিজের হাতের চেটো প্যান্টে মুছে ফেলল।

পূর্বা ফিসফিস করে বলে—যা ভয় করছিল, তখন থেকে তিনটে মাতাল নিয়ে বসে আছি। তোরা কেন দেরি করলি?

সোমেন টের পায় তার পাঁজরে কনুইয়ের খোঁচা দিয়ে অণিমা কী একটা ইঙ্গিত করল। পরমুহূর্তেই অণিমা গলা নামিয়ে পূর্বাকে বলে—দেরি হবে না! বিকেলের মধ্যেই সাক্ষী সাবুদ জোগাড় করে রেজিস্ট্রারের কাছে যেতেই তো বেলা হয়ে গেল। সইটই করে এই দুজনে আসছি।

পূর্বা ভীষণ অবাক হলে বলে—কী বলছিস যা তা!

—মাইরি।

—সোমেনকে?

—আর কাকে?

—কী বলছে রে? বলে অপালা তার লাইমজুসের গেলাস সরিয়ে রেখে রেখে মুখ এগিয়ে আনে।

পূর্বা অসহায়ের মতো বলে—ওরা রেজিস্ট্রি করে এল, জানিস! কি বদমাশ বলত?

—কে? কারা? ভারী অবাক হয় অপালা।

—অণিমা আর সোমেন।

—মাইরি? অপালার বড় চোখ বিশালতর হয়।

পূর্বা কাঁদোকাঁদো মুখে বলে—এ মা! শেষ পর্যন্ত সোমেনকে?

অণিমা ভারী চশমায় বেশ গম্ভীর মন-খারাপ গলায় বলে—সেই কবে থেকে জ্বালাচ্ছে। বিয়ে করো, বিয়ে করো, ধৈর্য থাকে? আজ তাই ঝামেলা মিটিয়ে দিলাম।

অপালা বড় বড় চোখ করে, নিশ্বাস চেপে শুনেটুনে হঠাৎ বলে—গুল!! ওদের দেখে মোটেই বোঝা যাচ্ছে না বিয়ে করেছে।

এই নাটকটায় নিজের ভূমিকা বুঝতে একটু সময় নিয়েছিল সোমেন। এবার হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে মুখ নিচু করে অপালার দিকে চেয়ে বলে—তোমার বুঝে কাজ নেই সোনা। তুমি তো পুতুল! পুতুলের সব বুঝতে নেই।

—মারব এক থাপ্পড়।

অনিল রায় হঠাৎ ওপাশ থেকে বললেন—কী হয়েছে মেয়েরা? রাগারাগি কীসের?

পূর্বা তেমনি কাঁদো-কাঁদো গলায় বলে—দেখুন স্যার, ওরা দুজন বিয়ে করে এল।

—কারা?

—সোমেন আর অণিমা।

—অ্যাঁ! আমি যেন অন্যরকম শুনেছিলাম! দাঁড়াও, দাঁড়াও, খুব মাতাল হয়ে গেলাম নাকি!

অপালা গলা তুলে বলে—মোটেই বিয়ে করেনি স্যার। সোমেনকে দেখুন, তিনদিন দাড়ি কামায়নি, চোর-চোর চেহারা, ময়লা জামাকাপড়, ও মোটেই বিয়ে করেনি অণিমাকে।

অনিল রায় হাত তুলে অপালাকে থামান, গম্ভীর গলায় বলেন—ইজ ইট ফ্যাক্ট অণিমা? তোমার মুখ থেকে শুনি।

অণিমা ভীষণ লাজুক মুখভাব করে সোমেনের দিকে তাকায়—লক্ষ্মীটি, স্যারকে বলে দাও না।

সোমেন তার খোঁচা খোঁচা দাড়ি চুলকে মাথাটাথা নিচু করে বলে—তুমিই বলো।

একদিন পূর্বার সঙ্গে উজ্জ্বলায় ম্যাটিনিতে সিনেমা দেখে ফিরছিল সোমেন। কালীঘাট স্টপে ভিড়ের পাঁচ নম্বরে উঠতে গিয়ে সোমেন উঠল, পূর্ব উঠতে পারেনি। পূর্বার হাতব্যাগের ভিতরে ছোট্ট পয়সা রাখার ব্যাগে পাঁচটা টাকা ছিল, বাসের পাদানিতে সাফ হাতের কেউ সেটা তুলে নিয়েছিল। বাস ছেড়ে দিলে ভিতর থেকে সোমেন শুনেছিল, পূর্বা সর্বনাশের গলায় চেঁচাচ্ছে—সোমেন! সোমেন! ব্যাপারটা কিছুই না, পরের বাসে পূর্বা আসতে পারত, পয়সা না থাকলেও অসুবিধে ছিল না, কন্ডাকটরকে বললেই হত। কিন্তু পূর্বা ঘাবড়ে-টাবড়ে, দুঃখে কান্নাকাটি শুরু করে, বাসস্টপে কয়েকজন লোকও জুটে গিয়েছিল ওর চারপাশে। সোমেন রাসবিহারী বাসস্টপে নেমে ফিরে এসে পূর্বাকে ঘিরে ভিড়, ঘুনধুন করে কঁদছে পূর্বা, বলছে—আমার বন্ধু চলে গেছে, কী যে হবে! এমা! আমার টাকাও নেই, তুলে নিয়েছে। কী বিচ্ছিরি। বুড়ো একটা লোক ওকে একটা টাকা অফার করতেই পূর্বা ঝেঁঝে ওঠে—আমি কারও কাছে টাকা নেব না। তারপরেই আবার ঠোঁট কাঁপিয়ে চোখভরা জল রুমালে মুছে দিশাহারাভাবে বলতে থাকে—কী যে সব বিচ্ছিরি কাণ্ড না! যা তা! সোমেন যখন ভিড় ঠেলে গিয়ে ওর হাতটা ধরল তখন পূর্বার মুখে-চোখে সে কী আনন্দের রক্তিমাভা, যেন বাচ্চা মেয়ে মেলার ভিড়ে বাবাকে হারিয়ে ফেলেছিল, এইমাত্র ফিরে পেল।

এই হচ্ছে পূর্বা। যেখানে দুশ্চিন্তার কিছু নেই, সেখানেও ওর দুশ্চিন্তা। যেখানে কাঁদবার মতো কিছু ঘটেনি সেখানেও ও কেঁদে ফেলে। আড়চোখে সোমেন দেখে পূর্বার মুখ লাল, ঠোঁট কাঁপছে, চোখের পাতা ফেলছে ঘনঘন এক্ষুনি কেঁদে ফেলবে। সোমেন ভারী ভয় পেয়ে যায়। পূর্বা ঘনঘন শ্বাস ফেলে বলে—স্যার, বন্ধুকে

কেউ বিয়ে করে? সেটা ট্রেচারি নয়। বলেই সোমেনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে—লজ্জা করে না। কী বিচ্ছিরি সব কাণ্ড করিস না!

সোমেন অবাক হয়ে বলে—কেন, আমি পাত্র খারাপ?

পূর্বা তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে বলে—সে কথা বলছি নাকি! কিন্তু অণিমা তোকে বর বলে ভাববে কী করে! তুই-ই বা কী করে ভাববি যে—ইস ভাবতেই গা কেমন করে!

অনিল রায় ভারী অবাক হয়ে পূর্বার কাণ্ডকারখানা দেখে বলেন—বন্ধুকে বিয়ে করতে নেই? কেন বলো তো!

—সোমেনকে কখনও স্বামী বলে ভাবতে পারবে অণিমা?

—কেন পারবে না?

—আপনি বুঝতে পারছেন না স্যার। স্বামী মানে তো বড় বড় মানুষ, যাকে শ্রদ্ধাভক্তি করতে হয়। সোমেনটা তো সমবয়সি, কেবল ইয়ারকি করে বেড়ায়, ও স্বামী হবে কী করে?

অনিল রায় তাঁর ছাত্রজীবনে মস্ত আধুনিক মানুষ ছিলেন। শোনা যায় প্রেসিডেন্সিতে পড়ার সময়ে রংদার চকরা-বকরা জামা, ষাঁড় ক্ষ্যাপানো উৎকট রঙের প্যান্ট পরতেন, হিপ পকেটে থাকত মাউথ-অর্গান, করিডোরে মাউথ-অর্গান বাজিয়ে বিলেতি নাচ নাচতেন। অধ্যাপকরা চটে গিয়েছিলেন। তবু বি-এ আর এম-এ-তে ফাস্ট হতে আটকায়নি। আমেরিকায় ডক্টরেট করেন। এখনও এই উত্তর চল্লিশে প্রায় একই রকম আছেন অনিল রায়। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে এখনও লনে বসে আড্ডা দেন। সিগারেট বিলোন। গায়ে কাউবয় রঙিন শার্ট, বড় জুলপি, ফাঁপানো চুল, নিম্নাঙ্গে নিশ্চিত বেলবটমও আছে, টেবিলে পা ঢাকা রয়েছে বলে বোঝা যাচ্ছে না। একটা শ্বাস ফেলে বললেন—আমাদের আমলে ক্লাসমেটকে বিয়ে করাটাই ফ্যাশন ছিল। ইন ফ্যাক্ট আমিও ইনভলভড ছিলাম। তোমাদের আমলটা কি খুব বেশি পালটে গেছে?

—না স্যার, মোটেই পালটায়নি। সোমেন হেসে ওঠে—পালটালে আমি আর অণিমা কেমন করে করলাম?

—করেছিস? অপালা হাত বাড়িয়ে বলে—দেখি সার্টিফিকেট।

—ওর হাতব্যাগে আছে। উদাস গলায় বলে সোমেন। তারপর সিগারেটের ধোঁয়ার আড়ালে আত্মগোপন করার চেষ্টা করে। আর তক্ষুনি দেখতে পায়, ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে উলটোদিকে একজোড়া নীল ফসফরাস জ্বলছে। ম্যাক্স। এতক্ষণ ম্যাক্সকে হিসেবের মধ্যেই ধরেনি সোমেন। ও কি সত্যিই প্রোপোজ করেছিল অণিমাকে! করে থাকলে অণিমার এ কী রকম ব্যবহার। লাজুক, ভিতু, পেটরোগা চেহারার কোনও সাহেব এর আগে দেখেনি সোমেন। ম্যাক্সকে দেখে তাই কষ্ট হয়। ওর মুখে, কপালে রগ দেখা্ যাচ্ছে! শুষ্ক নেশার চিহ্ন। গাল বসা, চুল রুখু। শুধু চোখ দুখানার নীল আগুন জ্বলছে। কিছু বুঝতে পারছে, কিন্তু আন্দাজ করছে। কেবিন ঘরটা হালকা কথায় খিলখিল করছে, বাতাসে ইয়ারকি, তবু সে সব ছাপিয়ে একটা টানাপোড়েনও কি নেই!

—অপালা অণিমার হাতব্যাগ কেড়ে নিয়ে হাঁটকে দেখে বলে—না স্যার, নেই।

অনিল রায় লম্বা চুলে আঙুল চালিয়ে উত্তেজিতভাবে বলেন—ইয়ারকি! ইয়ারকি! মাই গড, তোমরা মোটেই বিয়ে করোনি! এমন ইয়ারকি তোমরা কোথা থেকে শিখলে?

পূর্বা হঠাৎ ভীষণ হাসতে থাকে। সোমেনের দিকে চায়। ভারী আদুরে স্বরে বলে—তুই যা পাজি না সোমেন! এমন চমকে দিয়েছিলি!

অণিমা অসহায় মুখ করে বলে—ছিল স্যার, বোধ হয় ট্যাক্সিতে পড়ে-ফড়ে গেছে, ভাড়া দেওয়ার সময়—

—ফের? অপালা ধমক দেয়।

—অণিমা, তুই আমার জায়গায় বোস, সোমেনের সঙ্গে আমার কথা আছে। এই বলে পূর্বা জায়গা বদল করে নেয়।

বেয়ারা বিয়ারের জগ রেখে গিয়েছিল। সোমেন ফেনাটা ফুঁ দিয়ে চুমুক দিতে যাচ্ছে, পূর্বা কানের কাছে মুখ এনে বলল—বেশি খাস না সোমেন, পায়ে পড়ি।

—কেন?

—আমি তোর সঙ্গে ফিরব যে। গড়িয়ার দিকে যাওয়ার আর কেউ নেই। মাতালের সঙ্গে ফেরার চেয়ে একা ফেরা ভাল। খাস না।

—আচ্ছা। তোর কাছে টাকা আছে?

—গোটা চারেক। কেন?

—ট্যাক্সি নিস। চটিটা ছিঁড়ে গেছে, হাঁটতে পারছি না।

—গড়িয়া পর্যন্ত ট্যাক্সি! কত উঠবে জানিস? তা দিয়ে একজোড়া নতুন চটি হয়।

অপালা চাপা ধমক দিয়ে বলে—তোর সঙ্গে ফিরবে কেন? আজ বিয়ের দিন, সোমেন ওর বউয়ের সঙ্গে ফিরবে।

চিলি-চিকেন আর এক চামচ ফ্রায়েড রাইস মুখে তুলেছিল সোমেন। একটু বিষম খেল। বউ কথাটা তার ভিতরে হঠাৎ বিদ্যুতের মতো খেলে যায় অলক্ষ্যে ঝিকিয়ে ওঠে একটা আসাহী পেনট্যাক্স ক্যামেরার নিষ্প্রাণ চোখ। গর্‌র্ শব্দ করে জেগে ওঠে একটা অন্ধ কুকুর। হঠাৎ এতক্ষণ বাদে একটা নিরুদ্ধ লজ্জায় সোমেনের মুখ লাল হয়ে যায়।

॥ সাত ॥

বিকেলের দিকে হাওড়ায় এসে নামলেন ব্রজগোপাল। ক্যাম্বিসের ব্যাগে কিছু তরিতরকারি, একটু খেজুর গুড়, আমসত্ত্ব, কিছু গাছ-গাছড়া, ফকির সাহেবের দেওয়া বাতের ওষুধ। স্টেশনের চত্বরে নেমে ভারি বিশ্রী লাগছে তাঁর। কলকাতার বুকচাপা ভিড়, গরমি ভাব, গাড়িঘোড়া, যতবার আসেন ততবারই আরও বেশি খারাপ লাগে। খেই পান না, দিশাহারা লাগে। এই বিপজ্জনক শহরে এখনও কিছু নির্বোধ বাস করছে, প্রতিদিন কিছু নির্বোধ আসছে বাস করতে। মানুষের নিয়তিই টেনে আনছে তাদের। তাঁর ছেলেরা এই শহরে বাড়ি করবে। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন ব্রজগোপাল। সংসারে অনেকদিন হয় তিনি বাতিল মানুষ। তাঁর কথা বা মতামতের কোনও মূল্য আর ওদের কাছে পাওয়া যাবে না। তবু ছেলেদের মুখের কাছে বিষের বাটি ধরতেই তিনি এসেছেন। বাড়ির জন্য দশ হাজার টাকা দিয়ে দেবেন। একেবারে পর হয়ে যাওয়ার ক্ষণকাল আগে, মৃত্যুর আগমুহূর্তেও যেন ওরা অন্তত একবার তাঁর দিকে আকর্ষণ বোধ করে। পুত্র-ক্ষুধা বড় মারাত্মক। সন্তানের বড় মায়া।

বাসে একটা জানালার ধারের সিট পেয়েছিলেন ব্রজগোপাল। খর চোখে চেয়ে কলকাতার দৃশ্যাবলি দেখতে থাকেন। বড়বাজার, ব্রাবোর্ন রোড, ডালহৌসি হয়ে ময়দান। এইটুকু রাস্তা জুড়ে বাণিজ্য আর বাণিজ্য। মানুষের লোভ-লালসার শেষ নেই। ময়দান থেকে বাকি রাস্তাটা চোখ বুজে কেবল ভাবেন আর ভাবেন। স্ত্রী আজ কেমন ব্যবহার করবে কে জানে? বোধ হয় ভাল ব্যবহার কিছু আশা করা যায় না। তবে টাকার খাতির সর্বত্র। হয়তো বসিয়ে চা জলখাবার খাওয়াতেও পারে। ভেবে একটু হাসেন ব্রজগোপাল। কিশোর বয়সে বিয়ে হয়েছিল তাঁদের। নৌকোয় সে বহু দূরের রাস্তা। কত রোমাঞ্চ কত কল্পনা। আজও ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়। সেই কিশোর বয়স ফিরে পেতে ইচ্ছে করে। যদি পান ব্রজগোপাল, যদি এখনও কিশোর ব্রজগোপালকে কেউ জিজ্ঞেস করে, পৃথিবীর এত মেয়ের মধ্যে কাকে বউ করতে চাও, তবে ব্রজগোপাল এখনও অম্লানবদনে বলবেন—ননীবালা। ননীবালার প্রতি তাঁর ভালবাসার এখনও যেন শেষ নেই। মুখখানার দিকে এখন আর ভাল করে তাকানো হয় না বটে, কিন্তু তাকালে এখনও সেই কিশোরকালের প্রণয়ের চিহ্নগুলি দেখতে পান যেন। আধো-ঢাকা কপাল, পিছনে অন্ধকারের মতো চুলের রাশি, থুঁতনির খাঁজে ঘামের মুক্তাবিন্দু। স্ত্রী শব্দটাই কী মারাত্মক! এই শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অভ্যাস, আশ্রয়, বিশ্রাম, শান্তি। ব্রজগোপাল তা পাননি। তবু এখনও যদি তাঁকে কেউ প্রেমভিক্ষা করতে পাঠায়, তিনি এসে দাঁড়াবেন ননীবালার দরজায়। কেন দাঁড়াবেন তা কেউ জানে না। সংস্কার।

রাস্তা ফুরিয়ে যায়। শীতের বেলাশেষে যোধপুর পার্কের পিছনে সূর্যাস্ত ঘটছে। ঢাকুরিয়ার প্রকাণ্ড জলাভূমিটায় কত কচুরিপানা, ঠিক মাঠের মতো দেখাচ্ছে। যোধপুরের ফাঁকা জমিগুলো ভরতি হয়ে যাচ্ছে

ক্রমে। বাড়ি আর বাড়ি। পায়ের নীচে ভারবাহী কলকাতার নিঃশব্দ আর্তনাদ শোনেন ব্রজগোপাল। ওই জলাভূমিটাও ক্রমে গ্রাস করে নেবে মানুষের সর্বগ্রাসী বসত।

ঢাকুরিয়ার বাড়ির দোতলায় কুণ্ঠিত পায়ে উঠে এসে কড়া নাড়েন তিনি। খুবই সংকোচের সঙ্গে। যেন বা বেড়াতে এসেছেন, কর্তা বাড়ি নেই শুনলে ফিরে যাবেন। এ বাসার তিনি আর কেউ নন। যত রাতই হোক আজই তাঁকে ফিরে যেতে হবে।

রণেনের বউ দরজা খোলে। ভারি খর ঝগড়াটে চেহারা, তবু সুন্দরী। হাঁটু ধরে একটা ছেলে বায়না করছে। নাতি। সন্ধ্যা হয়েছে, তবু এখনও আলো জ্বালানো হয়নি বলে জায়গাটা অন্ধকার। রণেনের বউ দরজা খুলে বলে—কে?

ব্রজগোপাল গলা খাঁকারি দিয়ে বলেন—আমি ব্রজগোপাল।

বউটি ঘোমটা টানার প্রয়োজন বোধ করে না। বলে—ও।

সুইচ টিপে আলো জ্বালে।

ব্রজগোপাল ঘরে যাবেন কিনা স্থির করতে না পেরে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বলেন—রণেন বাড়ি নেই?

—না, এখনও ফেরেননি।

—আর কে আছে?

—মা আছেন। আপনি ঘরে আসুন।

—থাক, এইখান থেকেই বরং কথা বলে চলে যাই।

বউটি গলায় যথেষ্ট ধার তুলে বলে—আপনি রোজ রোজ দরজায় দাঁড়িয়ে কথা বলে যান, পাঁচজন তাতে কী ভাবে! ঘরে আসুন।

ছেলেটাকে কোলে নিয়ে ভিতরে সরে যায় বীণা। ব্রজগোপাল নিজের হৃৎস্পন্দন আকস্মাৎ টের পেতে থাকেন। বহুকাল বাদে ওদের ঘরদোরে ঢুকতে ইচ্ছে করে। ওরা কেমন যে আছে!

সামনের ঘরটা ঠিক ঘর নয়। একটুখানি প্যাসেজ। কলঘর রান্নাঘর আর শোওয়ার ঘরের দরজা চারদিকে। মাঝখানে বেতের চেয়ার আর টেবিল পেতে বসার ব্যবস্থা। তারই একধারে খাওয়া-দাওয়া হয়। বউটি ঘরের বাতি জ্বালল। আগে ষাট পাওয়ারের বালব জ্বলত, এখন ফ্লুরেসেন্ট বাতি। ঘরদোরের চেহারাও আগের মতো নেই। বেতের চেয়ারগুলো রং করা হয়েছে, তাতে ডানলোপিলোর কুশন পাতা। একটা ঝকঝকে নতুন সোফা-কাম-বেড। একধারে একটা মস্ত বড় রেডিয়োগ্রাম, তার ওপর ফুলদানি। দেয়ালে কাঠের চৌখুপিতে কেষ্টনগরের পুতুল, বাঁকুড়ার ঘোড়া, রান্নাঘরের খোলা দরজা দিয়ে একটা গ্যাস সিলিন্ডার দেখা যাচ্ছে। নিজের অবস্থাকে প্রাণপণে অতিক্রম করার চেষ্টা করছে এরা।

রণেন ঘুষটুষ খায় না তো এখন! ফুড ইনস্পেকটরের ঘুষের ক্ষেত্র অঢেল। ইচ্ছে করলেই রণেন অবস্থা ফিরিয়ে ফেলতে পারে। কিন্তু আকণ্ঠ সৎ মানুষ ব্রজগোপালের রক্তের ধাত খানিকটা আছে বলে রণেন এই সেদিনও ঘুষটুষ খেত না। এখন কি খায়? অবস্থার ফেরে পড়ে, বউ আর মায়ের গঞ্জনায়? বড় অস্বস্তি বোধ করেন ব্রজগোপাল। যদি ঘুষ না খাস তবে কেন নিজের অবস্থার চেয়ে ভাল থাকার চেষ্টা করিস? না কি পাঁচজনকে দেখাতে চাস যে তোরা ঠিক মধ্যবিত্ত নোস।

বীণা ভিতরের ঘর থেকে ঘুরে এসে বলল—বসুন, মা আসছেন।

ব্রজগোপাল মাথা নাড়লেন। বীণার কোলের ছেলেটির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন—কী নাম রেখেছ ওর?

—কৌশিক। ডাকনাম টুবাই।

—দু-বছর বয়স হল, না?

—দু-বছর তিন মাস।

—মুখখানা রণোর মতোই।

বউটি ছেলেকে আদর করে ঘাড়ে মুখ ডুবিয়ে বলে—ছোনা একটা।

লজ্জায় ব্রজগোপাল মুখ ফিরিয়ে নেন। মা বাবা শ্বশুর-শাশুড়ির সামনে নিজের ছেলেকে আদর করা বড় লজ্জার ব্যাপার ছিল একসময়ে। এরা কিছু জানে না, মানেও না।

ব্রজগোপাল হঠাৎ প্রশ্ন করেন—রণেনের কি প্রোমোশন হয়েছে?

—না। হওয়ার কথা চলছে, কিন্তু কীসব যেন গণ্ডগোল।

—এসব কবে হল?

—কীসের কথা বলছেন?

—এই যে সব জিনিসপত্র?

—কিস্তিবন্দিতে?

—বোধ হয়। আমি ঠিক জানি না।

ব্রজগোপাল হাসলেন। জানো না, তা কি হয়? সোফা-কাম-বেড, রেডিয়োগ্রাম কিংবা গ্যাসের উনুন কেনার মানুষ রণেন তো নয়। সে ঢিলাঢালা মানুষ, শখ-শৌখিনতার ধার ধারে না। এসব মানুষ কেনে স্ত্রীবুদ্ধিতে, স্ত্রীরই তাগিদে। মেয়েছেলের মতো এমন বিপজ্জনক প্রাণী আর নেই। সাধুকে চোর, সরলকে কুটিল বানানোর হাত তাদের খুব সাফ। সম্ভবত, রণো এখন ঘুষ খাচ্ছে। সংসারটাও বড়, হয়তো সামলাতে পারে না।

—বসুন, চা করে আনি। বীণা বলে।

ব্রজগোপাল হাত তুলে বলেন—না, চা আমি খাই না।

—ওমা! আগে তো খুব খেতেন।

—ছেড়ে দিয়েছি।

—খাবারটাবার কিছু দিই?

অভিমান, পুরনো অভিমানটাই বুকে ফেনিয়ে ওঠে আবার। ব্রজগোপাল মাথা নেড়ে বললেন—না। মনে ভাবলেন, এরা জিজ্ঞেস করে কেন? জিজ্ঞেস করলে কেউ কি বলে, খাব?

ব্রজগোপাল বললেন—বরং তোমার শাশুড়িকে ডেকে দাও। ফিরে যাওয়ার গাড়ি আটটায়। দেরি হলে ওরা ভাববে।

বীণা অবাক হয়ে বলে—কারা?

—যাদের আশ্রয়ে আছি। আত্মীয়ের অধিক।

কথাটা বলার দরকার ছিল না। তবু বললেন ব্রজগোপাল। বীণা খারাপ ব্যবহার কিছু করছে না, কিন্তু একধরনের ভদ্রতাসূচক দূরত্ব বজায় রাখছে যা তিনি ঠিক সহ্য করতে পারেন না। বোঝাই যাচ্ছে, ননীবালারও এখানে সুখে থাকার কথা নয়।

বীণা মুখটা গম্ভীর করে থাকল।

ব্রজগোপাল সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভুলটা ধরতে পারেন। কিন্তু কথাটা ফেরাবেন কী করে! তাই তাড়াতাড়ি নাতির দিকে হাত বাড়িয়ে বলেন—এস দাদা।

বীণা ছেলেকে ছেড়ে দিয়ে বলে—দাদুর কাছে যাও।

ছেলেটি দু-পা এগিয়ে আসে। একদম কাছে আসে না। ব্রজগোপাল তবু হাত দুটো বাড়িয়েই থাকেন। বলেন—খুব দুষ্ট হয়েছে?

—খুব। সেইজন্যই তো স্কুলে দিয়ে দিলাম।

খুব অবাক হয়ে ব্রজগোপাল বলেন—স্কুলে দিলে! দু-বছর মাত্র বয়স বললে না?

বীণা হেসে বলে—দু-বছর তিন মাস। আজকাল ওর বয়সে সবাই স্কুলে যায়।

—বলো কী! আমরা প্রথম স্কুলে যাই সাত আট বছর বয়সে, তাও খুব কান্নাকাটি করতাম।

—এখনকার ছেলেরা তো স্কুলে যাওয়ার জন্য অস্থির।

—কীরকম ইস্কুল?

—নার্সারি। ইংলিশ মিডিয়াম।

—ও। সে তো অনেক পয়সা লাগে।

—কুড়ি টাকা মাইনে, বাস পঁচিশ, তার ওপর আজ এটা কাল সেটা লেগেই আছে। মাসে পঞ্চাশ টাকার ধাক্কা।

ব্রজগোপাল মনে মনে ভারী বিরক্ত হন। কিন্তু মুখে নির্বিকার ভাবটা বজায় রেখে বলেন—বড়জনকেও কি ইংলিশ মিডিয়ামে দিয়েছ? মেয়েটাকেও?

—হ্যাঁ একই স্কুলে।

—তা হলে সংসারের দেড়শো টাকা মাসে বেরিয়ে যাচ্ছে!

—হ্যাঁ । একটু কষ্ট করছি, ছেলেমেয়েগুলো যদি মানুষ হয়।

ব্রজগোপাল দীর্ঘশ্বাস চাপলেন। রণোর যা বেতন তাতে এত বড় সংসার চালিয়ে কষ্ট করেও বাড়তি দেড়শো টাকা বাচ্চাদের জন্য খরচ করা সম্ভব নয়। তবে কি রণো উপরি নিচ্ছে আজকাল? বুকের মধ্যে ভারী একটা কষ্ট হতে থাকে তাঁর। এ সংসারে কেউই ব্রজগোপালকে অনুসরণ করল না। তিনি সৎ ছিলেন, এবং সৎ-অসতের ব্যাপারে তাঁর কোনও দ্বন্দ্ব ছিল না। ছেলের ভিতরে অন্তত সেইটুকু থাকলে তার অহংকার থাকত।

তিনি প্রসঙ্গ পালটে বললেন—বড়জন কোথায়?

—কে, বুবাই? সে খেলতে গেছে।

—পড়াশুনোয় কেমন হয়েছে?

—ভাল, ফার্স্ট হয়। মাস্টারমশাইরা আন্টিরা মনোজিৎ বলতে অস্থির।

—মনোজিৎ? ভারী অবাক হলেন ব্রজগোপাল। বড় নাতির নাম তিনিই রেখেছিলেন সুপ্রসন্ন। তিনি যখন চলে যান তখনও এ নামই বহাল ছিল। সদ্য লিখতে শিখেছিল নাতিটি, একসারসাইজ বুক আর বইয়ের

ওপরে কাঁচা হাতে অতি কষ্টে লিখত সুপ্রসন্ন লাহিড়ি। ব্রজগোপাল নিস্তেজ গলায় বলেন—নামটা কি বদলানো হয়েছে?

বীণা একটু লজ্জা পায়, বলে—সেকেলে নাম বলে পালটে রাখা হয়েছে। ওর বন্ধুদের সব আধুনিক নাম, ও তাই ভাল নামের জন্য বায়না করত।

—ও। একটু চুপ করে থেকে বলেন—মনোজিৎ বেশ নাম। ভাল। মেয়েটারও কি নতুন নাম রেখেছ?

—না, ওর সেই পুরনো নামই আছে। তবে ডাকনাম অনেক। কেউ ডাকে শানু, কেউ বেলকুঁড়ি, কেউ বুড়ি।

ভিতরের ঘরে ননীবালা পরনের নোংরা শাড়িটা ছেড়ে ধীরে আস্তে একটা ভাল শাড়ি পরলেন। জরির ধাক্কা দেওয়া লাল পাড়। বেখেয়ালেই পরছিলেন। পরার পর মনে হল লাল পেড়ে শাড়ি বড় পছন্দ ছিল মানুষটার।

শাড়ি পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চিরুনিটা হাতে নিলেন। সিঁথিতে সিঁদুরের ঘা। আজকাল সব সিঁদুরেই ভেজাল। বাসি বিয়ের দিন সকালে বাসি বিছানায় ব্রজগোপাল যে সিঁদুরের স্তূপ ঢেলে দিয়েছিলেন সিঁথি ভরে, তার কিছু আজও অবশিষ্ট আছে, গোপন কৌটোয় যত্নে তুলে রেখেছেন ননীবালা। ওই সিঁদুর একটু একটু করে কৃপণের মতো অন্য সিঁদুরের সঙ্গে মিশিয়ে আজও পরেন তিনি। নিয়ম। এখনকার সিঁদুর সে আমলের মতো নয়, সিঁথি চুলকে ঘা হয়ে যায়, তাই সচরাচর খুব সামান্য একটু সিঁদুর ছোয়ান আজকাল। কী ভেবে আজ ডগডগে করে সিঁদুর পরলেন। চুলের জট পছন্দ করতেন না ব্রজগোপাল। মাথার তেলের দাম বড্ড বেড়ে গেছে, ননীবালার একরাশি চুলে তেল দিতে সিকি শিশি তেল শেষ হয়ে যায়। রণেনের মুখ চেয়ে আজকাল তালুতে একটু তেল চেপে ননীবালা স্নান সারেন। তাই তেলহীন চুলে আঠা আর জট। চিরুনি চালাতে গিয়ে একটা শ্বাস ফেললেন। এই বিপুল চুলের রাশি তাঁর বোঝার মতো লাগে।

সাজগোজ কি একটু বেশি হয়ে গেল? বীণা বোধ হয় শাশুড়ির এই প্রসাধন দেখে মুচকি হাসবে। মেয়েরাই মেয়েদের সবচেয়ে বড় শত্রু। সব লক্ষ করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। শ্বশুরবাড়িতেই তিনি শিখেছিলেন যে স্বামী শ্বশুর ভাসুরের সামনে যেতে হলে পরিচ্ছন্ন হয়ে যেতে হয়। অবশ্য ব্রজগোপালের ব্যবহারে সেসব শিক্ষা তিনি ভুলেও গিয়েছিলেন। আজ সেই পুরনো নিয়মটা রক্ষা করার জন্য তাঁর আগ্রহ হয়। তিন-চারবছর তিনি স্বামীর মুখশ্রী দেখেননি, তার আগেও বছর দুই এক আধপলক দেখেছেন। আজ তাঁকে ওই লোকটার সামনে যেতে হবে, মেজাজ ঠিক রাখতে হবে, মিষ্টি কথায় বোঝাতে হবে, টালিগঞ্জের জমিটা কেনা তাদের একান্ত দরকার। ছেলেদের ব্রজগোপাল তো কিছুই দিলেন না, এটুকু অন্তত ছেলেদের জন্য ভিক্ষা করে নিতেই হবে তাঁকে। শরীর পরিচ্ছন্ন থাকলে মনটাও শান্ত রাখা যাবে। ব্রজগোপালেরও হয়তো তাঁকে দেখামাত্র খ্যাঁক করে উঠতে ইচ্ছে করবে না।

সাজগোজ করতে বেশ একটু বেশি সময় নিলেন ননীবালা। তাঁর হাত-পা যেন বশে নেই। প্রেসারটা বোধহয় ইদানীং বেড়েছে, বুকে ধপ ধপ হাতীর পা পড়ছে। মাথায় ঘোমটা সযত্নে টেনে ননীবালা ধীরপায়ে বাইরের ঘরের পরদা সরিয়ে চৌকাঠে দাঁড়ালেন। বাইরের মানুষের মতোই বসে আছেন ব্রজগোপাল। খয়েরি চাদর গায়ে, আধময়লা ধুতি, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, ধুলায় ধূসর চেহারা। ননীবালার দিকে চেয়েই মুখটা ফিরিয়ে নিলেন।

ননীবালা আজকাল বীণাকে কোনও কাজের কথা বলতে ভয় পান। সংসার খরচের টাকা আজকাল বীণার কাছেই থাকে। খরচ নিয়ে খিটিমিটি বাঁধত বলে ব্যবস্থাটা ননীবালাই করেছেন। সংসারের কর্তৃত্বও সেই সঙ্গেই চলে গেছে। বীণা এখন ওপরওয়ালা। সচরাচর ননীবালা তাকে কাজের কথা বলেন না। কিন্তু এখন অনুচ্চ কর্তৃত্বের সুরে বললেন—বউমা, চায়ের জল চাপাও। ও-বেলার রুটি করা আছে, একটু ঘিয়ে ভেজে দাও।

বীণা বাধ্য মেয়ের মতো ওঠে। দেখে ননীবালা খুশি হল। ব্রজগোপাল এদের সংসারে ননীবালার অবস্থাটা যেন টের না পান।

বীণা কাছে এসে বলে—উনি কিছু খাবেন না, আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।

ননীবালা সুর নামিয়ে বলেন—ওসব কি জিজ্ঞেস করতে হয়! সামনে ধরে দেবে। এস-জন বোসো-জন তো নয়। যাও।

বীণা চলে গেলে নাতি কোলে ননীবালা সোফা-কাম-বেডের একধারটায় বসেন। বলেন—ওদিককার খবর-টবর সব ভাল?

—ওই একরকম। ব্রজগোপাল অন্যদিকে চেয়ে বলেন।

ননীবালা বেশি কথাটথা জানেন না, দ্বিতীয় কথাতেই সরাসরি প্রশ্ন করলেন—কী ঠিক করলে?

—জমিটা কিনবেই তুমি?

ননীবালা শ্বাস ফেলে বললেন—আমি জমি দিয়ে কী করব? জমি তো আমার জন্য চাইছি না। ওদের জন্য। আমি আর ক'দিন?

—ওই হল।

—খুব সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে। অজিতের বন্ধুর জমি, সেই সব ব্যবস্থা করে দেবে। তাকে ওকালতনামা দেওয়া আছে।

—শুনেছি। কিন্তু কথা তো তা নয়। রণো ওরা সব এখানকার বাসিন্দা হয়ে গেলে গোবিন্দপুরে থাকবে কে?

—যেই থাকুক, ওরা থাকবে না। গ্রামে-গঞ্জে থাকার ধাত তো ওদের নয়।

ব্রজগোপাল উত্তর দেন না।

ননীবালা শান্ত গলায় বলেন—আমার ওপর রাগ আছে তো থাক। ছেলেরা তো কোনও দোষ করেনি বাপের কাছে! রণোর একার ওপর এত বড় সংসার, দশ-বিশ হাজার এক ডাকে বের করে দেবার ক্ষমতা নেই। তুমি একটু ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখ।

ব্রজগোপাল আস্তে করে বললেন—সচ্ছলতার মধ্যেই তোমরা আছ, দেখতে পাচ্ছি। নতুন নতুন সব জিনিসপত্র কেনা হচ্ছে, নিজের অবস্থাকে ডিঙিয়ে পাঁচজনের কাছে সচ্ছলতা দেখানো।

—ওমা! গরিবের সংসারেও দিনে দিনে টুকটাক করে কত জিনিস জমে যায় দেখতে দেখতে। গত পাঁচ-সাত বছর ধরে কত কষ্টে এইসব করেছে একে একে। তাও তো তেমন শৌখিন জিনিস না, সংসারের যা লাগে তাই। ছেলেদের সংসারের শ্রী দেখতে ইচ্ছে করে না?

ব্রজগোপাল ভ্রূকুটি করে বললেন—কিন্তু এত টাকা আসছে কোত্থেকে! রণোর যা মাইনে তাতে তো এসব হওয়ার কথা নয়। টাকার দাম কমছে বই বাড়ছে না। ঘুষটুষ খাচ্ছে নাকি!

—সেরকম ছেলে নয়। তবে কেউ হয়তো খাতির-টাতির করে সস্তায় কোনও জিনিস ধরে দেয়। সে তো আর দোষের নয়!

উদাস গলায় ব্রজগোপাল বলেন—তাই হবে। আমার সেসব না জানলেও চলবে।

ননীবালা মাথা ঠান্ডা রেখে বলেন—একটা বয়সের পর ছেলেদের হাঁড়ির খবর নেওয়া ঠিক নয়। ওরা বড় হয়েছে, দায়িত্ব নিয়েছে, ওদের ভালমন্দ ওদের বুঝতে দাও।

—আমি তো সব কিছু থেকেই দূরে আছি, তবে আর আমাকে সাবধান করা কেন! ঘুষটুষ যদি নেয় তো নিক, আমার কী! শুধু সমাজের একজন মানুষ হিসেবে অন্য এক মানুষকে বিচার করছি।

ননীবালা চঞ্চল হয়ে বলেন—রণো হয়তো এক্ষুনি চলে আসবে। এ সব কথা তার কাছে তুলো না।

ব্রজগোপাল ভ্রূ কুঁচকে সরাসরি স্ত্রীর দিকে তাকান। অল্প কঠিন স্বরে বলেন—ছেলের প্রতি তোমার এত টান, তবু তাকে অত ভয় কেন? তাকে যদি শাসন করা দরকার হয় তবে তা করাই উচিত।

—না না, তার দরকার নেই। রণো ওসব কিছু করে না।

—ভাল, জেনে গেলাম।

—রণোকে কী বলব জমিটার কথা?

—কিনুক।

—কিনবে?

—হ্যাঁ তো বলছি।

—ভাল মনে বলছ, না মনে রাগ রেখে?

—তাতে কী দরকার! টাকাটা আমি দেব। কর্তব্য হিসেবে।

—রণো বড় অভিমানী ছেলে, এরকম কথা শুনলে টাকা নেবে না।

ব্রজগোপাল বিরক্ত হয়ে বলেন—তবে কীরকম কথাবার্তা বলতে হবে?

—বিরক্ত হয়ো না। ছেলের মুখ চেয়ে খুশি মনে দাও। অনাদর অশ্রদ্ধার দান যে নেয় সে খুশি হয়ে নেয় না।

ব্রজগোপাল চুপ করে থাকেন। চোখে একটু উদাস ভাব। হঠাৎ বলেন—রণো খুব সৎ ছিল। ফুড ইনস্পেকটরের চাকরিতে অনেক উপরি। সে সব লোভে কখনও পা দেয়নি।

—তোমার অত সন্দেহের কী? ঘরে দুটো বাড়তি জিনিস দেখেই কি লোকটাকে বিচার করা যায়?

—যায়। আমার বড় দুশ্চিন্তা হয়।

—দুশ্চিন্তা কীসের?

—যারা ঘুষ নেয় তারা কখনও প্রকৃত শ্রদ্ধা পায় না, কেবল খাতির পায়।

—শ্রদ্ধা ধুয়ে জল খাবে! মা, ভাই, সংসার পালছে পুষছে, সে বড় কম কথা নাকি! আজকাল ক'টা ছেলে এই বয়সে এত দায়িত্ব ঘাড় পেতে নেয়? যার দায়িত্ব নেওয়ার কথা সেই নিল না কোনওদিন। রণোকে কেন অশ্রদ্ধা করবে লোকে?

ব্রজগোপাল ননীবালার দিকে তাকালেন। মধ্য যৌবনে স্ত্রীর প্রতি যে হিংস্র রাগ তাঁর দেখা যেত এখনও সেরকমই এক রাগে বুড়ো বয়সের দীপ্তিহীন চোখও একটু ঝলসে ওঠে। অথচ একথাও ঠিক, স্ত্রী ছাড়া অন্য

কারও প্রতি কখনও এমন তীব্র রাগ তিনি অনুভব করেননি। তার অর্থ কি এই যে, স্ত্রীর প্রতিই তিনি সবচেয়ে বেশি অধিকার সচেতন?

বীণা বুদ্ধিমতী। রান্নাঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু ওপাশে কান পেতে আছে হয়তো। তাই ননীবালা ব্রজগোপালের চোখ দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। যদি লোকটা তেড়েফুঁড়ে কিছু বলে তো বউমার কাছে অপমান। বললেন—ভয় পেয়ো না। রণো তেমন কিছু করেনি। শত হলেও তোমারই ছেলে তো!

—আমার ছেলেই শুধু নয়। তোমার ধাতও তো কিছু তার মধ্যে আছে। তা ছাড়া আছে পারিপার্শ্বিকের প্রভাব, চারদিকের লোভ আর আকর্ষণ। মানুষ খুব মরিয়া না হলে এমন অবস্থায় সৎ থাকতে পারে না।

ননীবালা স্বামীকে চটাতে চাইলেন না। উত্তরে বলতে পারতেন—সৎ হয়ে কী ঘচু হবে। তা না বলে বললেন—তুমি হাতমুখ ধুয়ে নাও। খেয়ে বিশ্রাম করো।

—ওসব দরকার নেই। রণোকে বোলো টাকা আমি দেব। এল-আই-সিতে গিয়ে যেন ও একটু খোঁজখবর করে। দরকার মতো আমাকে খবর দিলেই আমি এসে সইটই করে টাকা তুলে দিয়ে যাব।

—সব ব্যবস্থা অজিতই করছে। বসবে না?

না। আটটার কাছাকাছি সময়ে গাড়ি আছে। তাড়াতাড়ি না উঠলে গাড়িটা ধরতে পারব না।

—একটু বোসো, জলখাবারটুকু খেয়ে যাও, তা করতে হয়তো রণো এসে পড়বে।

ব্রজগোপাল খাওয়ার জন্য ব্যস্ত নন। কিন্তু এই সংসারের মাঝখানে আর একটু বসে বিশ্রাম নিতে তাঁর বড় সাধ হচ্ছিল। দূর এক একাকী নির্জন ঘরে ফিরে যেতেই তো হবে! বললেন—সোমেন বাড়িতে নেই?

—না। এ সময়ে কি ডাঁশা ছেলেরা ঘরে থাকে?

ব্রজগোপাল সেটা জানেন। ছোট ছেলেটি যখন বয়ঃসন্ধিতে পা দিয়েছে তখন তিনি বাড়ি ছেড়েছেন। চেহারায় ভাঙচুর হয়ে ছেলেটি এখন অন্যরকম হয়ে গেছে। তীক্ষ্ণ, বুদ্ধিমান এবং সুশ্রী মুখখানা আর একবার দেখবার জন্য তার বড় সাধ হচ্ছিল। জিজ্ঞেস করলেন—কখন ফেরে?

—তার কিছু ঠিক নেই।

—কী করেটরে আজকাল? স্বভাবটভাব কেমন?

ননীবালা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন—কাজকর্ম না থাকলে কী আর ভাল থাকে। এম. এ. পরীক্ষাটা দিল না, ব্যাঙ্কে একটা চাকরি পাওয়ার কথা হচ্ছিল তো তারও চিঠি এসেছে, চাকরি এখন হবে না।

জলখাবারের প্লেট আর চা নিয়ে বীণা আসে। ঘরে ঢোকার আগে গলা খাঁকারি দেয়। ব্রজগোপাল জলখাবারের প্লেটটা ছুঁলেন মাত্র, চায়ে গোটা দুই চুমুক দিলেন। তারপর অন্যমনস্কভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—চলি।

কিছু বলার নেই ননীবালার। কেবল বললেন—শরীরটরীর কেমন?

—ভাল, বেশ ভাল।

—আর একটু বসলেই রণো এসে পড়ত।

—দেখা করার জন্য তাড়া কী? হবে এখন।

—দুর্গা দুর্গা। ননীবালা বলেন।

ব্রজগোপাল দরজার কাছ বরাবর গিয়ে ফিরে প্রশ্ন করলেন—বাড়িটা কার নামে হবে?

—রণোর ইচ্ছে আমার নামে হোক। আমি বলি দুই ছেলের নামে হলেই ভাল। তুমি কী বলো?

—আমি কী বলব? যেটা তোমাদের খুশি।

রাস্তায় এসে ব্রজগোপাল ইতস্তত তাকালেন। আরও শ্রীহীন, নোংরা ধুললাটে হয়ে গেছে কলকাতা। রাস্তায় জঞ্জালের স্তূপ জমে আছে। স্টেশন রোডে এই শীতেও কোথা থেকে জল জমে কাদা হয়ে আছে এখনও। ঘর-ছাড়া ছেলেরা জটলা করছে। যতদূর সতর্ক চোখে সম্ভব দেখলেন ব্রজগোপাল, সোমেনকে দেখা যায় কিনা কোথাও। নেই, থাকার কথাও নয়।

কলকাতায় বেড়েছে কেবল দোকান। এত দোকান, কেনে কে, তা ব্রজগোপাল ভেবে পান না। তবু ঠিকই সওদা বেচাকেনা চলে। মানুষকে লোভী করে তুলবার কত আয়োজন চারদিকে।

একটা ট্যাক্সি উলটোদিক থেকে এসে তাঁকে পেরিয়ে গেল। থামল। ব্রজগোপাল ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন, বাসার সামনেই থেমেছে। একটু দাঁড়ালেন। রণো না? রণোই। ঘাড় নিচু করে নেমে এল, হাতে বোধ হয় একটা দুধের কৌটো, দু-একটা প্যাকেট গোছের, একটা ফোলিও ব্যাগ। চশমা নিয়েছে আজকাল। বেশ মোটা হয়ে গেছে। সোয়েটারের ওপর দিয়ে পেটটা বেশ ঠেলে বেরিয়ে আসছে, গালটাল পুরন্ত। চিনতে তবু অসুবিধে হয় না, ছেলে তো। মোটা হয়ে যাওয়ায় এই বয়সেই বেশ বয়স্ক দেখায়।

কয়েকটা মুহূর্ত তিনি দাঁড়ালেন, ট্যাক্সিতে চড়ার অবস্থা রণোর নয়। তবু কী করে ট্যাক্সি চড়ে ও? দিব্যি নির্লিপ্ত মুখে ভাড়া গুনে দিয়ে খুচরো ফেরত নিচ্ছে। ট্যাক্সির মিটার টুংটাং করে ঘুরে গেল। বোঝা যায় হামেশা ট্যাক্সিতে চড়ার অভ্যাস আছে। নামা থেকে ভাড়া দেওয়া অবধি ঘটনাটুকুর মধ্যে একটা অভ্যস্ত অবহেলার ভাব।

রণো বাড়িতে ঢুকে গেলে ব্রজগোপালের খেয়াল হয়, ছেলে এক্ষুনি শুনবে যে বাবা এসেছিল, এইমাত্র বেরিয়ে গেছে। ফলে হয়তো বাপের সঙ্গে দেখা করতে তড়িঘড়ি নেমে আসবে। ভেবে ব্রজগোপাল দ্রুত হাঁটতে থাকেন। তাঁর অভ্যাসের পক্ষে খুবই দ্রুত। জোরে হাঁটা তাঁর বারণ।

বড় রাস্তা পর্যন্ত এসেই ব্রজগোপাল বুঝতে পারেন, কাজটা ঠিক হয়নি। বুকে প্রাণপাখি ডানা ঝাপটাচ্ছে। শ্বাসবায়ু উকট রকমের কমে আসছে। এ সময়টায় তাঁর আজকাল হাঁপির টান ওঠে। দু-চার কদম হেঁটে ব্রজগোপাল ব্রিজের পিলারের কাছে উবু হয়ে বসে পড়েন। ভগবান! এ যাত্রা সামলাতে দাও। এক বিশাল সমুদ্র যেন ক্লান্ত সাঁতারুকে বড় নয়-ছয় করে। ব্রজগোপাল বসে নিবিষ্টমনে শ্বাস টানতে চেষ্টা করেন। একবার এ সময়ে সোমেনটার মুখখানা যদি দেখে যেতে পারতেন। ওই ছেলেটির প্রতি বড় মায়া। লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ে কোথায় হারিয়ে আছে ছেলেটা! এ বয়সে কবে কখন প্রাণপাখি ছেড়ে যায় দেহের খাঁচা। আয় সোমেন আয়।

॥ আট ॥

কলকাতার ময়দানে প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দিচ্ছেন। রেডিয়োতে রিলে হচ্ছে।

সন্ধেবেলা। প্রধানমন্ত্রী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আন্তরিকতার সুরে বার বার জাতিকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, আরও ত্যাগ, আরও কষ্ট স্বীকার, আরও ধৈর্যের জন্য জনগণকে প্রস্তুত হতে হবে। ভারতের চতুর্দিকে কয়েকটি দেশ মিত্রভাবাপন্ন নয়। যে কোনও সময়ে আমরা আক্রান্ত হতে পারি। বন্ধুগণ, আমরা যুদ্ধ চাই না, কিন্তু যুদ্ধে যদি আমাদের নামানো হয় তবে আমরা আদর্শের জন্য, অস্তিত্বের জন্য, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে চূর্ণ করার জন্য...

অজিত রেডিয়োটা বন্ধ করে দেয়। রেডিয়োর পাশে পোষা বেড়ালের মতো বেতের গোল চেয়ারে পা গা ঢাকা দিয়ে বসে আছে শীলা। তার মুখশ্রী চমৎকার, রং একটু চাপা, ইদানীং সুখের কিছু মেদ জমছে গায়ে। তুঁতে রঙের উল দিয়ে একটা সোয়েটার বুনছিল, একটা ঘর গুনতে ভুল হয়েছে, মাথা নিচু করে দেখছিল ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। রেডিয়োটা বন্ধ হয়ে যেতেই চমকে উঠে বলে—এই যাঃ, কী হল?

—বন্ধ করে দিলাম। তুমি তো শুনছ না। অজিত শান্ত গলায় বলে।

শুনছি না কে বলল? তুমি বন্ধ করে দিলে তাই বলো! প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা! ভারি বিস্ময়ভরে বলে শীলা।

—তোমার কি ধারণা, প্রধানমন্ত্রীর গলার স্বরে ঘরদোর পবিত্র হবে? কেউ যখন শুনছি না তখন খামোখা ব্যাটারি নষ্ট করে লাভ কী! আজকাল ব্যাটারির লনজিভিটি অনেক কমে গেছে, যদি যুদ্ধ হয় তো নেকস্ট বাজেটে দামও বাড়বে।

—ভারী বিশ্রী স্বভাব তোমার। ভাল কথা সহ্যই করতে পারো না। কত লোক আজকের মিটিং অ্যাটেন্ড করছে জানো?

—খামোখা করছে। ফেরার সময়ে অধিকাংশ লোকই ট্রামে বাসে উঠতে পারবে না। লম্বা রাস্তা হেঁটে মরবে সবাই, আর তা করতেই ভাল ভাল কথা যা শুনছে সব ভুলে যাবে।

—ইউনিয়ন করতে করতে তোমার মনটাই হয়ে গেছে বাঁকা। যেহেতু পি-এম বলছে সেইজন্যই তার সব খারাপ। শুনছিলাম বেশ, দাও আবার রেডিয়োটা।

—থাক। তার চেয়ে এস একটু প্রেমট্রেম করা যাক। যুদ্ধফুদ্ধ লাগলে কবে যে কী হবে! মরেটরে যাওয়ার আগে—

—আহা, সারাদিনে যেটুকু সময় দেখা হয় সেটুকু সময়ও তো আমার দিকে তাকাও না। এখন প্রধানমন্ত্রীর ইমপর্ট্যান্ট বক্তৃতার সময়ে প্রেম উথলে উঠল। দাও না রেডিয়োটা, একটা ঘর পড়ে গেছে, তুলতে পারছি না। দাও না গো—

অজিত রেডিয়োটা আস্তে করে ছেড়ে দেয়। রেডিয়োর টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর রনসন গ্যাস লাইটারটা তুলে নিয়ে বারান্দায় আসে।

টালিগঞ্জের এ পাড়াটাকে খাটালের পাড়াও বলা যায়। বারান্দায় দাঁড়ালেই গোচোনা, শুকনো গোবর তার গরুর গায়ের গন্ধ এসে ধাক্কা দেয় নাকে। অভ্যাস হয়ে গেছে এখন। ঝিম এক সন্ধ্যা নেমে আসছে মাঠে ময়দানে। তাল্প কুয়াশা, ভৌতিক আলো জ্বলছে অন্ধকারে। কুয়াশার ভিতরে পাখির ডিমের মতো। এখনও এ-দিকটায় ফাঁকা জমি দেখা যায়। অবশ্য ক্রমেই ফাঁকা জায়গা ভরে যাচ্ছে, নিত্য নতুন ভিত পত্তন হয়, বাঁশের ভারা ওঠে, তার সঙ্গে উঠতে থাকে ইটের গাথনি। লোহার গ্রিল শীতে চনচনে হয়ে আছে। গ্রিলের সঙ্গেই প্রায় গাল ঠেকিয়ে দাঁড়ায় অজিত। ঘরের ভিতর থেকে প্রধানমন্ত্রীর গলার স্বর আসছে, চারদিক থেকে প্রধানমন্ত্রীর গলার স্বর আসছে। সব বাড়িতে রেডিয়ো খোলা। কর্তা গিন্নি, চাকর-বাকর, খাটালওয়ালা সবাই শুনছে, নির্বাচকমণ্ডলী, জনগণ।

কাঁচা রাস্তাটা বাঁ ধারে কিছুদূরে গিয়ে বাঁক নিয়েছে। বাঁকের মুখেই একটা বাতিস্তম্ভ। হলুদ আলো নতমুখ হয়ে দাঁড়িয়ে। ওই জমিটা লক্ষ্মণের। গতকালও একটা এয়ারোগ্রাম এসেছে লক্ষ্মণের। কানাডা থেকে ওরা স্বামী-স্ত্রী বেড়াতে বেরিয়েছে স্টেটসে। বড় শীত, খুব ফূর্তি। লক্ষ্মণ আর ফিরবে না। ইমিগ্রান্ট ভিসা পেয়ে গেছে। ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ার লক্ষ্মণ কোনও দিনই খাটাল-ভরা এই এলাকায় বাড়ি করতে আসবে না। তার জমিটা বায়না করেছে রণেন। দু-একবছরের মধ্যেই ওখানে এক কি দেড়তলা দীন একটি বাড়ি উঠবে। শীলার খুব আনন্দ, বাপের বাড়ি উঠে আসছে কাছে।

রনসন গ্যাসলাইটারটার আগুন কেমন লেলিহান হয়ে লাফিয়ে ওঠে! চাকা ঘুরিয়ে দিলেই আবার কমে যায়। গ্যাসের সিলিন্ডার শেষ হয়ে এসেছে। লক্ষ্মণ আবার পাঠাবে, লিখেছে। কিন্তু লক্ষ্মণ আর ফিরবে না। বন্ধুর জন্য শখ করে কাছাকাছি জমি কিনেছিল। যখনই কিনেছিল তখনই বোধ হয় লক্ষ্মণ জানত যে সে সুখের পাখি হয়ে উড়ে গেছে। ফিরবে না। তবু অজিতকে খুশি করতেই কিনেছিল বোধ হয়। মেরেকেটে পৌনে দু-কাঠা জমি হবে। বেশি দামও নয়। লক্ষ্মণের কিছু যায় আসে না যদি অজিত খুব কম দামেও জমিটা ছেড়ে দেয়। লক্ষ্মণ বহু টাকা মাইনে পায়। কানাডায় বাড়িও করেছে। খাটালে ভরা, বন্ধুহীন এলাকায় অজিত পড়ে আছে একা। একাই। অজিত বড় একা।

ঘর থেকে প্রধানমন্ত্রীর গলার ওপরে গলা তুলে শীলা ডাকে—শুনছো, ঠান্ডা লাগিও না। বারান্দায় এখন কী? ঘরে এস।

অজিত উত্তর দিল না। কিং সাইজ ডানহিল সিগারেটের সুন্দর গন্ধটি ফুসফুস ভরে টেনে নিল। পাঁচ প্যাকেট পাঠিয়েছিল লক্ষ্মণ। আর মাত্র আড়াই প্যাকেট আছে। কৃপণের মতো খায় অজিত। একটুও ধোঁয়া নষ্ট করতে ইচ্ছে করে না। ফুরোলে আবার পাঠাবে। কত কী পাঠায় লক্ষ্মণ! কিন্তু সে নিজে ফিরবে না। দূরের ল্যাম্পপোস্টের আলো কুয়াশার একটা ধাঁধার মতো জ্বলছে। মাকড়সার জালের মতো সেই ভৌতিক আলোয় লক্ষ্মণের শূন্য জমিটা দেখা যায়। শীতে কিছু ছেলে কোর্ট কেটে ব্যাডমিন্টন খেলে, বর্ষায় আগাছা জন্মায়। কোনওদিন লক্ষ্মণ ফিরবে, বাড়ি-টাড়ি করবে, এই আশায় এতকাল জমিটা ধরে রেখেছিল অজিত। শীলার তাগাদায়, শাশুড়িই আর রণেনের আগ্রহে ছেড়ে দিতে হল। ধরে রেখেও লাভ ছিল না অবিশ্যি। পৃথিবী ঠিক এক পুকুরের মতো, মাছের মতো মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে কোথায় কোথায়। বৃথা ছিপ ফেলে বসে থাকা, কোন দূরে হারিয়ে যাওয়া মাছটিকে ধরে আনবে কাছে, এমন সাধ্য কী!

লক্ষ্মণের পায়ে থাকত একটা বর্ণহীন ধুলোটে চপ্পল, একটু খাটো ধুতি, গায়ে একটা ফুলহাতা শার্ট—যার হাতে বোতাম খসে যাওয়ার পর হাতীর কানের মতো লটপট করত। শীত-গ্রীষ্মে ওই ছিল তার মার্কামারা পোশাক। কখনও কারও সঙ্গে ঝগড়া করত না লক্ষ্মণ, তর্কাতর্কিতে যেত না, কাউকে কখনও অবহেলা করেনি। বিশাল এক যৌথ পরিবারে মানুষ, মা-বাবা বর্জিত কাকা-জ্যাঠার সংসারে তার অনাদর ছিল না হয়তো। কিন্তু সে পরিবারের আদর জানাবার সাধ্যই ছিল কম। কাকা পলিটিকস করত—তৎকালীন সি পি আইয়ের নিয়তকর্মী। জ্যাঠা দোকান দিয়েছিল। বাসায় পড়ার ঘর ছিল না। বইপত্র ছিল না, শোওয়ার জায়গারও কিছু ঠিক ছিল না। লক্ষ্মণের বাসায় গিয়ে দৃশ্যটা নিজের চোখে দেখেছে অজিত। লক্ষ্মণের তাই বেশি আপন ছিল ঘরের বাইরের জগৎ। সকলেই ভালবাসত লক্ষ্মণকে। সেবার প্রথম আই এস সি ক্লাসে বিজ্ঞান পড়তে গিয়ে অজিত বস্তুবিশ্বের অণুময় অস্তিত্বের বিষয়ে জানতে গিয়ে ভারী অবাক হয়। বিজ্ঞান, ত্রিকোণমিতি বা অঙ্কের বই খুলে বসে সে এক অবাক বিস্ময়ভরা তত্ত্বজ্ঞানের মুখোমুখি হত। বিশ্বের সব কিছুর অস্তিত্বের স্বরূপ বিশ্লেষণ জানতে গিয়ে তার বহুকালের পুরনো সব ধারণা ভেঙে যাচ্ছিল। বহু ছেলেই আই এস সি পড়ে, তাদের কারও এসব মনেই হয় না। কিন্তু অজিতের ভিতরে চাপা বিষাদরোগ বীজাণুর মতো ওত পেতে ছিল। বিজ্ঞান পড়তে গিয়েই সেই বীজাণুর আক্রমণ টের পায়। সারাদিন বসে ভাবত—এই যে আমি, আমি কতগুলি অণুর সমষ্টি মাত্র? একদিন ঠাট্টা করে কেমিস্ট্রির অধ্যাপক ক্লাসে বললেন—মানুষকে পুড়িয়ে ফেললে খানিকটা কার্বন পড়ে থাকে, খানিকটা জল হয়ে উড়ে যায়। আমাদের এত আদরের শরীরের ওই হচ্ছে পরিণতি। জল আর কার্বন নিয়ে খুবই ভাবতে শুরু করেছিল অজিত। খেতে পারত না, রাতে ঘুমও কমে যেতে থাকে। মাথা-ভরা ওলট-পালট বিজ্ঞানের তত্ত্বজ্ঞান। বস্তুবিশ্বের গঠন, অঙ্কের কাল্পনিক সংখ্যা এবং অসীম চিহ্নের ব্যবহার তাকে মনে মনে ভয়ংকর উত্তেজিত এবং বিষাদগ্রস্ত করে তুলত। ইনফিনিটি শব্দটা নিয়ে ভাবতে বসে সে কেবলই অসীমতার ধারণা করতে গিয়ে মাথা চেপে ধরত ভয়ে। পাগল হয়ে যাব না তো! অবস্থা কাউকে বলাও যায় না। একা সওয়াও যায় না। সব ছেলেরা যখন রসায়নের ক্লাসে বস্তুত মলিকিউলার ভ্যালেন্সি বুঝছে তখন অজিত নিউক্লিয়াস আর তার চারধারে ঘূর্ণমান পরমাণুকণার ধারণা করতে গিয়ে ভারী অন্যমনস্ক হয়ে যেত। বুঝতে পারত অন্যান্য ছেলেদের মতো সে স্বাভাবিক নয়। সে একা, সে আলাদা। তার মতো চিন্তা বা দুশ্চিন্তা অন্য কারও নেই। ঠিক সেই সময়ে একদিন কলেজ থেকে ফেরার পথে লক্ষ্মণকে সঙ্গী পায়। সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজ থেকে ওয়েলেসলি হয়ে হেঁটে কালীঘাট ফিরবে লক্ষ্মণ। কারণ তার পয়সা নেই। অজিত বলল—চলো তোমার ট্রামভাড়া আমি দেব। লক্ষ্মণ রাজি হল তবু বলল—পরে উঠব, ময়দান পর্যন্ত হাঁটি চলো। এ সময়ে ফাঁকা জায়গায় হাঁটতে বেশ লাগে। সেই থেকে বন্ধুত্ব। সারা রাস্তা কত কথা বলে গেল লক্ষ্মণ। অজিত ভাল শ্রোতা পেয়ে মনোহরদাস তড়াগের কাছে ঘাসে মুখোমুখি বসে তার বিজ্ঞান-বিষয়ক বিপদের কথা ব্যক্ত করলে লক্ষ্মণ তার হাত চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠল—মাইরি, আমারও ওরকম হয়। 'আকাশের কথা' নামে একটা বই পড়ে আমার মাথা গোলমাল হয়ে যাওয়ার জোগাড়। মনে হচ্ছে সেই কথাটাই ঠিক, মানুষ হচ্ছে জন্মান্ধ, তাকে একটা অন্ধকার ঘরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে একটা কালো বেড়ালকে খুঁজে বের করতে হবে। আমার কাকা একবার বলেছিলেন—সৃষ্টির আদি রহস্য জানাবার চেষ্টা করা মূঢ়তা। যদি তা কউ করতে যায় তবে সেই অন্ধকার ঘরে ঢোকার আগে সে যেন তার বোধবুদ্ধি রেখে যায়,

নইলে পাগল হয়ে যাবে। তার মতো আর একজনও আছে যে কিনা বিজ্ঞানের তত্ত্বজ্ঞান নিয়ে মাথা ঘামায়—এই কথা জেনে কী রোমহর্ষময় আনন্দ হয়েছিল অজিতের। আজও গায়ে কাঁটা দেয়।

মজ্জাগত বিষাদরোগ যদিও কোনওদিনই ছাড়েনি অজিতকে, তবু ওই বন্ধুত্ব তার মনে একটা, হাওয়া-বাতাসের জানালা খুলে দিল। বড় অকপট, বন্ধুবৎসল ছেলে লক্ষ্মণ। মন-খারপ হলেই অজিত চলে যেত তার কাছে। লক্ষ্মণ তার চিরাচরিত পোশাকে বেরিয়ে আসত। রাস্তায় হাঁটত দুজনে, কয়েক পয়সার চিনেবাদাম কিনে নিত। পার্ক বা লেকের ধারে বসত গিয়ে। সেই বয়সের তুলনায় কিছু বেশি পড়াশুনো ছিল লক্ষ্মণের। বিবেকানন্দের বই ইংরেজিতে পড়েছে, নাড়াচাড়া করেছে কিছু রাজনীতির বই, সবচেয়ে বেশি ছিল তার পত্রিকা পড়ার অভ্যাস—পৃথিবীর কোথায় কী ঘটছে, কীভাবে ঘটছে, কেন—সে সব ছিল তার নখদর্পণে। তার কাছে খুব একটা মানসিক আশ্রয় পেয়েছিল অজিত। ওই ভাবেই তারা বড় হয়। আই এসসি থেকে বি এসসি। তারপরও লক্ষ্মণ পড়ল এম টেক। অনার্স ছিল না বলে অজিত লেখাপড়া ছাড়ে। বরাতজোরে এক ছোট্ট জীবনবিমা কোম্পানিতে চাকরি পেয়ে যায়। লক্ষ্মণ এম টেক-এ ভাল রেজাল্ট করে কিছুদিন চাকরি করল এখানে-সেখানে, একটা প্রফেসারিও করল কিছুদিন। বলত—অজিত, এখানে বড় কূপমণ্ডুকের জীবন। পাসপোর্ট করছি, দেখি কী হয়। পাসপোর্ট করেও রিনিউ করাতে হল লক্ষ্মণকে। প্যাসেজ মানির সংকুলান হত না। ভিসা পচে যেত। অজিতের ছোট্ট কোম্পানি রাষ্ট্রায়ত্ত হয়ে মাইনে-টাইনে বাড়তে লাগল। কাজ কমল। বউ এল ঘরে। এবং বউয়ের সঙ্গে মা বাবার বনিবনার অভাব ঘটাতে অজিত ভবানীপুরের বাসা ছেড়ে আলাদা হয়ে উঠে এল টালিগঞ্জের কাছে। একটু বেশি বয়সেই লক্ষ্মণ গেল কানাডায়। বড় একা হয়ে গেল অজিত। ঘরে বউ, তবু একা। মেয়েরা যে পুরুষের গভীরতার বন্ধু নয় সে সত্য অজিতের চেয়ে বেশি কে জানে! আজ যদি আবার সেই বিষাদরোগ ফিরে আসে তবে অজিত জানে, নিঃসঙ্গতার কাছে ছাড়া ঘরে তার কেউ নেই যাকে বলবে তত্ত্বকথা। কত প্রেমের গল্প লেখা হয়, একটা মেয়েকে নিয়ে কত টানাপোড়েন, কত দ্বন্দ্ব, কত আশা-নিরাশা, ব্যর্থতা ও মিলন, হায়, নারী প্রেম তবু জীবনের কতটুকু মাত্র জুড়ে আছে। মেয়েদের সাধ্য কী স্পর্শ করে ধীমান পুরুষের গভীর নিঃসঙ্গতা! মেয়েমানুষের প্রতি প্রেম তাই ফুরিয়ে যায়, জুড়িয়ে যায়। কিন্তু দূরের লক্ষ্মণের জন্য অজিতের পিপাসা ঠিক জেগে থাকে। বন্ধুর মতো বন্ধু পেলে পৃথিবীর কত বিষণ্ণতার অর্থ হয়ে যায় আনন্দ!

অজিতের ছেলেপুলে হল না। সরকার খেপে খেপে মাইনে বাড়িয়ে গেল। আগে ইউনিয়ন করত, শীলা বকে বকে ছাড়াল ইউনিয়ন। বছরখানেক আগে প্রোমোশন পেয়ে সেকশন ইনচার্জ হয়ে গেল অজিত। শীলাও একটা গার্লস স্কুলে চাকরি করছে। দুজনের রোজগার। ফলে হাতে টাকা জমে গেল কিছু। লক্ষ্মণকে লিখল কাছাকাছি দুটো প্লটে জমি আছে, লক্ষ্মণের জন্য একটা কিনবে নাকি? দুই বন্ধুতে পাশাপাশি থাকবে সারাজীবন। তত্ত্বজ্ঞানী সহৃদয় বন্ধু আর কে আছে! চিঠি পেয়েই লক্ষ্মণ টাকা পাঠিয়েছিল জমি কিনবার জন্য।

ল্যাম্পপোস্টের মাকড়সার জালের মতো ভৌতিক আলোটি লক্ষ্মণের জমির ওপর ময়লা জলের মতো পড়ে আছে। ব্যাডমিন্টন কোর্টের আশে-পাশে কাঁটাঝোপ। বর্ষাকালে পাগলা চেঁকি, ভাঁট আর আগাছায় ছেয়ে যায়। লক্ষ্মণ জার্মান এক মহিলাকে বিয়ে করেছে, পেয়েছে ইমিগ্রান্ট ভিসা, জমিটা বেচে দিতে লিখেছে।

প্রধানমন্ত্রীর বিষণ্ন-গম্ভীর কণ্ঠস্বর ক্রমে উঁচুগ্রামে উঠছে। সেতারের ঝালার মতো। এবার থামবে। ঘোষক বলবে—এতক্ষণ তিনতালে প্রথমে বিলম্বিত এবং পরে দ্রুত রাগ শোনালেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী...ইত্যাদি।

অজিতের বিদেশি সিগারেট শেষ হয়ে আসে। ফিল্টারটায় আগুন ধরেছে, পোড়া একটা গন্ধ পাওয়া যায়। সেটা ফেলে দিয়ে আর একটা ধরায় অজিত। রনসন গ্যাসলাইটারটার চাকা ঘুরিয়ে হঠাৎ প্রায় আধফুট উঁচু একটা শিখা তৈরি করে। নিবিয়ে দেয়। লক্ষ্মণ কোনওদিনই ফিরবে না।

শীতের নির্জন রাস্তা দিয়ে কুয়াশায় ডুবন্ত একটা ছায়ার মতো মানুষ আসছে। সামনে এসে চিন্তামগ্ন মুখটা তুলল। অন্ধকার বারান্দায় সম্ভবত সিগারেটের আগুন দেখে জিজ্ঞেস করে—অজিত নাকি?

আরে রণেন!

—খবর আছে।

—কী?

—ভিতরে এস বলছি।

অজিত মন্থর পায়ে ভিতরে আসে। ঘর ভরতি প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠস্বর। শীলা বোনা অংশটুকু তুলে আলোয় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নকশাটা দেখছে। অজিত দরজা খুলে এক বিপর্যস্ত রণেনকে দেখতে পায়। আজকাল রণেন একটু মোটাসোটা হয়েছে। ভুঁড়ি বেড়ে যাওয়ায় এবং টাক পড়ছে বলে একটু বয়স্ক দেখায়। তবু আজকাল আগের তুলনায় অনেক বেশি রংদার, বাহারি পোশাক পরে সে। আজও পরনে নেভি ব্লু রঙের একটা স্যুট, গলায় টাই, কোটের তলায় দুধসাদা জামা। চুল বিন্যস্ত, দাড়িও কামানো। তবু বিপর্যয়ের চিহ্ন ফুটে আছে তার মুখে-চোখে। হা-ক্লান্ত এবং হতাশা মাখানো মুখ।

শীলা মুখ তুলেই হাতের বোনাটা রেখে দিল। বলল—কী রে দাদা?

সেই মুহূর্তেই প্রধানমন্ত্রী বলে উঠলেন—জয় হিন্দ। এবং জনতা তার প্রতিধ্বনি করল। শীলা নিজেই রেডিয়োটা বন্ধ করে দেয় এবার। উৎকণ্ঠায় রণেনের দিকে চেয়ে থাকে।

রণেন চেয়ারে বসে একটু এলিয়ে হাতের ফোলিও ব্যাগটা মেঝেয় রেখে হাতের চেটোয় মুখটা ঘষে নেয়। বলে—একটু চা কর তো।

—করছি। কী হয়েছে?

—গ্রহের ফের। বলে রণেন অজিতের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে—এল আই সি-তে চেকটায় খোঁজ নিয়েছিলে?

অজিত তার বিদেশি সিগারেটটার ফিল্টার পুড়িয়ে ফেলেছে আবার। সেটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে বলে—নিয়েছি। কাল-পরশুই ইস্যু হওয়ার কথা।

—কিন্তু বাবা আসতে পারছেন না। বহেরু লিখেছে বাবার শরীর ভাল নেই। কলকাতা থেকে ফিরে গিয়েই অসুস্থ। বাবাকে ছাড়া চেক তো ওরা আর কাউকে দেবে না!

—না

—ব্যাপারটা এত দূর ম্যাচিওর করেও ঝুলে গেল!

অজিত ভ্রূ কুঁচকে বলে—শ্বশুরমশাইয়ের কী হয়েছে?

—জানি না। বহেরু ভেঙে তো কিছু লেখেনি। লিখেছে, বুকে ব্যথা। তা থেকে কিছু আন্দাজ করা সম্ভব নয়। এদিকে আমি সিমেন্টের পারমিট বের করেছি। লোহালক্কড়ও পেয়ে যাচ্ছি সস্তায়। টাকা অ্যাডভান্স করা হয়েছে। এত দূর এগিয়ে আবার বসে থাকতে হবে। চেক-এর ভ্যালিডিটি কতদিন থাকে? তিন মাস?

—ওরকমই।

শীলার মুখটা ম্লান হয়ে গিয়েছিল। বলল—তুই একবার গিয়ে দেখে আয় না!

রণেন একটু চড়া গলায় বলে—যাব বললেই যাওয়া যায়! তোর বউদির বোধ হয় একটা মিসহ্যাপ হয়ে গেল।

—কী?

—কনসিভ করেছিল। তিন মাস। কাল থেকে ব্লিডিং —

—ইস! কী করে হল? পড়েটড়ে যায়নি তো!

—না। কিছু বলেনি সেরকম। আজ নার্সিং হোমে ভরতি করে দিতে হল। এক সঙ্গে এত ঝামেলা যে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি। জলের মতো কিছু টাকা বেরিয়ে যাবে।

কেউ কথা বলল না। রণেনই আবার বলে—অজিত, জমিটার ব্যাপারে তুমি কি আর সময় দিতে পারো না?

অজিত উত্তর দেয় না। হাতের রনসন লাইটারটার দিকে চেয়ে থাকে। শীলা উৎকণ্ঠিত মুখ তুলে স্বামীকে দেখে।

—পারো না? রণেন আবার প্রশ্ন করে।

অজিত ভ্রূ কুঁচকে বিপরীত দেয়ালে কাঠের চৌখুপিতে রাখা হরেক পুতুলগুলো দেখে। প্রধানমন্ত্রী চুপ করেছেন। দূর থেকে সম্ভবত পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কণ্ঠস্বর আসতে থাকে। অজিত একটা শ্বাস ছেড়ে বলে—মুশকিল হল, লক্ষ্মণের এক পিসেমশাই প্লটটার ব্যাপারে জানেন। লক্ষ্মণও লিখেছিল যেন তার পিসেমশাইকে প্লটটা আমি বিক্রি করে দিই। উনি আট হাজার টাকা অফার দিয়েছিলেন। আমি লক্ষ্মণকে লিখি যে জমি অলরেডি বায়না হয়ে গেছে, কয়েক দিনের মধ্যেই রেজিস্ট্রি হয়ে যাবে। এদিকে সেই পিসেমশাই এখনও খোঁজখবর রাখছেন যদি বাই চান্স পার্টি পিছিয়ে যায়, তবে উনিই কিনবেন। ব্যাপারটা ঝুলিয়ে রাখা খুবই দৃষ্টিকটু হবে। লক্ষ্মণ কোনও প্রশ্ন তুলবে না, কিন্তু মনে মনে অবাক হবে। তার খুবই ইচ্ছে ছিল পিসেমশাইকে প্লটটা বিক্রি করি।

শীলা ভ্রূ কুঁচকে বলে—তোমার তো খুব বন্ধু সে। তাকে একটু বুঝিয়ে লিখে দাও না।

—বোঝাবার কী আছে! সে তো তাগাদা দেয়নি। তাগাদা যা আমারই। তা ছাড়া ওই পিসেমশাই ভদ্রলোক রিটায়ার করে সামান্য কিছু টাকা পেয়েছেন। কলকাতায় ওই টাকায় জমি পাওয়া যে কী মুশকিল, তাই ভদ্রলোক খুব আশায় আশায় এসেছিলেন লক্ষ্মণের জমিটার জন্য। তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছি জমি বিক্রি হয়ে গেছে বলে। লক্ষ্মণকে আমি এখন কী লিখব?

—একটু সময় চাও।

অজিত অদ্ভুত চোখে শীলাকে দেখে। বলে—চাইব কেন? সে তো আমায় সময় বেঁধে দেয়নি। জমি বিক্রির টাকারও তার দরকার নেই। টাকাটা তার অ্যাকাউন্টে কলকাতার এক ব্যাঙ্কে জমা পড়বে। প্রবলেম তো সেখানে নয়।

—তা হলে আর প্রবলেম কী? তুমি চুপচাপ থাকো জমির ব্যাপারে। বাবা সুস্থ না হয়ে এলে তো রেজিস্ট্রি হবে না।

রণেন ম্লানমুখে বলে—শোনো অজিত, বাবা বুড়ো হয়েছেন, তাঁর অসুখকে বিশ্বাস নেই, গুরুতর কিছু হলে—বলে একটু চুপ করে থাকে রণেন। শীলা তার মুখের দিকে চেয়ে আছে, অজিতও। রণেন চোখটা নামায়, বলে—কাজেই তাঁর ভরসায় থাকাটা এবং তোমাকেও অসুবিধেয় ফেলাটা ঠিক নয়। আমি অন্য একটা ব্যাপার ভাবছি।

—বলো। অজিত নিস্পৃহ গলায় বলে।

—ধরো যদি টাকাটা আমিই জোগাড় করে দিই তা হলে কেমন হয়?

অজিত একটু বিস্মিত হয়ে বলে—তুমি দেবে? তা হলে এতদিন ওল্ডম্যানের ভরসায় ছিলে কেন?

—সেটা মার আইডিয়া। মার ধারণা বাবার টাকা বারোভূতে লুটে খাবে, তাই বাবার কিছু টাকা ছেলেদের জন্য আদায় করে দিতে চেয়েছিল মা। সেটা যখন আপাতত হচ্ছে না তখন জমিটা কেন হাতছাড়া হয়! বীণার সঙ্গে আমি পরামর্শ করেছি, সে তার কিছু গয়না দেবে, আমিও প্রভিডেন্ড ফান্ড থেকে লোন নিচ্ছি, আরও কিছু জোগাড় করেছি। সব মিলিয়ে জমির দামটা হয়ে যাবে।

শীলা তার বড় বড় চোখ পরিপূর্ণ মেলে রণেনকে দেখছিল। হঠাৎ বলল—জমিটা তা হলে কার নামে কেনা হবে?

রণেন তৎক্ষণাৎ চোখ সরিয়ে নেয়। বলে—সেটা এখনও ঠিক করিনি! তবে, মার ইচ্ছে, আমার নামে হোক।

—তোর কী মত?

রণেন একটু ইতস্তত করে বলে—বীণার গয়নার অংশটাই বড়। মেজর টাকাটা ও-ই দিচ্ছে যখন, প্লটটা তখন ওর নামেই কেনা হোক। নইলে ওর বাপের বাড়ির লোকেদের চোখে ব্যাপারটা ভাল দেখাবে না।

শীলা একটা নিঃশ্বাস ফেলে উঠে যায়।

রণেন মুখ তোলে।

—অজিত!

—বলো।

—আমি দিন-সাতেকের মধ্যেই পেমেন্ট করব।

—ভাল।

—তা হলে উঠি!

—বোসো। শীলা তোমার চা করতে গেল।

রণেন বসে। কিন্তু তার মুখচোখে একটা রক্তাভা ফুটে থাকে। সে যে স্বস্তি বোধ করছে না, তা বোঝা যায়। অজিত চেয়ে থাকে। একসময়ে রণেনও তার বন্ধু ছিল, বেশি বয়সের বন্ধু। সেই সূত্রেই ওর বোনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল অজিতের। কিন্তু লক্ষ্মণ যেমন বন্ধু তেমন বন্ধু রণেন নয়। এখন ওর দিকে চেয়ে একটু মায়া হয় অজিতের।

রাতে শুয়ে শীলা বলল—শুনছ?

—কী?

—বউদির নামে জমিটা দিও না। আমি অনেক ভাবলাম সারা সন্ধ্যা।

—কী ভাবলে?

—দাদা নানা ছুতোয় ইচ্ছে করেই বউদির নামে প্লটটা কিনছে।

—কিনুক না!

—তুমি কিছু বোঝে না। বউদির নামে বাড়ি হলে সেখানে সোমেন বা মার দাবি-দাওয়া থাকে না। আমরাও সেখানে বাপের বাড়ি বলে মাথা উঁচু করে যেতে পারব না। তুমি ওকে বেচো না।

অজিত সামান্য উষ্মার সঙ্গে বলে—সেটা রণেন থাকতে-থাকতেই বলতে পারতে। ওকে কথা দিয়ে দিলাম, তা ছাড়া ও বউয়ের গয়নাটয়নাও বেচেছে বলল।

—ছাই। বউদি গয়না বেচতে দেওয়ার লোক কিনা! তা ছাড়া সবাই জানে দাদা দ'হাতে পয়সা রোজগার করছে। বিয়ের পর থেকেই ও যথেষ্ট পালটে গেছে। তোল্লা ঘুষ খায়। দশ-বিশ হাজার টাকার জন্য ওকে বউদির গয়না বেচতে হবে না। যদি বেচে তো সে লোক দেখানোর জন্য।

অজিত অন্ধকারে একটু হাসল। বলল—আমার কাছে সবাই সমান। পিসেমশাই কিনুক, কী রণেনের বউ কিনুক, কী শাশুড়িই কিনুক—আমার কিছু যায় আসে না।

শীলা ঝংকার দিয়ে বলে—কিন্তু আমার যায় আসে। তুমি দাদাকে বেচতে পারবে না।

—তা হলে কী করব?

—আমি কিনব। শীলা বলে।

—তুমি? তুমি কিনে কী করবে?

—ফেলে রাখব। যেদিন বাবা টাকা দিতে পারবেন সেদিন ছেড়ে দেব।

—তা হয় না।

—কেন?

—বড্ড দৃষ্টিকটু দেখায়। লক্ষ্মণ কী ভাববে? তা ছাড়া রণেন আর তার বউও চটে যাবে, মুখ দেখাদেখি বন্ধ করে দেবে।

শীলা চুপ করে থাকে। ভাবে। বলে—তাহলে লক্ষ্মণবাবুর পিসেমশাইকেই বিক্রি করে দাও।

একটু স্তব্ধ থেকে অজিত বলে—রণেন কি তোমার শত্রু? সে কিনলেও জমিটা তোমার বাপের বাড়ির হাতেই থাকল।

শীলা একটু শ্বাস ফেলে বলে—পুরুষমানুষ তুমি, তোমাদের মন একরকম। মেয়েদের মনই কেবল কু-ডাক ডাকে।

—রণেনকে অত অবিশ্বাস কেন? সংসারটা তো এতকাল সে-ই টানছে। টানবেও। ছেলে হিসেবে রণেন তার সব কর্তব্যই করেছে। তোমার বাবা যখন টাকা তুলতে আসতে পারছেন না, অনিশ্চিত অবস্থায় জমিটা হাতছাড়া না করে রণেন যদি কেনেই তো তাতে দোষ কী! বউয়ের নামে কিনলেও দোষ নেই। নিজের বাড়ি বলে সে যে মা-ভাইকে বের করে দেবে, এমন তো মনে হয় না।

শীলা চুপ করে থাকে। কিছু বলার মতো যুক্তি খুঁজে পায় না বোধ হয়। এক সময়ে বলে—বাবার যে কেন এসময়ে অসুখ করল! চলো না একদিন বাবাকে দেখে আসি।

—তোমার বাবা আমাকে পছন্দ করেন না, জানোই তো!

—কাকেই বা করেন! বাবার ভালবাসা আমরাই পাইনি, যা একটু দাদা পেয়েছে। মার জীবনটা যে কীভাবে কাটল!

অনেকক্ষণ স্তব্ধ থাকে শীলা। তারপর অজিত টের পায়, শীলা ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

ভীষণ অসহায় বোধ করে অজিত। কান্নাকাটি তার সহ্য হয় না। উঠে একহাতে শীলাকে নিজের দিকে পাশ ফেরাবার চেষ্টা করতে করতে বলে—আচ্ছা বোকা তো! কাঁদো কেন? না হয় যাব শ্বশুরমশাইকে দেখতে, রণেনকেও না হয় প্লটটা না বেচলাম।

শীলা তবু কাঁদে। সাধাসাধি করে করে ক্লান্ত হয়ে গেল অজিত। ঘুমও হবে না। অগত্যা উঠে একটা ডানহিল ধরায়।

সেই শব্দে শীলা হঠাৎ ফোঁপানি বন্ধ করে বলে—তুমি চলে গেলে কেন? ভিতরে এস।

—যাচ্ছি। সিগারেটটা খেয়ে নিই।

—না। সিগারেট নেবাও।

—আঃ, একটু অপেক্ষা করো না।

—না, এক্ষুনি ভিতরে এস।

অজিত শ্বাস ফেলে বলে—কখন যে কী মনে হয় তোমার! একখানা হাত টেনে নেয় বুকের ওপর। অজিত আন্দাজে বালিশের তোয়ালে তুলে শীলার চোখ-মুখ মুছে দেয়। বলে—কেন কাঁদলে? বাবার জন্য, নাকি রণেন জমি বউয়ের নামে কিনছে বলে?

—ওসব কারণ নয়।

—তবে?

শীলা চুপ করে থেকে বলে—আমি একটা জিনিস টের পাই আজকাল।

—কী?

—তুমি আমাকে ভালবাস না।

॥ নয় ॥

খুব ভোরেই ঘুম ভাঙল রণেনের। বিছানা আজ ফাঁকা। শুধু বড় ছেলেটা একধারে কেৎরে লেপের তলায় শুয়ে আছে। মেয়ে আর ছোট ছেলে তাদের ঠাকুমার কোল কাড়াকাড়ি করে শুয়েছে, ওঘরে। বড় ছেলেটার মাথায় একটোকা চুল, মস্ত মাথাটা জেগে আছে লেপের ওপরে, মুখ নাক ঢাকা। বীণা আজ পাঁচদিন নার্সিং হোমে।

বুবাইয়ের মুখ থেকে লেপটা সাবধানে সরিয়ে দিল রণেন। ভারী হালকা আর ফুরফুরে আছে মনটা। সকাল থেকেই যে গাম্ভীর্য তাকে চেপে ধরে সেটা কদিন হল একদম নেই। বীণা নার্সিং হোমে যাবার পর থেকেই নেই। অন্যদিন লেপ ছেড়ে উঠতে কষ্ট হয়। আজ হল না। শিস দেওয়া তার আসে না। ছেলেবেলা থেকে অনেক চেষ্টা করে দেখেছে, ঠোঁট ছুঁচোল করে নানা কায়দায় বাতাস ছেড়েছে, বড় জোর একটা কুঁই কুঁই আওয়াজ তুলতে পারে। তবু মন খুশি থাকলে রণেন আড়ালে শিস দেয়। অর্থাৎ ওই আওয়াজটা বের করে। আওয়াজটা একটানা হয় না, বাতাসটা বেরিয়ে যাওয়ার পথে মাঝে মাঝে একটু কুঁই শব্দ তুলে তার মান রেখে যায় মাত্র।

এক কাকভোরে রণেন উঠে গায়ে হাতঅলা একটা উলিকটের গেঞ্জি পরল, লুঙ্গিটা ঝেড়ে পরতে পরতে ড্রেসিং-টেবিলটার সামনে এসে দাঁড়াল। নিজেকে দেখে তার খুব বেশি পছন্দ হল না। পেটটা বেশ বেড়ে গেছে, গলায় চর্বির গোটাকয়েক থাক। গাল দুটোও কি বেশ ভারী নয়? ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিজেকে দেখল সে। হাত ভাঁজ করে বাইসেপ টিপে দেখল গেঞ্জির ওপর দিয়েই।।

না, তেমন শক্ত হয় না আজকাল। অর্থাৎ অপরিহার্য মেদ জমছেই। লোকে বলে তার ব্যক্তিত্ব নেই। ব্যাপারটা সে ঠিক বোঝে না। চিরকালই সে কিছু ঢিলা-ঢালা রশি-আলগা মানুষ, একটু আয়েশি; টিপটপ থাকা তার আসে না। অনেক মানুষ যেমন কল-টেপা পুতুলের মতো ঘুম থেকে উঠে চট-জলদি হাতে নিখুঁত দাড়ি কামিয়ে, দাঁত মেজে, স্নান সেরে, এক্সিকিউটিভ-টি সেজে, ব্রেক-ফাস্ট টেবিলে গিয়ে বসে—তার সেরকম হবেও না কোনওদিন। ফুড-ইনস্পেকটরের বেলা এগারোটার পরে বেরোলেও ক্ষতি নেই, অঢেল আউটডোরে ঘোরা আছে তারপর। কিন্তু বীণা সেরকম পছন্দ করে না। বীণা যে কী চায়!

কিন্তু বীণা আপাতত নার্সিং হোমে। পেটের বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে গেল। তা যাক। রণেন সেটা নিয়ে খুব একটা ভাবে না। আপাতত সে ব্যক্তিত্ব কথাটা নিয়ে ভাবছিল। তার ব্যক্তিত্ব নেই এটা একটা চাউর ব্যাপার। আয়নায় সে তার ব্যক্তিত্বটা একটু খুঁটিয়ে দেখছিল। প্রথমে সে ছোট চোখে চাইল, তারপর বিস্ফারিত চোখে একবার মুখটা তোল্লা গভীর করল, একবার ছটাকী একটু হাসির বিজলি খেলিয়ে দেখল। বাঁধার এবং ডানধার থেকে দেখে অতঃপর সে ছোট হাত-আয়নাটা বড় আয়নার মুখে মুখে ফেলে নিজের সঠিক চেহারাটা লক্ষ করে। আয়নার উলটো ছায়া পড়ে আর একটা আয়নায় সেই উলটো ছায়াটাকে উলটে নিয়ে নিজের প্রকৃত চেহারাটা

দেখা যায়। কিন্তু দেখেটেখে খুব একটা প্রভাবিত হয় না সে। কিংবদন্তীর খানিকটা সত্যিই। চর্বিওলা তুম্বো গাল দুটো আর ছোট চোখে কি ব্যক্তিত্ব ফোটানো যায়! কিন্তু চার্চিলের ছিল, বিবেকানন্দের ছিল। দুনিয়ার বিস্তর মোটাসোটা মানুষের এখনও ব্যক্তিত্ব আছে। কিন্তু সে যখন রোগা ছিল তখনও ছিল না, সে যখন মোটা হয়েছে তখনও নেই।

নেই, কিন্তু তাতে ধৈর্য হারায় না সে। নিরিবিলিতে একা একখানা আয়না হাতের কাছে পেলে সে নিজের দিকে চেয়ে বিস্তর খোঁজে। এবং নিজেকে বিরল ধমকধামকও দেয়। কিন্তু লোকের সামনে সে গম্ভীর মানুষ, কথা কম, ভারী দায়িত্বশীল কাজের মানুষ।

সোমেন বা মা কেউ এখনও ওঠেনি। শিস দেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টাটা চালাতে চালাতে সে দাঁতটাঁত মেজে নিল, ইসবগুলের ভুষি খানিকটা জলে নেড়ে খেল। মোজা এবং একজোড়া ন্যাকড়ার জুতো পরে বেরিয়ে পড়ল। রোজই সে খানিক সকালে বেড়ায় আজকাল। বীণা তার মেদ কমানোর জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

দরজা ভেজিয়ে শিস দেওয়ার চেষ্টার অবিরল শ্বাসবায়ুর উদ্ভট শব্দটা করতে করতে সে নিচতলার সদর খুলে রাস্তায় পড়ল। ধারেকাছে পার্ক নেই। হাঁটতে হাঁটতে চলে এল যোধপুর পার্কে। ঝিলের ধারে অনেকটা ফাঁকা জমি পড়ে আছে। শোনা যাচ্ছে, একদিন এখানে পার্ক হবে। ফাঁকা জায়গায় পড়েই দ্রুতপায়ে চক্কর দিতে থাকে সে। লক্ষ করে, সে আজ বড্ড সকালেই চলে এসেছে। কাছেপিঠে কেউ নেই। শুধু দূরে দু-চারজন খাটালওলা লোটা হাতে ফাঁকা ঝিলপাড়ে যাচ্ছে প্রাকৃতিক কাজে। সে দ্রুত চারদিক দেখে নিয়ে লুঙ্গিটা কেচে নিয়ে ফটাস করে মালকোঁচার মতো এঁটে নিল। প্রকাণ্ড উরুত দুটো বেরিয়ে পড়েছে, উঁচু হয়ে আছে দাবনা। একটু লজ্জার ভাব ঝেড়ে ফেলে পাঁই পাঁই দৌড়োতে লাগল সে। মেদটা ঝরাতেই হবে। শরীর বা মনে একটা গভীর পরিবর্তন দরকার। রণেনের ঠিক রণেন হয়ে থাকতে ইচ্ছে করে না। হঠাৎ নিজের সব ভেঙেচুরে ফেলে হয়ে যেতে ইচ্ছে করে স্লিম ফিগারের একজন এক্সিকিউটিভ, কিংবা পারসোনালিটিঅলা ডাইরেকটর, কিংবা হেভি ফাঁটের একজন ডিপার্টমেন্টাল সেক্রেটারি। যাহোক কিছু একটা। শুধু ফুড ইনস্পেকটর রণেন লাহিড়ি বাদে।

দু-চক্কর ঘুরতেই জিব বেরিয়ে গেল। শুকনো টাকরায় লেগে জিবটা টকাস শব্দ করে। দু-চারজন বুড়োসুড়ো মানুষ রাস্তায় হাঁটছে, চেয়ে দেখছে তাকে, রণেন দাঁড়িয়ে লুঙ্গি নামায় প্রচণ্ড হাঁফাতে হাঁফাতে বুকে হাত চেপে হৃৎপিণ্ডকে সামাল দেয়—র' বাবা র'!

যতদূর সম্ভব গম্ভীর হয়ে বাসায় ঢুকল সে। বাচ্চাগুলো এখনও ওঠেনি। মা নার্সিং হোমে বলে ঠাকুমার প্রশ্রয় পায় বড্ড বেশি। বীণা থাকলে ঠিক এই শীতভোরে তুলে দিত, ঠকঠকিয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে দাঁতটাঁত মেজে সেগুলো পড়তে বসত এতক্ষণে। দেখে ভারী কষ্ট হয় রণেনের। ক'দিন ঘুমিয়ে নিক। বাচ্চাবেলায় শীতভভারের লেপঘুম যে কী আরামের! আহা, ঘুমোক।

সোমেন রান্নাঘরের চৌকাঠে বসে হাই তুলছে। চা ওর প্রাণ। মা আঁচলে চেপে চায়ের কেটলি নামাল গ্যাস-উনুন থেকে। রণেন সাধারণত নিজের ঘরে বসে চা খায়, একা। রান্নাঘরের দরজায় বসে চা-খাওয়া যে কী মৌজের তা বীণার রাজত্বে সে টেরই পায় না। সংসারের কর্তা সকলের সঙ্গে মেঝেয় বসে হুইহাট চা খাবে, কী গল্প করবে—তাতে ওজন কমে যায়। আজকাল বীণা নেই। সোমেনের পাশেই মেঝের ওপর থপাস করে বসে সে। আরামের একটা শব্দ তোলে—ওঃ ও! মাজাটায় একটা খচাং টের পায়। বুড়ো হাড়ে দৌড়টা ঠিক হজম

হয়নি। সোমেন তটস্থ হয়ে সরে জায়গা দেয়। মা কলকা ছাপের খদ্দরের চাদরের মোড়ক থেকে মাথা বের করে তাকে দেখে। সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বহীন একগাল হাসে রণেন। বলে—মেরে দিলাম একটা দৌড়।

সোমেন হাঁ করে তাকায়। মা বলে—কী বলছিস? কাকে মারলি?

রণেন ভারী আমুদে গলায় বলে—যোধপুর পার্কে বেড়াতে যাই তো রোজ, আজ দেখলাম ফাঁকা, কেউ নেই। লুঙ্গিটা কেঁচে নিয়ে মারলাম দৌড়। মাজাটা গেছে। ওঃ।

—ইস! ওসব দৌড়ঝাপ কি তোর সয়! মা দুঃখের গলায় বলে—তোর হচ্ছে আদুরে ধাত।

—ওই আদর দিয়ে দিয়েই তো খেয়েছ। এই বয়সে পোয়াতির মতো ভুঁড়ি, নাড়ুগোপাল নাড়ুগোপাল চেহারা! চা দাও তো।

মা একটা শ্বাস ফেলে বলে—আদর আর দিতে পারি কই? বউয়ের হাতে দিয়েছি, সে যা দিয়ে যা করে। আমাদের কি আর আদর দেওয়ার ক্ষমতা আছে।

কী কথার কী উত্তর! তবু গায়ে মাখে না রণেন। প্রায় চোদ্দো বছরের ছোট ভাইটার দিকে চায়। তারই ভাই, তবু চেহারায় প্রায় বিপরীত। লম্বা, রোগাটে, চোখা বুদ্ধিমানের চেহারা। অল্প বয়স, দাড়িকাড়িও ঠিকমতো কামায় না, নইলে ঠিকই বোঝা যায় যে ব্যক্তিত্বের চেহারা।

রণেন হঠাৎ বলে—বসে না থেকে আই এ এসটা দিয়ে দে না!

সোমেন অবাক হয়ে বলে—আই এ এস! আমি?

রণেন মাথা নাড়ে। বলে—আজকাল যেন কোথায় ট্রেনিং দেয়?

—ইউনিভার্সিটিতে।

—ভরতি হয়ে যা। আমি টাকা দেব। নিশ্চিত গলায় বলে রণেন।

সোমেন সামান্য হাসে, বলে—টাকাফাকার জন্য নয়। আমার ইচ্ছে করে না।

—কেন, ইচ্ছে করে না কেন?

—ওসব আমার হবে না। খামোখা চেষ্টা।

—দ্যাখ না। লেগে যেতে পারে। বলে খুব ভরসার হাসি হাসে রণেন। বহুকাল এমন সহজভাবে কথাবার্তা হয়নি তিনজনে। বীণা নার্সিং হোমে যাওয়ার পর থেকে হচ্ছে। ভাইয়ের দিকে একটু চেয়ে থাকে রণেন। ওই রকম তেইশ চব্বিশ বছর বয়সে তারও কি সোমেনের মতো চেহারা ছিল? অবিকল না হলেও ওরকমই অনেকটা ছিল সে। বহেরুর খামারবাড়িতে সে যেতটেত তখন। নয়নতারার সঙ্গে তখন তার একটা সম্পর্ক ছিল।

মনে পড়তেই ফুড়ুক ফুড়ুক একটু হেসে ফেলল সে, আপনমনেই। ব্যক্তিত্বের অভাব। হাসিটা চাপা উচিত ছিল। গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করে বলল—বহেরুর ওখানে কাকে কাকে দেখলি?

সোমেন বলে—কাকে দেখব? হাজারটা লোক, কাউকে আলাদা করে দেখার উপায় কী? তবে গন্ধ বিশ্বেস, দিগম্বর...

বিরক্ত হয়ে রণেন বলে—ওরা নয়।

—তবে?

—বহেরুর ছেলেপুলেদের কাকে দেখলি?

—চারটে ছেলের সঙ্গে আলাপ হল, আরও সব আছে। একটা মেয়েকে দেখলাম—বিন্দু, ডিভোর্সড।

—ডিভোর্সড আবার কী! ওরা ওইরকম, ছেড়ে চলে আসে, আবার বিয়েফিয়েও করে। আইনটাইন মানে না। আমি যখন যেতাম তখন নয়নতারা নামে একজন ছিল, সেও ওইরকম—

সোমেন মাথা নেড়ে বলে হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে একজন। আলাপ হয়নি। দূর থেকে আমাকে খুব দেখছিল।

রণেন আপনমনে হাসে। বহুকাল আগের কয়েকটা দিন মনে পড়ে। নয়নতারা খুব জমিয়েছিল তার সঙ্গে। বেশি কিছু নয় অবশ্য। এই একটু জড়িয়ে-উড়িয়ে ধরা। দু-চারটে চুমু, আনাড়ির কাজ সব। তবু ভোলা যায় না। সে সবের জন্য সে তার পৈতেয় পাওয়া একটা আংটি খুলে দিয়ে এসেছিল নয়নতারাকে। বাড়ি এসে একটা ছিনতাইয়ের গল্প বলেছিল। মা অনেকদিন আংটিটার কথা দুঃখ করে বলেছে। আংটিটা তার নামের দুটো আদ্য অক্ষর মিনা করা ছিল—আর এল। আংটিটা কি আজও আছে নয়নতারার আঙুলে, বা বাক্সে? ভারী বিহ্বল লাগছিল ভাবতে।

সুখের স্বপ্নটা ভেঙে হঠাৎ চমকে ওঠে রণেন। ভারী ভয়-ভয় করে হঠাৎ। আংটিটা কি এখনও রেখেছে নয়নতারা? সর্বনাশ ওই আংটি দিয়ে যে এখনও অনেক কিছু প্রমাণ করা যায়। রণেন মনে মনে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতে থাকে—অবশ্য, বেশি কিছু নয়, বেশি কিছু নয়। সবই আনাড়ির কাজ, ছেলেমানুষি... ইত্যাদি।

চায়ের সুঘ্রাণ এবং তাদের তিনজনের এই কাছাকাছি বসে থাকা—বেশ ভাল লাগছিল রণেনের। বলল—সোমেন, কাল তুই বরং নার্সিং হোমে যাস, বউদিকে দেখে আসিস। আমি বরং কাল একবার বাবাকে দেখতে যাই।

সোমেন বলল—তোমার যাওয়ার কী দরকার? আমিই বরং—

—না, না। কাল রবিবার আছে। আমিই যাব'খন। অনেককাল যাই না। বাবাকে দেখে আসি, বহেরুটাও গড়বড় করছে

মা বলে—বউমাকে আর কদিন রাখবি ওখানে?

—আছে থাক না। রণেন অন্যমনস্কভাবে বলে—বেশ তো আছে। বলেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে কথা উলটে বলে—ডাক্তার ঠিক এখনই ছাড়তে চাইছে না।

মা একটু অনুযোগ করে—ততাদের সবটাতেই বাড়াবাড়ি। হুট বলতে ডাক্তার। হুট বলতে নার্সিং হোম। মেয়েরাও কেমনধারা হয়ে গেল, সজ্ঞান অবস্থায় একটা পরপুরুষ ডাক্তার মেয়েদের শরীরে হাত দেবে এ কেমন কথা! পেটে বাচ্চা এলে দশবার চেক-আপ, লজ্জা হায়া কোথায় যে গেল। তুই নিয়ে আয় তো, কিছু হবে না।

সোমেন এসব শুনে উঠে পড়ে। রণেন হাসে। বলে—ডাক্তারই ছাড়তে চাইছে না যে!

—কেন? স্রাব বন্ধ হয়ে গেছে, অপারেশনও যখন দরকার নেই, তখন আর গুচ্ছের টাকা গুনবি কেন?

—অপারেশন! বলে একটু চোখ বড় করে চায় রণেন। বলে—একটা মাইনর অপারেশন দরকার ছিল বটে।

—তা না হয় সেটাই করিয়ে আন।

—পাগল হয়েছ? ওখানকার ডাক্তার হচ্ছে সাহা। এমনিতে ডাক্তার ভালই। কিন্তু দিনরাত কেবল খাওয়ার গল্প। অমন ইলিশ-ভক্ত তোক দুটো নেই। আমাকে প্রায়ই বলে—পদ্মার ইলিশ! ও আর উনুনে চড়াতে হয় না, একটু তেল-সরষেবাটা মেখে বগলে চেপে রাখুন, বগলের ভাপেই সেদ্ধ হয়ে যাবে—এত নরম সুখী মাছ! বলতে বলতে বুঝলে মা, ডাক্তারের চোখ দুখানা স্রেফ কবির চোখ হয়ে গেল। উদাস, অন্যমনস্ক। হাত থেকে স্টেথেসকোপের চাকতিটা পড়ে গেল ঠকাস করে, চশমা খুলে বুঝি চোখের জলও মুছল। সেই থেকে অপারেশনের নামে আমি ভয় পাই। রুগির শরীরে ছুরি বসিয়ে যদি লোকটার হঠাৎ ইলিশের কথা মনে পড়ে, যদি ওরকম অন্যমনস্ক আর উদাস হয়ে যায়, তা হলে তোমার বউমার কী হবে!

সোমেন যেতে যেতেও শেষটুকু শুনে হেসে ফেলে। মা স্মিতমুখ ফিরিয়ে নেয়।

বেলায় অফিস বেরনোর সময়ে রণেনের মাজার ব্যথাটা যেমন খচাং করল একবার জুতোর ফিতে বাঁধার সময়ে, তেমনি তার মনেও একটা খচাং খিঁচ ধরল হঠাৎ। সে যে বউয়ের নামে জমিটা কিনতে চেয়েছে এটা মা জানে না তো! নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য সে বেরোবার মুখে জিজ্ঞেস করল—ওরা কেউ এসেছিল নাকি মা?

—কারা?

—শীলা, কিংবা অজিত।

মা বিরক্তির শ্বাস ফেলে বলে—আসবে কী! সেখানেও আদেখলাপনার চূড়ান্ত।

—কেন?

—মেয়ের নাকি পেটে বাচ্চা এসেছে। ডাক্তার বলেছে পাঁচ মাস পর্যন্ত নড়াচড়া বারণ। জামাই ডানলোপিলোর কুশন কিনে তিনরাত মেয়েকে শুয়ে থাকার কড়া আইন করেছে। পাশের বাড়িতে ফোন করে জামাই জানিয়ে দিয়েছে, মেয়ে এখন আসবে না।

—ওঃ। বলে রণেন নিশ্চিন্তমনে বেরোয়। পাঁচ মাসের জন্য নিশ্চিন্ত।

কিন্তু বাসরাস্তার দিকে হাঁটতে হাঁটতে তার হঠাৎ মনে পড়ে—নিশ্চিন্ত! দূর বোকা! নিশ্চিন্ত কীসের? শীলা না এলে মাও তো যেতে পারে ওদের বাড়িতে!

সমস্যাটা ভেবে সে একটু থমকায়। তারপরই আবার দার্শনিক হয়ে যায়। জানবেই তো, একদিন তো জানবেই!

যেমন সুন্দরভাবে দিনটা শুরু হয়েছিল সেভাবে শেষ হল না।

কলকাতায় আজকাল ব্যাঙের ছাতার মতো নার্সিং হোম গজিয়ে উঠেছে। দোকানঘরের ওপরে, কারখানার পাশে, অফিসবাড়িতে সর্বত্রই নার্সিং হোম। ভাল ব্যাবসা। বীণাকে যে নার্সিং হোমে ভরতি করেছে রণেন সেটাও একটা এরকমই জায়গা। মধ্য কলকাতার জরাজীর্ণ বাড়িতে ঝকঝকে সাইনবোর্ড লাগানো। নীচের তলায় সামনের দিকে কাপড়ের দোকান, পিছনের দিকে এক আমুদে অবাঙালি পরিবারের বাস; দোতলায় নার্সিং হোম, তিনতলায় বোধ হয় কোনও পাইকারের গুদাম। নীচের তলায় সবসময়েই হয় রেডিয়ো, নয়তো স্টিরিও কিংবা পিয়ানো অ্যাকোর্ডিয়ান রেওয়াজের শব্দ হচ্ছে। ওপরতলায় কুলীদের মালপত্র সরানোর শব্দ। সামনের রাস্তাতেও কোনও নৈঃশব্দ্য নেই। ট্রাম এইখানে বাঁক নেয় বলে প্রচণ্ড ক্যাঁচকোচ শব্দ তোলে। লরির

হর্ন শোনা যায়। শীতের শুকনো বাতাসে পোড়া ডিজেল, ধুলো আর আবর্জনার গন্ধ আসে অবিরল। তবু নার্সিং হোম।

রক্ত বন্ধ হয়েছে। বীণাকে একটু ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে, তবু সামলে উঠেছে অনেকটা। রণেনকে দেখে একটু কর্কশ স্বরে বলল—টুবাইকে আজও আনলে না?

রণেনের মেজাজ ভাল নেই। ভিতরে নানারকমের অস্থিরতা। তবু মাথা ঠান্ডা রেখে বলল—কেমন করে আনব? আমি সোজা অফিস থেকে আসছি।

—অফিস থেকে আসছি, অফিস থেকে আসছি—রোজ এক কথা। বীণা মুখ ঘুরিয়ে নিল।

—ট্রামবাসের অবস্থা তো জানোই। বাসায় ফিরে টুবাইকে নিয়ে আসতে আসতে ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ হয়ে যেত।

বীণা ঝেঁঝে ওঠে—ভিজিটিং আওয়ার্স না হাতি! সারাদিন রাজ্যের লোক আসছে যাচ্ছে! পরশু এক ছুঁড়ি ভরতি হয়েছে, তার কাছে সারাদিনই দু-তিনটি ছোঁড়া আসছে, ফুল, ক্যাডবেরি, সিনেমার কাগজ দিয়ে যাচ্ছে, গুজগুজ ফুসফুস করছে—তারা আসছে কী করে? আর তোমার অফিসটাই বা কোন জেলখানা? সারাদিন তো টো-টো করে বেড়ানোই তোমার চাকরি! একটু আগে বেরিয়ে টুবাইকে নিয়ে আসতে পারলে না?

এরকম ভাষাতেই বীণা আজকাল কথা বলে। রণেন চুপ করে থাকে। আসলে রাগটা তার সোমেন আর মার ওপর গিয়ে পড়ে। পরশু থেকেই সোমেনকে বলছে বুবাই, টুবাই আর শানুকে নিয়ে একবার নার্সিং হোমে তাদের মাকে দেখিয়ে যেতে। ট্যাক্সি ভাড়াও কবুল করা ছিল। সোমেন, তেমন উৎসাহ দেখায়নি। মাও আপত্তি করেছে—মোটে তো তিনদিন হল গেছে, এর মধ্যে ছেলেমেয়েদের জন্য হেদিয়ে পড়ার কী! ওদের তো মায়ের জন্য কিছু আটকাচ্ছে না!

তা ঠিক। বীণাকে ছাড়াও ছেলেমেয়েদের কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। মা যক্ষীবুড়ির মতো সংসারের সব কিছু আগলে রেখেছে।

রণেন চুপ করে ছিল। বীণা মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করে—ডাক্তার কী বলল?

—আরও কয়েকদিন এখানে রাখতে বলছে।

—আরও কয়েকদিন রাখতে বলার মানে জানো? টাকা মারার ধান্ধা। আমি থাকব না। তুমি ট্যাক্সি ডাকো, আমি আজই চলে যাব।

—ডাক্তারের অমতে কি যাওয়া ঠিক হবে?

—হবে। আমি ভাল আছি। ছেলেমেয়ে না দেখে আমি থাকতে পারি না। এখানকার অখাদ্য খাবারও মুখে দিতে পারি না, দু'দিন প্রায় উপোস যাচ্ছে। তুমি ট্যাক্সি ডাকো।

—ব্লিডিংটা মোটে কালই বন্ধ হয়েছে, দুটো দিন থেকে যাও।

—না। বলে বীণা মাথা নাড়ল। তারপর অভিমানভরে বলল—আমার তো এমন কেউ আপনজন নেই যে বাড়ি থেকে রান্না করা খাবার দিয়ে যাবে রোজ। এখানে সকলের বাড়ি থেকে ভাত আসে, আমাকেই কেবল এদের হাতের অখাদ্য রান্না খেতে হচ্ছে।

রণেন একটা শ্বাস ফেলে বলে—পরশু নিয়ে যাব। কথা দিচ্ছি।

বীণা অবাক হয়ে বলে—পরশু? মাথা খারাপ! এই নরকে আর এক রাতও নয়। তুমি আমাকে এখানে রেখে কী করে নিশ্চিন্ত আছো? সুস্থ মানুষ এখানে অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমি আজই চলে যাব।

রণেন মলিন মুখে ওঠে।

ইলিশের কবি ডাক্তার সাহা গাঁইগুঁই করল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছেড়েও দিল।

ট্যাক্সিতে ওঠার পর, বীণার যেটুকু অসুস্থতা ছিল সেটুকুও ঝরে গেল। দিব্যি এলিয়ে বসে বাইরের দিকে চেয়ে রইল একটুক্ষণ, মুখ না ঘুরিয়েই বলল—অজিতবাবুর সঙ্গে কথা বলেছ?

—বলেছি।

—কী বলছে?

—কী আবার! ও তো রাজিই।

—শীলা কী বলল?

—কী বলবে?

—জমিটা আমার নামে কিনতে চাও শুনে কিছু বলল না?

—না। তবে আমি কাল একবার বাবার কাছে যাব।

বীণা মুখ চকিতে ঘুরিয়ে প্রশ্ন করে—কেন?

—বাবার শরীর খারাপ, একবার দেখে আসি।

—ও। বলে মুখ ফিরিয়ে নিল বীণা। তারপর একটু চুপ করে থেকে গলা আর একটু মৃদু, এবং আর একটু কঠিন করে বলল—শীলার কথায় হঠাৎ হুট করে বাবার কাছে যাওয়ার কথা বললে কেন?

রণেন এত সাংসারিক বুদ্ধি রাখে না। তর্কও তেমন আসে না তার। একটা শ্বাস ছেড়ে বলল—বাবা যদি কলকাতায় আসতে পারেন তবে জমিটা বাবার টাকাতেই কেনা হবে, মার নামে।

—তাই বাবাকে দেখতে যাচ্ছ?

—হ্যাঁ।

বীণা তার চোখে চোখ রেখে তেমনি কঠিন গলায় বলে—সেজন্যই আমাকে আরও দু-দিন নার্সিং হোমে ফেলে রাখতে চেয়েছিলে, যাতে আমি জানতে না পারি যে তুমি বাবার কাছে গেছ?

কথাটা ঠিক। বীণার বুদ্ধির প্রশংসাই করতে হয়। তবু রণেন একটু রেগে গেল। বলল—কেন, তোমাকে ভয় করে চলি নাকি! বাবার কাছে যাওয়াটা কি দোষের কিছু?

—তা বলিনি।

—তবে?

—যা খুশি করো, কিন্তু আমার কাছে লুকচ্ছ কেন?

রণেন উত্তেজিত হয়। মুখে কিছু বলতে পারে না, কিন্তু চঞ্চল হাতে একটা সিগারেট ধরায়। বীণা চেয়ে আছে মুখের দিকে, জবাব চাইছে।

রণেন গলা ঝেড়ে বলে—লুকোইনি। জমিটা মার নামে কেনা হবে বলে ঠিক হয়েছিল, এখন হঠাৎ তোমার নামে কেনা হলে খারাপ দেখায়।

—খারাপ লাগবে কেন? বাবা কলকাতায় আসতে পারছেন না, অজিতবাবুও জমি বিক্রির জন্য সময় দিচ্ছেন না। সেক্ষেত্রে জমিটা আমি তোমার টাকা দিয়ে কিনে নিতে বলেছি। তাতে দোষের কী? আর তোমার টাকা দিয়ে যদি কেনা হয় তবে মার নামে কেনা হবে কেন? যদি আমার নামে নাও কেনো, তুমি নিজের নামে কিনবে।

—তাতে মা খুশি হবে না। মা চেয়েছিল, আমাদের দুই ভাইয়ের নামে কেনা হোক, আমি বলেছিলাম, মার নামে কেনা হোক।

—সে হত যদি শ্বশুরমশাই টাকা দিতেন। তিনি যদি না দেন তবে অমন সস্তার সুন্দর জমি তো হাতছাড়া করা যায় না!

—মার ইচ্ছে দুই ভাইয়ের অংশীদারি থাক।

বীণা অত্যন্ত বিদ্যুৎগর্ভ একটু হেসে বলে—তার মানে মা তোমাকে বিশ্বাস করেন না। তাঁর ধারণা, সোমেনকে তুমি আলাদা করে দেবে।

রণেন সেটা জানে। তাই উত্তর দেয় না।

বীণা বলল—একটা কথা বলি। যদি শ্বশুরমশাই শেষ পর্যন্ত টাকা দেন আর জমিটা যদি মা কিংবা তোমাদের দুই ভাইয়ের নামেই কেনা হয়, তা হলেই বা বাড়ি করার টাকা দিচ্ছে কে? ওই দশ হাজারে জমির দাম দিয়ে যা থাকবে তাতে তো ভিতটাও গাঁথা হবে না। যেমন-তেমন বাড়ি করতেও ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকার ধাক্কা। জমি যদি মায়ের নামে হয়। বাড়িও তাঁর নামেই হবে, ভাগীদার তোমরা দুই ভাই। বাড়ির টাকার অর্ধেক তা হলে হয় মার দেওয়া উচিত, নইলে দেওয়া উচিত সোমেনের। তারা কি দেবে?

—কোত্থেকে দেবে?

—তা হলে তোমাকেই দিতে হয়। তুমি যদি বাড়ি তৈরির পুরো খরচ দাও তা হলেও পুরোটা কোনওদিন ভোগ করতে পারবে না। অর্ধেক দাবি সোমেনের। তা হলে ওই ভাগের জমিতে তুমি বাড়ি করার খরচ দেবে কেন?

রণেন যুক্তিটা বোঝে। কিন্তু মানতে চায় না। তার মাথায়, বোধ বুদ্ধিতে কেবলই একটা কথা খেলা করে যে, এই যুক্তিতে একটা মস্ত বড় অন্যায় রয়ে গেছে। কিন্তু সেটা ঠিক ধরতে পারে না রণেন। কিছু বলতেও পারে না। কিন্তু ছটফট করে। বীণা আর কয়েকদিন নার্সিং হোমে থাকলে সে ঠিকই অন্যায়টা বুঝতে পারত।

বাড়িতে ঢুকবার আগে রণেন তার কষ্টকর গাম্ভীর্যের মুখোশটা মুখে এঁটে দিল আবার।

॥ দশ ॥

ট্যাক্সি থেকে নেমে বীণা একবারও পিছু ফিরে না চেয়ে বাসার সদরে ঢুকল এবং সিঁড়ি বেয়ে উঠবার চেষ্টা করতে লাগল। একটু থেমে থেমে, রেলিঙে ভর রেখে, খুব ধীরে ধীরে উঠছিল সে। পিছনে রণেন, তার এক হাতে ফোলিও ব্যাগ, অন্য হাতে প্লাস্টিকের ঝোলায় বীণার জিনিসপত্র। দুটো ব্যাগ একহাতে নিয়ে অন্য হাতটা বাড়িয়ে বীণার হাত ধরল সে, সাহায্য করতে চেষ্টা করল। বীণা হাতটা ঝাঁকিয়ে তিব্র স্বরে বলে—আঃ, ছাড়ো! লাগছে!

লাগার মতো জোরে ধরেনি রণেন, তবু অপ্রস্তুত হয়ে ছেড়ে দিয়ে বলে—একা উঠতে পারবে? কষ্ট হচ্ছে তো!

—হোক। অনেক উপকার করেছ, আর করতে হবে না। বীণা বলে।

ট্যাক্সিতে শেষ দিকে তাদের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বীণা চুপচাপ বাইরের দিকে চেয়ে বসেছিল। রণেনকে দরকার মতো উপেক্ষা করার একটা নিজস্ব ভঙ্গি আছে বীণার। মুখটায় একটু দুঃখী ভাব করে ছলছলে চোখে অন্যদিকে চেয়ে থাকে। মনে হয় বুঝি অভিমান। তা নয়! তখন সেই অভিমান ভাঙতে গেলেই অনর্থ ঘটে। ভঙ্গিটা দেখেই রণেন মনে মনে বিপদের গন্ধ পেয়েছিল তখনই।

থেমে থেমে অনেকক্ষণ ধরে সিঁড়ি ভাঙে বীণা। মাঝে মাঝে কাতর ব্যথা-বেদনার শব্দ করে—উঃ বাবা! রণেন ধৈর্য ধরে পিছনে অপেক্ষা করে। বীণাকে ধরে তুলবে তার উপায় নেই। ছুঁতে গেলেই ও নির্দয় অপমান করবে।

দরজা খুলে ননীবালা অবাক হয়ে বলেন—চলে এলে?

বীণা উত্তর দিল না। দরজার চৌকাঠে হাতের ভর রেখে দাঁড়াল একটু। ননীবালা সরে গিয়ে বলেন—ঘরে এস।

বাচ্চারা ঠাকুমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। টুবাই মাকে দেখে ভারী খুশি হয়ে 'মা' বলে চিৎকার করে দু'কদম এগিয়ে গিয়েছিল, ননীবালা তাকে টেনে রেখে বলেন—ছুঁস না, অশৌচ। তারপর রণেনের দিকে চেয়ে বলেন—বউমাকে ঘরে নিয়ে আয়। আমি গরম জল করে দিচ্ছি, তুই স্নান করে ফেলিস।

বীণা কোনও কথা না বলে তার ঘরে চলে গেল, আর ঠাস করে ভিতর থেকে বন্ধ করে দিল দরজা। অপ্রস্তুত অবস্থা। ননীবালা অপমানটা হজম করতে পারছিলেন না। ছেলের দিকে চেয়ে বলেন—কি জানি বাবা, আমরা তো এ অবস্থায় আঁতুড়-অশৌচ দুই-ই মানি। এতে রাগের কথা কী হল?

রণেন ব্যাগট্যাগ বাইরের ঘরের টেবিলেই রাখে। জামাকাপড় ছাড়তে পারে না, কারণ ঘরের দরজা বন্ধ। অগত্যা একটা গামছা জড়িয়ে সোফা-কাম-বেডটার ওপর বসে থাকে। ননীবালা চা করতে করতে রান্নাঘর থেকে ডেকে বলেন—বউমাকে জিজ্ঞেস কর তো চা খাবে নাকি!

রণেন অবশ্য সে চেষ্টা করে না। তখন বুবাই উদ্যোগী হয়ে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দেয়—মা, ও মা, চা খাবে? ঠানু জিজ্ঞেস করছে! মা, ও মা, খাবে? খাবে না?

বাচ্চাদের যা স্বভাব, মা দরজা খুলছে না, মা দরজা খুলছে না, কাজেই বুবাই ক্রমান্বয়ে দরজা ধাক্কায়, আর ডাকে। তার সঙ্গে জুটে যায় টুবাই আর শানুও। তিনজনে তুলকালাম করাঘাত করে দরজায়। তারস্বরে ডাকে। টুবাই দৌড়ে এসে বাপকে বড় বড় চোখ করে বলে যায়—দরজা খুলছে না, মা অজ্ঞান হয়ে গেছে। গত লক্ষ্মীপুজোয় সারাদিন উপোসের পর ভোগ-টোগ বেঁধে, পিত্ত আর অম্বলে কাহিল হয়ে ননীবালা অজ্ঞান হয়ে যান। সেই অভিজ্ঞতা থেকে টুবাইয়ের ধারণা, কেউ বন্ধ ঘর থেকে সাড়া না দিলে, বা ঘুমন্ত অবস্থা থেকে সহজে চোখ না মেললে সে নিশ্চয়ই অজ্ঞান হয়ে গেছে।

তিনজনের ওই ধাক্কাধাক্কি আর ডাকাডাকির বাড়াবাড়ি দেখে ননীবালা উঠে এসে ধমকান—ও-রকম করিস না, মেজাজ ভাল নেই, উঠে আবার মারধর করবে।

ঠিক তখনই বীণা দরজা খোলে। ক্লান্ত চেহারা, দরজাটা ধরে দাঁড়িয়ে, ডান হাতে পাখার ডাঁটটা তুলে এলোপাথাড়ি কয়েক ঘা কসায় বাচ্চাগুলোর মাথায়, গায়ে, শ্বাসের সঙ্গে চাপা চিৎকারে বলে—যাঃ যাঃ, আপদ কোথাকার। জন্মে কখনও শুনিনি পাঁচ মাসের আগে বাচ্চা নষ্ট হলে কেউ আঁতুড় বা অশৌচ মানে। আমার বেলা যত নিয়ম! যাঃ যাঃ, ছুঁবি না আমাকে, ধারেকাছেও আসবি না।

বীণার মূর্তি দেখে ননীবালার কথা জোগায় না। রণেন চায়ের কাপে চোখ রেখে বসে থাকে। বীণা দরজাটা বন্ধ করতে যাচ্ছিল, তখন ননীবালা বললেন—তা আমি কি জানি ক'মাস! আমাকে কি তোমরা কিছু বলো?

বীণা তীব্র চোখে বলে—পাঁচ মাসে পঞ্চামৃত হলে আপনি তা জানতে পারতেন না? কচি খুকি তো নন। ঢের বয়স হয়েছে।

রণেন বুঝতে পারে, মা একটা ভুল করেছে কোথাও। এ সব মেয়েলি ব্যাপার তার মাথায় ঢোকে না, কিন্তু এটুকু বুঝতে পারে হয় ননীবালা ভুল করে কিংবা ইচ্ছে করেই আঁতুড় আর অশৌচের কথাটা তুলেছেন। সম্ভবত ননীবালার ধারণা ছিল যে, বীণা একালের মেয়ে, এত সব খুঁটিনাটি সে জানে না। কিন্তু ইচ্ছে না ভুল তার বিচার হবে কী করে? সংসারের কত সত্য কথা কোনওদিনই জানা যায় না!

ননীবালা এক পরদা গলা নামিয়ে বলেন—অশৌচ না মানলেও হাসপাতালের ছোঁয়াটোয়া তো মানবে! না কি তাতেও দোষ?

তীব্র কণ্ঠে বীণা উত্তর দেয়—দোষ কিনা তা আপনিই জানেন! আমার বেলায় হাজার দোষ, হাজার নিয়মনিষ্ঠা। কিন্তু কারো দরদ তো দেখি না! নার্সিং হোমে বুবাইয়ের বাপ ছাড়া কেউ একদিন উকি দিয়েও দেখে আসেনি, এক বেলা কেউ ঘরের ভাত পৌঁছে দিয়ে আসেনি! আর দুর্বল শরীরে ঘরে পা দিতে না দিতেই আচার-বিচার শুরু হয়ে গেল!

রণেন এইটুকু শুনেছিল। চায়ের কাপ রেখে সে দ্রুত বাথরুমে গিয়ে ঢুকে পড়ে। ননীবালা গরম জল করে দেওয়ার সময় পাননি, কাজেই শীতে হিম হয়ে থাকা জল তুলে রণেন তার উত্তপ্ত মাথায় ঢালতে থাকে। স্নানের দরকার ছিল না। জলের শব্দে ঝগড়ার শব্দটা ডুবিয়ে দিল কেবল।

ননীবালা অবশ্য পিছিয়ে গিয়েছিলেন। ঝগড়াটা তাই বেশি দূর গড়ায়নি। স্নানটান করে এসে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে রণেন দেখে, বীণা মুখ ফিরিয়ে শুয়ে আছে, বুকের কাছে টুবাই। টুবাই ছোট, তার অপমান জ্ঞান

নেই, কিন্তু বড় দুজন মার খেয়ে ঠাকুমার ঘরে ঢুকে গেছে, সেখান থেকেই তাদের গলার শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল।

চুল পাট করতে করতে রণেন তার ব্যক্তিত্বের ঘাটতিঅলা মুখখানা দেখছিল। কিছু ব্যক্তিত্ব যদি এই মুখশ্রীতে থাকত তবে এই সংসারটাকে আঙুলের ডগার সঞ্চালনে শাসন করতে পারত সে। বাপের বড় ছেলে বোকা হয়—এটা একটা প্রচলিত কথা। তার নিজের ক্ষেত্রে কথাটার ব্যত্যয় হয়নি। সে বোকাই। এবং বোকা বলেই ব্যক্তিত্বহীন। এ সবই বুঝতে পারে রণেন। ব্রজগোপালের উপেক্ষিত সংসারটি সে টানছে আজ বহুদিন। বিনা প্রশ্নে এবং বিনা দ্বিধায়। মা-বাপ-ভাই মিলে এ সংসার তো তারই নিজস্ব সংসার ছিল এতকাল। শুধু সংসার নয়, এ ছিল তার অস্তিত্ব, তার বেঁচে থাকা। মায়ের জন্য মঠ-মন্দির গাড়ি-বাড়ি সবই সে করে দিতে চেয়েছিল মনে মনে, এতকাল। কোনও দ্বিধা ছিল না, সংশয় ছিল না। সকলে বলত—রণেনের মতো এমন মাতৃভক্তি দেখা যায় না। সেই ভক্তিটা এখন আর তেমন টের পায় না রণেন। সংসার টানতে আজকাল তার কষ্ট হয়। কত ব্যয়কে মনে হয় অপব্যয়। বাবার টাকায় মায়ের নামে কেনা জমিতে নিজের টাকায় বাড়ি করা যে কত বড় মূর্খতা তা অনায়াসে বুঝতে পারছে। তাই বীণার পরামর্শে চোরের মতো সে গিয়েছিল অজিতের কাছে, জমিটা বীণার নামে কেনার জন্য। সেই গ্লানিটাও তাকে চেপে ধরে। ব্যক্তিত্বহীনদের এই রকমই সব হয়। ভাল বা মন্দের বোধ নষ্ট হয়ে যায়। কী যে করবে, কী যে করা উচিত তা সে ভেবে পায় না।

অনেকক্ষণ বে-খেয়ালে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে সে। তার পুরনো স্বভাব। আয়না পেলে প্রায়ই তার বাহ্যজ্ঞান থাকে না।

বিরক্ত হয়ে বীণা বলল—আলোটা নিবিয়ে দাও, চোখে লাগছে।

অপ্রস্তুত হয়ে সে আলো নেবায়, আর অন্ধকারে বীণার বাঁকা গলার স্বরটা আসে—দিনরাত মুখ দেখা, তাও যদি দেখার মতো মুখ হত।

এ সবই উপেক্ষা করতে পারে রণেন। তার স্বভাব শান্ত, রেগে গেলেও সহজে প্রকাশ পায় না তার রাগ। কথা কম বলে। সে বীণাকে অন্ধকারে শুয়ে থাকতে দিয়ে বাইরের ঘরের সোফা-কাম-বেডটায় একটু কেতরে বসে থাকে। রেডিয়োটা চালিয়ে দেয়। খবর হচ্ছে। একটা যুদ্ধ-টুদ্ধ লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা। চারদিকে টেনশন, কিন্তু দেশের খবর তাকে বিন্দুমাত্র চিন্তান্বিত করে না। সে নিজেকে নিয়ে ভাবে। ভাবতে ভাবতে ঘুম-ভাব এসে যায়, রেডিয়োটা চলতেই থাকে।

হঠাৎ চমকে উঠে শোনে পুরুষ-হাতে রেডিয়োটা বন্ধ করে দিল বীণা। ঝাঁঝ-গলায় বলে—এই কপাল-কুষ্ঠিটা খুলে রেখে ঘুমচ্ছো কেন? ব্যাটারি নষ্ট হয় না!

রণেন চোখ চায়। বীণার ক্লান্তির ভাবটা কি কেটে গেল। ঘরের আসবাবপত্র টেনে টেনে সরাচ্ছে আর আপনমনে বলছে—কদিন ছিলাম না, নোংরার হদ্দ হয়ে আছে ঘরদোর। ঝুল-কালি-ধুলো, বিছানাপত্র গু হয়ে আছে...বলতে বলতে আবার ও ঘরে যায়, আলনা হাঁটকে জামা-কাপড় ছুঁড়ে ফেলে মেঝেয়—আন্ডারওয়্যার, গেঞ্জি কী কালেকুষ্ঠি হয়ে আছে! আমাকে আবার আচার-বিচার শেখাতে আসে সব। নোংরার হদ্দ, বস্তিবাড়িতে গিয়ে থাকা উচিত।

রণেন বুঝতে পারে, এসব কথা শোনানোর জন্যই তাকে জাগিয়ে নিয়েছে বীণা। এখন সে যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে। সহজে ছাড়বে না। বিষণ্ণ মনে রণেন বসে শোনে, বীণা ও-ঘরে ছেলেমেয়েদের ডেকে নিয়ে বলছে—কী সব চেহারা হয়েছে এ ক'দিনে। খাস না নাকি তোরা? হাড় জিরজির করছে! কনুইতে ময়লা,

ঘাড়ে ময়লা, চোখে পিচুটি, দাঁতে ছ্যাতলা—কেউ এসব দেখে না নাকি! এই শীতে গায়ে গরম জামাও কেউ পরায়নি!

ননীবালা গ্যাসের উনুনের সামনে বসে আছেন নিশ্চুপে। কিন্তু সেটা তাঁর পরাজয়-মেনে-নেওয়া মনে করলে ভুল হবে। মনে মনে তিনিও তৈরি হচ্ছেন, লেগে যাবে। রণেন উঠে বসল এবং বীণার উদ্দেশে একটা দুর্বল ধমক দিয়ে বলল—আঃ কী হচ্ছে! চুপ করে শুয়েটুয়ে থাকো না।

বীণা প্রায় ঝাঁপিয়ে আসে—কেন চুপ করে থাকব? এই ঘর-সংসারে আমি কি ফ্যালনা? আমার বলার কথা কিছু থাকতে পারে না?

—এই দুর্বল শরীরে অত চেঁচিও না। ডাক্তার তোমার ওঠা-হাঁটা বেশি বারণ করেছেন।

—থাক, অত দরদে কাজ নেই। মুখের দরদ অনেক দেখা আছে।

এইভাবে শুরু হয়েছিল। ননীবালা কেন যেন উত্তর দিচ্ছেন না। চুপচাপ আছেন। বীণা গনগন করে যেতে লাগল একা একা। দু-চার ঘা বাচ্চাদের মারধরও করল শোওয়ার ঘরে। বোঝা যায়, সে ননীবালাকে উত্তেজিত করে ঝগড়ায় নামাতে চাইছে। একটা হেস্ত-নেস্ত করাই তার উদ্দেশ্য। ক্রমে ক্রমে তার কথাবার্তায় মরিয়া ভাব ফুটে উঠতে লাগল, রণেন শুনতে পায় শোওয়ার ঘরের ভেজানো দরজার ওপাশে বীণা চাপা গলায় বলছে—পাগলের গুষ্ঠি। দ-পড়া কপাল না হলে কারও এরকম শ্বশুরবাড়ি হয়।

বহুকাল আগে রণেনের একবার কড়া ধাতের টাইফয়েড হয়েছিল। তখন টাইফয়েডের চিকিৎসা ছিল না। গ্রামে-গঞ্জে ডাক্তার-কবিরাজও ছিল না সুবিধের। প্রায় বাহান্ন দিনে তার জ্বর কমেছিল বটে, কিন্তু কিছুকাল তার বিকারের অবস্থা হয়েছিল। জ্বরের পরও প্রায় মাস তিনেক সে মস্তিষ্কবিকারে ভুগেছে। লোকে বলে টাইফয়েডের পর ওই পাগলামির সময়ে সে মা-বাপকে চিনতে পারত না, নিজের বাড়ি কোথায় বলতে পারত না। সেই পাগলামি সেরে যাওয়ার পর রণেন খুব ঠান্ডা আর ভালমানুষ হয়ে যায়। কিন্তু সে যে একদা পাগল হয়ে গিয়েছিল এই ঘটনাটা সে কোনওদিনই ভুলতে পারে না। মাঝে মাঝে তার মনে হয় পাগলামিটা ছাই চাপা হয়ে আছে তার অভ্যন্তরে। সেই কারণেই বোধ হয় আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে আজও এই বয়সেও সে নানা অঙ্গভঙ্গি করে, ব্যক্তিত্ব খোঁজে, ফাঁকা মাঠ পেলে ছেলেমানুষের মতো দু-চক্কর দৌড়ে নেয়, কিংবা একাবোকা অবস্থায় সে এরকম অনেক কিছুই করে। 'পাগল' কথাটা শুনলেই বরাবর একটু চমকে ওঠে। তার বুকের ভিতরে একটা ভয় যেন হনুমানের মতো এ-ডালে ও-ডালে লাফিয়ে বেড়ায়।

সে উঠে শোওয়ার ঘরের দরজার কাছে গিয়ে বলল—শোনো, এত অশান্তি কোরো না। যদি বাড়াবাড়ি করো, তা হলে আমি বেরিয়ে যাব।

বীণা টুবাইকে হাত-মুখ ধুইয়ে এনে গরম পোশাক পরাচ্ছিল হাঁটু গেড়ে বসে। মুখ না ফিরিয়েই বলে—তুমি বেরিয়ে যাবে বলে ভয় দেখাচ্ছ কাকে? তুমি কবে ঘরে থাকো, কতক্ষণই বা থাকো? ঘরের কোনও খবর কি তোমার কানে যায়? যেতে হয় যাও, আমাকে চোখ রাঙাতে এস না। আমি আর ও-সব গ্রাহ্য করি না।

অগত্যা বেরিয়েই গেল রণেন। শীতের রাস্তায় রাস্তায় খানিক হাঁটল। মাথাটা গরম। মোড়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেল। দু-চারজন চেনা পাড়ায় লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলল। সোমেন তার আড্ডা সেরে ফিরছিল। রাত হয়েছে। রণেনকে রাস্তায় দেখে সিগারেট লুকিয়ে নতমুখে পেরিয়ে যাচ্ছিল, রণেন তাকে ডাকল। এত রাত করে ফেরে, একটু শাসন করা দরকার। দিনকাল ভাল নয়।

—এত রাত করে ফিরিস কেন? লোকের চিন্তা হয় না?

সোমেন তার কমনীয় সুন্দর মুখটি তুলে হাসল। হাসিটি ভুবন-ভোলানো। রণেন শাসন করতে গিয়ে মুগ্ধ হয়ে যায়। সোমেন বলে—একটা পিকনিকে যাব কাল, তার সব জোগাড়যন্ত্র করছিলাম, তাই দেরি হয়ে গেল।

রণেন গলাখাঁকারি দেয়। ভাইটাকে সে কোনওদিনই কড়া কথা বলতে পারে না। বড্ড মায়াবী। আজকালকার এই বয়সের ছেলেদের যেমন ডোন্টপরোয়া ভাব তেমন নয়। তাই রণেন বলে—ও। গায়ে গরম জামা নেই কেন? ওই পাতলা সোয়েটারে কি শীত মানে? একটা পুল-ওভার কিনে নিস।

—তেমন শীত কই? আমার তো ঠান্ডা লাগেই না।

—পিকনিকে বাইরে যাচ্ছিস তো! সেখানে শীত লাগবে। বরং আমার কোটটা নিয়ে যাস।

—তোমারও তো কাল বাইরে যাওয়ার কথা। কোট তোমারও তো লাগবে!

বাইরে যাওয়ার কথা! তাই তো! গোলমালে খেয়াল ছিল না। বাবার কাছে কাল তার একবার যাওয়া উচিত। ওই অভিশপ্ত জমিটার হাত থেকে তো রেহাই নেই।

রণেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। বলল—হুঁ, আচ্ছা যা।

গোলমালটা বাঁধল রাত্রে।

খাওয়া-দাওয়ার পর দরজা দিয়েছে তারা। রণেন দেখল বীণা কাগজ জ্বেলে ঘরের মেঝেয় একবাটি দুধ গরম করছে।

—ও কী করছ? রণেন জিজ্ঞেস করে।

বীণা উত্তর দিল—দেখতেই পাচ্ছ।

—ঘরে কাগজ জ্বালছ কেন, রান্নাঘর থাকতে?

—রান্নাঘরে আমি যাব না, কারও শুচিবাইয়ে লাগতে পারে।

—মাকে বললে মা নিজেই গরম করে দিত। কী করবে দুধ দিয়ে এত রাতে?

বীণা উত্তর দিল না। দুধ গরম করে ঘুমন্ত টুবাইকে টেনেহিঁচড়ে আনল বিছানা থেকে। টুবাই ঘুমের মধ্যে কাঁদে, হাত পা ছোড়ে। তাকে গোটাকয় চড়-চাপড় দিয়ে, গলায় আঁচল চেপে ঝিনুকে দুধ খাওয়াতে থাকে বীমা।

একটু অবাক হয় রণেন। একটু আগে টুবাই দুধ-ভাত খেয়ে ঘুমিয়েছে। এখনই আবার খাওয়ার কথা নয়। বলল—একটু আগেই তো খেলো, এখন আবার খাওয়ানোর কী দরকার? কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে কষ্ট দেওয়া শুধু শুধু।

বীণা হঠাৎ দু'খানা ঝকঝকে চোখের ছোরা মারে রণেনকে। একটু ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে—কেন, টুবাই বেশি খাচ্ছে বলে চোখে লাগছে নাকি? লাগলে অমন চোখ কানা করে রাখো?

রণেন চুপ করে থাকে। বীণা নিজেই বলে—বাচ্চাদের খাওয়াই, এটাকে সকলেরই চোখ কেন যে কটকট করে!

রণেন একটু উত্তপ্ত হয়ে বলে—একে খাওয়ানো বলে না। এ হচ্ছে তোমার বাতিক। অত খাওয়া কি সহ্য হবে?

বীণা খুব অবাক চোখ তুলে বলে—দু'ঝিনুক দুধ বাচ্চারা খাবে না? এ কদিন ভাল করে দুধ গেছে নাকি পেটে? তোমরা পাগল না কি! 'অত খাওয়া' বলতে তুমি কী বোঝাতে চাও?

—বলছি, পেটে অত সইবে না।

—সে আমি বুঝব। পেটে কী সয় না সয় তা আমি মা হয়ে জানি না! তুমি জানবে?

—তোমার মাথায় ছিট-পড়া।

—তা হবে। পাগলদের সঙ্গে থাকলে লোকে পাগলই হয়।

রণেন শ্বাস ফেলে চুপ করে থাকে। কিন্তু বীণার আক্রোশ তাতে কমে না। সে বলে—পাগলের গুষ্ঠি। যেমন পাগল ছিল বাপ, বাউন্ডুলে হয়ে বেরিয়ে গেছে, তেমনি ছেলে পাগল।

হঠাৎ সেই পুরনো ক্ষতে হাত পড়ে। ঠান্ডা, ভালমানুষ রণেন একটা ঝাকুনি খেয়ে জেগে ওঠে যেন। হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে—চুপ করো বলছি!

বীণা চমকে ওঠে। টুবাই বিষম খায়। দুধ গড়িয়ে নামে গাল বেয়ে। বীণা তার শান্তস্বভাব, উত্তাপহীন স্বামিটিকে হঠাৎ উত্তেজিত হতে দেখে একটু অবাক হয়। তাকায়। এবং তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরে যায় সে তার স্বামীর একটি অতিশয় দুর্বলতার স্থান খুঁজে পেয়েছে। এতকাল এই দুর্বলতার কথা তার জানা ছিল না। মানুষ আর একটা মানুষের কত কিছু জানতে পারে না, কাছাকাছি থেকেও।

মেয়েদের নিষ্ঠুরতার বুঝি শেষ নেই। যে মুহূর্তে বীণা বুঝতে পারে যে 'পাগল' কথাটাই রণেনকে উত্তেজিত করেছে সেই মুহূর্তেই সে দুর্বল জায়গাটায় প্রবল নাড়া দিতে থাকে। এবং খেলাটা বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। বীণা বলে—কেন, চুপ করব কেন? তোমাদের মধ্যে পাগলামির বীজ নেই? তোমার বাবাকে লোকে পাগল বলে না? তোমারও ছেলেবেলায় অসুখের পর একবার পাগলামি দেখা দেয়নি? আমি কি ভুল বলছি? যা সত্যি তা বলব না কেন?

ঠান্ডা এবং শান্তস্বভাবের রণেনের ভিতরে সেই হনুমানের হাঁচোড় পাঁচোড় তার ভিতরটাকে নয়-ছয় করে দেয়, রাগে চিন্তাশক্তি লুপ্ত হয়ে যায়। সে বুঝতে পারে বীণা তাকে পাগল করে দিতে চাইছে। তার মনে নিভৃতে লুকিয়ে রাখা বড় গোপন ও লজ্জার স্থানটিতে এই প্রথম হানা দেয় মানুষ। সে মাথা চেপে ধরে। সে আর একবার চেঁচায়, কিন্তু কোনও কথা ফোটে না, একটা জান্তব আওয়াজ বেরিয়ে আসে। এবং সেই মুহূর্তে তার মনের যাবতীয় মানবিক চিন্তাশক্তি লুপ্ত হয়ে যায়।

বীণা তার দিকে আঙুল তুলে বলে—তুমি পাগল নও? আগে এসব জানলে তোমার সঙ্গে বাবা আমার বিয়ে দিত? পাগলের বংশে কেউ জেনেশুনে মেয়ে দেয়?

রণেন মশারি সরিয়ে বিছানার ধারে বসে সিগারেট খাচ্ছিল। সিগারেটটা পড়ে গেল। শূন্য এবং ভয়ার্ত চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে রণেন। এখন থেকে এই মেয়েমানুষটার চেয়ে বড় শত্রু তার আর কেউ নেই। ওই ভঙ্গি থেকেই সে হঠাৎ পা বাড়িয়ে লাথিটা কষাল বীণার বুকে। টুবাই ছিটকে গিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে বসে। বীণা পড়ে গিয়ে ফের উঠতে যাচ্ছিল। রণেন ঝুঁকে তার চুলের মুঠি চেপে ধরে তাকে হেঁচড়ে তোলে, অস্ফুট গলায় বলে—হারামজাদি, আমাকে জামাই পেয়ে তোর চোদ্দোপুরুষ উদ্ধার হয়ে গেছে...বলতে বলতে সে তার ডান হাতে গোটাকয় প্রচণ্ড চড় মারে বীণার গালে। দেয়ালের কাছে নিয়ে মাথা ঠুকে দেয়, মুখ ঘষে দেয় দেয়ালে, আর বলে—পাগল! পাগল! বল, বল, পাগল? পাগল...

বদ্ধ দরজায় তখন প্রবল ধাক্কা দিয়ে বাইরে থেকে সোমেন চিৎকার করছে—দাদা, দাদা, কী করছ কী! দাদা, দরজা খোলো! মায়ের চিৎকারও কানে আসে রণেনের।

মা বলে—সর্বনাশ করিস না, ওরে সর্বনাশ করিস না!

ছেলেমেয়েরা ঘুম ভেঙে প্রথমটায় চিৎকার করে উঠেছিল। রণেন তার ক্ষ্যাপা চোখে তাদের দিকে চাইতেই তারা নিথর হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ বাদে দরজা খুলেছিল রণেন। তখন বীণা মেঝেয় পড়ে আছে বটে, কিন্তু জ্ঞান হারায়নি। কেবল বড় বড় শ্বাস টানছিল। সোমেন গিয়ে বউদিকে ওঠায়, মা ধরে রণেনকে। রণেন ননীবালার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে সোফায় বসে। সিগারেট ধরায়। জীবনে সম্পূর্ণ এক নতুন অভিজ্ঞতায় তার মনটা তখন অস্পষ্ট। আচ্ছন্ন। এই প্রথম সে মেয়েছেলের গায়ে হাত তুলল।

ঘরে সে আর যায়নি। সোমেন আর মা যা করার করেছিল রাতে। সম্পূর্ণ ভূতগ্রস্তের মতো সোফায় বসে রইল রণেন। ননীবালা এসে এক সময়ে বললেন—ঘরে যা রণো।

রণেন মাথা নাড়ল। সোমেন মাকে টেনে নিয়ে গেল ঘরে।

সারা রাত পরিত্যক্ত এবং আচ্ছন্ন রণেন বসে রইল সোফায়। মশার কামড় খেল, টের পেল না তেমন। সিগারেট খেল অনেক। মাথার ভিতর দিয়ে কত চিন্তার ঘূর্ণি বয়ে গেল।

মা বাবার কত ঝগড়া হয়েছে, কত আকথা কুকথা মা বলেছে বাবাকে। বাবা কোনওদিন হাত তোলেননি। স্ত্রীলোকের জন্য একটা আলাদা সম্মানবোধ ব্রজগোপালের বরাবর। এখনকার দিনে যখন আর ট্রামেবাসে পুরুষরা মেয়েদের বসার জায়গা ছেড়ে দেয় না, লেডিস সিটে জায়গা না থাকলে মেয়েরা যখন দাঁড়িয়েই যায় তখনও ব্রজগোপাল নিজের সিটটি ছেড়ে দেন। স্ত্রীলোকরা দাঁড়িয়ে থাকবেন আর আমি পুরুষ হয়ে বসে থাকব—বাবার পৌরুষে সেটা আজও লাগে। এখনও অনাত্মীয়া, অপরিচিতা মেয়েছেলের মুখের দিকে ব্রজগোপাল তাকান না, স্পর্শ বাঁচিয়ে চলেন, অধিকাংশ মেয়েকেই সম্বোধন করেন 'মা' বলে।

রণেনের মন তিক্ততা আর আত্মগ্লানিতে ভরে যায়। সারা রাত ধরে সে কত কী ভাবে। ভোরবেলা কেউ জেগে ওঠার আগেই সে পোশাক পরে বেরিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ এলোমেলো ঘুরে বেড়ায়। গড়ের মাঠের কাছে ট্রাম থেকে নেমে কুয়াশায় আচ্ছন্ন মাঠঘাটের সবুজ সৌন্দর্য দেখে। দেখতে দেখতে এক সময়ে বহেরুর খামারবাড়িটার কথা মনে পড়ে যায়। নির্বাসিত, বৃদ্ধ ব্রজগোপালকে মনশ্চক্ষে সে দেখতে পায়। নাতিদীর্ঘ সচ্চরিত্র একজন বাতিল মানুষ। হঠাৎ বাবার জন্য একটা আকুলতা বোধ করে সে।

খিদে পেয়েছিল। রেস্টুরেন্টে খেয়ে, সেলুনে দাড়ি কামিয়ে নিয়ে একটু বেলায় সে হাওড়ায় গিয়ে ট্রেন ধরে।

॥ এগারো ॥

বর্ধমানের বাজারে বহেরু একজন ভবঘুরে চেহারার লোকের সঙ্গে কথা বলছিল। ডাল শস্যবীজের পাইকার পরান সাহার চেনা লোক। রোগা, কালো, লিকলিকে চেহারা, গালে আর থুতনিতে খামচা-খামচা কয়েক গাছা লোমের মতো দাড়ি—মাকুন্দই বলা যায়। দুটো গর্ত চোখে ভিতুভাব। এক চালান মাল গস্ত করে পরান সাহা তার দোকানঘরের বাইরে বলে কোঁচা নেড়ে হাওয়া খাচ্ছে—মোটা মানুষ, শীতেও ঘাম হয়। সেখান থেকেই চেঁচিয়ে বলে—নিয়ে গিয়েই দেখ না। চোর ছ্যাঁচোড় নয়, দোষের মধ্যে কোনও একঠাঁই থাকতে পারে না! চোখে চোখে রেখো। তুমি তাঁতির কথা বলেছিলে, তাই আটকে রেখেছি।

বহেরু মাথা নাড়ল। পরান সাহা তার পুরনো খদ্দের। কাজেই খারাপ লোক দেবে না। কিন্তু ব্রজকর্তার সঙ্গে পরামর্শ না করে কথা দেয় কী করে? বলল—রও বাপু, আমি টপ করে ঘুরে আসছি। পালিও না যেন।

লোকটা সঙ্গে ধরে বলল—যদি নেন আপনার কাছে থাকব। বর্ধমানের বাজার ভাল, শানা-মাকু সব এখান থেকেই কিনে নিলে হয়।

—রাখো বাপু, আগে কর্তার মতামত দেখি। শানা-মাকু কিনতে হবে না, আমার তঁতঘর আছে।

—ও! লোকটা বিস্ময়ভরে বলে—তা কর্তা কে?

—ব্রাহ্মণ। আমার ব্রাহ্মণ। কথাটা অহংকারের সঙ্গে বলে বহেরু।

—আমি দাঁড়িয়ে রইলাম তবে!

—থাকো, বিড়িটিড়ি খাও, আমি এসে যাচ্ছি। লোকটা তখন হঠাৎ আপনমনে বলে—বড় খিদে পেয়েছিল। চাড্ডি মুড়িটুড়ি—সে কথায় কান না দিয়ে বহেরু বাজারের ভিড় ভেঙে এগোয়। মশলাপট্টি পার হয়ে বড় রাস্তা ধরে খানিক এগোলে ঘড়ির দোকান। ব্রজকর্তা বসে আছে ঠায় একটা পিঠ-উঁচু চেয়ারে।

—কর্তা, হল?

ব্রজগোপাল বহেরুর দিকে চেয়ে মাথা নাড়েন। হয়নি। বহেরু একটু হাসল। বলল—ও ঘড়ি তো চোদ্দোবার সারাই হয়েছে, যন্ত্রপাতি আর কি কিছু আছে? ফেলে দ্যান।

ব্রজগোপাল বিমর্ষভাবে বলেন—পুরনো জিনিস, মায়া পড়ে গেছে। বড় ছেলে প্রথম চাকরি পেয়ে দিয়েছিল, তা চোদ্দো পনেরো বছরের বেশি ছাড়া কম না।

—একটু কথা ছিল, আবডালে আসেন।

ব্রজগোপাল নেমে আসেন—কী বলবি?

—একটা তাঁতি পেয়েছি। দুশো সুতোর কাপড় বুনতে পারে।

ব্রজগোপাল অবাক হয়ে বলেন—দুশো সুতো? সে তো শৌখিন ব্যাপার। তোর সে কাপড় কী দরকার?

বহেরুর বড়সড় শরীরটা একটু ঝুঁকে পড়ে আহ্লাদে, একটু মৌজের হাসি হেসে বলে—দুশো সুতোর কাপড় বোন যার-তার কর্ম নয়। ও কাপড় পরলে টেরই পাওয়া যাবে না যে কিছু পরে আছি। মনে হবে ন্যাংটা আছি।

ব্রজগোপাল বড় চোখে চেয়ে বলেন—ও কাপড় পরে রাজা-জমিদার, তুই চাষিবাসি মানুষ, ও পরে কি আরাম পাবি?

—দেখি কীরকম করে। পাঁচজনকে দেখানোও যাবে। আশেপাশে ঘরে কেউ তো বোনে না। একটা গুণী লোক, আটকে রাখি। কি বলেন?

—নিবি তো নে। তবে দেখেশুনে নিস, একপেট ভাতের জন্য বহু হাঘরে নিষ্কর্মা গুণী সেজে ঘুরে বেড়ায়। ব্রজগোপালের মুখে অবশ্য কোনও উৎসাহ দেখা যায় না।

বহেরু উৎসাহে বলে—তো নিই? পরান সাহার চেনা লোক।

—কত লোক তো আনলি। সেই যে সুন্দরবনের এক রাইচাষা এল আনারসের ক্ষেত করতে, তারপর চৌপরদিন পড়ে ঘুমতো—সেরকম না হয়।

—হলে বের করে দেব। একটু দোষ আছে অবিশ্যি, মাঝেমধ্যে পালিয়ে যায়। তবে হাতটান নেই। পরান সাহা তো জামিন রইল। আপনি আসুন না, দেখবেন। যদি মত দেন তো কথা পাকা করে ফেলি।

ব্রজগোপাল বিরক্ত হয়ে বলেন—দাঁড়া, ঘড়ির মেরামতিটা হোক। চোখের আড়াল হলেই ওরা যন্ত্রপাতি সরিয়ে ফেলে। ঘড়ি বলে জিনিস।

বহেরু গুরগুরিয়ে হাসে—পুরনো যন্ত্র, ও নিয়ে কী করবে?

—তুই বড় বুঝিস। সব সারাইকর ঘড়ির পার্টস চুরি করে। বহেরু বোঝে বড় কর্তাকে এখন নড়ান যাবে না। আগাগোড়া মেরামতির সময়টা উনি ঠায় বসে থাকবেন অপলক চেয়ে। বড় সাবধানী লোক।

দোকানদার পুরনো চেনা লোক, ব্রজগোপালের টেবিল-ঘড়িটা না হোক বার ছয়-সাত সারিয়ে দিয়েছে। বুড়োসুড়ো লোক, হাত কাঁপে, মাথা নড়ে, তাই দোকানে বড় একটা খদ্দের হয় না। লোকটা, ব্রজগোপালকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে বলল—ব্রজদা, এ হবে না।

ব্রজগোপাল চমকে দোকানে উঠে যান। ঝুঁকে ঘড়িটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে বলেন—হবে না?

বুড়ো লোকটা ঝাড়নে হাত মুছতে মুছতে মাথা নাড়ে—না, এর জান শেষ হয়ে গেছে। জং-ফং লেগে একাক্কার। এ-কদিন চলল কী করে সেইটাই ভারী বিস্ময়ের কথা।

—আর একটু নেড়েচেড়ে দেখুন না, বহু বছর ধরে সঙ্গে রয়েছে, বাতিল করতে মায়া লাগে।

—সারানো যায়। তবে তাতে নতুন কেনার খরচ। তেমন ভাল চলবেও না।

হতাশ হয়ে ব্রজগোপাল ঘড়িটা হাতে নিয়ে বলেন—বড় ছেলে দিয়েছিল।

—নতুন একটা কিনে নিন।

—দূর! ব্রজগোপাল 'নতুন' শব্দটা সহ্য করতে পারেন না বোধ হয়। বলেন—পুরনো আমলের জিনিসের মতো জিনিস হয়!

ব্রজগোপাল চাদরের তলায় ঘড়িটা নিয়ে নেমে আসেন। হাঁটতে হাঁটতে বলেন—লোকটা বুড়ো মেরে গেছে রে বহেরু, ও-পাশে একটা দোকান দেখেছি, চল তো দেখিয়ে যাই। বলে কি না চলবে না!

—আবার ঘড়ির দোকানে বসবেন! তবে আর কোকাকে দেখতে যাওয়া হবে না।

আমারও মালপত্র কেনার আছে। টাইম কটা হল?

হাতে ঘড়ি, তবু টাইম কটা হল তা দেখার উপায় নেই। ভারী রেগে গিয়ে ব্রজগোপাল বলেন—কী করে বলি?

টাইম জানতে বহেরু একজন চলতি ভদ্রলোককে দেখে এগিয়ে যায়। পিছিয়ে আবার ব্রজগোপালের পাশটি ধরে বলে—আজ আর হবে না। জেলখানার ফটক বন্ধ হয়ে যাবে যেতে যেতে।

শীতের বেলা ফুরিয়ে যাচ্ছে। বাজারের ভিড়ে পায়ে পায়ে ধুলো উড়ছে। রাঙা ধুলো। একটা জলহীন শুকনো বাতাস বয়ে যাচ্ছে। ভিড়ের মধ্যে শীতটা টের পাওয়া যাচ্ছে না, ফাঁকায় পড়লে আজ ঠান্ডা কামড়াবে খুব। বুড়ো হাড়ে শীতটা আজকাল লাগে। ব্রজগোপাল ঘড়িটা একবার ঝাঁকিয়ে কানে লাগান। কোনও শব্দ না পেয়ে বলেন—নষ্ট হবে না! তোর রাজ্যের সব লোকের ঘণ্টায় ঘণ্টায় সময় জানা চাই, যেন অফিস টাইম সবার। উত্তরের বেড়ার দিকটা ফাঁক করে বাচ্চাকাচ্চারা ঘরে ঢোকে। আমি না থাকলে ঘড়ির অ্যালার্ম বাজিয়ে মজা মারে।

বহেরু গম্ভীরভাবে বলে—হুঁ। ছাওয়াল পাওয়ালগুলান বড় খচ্চর হয়েছে। সবকটাকে কানে ধরে ওঠাবসা করাব।

গুণী লোকটা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে পরান সাহার দোকানের সামনে, আকাশমুখো চেয়ে। পরনে লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জির ওপর পড়ে পাওয়া একটা ছেড়া সোয়েটার। পেটটা খাল হয়ে পড়ে আছে, কতকাল বুঝি পেটপুরে খায়নি। পেটের খোঁদলটাকে আরও ভিতর ঢুকিয়ে শীতে কুঁজো হয়ে লোকটা আকাশের দিকে চেয়েছিল। বহেরু সামনে দাঁড়াতেও খানিকক্ষণ যেন চিনতে পারল না, তারপর সম্বিৎ পেয়ে শুকনো ঠোঁটে বড় বড় দাঁতগুলো ঢাকার চেষ্টা করল।

—কী? লোকটা বলে।

—দুশো সুতোর কাপড়? পরলে মনে হবে কিছু পরি নাই, ন্যাংটা আছি!

লোকটা ঘাড় নাড়ল। বলল—আমাদের বহু পুরুষে বুনে আসছি। ইদানীং সব গোলমাল হয়ে গেল। দাদন না পেয়ে আমার বাবা তাঁত বেচে দেয়। সে অনেক ইতিহাস। আমি তো শেষ অবদি বিষ্ণুপুর গিয়েলাম রেশমের কাজ শিখতে। ওরা শেখাতে গা করে না। সেই থেকে ঘুরে ঘুরে বেড়াই। তাঁত আর দাদন পেলে এখনও—

বহেরু বাধা দিয়ে বলে—মালপত্র সব পাবে। এখন কিছুদিন পেটভাতে কাজ করো তো বাপু! তোমার কাজ তো দেখি।

লোকটা রাজি। বহেরু ব্রজগোপালকে দেখিয়ে বলে—ইনি ব্রাহ্মণ। একটা নমো ঠুকে দাও, শুভকাজে ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলো—

লোকটা কথাটা ধরতে পারে না, যেন বা পায়ের ধুলো নেওয়ার অভ্যাস নেই। সে তেমনি খুব আপনমনে বলে—বড্ড খিদে পেয়েছিল। চাড্ডি মুড়িটুড়ি হলে—

ব্রজগোপাল বলেন—থাক থাক। লোকটাকে দেখে তাঁর মনে হয় লোকটার আত্মবিশ্বাস নেই। তবে তাঁতের কথায় তার চোখ দুখানা যেমন ঝলসে উঠল, তাতে বোঝা যায় ওই একটা ব্যাপার ভালই জানে। বহেরুকে বলেন—যা, ওকে কিছু মিষ্টিটিষ্টি খাইয়ে আন, পেটটা খাল হয়ে আছে।

বহেরু মিষ্টি বা শৌখিন খাবারে বিশ্বাসী নয়। সে ভাতে বিশ্বাসী। চারবেলা সে নিজে ভাত মারে। ভাত ছাড়া সে কিছু ভাবতে পারে না। বহেরু হাসল—মিষ্টির কর্ম নয়। রামহরিদার হোটেল থেকে পেট চুক্তিতে ভাত খাইয়ে আনি। অতটা রাস্তা যাবে।

—তুই যা। আমি পরানের গদিতে আছি। বলে ব্রজগোপাল ঘড়িটা আবার কানে তোলেন।

রামহরি লোকটাকে দেখেই বেগড়বাঁই করতে থাকে। বলে—না বাপু, পেট চুক্তিতে হবে না।

বহেরু ঝেঁকে বলে—হবে না মানে? তোমার এখানে তো সবাই তাই খায়!

—সবাই না। লোক বুঝে আমাদের আলাদা আলাদা চুক্তি।

—কেন?

রামহরি লোকটার দিকে আর এক ঝলক চেয়ে বলে—এ বাপু গাঁ-ঘরের লোক, তার ওপর উপোসী, দেকেই মনে হয়। আমরা লোক চিনি। পাইস সিস্টেমে খেতে পারে, যত ভাত তত পয়সা।

বহেরু রেগে উঠতে গিয়ে হাসে। বলে—বর্ধমানের লোকের মুখে কী কথা! এ জেলা হচ্ছে লক্ষ্মীর বাথান, তুমি এখানের লোক হয়ে দুমুঠো ভাতের মায়া করলে! তো খাওয়াও তোমার পাইস সিস্টেমে। কুছ পরোয়া নেহি। লোকটা গুণী বুঝলে রামহরিদা, দুশো সুতোর কাপড় বুনতে পারে।

রামহরি তাতে কৌতূহল দেখায় না। বেল টিপে বেয়ারা ডাকে।

লোকটি কিন্তু খেতে পারল না। মরা পেট, তার ওপর তার খাওয়া নিয়ে এত গবেষণা শুনে লজ্জাও হয়ে থাকবে। লোকটা আঁচাতে উঠে গেল। সে সময়ে পাণ্ডুয়ার ঘিয়ের কারবারি গন্ধবণিক হরিপদ চা খেতে ঢুকে বলে—বহেরু যে।

দু-চারটে কথা হয়। হরিপদ বলে—আমাদের হাটে সেদিন এক বামন বীর এসেছিল, একুনে আড়াই ফুট উঁচু হবে। এত ছোট বামন বীর দেখিনি।

সঙ্গে সঙ্গে বহেরু কৌতূহল দেখায়—কতটুকু বললে? আড়াই ফুট! তাতে কতটা উঁচু হয়?

হরিপদ মেঝে থেকে বোধ হয় ছ-ইঞ্চি উঁচু একটা মাপ দেখায় হাত দিয়ে। বহেরু বলে—আরে বাপ্‌স! লোকটাকে পাওয়া যায়?

—দুই হাটবারে এসেছিল। আবারও আসবে। যা ভিড় লেগে গেল দেখতে! দাড়িগোঁফ আছে বিশ্বাস হয় না না-দেখলে। তোমার ঠেঁয়ে নেবে নাকি?

বহেরু মাথা নাড়ল—নিলে হয়। সামনের হাটবারে যাবখন। কিম্ভুত মানুষের বড় শখ আমার। ঠিক মাপ বলছ? বামন বীর আবার একটু লম্বাটে হয়ে গেলে তেমন কিম্ভূত থাকে না।

হরিপদ চোখ বড় করে বলে—ঠিক মাপ মানে! শ্রীমন্তর দরজিঘরে গজফিতে দিয়ে মাপা হয়নি নাকি। তা বামন বীর নিয়ে কি পালবে পুষবে?

—ওই একরকম। বলে বহেরু, একটু হাসে।

—তুমি বাপ নিজেই কিম্ভূত আছে।

তাঁতি লোকটা লুঙ্গিতে হাতমুখ মুছে দাঁড়িয়ে আছে তখন থেকে। বহেরু উঠে পড়ল। খাবারের পয়সা দিতে দিতে মুখ ঘুরিয়ে হরিপদকে আবার মনে করিয়ে দিল—সামনের হাটবারে যাচ্ছি।

রাস্তায় এসে পিছু-পিছু আসা লোকটার দিকে একবার ফিরে চেয়ে কী ভেবে বহেরু বলে—রাতেরবেলা আবার খেওখন। এ শালারা ব্যাবসাদার, লোকের পেট বোঝে না।

লোকটা এতটুকুন হয়ে বলে—আমি বেশি খাই না। ঘুরে ঘুরে বেড়াই, খাওয়ার বেশি বায়নাক্কা থাকলে চলে?

বহেরু একটু শ্বাস ফেলে বলে—কিন্তু দুশো সুতোর কাপড় বুনতে হবে—মনে থাকে যেন। আমার ইজ্জত রেখো।

পরানের গদিতে ব্রজগোপাল ক্যাশবাক্সের পিছনে বসে নিবিষ্টমনে তখনও ঘড়িটা ঝাঁকাচ্ছেন। মাঝে মাঝে কানে তুলে শব্দটা শুনবার চেষ্টা করছেন। বহেরুকে দেখতে পেয়ে বললেন—ঘরে থাকতে যাও বা একটু-আধটু চলছিল, এ ব্যাটা খুলেটুলে একেবারে বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। একটুও টকটক শব্দ শুনছি না। পার্টস-ফার্টস খুলে নিয়েছে নির্ঘাত।

বহেরু হাসে। তার বলতে ইচ্ছে করে—নতুন ঘড়ি আপনাকে একটা কিনে দেব, ওটা ফেলে দ্যান। তা দিতেও পারে বহেরু। এবার ফসলে ভাল টাকা এসেছে। ঘেরপুলিশকে মাঠে কিছু ফসল দিতে হয়েছে। তা হলেও সে আর কতটুকু? ব্রাহ্মণকে একটা ঘড়ি দান করতে আটকায় না। কিন্তু ব্রজগোপালকে সেকথা বলতে সাহস পায় না বহেরু ডাকাত। ব্রজকর্তা কখনও কারও থেকে কিছু নেন না। ওই নষ্ট ঘড়িটা ধরে বসে থাকবেন, ঝাঁকাবেন, দুঃখ করবেন, কিন্তু অনাত্মীয় কারও কাছ থেকে নতুন একটা ঘড়ি নেবেন না হাত পেতে। এজন্যেই লোকটাকে বড় ভালবাসে বহেরু।

ব্রজগোপাল মুখ তুলে বলেন—সায়ংকালটা পার হয়ে গেল রে! আর কত দেরি করবি? আমার আহ্নিক হল না।

—এই আসি। বলে বহেরু বেরিয়ে যায়।

দোকানপাট সেরে গাড়ি ধরবার জন্য স্টেশনে যখন তিনজন পৌঁছাল তখন চারধার অন্ধকার হয়ে গেছে। গাড়ি ছাড়তেই দৌড়ঝাঁপ-করা শরীরে যে ঘাম জমেছিল তা শিরশিরিয়ে ওঠে শীতের বাতাসে। বুড়ো হাড়ে শীত বড় লাগে। ব্রজগোপাল কানমুখ ঢেকে বসেন। বহেরু একটু আবডালে গিয়ে পকেট থেকে ছোট কলকে আর গাঁজা বের করে। তাঁতি লোকটা ব্রজগোপালের গায়ে ঢলে ঢলে পড়ে ভাতঘুমে।

বহেরু গাঁজাটা উপভোগ করে। গাড়িতে লোকজন আছে, দেখছে তাকে গাঁজা খেতে। কিন্তু তার দিকে চেয়ে কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না। বহেরু সেটা জানে। নিজেকে তাই মাঝেমধ্যে রাজা-জমিদারের মতো লাগে তার। সুখ এরেই কয়। কোকা গত তিন বছর জেলে পচছে, আরও বছর-দুই ঘানি টানবে। ছেলেটাকে একবার চোখের দেখা দেখে আসবে ইচ্ছে ছিল। হল না। মাঝলা সন্তান ভাল হয় না বড় একটা, আর বড় ছেলে হয় বোকা। কোকা তার মেজো ছেলে। ছেলেবেলা থেকেই খারাপ, গোবিন্দপুর ইস্কুলের মাস্টাররা মেরে মেরে হয়রান। তারপর ধরল ডন-বৈঠক, আখড়ায় যেত। পাহাড় সমান শরীর নিয়ে বজ্জাতি করত। সেবার বেদরকারে খামোক একটা ছোকরাকে কেটে ফেলল খালধারে। ছোকরাটা পার্টি করতে এসেছিল, একটু-আধটু বিষ ছড়িয়েছিল বটে, কিন্তু সে তেমন কিছু না। গাঁ ঘরে শহুরে কথা বুঝবার মতো বুঝদার কজন? তবু তার সঙ্গে কোকার কী একটা শত্রুতা তৈরি হল। ছোকরাকে পুলিশও ভাল চোখে দেখত না, নইলে কোকাকে আরও ঝোলাত কঠিন মামলায়। অল্পের ওপর দিয়ে বেঁচে গেছে কোকা। খুনটা ঠিক প্রমাণ হয়নি। শুধু জানা

গেছে যে, খুনের দলে ছিল। কিন্তু নিজের ছেলেটাকে ঠিক বুঝতে পারে না বহেরু। ও শালা অনেকটা তার নিজের মতোই। দাপ আছে। কিন্তু হিসেবি-বুদ্ধি নেই। ছেলেটাকে ভালও বাসে বহেরু, আবার একটু ভয়ও পায়। গত মাসে গিয়ে দেখা করেছে। শরীর মজবুত হয়েছে আরও, পাথরটাথর ভাঙে, যাঁতা ঘোরায়, ঘানি টানে। কিছু খারাপ নেই। বহেরুর তাই দুঃখ হয় না। তার আরও ছেলে আছে, এক-আধজন কম থাকলেও কিছু অভাব বোধ হয় না।

বৈঁচীতে যখন নামল তারা তখন চারধারে বেশ রাত ঘনিয়ে এসেছে। দুজন মুনিশ হাজির ছিল স্টেশনে, সঙ্গে বহেরুর দুই ছেলে। তাদের সঙ্গে আর একজন লোকও দাঁড়িয়ে আছে, মোটাসোটা চেহারা, কোটপ্যান্ট পরা। ব্রজগোপাল নামতেই লোকটা এগিয়ে এসে প্রণাম করে।

আলো-আঁধারে ঠিক চিনতে পারেননি ব্রজগোপাল। ঠাহর করে দেখেই চমকে ওঠেন। বুকের ভিতরটা ধক ধক করে। বহেরু ঝুঁকে দেখে বলে—রণেনবাবু না?

ব্রজগোপাল সর্বদাই দুঃসংবাদের অপেক্ষা করেন। বয়সটা ভাল না। ননীবালার বা তাঁর নিজের। গলাটা সাফ করে নিয়ে বলেন—তুমি?

রণেনের গলার স্বরটা ভারী মৃদু, বলে—দুপুরে এসেছি, তখন থেকে বসে আছি।

—ও। তা খবর কী? খারাপ খবর নাকি?

—না না। আপনার শরীর খারাপ খবর পেয়ে এলাম।

—চিঠি দিয়ে আসতে পারতে, তা হলে আর যেতাম না বর্ধমান। আমিও দুপুরের দিকেই গেছি। কিছু বলবে?

—কেমন আছেন এখন?

—ভাল। একটু বুকে ব্যথা হয়। বোধ হয় হার্টটার জন্যই। তা এই বয়সে আদিব্যাধি তো হবেই। চিন্তা কী?

—কলকাতা শীগগীর যাবেন-টাবেন না?

—যাব-যাব তো রোজই করি। হচ্ছিল না। শরীরটার জন্যই। দু-চারদিনের মধ্যেই যাব।

—সেই জমিটার ব্যাপারে—

ব্রজগোপাল থমকে যান। পুরনো অভিমানটা বুকের ব্যথার মতোই ঘনিয়ে ওঠে। এরা কেবল দশটি হাজার টাকা চায়, তার জন্যই এত যাওয়া-আসা, এত খোঁজখবর!

ব্রজগোপাল গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলেন—জমিটা তোমরা কিনা। আমি কয়েকদিনের মধ্যেই গিয়ে টাকা দিয়ে আসব।

বড় ছেলের চেহারায় ঘরগৃহস্থালির ছাপ পড়ে গেছে। কচি-ভাবটি আর নেই। বরাবরই ছেলেটা মা-বাপ ন্যাওটা, শান্ত প্রকৃতির, আর একটু বোকাসোকা ছিল। এখনও প্রায় তাই আছে, তবে বোধ হয় এখন মা-বাপের জায়গায় বউয়ের ন্যাওটা হয়ে পড়েছে।

বহেরু ওদিকে মালপত্র ভাগাভাগি করে মুনিশদের মাথায় তুলে দিয়েছে। টর্চ আর লম্বা লাঠি হাতে ছেলেরা দাঁড়িয়ে আছে। ব্রজগোপাল আদেশ করলে রওনা হতে পারে সবাই। বহেরু দুকদম এগিয়ে এসে বলে—ওদের রওনা করে দিই কর্তা। আপনি ছেলের সঙ্গে কথা বলুন, আমি মাস্টারবাবুর সঙ্গে একটু কথা বলে আসি, তিনি পুরনো তেঁতুল চেয়ে রেখেছিলেন। একসঙ্গে যাবখন।

ব্রজগোপাল ঘাড় নাড়েন। প্ল্যাটফর্মের ফাঁকা কংক্রিটের বেঞ্চে বসেন দুজন। শিশির ভিজে সেঁতে আছে সিমেন্ট। হাওয়া দিচ্ছে, খুব শীত। রণেন বলে—আপনি বেশি দেরি করবেন না, ঠান্ডা পড়েছে, রওনা হয়ে পড়ুন।

—তুমি একা বসে থাকবে? আর বোধ হয় আধ ঘণ্টার মধ্যে গাড়ি নেই।

—তাতে কী? ঘোরাফেরা করব, তা করতেই সময় কেটে যাবে।

—আচ্ছা যাচ্ছি। ছুটির দিনে-টিনে এদিকে চলেও আসতে পারো তো, বহেরুর খামারের দক্ষিণে একটা চমৎকার জায়গা আছে, বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে এসে চড়ুইভাতি করে যেতে পারো।

রণেন একটু অবাক হয়। বাবা এসব কথা এতকাল বলেননি। বরং রণেন এলে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। সে চুপ করে থাকে।

ব্রজগোপাল বলেন—কলকাতা শহর আর ইংরেজি স্কুলে কোনও শিক্ষা হয় না। বাচ্চা-কাচ্চাদের নানা জায়গায় নিয়ে যেতে হয়, লোকের সঙ্গে মিশতে দিতে হয়, নইলে মাথায় গাদ জমে যায়।

রণেন বলে—সারা সপ্তাহ খেটেখুটে ওই একটা ছুটির দিনে আর বেরোতে ইচ্ছে করে না।

ব্রজগোপাল একটা শ্বাস ছাড়েন। একটু চুপ থেকে বলেন—আমার ঘরের বিশ্রামের চেয়ে বাইরের শ্রমটাই ভাল লাগত বরাবর। তোমার মা অবশ্য পছন্দ করতেন না। কিন্তু বাইরেটাই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

রণেন মাথা নাড়ে। কথা খুঁজে পায় না।

ব্রজগোপাল বলেন—আমার কথা বাদ দাও। আমার জীবনের দশা দেখে লোকে হাসে হয়তো। তবু বলি, মাঝেমধ্যে সংসার থেকে পালানো ভাল, নইলে সংসারের মাঝখানে সারাক্ষণ থাকলে কেবলই খিটিমিটি বাঁধে, সম্পর্কগুলো বিষ হয়ে যায়, একঘেয়েমি থেকে পরস্পরের প্রতি বিতৃষ্ণা আসে।

কথাগুলো খুব গভীর থেকে উঠে আসছে মনে হয় রণেনের। এবং বাবার এই অতি সাধারণ কথাগুলো তার ভিতরে যেন ছ্যাঁকার মতো লাগে। আত্মসংবরণ রণেনের আসে না। সে হঠাৎ বলে ওঠে—সংসারে বড় অশান্তি।

ব্রজগোপাল মুখ ফিরিয়ে বলেন—কীরকম?

রণেন নিজেকে সংযত করে নেয়, বলে—ওসব শুনে আপনার দরকার নেই।

ব্রজগোপাল মাথা নাড়লেন। বোঝেন। বলেন—কলকাতা শহরটাকে লক্ষ কোরো। চারদিকে মানুষকে লোভানী দেখাচ্ছে, স্বার্থপর করে তুলছে। ও হয়েছে মানুষ পচানোর জায়গা, সাধুকেও অসৎ করে ফেলে। সেই জন্যই আমি ভেবেছিলাম এদিকটায় বসত গড়ে তুলব—

রণেন গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। তার খুব ইচ্ছে করে সংসারের বাতিল এই মানুষটির কাছে থেকে যেতে। কাল রাত থেকে এক প্রবল অস্থিরতা, ভয়ংকর এক পাপবোধ তাকে তাড়া করে ফিরছে। তার বলতে ইচ্ছে করে—তাই হোক বাবা, এইখানেই বসত গড়ে তুলি।

কিন্তু বলে না। বহেরুর বিশাল শরীর চরাচর ঢেকে সামনে এসে দাঁড়ায়। হেসে সে বলে—আধ ঘণ্টার মধ্যেই কলকাতার গাড়ি আছে।

রণেন মুখ তুলে বলে—বাবা, আপনি রওনা হয়ে পড়ুন। খুব ঠান্ডা।

ব্রজগোপাল গা করেন না, বলেন—তুমি একা বসে থাকবে। আমিও থাকি, দেখতে দেখতে আধ ঘণ্টা কেটে যাবে।

—না, আপনি উঠুন। রণেন জোর করে।

অগত্যা ব্রজগোপাল ওঠেন।

ওরা প্ল্যাটফর্মের গেট পর্যন্ত এগিয়ে যায়। ব্রজগোপাল সেখান থেকে পিছু ফিরে চান। কুয়াশা আর ঝুঁঝকো আঁধারে কিছু দেখতে পান না বোধ হয় ভাল করে। তবু অন্ধকারে চেয়ে থাকেন।

বহেরু ডাক দিয়ে বলে—কর্তা, রিশকা নিয়ে নেব নাকি!

ব্রজগোপাল বলেন—না রে, ও-সব বাবুগিরির কী দরকার? চল্। হেঁটে মেরে দিই।

দীর্ঘ রাস্তা হাঁটতে হাঁটতে বহেরু বলে—কর্তা, এক বামন বীরের খবর পেয়েছি। আর একটা লোক আছে গুসকরায়, তার দুহাতে চোদ্দোটি আঙুল। ছ-আঙুলে অনেকে আছে, ও সাত আঙুলে। ছনম্বর আঙুল থেকে নাকি আবার একটা আঙুল বেরিয়েছে। আশ্চর্য ব্যাপার। এনে ফেলব দুজনকে বহেরু গাঁয়ে।

অন্য সময় হলে ব্রজগোপাল তাকে তার বাতিকের জন্য ধমকাতেন, এখন শুধু অন্যমনে একটা ‘হুঁ’ দিলেন। তিনি বহেরুর কথা শুনতেই পাননি। ছেলেটা হঠাৎ ওই কথা বলল কেন—সংসারে বড় অশান্তি।

এক ফাঁকা প্ল্যাটফর্মের ঠান্ডা বেঞ্চটায় বসে আছে রণেন। সিগারেট খায়। মনটা বড় অস্থির। কারণ রাতে সে বীণাকে মেরেছে খুব। এই প্রথম সে এই কাজ করল। হাত দুখানা আবছায়ায় চোখের সামনে তুলে ধরে সে। দেখে। গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটা। মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুলেছে! হায়! আত্মগ্লানিতে ভিতরটা ভরে ওঠে। তার বাবা ব্রজগোপাল এত ঝগড়া সত্ত্বেও কোনওদিন মার গায়ে হাত দেননি। এখনও ভিড়ের ট্রামে বাসে মেয়েছেলেকে সিট ছেড়ে দেন বাবা। মেয়েমানুষকে এখনও সম্মান করতে বাবা জানেন। সে তবে এ কী করল?

হলদে আলোয় উদ্ভাসিত কুয়াশার ভিতর দিয়ে ট্রেনটা আসছে। প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা। রণেন হঠাৎ সম্মোহিতের মতো উঠে দাঁড়ায়, তাই তো! এই গ্লানি থেকে এখনই মুক্তি পাওয়া যেতে পারে! সে উঠে ধীর পায়ে প্ল্যাটফর্মের ধারটায় চলে আসে। ঝুঁকে দাঁড়ায়। গাড়িটা আসছে। সব স্মৃতি ঝেড়ে ফেলে লাইনের ওপর চোখ বুজে লাফিয়ে পড়া।

রণেন ঘোর-লাগা চোখে গাড়িটা দেখে। লাফানোর জন্য পা তোলে।

॥ বারো ॥

প্ল্যাটফর্মের লোকজন দেখতে পায়, রেলগাড়ির আলোয় একটা মোটামতো বোকা লোক লাইনের ওপর ঝুঁকে বোধ হয় পানের পিক ফেলতে, কী নাক ঝাড়তে, কী থুথু ফেলতে দাঁড়িয়েছে। তারা চেঁচিয়ে ওঠে—গাড়ি আসছে, গাড়ি আসছে, ও মশাই...

সময় মতোই রণেন পিছিয়ে দাঁড়ায়। ভারী বিরক্ত হয়। পৃথিবীতে এত লোক বেড়ে গেছে যে কারও চোখের আড়ালে কিছু করার উপায় নেই। তার ধারণা হল, লোকগুলো না ডাকলে সে ঠিকই অন্তিম লাফটা দিতে পারত।

গাড়ি এলে রণেন উঠে পড়ে। বেশ ভিড়। সপ্তাহান্তে যারা মফঃস্বলের বাড়িতে গিয়েছিল কিংবা বেড়াতে, তারা সোমবার থেকে ফের কলকাতার জোয়াল ঠেলতে ফিরছে। গাড়ির মেঝেয় থিক থিক করছে আধবুড়ি আর কচিকাঁচা ননএন্টিটি সব ভারতীয়। বোঁচকায়, পোঁটলায়, কোমরে, গেঁজেয় বর্ধমানের সস্তা চাল রয়েছে, কলকাতার দামি বাজারে ছাড়বে। তাদের কাঁউ-মাউ চিৎকারে কামরা গরম। তিনজন বসতে পারে এমন সিটে একটা ঠেলাঠেলি করে রণেন বসে পড়ে। মোটা শরীর, ঠিক যুৎ পায় না বসে। কিন্তু তিনজনের জায়গায় চারজনের বসার নিয়ম আছে বলে কেউ আপত্তিও করে না। ঢেউ খেলানো কাঠের সিট। দুটো সিটের জোড়ের অংশটা উঁচু হয়ে আছে, পাছায় ফুটছে। তবু সেই অবস্থাতেও হা-ক্লান্ত রণেন বসে বসে ঢুলতে থাকে। নয়নতারা আজ বড় যত্ন করেছে। কতকাল পরে দেখা। বামুনের পাতে ওরা বেঁধে ভাত দেয় না বটে, কিন্তু কাছে বসে যত্ন করে খাওয়ানো, দেখাশুনো করা—সে বড় কম নাকি!

নয়নতারা তার মুখ-চোখ দেখে, আর হাবভাব লক্ষ করে প্রথমেই বলে দিয়েছিল—বউদির সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছেন তো!

নয়নতারার সঙ্গে যখন সে-সব হয়েছিল তখন কোথায় ছিল বীণা! বহুকালের কথা সব। বহেরুর খামারবাড়িতে প্রেমট্রেম বলতে গায়ে-হাত। সে সব না হলে সরু চালের ভাত যেমন পানসে মতো লাগে চাষার মুখে তেমনি হয়। হয়েওছিল তাই, তা বলে কি নয়নতারা সে সব স্মৃতি বুকে করে বসে আছে? মোটেই না। ভুলে গেছে কবে। রণেনকে দেখে অবাক, খুশি সবই হয়েছিল, কিন্তু কোনও গুপ্ত স্মৃতির পাপবোধ ছিল না। পুকুরে আজ বেড়াজাল ফেলেছে বহেরুর লোকজন, মাছগুলো নাড়াচাড়া পড়বে। জাল তুলে হাজার মাছ তুলে আবার জাল ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছিল, নয়নতারা হাঁটুভর জলে নেমে গিয়ে বাছাই একটা রুই তুলে আনল প্রায় দু-সেরি। উঠে এসে বলল—এর পুরোটা আজ না খাইয়ে ছাড়ব না।

খুব খাইয়েছে। ও-বেলা মুড়ো-সুদ্ধু বারোখানা টুকরো গেছে পেটে। এ-বেলাও সাঁঝ লাগার পরই আবার গরম ভাত, মাছের ঝাল আর দুধ খেতে হয়েছে। ঘুম তো আসবেই। ঘুমোতে ঘুমোতে স্বপ্নও আসে। নয়নতারার। বীণার কাছে যেমন বাঁধা-পড়া জীবন, বহেরুর খামারে নয়নতারার কাছে তেমন নয়। কীরকম

হাওয়া-বাতাস, খোলা-মেলার মতো সম্পর্ক গড়ে তুলতে জেনেছিল নয়নতারা! সেই জন্যই কি ওর স্বামীটা ওকে নিতে পারল না শেষ পর্যন্ত? তা বলে নয়নতারাকে কেউ আবার যেন দুঃখী বলে না ভাবে। ও সব দুঃখ-টুঃখ তার আসে না। আজ দুপুরে মাথার কাছে বসে সুপুরি কাটছিল। জাঁতিটা ভারী শৌখিন। রুপোর মতো। রণেন হাত বাড়িয়ে জাঁতিটা টেনে নিয়ে বলল—কী জিনিস দিয়ে তৈরি বলো তো! এমন দেখিনি।

নয়নতারার একটা হাসি-রোগ আছে। মুখে আঁচল চেপে বলল—এখনও মানুষটার দোষ যায়নি দেখছি?

শোওয়া অবস্থা থেকে ঘাড় তুলে রণেন বলে—কী দোষ দেখলে?

—বয়সের।

—যাঃ! রণেন বলল।

—তবে জাঁতির নাম করে হাত ছুঁলেন যে বড়!

রণেন বলে—ওকে ছোঁয়া বলে না।

—খাবলকেও ছোঁয়া বলে না তো বাপু, ছোঁয়ার আবার আলাদা রকম আছে নাকি!

—মনে পাপ না থাকলেই হল। রণেন বলে।

নয়নতারা ছেনাল সন্দেহ নেই। কিন্তু বড় একটা শ্বাস ফেলে বলে—মনের পাপের কথা বলছেন! সে বড় জটিল কথা!

—জটিল কেন হবে?

নয়নতারা মাথা নেড়ে বলে—একটা পুরুষ আর একটা মেয়েমানুষ একঠাঁই হলেই মনে পাপ জাগে। এ প্রকৃতির নিয়ম।

ঘরটা ছিল নয়নতারার। পাকা ঘর, ওপরে টিন। দক্ষিণের জানালা দিয়ে দক্ষিণায়নের সূর্যরশ্মি ঠ্যাং বাড়িয়েছে। কেউ নয়নতারাকে কিছু বলতে সাহস পায় না, তাই তার বিছানাতেই এলিয়ে পড়েছিল রণেন। অবশ্য বাচ্চা একটা ঝিউড়ি মেয়েকে কাছে রেখেছিল সে, নলচে আড়াল দিয়ে তামাক খাওয়ার জন্য। সে মেয়েটা খানিক কড়ি খেলে মেঝেয় পড়ে ঘুমাচ্ছে। বালিশের অড়ে রোদের গন্ধ, নরম। লেপখানা যেন বা পালকের তৈরি। তার ওপর হাতের কাছে নয়ন নিজে। এমনতরো বিলাস জীবনে কমই ভোগ করেছে রণেন। সেই চিন্তাহীন আরামের মধ্যে হঠাৎ একটা দার্শনিকতা ঢুকিয়ে দিল নয়নতারা। রণেন নাড়া খেয়ে বলে—পাপ জাগে? সে কীরকম?

এতক্ষণ আপনি-আজ্ঞে করছিল, হঠাৎ গলা নামিয়ে নয়নতারা বলে—বলো তো, একটা বয়সের ছেলে আর একটা বয়সের মেয়ের দিকে যখন তাকায় তখনই সব সময়ে একটা কিছু পাপ ইচ্ছে জাগে কিনা? যেখানেই হোক, যখনই হোক, চেনা বা অচেনা যা-ই হোক, হয় কিনা-ওরকম? আমার তো মনে হয়, না হয়ে যায় না।

ভারী বিস্ময় বোধ করে রণেন শুয়ে থাকে। ভাবে। এবং আশ্চর্য হয়ে বোধ করে, ঠিক তাই। চোখে চোখে যৌনতার বীজ ছড়ায় বটে। নিজেকে দিয়েই সে বুঝতে পারে। যখন ভিড়ের মধ্যে, যখনই নিঃসঙ্গতায়, যখনই কখনও বয়সের মেয়ের দিকে চেয়েছে তখনই মনে হয়নি কি—ওই ওটা হচ্ছে মেয়েছেলে! হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা, মেয়েছেলে। আর মেয়েছেলের মানে কী? মানে তো একটাই—পুরুষের কাছে মেয়েছেলের যা মানে হতে

পারে। এই রকমই যৌনতার বীজাণুযুক্ত চোখ বটে আমাদের। এইজন্যই কী রামকৃষ্ণদেব বলেছেন—মাতৃভাব হৃদয়ে না এলে মেয়েদের ছুঁতে নেই। এমনকী মুখ দর্শন না করাই ভাল!

রণেন লজ্জা-টজ্জা পেল না, সে বয়স পেরিয়ে এসেছে। তা ছাড়া নয়নতারার কাছে লজ্জাই বা কী? বলল—মাইরি, কেবল জাঁতিটার দিকেই চোখ ছিল আমার!

নয়নতারা বিছানায় পড়ে-থাকা জাঁতিটা তুলে তার হাতে ফের ধরিয়ে দিয়ে বলল—তা হলে জাঁতিটাই দেখ। ভাল জিনিস। মুরগিহাটা থেকে বাবা কিনে এনেছিল, স্টেনলেস ইস্টিলের। অনেক দাম।

তখন জাঁতিটা ফেলে নয়নতারার হাত ধরতে কোনও বাধা হল না আর। তখন মনে মনে রণেন বলল—মেয়েছেলে, হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা মেয়েছেলে! মেয়েছেলের মানে তো একটাই হয় পুরুষের কাছে।

চোখে চোখ রেখে নয়নতারা বলে—ঠিক বলিনি?

—ঠিকই বলেছ। ভেবেটেবে দেখলাম, জীবনের কোনও মানেই হয় না। এক-আধটা যা মানে করা যায় তার একটা হচ্ছে টাকা, অন্যটা মেয়েছেলে।

নয়নতারা ফের আপনি-আজ্ঞেয় ফিরে গেল। বলল—আমি মোটেই সে-কথা বলিনি আপনাকে।

—বলোনি?

—না, কেন বলব? টাকা আর মেয়েছেলে ছাড়া জীবনে আর কিছু থাকে না নাকি? সে আবার কীরকম? কত কিছু আছে!

—আমি তো খুঁজে পাই না।

নয়নতারা হাসল, বলল—আপনি আচ্ছা একটা লোক। অনেক ভেবেচিন্তে একটা কঠিন কথা বের করেছিলাম মাথা থেকে, সেটা জল করে দিলেন। জটিল কথা অত সহজে বোঝা যায় না।

নয়নতারারও বয়স হল, রণেনের চেয়ে বড়জোর এক-দুবছরের ছোট হতে পারে। বহেরুর প্রথম পক্ষের মেয়ে। গাঁ ঘরের তুলনায় ফরসা, মুখটায় সর্বদা একটা হাসি-মাখানো সহৃদয় ভাব, সকলের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে, রাগ নেই। সেই ব্যবহারটাই আবার প্রেম-ট্রেম বলে ভুল করে লোকে। চোখ দু'খানা বড়, নাক-টাক, ঠোঁটের কায়দা সব মিলিয়ে একরকম চটক আছে। বুদ্ধি বোধ হয় বেশি রাখে না, হাসিখুশি মেয়েদের বুদ্ধি কম হবেই, কিন্তু এক-আধটা কথা বলে বড় মারাত্মক। যেমন এই পাপ-ইচ্ছের কথাটা।

বিকেল পর্যন্ত নয়নতারার হাতখানা মাঝে মাঝে ধরে রইল রণেন। হাতটা ঘেমে গেল, গলে গেল, কিন্তু সহৃদয়া নয়নতারা তা ফেরত নিল না। ভাগ্যিস শীতের বিকেল কিছু তাড়াতাড়ি আসে! অবশ্য রণেন হাতের বেশি এগোবার উৎসাহও পাচ্ছিল না। মেয়েমানুষ কথাটা তার মধ্যে মাঝে মাঝে বজ্রাঘাত করছিল তখন। মেয়েমানুষের গায়ে কাল রাতে জীবনে প্রথম হাত তুলেছিল রণেন। এ পাপ কি স্খালন হওয়ার?

নয়নতারা মুখের ওপর একটু ঝুঁকে বলে—বাবা একটা মানুষের চিড়িয়াখানা বানাচ্ছে, শুনেছেন?

—সে কীরকম? বিষণ্ণ রণেন জিজ্ঞেস করে।

—সে চিড়িয়াখানায় থাকবে অদ্ভুত সব মানুষ। খুব বেঁটে, খুব লম্বা, খুব সুন্দর, খুব কচ্ছিৎ, হিজড়েও থাকবে। আরও থাকবে নানারকম। সাহেব থেকে সাঁওতাল। যত আজব মানুষ হতে পারে সব এনে জড়ো করবে। যদি বলেন তো বাবাকে আপনার কথা বলে দিই।

—কেন?

—বাবা ঠিক চিড়িয়াখানায় ভরতি করে নেবে আপনাকে।

হাতটা তখন ছেড়ে দিল রণেন।

নয়নতারা তখন দুঃখের গলায় বলে—আপনি পালটে গেছেন।

—একটু মোটা হয়ে গেছি বলে বলছ?

—তাই হবে বোধ হয়। একটা সময়ে আপনি খুব ভিতু ছিলেন, মেয়েমানুষকে বড় ভয় ছিল আপনার।

রণেন সনিঃশ্বাসে বলে—এখনও আছে।

নয়নতারা হাসে, বলে—সে মেয়েমানুষের ভয় নয়, এ বয়সের পুরুষ ডরায় কেবল বউকে, মেয়েমানুষকে নয়।

আবার চমকায় রণেন। ঠিক কথা, হক কথা। বলে—তুমি বেড়ে কথা বলছ আজ।

নয়নতারা জাঁতিটা ফের তুলে নিয়ে বলল—তখন আমাকে বড় ভয় ছিল আপনার, আজ আর নেই।

—সেটা ভাল, না খারাপ?

—খারাপ।

—কেন?

—ভয়ডর থাকাই ভাল।

—বউ কি মেয়েমানুষ নয়? তাকে তো ডরাই ঠিকই।

—দূর! বউ বিয়ের পর আর মেয়েমানুষ থাকে নাকি? পাশবালিশ হয়ে যায়।

কথাটা কতদূর অশ্লীল ও সত্য তা চোখ কপালে তুলে ভাবে রণেন। তারপর বলে—শুধু পাশবালিশ?

সে কথার উত্তরে নয়নতারা বলে—তা নয় অবশ্য, রাতের পাশবালিশ আর দিনের দারোগা-পুলিশ।

তারপর সে কী হাসি হেসেছিল সে। সারাটা দিনে কাল রাতের পাপবোধ অনেকটাই ধুয়ে মুছে দিয়েছিল। আংটিটা চাইবে বলে ভেবে রেখেছিল রণেন, তা আর চাইতে ভুলে গেল।

নয়নতারা বলে—আমাদেরও একটু একটু ভয় খাওয়া ভাল।

—কেন?

—স্বামী নেয় না বলে আমাকে সবাই কুমড়োলতা ভাবে, মাচান দিতে চায়। সে সব লোক আমার ভাল লাগে না। আমি লতানে গাছ নই, লতার মতো দেখতে যে জীব তাই। বিষ-দাঁত আছে।

—তোমার মনে পাপ। রণেন চোখ বুজে বলেছিল।

—হবে। যাই, ঠাকুরদা ডাকছে।

—কে ডাকছে বললে? রণেন চোখ খুলে জিজ্ঞেস করে।

—ঠাকুরদা, দিগম্বর। খোল-কপালে লোক।

রণেন অবাক হয়ে বলে—খোল-কপালে লোক কথাটার মানে কী?

নয়নতারা তার বিশুদ্ধ দাঁতে হেসে বলে—কোন যৌবন বয়সে ঠাকুরদার কপালে কেবল জুটেছিল ওই খোলটা, আর কিছু নাই। লোকে বলে গণেশের কলা-বউ যেমন, ঠাকুরদার খোলও তেমনি।

—বুঝলাম, তা ডাকল কোথায়, শুনতে পেলাম না তো!

—খোলের আওয়াজ হচ্ছে, শুনছেন?

রণেন কান পেতে শোনে। আগেও শুনেছে, দিগম্বরের খোল কথা কয়। এখনও কইছে।

নয়নতারা বলে—খিদের বোল তুলছে ঠাকুরদা। চিঁড়ে আন, চিঁড়ে আন, দে দই, দে দই। আমরা সব বুঝতে পারি। এই বাজনার জন্যই বাবা তার খুড়োকে আটকে রেখেছে এতকাল।

—বহেরু আবার এসবেরও সমঝদার না কি?

—তা নয়। মানুষের চিড়িয়াখানার কথা বলছিলাম যে আপনাকে? তাতে সব রকম মানুষ লাগে যে!

নয়নতারা উঠে গেলে ভারী একা লেগেছিল রণেনের। উঠে ঘুরে ঘুরে বহেরুর খামারবাড়ি দেখছিল। দেখে দিগম্বর পুকুরের ঘাটলায় বসে আছে, হাতে বড় কাঁসার গ্লাসে চা, চায়ের ওপর মুড়ির স্তূপ ঢেলে দিয়েছে, আর সেই মুড়ির তলা দিয়ে সুড়ুক সুড়ুক টেনে দিচ্ছে চা। চায়ে সিটনো মুড়ি চিবচ্ছে আরামে। চারদিকের দুনিয়া সম্পর্কে কোনও বোধই নেই।

একা একা ঘুরেছিল রণেন। বহেরুর খামার থেকে কয়েক কদম তফাতে তাদের জন্য বাস্তুজমি কিনে রেখেছিলেন বাবা। সেই জমি খুব সাবধানে ও যত্নে তারকাঁটা দিয়ে ঘিরেছে, জায়গা মতো আম-কাঁঠাল-নিম-নারকোল গাছ লাগিয়ে রেখেছে—এ-সব গাছ বাড়তে সময় নেয়। তাই আগেভাগে লাগিয়ে রেখেছেন বাবা। যখন ছেলেরা বসত করতে আসবে, তখন যেন ফসল দেয়। তারকাঁটার গায়ে গায়ে অমরি গাছ—এ গাছ জীবাণু মারে। সামনের দিকে শীতের গাঁদা ফুটে আছে। একটা কুয়ো কাটা ছিল। এখনও সেটা মজে যায়নি। রণেন কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে কুয়োর ধারে দাঁড়াল। বড় কুয়ো। গভীরে কিছু জল আছে। বোধ হয় জলটা ব্যবহার হয়, এখনও আবর্জনা পড়েনি। ঝুঁকে দেখতে দেখতে মনে হল, ভিতরের জলে মাছ ফুট কাটছে। শীতের গভীর কুয়োয় রণেনের ছায়া, তার পিছনের ধূসর শীতের আকাশের ছায়া। রণেনের তখন একবার বজ্রাঘাতের মতো 'মেয়েমানুয' কথাটা মনে হয়েছিল। আর লাফিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়েছিল কুয়োর জলে। বড় শীত, তাই পারেনি।

কিন্তু একথা ঠিক, আজ বার-বারই তার মরতে ইচ্ছে হয়েছে। মেয়েমানুষের সম্মান যে রাখতে জানে না, তার মরাই উচিত। কথাটা ভাবতে ভাবতেই সে পিছু ফিরে ভূত দেখতে পায়। খুব লম্বা অপ্রাকৃত রকমের একটা লোক বেড়া ডিঙিয়ে জমির মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে বাঁশের একটা লাঠি, তাতে ভর দিয়ে কুঁজো হয়ে না দাঁড়ালে আরও লম্বা ঠেকত। তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল, মুখে কথা নেই। তবে চোখের ভাষায় কথা কিছু ছিলই। চমকে উঠেও সামলে গেল রণেন। কারণ, বহেরু যে মানুষের চিড়িয়াখানা বানাচ্ছে একথাটা ভোলেনি সে। এই অস্বাভাবিক লম্বা লোকটা বহেরুর সেই চিড়িয়াখানারই একজন কেউ হবে। পিটুইটারি গ্লান্ডের দোষেই এরকমটা হয়ে থাকবে, লম্বায় অন্তত সাত ফুটের কাছাকাছি। চেহারা দেখে মনে হয় সাঁওতাল। তবে ভারী অসুস্থ, জীর্ণ চেহারা, শরীরের দৈর্ঘ্যকে দাঁড় করিয়ে রাখার ক্ষমতা নেই। লোকটা দ্রুত এসেছিল বোধ হয়, হাঁফাচ্ছে। রণেন লক্ষ করে, কাঁটাতারের ওপাশে বহেরুর জ্ঞাতিগুষ্টির রাজ্যের ছেলেমেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের হাতে ঢিল, চোখেমুখে শয়তানি মাখানো। লোকটাকে তাড়া করেছিল বোধ হয়, রণেনকে দেখে একটু থমকে গেছে।

লোকটা হাত তুলে ডাকে, বাবু।

রণেন একটু এগোতেই লোকটা হাত তুলে ছেলেগুলোকে দেখিয়ে বলে, মারে।

রণেন ছেলেগুলোকে একটু তাড়া করে—যা, যা।

ছেলেগুলো অল্প একটু দূরে সরে যায়। লম্বা লোকটা ঘাসে বসে হাঁফায়। সভয়ে চেয়ে থাকে ছেলেদের দিকে। কাঁটাতারের বেড়া ফাঁক করে আবার সাবধানে বেরিয়ে আসে। একটু দূরে এসেই ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে পায়, ছেলেগুলো কাঁটাতারের বেড়ার কাছে ঘেঁষে গিয়ে লোকটার দিকে ঢিল ছুঁড়ছে। লোকটা কুয়োর আড়ালে সরে গেল। তারপর সেও ঢিল কুড়িয়ে উলটে ছুঁড়তে থাকে। লোকটাকে ছেলেগুলোর হাত থেকে বাঁচানোর কোনও ইচ্ছেই বোধ করে না সে। পৃথিবীতে যে যার মতো বেঁচে থাকার লড়াই করুক। তার কী?

এখন রেলগাড়ির সিটের জোড়ের ওপর অস্বস্তির সঙ্গে বসে ঢুলতে ঢুলতে পুরো ব্যাপারটাকেই অবাস্তব মনে হতে থাকে তার। দেখে লম্বা লোকটা কুয়োর মধ্যে ঝুঁকে দীর্ঘ হাতে বিষ মেশাচ্ছে তাদের পানীয় জলে। চিৎকার করে উঠতে গিয়ে সে জেগে যায়। মেশায় যদি বিষ, মেশাগগে। তারা কোনওকালে ওই জল খেতে আসবে না তো। তারা কলকাতাতেই পার্মানেন্ট হয়ে গেল। টালিগঞ্জের বাড়িটা যদি হয়! ভারী ফাঁদে পড়ে গেছে রণেন। সিমেন্ট আর লোহালক্কড়ের জন্য আগাম দিয়েছে। বাড়িটা তাকেই করতে হবে। জমি হবে হয় মার নামে, নয়তো দু-ভাইয়ের নামে। বীণার কঠিন মুখখানা মনে পড়ে যায় তৎক্ষণাৎ। বজ্রাঘাত হয় বুকে। কাল রাতে সে বীণাকে মেরেছে। একে মেয়েমানুষ, তার ওপর রোগা শরীর। কী করে বাসায় ফিরে সে বীণার মুখোমুখি হবে। এক বিছানায় শোবেই বা কী করে, ফের কথাটথাই বা বলা যাবে কি কোনওদিন? হয়তো ফিরে গিয়ে দেখবে বীণা তার বনগাঁয়ের বাপের বাড়িতেই চলে গেছে। আর হয়তো আসবে না। ...না যদি আসে তবে কি খুব মন্দ হয়? যদি চিরকালের মতো বীণা ছেড়ে চলে যায় তবে কি খুব খারাপ হবে রণেনের? হবে একটু অসুবিধে, বিয়ের পরের অভ্যেসগুলো যাবে কোথায়? তবু বোধ হয় মা-ভাই নিয়ে এরকম ব্যক্তিত্বহীন আনন্দের জীবনও আবার ফিরে পাবে রণেন। তখন মাঝে মাঝে নয়নতারার কাছে আসবে। আনাড়ি পুরুষের মতো।...লম্বা লোকটার কথা আবার ভাবে রণেন...নয়নতারার কথা...বীণার কথা...বাবার কথা...সব মিলেমিশে একটা তালগোল স্বপ্ন হয়ে যেতে থাকে।

কেষ্টনগরের দিককার দুটো লোক বসেছে সামনের সিটে। ও-দিকের লোক কথার ওস্তাদ। সারাক্ষণ রঙ্গরস করছিল। গাড়িটা হঠাৎ বেমক্কা থেমে যেতে তাদের একজন। অন্যজনকে ঠিক বীরভূম বা বাঁকুড়া জেলার কথা নকল করে বলে—গাড়িটা কোথায় থামা করাল রে?

অন্যজন বলে—এ হচ্ছে হালুয়া ইস্টিশান।

—সে কীরকম?

—হাওড়াও নয়, লিলুয়াও নয়, মাঝামাঝি। হাওড়ার হা আর লিলুয়ার লুয়া নিলে যা হয়। এ হচ্ছে বাবা কার শেড। রাজধানী এক্সপ্রেসও হাওড়ায় ঢোকার আগে এখানে থামে। হালুয়া ইস্টিশানে।

রণেন চমকে ওঠে। কার শেড! তার মানে হাওড়া এসে গেল প্রায়। একটু পরে সে বাসায় পৌঁছবে।

খুব ভয়ে রণেন বাসায় ঢুকল। ভারি লজ্জা করছিল তার। মা দরজা খুলে সরে যায়।

ছেলেমেয়েরা তাদের ঠাকুমার ঘরে হল্লাচিল্লা করছে। তার ঘর অন্ধকার। বীণা ঘরেই বিছানায় শুয়ে আছে, আন্দাজ করে সে। বাতি না জ্বেলে জামাকাপড় ছাড়ে নিঃশব্দে। লুঙ্গিটা আলনার অভ্যস্ত জায়গা থেকে টেনে পরে নেয়। খবরের কাগজটা নিয়ে বসে বাইরের ঘরের সোফায়। কাগজ ভরা যুদ্ধ লাগতে পারে, এই আশঙ্কা, দুর্দিনের সংকেত। সে সব পড়ে না রণেন। চোখ চেয়ে বসে থাকে।

সোমেন ফেরেনি। বলে গেছে, ফিরতে রাত হবে। রাতে খাবে না। বীণার আর বাচ্চাদের খাওয়া হয়ে গেছে। রণেন খেয়ে এসেছে। ননীবালা খাননি। ঘটনাটা কতদূর গুরুতর হয়েছে তা এখনও বুঝতে পারে না রণেন, ছেলেমেয়েরা কাছে ঘেঁষছে না, মা কথাটথা বলছে না। ভারি বিষন্ন বোধ করে সে।

বড় ছেলেমেয়ে দুটো ঠাকুমার কাছে শোয় এখনও, তাদের মা হাসপাতালে যাবার পর থেকেই। শুধু টুবাই শোয় বীণার কাছে। বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়ার পরও রণেন অনেকক্ষণ বসে থাকে বাইরের ঘরে। তারপর এক সময়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয় নিয়ে উঠে আসে। বিছানার মশারি তুলে ভিতরে ঢুকে শুয়ে থাকে চুপচাপ। বীণার গায়ে লেপ, লেপের অর্ধাংশ রণেনের প্রাপ্য। কিন্তু লেপটা টেনে নিতে তার সাহস হয় না। বিনা লেপে শুয়ে থাকে সে। বীণার গা থেকে একটা সুন্দর পাউডার বা সেন্টের গন্ধ আসে।

হঠাৎ তাকে চমকে দিয়ে বীণা নড়েচড়ে ওঠে। পাশও ফেরে বুঝি। এবং হঠাৎ লেপটা তুলে তার গা ঢেকে দেয় বীণা। রণেনের বুকখানা মুচড়ে ওঠে হঠাৎ। কান্না আসে চোখ ভরে। বুক ভরে। সে পাশ ফেরে।

—বীণা।

উত্তর নেই।

—ক্ষমা করো। রণেন বলে।

তারপর আঁকড়ে ধরে বীণাকে। প্রথমটায় শরীর একটু কঠিন করে রাখে বীণা। তারপর কেঁপে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। শরীরটা হঠাৎ নরম হয়ে যায়।

॥ তেরো ॥

সোমেন ভোরের গাড়িটা ধরতে পারেনি। অনেক রাত পর্যন্ত কাল বউদিকে নিয়ে ঝামেলা গেছে। তারপর শুয়ে শুয়ে গভীর রাত অবধি জেগে থেকেছে সে। টের পেয়েছে মাও ঘুমোয়নি। বাইরের ঘরে বসে মশা তাড়াচ্ছে। সে এক অসহনীয় অবস্থা। দাদা যে কেন বউদিকে মারল, কী করেই বা মারতে পারল, তা অনেক রাত অবধি ভেবে ভেবে তার মাথা গরম হয়েছে।

এপাশ ওপাশ করতে করতে মা এক সময়ে বলল—তোর দাদার কাছে একবার যা না।

—কেন? ক্লান্ত সোমেন জিজ্ঞেস করেছে।

—কী করছে দেখে আয়। ঝোঁকের মাথায় কী একটা করে ফেলল, এখন যদি আবার লজ্জায় ঘেন্নায় বেরিয়ে যায়—

—যাকগে। সোমেন রেগে উত্তর দিয়েছে—যাওয়াই উচিত। ভদ্রলোকের মতো দেখাবে লোকের কাছে, আর ছোটলোকের মতো সব কাণ্ড করবে।

মা নিঃশ্বাস ফেলে বলল—মানুষ রেগে গেলে কত অনর্থ করে। তখন কি আর মানুষ মানুষের মতো থাকে। বউমার বড্ড মুখ হয়েছে আজকাল, বিকেলে বাড়িতে পা দেওয়া থেকে ইস্তক কী না বলছে!

সোমেন সিগারেট ধরিয়ে বলল—তোমাদের জ্বালায় আমাকে একদিন বাড়ি ছাড়তে হবে।

মা চুপ করেছিল। সোমেন বাথরুম যাওয়ার নাম করে উঠে গিয়ে দাদাকে অবশ্য দেখেও এসেছে দুবার। সোফার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে, মাতালের মতো। ডাকেনি সোমেন। থাক পড়ে। মশা কামড়ে খাক। বউদির অবশ্য তেমন কিছু লাগেনি। দুর্বল শরীর বলে আর ঘটনার বিস্ময়করতায় বোধ হয় কেমন হয়ে গিয়েছিল। গালে অবশ্য আঙুলের দাগ দগদগে হয়ে ফুটেছিল, কয়েক গুচ্ছি চুল ছিঁড়ে গেছে। কিন্তু দাদার ওপর এই প্রথম একটা তীব্র ঘৃণা মেশানো রাগ অনুভবও করে সোমেন। হতে পারে, দাদাকে দিনের পর দিন গোপনে উত্তেজিত ও বিরক্ত করেছে বউদি, তবু দাদা কেন অমানুষ হয়ে যাবে!

এই সব কারণেই সকালে উঠতে দেরি হয়ে গেল। বেরোবার সময়ে দেখে সদর দরজা ভেজানো রয়েছে, দাদা নেই। বুকটা একটু কেঁপে উঠেছিল তার। দাদা বড় ভাবপ্রবণ ছেলে, রাগীও। অনুতাপে লজ্জায় যদি দুম করে নিজের ওপর প্রতিবোশ নিতে গিয়ে ভালমন্দ কিছু একটা করে ফেলে?

কিন্তু ভাববার সময় ছিল না। শিয়ালদা থেকে ব্যারাকপুরের গাড়ি ছাড়তে তখন আর কুড়ি মিনিট বাকি। ঢাকুরিয়া স্টেশনে এসে তাকে অপেক্ষা করতে হল কিছুক্ষণ শিয়ালদার গাড়ির জন্য। দেরি হয়ে গেল। কথা ছিল ভোরের গাড়িতে হাঁড়ি-কড়াই নিয়ে সে আর শ্যামল গিয়ে গঙ্গার ধারে একটা পিকনিকের জায়গা খুঁজে বের করবে, তারপর স্টেশনে এসে নটার গাড়ি দেখবে। পূর্বা, অপালা, আর সব দূরের বন্ধুরা ওই গাড়িতে আসবে, তাদের নিয়ে যাবে জায়গা মতো। সেটা হল না। শ্যামল নিশ্চয়ই গাল দিচ্ছে সোমেনকে।

কুয়াশা আর শীতের ভিতর দিয়ে ইলেকট্রিক ট্রেন তাকে কখন যে ব্যারাকপুরে এনে ফেলল তা অন্যমনস্ক সসামেন টেরও পেল না। নেমে ঘড়ি দেখল, নটা বাজতে আর অল্পই দেরি। মন ভাল ছিল না বলে তার খেয়াল হয়নি যে এই গাড়িটাতেই ওরাও আসতে পারে। সে আপন মনে নানা কথা ভাবতে ভাবতে স্টেশনের গেট পেরিয়ে বাইরে পা দিতে যাচ্ছে তখন পেছন থেকে শুনতে পেল—ও মা! সোমেন, আমাদের নিতে এসে ফিরে যাচ্ছিস যে বড়?

সোমেনের তখন খেয়াল হয়। ফিরে পূর্বাকে দেখে একটু হাসে।

পূর্বা চোখ বড় বড় করে তাকে দেখে, বলে কোথায় চলে যাচ্ছিলি আমাদের না নিয়ে?

সোমেন বলে—ওরা কোথায়?

—ওই তো! দেখিয়ে দেয় পূর্বা। একটু পিছনে অণিমা, অপালা, ম্যাক্স, অনিল রায়—সবাইকেই দেখা যায়। ওরা গেটের কাছে এগিয়ে আসে। অপালা তাকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে বলে—যা খিদে পেয়েছে না রে! ব্রেকফাস্ট রেডি আছে তো!

সোমেন সিগারেট ধরাল। মানুষের স্রোত বেরিয়ে আসছে। সে সেই স্রোতের মুখে থেকে একটু সরে দাঁড়ায়! অপেক্ষা করে। অপালা বোধ হয় হাতব্যাগে টিকিট খুঁজছে। পাচ্ছে না। ভ্রূ কুঁচকে অধৈর্য হাতে হাঁটকাচ্ছে, তোলপাড় করছে ব্যাগ। পাচ্ছে না। বেড়ার ওপাশে দলটা একটু সরে দাঁড়িয়েছে তোকজনকে পথ দেওয়ার জন্য। পূর্বার মুখটা কাঁদো কাঁদো হয়ে গেছে, সে বলল—ভাল লাগে না। কী যে সব কাণ্ড করিস না!

অপালা বলে—আহা, কাণ্ড আবার কী? ব্যাগ খুলে টিকিটগুলো ভিতরে ফেলে দিয়েছিলাম, বেশ মনে আছে।

অনিল রায় পাইপ খাওয়ার অভ্যাস করছেন। সেটা ধরাতে ধরাতে বেশ নিরুদ্বেগ রসিক গলায় বলেন—ভিতরেই ফেলেছিলে তো! না কি ব্যাগটা খুলতে ভুলে গিয়ে টিকিটগুলো বাইরে ফেলে দিয়েছ!

—না স্যার, স্পষ্ট মনে আছে। বলে অকারণে হাসে অপালা। অণিমাও। কারো কোনও উদ্বেগ দেখা যায় না।

কেবল পূর্বার চোখ ছলছল করে—ইস্ কী ইনসাল্ট স্যার! কী বিচ্ছিরি কাণ্ড! এই সোমেন চলে যাস না।

সোমেন দুপা এগিয়ে যায়, বলে—কী হল, টিকিট পাচ্ছিস না?

—নারে! অপালার ভ্রূ কুঁচকে আসে, চোখ ছোট আর তীক্ষ্ণ হয়। ব্যাগটা তুলে কাত করে ভিতরে খোঁজে।

সোমেন নিরুদ্বেগ গলায় বলে—কী আর করবি, মামাকে বলেকয়ে চলে আয়।

অপালা চোখ তুলে অবাক হয়ে বলে—মামা! মামা আবার কে?

সোমেন চোখের ইশারায় টিকিট চেকারকে দেখিয়ে দেয়। অপালা আর অণিমা অমনি ইয়ারকির গন্ধ পেয়ে টিকিটচেকারের মুখের দিকে চেয়ে হাসতে থাকে। অনিল রায় ধমকে দেন—কী হচ্ছে কী?

—স্যার, সোমেন বলছে ইনি নাকি আমাদের মামা, ছি—ছি—

এ লাইনে সবাই চেকারকে মামা বলে। কেন বলে খোদায় মালুম। অল্পবয়সি চেকারটি গা ছেড়ে দাঁড়িয়েছিল। এখন হঠাৎ সোজা হল। একবার বিরক্তির একটু দৃষ্টিক্ষেপ করে সোমেনের দিকে। ততক্ষণে পূর্বা রুমালে চোখ মুছছে। অনিল রায় বললেন—কোথাও বোধ হয় পড়েটড়ে গেছে তাহলে। দেন উই হ্যাভ টু পে দি ফেয়ার। বলতে বলতে হিপ পকেটের ওয়ালেটে হাত দেন।

তৎক্ষণাৎ টিকিট খুঁজে পায় অপালা। চেঁচিয়ে বলে—পেয়েছি স্যার, ব্যাগের লাইনিঙের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল।

ওরা বেরিয়ে আসে। অনিল রায় বলেন—স্পটটা কি খুব দূরে সোমেন?

—জানি না স্যার।

—জানো না? অবাক হল অনিল রায়।

—না স্যার, আমিও এই গাড়িতে এলাম।

অণিমা কাছেই ছিল, বলল—সে কী? তোমার তো শ্যামলের সঙ্গে আসার কথা।

—আসিনি।

পূর্বা বলে—এ মা! কী হবে তা হলে?

অপালা রেগে গিয়ে বলে—ঠিক জানি, একটা ভণ্ডুল হবেই! এখন গঙ্গার ঘাটময় ঢ্যাঙস ঢ্যাঙস করে শ্যামলকে খোঁজো, ততক্ষণে নাড়িভুঁড়ি হজম হয়ে যাবে।

অনিল রায় নিরুদ্বেগ গলায় বললেন—তাতে কী! ব্যারাকপুর তো আর নিউইয়র্ক নয়। ঠিক খুঁজে পাওয়া যাবে। ব্যারাকপুরের গঙ্গার ঘাটে আমি অনেক এসেছি এক সময়ে। চেনা জায়গা।

অপালা বাতাস শুঁকে বলে—স্যার, জিলিপির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

সবাই জিলিপির গন্ধ পায়। গন্ধে গন্ধে তারা দোকানের দিকে এগিয়ে গেল। মুহূর্তেই সকালের শান্ত দোকানঘরটা সচকিত হয়ে ওঠে কলকাতার হাউড়ে ছেলেমেয়ের কলকলানো কথার শব্দে। জিলিপির পাহাড় ধ্বসে পড়তে থাকে।

সকাল নটাতেও রোদ ফোটেনি। কুয়াশায় আবছা গঙ্গার ধার বড় নিস্তব্ধ। এ অঞ্চলটায় বাগানঘেরা বাড়ি একের পর এক। লোকজন নেই। পাহাড়ি জায়গার মতো কুয়াশায় হিম হয়ে আছে এক প্রাচীন নিস্তব্ধতা। বাগানের মধ্যে কেবল মাথা উঁচু করে আছে কিছু মানুষের চেহারা। সত্যিকারের মানুষ নয়, পাথরের মূর্তি। কলকাতার রাস্তাঘাটে এক সময়ে যেসব সাহেবদের স্ট্যাচু ছিল তা তুলে এনে রাখা হয়েছে।

অনিল রায় পাইপের ডাঁটি তুলে ম্যাক্সকে দেখান, ইংরেজিতে বলেন—ওই হচ্ছে সত্যিকারের ব্রিটিশ স্কাল্পচার। আউট্রামের মূর্তিটা এখন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে রেখে দিয়েছে। সে মূর্তি ভোলা যায় না। টুপি পড়ে গেছে, আউট্রাম ঘোড়ার পিঠ থেকে ঘুরে দেখছে—এমন ডাইনামিক স্ট্যাচু খুব কম দেখা যায়। জীবন্ত পাথর। পার্ক স্ট্রিটে ওর পেডেস্টলে এখন গান্ধীর মূর্তি বসানো আছে—সেটাও মন্দ নয়। কিন্তু তার গ্র্যাঞ্জারই আলাদা।

কুয়াশার ভিতরে দেখা যায় আরও কয়েকজন পাথরের মানুষকে। ব্রিটিশ আমলের কলকাতার সব স্মৃতি। অনিল রায়ের বোধ হয় সেই সব মূর্তি দেখে যৌবন বয়সের কলকাতার কথা মনে পড়ে যায়। তিনি ম্যাক্সের কাঁধে হাত রেখে একটু পিছিয়ে চলতে থাকেন। এবং একটি ব্যর্থ প্রেমের গল্পই বলতে থাকেন বোধ হয়।

অন্যমনস্ক সোমেন এগিয়ে হাঁটছিল। পিছনে মেয়েরা। পূর্বা একটু এগিয়ে এসে বলে—কী কাণ্ড করলি বল তো!

—কী?

—এখন যদি শ্যামলকে খুঁজে না পাই আমরা?

সোমেন কথাটায় কান না দিয়ে বলে—পূর্বা, তোদের বাড়ির ওপরতলায় একটা এক-ঘরের ফ্ল্যাট খালি আছে বলছিলি না?

—হ্যাঁ। বাথরুম, কিচেন নিয়ে কমপ্লিট ফ্ল্যাট, বড় ঘর, চারধার খোলা। কেন?

—আমাকে থাকতে দিবি?

অণিমা এগিয়ে আসে—কী বলছে রে পাজিটা?

পূর্বা ঘাড় না ঘুরিয়ে বলে—আমাদের বাড়িতে থাকতে চাইছে।

—থাকবে মানে? ঘরজামাই হয়ে নাকি? বলে হাসে অণিমা।

পূর্বা ভীষণ লজ্জা পেয়ে বলে—যাঃ। আমাদের তিনতলার ফ্ল্যাটটার কথা বলছে, তোরা যা মুখ পলকা না!

অপালা অণিমার বেণী ধরে টেনে বলে—ঘরজামাই হবে কিরে, ও তোর বর না? সেই যে বিয়ে করে এলি সেদিন, ভুলে গেছিস?

সোমেন 'আঃ' বলে ধমক দেয়। তারপর পূর্বাকে বলে—সত্যিই আমার বড় দরকার। একমাস আমাকে থাকতে দিবি?

অপালা বড় বড় চোখে চেয়ে বলে—বাড়ির সঙ্গে ঝগড়া করেছিস? না কি কোনও পরীক্ষা—ফরীক্ষা দিবি?

সসামেন বলে—তা দিয়ে তোর কী দরকার? আমি তো পূর্বার কাছে ঘরটা ভাড়া চাইছি। মাগনা নয়।

অপালা উত্তর দেয়—তোকে দেবে কেন? পূর্বা ওটা একজন প্রসপেকটিভ ব্যাচেলরকে ভাড়া দেবে, সব ঠিক হয়ে আছে। আই-এ-এস বা ইঞ্জিনিয়ার। ডাক্তার যদিও আমি দুচোখে দেখতে পারি না, তবু তাও চলবে। তোকে দেবে কেন? বেকার, এম-এ'র মতো সোজা পরীক্ষাটাও পাশ করিসনি। তোকে দিয়ে পূর্বার ভবিষ্যৎ কী? বরং ধারকর্জ দিতে দিতে ফতুর হতে হবে।

কথাটা পূর্বার লাগে, গম্ভীর মুখখানা ফিরিয়ে বলে—কেন, ব্যাচেলারকে ভাড়া দেব কেন, আমার বুঝি বর জুটছে না?

অপালা ধমক দিয়ে বলে—কোথায় জুটছে? ধুমসি হয়ে যাচ্ছিস!

—তোরই বা কোন বর জুটছে শুনি!

সোমেন বিরক্ত হয়ে বলে—তোদের কারো জুটবে না। এত ইয়ারবাজ হলে কারো বর জোটে! ছেলেপক্ষ যদি দেখতে আসে তো তাদের সঙ্গেও তোরা ইয়ারকি দিবি, পার্টি কেটে যাবে।

—মাইরি, মাইরি! অপালা লাফিয়ে উঠে বলে—আমাকে একটা পার্টি দেখতে এসেছিল কিছুদিন আগে, পাত্রের জ্যাঠামশাই আর একজন ভগ্নীপতি। আমি খুব সিরিয়াস হয়ে গিয়ে বসলাম। কিন্তু মাইরি জ্যাঠামশাইটা যা বাটকুল না, দেখেই হাসি এসে যাচ্ছিল, অনেক কষ্টে হাসি চেপেচুপে বসে রয়েছি। হঠাৎ শুনি ফঁক-ফঁ ফঁক-ফঁ একটা শব্দ। প্রথমে বুঝতে পারিনি শব্দটা কোথা থেকে আসছে। এদিক ওদিক চাইছি। পাত্রপক্ষকে খাবার-টাবার দেওয়া হয়েছে, তারা খাচ্ছিল আর আমার দিকে মাঝে মাঝে দেখছিল। হঠাৎ টের পেলাম, শব্দটা জ্যাঠামশাইয়ের নাক থেকে আসছে। যখনই খাবার মুখে দেয় লোকটা তখনই মুখবন্ধ অবস্থায় নাক দিয়ে শব্দটা হয়। নাকে পলিপাস থাকলে ও-রকম হয় অনেকের, মুখ দিয়ে শ্বাস টানে, কিন্তু মুখ বন্ধ করলেই বিপদ। আমি মাইরি, আর চাপতে পারলাম না, ফুড়ুক ফুড়ুক করে হেসে ফেললাম।

অণিমা জোরে হেসে ওঠে, বলে—সত্যি?

—মাইরি। কয়েকদিন পর ওরা রিগ্রেট লেটার দিল। বাবার সে কী বকা আমাকে—কিন্তু কী করব বল তো!

গঙ্গার উন্মুক্ত বিস্তারের সামনে এসে পড়তেই কনকন করে ওঠে ঠান্ডা বাতাস। সোমেন বলে—তোদের কারও জুটবে না, আমি বলে দিচ্ছি।

—ঠিক বলেছিস। অপালা দুঃখের গলায় বলে—কেবল আমাদের মধ্যে অণিমাটাই যা লাকি। ওর জুটে গেল বোধ হয়।

—কে? সোমেন অবাক হয়ে বলে।

—দুজন তো দেখতে পাচ্ছি। তুই আর ম্যাক্স। ম্যাক্স তো রোজ প্রোপোজ করছে, একটু আগে গাড়িতেও করছিল। অপালা বলে।

—যাঃ! অণিমা লজ্জার ভাণ করে—আজ করেনি।

—এই মিথ্যুক, তোরা যে ও-পাশের সিটে গিয়ে আলাদা হয়ে বসলি, তখন স্পষ্ট দেখলাম ম্যাক্স, তোকে কী বলল, আর তুই খুব মিষ্টি হেসে মাথা নিচু করলি!

—না, না, সে অন্য কথা।

—কী কথা শুনি? অপালা চোখ পাকায়।

—বলছিল কলকাতায় কলার দাম নাকি বড্ড বেশি। ও কলা ছাড়া থাকতে পারে না।

—যাঃ।

—মাইরি। আমি বলেছি, সস্তায় ওকে কলা কিনে দেব।

'মিথুক, মিথুক' বলে অপালা হাসতে থাকে। শীতের নদীর ধারটা বড় নিস্তব্ধ, জলের শব্দ নেই। ওরা ঢালু বেয়ে নামতে নামতেই দেখতে পেল, ডান ধারে একটু গাছপালার জড়াজড়ি, তার ওধারে দু-চারজন লোক। উনুনের ধোঁয়া উঠছে।

ভারী খুশি হয়ে পূর্বা চেঁচায়—ওই যে!

দূর থেকে তাদের দেখেই শ্যামল রাগারাগি করতে থাকে। কিন্তু কেউ চটে না। কারণ, শ্যামল চমৎকার ব্রেকফাস্ট সাজিয়ে রেখেছে, রুটি-মাখন, ডিমসেদ্ধ, কলা, চায়ের জল ফুটছে ইটের উনুনে। রান্নার দুজন লোক এনেছে শ্যামল, আর একজন নিরীহ চেহারার বন্ধু। বলেছিল বটে, একজন বন্ধুকে আনবে, তাহলে এ-ই। সোমেন লক্ষ করে, লোকটার চেহারা নাদুসনুদুস, মুখে ভালমানুষি আর বোকামি, পরনে খুব দামি স্যুট, হাতে এক ঠোঙা আঙুর।

শ্যামল যথেষ্ট মিহি ও মিষ্টি গলায় পরিচয় করিয়ে দেয়। লোকটার নাম মিহির বোস। শ্যামলের স্কুলফ্রেন্ড, চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। বড় ফার্মে চাকরি করে। পরিচয়ের পর হাতজোড় করে রেখেই অপালার দিকে চেয়ে বলে—সবাই বুঝি আপনারা এম-এ দিয়েছেন!

তার চেহারার ভালমানুষি আর বোকা ভাব সবাই লক্ষ করেছে। অপালার মুখে হাসি খেলে গেল বিদ্যুতের মতো। একটু চাপা গলায় বলে—দূর শালা, তা দিয়ে তোর কী হবে! বলেই নিপাট ভালমানুষের মতো গলা তুলে বলে—হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন তো!

মিহির বোস পরিষ্কার আগের কথাটা শুনতে পেয়েছে, বুঝতে পেরে সোমেন বিরক্ত হয়ে অন্যদিকে মুখ ফেরায়। কিন্তু মিহির বোস শুনলেও রাগ করে না, বলে—ভারী সুন্দর স্পষ্ট কিন্তু এটা। সারাদিন এই জায়গাটায় আপনাদের সঙ্গে কাটাতে পারব ভাবতেই ভাল লাগছে।

—হরি-হরি! চাপা গলায় অণিমা শ্বাস ফেলে বলে।

—কী বললেন? মিহির একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

অণিমা অমায়িক হেসে বলে—কিছু না, হরির নাম...

অপালা হু-হু করে হাসছে। শ্যামল গাছতলায় শতরঞ্চি পাতছে, কী একটু আন্দাজ করে ধমক দিল—এই, কী হচ্ছে? আয় না তোরা, বোস এসে।

অপালা হাসি চাপতে চাপতেই চাপা গলায় বলে—এই মিহির, বোস, বোস। তারপর গলা তুলে বলে—আয় রে সবাই বসি।

থতমত খাওয়া মিহির বোস হাসতে চেষ্টা করে। অপালার দিক থেকে চোখ সরিয়ে অণিমার দিকে চায়। অণিমা সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূ দুটো নাচাতে থাকে। অপ্রস্তুত মিহির বোস চোখ সরিয়ে নেয়। অপালা, অণিমা আর পূর্বা গা টেপাটেপি করে হাসতেই থাকে।

শতরঞ্চিতে বসে অপালা খুব দুঃখের গলায় মিহির বোসকে বলে—বাড়ি ফিরে গিয়ে আজ আপনি নিশ্চয়ই আমাদের খুব নিন্দে করবেন?

ভালমানুষ মিহির বোস তটস্থ হয়ে বলে—না, না, সে কী!

অপালা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে—করবে না রে অণি?

—হ্যাঁ করবে রে অপা। জানেন মিহিরবাবু, আমরা না খুব খারাপ। অণিমা মুখখানা চুন করে বলে।

—না, না। মিহির বোস ঠিক থই পায় না।

অপালা হাতজোড় করে বলে—আমরা সত্যিই ভীষণ খারাপ। সেইজন্য কেউ আমাদের ভালবাসে না, না রে পূর্বা?

পূর্বা মাথা নাড়ে। আঁচলে হাসি চাপতে গিয়ে কাশতে থাকে।

—আমাদের তাই বিয়েও হবে না। অণিমা করুণ স্বরে বলে।

অপালা তাকে একটা ঝাপটা মেরে বলে—না, না জানেন, আমাদের মধ্যে একমাত্র এই অণিমারই হবে। হত না কিন্তু। ভাগ্যিস লোকটা বাংলা তেমন জানে না। এই যে গঙ্গার ধারে উলোঝুলো সাহেবটা দাঁড়িয়ে আছে আমাদের স্যারের সঙ্গে—ওর সঙ্গে অণিমার ভাব। সাহেব বলেই করছে, বাঙালি হলে কিছুতেই—

অণিমা উৎকণ্ঠিতভাবে বলে—ও বাংলা শিখে গেছে অনেকটা। তাই আর একদম প্রোপোজ করছে না আজকাল। আপনার হাতে ওটা কীসের ঠোঙা মিহিরবাবু?

মিহির বোস এতক্ষণে কথা খুঁজে পেয়ে বলল—আঙুর। তারপর শ্বাস ফেলে বলে—খাবেন?

অপালা হাত বাড়িয়ে ঠোঙাটা নিঃসংকোচে নিয়ে নেয়। বলে—পেটুক ভাববেন না তো?

—না, না। বলে হঠাৎ মিহির বোস খুব হাসতে থাকে। সবাই তার দিকে ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করে। সবাইকে অবাক করে দিয়ে মিহির বোস বলে—আমার খুব ভাল লাগছে।

বলে চকচকে চোখে সে অপালার দিকে চেয়ে থাকে।

অণিমা শ্বাস ফেলে বলে—তোরও ব্যবস্থা হয়ে গেল অপা।

পাইপ মুখে অনিল রায়, আর চোখে নীলচে ফসফরাস নিয়ে রোগা সাহেব এগিয়ে আসে। অনিল রায় বলেন—কী হচ্ছে?

পূর্বা এতক্ষণে একটা রসিকতা করে—ম্যাট্রিমণি স্যার।

—ম্যাটিনি? অনিল রায় অবাক হন।

—না স্যার, ম্যাট্রিমণি।

সবাই এত জোরে হাসে, কেউ কিছু বুঝতে পারে না।

ম্যাক্স কথা বলে খুব কম। কদিন দাড়ি কামায়নি, সাদা দাড়িগোঁফে মুখটা আচ্ছন্ন। সবুজ পাঞ্জাবির ওপর জহরকোট, নীচে পায়জামা, উলোঝুলো চুল, ন্যালাক্ষ্যাপার মতো দেখাচ্ছে। সোমেনের পাশে এসে বসে পড়ল।

সোমেন দুঃখ করে বলল—তুমি পুরো ভেতো বনে গেছ সাহেব।

ম্যাক্স হাসল। দীন এবং মলিন একরকম হাসি। বাংলা বোঝে আজকাল। বলল—হুঁ, হুঁ, ঠিক কথা।

—এবার গরমকালে তোমাকে বাঁদিপোতার গামছা পরিয়ে আম আর কাঁঠাল খাওয়াব। আমার গ্র্যান্ডফাদার আর ফাদার ওইভাবে খেত। কনুই পর্যন্ত রস গড়াবে, আর চেটে চেটে খাবে।

অপালা হাসতে হাসতে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে—যাঃ! গরমকাল পর্যন্ত ও থাকবে নাকি? সেদিন ফেয়ারওয়েল দেওয়া হল, দেখলি না? ও চলে যাচ্ছে।

—যাচ্ছে কোথায়! কবে থেকে তো শুনছি যাবে-যাবে!

—যাবে। অণিমা আজও পাকা কথা দেয়নি যে।

অণিমা ফের লজ্জার ভাণ করে বলে—ও প্রোপোজ করে না আজকাল, মাইরি। বাংলা শিখে যাওয়ার পর থেকে—

॥ চোদ্দো ॥

এদের দঙ্গলে সোমেন বড় একটা আসে না। ভাল লাগে না। একসঙ্গে পড়ত, কিন্তু এখন ওরা এগিয়ে রইল, সোমেন পড়া ছেড়ে দিয়েছে। পিকনিকেও আসত না, কিন্তু কাল গাব্বুর পড়ার ঘরে এসে অণিমা খুব ধরল—আমরা চার-চারটে মেয়ে যাচ্ছি, পুরুষ মোটে তিনজন—ম্যাক্স, অনিল রায় আর শ্যামলের কে এক বন্ধু। তাই ব্যালান্স অফ পাওয়ার থাকছে না। তুমি চলো সোমেন। সোমেন অবাক হয়ে বলেছে—কেন, শ্যামল যাবে না? অণিমা অবাক হয়ে বলে—শ্যামলকে ধরেই তো চারজন মেয়ে! সোমেন হেসে ফেলে বলেছে—তাই বলল।

কথাটা মিথ্যে নয়। মেয়েদের সঙ্গ ছাড়া শ্যামল কখনও থাকতে পারে না। পুরুষ-বন্ধু শ্যামলের আছে কি নেই। থাকলেও তাদের সঙ্গ ও খুব পছন্দ করে না বোধ হয়। আশ্চর্যের বিষয়, মেয়েদের সঙ্গে মিশে ওর গলার স্বর আজকাল মিহি হয়ে গেছে। মিষ্টি করে হাসে, চোখের চাউনিতে কটাক্ষ দেখা যায়। অণিমা একটা শ্বাস ফেলে বলেছিল—জানো না তো, শ্যামল আজকাল পুরুষ মানুষ দেখলে বুক ঢাকার চেষ্টা করে।

সোমেনের মন ভাল নেই। কাল রাতে দাদার কাণ্ডটা সারাক্ষণ মনে পড়ছে। মাঝে মাঝে শীতে কেঁপে উঠছে সে। এতকাল সংসারের ভিতরের গণ্ডগোলটা এমনভাবে তাকে স্পর্শ করেনি। দাদা এত নীচে নেমে যায়নি কখনও। বড়দি মাকে ইনল্যান্ডে একটা চিঠি দিয়েছে, দাদা নাকি টালিগঞ্জের জমিটা বউদির নামে কিনবার চেষ্টা করছে। কেনে কিনুক, সোমেনের কিছু যায় আসে না। কিন্তু সেটা দাদা, বা সোমেনকে জানাতে পারত। জানায়নি। এটা নিয়েও হয়তো কথা তুলবে মা। সংসারে আর একটা অশান্তি লেগে যাবে। পিকনিকে এসে সোমেনের তাই মন ভাল নেই।

একা একা একটু ঘুরবে বলে দঙ্গল ছেড়ে বেরোচ্ছিল, এ সময়ে অণিমা সঙ্গ ধরে বলে—কোথায় যাচ্ছ?

—বসে থেকে কী হবে! আমার আজ ইয়ারকি ভাল লাগছে না। তোমরা মিহির বোসকে যা বাঁদরনাচ নাচাচ্ছ!

—বা রে, আমাদের দোষটা কী? লোকটা অত বোকা কেন?

সোমেন ক্ষীণ হাসে, বলে—অবশ্য লোকটারও খুব খারাপ লাগছে না। বোধ হয় অপালার প্রেমে পড়ে গেছে।

—পড়েছেই তো! তোমার মতো হার্টলেস নাকি!

সোমেন একটা ঢিল কুড়িয়ে দূরের একটা ল্যাম্পপোস্টের দিকে ছুঁড়ল। লাগল না। বলল—অণিমা, তুমি এবার একটা প্রেমে পড়ে যাও, নয়তো বাড়ি থেকে পছন্দ-করা ছেলেকে বিয়ে করে ফেল।

—কেন?

—এমন সুন্দর বয়সটা পেরিয়ে যাচ্ছে।

খিলখিল করে ইয়ারকির হাসি হাসে অণিমা, বলে—ভীষণ ফ্রাস্টেটেডরা ওই সব কথা বলে। নিজের হচ্ছে না, তাই অন্যকে উপদেশ দেওয়া।

—পুরুষের বয়স আর মেয়েদের বয়স কি এক? বলে আর একবার ল্যাম্পপোস্টটা লক্ষ্য করে ঢিল ছোঁড়ে সে। লাগে না।

অণিমা হাত ধরে হঠাৎ তাকে থামিয়ে বলে—ব্যস, আর এগিয়ো না, এখান থেকেই ল্যাম্পপোস্টটায় লাগাও দেখি, ক'বারে পারো দেখব!

সোমেন দাঁড়ায়। একটু হেসে ঢিল কুড়িয়ে নেয়। ছোঁড়ে। অনেক দূর দিয়ে সেটা চলে যায়। অণিমা তখন মুখ ফিরিয়ে বলে—সসামেন, তোমার ঢিল ছোঁড়া দেখেই বোঝা যায় আজ তোমার মন খারাপ।

—না না, কে বলল?

—ঢিলটা ল্যাম্পপোস্টে লাগাতে বললাম কেন জানো? ওটা একটা সাইকোলজিক্যাল টেস্ট। খুব গম্ভীরমুখে অণিমা বলে।

সোমেন জানে, এটা ইয়ারকি। তবু বলে—ঠিক আছে, দাঁড়াও লাগাচ্ছি।

একটার পর একটা ঢিল ছুঁড়ল সোমেন। একটাও লাগল না। অনেক দূর দূর দিয়ে চলে গেল। অণিমা হাসে, বলে—আর ছুঁড়ে কাজ নেই, আমার যা বোঝার তা বোঝা হয়ে গেছে। এখন চলো তো, কফি হচ্ছে।

সোমেন একটা সিগারেট ধরায়, চারপাশে চেয়ে দেখে। কুয়াশা এখনও কাটেনি, তবু এই বেলা সাড়ে দশটায় ভোরের সূর্যের মতো এক রক্তিম কুয়াশায় ঢাকা সূর্য গঙ্গার জলে কী অপরূপ আলো ঝরিয়ে দিয়েছে। শ্রীরামপুর এখনও আবছা, তবু এক বিমূর্ত ছবির মতো ফুটে উঠছে নদীর ওপারে। জলে নৌকা, শীতের শান্ত নদীতে চিত্রার্পিত হয়ে আছে। এ পারে ব্রিটিশ আমলের গন্ধমাখা নির্জনতা, বাংলোবাড়ি, ভাঙা পাড়। শ্রীরামপুরের পশ্চাৎপট নিয়ে অণিমা দাঁড়িয়ে। অণিমার মুখশ্রীর কোথাও কোনও বড় রকমের খুঁত নেই। ভোরের আলোয় তাকে ভালই দেখাচ্ছে। একটু হাসিমুখ, চোখে করুণা। সোমেন মাথা নেড়ে বলে—তুমি ঠিকই ধরেছ, মন ভাল নেই।

—কেন সোমেন?

—কিছু না। বলে সোমেন ঢিল কুড়িয়ে নেয়। আবার ছোঁড়ে।

অণিমা বলে—আজ লাগবে না। যতই চেষ্টা করো।

—লাগবে।

—অত সোজা নয় মশাই।

—আচ্ছা দাঁড়াও, দেখাচ্ছি।

তারপর আরও অনেকগুলো ঢিল ছোঁড়ে সোমেন। এক-আধটা খুব কাছ দিয়ে যায়। কিন্তু লাগে না। অণিমা বলে—ইস, আর একটু হলে লেগে গিয়েছিল।

—লাগবে, দাঁড়াও না।

আবার ছোঁড়ে সোমেন। যত মনঃসংযোগ করে ততই ল্যাম্পপোস্টটা আরও দূরের বস্তু, অলীক কল্পনা, ছায়াশরীর হয়ে যায়। ঢিল লাগবার বাস্তব টং শব্দটা শোনা যায় না।

—অমন ডেসপারেটভাবে ছুঁড়ো না। অণিমা সাবধান করে দেয়—কার গায়ে লাগবে।

হতাশ হয়ে সোমেন বলে—এক-একদিন এ-রকম হয়। সেদিন যে কাজেই হাত দাও সব পণ্ড হবে। এক-একটা দুষ্ট দিন আসে।

অণিমা হাসে, বলে—তুমি যতক্ষণ ল্যাম্পপোস্টটাকে ভুলে না যাবে ততক্ষণ ঢিল লাগবে। না।

—লাগবে না? দেখি!

শ্যামল দূর থেকে তাদের নাম ধরে ডাকছে। অণিমা সাড়া দিয়ে সোমেনকে বলে—চলো, চলো, কফি ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।

সোমেন মাথা নেড়ে বলে—না, যতক্ষণ না লাগাতে পারি ততক্ষণ যাচ্ছি না।

—আচ্ছা পাগল। ছেলেমানুষ একটা।

সোমেন হেসে আরও কয়েকটা ঢিল কুড়িয়ে বাঁ হাতে জড়ো করে।

—লক্ষভেদ করে কোন দ্রৌপদীকে পাবে বাবা! ঠান্ডা কফি আমি দু-চোখে দেখতে পারি না—বলে অণিমা চলে যায় রাগ করে।

সোমেন একা নিরর্থক ল্যাম্পপোস্টে ঢিল লাগানোর খেলাটা খেলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য স্থির থাকে না। কত কথা ভাবে, আর আন্দাজে ক্লান্ত হাতে ঢিল ছোঁড়ে। অনভ্যাসে হাত ব্যথিয়ে ওঠে, শীতের বাতাসে নিষ্পলক চোখে জল আসে। তবু আক্রোশে, হতাশায় ঢিল ছুঁড়তে থাকে সসামেন। ফ্রাস্টেশন? তাই হবে।

টং করে অবশেষে একটা ঢিল লাগল। সোমেন একা একা হাসল। সফলতার একটা ক্ষীণ আনন্দ টের পায় সে, এত তুচ্ছ ব্যাপার থেকেও। পরমুহূর্তেই ভাবে, কত নিরর্থক। হাত ব্যথা করছে, ক্লান্তি লাগছে। তারপর একা সোমেন বহুদূর পর্যন্ত হেঁটে চলে গেল।

একটু দূরে একটা গাছের তলায় অনিল রায় হুইস্কির বোতল খুলে বসেছেন, তাঁর সামনে গেলাস হাতে ম্যাক্স আর মিহির বোস। শ্যামল রান্নার তদারকিতে ব্যস্ত, তার কোমরে গামছা, পূর্বা তার পেঁয়াজ কুচিয়ে দিচ্ছে। গাছের ডালে একটা খাটো দোলনা বেঁধে দুলছে অপালা। অণিমার হাতে বই, হাঁটু মুড়ে গাছতলায় বসে আছে।

—কী করছিলি এতক্ষণ? একটা ধমক দেয় অপালা।

সোমেন বলে—ধুমসি কোথাকার, দোলনা ছিঁড়লে বুঝবি মজা। এখনও বয়স বসে আছে ভেবেছিস?

—তোর ঢিল ছুঁড়বার বয়স থাকলে আমারও দোলনার বয়স আছে।

অণিমা মুখ তুলে গম্ভীর গলায় বলে—শোনো।

—কী?

—শেষ পর্যন্ত তুমি ল্যাম্পপোস্টটায় ঢিল লাগিয়েছিলে?

—হুঁ।

—কবারে?

—খেয়াল করিনি। কেন?

—ভাবছিলাম। জানিস অপা, সোমেনের খুব ডিটারমিনেশন, ও দেখিস, উন্নতি করবে।

—কীসে বুঝলি? অপালা দোলনা থেকে নেমে কাছে আসতে আসতে বলে।

—ঢিল ছোঁড়া দেখে।

অপালা শ্বাস ছেড়ে বলে—ঠিকই, ও খুব বীর।

অণিমা বিচ্ছুর মতো মুখ করে বলে—না, না, ওকে এতকাল যা ভেবেছিল ও কিন্তু তা নয়। ঢিলটা লাগানো খুব শক্ত ছিল, ও কিন্তু পেয়েছে।

সোমেন রেগে গিয়ে বলে—তুমিই তো ঢিলটা লাগাতে বললে।

অণিমা হঠাৎ চোখ বড় করে তাকায়। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে সোমেনের দিকে, তারপর যেন সম্মোহন থেকে জেগে উঠতে উঠতে বলে—তুমি সেজন্যই অত সিরিয়াস হয়ে গেলে? না হয় আমার মুখ থেকে একটা কথা বেরিয়েই গেছে! বলে আবার বিহ্বল চোখে চেয়ে থাকে অণিমা। আস্তে করে বলে—ভেবেও সুখ যে একজনের কাছে আমার কথার এত দাম। সোমেন! তুমি কী তবে বলে থেমে চেয়ে থাকে অণিমা।

সোমেন মাথা নাড়ে। বড় বড় চোখে অণিমার দিকে তাকায়। আস্তে করে গাঢ় স্বরে বলে—তবে আজ বলি?

অণিমা মাথা নেড়ে কানে হাত চাপা দেয়, ভয়ার্ত গলায় বলে—না, না, এখন নয়। যেদিন ফুল-টুল ফুটবে, চাঁদ-টাঁদ উঠবে, লোডশেডিং থাকবে, সেদিন দূরে কোথাও গিয়ে—

অপালা ব্যাপারটা দেখে খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল। এতক্ষণে হঠাৎ শ্বাস ছেড়ে বলল—মাইরি, পারিস তোরা! কিন্তু ও কথাটা কী। সোমেন কী বলতে চাইছিল, আর তুই-ই বা চাঁদ-ফুল-লোডশেডিং কী বললি ও-সব?

—ও একটা গোপন কথা। অণিমা বলে।

—আমার সঙ্গে কেউ গোপন কথা বলে না, মাইরি! অপালা দুঃখের গলায় বলল—বলবি। না, এই সোমেন? কিরে?

—ওটা কেবল আমার আর অণিমার একটা ডায়লগ। তুই বুঝবি না। সিক্রেট।

—ইস, সিক্রেট! মারব থাপ্পড়। বল শিগগির!

—না।

—এই সোমেন!

অপালা রেগে সোমেনের হাত খামচে ধরে। অন্য হাতে একটা থাপ্পড় কষায় পিঠে।

সোমেন বলে—ইস, হাতে কী জোর! একদম ব্যাটাছেলে।

—বলবি না?

—তোর বিয়ে হবে না, বুঝলি! সোমেন বলে—হলেও বর ফেরত দিয়ে যাবে। এমন ব্যাটাছেলে মার্কা মেয়ে জন্মে দেখিনি।

—ছেলেগুলো মেনিমুখো হলে আমাদের ব্যাটাছেলে হতেই হয়।

সোমেন একটু দূরে দাঁড়িয়ে বলে—সেজন্যই ছেলে আর মেয়েতে ফ্রি মিক্সিং ভাল নয়। দুপক্ষেই ভেজাল মিশে যায়।

অণিমা গম্ভীর হয়ে বলে—সেই জন্যই বুঝি তুমি আমাদের সঙ্গে সহজে মিশতে চাও না সোমেন! ছোঁয়াচ বাঁচাচ্ছ?

—বটেই তো। আমার বউ হবে একটা আস্ত মেয়েমানুষ, তার মধ্যে ব্যাটাছেলের যেমন ভেজাল চলবে না, তেমনি আমার মধ্যে মেয়েছেলের ভেজাল থাকলে সে-ই বা খুশি হবে কেন?

—ইস! অপালা ঠোঁট ওলটায়—বউ! কোন বউ তোর জন্য ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে আছে? ততাদের জেনারেশন বিয়ে হবে ভেবেছিস? বউ! মারব থাপ্পড়।

—তুই ঠিক পূর্বার মতো হয়ে যাচ্ছিস। আমার বউয়ের কথা শুনে তোর চটবার কী? সোমেন দু-পা পিছিয়ে গিয়ে বলে—আমার একটা বউ হতে নেই? ভিখিরিরও আর কিছু না হোক একটা বউ হয়।

—কিন্তু তোর হবে না। বলে অপালা আঙুল তুলে তেড়ে আসে—তোর কিছুতেই হবে না।

সোমেন তেমনি তটস্থ ভাব দেখিয়ে পিছিয়ে গিয়ে বলে—কিন্তু প্রায় হয়ে গেছে যে!

অপালা থমকে গিয়ে ভ্রূ কুঁচকে তাকায়, বলে—কে?

সোমেন তখন গালগলা চুলকোয়, চোখমুখ বিকৃত করে নানারকম, তারপর হঠাৎ বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলে—দেখছিও তো কবো না, লম্বা ঘুঁষি মারেগা, হা রে মনোপাগলা—

—ও কিরে? অপালা চেঁচিয়ে হেসে ওঠে।

—মনোপাগলা নামে একটা পাগল আসত আমাদের বাড়িতে। সে বলত।

অণিমা আর একটা কপট শ্বাস ফেলে বলে—তুই বুঝিসনি অপা।

—কী বুঝিনি?

—সোমেন প্রেমে পড়েছে। কিন্তু তার কথা আমাদের কাছে বলবে না। ওই ছড়াটার মধ্যে সেটাই বলে দিল। দেখেছে, বলবে না। না, সোমেন?

—মাইরি! অপালা চোখ বড় করে বলে—পড়েছিস?

—হুঁ

—কেমন দেখতে রে?

—দেখছিও তো কবো না!

—আবার?

সোমেন সিগারেট ধরায়, বলে—কী করে বলি কেমন দেখতে! তাকে এখনও ঠিক চোখে দেখিনি, তবে বাঁশি শুনেছি।

—বল না! বল না!

সোমেন অণিমার দিকে তাকায়, হঠাৎ গাঢ় স্বরে বলে—এই অনি, বলে দাও না সোনা! আর লুকিয়ে রেখে লাভ কী?

অণিমা ইয়ারকিটা লুফে নেয়। লাজুক নতমুখে বলে—যাঃ, আমার ভারী লজ্জা করে। তুমিই বলো।

বলে অণিমা আঙুল কামড়ায়।

ধুস! অপলা ভারী হতাশ হয়ে বলে—সেই পুরনো ইয়ারকি। যা ফাজিল হয়েছিস না তোরা। সোমেন, বলবি না তো?

—দেখছিও তো কবো না—সোমেন সুর দিয়ে বলে—লম্বা ঘুঁষি মারেগা, হা রে মনোপাগলা

ভেদ হয় না, কিছুতেই ভেদ হয় না বলে অপালা হঠাৎ দু-পা এগিয়ে এসে সোমেনের সোয়েটারটা বুকের কাছে খিমচে ধরে বলে—বলবি না? বল শিগগির!

সোমেন বলে—ছাড় ছাড়, মোটে একটাই সোয়েটার আমার, বেকার মানুষ।

—বল তা হলে!

—বলছি, বলছি, পূর্বা।

সোয়েটারটা মুঠো করে মোচড়ায় অপালা—বল শিগগির ঠিক করে।

—বলতেই হবে?

—ছিঁড়লাম কিন্তু।

—তুই।

অপালা একটা ধাক্কা দিয়ে ঘন শ্বাস ফেলে বলে—ইস, সাহস কত!

পিকনিক থেকে ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। বলে গিয়েছিল, রাতে খাবে না। তার কারণ, এ বাড়িতে অনুগ্রহণ করতে তার অরুচি।

জামাকাপড় ছেড়ে অনেকটা ঠান্ডা জল খেয়ে শুয়ে পড়তে যাচ্ছিল সে। ননীবালা এসে বলেন—দুটো ভাত খাবি না?

—না।

—রাতে না খেলে হাতি শুকিয়ে যায়, যা হোক দুটো খা।

সোমেন একটু রেগে গিয়ে বলে—না, খিদে নেই। খাওয়া নিয়ে ঘ্যান ঘ্যান করো না তো, ভাল লাগে না।

ননীবালা হাল ছাড়েন না। মুখে কিছু না বলে পান আর জরদার কৌটো খুলে বসেন। বলেন—কখন থেকে ভাত তরকারি গরম করে বসে আছি। গরম কি থাকে। শীতকাল, টপ করে জুড়িয়ে যায়।

—তুমি খাওনি?

ননীবালা ছেলের চোখের দিকে চেয়ে একটু তাচ্ছিল্যের মতো করে বলেন—খাব। তাড়া কী? তুইও দুটো মুখে দিতিস!

সোমেন একটা শ্বাস ছেড়ে বলে—সহজে ছাড়বে না, না বুড়ি?

—ছেলেরা না খেলে মা যে বড় জব্দ হয়ে যায়।

—দাদা ফিরেছে?

—হুঁ। কখন শুয়ে পড়েছে। একটু আগে শুনছিলাম ও-ঘরে কথাবার্তা চলছে। ভাব হয়ে গেছে বুঝি।

—আবার ওদের দরজায় কান পেতেছিলে? সোমেন মার দিকে কটমট করে তাকায়।

ননীবালা বিরসমুখে বলেন—তুই কেবল আমার কান-পাতা দেখিস। কান পাতব কেন? জোরেই বলছিল, শুনেছি।

সোমেন হতাশ হয়ে বলে—তোমাকে নিয়ে পারি না। যত গণ্ডগোলের মূলে তুমি ঠিক থাকবে। ছেলে আর ছেলের বউ ঘরে কী বলে না বলে তা শুনতে তোমার লজ্জা করে না?

ননীবালা অন্য সময় হলে এ কথায় রেগে যেতেন। কিন্তু এখন তাঁকে খুবই ভীতু আর হতাশ দেখাচ্ছিল। বললেন—সংসারের সব কি তুই বুঝিস? ছেলেদের ভালমন্দের জন্য মাকে অনেক অন্যায় করতে হয়। লজ্জা-ঘেন্না থাকলে চলে না।

সোমেন স্থির দৃষ্টিতে ননীবালার চোখের দিকে চেয়ে বলে—তার মানে তুমি আড়ি পেতে ওদের কথা শুনেছ।

—তুই দুটি খেয়ে আমাকে ছেড়ে দে তো! শীতের রাত, তাও অনেক বেজে গেছে। বলে সোজা পানটা মুখে না দিয়ে রেখে দেন ননীবালা। ছেলের দিকে চেয়ে বলেন—চল।

সোমেন কথা বলে না। কিন্তু খেতে যায়।

কয়েক দিন হল, রান্নাঘরের এক ধারে টেবিল পাতা হয়েছে। টেবিলটা ভালই। শ'চারেক খরচ করে দাদা বানাল। ওপরে কালচে রঙের সানমাইকা লাগানো, পায়ায় পেতলের শু। চেয়ারগুলোও চমৎকার। রান্নাঘরটা বেশ বড়, তবু টেবিল চেয়ার পাতার পর আর বেশি জায়গা নেই। ননীবালা টেবিলে খান না, তাঁর এঁটো বাতিক। টেবিলে খেলে সর্বস্ব এঁটো হয়। সোমেন টেবিলে খেতে বসলে মা তার পায়ের কাছটিতে একটা ছোট্ট কাঁসার বাটিতে নিজের জন্য একটু ভাত আর মাছের ঝোল নিয়ে বসেন। ভাল করে খেতে পারেন না। অনিচ্ছায় মুখে গ্রাস তুলে অনেকক্ষণ ধরে চিবোন।

সোমেন জিজ্ঞেস করে—আর কোনও হাঙ্গামা হয়নি তো?

—না, কী হবে! আমে দুধে মিশে গেছে বাবা। আঁটিটা পড়ে আছে।

সোমেন চাপা ধমক দিয়ে বলে—কেন, তাতে তোমার গা জ্বালা করছে? ওদের মিলমিশ হলে তোমার ক্ষতিটা কী হল?

—ক্ষতির কথা বলেছি? মিলমিশ হয়েছে ভালই তো।

—তবে বলছ কেন?

ননীবালা চুপচাপ ভাতের গ্রাস চিবোতে থাকেন। হঠাৎ বলেন—তোর চাকরিটা হল না কেন?

—হল না, এমনিই। সোমেন বিরক্ত হয়ে গেল—কেন, আমার চাকরি দিয়ে কী হবে?

—মাঝে মাঝে ভাবি, তোর একটা কিছু হলে বরং একটু আলাদা বাসা-টাসা করলে হয়।

সোমেন উঠে পড়ে।

ননীবালা খুব সম্প্রতি পান আর জরদার নেশা ধরেছেন। শোওয়ার আগে পান না হলে আজকাল চলে না। পানের বাটা নিয়ে বসতে যাবেন, জাঁতিটা মেঝেয় পড়ে শব্দ হল।

সোমেন শুয়েছিল, বলল—আঃ।

—জেগে আছিস?

—না ঘুমোচ্ছি। বিরক্ত হয়ে সোমেন বলে।

ননীবালা শ্বাস ফেলেন।

সোমেন পাশ ফিরে বলে—ইচ্ছে করে জাঁতিটার শব্দ করলে না?

—না, পড়ে গেল।

ও-সব চালাকি আমি জানি। আমাকে জাগিয়ে এখন ওদের নিন্দেমন্দ করতে বসবে তো!

—সংসারে থাকতে হলে অমন উদোর মতো থাকবি কেন? সব জেনেবুঝে থাকতে হয়।

—জেনেবুঝে আমার দরকার নেই। আমি ভীষণ টায়ার্ড, শুয়ে পড়ো, বিরক্ত কোরো না।

ননীবালা কথা বলেন না। পান খেয়ে ডাবরে পিক ফেলেন। বাতি নিবিয়ে মশারির মধ্যে ঢুকে যান। কিন্তু নানারকম শ্বাসের শব্দ আসে। একবার অস্ফুট কণ্ঠে বলেন—যা মশা! তারপর আবার খানিকক্ষণ চুপ থেকে সোমেন জেগে আছে কি না বুঝবার চেষ্টা করেন। আপন মনেই বলেন—আজ বাচ্চা দুটোকে আমার কাছ থেকে নিয়ে গেল। ওরা যেতে চায়নি। আমার কাছে তো বড় একটা শুতে পায় না।

—বেশ করেছে নিয়ে গেছে। সোমেন বালিশে কান চেপে রেখে বলে—ওদের বাচ্চা ওরা নিয়ে যাবে না কেন? তা ছাড়া তুমিই তো বলো যে ওরা তোমার ঘর নোংরা করে, ওদের পায়ের ধুলোবালিতে তোমার বিছানা কিচকিচ করে!

—সে তো সত্যি। তোরা চারটে ছেলেমেয়ে বড় হওয়ার পর থেকে বাচ্চাকাচ্চা বড় একটা টানি না তো!

—তা হলে আর দুঃখ কীসের?

ননীবালা হঠাৎ একটু চড়া গলায় বলেন—সব না শুনে অত রাগ-রাগ করছিস কেন?

—শুনতে চাই না। ঘুমোও।

ননীবালা মিইয়ে গিয়ে বলেন—হুঁ! ঘুম কি আর হুট বলতেই আসে! আজ বায়ুটা চড়ে গেছে। ঘুম আর হবে না।

—তা হলে আমাকে ঘুমোতে দাও।

—ওখানে কী কী খাওয়াল আজ? ননীবালা প্রসঙ্গ পালটান খুব কৌশলে।

—রণোটা সারাদিন কোথায় কী খেল কে জানে! বহেরুর ওখানে যাওয়ার কথা ছিল, সেখানেই গিয়েছিল বুঝতে পারলাম না। কথা বলতে সাহস পেলাম না। রাতে কিছু খেল না। মুখখানা শুকনো দেখাচ্ছিল। খায়নি বুঝি সারাদিন।

—না খাওয়াই উচিত। যে বউয়ের গায়ে হাত তোলে তার আবার খাওয়া!

—সেটা অন্যায় করে ফেলেছে ঠিকই, কিন্তু রণো তো অত রাগ করার ছেলে না। বউমা কিছু একটা অন্যায় বলেছে নিশ্চয়ই। কাল বাড়িতে পা দেওয়ার পর থেকেই তো টিক-টিক করছিল।

সোমেন কেঁকে উঠে বলে—যা খুশি করুক, তা বলে গায়ে হাত তুলবে!

—বলছি তো সেটা অন্যায় করে ফেলেছে। মানুষ কি সব সময়ে নিজের বশে থাকে?

—দাদার পক্ষ হয়ে একটাও কথা আর বলবে না তুমি।

—কেন বলব না? রণাকে আমি এইটুকুবেলা থেকে বড় করেছি, ওর ধাত আমার চেয়ে ভাল কে জানে! ও ঠান্ডা মানুষ, ওকে রাগালে কেমনতর হয়ে যায়। সেই জন্যই ওকে কেউ কখনও শাসন করেনি। তবে দরকারও হত না, ও তেমন কিছু দুষ্টুমি করতই না। কদিন হল দেখছি ও যেন কেমনধারা হয়ে যাচ্ছে!

—যাচ্ছে যাক। তুমি ওদের মধ্যে বেশি নাক গলিয়ো না।

ননীবালা আবার একটু চুপ থেকে সোমেনের মন বুঝবার চেষ্টা করেন।

তারপর বলেন—শীলার চিঠিটা পড়লি তো! আমি কিছু মাথামুণ্ডু বুঝলাম না। কী বলতে চেয়েছে বল তো! একটু বুঝিয়ে দে।

—আঃ! বলে ভীষণ বিরক্তিতে সোমেন উঠে বসে। বলে—কিছুতেই ঘুমোতে দেবে না?

—ঘুমোস। সকালেবেলা পর্যন্ত ঘুমোস, না হয় ডাকব না। এখন একটু বুঝিয়ে বল তো। বলে ননীবালা মশারি তুলে বাইরে বেরিয়ে বসেন।

ঘর অন্ধকার হলেও বাইরের আলো আবছাভাবে ঘরে আসে। ননীবালার ছায়ামূর্তিটার দিকে আক্রোশভরে একটু চেয়ে থাকে সোমেন। তারপর বলে—তুমি বড়দির চিঠিটা ঠিকই বুঝেছ।

—যা বুঝেছি তা কি হতে পারে?

—হবে না কেন? বাবা তো টাকা দিতে এলেন না। জমিটা হাতছাড়া হয়ে যাক—তাই চাও?

—তাই কি বলেছি? কিন্তু লোকটা এল না কেন, কেমন তার বুকের ব্যথা, এটা তো তোরা। দু-ভাইয়ের একজন গিয়ে খোঁজ নিতে পারতিস!

সোমেন বলে—বাবা তোমার কেউ হয় না? বহেরুর চিঠি পেয়ে তুমিও তো চলে যেতে পারতে!

ননীবালা কথা খুঁজে পান না। তারপর অনেকক্ষণ বাদে ক্ষীণকণ্ঠে বলেন—আমি তো চোখের বিষ। আমাকে দেখলে ব্যথা বেড়েই যাবে হয়তো।

সোমেন বালিশে উত্তপ্ত মাথাটা আবার রাখে। কথা বলে না। ননীবালাও কিছু বলেন না অনেকক্ষণ। তারপর ক্ষীণকণ্ঠে বলেন—তাই বলছিলাম, তোর যদি একটা চাকরি-বাকরি হত তা হলে আলাদা একটু বাসা-টাসা করে মায়ে-পোয়ে থাকতাম।

বড় রাগ হয় সোমেনের। সে বলে—দাদার মতো লোকের সঙ্গে থাকতে পারছ না, দাদা কত ভালবাসে তোমাকে!

—কী করব। দেখছিস তো! সব দোষ কি আমার?

—তোমারই। তোমাকে নিয়ে আমি থাকতে পারব না।

ননীবালা স্তব্ধ হয়ে থাকেন। হাতের ব্রোঞ্জের কয়েকগাছা চুড়ির একটু শব্দ হয়। শ্বাস ফেলেন। খুব বিষণ্ণ ক্ষীণ গলায় বলেন—জবাব দিলি?

॥ পনেরো ॥

বাসে ট্রামে আজকাল অজিত উঠতে পারে না। বড় কষ্ট হয়। অফিসের পরই তাই তার বাসায় ফেরা বড় একটা হয় না। এক সময়ে যখন ইউনিয়ন করত তখন প্রায়দিনই অফিসের পর ইউনিয়নের কিছু না কিছু কাজ থাকত, নয়তো কো-পারেটিবের। এখন সে সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছে। ওভারটাইম থাকলে অফিসের পর সময়টা একরকম কাটে। নইলে বিকেলটা ফাঁকা এবং শূন্য।

অজিত যখন বেরোয় তার বহু আগেই অফিসের লোকজন চলে যেতে শুরু কর। সরকারি অফিস, তাই কেউ সময়টময় মানে না। অজিত যায় না, গিয়ে কী হবে! সাড়ে পাঁচটা ছটা পর্যন্ত কাজ করে সে সময় কাটায়। তারপরও বাসায় ফেরার নামে গায়ে জ্বর আসে। শীলা বেলা থাকতেই স্কুল থেকে ফেরে, কিন্তু অজিত ফেরে না। কার কাছে ফিরবে? একটা বাচ্চাও যদি থাকত!

মুশকিল হয়েছে এই যে, অফিসে তার বন্ধু-টন্ধু বড় একটা নেই। যখন ইউনিয়ন করত তখন বন্ধু ছিল সঙ্গীও ছিল। ইউনিয়ন ছেড়ে দিয়েছে বহুকাল, সেকশন ইনচার্জ হওয়ার পর আর কোনও সম্পর্কও রইল না। যাদের সঙ্গে এক সাথে কাজ করে তাদের সঙ্গে আজও ঠাট্টা মস্করা বা আড্ডার সম্পর্ক আছে বটে, কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তারাও কেমন ভোঁতা হয়ে গেছে, সংসার-চিন্তায় কিছুটা বা আত্মকেন্দ্রিক। হাসি-ঠাট্টা আজও হয় কিন্তু সেও জলের ওপর ভেসে থাকা বিচ্ছিন্ন কুটোকাটার মতো, তাতে স্রোত নেই, টান নেই, গভীরতা নেই।

কলকাতার ভিড় দিনে দিনে কোন অসম্ভাব্যতার দিকে যাচ্ছে তা ভেবে পায় না অজিত। শহরটার আগাপাশতলা দেখলে মনে হয় না এত মানুষ আঁটার জায়গা এখানে আছে। তবু কী করে যেন ঠিক এঁটেও যায়। ট্রামে বাসে ঝুলন্ত মানুষ দেখে অজিত, রাস্তাঘাটে মানুষের শরীর আগেপিছু কেবলই ঠেলে, ধাক্কায়। বিরক্তি, রাগ, ভয় নিয়ে মানুষ চলেছে, ঘুরে মরছে, কোথাও পৌঁছোয় না শেষ পর্যন্ত।

ভিড় একটু কম থাকলেও, এবং অফিসের পর বাসে ট্রামে ওঠা গেলেও অবশ্য অজিত বাসায় ফিরত না। ফিরে গিয়ে কী হবে? শীলা সন্ধে থেকে রেডিয়ো খুলে রাখে, উল বোনে, সিনেমার কাগজ দেখে। অজিত তাড়াতাড়ি ফিরলে অবশ্য খুশি হয়। কিন্তু সেটা কেবল বাড়িতে একজন লোক আসার জন্য যেটুকু খুশি তাই। কথা প্রায়ই বলার থাকে না। শীলা ঝির নিন্দে করতে থাকে, আশেপাশের বাড়ির নানা খবরাখবরের কথা বলে, বড়জোর স্কুলের গল্প করে। ওদের স্কুলে নতুন এক ছোকরা মাস্টার এসেছে, সে নাকি বোকা তাই তাকে নিয়ে অনেক কাণ্ড হয় স্কুলে। সেই সব গল্প বলে শীলা। অজিতের হাই ওঠে।

অফিসের পর একা-একাই কিছুটা হাঁটে অজিত। কিন্তু হাঁটার মতো তেমন জায়গা নেই। ময়দানের অন্ধকারেও দুর্বৃত্তের মতো কিছু মানুষ মুখ লুকিয়ে চুপিসাড়ে ঘোরে পুলিশ নজর রাখে, ভাড়াটে মেয়েছেলেরা গা ঘেঁষে যায়। রেস্টুরেন্টে খুব বেশিক্ষণ একা বসে থাকা যায় না। আসলে এই চল্লিশের কাছাকাছি বয়সেও

তার সেই বয়ঃসন্ধির সময়কার পিপাসা জেগে আছে লক্ষ্মণের জন্য। লক্ষ্মণ আর কোনওদিনই ফিরবে না। একটা কভার ফাইল কিনে তার মধ্যে লক্ষ্মণের সব চিঠি জমিয়ে রাখে অজিত। অবসরমতো সেইসব চিঠি খুলে পড়ে। পিপাসা তাতে বেড়েই যায়।

অবশেষে খুব রাত হওয়ার আগেই অফুরণ সময় ফুরিয়ে না পেরে সে বাসার দিকেই ফেরে। মাঝে মাঝে ভবানীপুরে নেমে নিজেদের বাড়িতেও ঢুঁ মারে। কিছুই আগের মতো নেই। ভাইপো-ভাইঝিরা কত বড় সব হয়ে গেল। মা এখন কত বুড়োটে মেরে গেছে। খুব ডেকে, ভালবেসে কথা বলার কেউ নেই। দাদা বউদি আলগা আলগা কথা বলে, চাকর চা খাবার দিয়ে যায়। ইদানীং অজিত ম্যাজিক দেখায় বলে ভাইপো-ভাইঝিরা ঘিরে ধরে। অন্যমনস্কভাবে কয়েকটা ম্যাজিক দেখায় সে। জমে না।

অজিতকে তাই বাসায় ফিরতেই হয়। নিস্তব্ধ বাড়ি। শিশুর কণ্ঠস্বর নেই। কেবল রেডিয়োটা বাজে। বেজে যায়। কেউ শোনে না।

শীলা দরজা খোলে। কথা বলে না।

অজিত ঘরে ঢোকে। কথা বলে না।

আবার বলেও। খাওয়ার টেবিলে, বিছানায় শুয়ে এক-একদিন কথা হয় অনেক। ডাক্তার মিত্রকে কম টাকা আজ পর্যন্ত দেয়নি অজিত। কম করেও তিন-চার হাজার টাকা বেরিয়ে গেছে। একবার নার্সিং হোমে শীলার একটা অপারেশনও হয়েছে। শীলার কোনও তেমন মারাত্মক খুঁত না পেয়ে ডাক্তার মিত্র অজিতেরও কিছু চিকিৎসা করেছেন। তবু লাভ হয়নি। শীলার পেটে বাচ্চা আসেনি।

—কী আর হবে, ছেড়ে দাও। অজিত হতাশ হয়ে বলেছে।

শীলা কেঁদেছে, বলেছে—তোমাকে জীবনের সবচেয়ে বড় জিনিসটাই দিতে পারলাম না।

—দূর দূর! অজিত সান্ত্বনা দিয়েছে—বাচ্চাকাচ্চা হলে ঝামেলাও কম নাকি। হল হয়তো, বাঁচল না। তখন বাচ্চা না হওয়ার চেয়েও বেশি কষ্ট। ছেলেপুলে বড় করা কি সোজা কথা!

এ কোনও সান্ত্বনার কথাই নয়। তবু আশ্চর্য যে শীলা সান্ত্বনা পায়।

মুখের দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ হেসে বলে—যা বলেছ! ছেলেপুলে হওয়া মানেই তো সারাদিন দুশ্চিন্তা। বাড়িঘর নোংরা করবে, কাঁদবে, চেঁচাবে। অশান্তি বড় কম নাকি! এই পড়ে গেল, এই ছড়ে গেল, এই এটা ভাঙল, সেটা ছিঁড়ল!

অজিত মাথা নেড়ে বলে—তবে?

শীলা শ্বাস ছেড়ে আবার তার বেদনার কাঁটা তুলে নিয়ে বলে—বাচ্চাকাচ্চা তো নয়, যেন অভিশাপ। না গো?

—হুঁ।

—এই বেশ আছি। শান্তিতে, নিরিবিলিতে। হুট করে যেখানে খুশি যেতে পারি। দুশ্চিন্তা নেই, ঝঞ্ঝাট নেই!

অজিত সায় দিয়ে যায়।

এবং এইরকমভাবেই দুটি শিশুর মতো তারা পরস্পরকে স্তোক দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। পারেও।

কিন্তু দুজনের মাঝখানে একটা পরদা নেমে আসে ধীরে। যবনিকার মতো। তাদের দাম্পত্য জীবন যেন এই মধ্যযৌবনেই শেষ হয়ে আসে।

অজিত প্রথম ম্যাজিক শেখে রাস্তার এক ম্যাজিকঅলার কাছে। তিনটে টাকা নিয়ে সে অজিতকে বল অ্যান্ড কাপ, দড়িকাটা আর একটা তাসের খেলা শিখিয়েছিল। সেই তিনটে খেলা দেখিয়ে অজিত চমকে দেয় শীলাকে।

শীলা ভারী আবাক হয়ে বলেছিল—ভারী ভাল খেলা তো! তুমি তো বেশ খেলা দেখাও!

তারপর নানা সূত্রে সে সত্যিকারের ম্যাজিসিয়ানদের কাছে যাওয়া-আসা শুরু করে। বেশ কয়েকটা স্টেজ ম্যাজিক শিখে যায়, টেবিল ম্যাজিক অনেকগুলো টপাটপ শিখে নেয়। ফলে অফিসে, পাড়ায় ম্যাজিসিয়ান হিসেবে লোক তাকে চিনে গেছে। সে পয়সার খেলা দেখায়, জ্বলন্ত সিগারেট লুকিয়ে ফেলে কোথায়, হাতের আঙুলের ফাঁকে শূন্য থেকে নিয়ে আসে পিংপং বল। একটা দুটো তিনটে। এখন তার ভাণ্ডারে ম্যাজিকের মজুদ বড় কম নয়। ম্যাজিকের দোকান ঘুরে, ম্যাজিসিয়ানদের কাছ থেকেও সে সাজসরঞ্জাম কিনেছিল অনেক। ঘণ্টাখানেক স্টেজে দেখানোর মতো স্টক তার আছে।

মাঝেমধ্যে রাত জেগে সে আয়নার সামনে বসে পামিং আর পাসিং অভ্যাস করে। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে অন্যমনে পকেটে হাত দিয়ে কয়েন কনজিওরিং অভ্যাস করে। ভাবে, ম্যাজিকওয়ালা হয়ে গেলে কেমন হয়!

শীলা আজকাল মাঝে মাঝে বলে—তুমি আমাকে ভালবাস না।

—বাসি। নিস্পৃহ উত্তর দেয় অজিত।

—ছাই বাসো!

—কীসে বুঝলে?

শীলা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—সবচেয়ে চাওয়ার জিনিসটা তোমার, তাই দিতে পারলাম না। নিস্ফলা গাছকে কে ভালবাসে বলো!

—হবে। সময় যায়নি।

—কবে আর হবে?

—মিত্র বলেছে, হবে মিত্র এশিয়ার সবচেয়ে বড় গায়নোকলজিস্টদের একজন।

—মিত্রর কথা ছাড়ো, ঘোরাচ্ছে আর টাকা বের করে নিচ্ছে। ওর দ্বারা হবে না। আমারই কোথাও দোষ আছে।

—না। কিছু দোষ নেই।

—ঠিক বলছ?

—বলছি।

অবশেষে একদিন ঋতু বন্ধ হয়ে যায় শীলার। বুক ধুকপুক করতে থাকে। একদিন দুদিন করে দিন যায়। শীলার চোখেমুখে একটা অপার্থিব আলো কোথা থেকে এসে পড়ে।

শীলা বলে—বড় ভয় করে গো!

—কেন?

—কী জানি কী হয়। আমার এমনিতেই একটু লেট ছিল।

—না, না, এ সে লেট নয়। তুমি শরীরের কোনও পরিবর্তন বুঝছ না?

—একটু একটু কিন্তু সেটা মানসিক ব্যাপারও হতে পারে।

—না, না। কাল একবার ডাক্তারের কাছে যাব।

মিত্র দেখেটেখে পরদিন বলেন—মনে হচ্ছে প্রেগন্যান্সি। তবে ইউটেরস একটু বাঁকা হয়ে আছে। নড়াচড়া একদম করবেন না। নরম, খুব নরম বিছানায় দিনরাত শুয়ে থাকবেন।

আজকাল তাই থাকে শীলা। অজিত একটা চমৎকার রবারের গদি কিনে এনেছে। অনেক টাকা দাম। স্কুল থেকে ছুটি নিয়েছে শীলা। অজিতও অফিস কামাই করে খুব। বিছানার পাশে চেয়ার টেনে বসে থাকে। চোখেমুখে উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ।

শীলা উপুড় হয়ে শুয়ে থাকে। নরম গদিতে সুখের শরীর ডুবিয়ে, মুখখানা অজিতের দিকে ফিরিয়ে ড্যাবা-ড্যাবা চোখে চেয়ে থাকে। মাঝেমধ্যে অর্থপূর্ণ হাসি হাসে, বলে—কী গো!

অজিত বলে—কী?

—অফিস যাওনা যে বড়!

—ছুটি জমে গেছে অনেক, নিয়ে নিচ্ছি।

—কেন শুনি। কোনওদিন ছুটি নিতে দেখি না। অফিস তো তোমার প্রাণ।

—প্রাণ-ট্রাণ নয়। কাজ থাকে।

—কাজ কী তা তো জানি।

—কী?

—ফিস খেলা, আড্ডা আর ম্যাজিক।

—না, না, প্রোমোশনের পর থেকে আর ওসব হয় না।

শীলা স্বামীর প্রতি গভীর ভালবাসায় একরকম সম্মোহিত হাসি হাসে, বলে বউয়ের গন্ধ শুঁকে এত বাড়িতে বসে থাকার কী?

—গন্ধটা বেশ লাগছে আজকাল।

—বউয়ের গন্ধ? না কি অন্য কিছু?

—বউয়ের গন্ধই।

—বুঝি গো, বুঝি!

—কী বোঝো?

—বউয়ের গন্ধ নয়। অন্য একজনের গন্ধ।

অজিত নিঃশব্দে হাসে। একটু লম্বাটে মুখ অজিতের। গায়ের রং ফরসার দিকে, সাননের। দাঁত সামন্য বড়। তবু হাসলে তাকে ভারী ভাল দেখায়। মূর্ণ হয়ে চেয়ে থাকে শীলা। স্বামীকে এত ভাল বহুকাল লাগেনি।

শীলা একটা শ্বাস ফেলে বলে—বউ তো পরের মেয়ে, তার জন্য কোনও মানুষটারই বা দরদ উথলে ওঠে! আসল দরদ তো তোমার নিজের জন্য, নিজের রক্তের জন আসছে। তাই অত ছুটি নিয়ে বসে থাকা। বুঝি না বুঝি?

—তোমার জন্য দরদ নেই, এটা বুঝে গেছ? কী বুদ্ধি তোমার!

—ওসব বুঝতে বুদ্ধির দরকার হয় না। হাবাগোবাও ভালবাসাটা বোঝে।

—হবে।

শীলা মৃদু হাসতেই থাকে। বালিশে মুখ ঘষে, গদিটায় একটু দোলায় শরীর, ঠ্যাং নড়ে।

অজিত সতর্ক হয়ে ধমক দেয়—আঃ! অত নড়ো কেন? আচ্ছা চঞ্চল মেয়ে যা হোক।

শীলা গুরগুর করে হাসে, বলে—কী দরদ!

অজিত ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে থাকে।

শীলা ফের বলে—কার জন্য গো, এত দরদ? এতদিন তো দেখিনি।

—বারবার এক কথা! অজিত বিরক্তির ভান করে। কিন্তু তার ভিতরে একটা টলটলে আনন্দ। নিঃশব্দে যেমন কলের তলায় চৌবাচ্চা ভরে ওঠে জলে, উপচে পড়ে—ঠিক তেমনি এক অনুভূতি, গলার কাছে একটা আবেগের দলা ঠেলা মেরে ওঠে।

শীলা একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলার শব্দ করে বলে—সে এখন পেটের মধ্যে একটুখানি রক্তের দলা মাত্র, তবু তার কথা মনে করেই দামি গদি এল, কাজের মানুষ ছুটি নিয়ে বসে থাকল, চোয়াড়ে মুখটায় মাঝে মাঝে হাসিও ফুটছে আজকাল গোঁফের ফাঁক দিয়ে। কী ভাগ্যি আমাদের!

—একটু চুপ করে থাকবে?

শীলা নিঃশব্দে হাসে, চোখেমুখে ঝিকরিমিকরি দুষ্টুমি। একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে—পরের মেয়ের কপাল খুলল এতদিনে।

শীলাকে প্রায়দিনই স্নান করতে দেয় না অজিত। ওঠা-হাঁটা প্রায় বন্ধ। এক-আধদিন শীলা বায়না করে—আর পারি না, শুয়ে থেকে থেকে কোমর ধরে গেল। স্নান না করে শরীর জ্বর-জ্বর। একটু স্নান করতে দাও না।

অজিত আপত্তি করে। শেষ অবধি আবার নিজেই সাবধানে ধরে তোলে শীলাকে। বাথরুমে নিয়ে গিয়ে বলে—আমি স্নান করব।

—এ মা! লোকে কী বলবে?

—কে দেখতে আসছে?

—রেণু রয়েছে না! ঝি হলে কী হয় সব বোঝে।

—ও বাচ্চা মেয়ে, কিছু বুঝবে না।

—না গো, বোঝে।

—বুঝুকগে, অত মাথা ঘামানোর সময় নেই। একা বাথরুমে তুমি একটা কাণ্ড বাঁধাবে, আমি জানি।

বলে বাথরুমের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দেয় অজিত। শীলা আতঙ্কে বলে—না, না, ভারী বিশ্রী দেখায়। বড্ড লজ্জা করে।

অজিতও শোনে না। শীলা তখন অগত্যা চোখ বুজে দাঁড়িয়ে লজ্জায় হাসে। অজিত তার কাপড় ছাড়িয়ে দেয়। একটু আদর করে। খুব সন্দিগ্ধের মতো শীলার পেটটা স্পর্শ করে বলে—এখনও তো কিছু বোঝা যাচ্ছে না! একদম ফ্ল্যাট বেলি।

শীলা চোখ বড় বড় করে বলে—ও বাবাঃ, কী তাড়া! এখনই কী? পাঁচ-ছমাসের আগে। কিছু বুঝি বোঝা যায়।

অজিত বলে—কদিন হল যেন?

—প্রায় দেড়মাস।

অজিত শ্বাস ফেলে বলে—মাত্র!

শীলা হাসতে থাকে, বলে—তোমার বাচ্চা কি মেল ট্রেনে আসবে! সবার যেমন করে আসে তেমনই আসবে। বুঝলে?

অজিত বোঝে। যত্নে স্নান করিয়ে দেয় শীলাকে। ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে শীলার গায়ের জলে নিজেও স্নান করে। ঘরে এনে চুল আঁচড়ে দেয়। বিছানায় বসিয়ে চামচ দিয়ে নিজের হাতে ভাত খাইয়ে দেয়। একই পাতে খায় দুজনে। শীলা ভাজা বা মাছের টুকরো তুলে দেয় অজিতের মুখে। দুজনে পরস্পরের দিকে চেয়ে অর্থপূর্ণ হাসে। বড় সুখ।

রাতে শীলা ঘুমোয়। অজিতের ঘুম বড় অনিশ্চিত। তার স্নায়ুর একটা গণ্ডগোল আছে, মাঝে মাঝে সহজে ঘুম আসে না। মাথা গরম লাগে।

অন্ধকারেই উঠে টেবিল থেকে হাতড়ে রনসন গ্যাসলাইটারটা তুলে নেয়। সিগারেট ধরায়। দপ করে লাফিয়ে ওঠে চমৎকার নীলচে আগুনের শিখা। অমনি লক্ষ্মণের কথা মনে পড়ে। সেই সহৃদয় আর বুদ্ধির শ্রী মাখানো সরল মুখ। একটা ছবি পাঠিয়েছে লক্ষ্মণ। একটা প্রকাণ্ড স্ট্রিমলাইনড গাড়ি—খুব হালফ্যাশানের জিনিস, তার সামনে ওরা স্বামী-স্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে। বউটি ভালই দেখতে, তবে বয়সটা একটু বেশি—লক্ষ্মণেরই কাছাকাছি হবে। আর খুব লম্বা-লক্ষ্মণের সমান। লক্ষ্মণকে চেনাই যায় না ছবিতে। মোটা গোঁফ রেখেছে, বড় জুলপি, চুলও ঘাড়ের কাছে নেমে এসেছে। পরনে চেক প্যান্ট, গায়ে কোট, চোখে। রোদ-চশমা। মানাচ্ছে না লক্ষ্মণকে। মুখে খুশির হাসি। লক্ষ্মণকে কি আর চেনা যাবে না? পুরনো লক্ষ্মণ কি হারিয়েই গেল চিরকালের মতো? এরপর লক্ষ্মণের ছেলেমেয়েরা হবে, চাকরি আরও বড় হবে, কানাডায় শিকড় গেড়ে যাবে ওর। দেশে ফেরা হবে না। এবং লক্ষ্মণের পর ওর বংশধররাও হয়ে যাবে কানাডার মানুষ। তারা বাংলায় কথা বলবে না, আচরণ করবে না বাঙালির মতো, তারাও হবে ভিনদেশি। কেবল বহুকাল আগে প্রবাসে ছিটকে আসা লক্ষ্মণের পদবিটুকু স্মৃতিচিহ্নের মতো লেগে থাকবে তাদের নামের সঙ্গে। এরকম মুছে যাওয়া, নিঃশেষ হয়ে যাওয়া একটা মানুষের পক্ষে কতখানি দুঃখের তা কি লক্ষ্মণ বোঝে না? কলকাতার লক্ষ্মণ কেন অমন বিশ্বজনীন আর আন্তর্জাতিক হয়ে গেল? কোনও চিহ্ন রেখে গেল না স্বদেশে!

বাজে চিন্তা। মাথা থেকে চিন্তাটা বের করে দেয় অজিত। দরজির আঙুলের মাথায় যে ধাতুর টুপি পরানো থাকে হাত-সেলাই করার সময়ে, তাই দিয়ে নতুন একটা খেলা শিখেছে অজিত। পাশের ঘরে আলো জ্বেলে আয়নার সামনে বসে খেলাটা অভ্যাস করতে থাকে সে। ডান হাতের আঙুল থেকে চোখের পলকে বাঁ হাতের আঙুলে নিয়ে যায় বিদ্যুৎগতিতে লুকিয়ে ফেলে হাতের তেলোয়। আবার আঙুলে তুলে আনে। আঙুলের ডগায় ডগায় মুহুর্মুহু দেখা দেয় টুপিটা। হারিয়ে যায়, আবার দেখা দেয়। দ্রুত হাতে আঙুলে বিভ্রম সৃষ্টি করে চলে অজিত। বাচ্চাটা বড় হলে হাঁ করে দেখবে বাবার কাণ্ডকারখানা। ভাবতেই চকিত একটা অদ্ভুত হাসি খেলে যায় মুখে। 'বাবা' শব্দটা কী ভয়ংকর! কী সাঙ্ঘাতিক! দু-হাতের আঙুলে নৃত্যপর ধাতুর টুপির দ্রুত ও মায়াবী বিভ্রমটি তৈরি করতে করতে সে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে থাকে একটু।

শীলা ডাকে—ওগো কোথায় গেলে?

অজিত উঠে ও-ঘরে যায়—কী হল?

—কী করছ রাত জেগে? ম্যাজিক?

—হুঁ।

—পাগলা। ঘুমোবে না?

—ঘুম আসছে না। অজিত বলে।

—কাছে এস। তোমাকে ছাড়া ভাল লাগে না। এসো শিগগির, ও ঘরের বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে এস।

অজিত তাই করে।

বিছানায় এসে শীলা ঘন হয়ে লেগে থাকে গায়ের সঙ্গে। লেপের ভিতরে ওম, দুজনের শরীরের তাপ জমে ওঠে। কিছুক্ষণ ঝিম মেরে থাকে শীলা। আবার আলগা হয়ে উন্মুখ মুখখানা তুলে বলে—অনেক আদর করো।

অজিত আবছায়ায় স্ত্রীর মুখখানা দেখে। তার শ্বাস ঘন হয়ে আসে। দু-হাতে শীলার জলের মতো নরম শরীর চেপে ধরে। বলে—আদরখাকি!

—উসস। শীলা শব্দ করে।

—আদর খেয়ে শখ আর মেটে না তোর বউ?

শীলা করতলে চেপে ধরে তার মুখ, বলে—কথা নয়। আদর।

মুখটা সরিয়ে নিয়ে অজিত হাসে, বললে—আমি যে হাঁফিয়ে যাই! তুই যে বড় বেশি আদরখাকি!

তুমি বুড়ো।

—তুমি কচি খুকি!

শীলা আদর খেতে খেতে বলে—না না, আমাদের সবকিছু মাপমতো। বয়স-টয়স সব।

—মেড ফর ইচ আদার?

উম্‌ম্‌।

রতিক্রিয়ার পর যখন তারা তৃপ্ত ও ক্লান্ত তখন একটা সিগারেটের জন্য বুকটা বড় ফাঁকা লাগে অজিতের। বেরোতে যাচ্ছিল, শীলা জামা টেনে ধরে—কোথায় যাচ্ছ? সিগারেট?

—আগে বাথরুম। তারপর একটা সিগারেট।

উঁহু।

অজিতের সিগারেটের পিপাসা নিয়ে বসে থাকে। মেয়েদের এই বড় দোষ। স্বামীর কীসে ভাল হবে তা সময়মতো সঠিক বুঝতে পারে না, নিজের ধারণামতো চালায়। বিরক্তির সৃষ্টি করে। রতিক্রিয়ার পর এখন শীলার আকর্ষণ কিছুক্ষণের জন্য আর নেই। কেবল সিগারেটের জন্য বুকটা শূন্য। পিপাসা।

তবু অজিত মশারির বাইরে গেল না। হাত বাড়িয়ে বিছানার পাশের ছোট টেবিল থেকে জগ এনে জল খায়, শীলাকে খাওয়ায়। এক সময়ে আস্তে করে বলে—মাকে বলে আসব। কাঁথাটাঁথা সেলাই করতে।

শীলা আঁতকে উঠে বলে—এখনই কেন?

—বুড়ো মানুষ, এখন থেকে শুরু না করলে সময়মতো হবে না।

—না, না! শীলা বলে বাচ্চা হওয়ার আগে ওসব করতে নেই।

—কেন?

—ওসব তুকতাক তুমি বুঝবে না। বেশি সাধ করলে যদি খারাপ কিছু হয়! দূর, যত সব মেয়েলি সংস্কার।

—বাচ্চা হওয়ার আগে বাচ্চার জন্য কিছু করা বারণ। ও সব করবে না। বেশি আদেখলাপানা ভাল নয়।
অজিত একটা শ্বাস ছেড়ে বলে—আচ্ছা।

॥ ষোলো ॥

অফিসে ফিস্ খেলা হয় রানিং জোকারে। তাস বাঁটার পর যে তাসটা চিত হয় তার পরের নম্বরটা হয় জোকার, টেক্কা পড়লে দুরি, দুরি পড়লে তিন। অজিতের কপাল ভাল। প্রতিবার সে ঠিক দুটো তিনটে জোকার পেয়ে যায়। প্রচণ্ড জেতে। প্রতি কার্ডে দশ পয়সা হিসেবে এক-একদিন আট দশ টাকা পর্যন্ত জিতে নেয়।

মাঝখানে খেলত না, আবার ইদানীং খেলে অজিত। মনটা একরকম ফুর্তিতে থাকে আজকাল। মেশিন ডিপার্টমেন্টের কুমুদ বোস বয়স্ক লোক। চেহারাখানা বিশাল, এক সময়ে গোবরবাবুর আখড়ায় বিস্তর মাটি মেখেছে। চুলে কলপ-টলপ দিয়ে ফিনফিনে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে রইসবাবুর মতো থাকে সব সময়ে। বুদ্ধি কিছুটা ভোঁতা কথায় ভরপুর আদিরস। হেরে গিয়ে প্রায় দিনই বলে—ভাদুড়ি, তুমি তো শালা ম্যাজিসিয়ান।

অজিত বলে—তাতে কী?

—ম্যাজিসিয়ান মানেই হচ্ছে শাফলার।

অজিত হেসে বলে—একা আমিই তো প্রতিবার শাফল করছি না! সবাই করছে।

—তবু তুমি শালা তুকতাক জানো ঠিকই। নইলে রোজ জেতো কী করে?

—কপাল। অজিত বলে।

—কপাল না কচু। বলে গজগজ করে বোস—মুফত বসে বসে অতগুলো টাকা মাইনে পিটছ, দোহাত্তা জিতছ তাসে, তোমারটা খাবে কে হে? অ্যাঁ! এতদিনে একটা ছেলেপুলে করতে পারলে না!

—সেটাও কপাল।

—কপাল-টপাল নয়। ও সব করতে পুরুষকার চাই। তোমার সেটা নেই। কতবার তো বলেছি, যদি নিজে না পারো তো বউকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

উলটোদিক থেকে অরুণ দত্ত ধমক দেয়—বোসদা, চুপ!

বোস বলে—ও শালা জিতবে কেন রোজ?

গোপাল মুখার্জি সিগারেটসুদ্ধ ঠোঁটে বলে—ও রোজ সেফটি রেজার দিয়ে কপাল কামায়।

বোস থমথমে মুখ করে বলে কামায়? তাই হবে। ও শালা সবই কামিয়ে ফেলেছে বোধ হয়। পুরুষকার টুরুষকার সব।

একটা হাসি ওঠে।

অজিত সিগারেটের ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে চেয়ে বলে—বোসদা, এবার আপনাদের দেখাব।

—দেখাবে মানে?

—দেখবেন। সময় হোক।

—কিছু বাঁধিয়েছ নাকি এতদিনে?

অজিত উত্তর না দিয়ে হাসে।

বোস শ্বাস ছেড়ে বলে—বুঝেছি। কিন্তু এতদিন লাগল? আমার পাঁচ-ছ'টা নেমে গেছে, গোপালের ক'টা যেন! তিনটে না? ছবছরের বিয়েতে ভাল প্রগ্রেস! অরুণ, তোর? তুই তো নিরুদ্ধবাবু, সেই কবে একটা বানিয়ে বসে আছিস, পাঁচ বছরের মধ্যে আর মুখেভাতের নেমন্তন্ন পেলুম না! করিস কী তোরা, অ্যাঁ?

—সরকারের বারণ আছে। অরুণ দত্ত জবাব দেয়।

কী একটা অশ্লীল কথা বলতে যাচ্ছিল বোস, অজিত সিগারেট ধরিয়ে লাইটারটা বোসের মুখের কাছে ধরে বলল—ফের কোনও খারাপ কথা বেরোলে ছ্যাঁকা দিয়ে দেব। চুপ!

লাইটারটা পট করে কেড়ে নেয় বোস। নেড়েচেড়ে দেখে। বলে—মাইরি কী জিনিস যে বানায় সাহেবরা! আমি সিগারেট খেলে ঠিক এটা মেরে দিতুম।

তাস বাঁটা হয়েছে। সবাই হাতের তাস সাজাচ্ছে। চিতিয়ে পড়েছে টেক্কা, অর্থাৎ রানিং জোকার হচ্ছে দুরি। এবার অজিতের প্রথম টান। সে প্যাকের তাসের দিকে হাত বাড়িয়েছে, ঠোঁটে সিগারেট, চোখ কোঁচকানো, মাথার ভিতরকার যন্ত্র অটোমেশনের মতো হিসেব করে যাচ্ছে।

একটা অচেনা স্বরে কে ডাকল—অজিত!

অজিত উত্তর দিল—উঁ, কিন্তু ফিরে তাকাল না। ডাকটা তার ভিতরে পৌঁছয়নি।

অরুণ দত্ত ঠেলা দিয়ে বলে—কে ডাকছে দ্যাখ।

অজিত বিরক্ত হয়ে ফিরে তাকায়। টিফিনের সময় শেষ হয়ে এল। তাড়াতাড়ি করলে এখনও আর দুই রাউন্ড খেলা হতে পারে। এর মধ্যে কে আপদ জ্বালাতে এল!

অজিতের ঠোঁটে সিগারেট, তার ধোঁয়ায় চোখে জ্বালা, জল। স্পষ্ট কিছু দেখতে পায় না অজিত। ঘাড়টা ঘুরিয়ে একপলক আগন্তুকের দিকে চায়। নস্যি রঙের ব্যাপার গায়ে বুড়ো একটা লোক। গ্রাম্য চেহারা। লোকটা তার চোখে একটি বিস্ময়ভরে চেয়ে আছে।

—কী চাই? অজিত জিজ্ঞেস করে।

লোকটা তার চোখে চোখ রেখে একটু স্তম্ভিতভাবে চেয়েই থাকে। তারপর গলাখাঁকারি দিয়ে বলে—আমার পলিসিটার ব্যাপারে এসেছিলাম। তুমি ব্যস্ত থাকলে...

অজিত হঠাৎ লোকটাকে চিনতে পারে। ব্রজগোপাল লাহিড়ি, তার শ্বশুর। সিগারেটটা টপ করে নামায় সে।

—ওঃ! বলে শশ্যব্যস্তে উঠে পড়ে। আশেপাশে চেয়ার টেনে বসে যারা খেলা দেখছিল তাদের একজনের হাতে নিজের তাসটা ধরিয়ে দিয়ে আসর ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

শ্বশুরমশাই এই অবস্থায় তাকে দেখে ফেলেছেন বলে অজিতের একটু লজ্জা করে। অফিসে বসে তাসটাস খেলা এ নোক যে ভাল চোখে দেখে না, এ তো জানা কথাই। তার ওপর পয়সার খেলা। ভাগ্যিস নগদ পয়সার খেলা হয় না! খাতায় হিসেব লেখা থাকে, মাসের শেষে পেমেন্ট হয়। তবু অস্বস্তি বোধ করে অজিত। এ লোকটার সামনে সে বরাবর এক অনির্দিষ্ট কারণে অস্বস্তি বোধ করেছে।

বহু দিন পর দেখা, একটা প্রণাম করা উচিত হবে কিনা ঠিক বুঝতে পারছিল না অজিত। অফিসের মধ্যে অবশ্য লজ্জাও করে।

দুধারে সার বেঁধে আই-বি-এম মেশিনগুলি চলছে। অনুচ্চ মৃদু শব্দ, কিন্তু অনেকগুলো মেশিনের শব্দ একসঙ্গে হচ্ছে বলে ঘর ভরে আছে শব্দে। তাসের মতো কার্ডগুলি রোলালের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে অনায়াসে, পড়ছে বিভিন্ন খোপে। ঠিক তাদের মতোই মেশিনগুলি তাস শাফল করছে, বাঁটছে। টিফিনের সময়ে মেশিন চলে না। কিন্তু এখন কমিশনের সময় বলে চলছে। কিছু লোক কাজ এগিয়ে রাখে। বিস্ময়ভরে ব্রজগোপাল যন্ত্রগুলির দিকে চেয়ে থাকেন একটু। ব্রজগোপালের পিছনে একটু দূরে দাঁড়িয়ে রণেন। পরনে চমৎকার কাঠকয়লা রঙের স্যুট, চওড়া মেরুন টাই, গালে পানের ঢিবি। হাবাগঙ্গারাম! শ্বশুরমশাইকে দূরে দাঁড় করিয়ে রেখে রণেনই এসে ডেকে নিতে পারত অজিতকে, তা হলে আর অজিতকে ওই অবস্থায় দেখতেন না উনি।

রণেন এগিয়ে এসে বলে—অজিত, চেকটা?

বিরক্তি চেপে অজিত বলে—ডিসচার্জ ফর্মটা জমা দিয়েছ কবে?

—একমাস তো হবেই।

অজিত চিন্তিতভাবে বলে—এতদিনে চেক তো রেজিস্টার্ড পোস্টে চলে যাওয়ার কথা তোমাদের বাড়িতে।

—যায়নি।

অজিত একটু হেসে বলে—সরকারের ঘর থেকে টাকা বের করার কিছু পেরাসনী তো আছেই। সাধারণত ফর্ম জমা দেওয়ার মাস দুই তিন পর চেক যায়। আমি বলে রেখেছিলাম, তাই তাড়াতাড়ি যাওয়ার কথা ছিল।

ব্রজগোপাল আই-বি-এম মেশিনের কার্ড বিলির চমৎকার নিপুণতা লক্ষ করে মেশিন থেকে চোখ তুলে তাঁর বড় জামাইয়ের দিকে চেয়ে বললেন—একটু খোঁজ নিও। কোনও জায়গায় আজকাল আর কাজকর্ম তাড়াতাড়ি হয় না।

—আজই খোঁজ নিচ্ছি। হয়তো আজকালের মধ্যেই চেক চলে যাবে। আপনি এখন কয়েকদিন কলকাতায় থেকে যান।

ব্রজগোপাল তার দিকে চেয়ে থাকেন একটু। তাঁর চোখের বিস্ময় ভাবটা এখনও যায়নি। বললেন—আমি তো কলকাতায় থাকতে পারব না। তবে যদি বলো তো আবার কাল-পরশু আসতে পারি।

—অত ছোটাছুটির দরকার নেই। অজিত সহানুভূতির সঙ্গে বলে—রেজিষ্ট্রি চিঠির খবর পেলে আপনি পরে এসে রিসিভ করে চেক ব্যাঙ্কে জমা দিলেই চলবে। রেজিষ্ট্রি চিঠি পোস্ট অফিসে দিন-সাতেক ধরে রাখবে।

ব্যাপারটা অত সহজ তা যেন বিশ্বাস হতে চায় না ব্রজগোপালের। বলেন—আর কোনও সইসাবুদ বা সাক্ষির দরকার নেই তো?

—না, না।

ব্রজগোপাল রণেনের দিকে চেয়ে বললেন—তা হলে তো হয়েই গেল। চিঠি এলে তোমরা আমাকে খবর দিয়ো।

বলে ব্রজগোপাল দরজার দিকে এগোতে এগোতে বললেন—তোমরা সব ভাল আছ তো?

প্রশ্নটা অজিতকে করা। সে পিছু পিছু হাঁটতে হাঁটতে বলে—ভালই। আপনার শরীর খারাপ শুনেছিলাম।

—শরীরমুখী চিন্তা কখনও করি না। কাজকর্ম নিয়ে থাকি, ভালই আছি।

—কী একটা বুকের ব্যথার কথা শুনেছিলাম।

—হয় বটে মাঝেমধ্যে একটা। সেরেও যায়। আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠি ক্ষেতখামার করি।

—এই বয়সে একটু বিশ্রাম দরকার।

—বিশ্রাম মানে তো শুয়ে বসে থাকা নয়। বিশ্রাম হচ্ছে এক বিশেষ রকমের শ্রম। কোনও কোনও কাজই আছে যা ক্লান্তি ভুলিয়ে দেয়।

অজিত এ বাবদে আর কথা বলতে ভরসা পান না।

সিঁড়ি বেয়ে ব্রজগোপাল লবিতে আসেন। রণেন বাধ্য ছেলের মতো ব্রজগোপালের পায়ে পায়ে হাঁটছে। তার মুখে অন্যমনস্কতা, আর বিষাদ, জমিটার ব্যাপারে আর কোনও কথা বলতে আসেনি রণেন। কথা ছিল, ও বউয়ের নামে জমিটা কিনবে। এখনকার নামে যে লক্ষ্মণের জমিটা কেনা হবে তা সঠিক বুঝতে পারছে না অজিত।

ব্রজগোপাল লবি পার হয়ে পেভমেন্টে নেমে দাঁড়ালেন। বললেন—অজিত, তুমি ফিরে যাও বরং। কাজের ক্ষতি হচ্ছে।

কাজ বলতে ব্রজগোপাল কী বোঝাচ্ছেন তা বুঝতে পারে না অজিত। উনি তাকে তাস খেলতে দেখেছেন। বলা যায় না, কুমুদ বোসের দু-একটা রসিকতাও হয়তো কানে গিয়ে থাকবে। তাস খেলাটাকেই 'কাজ' বলে ঠাট্টা করছেন নাকি? অবশ্য ঠাট্টা করার লোক নন।

অজিত বলে—না, ক্ষতি হবে না। এইটুকুতে কী আর ক্ষতি?

—তবু তুমি তো ইনচার্জ। তুমি ফাঁকি দিলে কর্মচারীরাও ফাঁকিই শিখবে।

অজিত হেসে বলে—টিফিন শেষ হতে এখনও কিছু বাকি আছে।

—ও।

অজিত কবজির ঘড়িটা আড়চোখে দেখে নেয়। টিফিনের টাইমটা হড়কে গেল। শেষ কয়েকটা ডিল খেলা গেল না। খুব জমেছিল আজ। শ্বশুরের দিকে চেয়ে বলল—আমাদের বাসায় তো আসেন না।

—দূরে থাকি। সময় পাই না। দুর্বল অজুহাত দেন ব্রজগোপাল।

—আপনার মেয়ে আপনার কথা খুব বলে।

—হুঁ! বলে ব্রজগোপাল একটু অন্যমনস্ক হয়ে যান। ছেলেমেয়েরা তাঁর কথা বলে এটা যেন ঠিক তার বিশ্বাস হতে চায় না।

—একদিন যাব গোবিন্দপুরে। অজিত বলল।

ব্রজগোপাল একটা শ্বাস ফেলে জামাইয়ের মুখের দিকে তাকাল। বিশ্বাস করেন না, তিনি কলকাতার লোকের মুখের কথা বিশ্বাস করেন না। তবু মাথা নেড়ে বললেন—যেয়ো। জায়গাটা ভালই লাগবে।

একটু অন্যমনস্ক রইলেন ব্রজগোপাল। পেভমেন্টে গা ঘেঁষে অচেনা লোকেরা চলে যাচ্ছে। হাজার লোকের ভিড়ে এক অদ্ভুত অন্যমনস্কতাবশত তিনি বললেন—শীলার মুখটা ভুলেই গেছি। কতকাল দেখি না।

—আজই তো যেতে পারেন বাসায়, শীলা ভীষণ খুশি হবে।

ব্রজগোপাল জামাইয়ের মুখে মেয়ের নাম শুনে বোধ হয় একটু বিরক্ত হন। অজিত লক্ষ করে। ব্রজগোপাল বললেন—আগে প্রথা ছিল ছেলেপুলে না হলে মেয়ের বাড়িতে তার বাপ-মা যায় না।

অজিত সামান্য হাসে। ছেলেপুলে না হলে—কথা লক্ষ্য করেই হাস্য। বলল—ওসব তো প্রাচীন সংস্কার। না মানলেই হল।

ব্রজগোপাল মাথা নেড়ে বলেন—সংস্কারটা ভাল না মন্দ তা না জেনে ভাঙতে আমার ইচ্ছে করে না। তার দরকারই বা কী! আমরা বুড়ো হয়েছি, সব জায়গায় যাওয়া সম্ভব না হতে পারে। তোমরা যেয়ো।

—যাব।

রণেন একটু এগিয়ে রাস্তার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। একটা খালি ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে ডাকল—বাবা, আসুন।

ব্রজগোপাল বিরক্তির স্বরে বললেন—ট্যাক্সি নিলে নাকি?

—হ্যাঁ। রণেন কুণ্ঠিত ভাব দেখায়।

—কেন?

—এ সময়টায় বড্ড ভিড়। ট্রামে বাসে ওঠা যায় না।

—ভিড় হলেও তো লোকে যাচ্ছে আসছে! আমাদের বাবুগিরির কী দরকার?

ট্যাক্সিটা ছেড়ে যেতে অজিত সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল। আজ টিফিন খায়নি। খিদে পেয়েছে।

কিছু খাবে বলে ফুটপাথের হরেক টিফিনওয়ালাদের দিকে কয়েক কদম এগিয়েও গিয়েছিল সে। হঠাৎ মনে পড়ে যায়, শীলা বলেছিল ভাল চকোলেট নিয়ে যেতে। আর ঝাল আচার। আর চানাচুর। এই প্রথম শীলা এসব খেতে চাইছে। তার অর্থ, প্রেগন্যান্সির কোনও গোলমাল নেই।

ছোরার মারের মতো একটা তীক্ষ্ণ ও তীব্র আনন্দ বুক ছুঁড়ে দেয় হঠাৎ। এত তীব্র সেই আনন্দের অনুভূতি যে অজিতের শ্বাসকষ্ট হতে থাকে, হাত পায়ে রিমঝিম করে একটা ঝিঁঝি ছাড়ার মতো হতে থাকে।

অজিত অফিসের সিঁড়ি ভেঙে উঠে যায়।

আই-বি-এম মেশিনগুলি সঙ্গমকালীন সুখের শব্দ তুলে চলছে। মেশিনগুলির পাশ দিয়ে হালকা পায়ে চলে যায় অজিত। অফিসার সেনগুপ্তর টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

—সেনদা!

উঁ। বলে সেনগুপ্ত মুখটা তোলেন। হাসেন।

—আজ চলে যাচ্ছি।

—কী একটা খবর শুনছি!

—কী?

কুমুদ বোস বলে গেল। বউমার নাকি—

অজিত দাঁতে ঠোঁট কামড়ে বলে—একদিন বোসটাকে ঠ্যাঙাব সেনদা।

—মুখটা খারাপ, নইলে লোকটা খারাপ না। বলছিল—

—কী বলছিল?

—বলছিল, ম্যাজিসিয়ানের সব বিফলে যাচ্ছিল, আসল ম্যাজিকটা এতদিন দেখাতে পারছিল না। বউয়ের পেটে দুনিয়ার সবচেয়ে আশ্চর্য ম্যাজিকটা দেখাতে না পারলে নাকি সব বৃথা। বলে সেনগুপ্ত মোটা শরীরে দুলে দুলে হাসেন—সেটা এতদিনে দেখিয়েছে ম্যাজিসিয়ান।

—এখনও কিছু বলা যাচ্ছে না। সেনদা, আজ যাচ্ছি।

—যাও। কিন্তু আমার পড়ার স্কুলে একটা চ্যারিটি শো দিতে হবে, মনে থাকে যেন। বিনা পয়সায়।

—আমার তো টেবিল-ম্যাজিক। শো দিতে অ্যাপারেটাস লাগে।

—ওসব শুনছি না। আমি কথা দিয়ে রেখেছি। ফান্ডের অভাবে স্কুলটা উঠে যাবে হে। আমি সেক্রেটারি হয়ে বসে বসে দেখব?

—আচ্ছা।

অজিত অফিস থেকে বেরোবার আগে আর একবার আই-বি-এম মেশিনগুলির সামনে দাঁড়ায়। কতকাল ধরে এই সব মেশিন সে ঘাঁটছে। একঘেয়ে সব শব্দ। কিন্তু আজ শব্দটা অন্য রকম শোনায়। রতিক্রিয়াকালে শ্বাসবায়ুর মুখের শব্দ, দাঁত ঘষার শব্দ, চুম্বনের শব্দ—সব মিলেমিশে একটা তীব্র কম্পন উঠছে। অজিতের বুক এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে একটা আনন্দ ছোরা মারে আবার। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো শরীর চমকায়।

প্রায় ছুটে বেরিয়ে আসে অজিত। ক্যাডবেরি কেনে, আচার কেনে, চানাচুর কেনে। গ্র্যান্ট স্ট্রিট থেকে কিছু না ভেবে একটা শাড়িও কিনে ফেলে হঠাৎ। টাকা উড়িয়ে দেয়।

এই দুপুরের নির্জনে সে বাড়ি ফিরে কী লিপ্সায়, কী কাতরতায় শীলাকে মিশিয়ে ফেলবে নিজের সঙ্গে। তীব্রতায় সে প্রবেশ করবে শীলার অভ্যন্তরে! শীলা ভীষণ—ভীষণ—ভীষণ—সুখে, লজ্জায়, হাসিতে একাকার হয়ে যাবে তার সঙ্গে!

শীলা হারিয়ে গিয়েছিল। কতকাল অজিতের জীবনে শীলা প্রায় ছিলই না। আবার হঠাৎ কবে শীলা পরিপূর্ণ বউ হয়ে গেল!

ধৈর্যহারা অজিত অস্থির হয়ে ধর্মতলা থেকে ট্যাক্সি ধরল। বলল—জোরে চালান ভাই! জোরে—

॥ সতেরো ॥

ঠিক দুক্কুরবেলা ভূতে মারে ঢেলা। সারাটা দিন যখন শীলা একা, তখনই ভূতে ধরে তাকে। ভূতের ঢিল এসে পড়ে মাথার ভিতরের নিথরতায়। সারাদিন শুয়ে আর বসে সময় কাটে না। দিনটা কেবলই লম্বা হতে থাকে। মাঝে মাঝে অজিত অফিস কামাই করলে তবু এরকম কেটে যায় সময়। কিন্তু আদর ভালবাসা যখন শেষ হয় রতিক্রিয়ায়, তারপর ক্লান্তি আসে, কথা ফুরোয়, টান করে বাঁধা তার হঠাৎ ঢিলে হয়ে বেসুর বাজতে থাকে। বহুদিন শীলা এমন ভালবাসা পায়নি অজিতের কাছ থেকে। আবার বহুকাল ধরে সে নিজেও ভালবাসেনি এত অজিতকে। তবু দিনটা কাটতে চায় না। একা বা দুজন।

একা থাকাটা আরও ভয়ংকর। এখন ইস্কুলে পরীক্ষার সময়। এ সময়ে দু-একটা বেশি ক্লাস নিতে হয়, কোচিং থাকে। মেয়েদের ইস্কুলের নিয়মে বড় কড়াকড়ি। সাড়ে চারটে পর্যন্ত দম ফেলার সময় থাকে না। কিন্তু সেই ব্যস্ততা শীলার বড় ভাল লাগে। নিজেকে ভারী গুরুত্বপূর্ণ মানুষ বলে মনে হয়। ফাঁকে ফাঁকে টিচার্স রুমের আড্ডাটি! খুব ব্যস্ততার মধ্যে দু-পাঁচ মিনিটের চুরি করা আড্ডা যা ঝলমলে করে দেয় মনটাকে।

ইস্কুলের জন্য মনটা বড় উন্মুখ হয়ে থাকে শীলার। কলকাতার শীতের দুপুরের মতো এমন সুন্দর সময় আর কি হয়! এমন দুপুরে ঘরে পড়ে থাকার মতো শাস্তি আর কী হতে পারে? নির্জনতা জিনিসটা কোনওদিনই সইতে পারে না সে। তার ভাল লাগে রাস্তাঘাট, মানুষজন, আলো ঝলমলে চারধার। ভাল লাগে ক্লাসভরতি ছাত্রী, টিচার্স রুমের জমজমাট কথার শব্দ। আর ভাল লাগে কাজ। সংসারের কাজ তার দুচোখের বিষ। কোনও কোনও মেয়ে থাকে যারা সংসারে ঢুকে, মধুর মধ্যে যেমন মাছি আটকে যায়, তেমনি আটকে থাকে। যেমন মা। ঘরসংসারে অমন আকণ্ঠ ডুবে-থাকা মানুষ কমই দেখেছে শীলা। সারা দুপুর মা জেগে থেকে টুকটাক কাজ করছে তো করছেই। কোনও কাজ না পেলে ঝিয়ের মেজে যাওয়া বাসনে কোন কোণে একটু ছাইয়ের দাগ লেগে আছে ব্লেড দিয়ে ঘষে ঘষে তাই তুলবে, আর আপনমনে বকতে থাকবে—ইস, কী নোংরা কাজ! বাপের জন্মে এমন নোংরা কাজ করতে কাউকে দেখিনি। সারা দুপুর রেশনের গম ঝাড়বে কুলোয়, চাল বাছবে, নইলে ফেরিঅলা ডেকে সংসারের জিনিস কিনবে দরদস্তুর করে। ওরকম জীবনের কথা শীলা ভাবতেও পারে না। তার নিজের সংসারটা পড়ে থাকে বাচ্চা ঝিয়ের হাতে। ছাড়া শাড়িটাও শীলাকে ধুতে হয় না, রান্নাবান্না থেকে যাবতীয় কাজ করে দেয় ঝিটা। রান্নায় কখনও কখনও গোলমাল করে। ঘরদোর খুব পরিষ্কার রাখে না, কাজ ফাঁকি দিয়ে পড়ে ঘুমোয়, কিন্তু তবু সংসারটা চলে ঠিকই। কিছু তেমন অসুবিধে বোধ হয় না।

অবশ্য এই ইস্কুল করা বা বাপের বাড়ি মাঝে মাঝে যাওয়া বা একটু দোকান পশার করা—এ ছাড়া শীলাও কি ঘরবন্দি নয়? অজিতের বাইরে বেড়াতে যাওয়ার ধাতই নেই। বড় ঘরকুনো লোক। প্রচণ্ড আলসে। সারাদিন ঘর আর বারান্দা করে, সিগারেট খেয়ে কাটিয়ে দেবে, ছুটির দিনে রাস্তাঘাটে হাঁটতেও চায় না, বলে

—যা ভিড়, আর রাস্তাঘাটের যা বিচ্ছিরি অবস্থা! এই লোকটার সঙ্গে থেকে শীলার বেড়ানোর শখ-আহ্লাদ চুলোয় গেছে।

যে যেমন চায় সে তেমন পায় না কখনও। যেমন তার ছোট বোন ইলা। ঠিক মায়ের স্বভাব পেয়েছে। ছেলেবেলা থেকেই ঘরের কোণে বসে একমনে বিভোর হয়ে পুতুল খেলত, ছাদে যেত না, সঙ্গী-সাথীর সঙ্গে খেলতে তেমন ভালবাসত না। বড় হয়ে মার সঙ্গে ঘুরঘুর করে ঘরের কাজ করত। বিছানা তোলা বা পাড়া, টুকটাক একটু রান্না নামানো চড়ানো, শুকনো কাপড় গুছিয়ে রাখা, ধোপার হিসেব, সংসারের হিসেব রাখা। বিয়ে হল একটা উজ্জ্বল স্মার্ট ছেলের সঙ্গে। মুম্বইতে চাকরি করে। হুল্লোড়বাজ ছেলে। এক জায়গায় বেশিদিন থাকতে ভাল লাগে না বলে কলকাতার সরকারি চাকরি ছেড়ে মুম্বইতে একটা বেসরকারি ফার্মে চাকরি নিয়ে চলে গেল। সেখানে খুব আউটডোরে যায়। দিল্লি মাদ্রাজ করে প্রায়ই। সব সময়ে ঝুঁকি নিতে ভালবাসে। ঘরের জীবনের চেয়ে বাইরের জীবনটা ওর বড় প্রিয়। ইলাকে প্রায়ই ধমকায়, বলে—রোজ রান্নাবান্নার কী দরকার? সপ্তাহে দু-তিন দিন হোটেলে খেলেই হয়!

অমল আর ইলা বছর তিনেক আগে একবার এসেছিল। তখনই অমল দুঃখ করে বলেছিল শীলাকে—শীলাদি, আপনার বোনটি একদম ইনডোর গেম।

—কেন?

—বেরোতেই চায় না মোটে। সারাদিন কেবল ঘর সাজাবে আর গুচ্ছের খাবার-দাবার তৈরি করবে। আমাদের মতো ছেলে-ছোকরার কি ঘরে এসে বসে খুনসুটি ভাল লাগে! বলুন! আমি ওকে প্রায়ই বলি, চলো দুজনে মিলে হিপি হয়ে যাই। শুনেই ও ভয় খায়।

শীলা দীর্ঘশ্বাস চেপে হেসে বলেছে—আর আমার শিবঠাকুরটি হচ্ছে উলটো। ব্যোম বাবা ভোলানাথ হয়ে ঘরে অধিষ্ঠান করবেন। কলকাতা শহরের বারো আনা জায়গাই এখনও চেনেন না। কেবল অফিসের পরে আড্ডাটি আছে, আর কোনও শখ আহ্লাদ নেই। আমার যে বাইরে বেরোতে কী ভাল লাগে!

অমল বড় মুখ-পলকা ছেলে, দায়িত্বজ্ঞান নিয়ে কথা বলে না। ফস করে বলে বসেছিল—ইস শীলাদি, ইলার বদলে আপনার সঙ্গে যদি আমার বিয়ে হত!

শীলা মুখ লুকোতে পথ পায় না। বুকের মধ্যে গুরুগুরুনি উঠে গেল তখনই। সবশেষে খুব হেসেছিল।

ইলা ধমক দিয়ে বলল—দিদি গুরুজন না! ও কী রকম কথা!

অমল অবাক হয়ে বলে—তাতে কী হল! সম্পর্ক তো ঠাট্টারই।

কথাটা ঘোরানোর জন্য শীলা বলে—তা তুই-ই বা ওর সঙ্গে বেরোস না কেন?

—আমি অত ঘুরতে পারি না। গাড়ি-ঘোড়ায় বেশিক্ষণ কাটাতে বিশ্রি লাগে। হোটেলে আমি বড্ড আনইজি ফিল করি। তা ছাড়া নতুন নতুন জায়গায় নিয়ে যাবে, সেখানে পা দিয়ে বিশ্রামটুকুও করতে দেবে না। চলো, সমুদ্রে স্নান করে আসি। চলো পাহাড়ে উঠি। জায়গাটা দেখে আসি চলো। আমার দমে কুলোয় না।

—তোমার লাইফ সোর্স কম। শীলাদিকে দেখো, চোখেমুখে আর শরীরে টগবগ করছে জীবনীশক্তি। শুনে শীলা হাসবে না কাঁদবে ভেবে পায় না। বলেই অমল শীলার দিকে ফিরে বলে—জানেন শীলাদি, ঘুরব বেড়াব ফুর্তি করব বলে বাচ্চাকাচ্চা হতে দিইনি এতকাল। কোম্পানি থেকে ইয়োরোপের মার্কেট যাচাই করতে

পাঠাবে বলছে, ভাবছিলাম ইলার ভিসাটাও করিয়ে নেব। কিন্তু এই আলুসেদ্ধ মার্কা মহিলাকে নিয়ে গিয়ে ঝামেলা ছাড়া কিছু হবে না, সাহেবসুবোর জায়গা—আমি চোখের আড়াল হলেই হয়তো ভয়ে কাঁদতে বসবে।

ইলা মুখ ঝামড়ে বলে—যেতে আমার বয়ে গেছে!

অমল শীলার দিকেই চেয়ে ছিল, দুঃখ করে বলল—ভেবে দেখলাম, বাচ্চাকাচ্চা মানুষ করতেই ওর জন্ম হয়েছে। তাই ভাবছি এবার মুম্বই গিয়েই বাচ্চার ব্যবস্থা করে ফেলব।

সে কী লজ্জা পেয়েছিল শীলা! অমলের সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলার ওই হচ্ছে মুশকিল। গনগনে অ্যাগ্রেসিভ চঞ্চল, প্রাণপ্রাচুর্য ভরা ছেলে। কোনও কথাই বলতে মুখে আটকায় না। কিন্তু ওকে বেশিক্ষণ সহ্য করা যায় না। বুক গুর গুর করে। দমকা বাতাসের মতো মনের দরজা জানালার খিল নাড়িয়ে দিয়ে যায়।

সংসারে ঠিক এরকমই হয়। যা চাওয়া যায় তার উলটোটি বরাতে জোটে।

মনের ভিতরে কত পাপের বাসা। বলতে নেই, শীলার এক-এক সময়ে মনে হয়েছে, অমলের সঙ্গে তার বিয়ে হলে মন্দ হত না। দমকা বাতাসের সঙ্গে খড়কুটোর মতো উড়ে বেড়াতে পারত। কলকাতা ছাড়া আর কোথায়ই বা তেমন গেছে শীলা। অনেক বলেকয়ে একবার পুরী গিয়েছিল একবার দার্জিলিং আর কাছেপিঠে দু-একটা জায়গায়। ইস্কুলের স্টাফ সবাই মিলে বছরে দুবছরে এক-আধবার ডায়মন্ডহারবার বা কল্যাণীতে গেছে পিকনিক করতে, একবার স্টিমার পার্টিতেও গিয়েছিল অজিতের অফিস স্টাফের সঙ্গে। কিন্তু বিশাল ব্যাপ্ত পৃথিবীতে এ তো চৌকাঠ পেরনোও নয়। আর ইয়োরোপ ওদিকে হাত বাড়িয়ে আছে ইলার দরজায়, ইলা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। গতবার ওর ছেলে হল, কলকাতা থেকে ওর শ্বশুর গিয়ে ইলাকে আগলাচ্ছে। অমল গত সেপ্টেম্বরে চলে গেছে ইয়োরোপে। বড় কষ্ট হয় শীলার। ইলুটা বড্ড বোকা।

ঘরবন্দি থাকা মানে একরকম মরে যাওয়া। সে তাই বিয়ের পরই চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ওঠে। তার শ্বশুরবাড়ি বড্ড সেকেলে, মেয়ে-বউদের চাকরি কেউ পছন্দ করে না। কিন্তু ওই বড় সংসারে জবরজং আটকে থাকার হাত থেকে মুক্তি পেতেই শীলা চাকরিটা জোগাড় করেছিল অতি কষ্টে। ওই চাকরিই তার শ্বশুরবাড়ির বদ্ধ সংসারে হাওয়া বাতাসের কাজ করেছে। নইলে সে মনে মনে মরে থাকত এতদিনে। সেই চাকরি থেকেই শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে গণ্ডগোলের সূত্রপাত। কিন্তু চাকরি ছাড়েনি শীলা। তার জেদ বড় মারাত্মক।

তার চাকরির টাকা জমে জমেই জমির দামটা হয়ে গেল, তার সঙ্গে অজিতের সঞ্চয়, আর কিছু ধারকর্জ করে বাড়িটা উঠে গেল অনায়াসে। অজিতের একার রোজগার হলে হত নাকি এত সহজে? তাই শীলার একটা চাপা অহংকার আছে বাড়িটা নিয়ে। একটা মস্ত অভাব ছিল, সন্তান। তাও বোধ হয়... না, বলতে নেই। আগে হোক। কত দুষ্ট লোক নজর দেয়, বাণ মারে, ওষুধ করে।

শরীরের ভিতরে একটা প্রাণ, একটা শরীর। এখনও হয়তো একটা রক্তের দলা মাত্র। সেই দলাটা শীলার শরীর শুষে নেয় ধীরে ধীরে, টেনে নেয়, অস্থি-মজ্জা-মাংস। কে এক রহস্যময় কারিগর তৈরি করে চলেছে এক আশ্চর্য পুতুল তার শরীরের ভিতরে। ভাবতেই গায়ে কাঁটা দেয়, কুলপ্লাবী এক অসহ্য আনন্দের ঢেউঁ গলা পর্যন্ত উঠে এসে দম বন্ধ করে দেয়। ডাক্তার বার বার সাবধান করে দিয়েছে—নড়াচাড়া একদম বারণ, একটু দোষ আছে শরীরে। হঠাৎ দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। পাঁচ মাস ধৈর্য ধরে থাকতেই হবে। তারপর তার তেমন ভয় নেই।

কিন্তু পাঁচটা মাস কি শীলার কাছে কম। এই সুন্দর শীতের দুপুর বয়ে যায় নিরর্থক। সে ঘরের বাইরে পা দিতে পারে না। উল বুনতে বুনতে চোখ ব্যথা করে, দুহাতের আঙুল অসাড় হয়ে আসে। সকালের খবরের কাগজটা কতবার যে উলটোলটে পড়ে সে! মোটা মোটা গল্পের বই শেষ করে। সিনেমার মাসিক কাগজ উলটেপালটে দেখে। তবু সময় ফুরোয় না। বই পড়তে একনাগাড়ে ভালও লাগে না। কিন্তু শরীরের ভিতরে আর একটা শরীরের কথা ভেবে সয়ে যায়। কী নাম হবে রে তোর, ও দুষ্ট ছেলে? খুব জ্বালাবি মাকে? নাম কামড়ে ধরবি, চুল টেনে ধরবি, মাঝরাতে কেঁদে উঠে খুজবি মাকে?...না, না, ভাবতে নেই। আগে হোক। ভালয় ভালয় আগে আসুক কোলজুড়ে।...হতে গিয়ে খুব কষ্ট দিবি না তো মাকে? লক্ষ্মী সোনা ছেলে, কষ্ট হয় হোক আমার, তোর যেন ব্যথাটি না লাগে। কেমন ঝামরে আদর করব! মুখে মুখ দিয়ে পড়ে থাকব সারাদিন। নিজের পেটে আলতো হাত দুখানা রেখে শীলা শুয়ে থাকে। বুক ভরে যায়।

কিন্তু তবু, ঠিক দুকুরবেলা ভূতে মারে ঢেলা।

এই শীতকালে দুপুরেই রোদে একটা ধানি রং ধরে যায়। কোমল ঠান্ডা বাতাস দেয় টেনে। গায়ে একটা স্টোল বা স্কার্ফ জড়িয়ে ধীরে রাস্তা ধরে হেঁটে যেতে এখন বড় ভাল লাগে। শীত তার সবচেয়ে প্রিয় ঋতু। তার দিনে রাতে, তার কুয়াশায় ঢাকা মায়াবী আবহে, তার ফুলে ও ফসলে একটা দারিদ্র ঘুচে যাওয়া প্রাচুর্যের চেহারা আছে। আর থাকে রহস্য, ওম্। পরীক্ষা শেষ হলে শীতকালে ইস্কুলের বারান্দায় কখনও কমলালেবুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে মিষ্টি গন্ধে বুক ভরে ওঠে। খাতা দেখার ফাঁকে ফাঁকে আড্ডা। মেয়েরা যখন কথা বলে তখন সবাই একসঙ্গে বলে, কেউ কারও কথা শোনে না। একজন তার ঝিয়ের গল্প শুরু করতেই অন্যজনও তার ঝিয়ের গল্প শুরু করে দেয়, একজন নিজের ভাইয়ের বিয়ের গল্প ফেঁদে বসতেই অন্যজন তার কথার মাঝখানেই নিজের ননদের প্রসঙ্গ এনে ফেলে। আর ঠিক কথার মাঝখানে তুচ্ছ কারণে সবাই কেবল হাসতে থাকে। এক-এক সময়ে মেয়েরা নিজেরাও ভাবে—ইস্, আমরা কী সব ছোট্টখাট্ট বিষয় নিয়ে কথা বলি—ঝি, গয়না, শাড়ি, বিয়ে! ভাবে আবার বলেও আর কেবলই হাসতে থাকে। তুচ্ছ তুচ্ছ সব কারণে, বহুবার শোনা কথা আবার শুনে, কিংবা পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হাসি পায় বলে কেবলই হেসে যায় তারা।

শীতের দুপুরটার জন্য মন বড় ছটফট করে শীলার, ঘরে বসে থেকে থেকে সে কেবলই দেখে, দিন পুড়ে কালো হয়ে অন্ধকার নেমে আসছে। ইস্কুল ছুটি হয়ে গেল কোথায়, ছেলেদের হল্লা কানে আসে। মনটা একটা ছবিহীন শূন্য চৌকো ফ্রেমের মধ্যে আটকে থাকে। সামান্য এই কারণে চোখে জল এসে যায়।

তাই ঠিক দুক্কুরবেলা, ভূতে মারে ঢেলা।

আজকাল অবশ্য অজিত মাঝে মাঝে তাড়াতাড়ি ফিরে আসে। কোনওদিন বা অফিস কামাইও করে। কিন্তু বড্ড নির্জীব পুরুষ। হঠাৎ উত্তেজনা বশত প্রচণ্ড আদর করতে থাকে, হাঁটকে-মাটকে একশা করে শীলাকে। এবং তারপর তারা পরস্পরের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। তারপরই অজিত অন্যরকম হয়ে যেতে থাকে। একটু বুঝি দূরের মানুষ হয়ে যায়। কথা বলে, আদরও করে, কিন্তু জোয়ারটা থাকে না। হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে, সিগারেট ধরিয়ে ছাদে বারান্দায় যায়। কিংবা আপনমনে ম্যাজিকের স্যুটকেস খুলে সরঞ্জাম বের করে আনে। আপনমনে পাসিং আর পাসিং অভ্যেস করে। করে কয়েন কনজিওরিং, কাপস অ্যান্ড বলসের খেলা অভ্যেস করতে থাকে। দু-চারটে স্কুল শোতেও আজকাল ম্যাজিক দেখায় অজিত। কিন্তু যাই করুক শীলা যে একা সেই

একা। যেদিন অজিত থাকে না সেদিন শীলার বুকের ওপর সময়ের ভার হাতির পায়ের মতো চেপে থাকে। পাঁচ মাস! ওমা গো! ভাবাই যায় না।

কখনও কখনও আবার পেটের ওপর হাত দুখানা রাখে শীলা। কিছুই টের পাওয়া যায় ওপর থেকে। তবু শীলার হাত যেন ঠিক সেই রক্তের দলার ভিতরে অশ্রুত হৃৎস্পন্দন শুনতে পায়। সেই রক্তের পিণ্ডের ভিতরে বান ডাকে, অন্তঃস্থল থেকে উঠে আসে স্পন্দন। শীলা টের পায়। ও ছেলে, কেমন হবে রে তোর মুখখানা? কার মতো?...না, না, থাক, ভাবতে নেই। শীলা ফের হাত সরিয়ে নেয়।

কিন্তু ঠিক দুক্কুরবেলা ভূতে মারে ঢেলা।

ইস্কুলটা খুব বেশি দূরে নয়। বড় রাস্তা পর্যন্ত হেঁটে যেতে লাগে, অজিতের সাত মিনিট, শীলার দশ মিনিট। সেখান থেকে উলটোবাগের ট্রাম ধরলে ঠিক দুটো স্টপ। স্টপ থেকে মোটে তিন-চার মিনিটের রাস্তা। তবে গলিঘুজি দিয়ে একটা শর্টকাট আছে। সে রাস্তাটা ভাল নয়, কিন্তু রিকশা যায়। এক-এক দিন শীলার খুব ইচ্ছে করে, অজিত বেরিয়ে গেলে, চুপি চুপি উঠে সামান্য একটু প্রসাধন করে বেরিয়ে পড়ে। রিকশাঅলাকে বলবে —ভাই খুব ধীরে ধীরে যাবে। বারো আনা ভাড়ার জায়গায় আমি তোমাকে না হয় একটা টাকা দেব। গর্তটর্ত বাঁচিয়ে যেয়ো, যেন ঝাঁকুনি না লাগে।

আবার তখন একটা ভয়ও করে।

ডাক্তাররা যা বলে তার অবশ্য সব সত্যি হয় না। রুগিকে বেশি ভয় দেখিয়ে অনেক সময়েই ওরা একটা বাড়াবাড়ি চিকিৎসা চালায়। ডাক্তারদের সব কথা শুনতে নেই। অন্য কিছু হলে অবশ্য শুনতও না শীলা। কিন্তু সন্তান বলে কথা। বিয়ের পর এতকাল তারা দুজনে যার পদধ্বনির জন্য কান পেতে ছিল সেই রাজাধিরাজ আসছে। সোজা লোক তো নয় সে। দুষ্টু ছেলে, মাকে যে কী কষ্টে ফেলেছিস! তোর জন্য দ্যাখতো কেমন ঘরবন্দি আমি! হোক, তবু তোর যেন কিছু না হয়।

কিন্তু ঠিক দুকুরবেলা ভূতে মারে ঢেলা।

দুপুরবেলায় শীলা তার সেলাই রেখে একটা শ্বাস ফেলে উঠল। আজ একবার যাবে ইস্কুলে। কিছু হবে না। ডাক্তারদের সবতাতেই বাড়াবাড়ি।

॥ আঠারো ॥

কিন্তু ঠিক দুক্কুরবেলা ভূতে মারল ঢেলা।

ভূতের ঢেলাগুলোই ঘরে টিকতে দিল না শীলাকে। অতিষ্ঠ। মাথার ভিতরে একটা পুকুরে যেন ঢিলের ঝড় বয়ে যায়। বিছানায় সর্বক্ষণ পেতে রাখা শরীরের খাঁজে খাঁজে কেবলই ধৈর্যহীনতার ভূতের ঢেলা এসে পড়ে টুপটাপ। শরীর এপাশ ফিরিয়ে শোয়, ওপাশ ফিরিয়ে শোয়। ভাল লাগে না, বই তুলে নেয় হাতে। সেখানেও টুপটাপ ভূতের ঢিল এসে যেন পড়তে থাকে, মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। রেকর্ড-প্লেয়ার একটা সম্প্রতি কেনা হয়েছে সময় কাটানোর জন্য। কিছুক্ষণ রেকর্ড শুনল সে, ইস্কুলে যাবে বলে উঠেও এইভাবে কিছুক্ষণ সময় কাটায় শীলা। যাবে না যাবে না করে। কিন্তু জানালার বাইরে ওই যে রোদে ধানিরং ধরে গেল, বাতাস মৃদু শ্বাস ফেলে বয়ে যায় হাহাকারের মতো। বাইরের পৃথিবীটা আলোর ইশারা হয়ে দক্ষিণের খোলা দরজার কাছে চৌকো পাপোশের মতো পড়ে আছে। ওই রোদে চপ্পল পায়ে গলিয়ে একবার একটুক্ষণের জন্য ঘুরে আসতে বড় ইচ্ছা করে। কী করবে শীলা! এতকাল এতদিন ধরে ঘরবন্দি থাকার অভ্যাস তো নেই।

কী রে ছেলে, যেতে দিবি একবার মাকে? একটুক্ষণের জন্য? সোনা আমার, লক্ষ্মী আমার, আর যে পারি না রে! একটু যাব? লক্ষ্মী সোনা, ভয় দেখাস না। তোর জন্য সারাজীবন কত কষ্ট সহ্য করব দেখিস। একটুও বিরক্ত হব না, রাগ করব না। যেতে দিবি? বাবা আমার, ছেলে আমার...

এ-ঘর গেল, ও-ঘর গেল শীলা, ঘড়িতে মোটে দেড়টা, এখনও লম্বা দুপুর পড়ে আছে। রেকর্ডে গান হচ্ছিল, কী গান তা শোনেওনি সে। রেকর্ড শেষ হয়ে ঘস-স্ আওয়াজ হচ্ছে, সেটা বন্ধ করে দিল। তারপর যেন বা সম্মোহিতের মতোই বেখেয়ালে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়াল সে। সামান্য একটু পাউডার, একটু লিপস্টিক ছুঁইয়ে নেয়। আলমারি থেকে শাড়ি বের করে দ্রুত হাতে পরতে থাকে, মনে মনে সময়ের হিসেবটা কষতে থাকে ঝড়ের মতো। যদি চারটেতেও ফেরে অজিত তা হলেও আড়াই ঘণ্টা সময় হাতে থাকে। রিকশায় বড় জোর শর্টকাট করে গেলে পনেরো কুড়ি মিনিট লাগবে। যাতায়াতে চল্লিশ মিনিট বাদ দিলেও প্রায় দেড় পৌনে দুই ঘণ্টা সে ইস্কুলে থাকতে পারে। কাজকর্ম করবে না কিছু। কেবল একটু অভ্যাস বজায় রেখে আসবে। একটু কথা, একটু হাসি, একটু চেনা মুখ দেখা, চেনা ইস্কুলবাড়িটার একটা ধুলোটে মৃদু গন্ধ আছে, সেই গন্ধটা একটু বুক ভরে নেওয়া। অজিত টের পেলে ভয়ংকর রাগ করবে, বকবে ভীষণ, সেই ভয়ে বুকটা একটু কেঁপে কেঁপে ওঠে। পুরুষ মানুষের সন্তানক্ষুধা বড় প্রবল। সন্তান মানে পুরুষের নিজেরই পুনর্জন্ম। অজিতের নির্বিরোধী জীবনে ওই একটি প্রবল তীব্র ব্যাপার আছে। শীলা তা টের পায় ভীষণ, তার শরীরের এই বিপজ্জনক অবস্থায় সে যদিও বা দু-একটা বেচাল বেভুল কাজ করে ফেলে, হয়তো একটু জোরে ওঠে বা পাশ ফেরে, কিংবা হয়তো রান্নাঘরে যায় তরকারি পাড়তে কিন্তু অজিতের চোখে পড়লে আর রক্ষা থাকে না জোর করে আবার শুইয়ে দেবে, পাহারা দিয়ে বসে থাকবে। অজিতকে তাই বড় ভয়।

দ্রুত একটা একবেণী বেঁধে নেয় শীলা, ঝি মেয়েটাকে ঘুম থেকে ডেকে বলে—ঘোরদোর দেখে রাখিস।

—তুমি বেরোবে বউদি? তোমার না বারণ!

—এক্ষুনি আসব।

—দাদাবাবু যদি চলে আসে!

—বলিস, পাশের বাড়িতে একটু গেছি। একটা রিকশা ডেকে নিয়ে আয় তো।

রিকশায় ওঠার সময়ে যেন অনেকদিন বাদে আকাশ আর পৃথিবীর খোলামেলা কোলটিতে এসে যায় শীলা। কী ভীষণ ভাল লাগে তার।

—ভাই রিকশাঅলা, আস্তে যেয়ো, খুব আস্তে।

—হ্যাঁ।

রিকশা আস্তেই যায়। কখনও একটু জোর হলে শীলা সাবধান করে দেয়। রাস্তাটা খারাপ, এখানে-সেখানে গর্ত। একটু একটু টাল খায়। ওরে ছেলে, ভুল করলাম না তো! সর্বনাশ করিস না, তোর পায়ে পড়ি। না না, ছি ছি, তোর পাপ হবে, পায়ের কথা কেন বলতে গেলাম! চুপ করে থাকিস ছেলে, মাকে ধরে চুপ থাকিস।

দুহাতে দুপাশের হাতল ধরে শক্ত হয়ে বসে থাকে সে। শরীরকে যতদূর সম্ভব আলগা করে রাখে সিট থেকে। শরীরের মধ্যে যে রাজার শরীর সে যেন থাকে ভগবান। শরীরের মধ্যে যে দেবতা সে যেন ছেড়ে না যায়।

শরীরের কোন আবল্যি টের পায় না শীলা। রিকশাটা একটু দুলে দুলে, ধীরে ধীরে রাস্তা পার হয়ে যায়। দূর থেকে ইস্কুলের বাড়িটা দেখতে পায়, শীলা, ইস্কুলের ছাদে শীতের সূর্য আটকে আছে।

স্টাফ-রুমটা ভাগ্যিস একতলায়। শীলা দুধাপ সিঁড়ি, বারান্দা পার হয়ে স্টাফরুমে আসতেই একটা চাপা আনন্দ আর অভ্যর্থনা ছুটে আসে।

—কী খবর!

—আরে, শীলা!

—শুনেছি, শুনেছি, মিষ্টি-টিস্টি খাওয়াও বাবা।

—বেশ সুন্দর হয়েছেন শীলাদি।

—কংগ্র্যাচুলেশনস।

এইরকম সব কথা। বহুকাল পরে স্টাফ-রুমে পা দিয়ে একটা গভীর তৃপ্তি তাকে ধরে থাকে। নাকের পাটা ফুলে ফুলে ওঠে, চোখ ঝলমল করে। দাঁতে ঠোঁট চেপে একরকম হাসতে থাকে সে। লজ্জার হাসি। সে আর চিরকালের সেই একা শীলাটি নেই। তার শরীরের মধ্যে এখন অন্য এক শরীর। হয়তো এক রাজার হয়তো এক দেবতার। অহংকার পাখির মতো তার দুকান ভরে ডাকে।

সে ঘুরে ঘুরে হেড-মিস্ট্রেসের সঙ্গে দেখা করে, ক্লার্কদের সঙ্গে কথা বলে, ছাত্রীদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটায়, স্টাফ-রুমে বসে আড্ডা দেয়। কী ভাল যে লাগে তার! বারবার ঘড়ি দেখে। চারটের এখনও ঢের দেরি আছে।

মীনাক্ষী বলে—শীলা, সুভদ্রর মন খারাপ। দেখছিস না, কথা বলছে না।

সুভদ্র মেয়েদের থেকে দূরে আলাদা চেয়ারে বসেছিল, এ স্কুলে ছেলে স্টাফ খুব অল্প। পণ্ডিতমশাই ছাড়া একজন পুরনো আমলের বিএসসি আছে কেবল। সুভদ্র ঢুকেছিল কমিটির প্রেসিডেন্টের সুপারিশে, একজনের

লিভ ভেকান্সিতে। খুবই সুন্দর দেখতে সুভদ্র। ফরসা টকটকে রং, লম্বা, একটু রোগা হলেও মুখশ্রী মায়াবী কিশোরের মতো। অল্প দাড়ি রাখে সে, মোটা গোঁফ, গায়ে খুব কমদামি কিন্তু সুন্দর রঙিন খদ্দরের শার্ট পরে সে, টেরিকটের গাঢ় রঙের প্যান্ট পরে। সুভদ্র একটু বোকা। কিন্তু আবার এও হতে পারে যে, বোকামির ভান করে। কারণ তার ধারাল মুখে, বা চোখের তীক্ষ্ণ চাউনিতে বোকামির লেশমাত্র নেই। তবু স্কুলের চটুল স্বভাবের শিক্ষিকাদের মধ্যে সুভদ্রর বোকামির গল্প চাউর আছে। সেটা সুভদ্র জানে, কিন্তু রাগ করে না। বরং হাসে।

শীলার সঙ্গে সুভদ্রর পরিচয় কিছু গাঢ়। বলতে নেই, স্কুলে শীলার মতো সুন্দরী কমই আছে। একটু সুখের মেদ জমেছে সম্প্রতি, নইলে শীলার আর কোনও খুঁত নজরে পড়ে না, দিঘল চোখ দুখানায় এখনও অনেক কথার, ইঙ্গিতের রহস্যের খেলা দেখায় শীলা, সিঁথেয় সিঁদুর যাদের আছে তারা ছেলেদের সঙ্গে সহজেই প্রথম আলাপের সংকোচটা কাটিয়ে উঠতে পারে। এই সুন্দর কিশোরপ্রতিম চেহারার যুবকটির সঙ্গে আড্ডা দিতে বরাবরই ভাল লেগেছে শীলার। সে মায়া বোধ করে।

শীলা সুভদ্রকে ডেকে জিজ্ঞেস করে—সুভদ্র, কী হয়েছে? মন খারাপ কেন?

—কে বলে মন খারাপ! সুভদ্র নিরুত্তাপ গলায় বলে।

মীনাক্ষী চাপা গলায় বলে—শোভনাদি ফিরে আসছে, তাই সুভদ্রর চাকরি থাকছে না।

শীলা অবাক হয়ে বলে—শোভনাদি ফিরে আসছে! সে কী! উনি তো বরের সঙ্গে মাদ্রাজ গেলেন এই সেদিন। চাকরি বলে করবেন না?

—সেইটেই তো গোলমাল হল। ওঁর বর আরও প্রমোশন পেয়ে কোম্পানির ডাইরেক্টর হয়ে কলকাতায় ফিরছেন। শোভনাদি জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারিতে জয়েন করবেন বলে চিঠি দিয়েছেন।

শীলার মন খারাপ হয়ে যায়।

মীনাক্ষী বলে—অবশ্য শুধু সে কারণেই যে সুভদ্রর মন খারাপ, তা নয়।

—আর কী কারণ? শীলা জিজ্ঞেস করে।

—সে তো তুই জানিসই বাবা।

—কী জানব?

—আহা, তুই যে ছুটি নিয়ে ঘরে বসে রইলি, সুভদ্র বেচারা এখন কোন আকর্ষণে স্কুলে আসবে?

শীলার কানটান একটু লাল হয়ে ওঠে। আবার মুখে সে হাসেও। সুভদ্র দূর থেকে একবার এদিকে তাকিয়েই উঠে বারান্দায় চলে যায়।

বয়স্কা মাধুরীদি ধমক দিয়ে বলেন—তোর ইতর রসিকতাগুলো একটু বন্ধ করবি মিনু?

—আহা! কে না দেখতে পাচ্ছে বাবা, শীলা ছুটি নেওয়ার পর থেকেই সুভদ্র কেমন মন খারাপ করে ঘুরছে!

মাধুরী হাসেন। অবিবাহিতা এবং বয়স্কা অচলা মুখখানা গাঢ় গাম্ভীর্যে মেখে রাখেন। মেয়েদের প্রেগন্যান্সি তাঁর সহ্য হয় না। গর্ভবতী মেয়েদের দেখলে রাগ করেন। তবু শীলার পক্ষ হয়ে বললেন—মীনাক্ষী, সব ধোঁয়াই কিন্তু আগুনের ইঙ্গিত করে না।

ঠাট্টা। কিন্তু শীলা একটু অস্বস্তি বোধ করে। সুভদ্র আর ঘরে আসে না।

স্কুল চারটের অনেক আগেই ছুটি হয়ে গেল আজ। পরীক্ষার প্রিপ্যারেশনের জন্য মেয়েরা ছুটি চেয়ে অ্যাপ্লিকেশন করেছিল। শুধু উঁচু ক্লাসগুলোর কয়েকটায় ক্লাস চলছে।

তিনটে নাগাদ শীলা বেরিয়ে আসে ফেরার জন্য। বেয়ারাকে রিকশা ডাকতে পাঠিয়েছিল। দীর্ঘ বারান্দার থামের আড়াল থেকে সুভদ্র বেরিয়ে এসে ডাকে—শীলাদি!

—কী খবর? পালিয়ে এলেন যে! কথাটা বলতে বলতেই শীলা হঠাৎ টের পায় তার বুকের মধ্যে কী একটা নড়ে গেল। একটা শ্বাস অর্ধেক কেটে গেল। সঙ্গে একটা শ্বাস কষ্ট। শরীরটা ভার লাগে। ভাল লাগছে না।

—মীনাক্ষীটা বড্ড স্ট্রেট।

—আপনার মন খারাপ কেন?

সুভদ্র একটা শ্বাস ফেলে বলে—শীলাদি, একটা কথার জবাব দেবেন?

—কী?

—আপনি চাকরি করেন কেন?

—কেন করব না?

—দরকার থাকলে নিশ্চয়ই করবেন। কিন্তু আপনার কি চাকরি করা খুব দরকার?

শীলা ক্ষীণ হেসে বলে—না হলে করব কেন?

সুভদ্র মাথা নেড়ে বলে—আমি জানি আপনার হাজব্যান্ড হাজার টাকার ওপর মাইনে পান, কলকাতায় আপনাদের নিজেদের বাড়ি, ফ্যামিলি মেম্বার মোটে দুজন। তবু কেন চাকরি করা দরকার বলুন তো!

শীলা একটু শ্বাস ফেলে কপট গাম্ভীর্য এনে বলে—দরকার যার যার নিজের কাছে। কারও খাওয়া-পরার প্রবলেম, কারও সময়ের প্রবলেম, ধরুন যদি বলি, আমার সময় কাটে বলে চাকরি করি!

সুভদ্র তার বোকামির মুখোশটা পরে নিয়ে একটু বোকা হাসি হাসে। মুগ্ধ চোখে চেয়ে বলে—শীলাদি, আপনি সত্যিই সত্যবাদী।

—কেন?

—ঢাকবার চেষ্টা করেননি। কিন্তু আপনার মতো একজন ভাল চাকুরের বউ বা শোভনাদির মতো একজন ডাইরেক্টরের স্ত্রীর কেবলমাত্র সময়ের প্রবলেমের জন্য কি চাকরি করা উচিত? অঢেল সময় যদি থাকে তো আপনারা মহিলা সমিতি করুন, গান শিখুন বা সিনেমা থিয়েটার দেখুন। চাকরি কেন?

—কষ্ট করে লেখাপড়া শিখব, কিন্তু সেটা কাজে লাগাতে গেলেই কেন দোষ হবে?

—তাতে যে আমার মতো বেকাররা মারা পড়ি! শোভনাদি কলকাতায় ফিরে আসছেন বলেই চাকরিটা আবার নেবেন, নইলে তার দরকার ছিল না। অথচ তিনি জয়েন না করলে একজন অভাবী লোকের উপকার হয়। এ কথাটা আপনারা বোঝেন না কেন!

—কথাটা সত্যি হতে পারে, কিন্তু ওর যুক্তি নেই সুভদ্র।

সুভদ্র মাথা নেড়ে বলে, আছে শীলাদি। যার স্বামী ভাল রোজগার করে সে চাকরি করলে সমাজে ইকনমির ব্যালান্স থাকে না। নকশালাইটরা যে কয়েকটি ভাল কাজ করতে চেয়েছিল তার মধ্যে একটি হল স্বামী-স্ত্রীর দ্বৈত রোজগার বন্ধ করা।

শীলা হাসল। বলল—সুভদ্র, আমার একটু দুঃখ হচ্ছে শোভনাদি ফিরে আসছে বলে।

সুভদ্র ম্লান হেসে বলে—আমি চলে যাচ্ছি বলে নয়?

শীলার অকারণেই আবার কান মুখ লাল হয়ে ওঠে। বলে—সেজন্যও।

ইস্কুল বাড়ি প্রায় ফাঁকা। দুজন হাঁটতে হাঁটতে মাঠটুকু পার হয়ে গেট পেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। সুভদ্র একটা সস্তা সিগারেট ধরিয়ে বলে—আমার চাকরিটা খুব দরকার ছিল।

শীলা একটা শ্বাস ফেলে বলে—পেয়ে যাবেন। একটু খুঁজুন।

সুভদ্রর সাহস আছে। হঠাৎ মুখখানা উদাস করে বলে—চাকরি হয়তো পেতেও পারি, কিন্তু সেখানে আপনার মতো বুদ্ধিমতী সহকর্মী কি পাওয়া যাবে?

শীলা চারধারে চেয়ে দেখে একটু। কেউ নেই, কেউ তাদের লক্ষ করছে না। করলেও দোষের কিছু নেই। সুভদ্র ইস্কুলে ঢোকার পর থেকে দিনের পর দিন শীলা আর সুভদ্র ইস্কুল থেকে একসঙ্গে বেরিয়ে গল্প করতে করতে গিয়ে ট্রাম ধরেছে। ছাড়াছাড়ি হয়েছে শীলার নির্দিষ্ট স্টপে। আবার কখনও সুভদ্র নেমে বাড়ির দরজা পর্যন্ত এগিয়েও দিয়ে গেছে। আবার শীলা কখনও বা স্টপে না নেমে কেনাকেটা করার জন্য চলে গেছে সুভদ্রর সঙ্গেই এসপ্লানেডে বা গড়িয়াহাটা। কিন্তু শরীরের অন্য এক রাজাধিরাজের আগমনবার্তা পাওয়ার পর থেকেই শীলা একটু অন্যরকম হয়ে গেছে। কারও কথাই বেশিক্ষণ ভাবতে পারে না, কেবল শরীরের ভিতরকার সেই শরীর মনে পড়ে। সুভদ্রকে তাই তেমন করে ভেবেছে কি সে এ কয়দিন?

শীলা মুচকি হেসে বলে—শুধু বুদ্ধিমতী?

—সুন্দরীও। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় সুভদ্র।

শীলা মৃদু হাসে। এই স্তাবকতাটুকুর লোভ সে ছাড়ে কী করে?

আজ আর হাঁটে না শীলা। রিকশা আসবে তাই দাঁড়িয়ে থাকে। সুভদ্র পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে খেতে বলে—সত্যি আপনাদের ছেড়ে চলে যেতে খুব কষ্ট হবে। চাকরি পাওয়া সোজা নয়।

শীলা চুপ করে থাকে।

সুভদ্র নিজেই বলে আবার—আমি কোনওকালে পলিটিক্স করতাম না। কিন্তু এখন দেখছি পলিটিক্স করলেই আখেরে লাভ হয়।

—কীরকম?

চাকরি জোটে, বা ব্যবসার লাইসেন্স পাওয়া যায়। ভাবছি, পলিটিক্সে নেমে যাব কিনা।

শীলা পাশ থেকে সুভদ্রর মুখখানা দেখে। কী সুন্দর চেহারা! চাকরি দেওয়ার হাত থাকলে শীলা শুদ্ধমাত্র ওর চেহারা দেখেই একটা চাকরি দিয়ে দিত।

এই মুগ্ধতাটুকু পিনের আগার মতো তীক্ষ্ণ হয়ে লাগে শীলার বুকে। সুভদ্র চলে গেলে স্কুলটা অনেক বিবর্ণ হয়ে যাবে তার কাছে। সে তবু একটু ঠাট্টা করে বলে—বরং সিনেমায় নেমে পড়ুন।

—অ্যাঁ।

—আপনাকে লুফে নেবে।

সুভদ্র হাসল, বলে—অত সোজা নয়। তবে যা পাই তাই করব। কিছুতেই আর আপত্তি নেই। আপনারা যখন আমাদের রাস্তা আটকে রাখবেনই, তখন আমাদের রাস্তা তৈরি করে নিতে হবে।

—শুনুন, শোভনাদির সঙ্গে আমার তুলনা চলে না। আমার চাকরির টাকা সংসারে অনেক হেলপ করে। শোভনাদির তা নয়, ওঁরটা নিতান্তই শখ।

সুভদ্র হেসে বলে—আমার কিন্তু কারও ওপরেই রাগ নেই। যা আছে তা কেবলমাত্র অনুরাগ।

—খুব মুখ হয়েছে দেখছি। বলে শীলা গাঢ় শ্বাস ফেলে মায়াবী যুবকটির মুখখানা দেখে।

—আপনার ঠিকানা জানি। কোনওদিন হুট করে চলে যাব। আপনার হাজব্যান্ডের সঙ্গে আলাপও করে আসব।

—নিশ্চয়ই।

—এলআইসির একটা এজেন্সি নিয়ে রাখি।

—আমি বলে রাখব। কবে আসবেন?

—আসব যে কোনওদিন।

রিকশা এল। শীলা খুব সুন্দর একটু হেসে উঠে বসল। সুভদ্র নিঃসংকোচে তার মুখের দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইল। চোখ সরাল না শীলা। রিকশা কয়েক পা এগোলে শীলা মুখ ঘুরিয়ে হাসিমুখে চেয়ে রইল। গোপনে এই রকম তারা মাঝে মাঝেই চেয়ে থেকেছে পরস্পরের দিকে। যখনই তারা দুজন একা হয়েছে তখনই।

পাপ? কে জানে? কিন্তু ওই একরকম শিহরন, গোপনতা, রহস্য—যা না থাকলে বেঁচে আছে বলে মনে হয় না। শীলা যে কত ঝুঁকি নিয়ে আজ ইস্কুলে এসেছে তা কি আকারটাই সুভদ্রার জন্য নয়? মনের ভিতরে কত কী থাকে, ভাগ্যিস তা অন্যে জানতে পারে না!

সুভদ্রর কথা ভাবতে ভাবতে রিকশাওয়ালাকে আস্তে চালানোর কথা বলতে ভুল হয়ে গিয়েছিল। রিকশাটা পর পর দুটি ঝাঁকুনি খেল। আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে শীলা—আস্তে।

তেমন কিছু টের পেল না শীলা। কেবল বাড়ির সামনে রিকশা থেকে নামার সময়ে হেঁট হতে তলপেটে একটা চিনচিনে ব্যথা টের পেল।

॥ উনিশ ॥

বাসের দোতলায় তিন-চারটে মার্কামারা ছেলে উঠেছে। হাতে বইখাতা, পরনে কারও কলারঅলা গেঞ্জি, কারও রংচঙা সস্তা শার্ট। এই শীতেও গায়ে গরম জামা নেই। চোদ্দো-পনেরো বছর বয়স। দুজনের সিট তিনজন ঠেসে বসেছে। চেহারা দেখলেই বোঝা যায় গরিব ঘরের ছেলে, বাজে ইস্কুলে পড়ে, যে ইস্কুলে ইউনিফর্ম পরার বালাই নেই। কলকাতার বিস্তৃত বস্তি অঞ্চল থেকে এরকম চেহারার বহু ছেলে সস্তা বাজে ইস্কুলে লেখাপড়া শিখতে যায়।

একটা ছেলে চেঁচিয়ে বলে—কিস, কিস, এই টুবু, একটা কিস দিবি?

বলতে বলতে ছেলেটা তার পাশের ছেলেটার গলা জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করে।

ছেলেটা মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে—যাঃ। পাবলিক রয়েছে।

—তোর পাবলিকের 'ইয়ে' করি।

ছনম্বর বাসের দোতলায় প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে পিছনে দাঁড়িয়ে সোমেন দৃশ্যটা দেখে। সাদা আর ঘন নীল ইউনিফর্ম পরা তিন চারজন মেয়ে বসে আছে ডান দিকের দু-তিনটে সিটে, ফরসা ফরসা, গোলগাল অবাঙালি মেয়ে কজন, হাতে ছোট সুটকেস, কাঁধে প্লাস্টিকের জলের বোতল ঝুলছে। সম্ভবত ইংলিশ মিডিয়াম ইস্কুলে পড়ে, ছেলেগুলো ওদের দিকে তাকায়ে ওই সব করে যাচ্ছে। ইংরেজি শব্দগুলো ওই কারণেই বলা।

রাগে হাত-পা রি-রি করে সোমেনের। বাসসুদ্ধ লোকের একজনও রুখে উঠলে পুরো দৃশ্যটা পালটে যায়। কিন্তু কেউ কোনও রা' কাড়ে না। বরং না শুনবার ভান করে অন্যদিকে চেয়ে থাকে।

মেয়েগুলোর ফরসা মুখচোখ লাল হয়ে উঠেছে। বাচ্চা একটা মেয়ে হঠাৎ মুখ ফেরাতে সোমেন দেখল, মেয়েটার চোখে স্পষ্ট কান্নার চিহ্ন।

—হোয়াট ইজ ইয়োর নেম? অন্যদিকে চেয়ে একটা ছেলে জিজ্ঞেস করে।

বন্ধুদের একজন বলে—মাই নেম ইজ—বলে মুম্বইয়ের একজন ফিলমস্টারের নাম করে। তাকে ধমকে দেয় প্রথম ছেলেটা, খিস্তি করে। তারপর আবার জিজ্ঞেস করতে থাকে—হোয়াট ইজ ইয়োর নেম? হোয়াট ইজ ইয়োর নেম?

মেয়েগুলো ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছে।

সোমেনের পিছন থেকে একজন ফিসফিস করে বলে—কী সব ছেলে!

ব্যস। আর কোনও প্রতিবাদ হয় না। সোমেনের সামনে দু-চারজন দাঁড়িয়ে আছে। বাসের ঝাঁকুনিতে দোতলায় দাঁড়িয়ে ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করছে। বাস ব্রেক কষে, আবার চলে। এ-ওর গায়ে ধাক্কা খায় আগে পিছে। টলে ঢলে পড়ে যেতে যেতে আবার দাঁড়ায়।

বাসটা কোথায় এসেছে বোঝা যাচ্ছিল না ভিড়ের জন্য। ছেলেদের একজন চেঁচিয়ে ওঠে—ওই যে, নিরোধের বিজ্ঞাপন। নিরোধ ব্যবহার করুন, পনেরো পয়সায় তিনটে...

কোথায় এসেছে তা না বুঝেও সোমেন ভিড় ঠেলে নামতে থাকে। বেশিক্ষণ তার এসব সহ্য হয় না। হয়তো মাথা গরম হয়ে যাবে। কিন্তু কিছু করা যাবে না। কেবল নিজের ভিতরে এক অন্ধ রাগ বেড়ে বেড়ে ফুসে উঠে নিজেকেই ছুবলে মারবে। সেই বিষও আবার হজম করতে হবে নিজেকেই। ক্লান্তি আসবে। আসবে ব্যর্থতার বোধ। কলকাতার নির্বিকার জনগণ সকলেই এই ক্লান্তিতে ও ব্যর্থতায় ভুগে জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে না কি?

নেমে সসামেন দেখে, সে খুব বেশি দূরে নামেনি। এখান থেকে বড়দির বাড়ি আর মোটে দুটো স্টপ। খোলা আলো-হাওয়ায় এটুকু হেঁটে যেতে ভালই লাগবে। সে সিগারেট কিনে ধরায়। পৃথিবীর কোথাও কোনও শান্তি নেই। না ঘরে, না বাইরে। সোমেনের মাঝে মাঝে বড্ড মরে যেতে ইচ্ছে করে। কিংবা পালাতে ইচ্ছে করে বিদেশে। কিন্তু জানে, শেষ পর্যন্ত কোথাও যাওয়া হবে না। এই নোংরা শহরে কিংবা এই নিস্তেজ, ভাবলেশহীন দেশে তার জীবন শেষ হয়ে যাবে একদিন।

অন্যমনস্কভাবে সোমেন হাঁটছিল। একটা ট্যাক্সি পাশ দিয়ে যেতে যেতে এগিয়েই থামল। মুখ বাড়িয়ে কে যেন ডাকল—শালাবাবু!

জামাইবাবু! সোমেন তাড়াতাড়ি সিগারেট ফেলে দেয়।

এগিয়ে গিয়ে বলে—আপনাদের বাড়িতেই যাচ্ছিলাম।

—উঠে পড়ো। বলে দরজা খুলে ধরে অজিত।

সোমেন উঠলে অজিত সরে বসে বলে—এতকাল পরে আমাদের মনে পড়ল।

সোমেন একটু লাজুক হাসি হেসে বলে—কেন, আসি না নাকি?

—আসো? সে বোধ হয় সূক্ষ্ম শরীরে, আমাদের সাদামাটা চোখে দেখতে পাই না।

—সময় পাই না।

—সময়? তোমার আবার সময়ের টানাটানি কবে থেকে? একটা তো মোটে টিউশনি করো শুনেছি। আর কী করো? প্রেম নয়তো? তা হলে অবশ্য সময়ের অভাব হওয়ারই কথা।

—না, না। প্রেম-ট্রেম কোথায়?

—লাস্ট বোধ হয় ভাইফোঁটায় এসেছিলে। তারপর টিকিটি দেখিনি।

—এবার খুব বেশি দেখবেন।

—সে দেখব যখন নিজেদের বাড়ি করে উঠে আসবে। তার এখনও ঢের দেরি, শ্বশুরমশাই একটু আগে অফিসে এসেছিলেন চেকটার খোঁজ করতে।

—বাবা এসেছেন?

—এসেছেন মানে? এতক্ষণে হয়তো চলেও গেছেন হাওড়ায়। বাসায় যাননি বোধ হয়?

—কী জানি! আমি তো বাসায় ছিলাম না।

অজিত একটা শ্বাস ফেলে বলে-তুমি ওঁর কাছে যাওটাও না?

—খুব কম।

—যেয়ো। সন্তানের টান বড় টান। আমার তো এখনও কিছু হয়নি, কিন্তু হওয়ার সম্ভাবনা দেখেই মনটা উসখুস করে।

কোটের বাঁ দিকের পকেট থেকে ডানহিলের সুন্দর প্যাকেটটা বের করে অজিত, আর রনসন লাইটারটা।

—কী সিগারেট জামাইবাবু? সোমেন জিজ্ঞেস করে—বেশ প্যাকেটটা তো!

—বিলিতি। একটা চলবে না কি?

—না, না। লজ্জার হাসি হাসে সোমেন।

—লজ্জার কী! ধরিয়ে ফেলো একটা। খাও তো!

—আপনার সামনে নয়।

—এই যে ভাই, সামনের বাঁ দিকের রাস্তা। বলে ট্যাক্সিওলাকে নির্দেশ দেয় অজিত। ডানহিলের প্যাকেটটা সোমেনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে—শালাবাবুরা সামনে সিগারেট না খেলে ভগ্নীপতিদের বড় অসুবিধে। দরকার হলে শালাদের ঘাড় ভেঙে সিগারেট খেতে পারে না।

—আমি আপনাকে আর কী খাওয়াব বলুন। বেকার শালার সাধ্য কী? একটা চাকরি-বাকরি দিতেন যদি!

—তোমার এক্ষুনি চাকরির কী হল? এম এ-টা দাও না।

—ও হবে না।

—একটা প্রফেসরি হয়তো জুটে যেত। নাও, ধরিয়ে ফেল।

সোমেন লম্বা সিগারেট একটা টেনে নেয়। ধরায়। খুব লজ্জা করে তারা।

অজিত বলে—আরে জামাইবাবু আবার গুরুজন নাকি! ঠাট্টার সম্পর্ক, লজ্জার কিছু নেই।

বাসার সামনে ট্যাক্সি থেকে নামে দুজনে।

কড়া নাড়তে বাচ্চা ঝিটা এসে ঘুমচোখে দরজা খোলে।

—শীলা, দেখ কে এসেছে! বলে হাঁক ছাড়ে অজিত।

বাচ্চা ঝিটা ভয়ার্ত মুখে বলে—বউদি নেই।

অজিত যেন বুঝতে পারে না কথাটা। একটু অবাক হয়ে বলে কী বলছিস?

—বউদি বেরিয়ে গেল একটু আগে। রিকশায়।

—কোথায় গেছে?

—পাশের বাড়িতে।

—পাশের বাড়িতে রিকশা করে। ভারী অবাক হয়ে বলে অজিত—কোন বাসায়?

—ঝি-মেয়েটা কাঁদো কাঁদো মুখে বলে—ওই দিকের রাস্তা দিয়ে গেল। কোথায় তা জানি না। বলে গেছে পাশের বাড়িতে।

অজিত একটুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকে। মুখচোখ লাল হয়ে ওঠে রাগে, উত্তেজনায়। তারপর জুতোমোজা ছাড়ে, কোট হ্যাঙারে টাঙায়।

রহস্যটা ধরতে না পেরে সোমেন জিজ্ঞেস করে—কী হল জামাইবাবু?

অজিত গম্ভীর স্বরে বলে—কিছু না।

ঝিকে ডেকে চা করতে বলে অজিত। কিছুক্ষণ মুখখানা দুহাতের পাতায় ঢেকে বসে থাকে। সামলে নেয় নিজেকে। মুখ তুলে বলে—তোমার দিদি আজকাল আমাকে লুকিয়ে পালাতে শিখেছে।

সোমেন হাসে—পালায়?

—ওর একটি প্রেমিক আছে যে!

—কে?

—ওর ইস্কুল। ইস্কুলটাই ওর সর্বস্ব। আমরা কিছু না। বুঝলে শালাবাবু, তোমার দিদি এবার একটা সর্বনাশ ঘটাবে। রিকশা করে গেছে, ঝাঁকুনিতে না পেটের বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে যায়!

এ সব কথায় সোমেনের একটু লজ্জা করে। ডানহিলটা ঠোঁটে চেপে সে চমৎকার ধোঁয়াটা টানে। রিকশার ঝাঁকুনিতে পেটের বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাবে—ব্যাপারটা তার বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়।

সোমেন একটুক্ষণ বসে থেকে তারপর হঠাৎ বলে—জামাইবাবু।

—উঁ। অন্যমনস্ক অজিত উত্তর দেয়।

—আমার একটা উপকার করবেন?

—উপকার! নিশ্চয়ই।

—আমাকে কিছুদিন আপনার বাড়িতে থাকতে দিন।

অজিত একটু অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকায়। বলে—থাকবে? সে তো আমার সৌভাগ্য। কিন্তু কেন?

—এমনিই।

—বাড়ির সঙ্গে ঝগড়া করোনি তো?

—না, সেসব কিছু নয়।

অজিত একটু অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকায়। বলে—থাকবে? সে তো আমার সৌভাগ্য। কিন্তু কেন?

—এমনিই।

—বাড়ির সঙ্গে ঝগড়া করোনি তো?

—না, সেসব কিছু নয়।

অজিত একটু উদাস হয়ে বলে—কদিন আগে শাশুড়িঠাকরুন এসেছিলেন। তিনি তোমার বড়দিকে বলে গেছেন, তোমাদের বাসায় কী সব অশান্তি চলছে।

সোমেন মাথা নাড়ে।

অজিত একটু হেসে—তুমি বড় সেন্টিমেন্টাল হে শালাবাবু, সংসারে একটু-আধটু খটাখটি তো থাকবেই। আমি নিজে মা বাপ-অন্ত-প্রাণ ছেলে ছিলাম, সেই আমাকেই আলাদা হয়ে চলে আসতে হল! এখন তো তবু সংসারের কিছুই টের পাওনি, যখন বিয়ে করবে তখন বউ এসে রাত জেগে তোমাকে দুদিনে সংসারের সার সত্য সব শেখাতে থাকবে। তখন দেখবে মা-বাপ সম্পর্কে তোমার আজন্মের ধারণা পালটে যাচ্ছে, ভাই-দাদা, ভাইপো-ভাইঝি সকলেরই গুপ্ত খবর পেয়ে যাবে। বিয়ে করো, বুঝবে।

—বিয়ে! বলে একটু ঠাট্টার হাসি হাসে সোমেন।

—কেন, বিয়ে নয় কেন?

—আমাদের জেনারেশন বিয়ে-টিয়ে বোধ হয় উঠে যাবে।

—ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো, বাঁধো, বাঁধো বুক। বিয়েটাকে টারগেট করে যা করার করে যাও। তুমি যদি সংসার ছাড়ো তবে তোমার মা দাদার কী অবস্থা হবে জানো?

—কী হবে! আমার জন্য কিছু ঠেকে থাকবে না।

—থাকবে। তবে কিছুদিনের জন্য যদি আমার বাড়িতে এসে থাকো তো ভালই হয়। তোমার দিদিটিকে একটু পাহারা দিতে পারবে। চোখে চোখে না রাখলে ও ঠিক চুপি চুপি প্রায়ই পালিয়ে যাবে ওর প্রেমিকটির কাছে। ডাক্তারের কড়া নিষেধ। তবু ও শোনে না। আমি অবশ্য অন্য কোনওদিন ধরতে পারিনি। আজই হঠাৎ তাড়াতাড়ি এসে পড়েছি বলে বুঝতে পারছি।

চা শেষ করে আর একটা ডানহিল অজিতের প্যাকেট থেকে নিয়ে ধরায় সোমেন। বাইরে একটা রিকশা থামে। শব্দ হয়।

অজিত মুখখানা গম্ভীর করে বসে থাকে।

সদর দরজা খোলাই ছিল। শীলা ঘরে এসে একটু থতমত খেয়ে দাঁড়ায়। বলে—ওমা! কখন এলে? সোমেন, হঠাৎ যে দিদিকে মনে পড়ল?

সোমেন সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ে। হাসে। উত্তর দেয় না কেউ।

শীলা ভ্রূ কুঁচকে সোমেনের দিকে চেয়ে বলে—খুব যে উন্নতি দেখছি! গুরুজনদের সামনে সিগারেট খাওয়া!

শীলা ভ্রূ কুঁচকে সোমেনের দিকে চেয়ে বলে—খুব যে উন্নতি দেখছি! গুরুজনদের সামনে সিগারেট খাওয়া!

—জামাইবাবু জোর খাওয়ালেন, কী করব!

—কত জামাইবাবুর বাধ্য শালা! আবার ধোঁয়া ছাড়ার কায়দা হচ্ছে!

অজিত ভ্রূ কুঁচকে নিজের হাতের দিকে চেয়েছিল।

শীলা তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে আস্তে করে বলে—একটা জরুরি কাজ ছিল, বুঝলে! রাগ করেছ নাকি!

অজিত শ্বাস ফেলে মাত্র। উত্তর দেয় না।

দাঁড়িয়ে থাকতে শীলার বোধ হয় কষ্ট হয়। মুখখানা সামান্য বিকৃত করে বলে—যা রাস্তাঘাট! এত হাঁফিয়ে পড়েছি!

বলে সোফায় বসে শীলা। হাতের ব্যাগ মেঝেয় ফেলে রেখে ঝি-মেয়েটাকে ডেকে চা করতে বলে দেয়। কপাল থেকে চুলের কুচি সরাতে সরাতে বলে—সোমেন, রাতে খেয়ে তবে যাবি। আজ ফ্রায়েড রাইস করব, আর মুরগি।

সোমেন হেসে বলে—আগে বাড়ির আবহাওয়াটা স্বাভাবিক হোক, তবে বলতে পারি খাব কিনা। এখন তো বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখছি।

—আহা! এরকম আমাদের রোজ হয়! জামাইবাবুটিকে তো চেনো না। রাগের হোলসেলার।

অজিত তীক্ষ্ণ চোখে শীলাকে একটু দেখে নেয়।

—কী দেখছ? শীলা জিজ্ঞেস করে।

অজিত নিস্পৃহ গলায় বলে—তোমার মুখ সাদা দেখাচ্ছে।

—ও কিছু না। রোদে এলাম তো।

—রোদে মুখ লাল হওয়ার কথা, সাদা হবে কেন?

—তোমার বড্ড বাড়াবাড়ি।

—শীলা, আমাকে লুকিয়ে লাভ নেই। তোমার কোনও কষ্ট হচ্ছে শরীরে।

শীলা হাসতে চেষ্টা করল। বিবর্ণ হাসি। চোখ দুটো একটু ঘোলাটে, মুখ সাদা, ঠোঁট দুটোর মধ্যে ফড়িংয়ের পাখনার মতো কী একটু কেঁপে গেল। বলল—না, কিছু নয়।

অজিত একটু শ্বাস ফেলে বলে—না হলেই ভাল। তবু বলি, সামান্য ধৈর্য রাখতে পারলে ভাল করতে। একটা পেরেকের জন্য না একটা সাম্রাজ্য চলে যায়।

শীলা একটুক্ষণ বসে থাকে। তারপর ক্ষীণ গলায় বলে—তোমরা বোসো, আমি ও-ঘরে গিয়ে একটু শুয়ে থাকি।

শীলা ধীরে ধীরে উঠে ও-ঘরে চলে গেল। অজিত আর একটু ধৈর্য ধরে বসে থাকল সোমেনের মুখোমুখী। তারপর বলল—বোসো শালাবাবু, আমাদের দুজনের ভাগ্যটা কেমন তা দেখে আসি। এ যাত্রাটা যদি রক্ষা হয়।

অজিত ও-ঘরে গেল। সোমেন বসে থাকে একা। শুনতে পায় ভেজানো দরজার ওপাশ থেকে বড়দির ফোঁপানোর আওয়াজ আসছে। চাপা, আবেগপূর্ণ কথার শব্দ ভেসে আসে। একটা অস্ফুট চুম্বনের শব্দ আসে।

গায়ে কাঁটা দেয় সোমেনের। অনেকদিন বাদে হঠাৎ আবার তার মনের মধ্যে ঝিকিয়ে ওঠে একটা আসাহি পেনট্যাক্স ক্যামেরার ঢাকনা-খোলা ঝকঝকে চোখ, গর্-র শব্দে ডেকে ওঠে একটা অন্ধ কুকুর।

॥ কুড়ি ॥

সোমেন বসেছিল চুপচাপ বাইরের ঘরে। দু-আঙুলের ফাঁকে পুড়ে যাচ্ছে সিগারেট। শীতের শুকনো বাতাসে সিগারেট তাড়াতাড়ি পোড়ে। উৎকর্ণ হয়ে সোমেন বড়দির কান্নার কারণটা বুঝতে চেষ্টা করছিল। কান্না সে একদম সইতে পারে না। মন খারাপ হয়ে যায়, মনে হয় কী জানি সর্বনাশ ঘটে গেল।

কান্না থেমে গেছে, অনুচ্চ স্বরে জামাইবাবু কী বোঝাচ্ছে দিদিকে। সোমেনের ভাল লাগছে না, রোদ মরে শীতের বিষণ্ণ সন্ধ্যা ঘুমিয়ে আসে। শীতকালে সোমেনের একরকম ভালই লাগে, কিন্তু এই ঋতুটা বড় গুরুভার, মন্থর, রহস্যময়। ও-ঘর থেকে আদরের নির্লজ্জ শব্দগুলো আসে ভেজানো দরজা ভেদ করে। লজ্জা করে সোমেনের। উঠে চলে যাবে, তাও হয় না। মনে মনে সে এ-বাড়িতে বসবাস করার পরিকল্পনা ত্যাগ করে।

কী বিশাল এই কলকাতা শহর, তবু কোথাও নিরুপদ্রবে বাস করার একটু জায়গা নেই তার জন্য। পূর্বা বলেছে, তাদের তিন তলার এক-ঘরের ফ্ল্যাটটা সোমেনকে দেওয়া যায় কি না তা তার বাবাকে জিজ্ঞেস করবে। হয়তো রাজিও করাবে পূর্বা। কিন্তু নেওয়া কি সম্ভব হবে? মাসে মাসে একশো পঁচিশ টাকা ভাড়া আসবে কোত্থেকে! চাকরিটা সম্বন্ধে এত নিশ্চিত ছিল সে যে রেলে ক্লার্কশিপের পরীক্ষাটা পর্যন্ত দেয়নি। দিলেই ভাল করত। রেলের চাকরি হলে ভালই হত। বদলির চাকরি, কলকাতা ছেড়ে দূরে দূরে থাকতে পারত।

ব্যাঙ্কের চাকরিটা কেন যে হল না! ভাবতেই বুকের মধ্যে একটা ব্যথার মতো যন্ত্রণা হয়। অলক্ষে একটা কুকুর গর্-র শব্দ করে, একটা আসাহি পেনট্যাক্স ক্যামেরার ঢাকনা-খোলা মস্ত লেন্স ঝিকিয়ে ওঠে। রিখিয়া বলেছিল—আবার আসবেন।

সোমেন কথা দিয়েছিল—আসব। মনে মনে ভেবেছিল, একদিন সুসময়ে তার সঙ্গে রিখিয়ার ভালবাসা হবে। কথা রাখেনি সোমেন। রিখিয়া তাকে ভুলে গেছে এতদিনে। কত চালাক-চতুর ছেলেরা চারদিকে রয়েছে, একজন বিষণ্ণ যুবককে ভুলে যেতে বেশিক্ষণ লাগে কি? মাঝে মাঝে সোমেনও ভাবে, ভুলে যাবে। কিন্তু ভোলে না। কত মেয়ের সঙ্গেই তো মিশেছে সোমেন, তবে কেন রিখিয়ার প্রতি এই অভিভূতি! ইচ্ছে করলেই অভিভূতি বা অবসেশনটা কাটিয়ে উঠতে পারে সে। কিছু শক্ত নয়। কিন্তু কাটিয়ে দিতে মায়া লাগে। মাঝে মাঝে মনে পড়ুক, ক্ষতি কী!

ভেজানো দরজা খুলে অজিত এসে সোফাটায় বসে। সিগারেট আর লাইটার তুলে নেয়। তার মুখ চিন্তান্বিত, ঠোঁটে রক্তহীন ফ্যাকাশে ভাব। সোমেন চেয়ে থাকে।

চোখে চোখ পড়তেই অজিত বলে—মেয়েরা কখনও কথা শোনে না। বুঝলে শালাবাবু?

—কী হয়েছে?

—এখনও কিছু বোঝা যাচ্ছে না। একটা পেইন হচ্ছে। বলে অজিত এক হাতে সিগারেট, অন্য হাতে চুলের ভিতরে আঙুল চালাতে চালাতে ধৈর্যহীন অস্থিরতার সঙ্গে বসে থাকে।

—ডাক্তার ডাকুন না! সোমেন বলে।

—কী লাভ? ডাক্তারের কোনও কথা কি শোনে! শুনলে এরকমটা হত না। লিভ ইট, এস অন্য বিষয়ে কথা বলি।

অজিতের মুখে চোখে একটা আশা ত্যাগের ভাব। তার সঙ্গে চাপা রাগ।

সোমেন উঠে বলল—দাঁড়ান, দেখে আসি।

সোমেন শোওয়ার ঘরে ঢুকতেই একটা হাহাকারে ভরা শ্বাস ফেলে বিছানায় পাশ ফিরল শীলা।

—বড়দি!

শীলা তার মস্ত চোখ দুখানা খুলে চেয়ে বলে—যাবি না সোমেন। রাতে খেয়ে যাবি।

—তোর শরীর কেমন লাগছে?

শীলার ঠোঁট দুটো কেঁপে যায়। সামলে বলে—এখন ভাল। বোস।

সোমেন বিছানায় বসে। শীলার শ্বাসে একটা মৃদু অ্যালকোহলের গন্ধ ছড়ায়। বোধ হয় একটু ব্রান্ডি খাইয়েছে অজিত।

—জামাইবাবু খুব আপসেট। সোমেন বলে।

শীলা উত্তর দিল না। ক্ষণকাল চোখ বুজে থেকে বলে—সারাদিন ঘরবন্দি থাকা যে কী অসহ্য!

—কোথায় গিয়েছিলি?

—স্কুলে। কী যে হল তারপর। বলেই বোধ হয় ভাইকে লজ্জা পায় শীলা। বলে—ওসব কিছু না। কিছু হয়নি। তুই নাকি তোর জামাইবাবুকে বলেছিস যে আমাদের বাসায় কদিন থাকবি!

সোমেন মাথা নাড়ে।

শীলার মুখখানা অন্তর্নিহিত যন্ত্রণায় সামান্য বিকৃত হয়ে গেল। চোখ বুজে একটু গভীর করে শ্বাস নেয় সে। তারপর বলে—বাসায় ঝগড়া করেছিস!

—না।

—বউদির সঙ্গে, না?

—না।

—তবে?

—ঝগড়া হয়নি। বাসায় আমার ভাল লাগছে না।

শীলা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে—লাগার কথা নয়।

শীলা আবার চোখ বুজে যন্ত্রণাটা সহ্য করে, বলে—শোন, তোর ইচ্ছে করলে এসে থাক, যতদিন খুশি। সারাটা দিন যা একা লাগে আমার! আর কতদিন যে ঘর থেকে বেরনো হবে না! থাকবি সোমেন? থাক না! মাকে কতবার বলেছি আমার কাছে এসে কদিন থাকার জন্য। কিছুতেই রাজি হল না। ও সংসারে কী যে মধু! উঠতে বসতে বউদি খোঁটা দেবে, কথা শোনাবে, তবু পড়ে থাকবে ওখানে।

—মারও দোষ আছে।

শীলা ধমক দিয়ে বলে —আহা! দোষ আবার কী! মুখে একটু-আধটু হয়তো বলে, কিন্তু মার মন সাদা। অমন শাশুড়ির সঙ্গে যে বনে খেতে পারে না...বলতে বলতে শীলা চোখ বোজে। যন্ত্রণা সহ্য করে।

মেয়েরা মায়ের দোষ কমই দেখে ভাজের ব্যাপারে। সোমেন তা জানে। সোমেন উঠতে উঠতে বলে—শোন বড়দি, আজ আমার নেমন্তন্নটা ক্যানসেল কর। তোর শরীর ভাল না। শুয়ে থাক চুপচাপ।

শীলা করুণ মুখ করে বলে—থাক না আর একটু।

সোমেন ঘড়ি দেখে বলে—টিউশনিটায় যেতে হবে। পরীক্ষার সময়।

শীলা চোখ বুজে বলে—যাকে পড়াস তার দিদি তোর সঙ্গে পড়ত না।

—হ্যাঁ।

—বেশি মিশবি-টিশবি না, বুঝলি!

সোমেন হাসে। বলে—মিশি না।

—খুব নাকি মেয়েদের সঙ্গে ঘুরিস আর আড্ডা দিস!

—কে বলল?

—পাশের বাড়ির মাধবী তোকে বঙ্গ-সংস্কৃতিতে দেখেছে।

—দেখেছে তাতে কী? ঘুরলে দোষ কী?

শীলা বড় চোখে চেয়ে বলে—তুই তো হাঁদা ছেলে! কোন খেঁদি পেঁচির পাল্লায় পড়ে যাবি।

—দূর! ওরা সব বড় ঘরের মেয়ে, পাত্তাই দেয় না বেকারকে।

—বেকার কি চিরকাল থাকবি নাকি! তোর মতো স্মার্ট আর চটপটে ছেলে কজন? দুম করে একটা ভাল চাকরি পেয়ে যাবি।

সোমেন হেসে ফেলে। বলে—এই যে বললি হাঁদা!

—হাঁদাই তো! মেয়েদের ব্যাপারে হাঁদা। বলে শীলা ভাইয়ের দিকে স্নিগ্ধ চোখে চেয়ে হাসে। বলে—তোর বিয়ে আমি নিজে পছন্দ করে দেব। আমাদের সংসারে একটা লক্ষ্মী বউ দরকার।

—দিস। বলে সোমেন বাইরের ঘরের দিকে পা বাড়ায়।

—শোন। ওই আলমারির পাল্লাটা খুলে দেয়, মাঝখানের তাকে একটা প্যান্টের কাপড় আছে না?

—কেন?

শীলা ধমক দিয়ে বলে—খোল না!

সোমেন আলগা পাল্লাটা টেনে খোলে। বাদামির ওপর হালকা ছাইরঙা চেক দেওয়া সুন্দর টেরিউলের প্যান্ট লেংথ। দামি জিনিস।

—এখানে নিয়ে আয়। শীলা বলে।

সোমেন কাপড়টা নিয়ে কাছে আসে। শীলা ওর মুখের দিকে চেয়ে বলে—পছন্দ হয়?

—হলেই বা।

—তোর জামাইবাবুকে তার বন্ধু পাঠিয়েছে আমেরিকা থেকে। ওটা তোর জন্য রেখে দিয়েছে। নিয়ে যা।

—যাঃ! ভারী লজ্জা পায় সোমেন?

—পাকামি করবি না। আজকেই করাতে দিবি, দরজির খরচ আমি দিয়ে দেব।

—জামাইবাবুকে পাঠিয়েছে, আমি কেন নেব?

—তোর জামাইবাবু কত পরবে? প্রতি মাসেই এটা-ওটা রাজ্যের জিনিস পাঠাচ্ছে, প্যান্ট শার্ট সিগারেট ঘড়ি ক্যামেরা কলম। আমার জন্য শাড়ির মাপে কাপড় পাঠিয়েছে এ পর্যন্ত গোটা দশেক। এত দিয়ে কী হবে! তুই নিয়ে যা। ভাল দরজিকে দিয়ে করাস। খবরের কাগজে মুড়ে নিয়ে যা। আর ওঘর থেকে তোর জামাইবাবুকে একটু পাঠিয়ে দিস।

আচ্ছা, বলে সোমেন বেরিয়ে আসে। হাতে ধরা মোলায়েম ঈষদুষ্ণ কাপড়টা একটা আরামদায়ক আনন্দের মতো তার হাত ছুঁয়ে আছে। কিছু অপ্রত্যাশিতভাবে পেলে মনটা কেমন ভাল হয়ে যায়।

বাইরের ঘরে আলো-আঁধারির মধ্যে সিগারেট জ্বলছে। অজিত মৃদু গলায় বলে—কাপড়টা পছন্দ হয়েছে তো শালাবাবু?

—খুব। এমন সুন্দর জিনিসটা আমাকে দিয়ে দিলেন?

তোমার জন্যই রেখেছিলাম। বলে সিগারেটের প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে কয়েকটা সিগারেটও নিয়ে যাও।

—না, না।

—নাও হে নাও, ফ্রায়েড রাইস আর মুরগির মাংস খাওয়াতে পারলাম না, একটু কমপেনসেট করে দিই। পুরো প্যাকেটটাই নিয়ে যাও, গোটা আষ্টেক আছে।

সোমেন প্যাকেটটা পকেটে পোরে। বলে—আজ দারুণ বাণিজ্য হল।

আবছায়ায় অজিত একটু হাসে। আলো-আঁধারিতে ওর মুখটা তরল হয়ে মিশে হারিয়ে যাচ্ছে। মুখখানা অস্পষ্ট একটা চিহ্নের মতো। সিগারেটের একবিন্দু লাল আগুনের পাশে ওর হাসিটা ভৌতিক দেখায়। মুখে স্বেদ ঝিকিয়ে ওঠে। ভূর ছায়ায় চোখ দুটো অন্ধকার। লম্বা নাকটা তর্জনীর মতো উঁচু হয়ে আছে।

শীলা পাশের ঘর থেকে ক্ষীণ গলায় ডাকে—ওগো!

—যাচ্ছি। উত্তর দেয় অজিত, কিন্তু নড়ে না। সিগারেটটা ধীরে টান দেয়।

—জামাইবাবু, যাই।

অজিত মাথা নাড়ে। তারপর বিষণ্ণ গলায় বলে—দি ওয়ার ইজ লস্ট ফর এ নেইল।

—কী বলছেন?

—কত তুচ্ছ কারণে এত বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেল শালাবাবু!

সোমেন উত্তর খুঁজে পায় না।

অজিত বলে—আমার বয়স চল্লিশ, তোমার দিদিরও ত্রিশ-বত্রিশ। কত ধৈর্য, কত অপেক্ষা, কত কষ্টের পর এই ভরাডুবি। শালাবাবু, আজ বিকেল থেকে গোটা জীবনের রংটাই বোধ হয় ফিকে হয়ে গেল।

সিগারেটটা অ্যাসট্রের মধ্যে ছ্যাঁক করে ওঠে। অজিত মুখ তুলে দাঁড়িয়ে-থাকা সোমেনের দিকে তাকায়। আলো-আঁধারিতে মুখখানা ব্রোঞ্জের স্ট্যাচুর মুখের মতো দেখায়। সন্তানের জন্য সমস্ত মুখখানায় কী বুভুক্ষা আর পিপাসা কাতরতা ফুটে আছে।

সোমেন বিষণ্ণ গলায় বলে—ডাক্তার ডাকবেন না?

—ডাকব। তবু দি ওয়ার ইজ লস্ট। মানুষের ক্ষমতা বড় সীমাবদ্ধ। এই অবস্থা থেকে কে আমাদের বাঁচাতে পারে! ডাক্তার যা করার তা করেছে। এখন আর কী করার আছে তার! আমি আজকাল নিয়তি মানি। ভাগ্যে নেই।

—এ সব বোগাস। আপনি উঠুন তো, দিদির কাছে যান। ভেঙে পড়ার কিছু হয়নি।

—যাচ্ছি। বলে অজিত অন্ধকারে বসে রইল। উঠল না। কেবল হাত বাড়িয়ে হাতড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেটটা খুঁজল। পেল না। সোমেন নিঃশব্দে প্যাকেটটা পকটে থেকে বের করে টেবিলে রেখে দিয়ে বেরিয়ে আসে। অজিত লক্ষ করল না।

সন্তানের জন্য বুভুক্ষা কেমনতর তা পুরোপুরি বোঝে না সোমেন। কিন্তু একটু একটু টের পায়। গোবিন্দপুরে সে বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে অমনি এক তীব্র অসহায় ক্ষুধাকে প্রত্যক্ষ করেছে ব্রজগোপালের মুখে। সেই থেকে বাবার জন্য ক্ষীণ সুতোর টান সে টের পায়। যে ঘুড়িটা কেটে গিয়েছিল বলে ধরে নিয়েছে সে, আসলে তা কাটেনি। রক্তে রক্তে বুঝি টরেটা বেজে যায় ঠিকই। টান তেমন প্রবল নয়, কিন্তু মাঝে মাঝে মন বড় কেমন করে, মনে হয়—আহা রে, লোকটা! বড় একা হয়ে হা-ভাতের মতো চেয়ে আছে ছেলেদের দিকে। মায়া হয়।

সিগারেটের দোকান থেকে একটা সস্তা সিগারেট কিনে দড়ির আগুনে ধরিয়ে নেয় সোমেন। ট্রামরাস্তার দিকে হাঁটতে থাকে। ভাবে, অণিমাদের বাড়ি থেকে রিখিয়াদের বাড়ি বেশি দূর নয় তো। তবে কেন সে একবারও শৈলীমাসি আর রিখিয়ার কাছে যায়নি এত দিন! আজ একবার গেলে হয়। প্যান্টের কাপড়টা অপ্রত্যাশিত পেয়ে গিয়ে মনটা হঠাৎ ভাল হয়ে গিয়েছিল, জামাইবাবুর শেষ কথাগুলোয় আবার মন খারাপ হয়ে গেছে। গাব্বদের বাড়িতে যাওয়ার পথে একবার ওবাড়ি হয়ে যাবে।

আনোয়ার শা রোড দিয়ে আজকাল বাস যায় ঢাকুরিয়া পর্যন্ত। সেই আশায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে সোমেন হাঁটতে থাকে। প্যান্টের কাপড়টা বাড়িতে রেখে, হাতমুখ ধুয়ে, একটু ফরসা জামাকাপড় পরে বেরোবে।

মা প্রায়ই জিজ্ঞেস করে-হ্যাঁরে, শৈলী চাকরির কথা কী বলল?

সোমেন ঝেঁঝেঁ বলে—চাকরি কি ছেলের হাতের মোয়া!

আসলে সে মাকে বোঝাবে কী করে, যে বাড়িতে সে বর হয়ে যাবে সে-বাড়ির দেওয়া চাকরি সে তো নিতে পারে না! একবার উমেদার হয়ে গেলে আর কি রহস্য থাকে মানুষের?

রিখিয়া কেন যে আজ মাথাটা দখল করে আছে, কে জানে! মাঝে-মধ্যে আপন মনে মৃদু হাসল সোমেন। মনে মনে বলল, আসব রিখিয়া। আসছি।

হাঁটতেই হাঁটতেই বাড়ি পৌঁছে গেল সে। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে ঘরে ঢুকেই একটু অবাক হল। সোফার ওপর ব্রজগোপাল বসে আছেন। পাশে একটা চেয়ারে দাদা, মোড়ায় বসে। বউদি এঁটো চায়ের কাপ নিয়ে যাচ্ছে। একটি অপরূপ অসহনীয় সুন্দর সংসারের দৃশ্য।

॥ একুশ ॥

ঘরে ঢুকতেই তারদিকে তাকালেন ব্রজগোপাল। একটু বুঝি নড়ে উঠলেন। মুখখানায় কী একটা টান-বাঁধা উদ্বেগ ছিল সেটা সহজ হয়ে গেল। তাকিয়ে উৎসাহ-ভরে বললেন—এসো।

এ ঘর বাবার নয়। তবু যেন নিজের ঘরে ছেলেকে ডাকছেন, এমনই শোনাল গলা। সোমেনের সঙ্গে মাঝখানে অনেকদিন দেখা হয়নি। সে এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল। বলল—বড়জামাইবাবুর কাছে শুনলাম, আপনি এসেছেন, আবার চলেও গেছেন।

ব্রজগোপাল সরে বসে জায়গা করে দিলেন সোমেনের জন্য। সোমেন একটু সংকোচের সঙ্গে বাবার পাশে বসে। ব্রজগোপাল বলেন—যাওয়ার কথাই ছিল। বহেরুর যে ছেলেটা জেলে ছিল সে মেয়াদের আগেই হঠাৎ ছাড়া পেয়েছে। দামাল ছেলে। বহেরু তাকে ভয় পায়। আজ তাই বাড়িতে আমার থাকার কথা। আমাকে কিছু মানে-গোণে, তাই বহেরুর ইচ্ছে ছিল এ সময়টায় থাকি। চলেই যাচ্ছিলাম, রণেন ধরে নিয়ে এল। এসে পড়ে ভাবলাম, একটু বসে যাই। তোমার সঙ্গে দেখা-টেখা হয় না, তো এই সুযোগে যদি এসে পড়ো।

এ বাড়িতে বেশিক্ষণ বসে থাকার জন্য যেন ব্রজগোপাল বড় লজ্জা পেয়েছেন, এমনভাবে কৈফিয়ত দেন। ঘরে ঢুকবার মুহূর্তে যে সুখী সংসারের ছবিটা দেখতে পেয়েছিল সোমেন তা কত ভঙ্গুর! নিকটতম আত্মীয় মানুষেরা নক্ষত্রের মতো পরস্পর থেকে বহু দূরে বসবাস করছে।

সোমেন হাসিমুখে বলে—আপনার শরীর কেমন আছে?

—মন্দ কী! মাটির সঙ্গে যোগ রেখে চলি, ভালই থাকি। তোমার চাকরিটা হল না।

না।

ব্রজগোপাল যেন খুশি হন শুনে। বলেন—পরের গোলামি যে করতেই হবে তারও কিছু মানে নেই। চাকরির উদ্দেশ্য তো ভাত-কাপড়, নাকি! তা সেটার বন্দোবস্ত করতে পারলে কোন আহাম্মক চাকরিবাকরিতে যায়। এই মোদ্দা কথাটা তোমরা বোঝো না কেন?

সোমেন অবাক হয়ে বলে—কীভাবে ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা হবে?

ব্রজগোপাল একবার ননীবালার দিকে চেয়ে নিলেন। ননীবালা একটু গম্ভীর, টুবাইটা কোলে আধশোয়া হয়ে কী একটা বায়না করছে। বিরক্ত হয়ে বললেন—বউমা, নিয়ে যাও তো একটু! কথা শুনতে দিচ্ছে না।

ব্রজগোপাল গলাখাঁকারি দেন। বলেন—দেশের অবস্থা তো দেখছই। চাকরির ভরসায় থাকাটা আর ঠিক নয়। এমন দিন আসতে পারে, যখন টাকার ক্রয়ক্ষমতা কিছু থাকবে না। তাই বলি, মাটির কাছে থাক। ফসল ফলানোর আনন্দও পাবে, ঘরে ভাতের জোর থাকবে। মরবে না।

সোমেন একটু হাসে। সেই পুরনো কথা। এর কোনও উত্তর হয় না। মৃদু স্বরে বলে—চাকরির সিকিউরিটি বেশি, ঝামেলা কম। চাষবাস বড় অনিশ্চিত।

ব্রজগোপাল রণেনের দিকে চেয়ে হেসে তাকে সাক্ষী মেনে বললেন—কথা শোনো। সবাই আজকাল বেশি সিকিউরিটি আর কম ঝামেলা খোঁজে। পাগল! চাকরির ঝামেলা কি কম! চাকরগিরি মানে তো মনিবকে খুশি করা। না কি?

রণেন আর সোমেনের চোখাচোখি হয়।

ব্রজগোপাল বলেন—চাকরিরও একটা মর্যাল আছে। সেটা মেনে যদি চাকরি করতে যাও, তা হলে ঝামেলা কমে না। অন্নদাতা মনিবের দায় যদি ঘাড়ে করে না নিলে, যদি সভাবে তাকে খুশি না করলে তো তুমি খারাপ চাকর। তোমার বাড়িতে যে ঠিকে-ঝি কাজ করে যায় সে যদি ফাঁকিবাজ বা আলসে হয়, যদি চোর হয়, যদি মুখে মুখে কথার জবাব করে তো তুমি কি তাকে ভাল বলো? তেমনি যদি চাকরগিরিই করো তো ষোলো আনা ভাল চাকর হতে হবে। ফাঁকিজুকি, চুরি-চামারি এ সব চলে না।

এই বলে ব্রজগোপাল রণেনের দিকে তাকান। রণেন যদিও তেমন বুদ্ধিমান নয়, তবু এই কথার ভিতরে ইঙ্গিতের ইশারাটি সে বোধ হয় বুঝতে পারে। চোখের পাতা ফেলে নীচের দিকে তাকায়।

বউমার হাতে টুবাইকে তুলে দিয়ে ননীবালা একটা শ্বাস ফেললেন। বললেন—ঝি-চাকরের সঙ্গে কি ভদ্রলোকদের তুলনা হয়? ঘোটলোকদের ধাত আলাদা। ওরা লেখাপড়া শিখেছে।

—লেখাপড়ার কথা না বলাই ভাল। এত শিখেও বিচি দেখে ফল চিনতে পারে না।

ননীবালার হঠাৎ সন্তানের প্রতি আদিম জৈব অধিকারবোধ বোধ হয় প্রবল হল। ঝংকার দিয়ে বললেন—ওদের চিনতে হবে না।

ব্রজগোপাল একটু উদাস গলায় বলেন—সব চাকরেরই একরকম ধাত। আমি কিছু তফাত দেখি না। যারা যারা চাকর তারা দেশময় কাজে ফাঁকি দিচ্ছে, চুরি করছে, ফাঁকতালে মাইনে বাড়ানোর ধান্দা করছে, কাজ বন্ধ করে বসে থাকছে। মনিবরা ধরা পড়েছে চোর-দায়ে। এটা কেমন কথা? জমিদারের সেরেস্তায় আমার বাপ চাকরি করতেন, মনিবকে খুশি রাখতে তাঁর কালঘাম ছুটে যেত। আমি করতাম সরকারি চাকরি, তাও বুড়ো বয়সে। সেখানে দেখতাম মনিব বলে যে কেউ আছে তা বোঝা যাচ্ছে না। তবু প্রাণপাত করেছি। কোথাও না কোথাও একজন মনিব তো আছে। কোথাও হয়তো ব্যক্তিবিশেষ, কোথাও প্রতিষ্ঠান, কোথাও বা দেশের মানুষ। খোরপোষের টাকা তো কারও না কারও তহবিল থেকেই আসছেই। সেটা খেটে শোধ না দিয়ে ভাত খাই কী করে? লজ্জা নেই?

ননীবালা অসন্তোষের গলায় বলেন—ওসব ভাবতে গেলে গন্ধমাদন। সবাই যেমনভাবে চাকরি করে ওরাও তাই করবে।

ব্রজগোপালের আজকাল রাগ-টাগ কমে গেছে। হাসলেন। বললেন—জানি। ময়না এমনিতে কত কথা বলে, কিন্তু বেড়ালে সে ট্যাঁ-ট্যাঁ। সংসার রগড়ালে কত বাবাজি ভেক ছেড়ে 'জন' খাটতে যায়। তোমার ছেলেরাও তাই হবে। তবু বলি, আমার ওই এক দোষ।

বলে একটু শ্বাস ছেড়ে সোমেনের দিকে তাকান ব্রজগোপাল। বলেন—আমার সঙ্গে কোনও কিছুর বনে না। বুঝলে? আমি যা বুঝি তাই বুঝি। বুড়ো হয়েছি বাবা, বেশি কথা বলে ফেলি।

বাবার গলায় চোরা-অভিমানটা খুব গোপনে, কিন্তু তীক্ষ্ণভাবে আঘাত করে সোমেনকে। চোখের দৃষ্টিতে একটা অসহায় ভাব। দুনিয়াজোড়া সবাই তাঁর প্রতিপক্ষ বুঝি। বনল না। দান ওলটাবে না, লড়াই ছেড়ে সরে

যাওয়ার জন্যই বুঝি প্রস্তুত তিনি। বাণপ্রস্থও শুরু হয়েছে।

সোমেন তাড়াতাড়ি বলে—না বাবা। আপনার কথাগুলো তো ভালই।

ব্রজগোপাল ক্ষণেক নীরব রইলেন। আস্তে করে বললেন—হবে। আমি মনিব কথাটা বড় মানি। চাষবাস করতে গিয়ে দেখেছি অমন খেয়ালি মনিব আর হয় না। মাটির পিছনে যত খাটবে, যত তাকে পুষ্টি দেবে, সেবা দেবে তত ফসল ঘরে অসবে। সেখানে দাবি আদায় সেই, চুরি-জোচ্চুরি চলে না, ধর্মঘট না। সেখানে সার্ভিস মানে চাকরি নয়, সেবা। মানুষের এই বুঝটা সহজে হয় না। যে দেশের যত উন্নতি হয়েছে সে দেশের লোক তত মনিবকে মানে। সে চাকরিতেই হোক, আর স্বাধীন বৃত্তিতেই হোক। বেশি সিকিউরিটি আর কম ঝামেলা বলে কিছু নেই। দেশ কথাটাই এসেছে আদেশ থেকে। যে বৃত্তিতে থাকো তার আদেশ মানতেই হয়। যত ঝামেলাই আসুক। ডিউটিফুল ইজ বিউটিফুল।

ননীবালা চুপ করে ছিলেন এতক্ষণ। এখন বললেন—ওসব কথা ওদের বলছ কেন? তোমার ছেলেরা কি খারাপ?

ব্রজগোপাল সন্ত্রস্ত হয়ে ছেলেদের মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখলেন। তারপর খুব কুণ্ঠার সঙ্গে প্রসঙ্গ পালটে বললেন—তা বলিনি। চাকরি পাওয়াও সোজা নয়। আর চাকরি পেলেই বা কী! বাঁধা মাইনে, গণ্ডীবদ্ধ জীবন, মানুষ ছোট হতে থাকে।

ননীবালা বাতাস শুকে কী একটা বিপদের গন্ধ পান। হঠাৎ ছোবল তুলে বলেন—তো তুমি ওকে কী করতে বলো?

ব্রজগোপাল যেন আক্রমণটা আশঙ্কা করছিলেন। একটু মিইয়ে যায় তাঁর গলা। বলেন—পেলে তো চাকরি করবেই। আমি তো ঠেকাতে পারব না। যতদিন না পাচ্ছে ততদিন আমার কাছে গিয়ে থাকতে পারে। যা আছে সব বুঝেসুঝে আসুক।

ননীবালা কুটিল সন্দেহে চেয়ে থাকেন স্বামীর দিকে। গলায় সামান্য ধার এসে যায়। বলেন—ও সেখানে যাবে কেন চাষাভুষোর সঙ্গে করতে? বহেরুরা লোকও ভাল না। চাষার ধাতও ওর নয় যে, জলে কাদায় জেবড়ে চাষ করতে শিখবে। ও সব বলে লাভ নেই।

ননীবালার কথার ধরনেই একটা রুখেওঠার ভাব। যেন বা তাঁর সন্তানকে কেড়ে নিতে এসেছেন ব্রজগোপাল। তিনি পাখা ঝাপটে আড়াল দিচ্ছেন পক্ষিণীর মতো।

ব্রজগোপাল রণেনের দিকে চেয়ে বলেন—তুমিও কি তাই বলো?

রণেন মুখটা তুলে বলে—আমার কথায় কী হবে? সোমেনের ইচ্ছে হলে যাবে। আমার আপত্তি নেই।

ব্রজগোপাল মাথা নাড়লেন। কিন্তু সোমেনের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন না। ননীবালার দিকে চেয়ে বললেন—আমি বললেই কি আর ও যাবে? তোমার ভয় নেই। সংসারটা যেভাবে ভাগ হয়ে গেছে সেভাবটাই থেকে যাবে। একদিকে আমি একা, অন্যদিকে তোমরা।

ননীবালা কথাটার উত্তর দিলেন না।

সোমেনের একটা কিছু করা দরকার। হাতে খবরের কাগজে মোড়া প্যান্টের কাপড়টা তখনও ধরা আছে। ঘরের ভারী আবহাওয়াটা হালকা করার জন্যই সে মোড়কটা খুলে মার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—প্যান্টের কাপড়টা বড়দি দিল। লক্ষ্মণদা পাঠিয়েছে কানাডা থেকে।

—ওমা! বলে হাত বাড়িয়ে ননীবালা কাপড়টা নিলেন—বা! কী সুন্দর রং-টা রে! তোকে বড় ভাল মানাবে। রণেন, দ্যাখ!

রণেন আগ্রহে এগিয়ে ঝুঁকে দেখে। টুবাইকে ঘরে শুইয়ে রেখে বউদি ঘরে পা দিয়েই এগিয়ে এসে বলে—বাঃ, ফাইন! ইংরেজিটা বলেই শ্বশুরের কথা মনে পড়ায় একটু লজ্জা পায়।

এই অন্যমনস্কতার ফাঁকে ব্রজগোপাল ধীরে ধীরে উঠলেন। একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ সোফার কোণ থেকে তুলে নিয়ে বললেন—চলি।

প্যান্টের কাপড়টা বউমার হাতে দিয়ে ননীবালা কষ্টে উঠে বললেন—যাবে?

—যাই। রাত হয়ে যাচ্ছে।

ননীবালা সোমেনের দিকে চেয়ে বললেন—তুইও বেরোবি?

—টিউশনিতে যাব।

—তা হলে সঙ্গে যা। বাসে তুলে দিয়ে যাবি। দুর্গা দুর্গা।

রাস্তায় ব্রজগোপাল দু-কদম আগে হাঁটছেন। অন্যমনস্ক, ভারাক্রান্ত। পিছনে সোমেন। বাবার সঙ্গে বহুকাল হাঁটেনি সোমেন। এই স্টেশন রোডেই ছেলেবেলায় সে সকালে খালিপেটে বাবার সঙ্গে মাঝে মাঝে প্রাতঃভ্রমণে যেত। ফেরার সময় খিদে পেত না। ব্রজগোপাল তাকে ফেরার পথে মুড়ি আর বাতাসা কিনে দিতেন। আবছা মনে পড়ে। বাবার সঙ্গ সে খুব বেশি পায়নি।

লন্ড্রির সামনে কয়েকজন ছেলেছোকরা জটলা করছিল। তাদের পেরিয়ে যাওয়ার সময়ে একজন আর একজনকে একটা খিস্তি করল। একটু চমকে উঠল সোমেন। রাস্তাঘাটে আজকাল অনর্গল খিস্তি কানে আসে। বাপ-দাদার সঙ্গে বেরোতে তাই লজ্জা করে। একা থাকলে এ সব কানে লাগে না।

সে বাবাকে লক্ষ করল। শুনতে পাননি তো! না। ব্রজগোপাল আজ একটু অন্যমনস্ক। সোমেন বলে-বাবা, ব্যাগটা আমার হাতে দিন।

—উ! বলে ব্রজগোপাল মুখটা ঘুরিয়ে হাসলেন। বললেন, না, এ ভারী কিছু নয়।

—দিন না!

একটু লাজুকভাবে সংকুচিত ব্রজগোপাল বললেন—ক্যাম্বিসের ব্যাগ, এ তোমার নিতে লজ্জা করবে। মানায়ও না।

সোমেন একটু হেসে ব্যাগটা প্রায় কেড়েই নেয়। ব্রজগোপাল খালি হাতটা ব্যাপারের মধ্যে টেনে নেন। সোমেন টের পায়, বুড়োর মনটা ভাল নেই। ভরভরতি সংসারটা দুটো চোখে দেখে ফিরে যেতে হচ্ছে। সোমেনের মনটা কেমন করে। বলতে কী এই প্রথম বয়সকালে সে বাবাকে একটু একটু চিনছে।

ব্রজগোপাল দু-কদম পিছিয়ে তার পাশ ধরে বললেন—আমি আজ তোমার জন্যই বসেছিলাম। ভাবলাম দেখাটা করে যাই। নইলে সন্ধের গাড়িটা ধরতে পারতাম।

সোমেন একটু বিস্মিত হয়ে বলে—কোনও দরকার ছিল বাবা?

—না, না। তেমন কিছু নয়। এমনিই। ভাবলাম বসেটসেই তো আছে, অথচ ওদিকে এক-আধবার যাও-টাও না।

—হাতে একটা টিউশনি আছে।

—সে তো সন্ধেবেলা একটুখানি। বাদবাকি দিনটা তো ফাঁকা। ছুটিছাটার দিনও আছে।

সোমেন উত্তর দেয় না।

ব্রজগোপাল বলেন—টিউশনিটা করছ করো। কিন্তু বাড়ি বাড়ি ঘুরে পড়ানো অনেকটা ফিরিঅলার কাজ। ওটা অভ্যাসগত করে ফেললা না।

—পেয়েছি তাই করছি। বসেই তো থাকি।

—খারাপ বলছি না, ব্রজগোপাল নিজেকে সামলে নেন। বলেন—কিন্তু তোমরা মাঝেমধ্যে ওদিকে গেলে জমিজমার একটা বুঝ-সমঝ হয়। ব্রজগোপাল আবার আস্তে করে বলেন—অবশ্য আমি তোমাদের টেনে নিতে চাইছি না। তোমার মায়ের সেটা বড় ভয়ের ব্যাপার। আমি বলছিলাম, বসেই যখন আছ তখন—

কথাটা শেষ করতে পারে না ব্রজগোপাল। গলায় কী একটু আটকায় বোধ হয়।

সোমেন বলে—একা আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে ওখানে।

—না, না। একা বেশ আছি। বহুকালের অভ্যাস। কাউকেই দরকার হয় না তেমন। কিন্তু তোমার মায়ের সন্দেহ, আমি ছেলেদের কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি। পাগল! তাই কি হয়!

হাঁটতে হাঁটতে তারা ব্রিজের তলার কাছে চলে আসে। একটা ট্রেন সাঁ করে বেরিয়ে গেল। ব্রিজের ওপরে মহাভার নিয়ে চলে যাচ্ছে ডবলডেকার, বিমগুলো কাঁপে। ব্রজগোপাল একবার ওপরের ছুটন্ত বাড়িঘরের মতো বাসের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। থেমে ব্যাপারটা ভাল করে জড়িয়ে নিলেন গায়ে। বললেন—তোমার সঙ্গে দেখা করাটাই দরকার ছিল। ভাবছিলাম, হয়তো আজও দেখা হবে না। হয়ে গেল।

সোমেন বলল—কিছু দরকার থাকলে বলুন।

—দরকার! বলে ব্রজগোপাল সামান্য হাসেন—তেমন কিছু নয়। ছেলেকে যে বাপের কেন দরকার হয় তা বাবা না হলে কী বোঝা যায়!

ব্রজগোপাল একটু শ্বাস ফেললেন। সোমেন সঙ্গে সঙ্গে হাঁটে। ফাঁকা থেকে ক্রমে ভিড় আর আলোর মধ্যে এসে পড়ে। বাসস্টপ আর দূরে নয়। ব্রজগোপাল খুব আস্তে হাঁটেন। সামান্য রাস্তাটুকু যেন দীর্ঘ করে নেওয়ার জন্যই। বলেন—রণো কদিন আগে হঠাৎ গিয়ে হাজির। স্টেশনে দেখা হল, ও তখন ফিরছে। নানা কথার মধ্যে হঠাৎ বলে ফেলল- বাবা, সংসারে বড় অশান্তি। ভেঙে কিছু বলল না। সেই থেকে মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে। চাপা ছেলে, সহজে কিছু বলে না। কীসের অশান্তি তা তো আর আমার বুঝবার কথা নয়। আমি বাইরের মানুষ। কিন্তু শুনলে পরে মন ভাল লাগে না।

সোমেন সতর্ক হয়ে গিয়ে বলে—ওসব কিছু নয়। একটু বোধ হয় মন কষাকষি হয়েছিল, মিটে গেছে।

ব্রজগোপাল মাথা নাড়লেন। বুঝেছেন, বললেন—তাই হবে। তোমার মা কী কথায় যেন আজই বলছিলেন, তুমি নাকি আলাদা বাসা খুঁজছ!

মার মুখ বড় পলকা। কিছু চেপে-ঢেকে রাখতে পারে না। মনে মনে বড় রাগ হল সোমেনের। মুখে বলল—ও বাড়িতে জায়গা কম, লেখাপড়ার একটা ঘর দরকার। তাই ভাবছিলাম।

ব্রজগোপাল বুঝদারের মতো বললেন—ও।

কিন্তু কথাটা যে বিশ্বাস করলেন না তাঁর নিস্পৃহতা থেকে বোঝা গেল। একটা শ্বাস ফেললেন। এবং শ্বাসের সঙ্গে বললেন—মানুষের সওয়াবওয়া বড় কমে গেছে।

—বাবা, আপনি ষোলো নম্বর বাসে উঠে পড়ুন।

—তাই ভাল।

স্ট্যান্ডে বাস দাঁড়িয়ে আছে। বসার জায়গা নেই। ব্রজগোপাল বাসে উঠে রড ধরে দাঁড়ালেন। একা ব্রজগোপালই দাঁড়িয়ে আছেন, আর সবাই বসে। বাসের দরজা দিয়ে দৃশ্যটা দেখে সোমেন। একা দাঁড়িয়ে থাকা বাবাকে বড় অদ্ভুত দেখাচ্ছে। বলল—বাবা, আপনি নেমে আসুন। পরের বাসে যাবেন।

—থাকগে, দেরি হয়ে যাবে।

—দাঁড়িয়ে যেতে আপনার কষ্ট হবে।

ব্রজগোপাল মাথা নেড়ে বললেন—না, কষ্ট কী! পারব।

সোমেন ছাড়ল না, উঠে গিয়ে বাবার হাতের ব্যাগটা নিয়ে বলে—আসুন।

ব্রজগোপাল এই আদরটুকু বোধ হয় উপভোগ করে একটু হাসলেন। এই ছেলেটা তাঁর বড় মায়াবী হয়েছে। নেমে এলেন। পরের ষোলো নম্বর বাসটা ফাঁকা দাঁড়িয়ে আছে। স্টার্টারকে জিজ্ঞেস করে নিয়ে সোমেন বাবাকে ফাঁকা অন্ধকার বাসটায় তুলে দেয়। অবশ্য একেবারে ফাঁকা নয়। অন্ধকারে দুটো একটা বিড়ি বা সিগারেটের আগুন শিসিয়ে ওঠে। ব্রজগোপাল বসলেন। বললেন—আজকাল সব জায়গায় বড় ভিড়।

—হ্যাঁ।

—তবু মানুষ কত কম।

কথাটার মধ্যে একটা নিহিত অর্থ আছে। সোমেন বুঝল। কিছু বলল না। ব্রজগোপাল জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কোথায় যাবে?

সোমেনের একটু বিপদ ঘটে। সে যাবে বালিগঞ্জ সারকুলার রোডে। গাব্বুকে পড়াতে। সেখানে এই বাসেও যাওয়া যায়। কিন্তু বাবার সঙ্গে আর বেশিক্ষণ থাকতে তার এরকম অনভ্যাসজনিত অনিচ্ছা হতে থাকে। একটা সিগারেটও খাওয়া দরকার। সে বলল—এই কাছেই যাব।

—তা হলে রওনা হয়ে পড়ো। আমার জন্য দেরি করার দরকার নেই।

—যাচ্ছি। বলে একটু ইতস্তত করে বলে—আমাকে কোনও দরকার হলে—

ব্রজগোপাল অন্ধকারে একটু অবাক গলায় বললেন—দরকার! সে তেমন কিছু নয়।

সোমেন প্রত্যাশা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

ব্রজগোপাল মাথা নেড়ে লাজুক গলায় বললেন—তুমি ভেবো না। দরকারটা বাপ ছাড়া কেউ বোঝে না।

—কী দরকার বাবা?

—তোমার গায়ের গন্ধটুকু আমার দরকার ছিল। আর কিছু নয়।

॥ বাইশ ॥

ভাগচাষির কোর্ট থেকে বেরিয়ে ফেরার পথে একজায়গায় দাঁড়িয়ে গেল বহেরু। রাস্তার ধার ঘেঁষে মাঠমতো জায়গায় খেলা জমেছে। রাজ্যের লোক ভিড় করে ঘিরে আছে, লাউডস্পিকার বাজছে। দু-ধারে দুটো মস্ত গাছে বিশ পঁচিশ ফুট উঁচুতে টানা দড়ি বাঁধা, দড়ির মাঝ বরাবর একটা মেটে হাঁড়ি ঝুলছে। হাঁড়ির গায়ে সুতোয় গাঁথা দশ টাকার নোট হাওয়ায় উড়ে উড়ে হাতছানি দিয়ে ডাকছে মানুষজনকে। কম নয়, এই দুর্দিনের বাজারে একশোটা টাকা। লাউডস্পিকারে হিন্দি গান থামিয়ে ঘোষণা হচ্ছে—বন্ধুগণ, এ হচ্ছে বুড়ির হাঁড়ি। হাঁড়ির গায়ে একশো টাকা গাঁথা আছে, যে ছুঁতে পারে তার। কিছু শক্ত নয়, খুব সোজা খেলা। দেখুন, এবার আসছেন সিমলেগড়ের যুবক সংঘ।

আবার হিন্দি গান শুরু হয়।

ব্রজগোপাল বিরক্ত হয়ে বলেন—দাঁড়ালি যে!

বহেরু একটু হেসে লাজুকভাবে বলে—বলে র'ন একটু দেখে যাই।

—তোর আর বয়স হল না।

বহেরু গায়ের চাদরখানা খুলে ঝেড়ে ভাঁজ করে। কাঁধে ফেলে বলে—দুনিয়ার হাজারো মজা। দেখে-টেখে যাই সব।

—তো তুই দাঁড়া। আমি এগুতে থাকি, তুই চোটে হেঁটে আসিস।

বহেরু তখন মজা দেখছে। একবার মাথা নাড়ল কেবল। দশজনের দল, চারজন গোল হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াল, তাদের কাঁধে ভর দিয়ে উঠল তিনজন। নীচের চারজন টলোমলো। তাদের মাঝখানের ফোকর দিয়ে সাবধানে আর দুজন উঠছে। কাঁধে পা রাখতেই নীচের চারজন ঠেলাঠেলি শুরু করে দেয়।

লাউডস্পিকারে গান থামিয়ে উৎসাহ দেওয়া হতে থাকে—আপনারা পারবেন। চেষ্টা করুন, শক্ত হয়ে দাঁড়ান। বুড়ির হাঁড়ি আপনাদের নাগালের মধ্যেই এসে গেছে প্রায়। শক্ত হয়ে দাঁড়ান, ভরসা হারাবেন না...

লাউডস্পিকারে গান থামিয়ে এদের উৎসাহ দেওয়া হতে থাকে-আপনারা পারবেন। চেষ্টা করুন, শক্ত হয়ে দাঁড়ান। বুড়ির হাঁড়ি আপনাদের নাগালের মধ্যেই এসে গেছে প্রায়। শক্ত হয়ে দাঁড়ান, ভরসা হারাবেন না...

কিন্তু মানুষের স্তম্ভটা ভেঙেই গেল। হুড়মুড় করে ওপরের ছোকরারা পড়ে গেল এ ওর ঘাড়ে। চারধারে একটা হাসির চিৎকার উঠল।

—যাঃ, পারল না! ব্রজগোপাল বললেন।

বহেরু মুগ্ধ হয়ে খেলাটা দেখছিল। ঘাড় ঘুরিয়ে ব্রজগোপালকে দেখে বলল—যাননি?

—মজাটা মন্দ নয়, তাই দাঁড়িয়ে গেলাম।

—ভারী মজা। র'ন, একটু দেখে যাই।

লাউডস্পিকারে ঘোষণা হয়—এবার বুড়ির হাঁড়ি কারা ছোঁবেন চলে আসুন। কোনও প্রবেশমূল্য নেই, দশজনের যেকোনও দল চলে আসুন। বুড়ির হাঁড়ি আপনাদের চোখের সামনে ঝুলছে, হাতের নাগালের মধ্যেই। পুরস্কার নগদ একশো টাকা...নগদ একশো টাকা।

ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি হতে থাকে। রোগা-রোগা কালো-কালো চাষিবাসি গোছের কয়েকজন মাঠের মাঝখানে ফাঁকা জায়গাটায় গিয়ে দাঁড়ায়। উপোসী চেহারা, গায়ে জোর বল নেই।

লাউডস্পিকার বলতে থাকে—এবার আসছেন বেলদার চাষিভাইরা। মনে হয়, এ-বছর এঁরাই বুড়ির হাঁড়ি জিতে নেবেন। এঁরা প্রস্তুত হচ্ছেন, আপনারাও এঁদের উৎসাহ দিতে প্রস্তুত থাকুন।

আবার হিন্দি গান বাজে।

ব্রজগোপাল বলেন—এরা কি পারবে?

বহেরু একটু হাসে—তাই পারে! শরীলে আছে কী? ভাল করে দম নিতে পারে না।

ব্রজগোপাল শ্বাস ফেলে বলেন—টাকা দেখে লোভ সামলাতে পারেনি। লোক হাসাতে নেমে গেছে।

—সেইটেই তো মজা।

রোগা, আধবুড়ো, মরকুটে চেহারার লোকগুলো হাঁড়ির নীচে দাঁড়াতেই চারদিকে হুল্লোড় পড়ে গেল। লোকগুলোও অপ্রতিভভাবে হাসে চারদিকে চেয়ে। তারা যে মজার পাত্র তা বুঝে গেছে। তবু চারটে লোক কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়ায়, তিনজন আঁকুপাঁকু করতে করতে কাঁধের ওপর দাঁড়ায়। ভারী বেসামাল অবস্থা, চারজনের পিঠে তিনজন দাঁড়াতেই নীচের চারজনের পিঠ বেঁকে যাচ্ছে। মাটির দিকে নেমে যাচ্ছে মাথা। তবু ঠেলাঠেলি করে তারা সামাল দেয়। এখনও বুড়ির হাঁড়ি অনেক উঁচুতে। মাঝখানে অনেকটা শূন্যতা। বাতাসে ফুরফুর করে ওড়ে সুতোয় বাঁধা দশখানা নোট। বুড়ির হাঁড়ি দোল খাচ্ছে। চারজনের পিঠে তিনজন দাঁড়িয়ে একটুক্ষণ দম নেয়। তারপর আর দুজন উঠতে থাকে চারজনের মাজায় পা। রেখে, পিঠ বেয়ে। ভারী কষ্টকর কসরত। তবু ধীরে ধীরে দুধার দিয়ে দুজন শেষ পর্যন্ত ওপরের তিনজনের কাঁধের ওপর গিয়ে খাড়া হয়। প্রবল চিৎকার ওঠে চারদিকে। লাউডস্পিকার বলতে থাকে—পেরেছেন, আপনারা পেরেছেন! আর মোটে একজন উঠে দাঁড়াতে পারলেই বুড়ির হাঁড়ি জিতে যাবেন। সাহস করুন, শক্ত হয়ে দাঁড়ান।

রোগা, জীর্ণ মানুষের তৈরি স্তম্ভটা অবিশ্বাস্যভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। পিঠগুলো বেঁকে যাচ্ছে, শ্বাস পড়ছে হপর হপর। টলছে, তবু দাঁড়িয়ে আছে। বুড়ির হাঁড়ি আর মাত্র এক-মানুষ উঁচুতে। সর্বশেষ লোকটা হালকা-পলকা, অল্পবয়সি। জিব দিয়ে ঠোঁটটা একবার চেটে আস্তে পা তুলল নীচের চারজনের একজনের মাজায় ভর রেখে উঠল। হাত বাড়াল দ্বিতীয় স্তরটায় ওঠার জন্য। প্রচণ্ড হাততালি দিয়ে উঠল লোকজন, চেঁচাল—বাহবা! সাবাস! লাউডস্পিকারে ঘোষক বলতে থাকে—পারবেন। নিশ্চয়ই পারবেন। উঠে পড়ুন।

এত উৎসাহে আর চিৎকারেই বোধ হয় দিশাহারা হয়ে স্তম্ভটা হঠাৎ ভেঙে পড়ল। বুড়ির হাঁড়ির নীচে কালো, জীর্ণ মানুষের শরীর দলা পাকিয়ে গেল।

ব্রজগোপাল শ্বাস ছেড়ে বললেন—দূর! আগেই ভেবেছিলাম। বহেরু, এবার চল।

বহেরুর যেতে অনিচ্ছা। বলল—দেখে যাই। কেউ না কেউ তো পারবেই।

—পারলে পারবে। তা বলে কতক্ষণ দাঁড়াবি?

বহেরু আস্তে করে বলে—আমার দল থাকলে একবার দেখতাম কর্তা। হাঁড়িটা বড্ড উঁচুতে বেঁধেছে, কিন্তু পারা যায়। গা গতর থাকলে কিছু শক্ত কাজ নয়।

ব্রজগোপাল বললেন—জেদ করলে সব পারা যায়, লোভ করলেই কিছু হয় না।

বহেরু বলে—এ তাম্‌শাটা আমাদের ওখানে একবার দিলে হয়।

পরের দলটাও তিন থাক তৈরি করেছিল। শেষ লোকটাই পারল না। লোকজন চেঁচাচ্ছে লাউডস্পিকার আশ্বাস দিয়ে বলছে—কেউ না কেউ পারবেনই। এগিয়ে আসুন। হতাশ হবেন না।

এ খেলাটার মধ্যে ব্রজগোপাল লোভ দেখতে পান। বহেরু দেখে লড়াই। বুড়ির হাঁড়ির গায়ে মালার মতো পরানো নোটগুলোয় বাতাস এসে লাগে। মাটি থেকে হাঁড়ি, মাঝখানে নিশূন্য ফাঁকা জায়গাটা। সেটুকু জায়গার মাঝখানে কত কী খেলা করছে। খেলা, লোভ, লড়াই।

গোটা ছয়েক দল পর পর চেষ্টা করল। পারল না। বহেরু উত্তেজিত হয়ে বলে—কেউ পারল না! অ্যাঁ। একটা দলে ঢুকে পড়ব নাকি কর্তা? এ বুড়ো কাঁধে এখনও যা জোর আছে তা এদের কারও নেই।

—দূর! শিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢোকা! চল্। পিরামিডের খেলা অভ্যাস করতে হয়। শুধু ভার বইতে পারলেই হল না, ভারসাম্য রাখা চাই। সে বড় শক্ত।

বহেরু চমৎকার দাঁত দেখিয়ে হেসে বলে—কথার কথা বলছিলাম আর কী! সব হা-ঘরে কোত্থেকে এসে জুটেছে টাকার গন্ধে। এদের কম্ম নয়। তবে বড় ভাল খেলা, গোবিন্দপুরে একবার খেলাটা দেব। দুশো টাকা বেঁধে দেব, কে লড়বি লড়ে যা। সে মজা হবে!

বহেরু চমৎকার দাঁত দেখিয়ে হেসে বলে—কথার কথা বলছিলাম আর কী! সব হা-ঘরে কোত্থেকে এসে জুটেছে টাকার গন্ধে। এদের কম্ম নয়। তবে বড় ভাল খেলা, গোবিন্দপুরে একবার খেলাটা দেব। দুশো টাকা বেঁধে দেব, কে লড়বি লড়ে যা। সে মজা হবে!

এই সময়ে ডাকাবুকো হোঁতকা চেহারার একটা দল এসে নীরবে হাঁড়ির নীচে দাঁড়াল। তাদের সর্দার যে ছোকরা তার শরীর বিশাল। যেমন মাথায় উঁচু, তেমনি চওড়া কাঁধ। সে মাথা তুলে হাঁড়িটা একবার দেখে নিল। লাউডস্পিকারে ঘোষণা হতে থাকে—একবার বুড়ির হাঁড়ির দিকে হাত বাড়াবেন গোবিন্দপুরের কোঁড়ারপাড়া মিলন সমিতি ব্যায়ামাগারের যুবকবৃন্দ। এবার আমরা বেশ বুঝতে পারছি যে মিলন সমিতি বুড়ির হাঁড়ি প্রতিযোগিতা থেকে খালি হাতে ফিরে যাবেন না।

বহেরু হাঁ হয়ে সর্দারকে দেখছিল। মুখ ফিরিয়ে বলল—কর্তা, ওই কোকার দল এসে গেছে।

—কই?

—ওই দেখুন।

বহেরুর মাঝের ছেলে, সদ্য জেল-ফেরত কোকা এখন কোমরে হাত দিয়ে চারধারে চেয়ে দেখছিল। তার শরীরটা অঢেল। ভগবান ঢেলে দিয়েছে অস্থি-মজ্জা-মাংস। চোখ দুখানা ভয়ংকর। ব্রজগোপাল বহেরুকে বললেন—ডাকিস না। কী করে দেখি।

বহেরুনীরবে মাথা নাড়ল। চারদিকে প্রচণ্ড হাততালি। চেহারা দেখেই মানুষ বুঝে গেছে, এরা পারনেওয়ালা লোক।

কোকা দাঁড়াল নীচের থাকে। সেখানে চারজন সবচেয়ে মজবুত চেহারার ছোকরা। তাদের কাঁধে অনায়াসে নৈপুণ্যে উঠে গেল তিনজন। পা কাঁপল না, টলল না কেউ। মুহূর্ত পরে আর দুজন উঠে গেল তিজনের কাঁধে। সর্বশেষ একজন বানরের মতো চটুল হাত-পায়ে উঠে গেল ওপরে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বুড়ির হাঁড়িটা দুলিয়ে দিল হাত দিয়ে। হাততালিতে তখন ফেটে পড়ছে চারদিক, চেঁচানিতে কান পাতা দায়। ভিড় এতক্ষণ গোল হয়ে ঘিরেছিল জায়গাটা, এখন হাঁড়ি-ছোঁওয়া হয়ে গেলে মাঠময় ছেলেপুলে লোকজন হুটোপাটি লাগিয়েছে।

এত সহজে, অনায়াসে ওরা হাঁড়িটা ছুঁল যে বিশ্বাসই হতে চায় না। ওদের হাঁড়ি-ছোঁওয়া দেখে মনে হয় যে কেউ পারে।

বহেরু বলে—ধুস্! এ তো দেখছি ফঙ্গবনে খেলা। আনাড়িগুলোই নাজেহাল হচ্ছিল এতক্ষণ।

ব্রজগোপাল হেসে বলেন—দূর বোকা! সহজ মনে হয় বলে কি সহজ! দক্ষতা জিনিসটা এমনি, শক্ত কাজটাও এমনভাবে করে যেন গা লাগাচ্ছে না বলে মনে হয়।

বহেরু ভারী খুশি। বুড়ির হাঁড়িটা তার ছেলের দল ছুঁয়েছে। ভিড়ের দিকে খোঁটা-ওপড়ানো গোরুর মতো বেগে ধেয়ে যেতে যেতে বহেরু বলে—দাঁড়ান, একবার কোকাকে দেখে আসি।

ব্রজগোপাল বিরক্ত হয়ে একটা ধমক দেন—তোর দেখা করার কী? ছেলেছোকরারা এ-সময়ে নানারকম ফুর্তিফার্তা করবে এ-সময়ে সেখানে বাপ-দাদা হাজির হলে কি খুশি হয়? চলে আয়।

বহেরু থমকে যায়। কথাটা বড় ঠিক। এইসব পরামর্শ ঠিক সময়মতো দেন বলেই ব্রজকর্তাকে তার এত প্রয়োজন।

পিছিয়ে এসে বহেরু বলে—যাব না?

—কেন যাবি?

—তা হলে চলুন বরং। বলে হাঁটতে হাঁটতে একটা শ্বাস ফেলে সে। তারপর গলাটা নামিয়ে বলে—ছাওয়ালটাকে কেমন বোঝেন?

—কেমন আর! হাঁকডাকের মানুষ হবে, তোর মতোই।

বহেরু দুঃখিতভাবে মাথা নাড়ে। বলে—তাই কি হয়? আমি বরাবর মানী লোকের মান দিই। ও দেয় না। দিনেকালে ও সবকিছু দখলে নেবে। দেখবেন।

ব্রজগোপাল আস্তে করে বলেন—দেখার জন্য আমরা কেউ থাকব না। নেয় তো নেবে আমাদের কী রে? আমাদের ডংকা বেজে গেছে। সংসার নিয়ে অত ভাবিস না।

—ভাবা ঠিকও নয়। বুঝি। তবু মনটা মানে না। কোকাটা এই বয়সেই খুন-খারাপি করে ফেলল!

—খুন-খারাপির কি বয়স আছে না কি! আজকাল কতটুকু কতটুকু সব ছেলে মানুষ মেরে বেড়ায়।

বহেরুর মুখে একটু উদ্বেগ দেখা যায়। বলে—আমিও তো কাটলাম ক'টা। সে-সব কর্মের দোষেই কি ছেলেটাও অমন হল! ওই একটাই একটু বেগোছ রকমের, অন্য ক'টা তো দেখছেন, ভালই।

ব্রজগোপাল অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়েন। মনের মধ্যে হঠাৎ একটা নিঃসঙ্গতা ঘনিয়ে আসে, মেঘলা দিনের মতো। ছোট ছেলেটাকে মনে পড়ে। মায়ের শ্রীই পেয়েছে ছেলেটা। লম্বা রোগাটে বুদ্ধিমান মুখশ্রী। সংসারের গাদ এখনও মনের মধ্যে কোনও তলানি ফেলেনি। ছেলেদের কাছে কিছুই চাওয়ার নেই ব্রজগোপালের। তবু বুক জুড়ে একটা দুর্ভিক্ষের চাওয়া রয়েছে। ভুলেই গিয়েছিলেন, কেন যে দেখলেন মুখখানা!

ব্রজগোপাল অন্যমনস্কভাবে মাথা নেড়ে বলেন—ভাবিস না। যত মায়া করবি তত দুঃখ।

বহেরু তত্ত্বকথা বোঝে না। তবু সায় দিল। বলল—জেলখানার মেয়াদটা বড় টপ করে ফুরিয়ে গেল। আরও কিছুদিন ঘানি টানলে রস মজত।

ব্রজগোপাল অবাক হয়ে বলেন—কেন রে! কোকা তোর কোন পাকা ধানে মই দিল! দিব্যি ঘুরছে-টুরছে, ফুর্তি করে বেড়াচ্ছে, তোকে ও পায় কীসে!

বহেরু একটু লজ্জা পায়। অপ্রস্তুত চোখ দু'খানা ব্রজকর্তার চোখ থেকে সরিয়ে নিয়ে বলে—পায় না অবশ্য। কিন্তু ওর বড় দাপ্ কখন কী করে ফেলে বুঝে পাই না। ভয় লাগে।

—ছেলেদের ভয় পেতে শুরু করেছিস, তার মানে তোর বয়েসে পেয়েছে।

চিন্তিতভাবে বহরু আস্তে করে বলে—ওর মতলব ভাল নয়। আপনার ছাওয়ালরা যদি জমিটমি বুঝে না নেয় তো আমরা চোখ বুজলে ও সব হাতিয়ে নেবে। ভাবি, সৎ ব্রাহ্মণের সম্পত্তি খেয়ে শেষমেশ নির্বংশ হয়ে যাবে না তো! আপনাকে ও খুব মানে, কিন্তু বড় লোভ ছেলেটার।

ব্রজগোপাল উদাস গলায় বলেন—হাতানোর দরকার কী! তেমন বুঝলে আমি ওর নামে সব লেখাপড়া করে দেব।

—তাই কি হয়।

ব্রজগোপাল মাথা নেড়ে বলেন—আমার ছেলেরা আসবে না কখনও। ওদের কলকাতায় পেয়েছে।

বহেরু একটু আগ্রহভরে বলে—তার চেয়ে কেন বেচে দেন না কর্তা! আমি কিনে নেব।

—বেচব! বলিস কী? মা'টি হল মাটি। রামকৃষ্ণদেবের কথা। মা কি বেচবার জিনিস! একসময়ে আমার ঠাকুর বলেছিলেন—বড় দুর্দিন আসছে, সব সোনা মাটি করে ফেল। সেই তখন হাতের পাতের যা ছিল, আর সোনাদানা বেচে মাটি কিনতে লাগলাম। সে মাটি বেচব কী বলে? ছেলেরা যদি না বোঝে না বুঝুক।

বহেরু একটা শ্বাস ফেলল মাত্র। তার প্রকাণ্ড শরীরটার কোথায় একটা দুর্বলতা আর ভয়ের পচন শুরু হয়েছে।

॥ তেইশ ॥

এখানে দিন শুরু হয় সূর্য উঠবার অনেক আগে। ঘুটঘুটে অন্ধকার, চারদিকে ফ্যাকাসে কুয়াশার ভূত। কালো পাহাড়ের মতো শীত জমে থাকে। শিশিরে মাটি ভিজে থাকে এমন, যেন বৃষ্টি হয়েছে। দিগম্বরের খোলের প্রথম বোলটি ফোটে, ব্রজগোপালের বউলঅলা খড়মের শব্দটি পাওয়া যায়, আর তখনই বহেরুর বড় জামাই কালীপদর গান শোনা যায়—জাইগতে হবে, উইঠতে হবে, লাইগতে হবে কাজে...।

ঘড়ির অ্যালার্ম আর বাজে না। তবু উঠতে কোনও অসুবিধে হয় না। ঘুম বড় একটা আসে না তো। এপাশ-ওপাশ করে রাত কাটে। হারিকেনের পলতে কমানো থাকে, ঘরে একটা পোড়া কেরোসিনের গন্ধ জমে। টিনের চালের ওপর টুপটাপ শিশির খসে পড়ার শব্দ হয়। আসেপাশে শেয়াল ডাকে, হাঁসের ঘর থেকে ডানা ঝাপটানোর শব্দ আসে, ঘুমের মধ্যে মুরগি ভুল করে ডেকে ওঠে হঠাৎ। নিশুতি রাতে দূরের শব্দ সব শোনা যায়। গন্ধ বিশ্বেসের বহুমূত্র রোগ। অন্ধ-প্রায় মানুষ বলে ঘরে মেটে-হাঁড়ি রাখা থাকে। ঘুম-চোখে ঠাহর না পেয়ে মাঝেমধ্যে হাঁড়ি উলটে ফেলে ঘর ভাসায়। সেই পেচ্ছাপ কাচতে গিয়ে বিন্দুর মা বেহান বেলাটার বাপ-মা তুলে বকাঝকা করে বলে গন্ধ হাঁড়ি উলটে ফেলেই আর্তনাদ করে বেড়ালের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে চেঁচায়—হঃই শালা মেকুর, হঃই...অ্যা-অ্যা-অ্যা....। এভাবে সে সাক্ষী রাখার চেষ্টা করে। গোটা চারেক সড়াল কুকুর সারা রাত চেঁচিয়ে পাহারা দেয়। নমঃশুদ্র বৃন্দাবন লাঠি ঠুকে চৌকি দিয়ে ফেরে। ব্রজগোপাল প্রায় সারা রাত এসব শব্দ শোনেন। শরীরের তাপে বিছানাটা তেতে ওঠে। পাশ ফিরলেই একটা শীতভাব টের পান। আরাম লাগে। এ বয়সে শীতটা বেশ লাগার কথা। কিন্তু লাগে না। বোধ হয় রক্তের চাপ বেড়েছে। তাঁতি লোকটা এ ঘরে ঘুমোয়। ব্যবস্থাটা বহেরুর। সে বলে—বুড়ো মানুষ একা থাকেন, কখন কী হয়ে পড়ে, একটা লোক ঘরে থাকা ভাল। ব্রজগোপাল বিরক্ত হয়ে বলেন—তোর বয়সটা কি কম নাকি! বহেরু হাঁ হাঁ করে বলে—ভদ্রলোকের জান আর ছোটলোকের জান কি এক! তা ছাড়া আমার জন আছে, আপনারে দেখে কেডা?

কথাটা আজকাল লাগে। একটু ভয়ও হয়। মৃত্যুভয় নয়, এ অন্য রকমের এক ভয়।

এখান থেকে কলকাতার দূরত্বটা হিসেব করে দেখেন, খবর পেলে মুখাগ্নি করতে সময়মতো ছেলেরা কেউ এসে পড়তে পারবে তো!

—তাঁতি লোকটার মশারি নেই। চটের ভিতরে খড় ভরে একটা গদি বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেটার ওপর সটান মাটিতে পড়ে থাকে। মাথা পর্যন্ত কাঁথায় ঢাকা, তবু ফাঁকফোকর দিয়ে মশা ঢুকে কামড়ায়। ঘুমের মধ্যেই চটাস চটাস মারে। প্রায় রাতেই শোওয়ার সময় হারিকেনের টিপ খুলে কেরোসিন আধ কোষ তেলোয় ঢেলে সরষেতেলের মতো গায়ে মুখে মেখে নেয়। তবু ঠিক কামড়ায়। ক্রিমি আছে বোধ হয় ঘুমের মধ্যে দাঁত কড়মড় করে, স্বপ্নের মধ্যে কথা বলে। ব্রজগোপাল বিরক্ত হন! পাকা ঘুম তাঁতির, ডাকলে সহজে ওঠে না। আর এক চিন্তা ব্রজগোপালের, চৌকির তলায় স্যুটকেস আছে, টেবিলে ঘড়ি, দড়িতে কিছু জামাকাপড়, দামি

একটা দশবাতির ল্যাম্প—একটা কিছু তুলে নিয়ে মাঝরাতে তাঁতি সটকায় যদি? এমন কিছু মহামূল্যবান দ্রব্য নয়, চোরের লাভ হবে না, কিন্তু গেরস্তর তো ক্ষতি! তাই সতর্ক থাকেন ব্রজগোপাল। কোথাকার সব উটকো লোকজন ধরে আনে বহেরু। এসব লোককে বিশ্বাস কী? এসব মিলেঝুলে আজকাল ঘুম কমে গেছে। বুড়ো বয়সে অবশ্য ঘুম কমে যায়। এ বয়সে শরীরের কল বড় আনমনা, নিজের ক্ষয়ক্ষতি আর পূরণ করে নিতে চায় না।

নিশুত রাতে পৃথিবীটা মস্ত বড় হয়ে ওঠে। ব্রজগোপাল শুলেই টের পান, চারধারে ঘুম, নিস্তব্ধতার ভিতরে মনটা নানা কথা কয়ে ওঠে। সে সব কথা ঢেউ-ঢেউ হয়ে চলতে চলতে কোথায় পৌঁছে যায়। আর ঠিক ওরকম সব ঢেউ যেন চারধার থেকে দূর-দূরান্ত পার হয়ে তাঁর দিকেও আসতে থাকে। যেমন নক্ষত্রের আলো, যেমন দূরদেশ থেকে আসা বাতাস, যেমন খঞ্জনা পাখি।

মনের বড় শত্রু নেই। এমনিতে বেশ থাকে, হঠাৎ কু-ডাক ডাকতে শুরু করে। কাজকর্মের মধ্যে থাকলে মনটা বেশ থাকে, কিন্তু একা হলেই মানুষ বোকা। রাতবিরেতে আজকাল ঘুম না হলে একটা ধন্দ ভাব চেপে ধরে ব্রজগোপালকে। বিষয়চিন্তা তাঁর অভ্যাস নয়। কিন্তু বহেরুর মাঝলা ছেলে কোকা জেল থেকে খালাস হওয়ার পর বিষয়-আশয়ের জন্য একটু উদ্বেগ হয়। ছেলেটা এই সেদিনও ছোট্টটি ছিল, পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করে বেড়াত, ফাইফরমাস খাটত। ব্রজগোপালের ঠাকুর পুজোর প্রসাদ একটু বাতাসার কণা কচি হাতখানা পেতে ভক্তিভরে নিত। চোদ্দো-পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত কিছু বোঝা যায়নি। তারপরই তেড়া বাঁশের মতো নিজের ইচ্ছেয় বাড়তে লাগল। এখনও তেইশ-চব্বিশ বয়স, তবু চোখে ইতরামি এসে গেছে। কাউকে বড় একটা মানে গোনে না। মাঝেমধ্যে ব্রজগোপালের ঘরে এসে 'বামুনজ্যাঠা' বলে ডাক দিয়ে মেঝেয় বসে। কথাবার্তা কয়। কিন্তু ব্রজগোপাল বুঝতে পারেন, ছেলেটার মধ্যে জন্মসূত্রে কোনও দোষ আছে। এ ছেলে যেখানে থাকবে সেখানেই একটা সামাল সামাল পড়ে যাবে। হাতের পাতের টাকা দিয়ে নিজের নামে কিছু জমি কিনেছেন ব্রজগোপাল, স্ত্রীর নামে আছে ছ'বিঘে, আর আছে বাস্তুজমি। ছেলেরা আসবে না এসব দেখতে। তাই কোকার দিকে তাকিয়ে একটু উদ্বেগ বোধ করেন। এই বয়সেই খুন-খারাপি করে ফেলেছে এবং সেজন্য কোনও পাপবোধও নেই। জেলখানা থেকে হাতি হয়ে ফিরেছে। কোকা যে-ছোকরাকে কেটেছিল তাকে চিনতেন ব্রজগোপাল। সোমেনের মতোই বয়স, তেজি চেহারা। পুলিশের ভয়ে পালিয়ে এসে গোবিন্দপুরে এক আত্মীয়-বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। কিছু স্যাঙাৎ জুটিয়ে মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়াত। তার রাগ ছিল জোতদারদের ওপরে। কিন্তু এমন কিছু করেনি যে পালটি নিতে হবে। তবু কোকা তাকে কেটে ফেলেছিল। মশা-মাছি মারলেও জীবহত্যা হয়, মানুষ মারলেও তাই। তবু মানুষ যখন মানুষ মারে তখন বোধ হয় তার নিজের রক্তেই একটা বিরুদ্ধ ভাব ওঠে। তার নিজের গড়া আর একটা জীবকে মারলে কি তার ভিতরে একটা আত্মীয়বধের অনুতাপ কাজ করে? নাকি সে, ফাঁসির দড়ি যাবজ্জীবনের মেয়াদ—এসব ভেবে দিশেহারা হয়? ঠিক জানেন না ব্রজগোপাল। তবে মনে আছে, সেদিন রাতে ফিরে কোকা পুকুরে ঝাঁপ খেয়ে দাপাদাপি করেছিল অনেকক্ষণ। যখন তাকে তুলে আনা হয় তখন দুচোখ ঘোলাটে লাল, বেভুল সব বকছে। রাতে গা-গরম হয়ে জ্বর এল। বহেরু লক্ষণ দেখেই চিনেছিল, ব্রজগোপালকে আড়ালে ডেকে বলেছিল—শুয়োরটা নিশ্চয়ই মানুষ খেয়েছে কর্তা। রক্তেরই দোষ। রাত না পোয়াতে বিড়াল পার করতে হবে।

ভোর রাতে কোকাকে প্রথম ট্রেনে কলকাতায় রওনা করে দিয়ে আসতে গিয়েছিল বহেরু। কলকাতা মানুষের জঙ্গল, পালিয়ে থাকার এমন ভাল জায়গা আর নেই। কিন্তু কোকা স্টেশনেই ধরা পড়ে। ধরা পড়বার পর ব্রজগোপাল গিয়েছিলেন দেখা করতে, উকিল সঙ্গে নিয়ে। ছেলেটাকে তখন দেখেছেন, শিবনেত্র হয়ে লাতন বেচারার মতো বসে আছে। ঘন ঘন মাথা ধোয়, চুল তখনও সপসপে ভেজা, মুখটা পাঁশুটে কেমনধারা যেন। অনেককাল রোগভোগের পর মানুষের এমন চেহারা হয়। ছেলেটা সোমেনের বয়সি একটা তাজা ছেলেকে কেটে ফেলেছে, ভাবলে ওর ওপর রাগ ঘেন্না হওয়ার কথা। কিন্তু মুখ দেখলে তখন মায়া হত। ব্রজগোপাল একটু মায়াভরে বলতেন—কেন কাজটা করতে গেলি রে নিব্বংশার পো?

কোকা তখন দিশেহারার মতো চারদিকে চেয়ে গলা নামিয়ে বলত—কাঁধের ওপর দাঁড়িয়েছিল একা। স্যাঙাৎ জুটিয়ে আমাদের ওপর মাতব্বরী করত খুব। পেছুতে লাগত, তাই রাগ ছিল। সেদিন একা দেখে মাথার ঠিক রাখতে পারিনি। এখন তো সবাই মানুষ-টানুষ মারে, কেউ কিছু বলে না। তাই ভাবলাম, একবার মেরেই দেখি না কী হয়। পালান, নেতাই ওরাও সব বললে—দে শালাকে চুপিয়ে। দিনকাল খারাপ বলে অস্তর সঙ্গে থাকত। হাতে অস্তর, মানুষটাও একা, মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে গেল। হাঁকাড় ছেড়ে দৌড়ে যেয়ে চুপিয়ে দিলাম।

ব্রজগোপাল আতঙ্কিত হয়ে বলেছেন—ওরে চুপ চুপ। ওসব কথা কোস না আর ভুলে যা। উকিলবাবু যা শেখাবেন সেই মতো বলবি।

সন্দেহ ছিল, জেরার সময়ে মাথা ঠিক রাখতে পারবে কিনা। কারণ, দেখা করতে গেলেই খুব আগ্রহের সঙ্গে ঘটনাটার বিশদ বিবরণ দিতে শুরু করত কোকা। চোখ দুখানা বড় বড় হয়ে যেত, দম ফেলত ঘন ঘন। বলত—মাইরি, মানুষ যে এমনভাবে মরে কে জানত! আঁ-আঁ করে একটা চিৎকার ছেড়ে ছেলেটা যখন পড়ে যায় তখন রক্তটা এসে গায়ে লাগল। কী গরম রক্ত রে বাবা! পড়ে হি-হি করে কাঁপছিল ছেলেটা। সে কী ভয়ংকর দৃশ্য! কোকাকে তখন চুপ করানো ভারী মুশকিল ছিল।

প্রথম কদিন ঝিম হয়ে পড়ে থাক। কোর্টে জেরার সময়ে নানা উলটোপালটা জবাব দিয়েছিল। সুবিধে ছিল এই যে, যাকে মেরেছিল তার নামে পুলিশের হুলিয়া ছিল। সে নাকি ভারী ডাকাবুকো ছেলে, কলকাতায় পুলিশ মেরে এসেছে। ফলে, কোকা আর তার দলবলের বিরুদ্ধে পুলিশ কেসটা খুব সাজায়নি। উকিলও সুযোগ পেয়ে 'আত্মরক্ষার জন্য হত্যা' প্রমাণ করার চেষ্টা পায়। মোকদ্দমা ফেঁসে যাওয়ার মতো অবস্থা। শেষ পর্যন্ত অবশ্য চারজনের মেয়াদ হয়েছিল। তিনজন আগেই খালাস পেয়ে যায়। সবশেষে খালাস হল কোকা, মেয়াদ শেষ হওয়ার অনেক আগেই।

এই মামলায় রাজসাক্ষী ছিল গোবিন্দপুরের মেঘু ডাক্তার। সে মাতাল-চাতাল মানুষ। বেলদা-র শুঁড়িখানা থেকে বাঁধ ধরে ফিরছিল। সে ঘটনাটা চোখের সামনে দেখতে পায়। সে অবশ্য লোকজনদের ঠিক চিনতে পারেনি। উলটোপালটা সেও বলেছিল সাক্ষী দিতে গিয়ে। তবু সবচেয়ে জোরদার সাক্ষী ছিল সে-ই।

এ তল্লাটে মেঘুর মতো ডাক্তার নেই। পুরনো আমলের এল এম এফ। সে রুগির মুখে ওষুধ বলে জল ঢেলে দিলেও রুগি চাঙ্গা হয়ে যেত—মানুষের এমন বিশ্বাস ছিল তার ওপর বউ মরে গিয়ে ইস্তক সে ঘোর মাল। বাল-বিধবা এক বোন তার সংসার সামলায়, মেঘু সকাল থেকেই ঢুকু ঢুকু শুরু করে দেয়। রোজগারপাতি বন্ধ হয়ে গেছে প্রায়, সংসার চলে না, রুগি দেখে যে পয়সা পায় তা শুড়িকে দিয়ে আসে।

ইদানীং পাগলামিতে পেয়ে বসেছিল। এক মুসলমান বৃষ্টির সন্ধেবেলা এসে হাজির, সান্নিপাতিকে তার তখন যা-দশা! মেঘুর আলমারিতে ওষুধের নামগন্ধও ছিল না তখন। রুগি হাতছাড়া হয়ে দেখে ইঞ্জেকশনের দাম নিয়ে উঠে ভিতর বাড়িতে গিয়ে গোয়ালঘরের খোড়ো চালের লালচে জল সিরিঞ্জে ভরে এনে ঠেলে দিয়েছিল রুগির শরীরে। এ ঘটনা দেখে ভয় পেয়ে বাল-বিধবা বোন চেঁচামেচি শুরু করাতে মেঘু গাঁ ছেড়ে পালাল ক'দিনের জন্য। তার তখন ধর্মভয় নেই, লোকলজ্জাও না, কেবল ছিল জীবজন্তুর মতো মারধরের ভয়। ফেরার অবস্থায় সে ভারী মজা করেছিল। বর্ধমানের এক বিখ্যাত তান্ত্রিকের নাম করে বহেরুকে চিঠি দিল একদিন। চিঠির ওপর সিদুরের ছাপ, লাল কালি দিয়ে ত্রিশূল আঁকা। তাতে লেখা—ক্ষীরোগ্রাম শ্মশানেশ্বরী শ্রীশ্রী১০৮ কালীমাতার আদেশক্রমে লিখি, বৎস বহেরু, গোবিন্দপুরের শ্রীমান মেঘনাধ ভট্টাচার্য আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অতি অল্প দিনেই সর্বসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। অতঃপর সে মেঘুতান্ত্রিক নামে লোকপ্রসিদ্ধ হইবে। তাহার আধার অতি উচ্চ। ক্ষীরোগ্রাম শ্মশানে মায়ের স্বপ্নদেশক্রমে একটি মন্দির নির্মাণকল্পে সে অর্থ সংগ্রহে তোমার নিকট যাইতেছে। তাহাকে সাহায্য করিলে শ্মশানেশ্বরী মাতার সিদ্ধ বর লাভ করিবে। বিমুখ করিলে শ্রীশ্রীমাতার কোপে পড়িবে ইত্যাদি। হাতের লেখা মেঘু ডাক্তারের নিজেরই, চিনতে কারও অসুবিধে হয় না। চিঠির প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রক্তাম্বর রুদ্রাক্ষে সিঁদুর ত্রিশুলে সেজে মেঘুতান্ত্রিক এসে হাজির। লোকে হেসে বাঁচে না। বহু লোককেই ওরকম চিঠি দিয়েছিল মেঘুতান্ত্রিক। বাল-বিধবারা খর-ঋগড়ুটে হয়। মেঘুর বোন আরও এক ডিগ্রি বেশি। সে মেঘুর মালা রক্তাম্বর ছিঁড়েকুটে একশা করল। সেই থেকে মেঘুর মাথা বড় সাফ, সাহসীও বটে। গায়ে একরকম ঘা নিয়ে শেওড়াফুলি থেকে একজন লোক এসেছিল, বহু চিকিৎসায় সারেনি। মেঘু তার ডান হাত থেকে রক্ত সিরিঞ্জে টেনে নিয়ে বাঁ হাতে ভরে দিয়েছিল। লোকটা আশ্চর্যের বিষয়, ভাল হয়ে গিয়েছিল তাতে।

গোবিন্দপুরের যে কজন লোককে বহেরু পছন্দ করে তার মধ্যে মেঘু একজন। খামারবাড়িতে কারও অসুখ হলে মেঘুই এসেছে বরাবর। ব্রজগোপালের সঙ্গে তার ভাবসাব ছিল খুব। প্রায় বলত—ব্রজঠাকুর, দু-বেলা খাওয়ার পর চ্যাটকানো প্লেটে মধু খাবেন দু- চামচ। মধুটা ছড়িয়ে নেবেন, আস্তে ধীরে খাবেন। যত স্যালিভা মিশবে মধুর সঙ্গে, তত ভাল।

কথামতো খেয়ে দেখেছেন ব্রজগোপাল, উপকার হয়।

একদিন বলেছিল—ব্রজঠাকুর, একটা মুষ্টিযোগ দিয়ে রাখি। পাতিলেবুতে মেয়াদ বাড়ে। আর নিরামিষে।।

—মেয়াদটা কী বস্তু? ব্রজগোপাল জিজ্ঞেস করেছেন।

—দুনিয়ার গারদের মেয়াদ। লনজিভিটি।

পুদিনা, সুল্‌পো আর ধনেপাতা আমলকি দিয়ে বেটে খেলে আর অন্য ভিটামিন দরকার হয় না। ক্ষ্যাপাটে ডাক্তারটা এরকম হঠাৎ হঠাৎ বলত। অব্যর্থ সব কথা। কিছু কিছু ডায়েরিতে লিখে রেখেছেন ব্রজগোপাল। ইচ্ছে ছিল ডাক্তারের পুরো জীবনটাই লিখবেন। কিন্তু মোদো-মাতালের কাণ্ডে তা হয়ে ওঠেনি। পয়সাকড়ি ফুরলে ডাক্তারটা পাগলের মতো হন্যে হয়ে যেত। কুমোরপাড়ার হরিচরণ এক সময়ে তাড়ি বানাত। পুলিশের রগড়ানিতে ছেড়ে দিয়ে একখানা ওষুধের দোকান দিল। গাঁ-ঘরের দোকান, তাতে কবরেজি, হোমিওপ্যাথি, অ্যালোপাথি সবই কিছু কিছু জোগাড় করে রেখেছিল সে। মেঘু ডাক্তার একদিন মৌতাতের সময়ে বিছুটি-লাগা মানুষের মতো সেখানে হাজির। তাড়ির কারবার যে আর নেই তা খেয়ালই করল না। চারপাশটা ক্ষ্যাপা চোখে

দেখে নিয়ে 'শিশিতে তাড়ি বেচিস?' এই বলে তাক থেকে এলোপাতাড়ি গোটা দুই বোতল তুলে নিয়ে ঢাকাঢ়ক মেরে দিতে লাগল। হরিচরণ হাঁ-হাঁ করে এসে ধরতে না ধরতে আধবোতল অ্যালক্যালাইন মিকশ্চার সাফ। অন্য বোতলটা ছিল ফিনাইলের, সেটা হরিচরণ সময়মতো কেড়ে না নিলে মুশকিল ছিল। পয়সা না পেলে এমন সব কাণ্ড করত মেঘু।

এই মেঘু যখন রাজসাক্ষী হয় তখন ব্রজগোপাল বহেরুকে বলেছিলেন—ওকে হাতে রাখ।

হাতে রাখা সোজা। মেঘুকে মদের পয়সাটা দিয়ে গেলেই চমৎকার। ঝামেলা ঝঞ্ঝাট নেই। কিন্তু বহেরু কেমন একধারা চোখে ব্রজকর্তার দিকে চেয়ে বলেছিল—দেখি।

—দেখাদেখির কী? ব্রজগোপাল বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন—এ সময়টা আর তেসিয়ে নষ্ট করিস না। আগে থেকে টুইয়ে রাখ।

কিন্তু কেমন যেন গা করেনি বহেরু। আলগা দিয়ে বলল—মাতাল চাতাল মানুষ, হাত করলেও কী বলতে কী বলে ফেলবে!

কথাটা ঠিক, তবু বহেরুর হাবভাব খুব ভাল লাগেনি ব্রজগোপালের। সে ছেলের ব্যাপারে একটু গা-আলগা দিয়েছিল যেন। মেঘুকে হাত করার কোনও চেষ্টা করেনি। ব্রজগোপাল নিজেই গিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এসেছিলেন মেঘূকে। পাঁচটা টাকা দিয়েছিলেন, যদিও মেঘুকে টাকা দেওয়া মানে পরোক্ষে শুড়িখানার ব্যবসাকে মদত দেওয়া। স্বভাববিরুদ্ধ কাজটা তবু করেছিলেন ব্রজগোপাল।

মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই কোকা বেরিয়ে এসেছে। এতে বাপ হয়ে বহেরুর খুশি হওয়ার কথা। কিন্তু তার মুখেচোখে একটা নিরানন্দ ভাব। আর, তারচেয়েও বড় একটা ব্যাপার দেখতে পান ব্রজগোপাল। বহেরুকে জীবনে ভয় পেতে দেখেননি তিনি। এখন মনে হয় বহেরুর চোখে একটু ভয় যেন সাপের মাথার মতো উকি মারছে।

ভাবতে ভাবতে এপাশ থেকে ওপাশ হন তিনি। কাঁথাটা গায়ে জড়ান। তাঁতি লোকটা কী একটু কথা বলে ঘুমের মধ্যে হাসে। ব্রজগোপাল অন্ধকারে চেয়ে থাকেন। হারিকেনের পলতেয় একবিন্দু নীলচে হলুদ আলো জ্বলছে। ব্রজগোপাল চেয়ে থাকেন।

গতকাল মেঘু ডাক্তার মারা গেছে। কোকা খালাস হয়েছে মোটে কদিন। মেঘুটা আবার রাজসাক্ষী ছিল।

॥ চব্বিশ ॥

সেদিন ভাগচাষির কোর্ট থেকে ফেরার পথে মেঘু ডাক্তারের সঙ্গে দেখা। বেলদা-র বাজারে দাঁড়িয়ে মাতলামি করছে। লোকজন ঘিরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। বেঁটেখাটো কালোপানা বুড়ো মানুষ, ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল, গালে বিজবিজ সাদা দাড়ি, কষে ফেনা, দুচোখে জলের ধারা। হাপুস কাঁদে মেঘু ডাক্তার। মাতালের যা স্বভাব, কোথাও কিছু না, হঠাৎ একটা পুরনো অনাত্মীয় দুঃখকে খুঁচিয়ে তোলে। মেঘু কাঁদছে তার বালবিধবা বোনের কথা মনে করে—আমার জনমদুখিনী বোনটা, আহা-হা, আমার বিধবা বোনটার যে কী দুঃখ! আমি তার দাদা হাঁ আলবত তার মায়ের পেটের দাদা! বলে হঠাৎ কান্না ভুলে বড় বড় ঠিকরানো চোখে চারদিকে চেয়ে দেখে মেঘু ডাক্তার। পরমুহূর্তে ক্যাঁ করে কেঁদে ফেলে ভাঙা গলায় বলতে থাকে-মায়ের পেটের দাদা! মরার খবর হলে বোনাই কাছে ডেকে বলেছিল হাত ধরে—দাদাগো, ব্যবস্থা তো কিছু করে যেতে পারলাম না, ওর কী হবে! সেই বোনটা আমার বাসন মেজে খায়, আর আমি শালা মাতাল...শালা মাতাল...জুতো মার, জুতো মার আমাকে...বলতে বলতে মেঘু এর-ওর তার পায়ের দিকে দু-হাত বাড়িয়ে তেড়ে যায় জুতো ধরতে।

সাঁত সাঁত করে সবাই পা টেনে নিয়ে পালাতে থাকে। কেবল ধরা পড়ে যায় রেলের রাতকানা কুলি হরশঙ্কর। তার হাতে শিশিতে একটু কেরোসিন, দোকান থেকে ফিরছিল, মজা দেখতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তার একখানা ঠ্যাঙ সাপটে ধরেছে মেঘু, হাঁটু গেড়ে বসে মুখ তুলে বলে—দে শালা জুতো আমার মুখে। দে! দিবি না? পয়সা জুটলে হরশঙ্কর নিজেও টানে, তাই খুব সমবেদনার সঙ্গে কী যেন বোঝাতে থাকে ডাক্তারকে।

গোবিন্দপুরের যে কজনকে একটু-আধটু পছন্দ করে বহেরু, তার মধ্যে মেঘু ডাক্তার একজন। কাণ্ড দেখে দাঁড়িয়ে গেল। বলল—খেয়েই ডাক্তারটা যাবে।

ব্রজগোপাল বলেন—দেখবি না কি!

—ও আর দেখার কী! চলে চলুন।

ব্রজগোপাল একটু ইতস্তত করে বলেন—কোথায় পড়েফড়ে থাকবে! হিম লেগে না রোগ বাধায়।

বহেরু বলে—পেটে ও থাকলে আর ঠান্ডা লাগে না।

ব্রজগোপাল একটা শ্বাস ফেলেন। বলেন—গুণ ছিল রে!

বহেরু থমকে দাঁড়ায়। হঠাৎ কী মনে পড়তেই বলে—ডাক্তারটা বামুন হয়ে ছোটলোকের পা ধরছে!

ব্রজগোপাল তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেন—মাতালের আবার বামুন।

বহেরু সে কথায় কান না দিয়ে বলে—আপনি এগোন কর্তা, আমি দেখেই যাই।

ব্রজগোপাল হাসলেন। বহেরুর ওই এক দুর্বলতা। বামুন দেখলে সে অন্যরকম হয়ে যায়। ব্রজগোপাল মাথা নেড়ে বলেন—দ্যাখ! একটা রিকশায় তুলে দিস বরং।

লম্বা পায়ে এগিয়ে গিয়ে বহেরু হ্যাঁচকা টানে তুলে ফেলে ডাক্তারকে, বলে—চলো ডাক্তার।

মেঘু কিছু বুঝতে পারে না কেবল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বলে, মারছিস? মার। বলে মাথা নামিয়ে দাঁড়িয়ে অঝোরে কাঁদে। মুখের লালা, নাকের জল মিশিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ভাঙা গলায় বলে—মার আমাকে।

—তোমার ইজ্জত নেই। বামুন হয়ে দোসাদের পা চেপে ধরলে কোন আক্কেলে? চলো তোমাকে গোচোনা গেলাব আজ।

মেঘু সঙ্গে সঙ্গে কান্না ভুলে ফোঁস করে ওঠে—কেন শালা? আমাকে পেয়েছ কী? অ্যাঁ!

—ফের মাতলামি করবে না বলে দিচ্ছি। তোমাদের গাঁ হয়েছে এক নেশাখোরদের আচ্ছা।

—আমি মাতাল! ভারী অবাক হয় মেঘু—আমি! অ্যাঁ?

—তুমি আজ বিস্তর গিলেছ। এত খাও কী করে হে! এই বলে বহেরু তাকে টানতে টানতে বটতলার রিকশার আড্ডায় নিয়ে যেতে থাকে। মেঘু চেঁচাতে থাকে—শালা, গোরু দেখেছিস? দেখেছিস গোরু সারাদিন খালি খায় আর খায়? সকালে জাবনা, বিকেলে জাবনা, তার ওপর দিনমানভর ঘাস ছিঁড়ছে আর খাচ্ছে! রাতেও শালা উগরে তুলে চিবোয়। গোরুর কখনও পেট ভরে, দেখেছিস? আমি হলুম মদের গোরু...।

লোকজন খ্যাল খ্যাল করে হাসছে। ছোকরা একটা রিকশাঅলা ঘন্টি মারে। রিকশাটা এগিয়ে আসতেই মেঘু তেড়িয়া হয়ে দাঁড়ায় রিকশায় যাব কেন, আমি কি মাতাল শালা? বহু কাপ্তান দেখেছি শুঁড়ির গায়ের ঘাম চাটলে শালাদের নেশা হয়ে যায়। আমি কি তেমন মাতাল নাকি। আমি হচ্ছি মদের গোরু, সারাদিন খাইয়ে যা, পেট ভরবে না। মেঘনাদ ভটচাযকে কেউ কখনও মাতাল দেখেনি। হটাও রিকশা...

বলে মেঘু রুখে দাঁড়ায়। তারপর বহেরু কিছু টানাটানি করতেই সটান শুয়ে পড়ে ধুলোয়। সে অবস্থা থেকে তাকে তোলা বড় সহজ হয় না।

ব্রজগোপাল সেই শেষবার দেখেছিলেন মেঘু ডাক্তাবকে বাজারের বটতলায় ধুলোমুঠো ধরে পড়ে আছে। মাতাল মানুষ। ইদানীং বোধবুদ্ধি খুব কমে যাচ্ছিল। কেমন ভ্যাবাগঙ্গারামের মতো চোখের নজর, দুটো ঠোঁট সবসময়ে ক্যাবলার মতো ফাঁক হয়ে থাকত। চোখের নীচে গদির মতো মাংস উচু হয়ে থাকত। চোখে আলো নিবে গেছে। ভিতরে ভিতরে বাঁচার ইচ্ছেটাও মরে গিয়েছিল বোধ হয়।

পরশু বুঝি পয়সার টান পড়ে। গোটা চারেক টাকার জোগাড় ছিল। দুপুরের দিকে বালবিধবা বোন তিনটে টাকা কেড়ে নেয়। না নিয়েও উপায় ছিল না, দু-চারদিন কুত্থি-কলাই সেদ্ধ অথবা গমের খিচুড়ি খেয়ে বাচ্চাদের পেট ছেড়েছে। কিছু ভদ্রলোকী খাবার না জোটালেই নয়। মেঘু ডাক্তার বোনকে মুখোমুখি বড় ডরায়। টাকাটা হাপিস হয়ে গেল দেখে নাকি সুস্থ মাথায় সদর দরজায় দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি করেছিল—আমার মালের দাম ভেঙে গেল, একটা টাকায় শুড়ির মুখখানাও দেখা যায় না। এখন আমার শরীরটা যদি পড়ে যায় তো তোদের দেখবে কে শুনি?

দায়িত্বশীল গেরস্তের মতো কথাবার্তা। মালের দামটা ভেঙে গেছে বলে যে আবার টপ করে জোগাড় করে নেবে সে সাধ্য মেঘুর ছিল না। তার গুডউইল নষ্ট হয়ে গেছে। এখন মেঘু মাতাল, আর মেঘু ডাক্তার দুটো মানুষ। মাতাল মেঘুর জন্য ডাক্তার মেঘু নষ্ট হয়ে গেছে। মাতাল অবস্থায় কী করেছে না করেছে ভেবে মেঘু ইদানীং বড় বিনয়ী হয়ে গিয়েছিল। যখন-তখন লোকের পা ধরত। তাতে শ্রদ্ধা আরও কমে যায়। ধারকর্জ

দিয়ে দিয়ে লোকে হয়রান। দুপুর গড়িয়ে গেলেই ডাক্তারকে নিশি ডাকে। বাহ্যজ্ঞান থাকে না, পাপ-পুণ্য ভাল-মন্দর বোধ লুপ্ত হয়ে যায়। ধূর্তামিতে পায় তখন। সে সময়ে চেনা লোক তাকে দেখলেই গা-ঢাকা দেয়।

পরশু বিকেলে মেঘুকে যখন নিশিতে পেয়েছে, মালের দাম ভেঙে গিয়ে চূড়ান্ত দুঃখে মেঘুর চোখে জল, সে সময়ে গুটি গুটি একটি পাঁঠা নিজে হেঁটে এল হাঁড়িকাঠে গলা দিতে। সে একটু বোকাসোকা চাষি মানুষ, এক-আধবার মেঘর চিকিৎসা করিয়ে থাকবে। 'কল' দিতে এসেছিল। গোবিন্দপুর থেকে আরও মাইলখানেক উত্তরে তাদের গাঁয়ে। মেঘু তক্ষুনি রাজি। রুগি দেখার পর নাকি পয়সা না দিয়ে চাষি-বউ গুচ্ছের ধান, কলাই, দুটো বিচে-কলার মোচা, এসব দিয়েছিল। কিন্তু মেঘুর তখন হন্যে অবস্থা, ধান-কলাই-মোচা দেখে আরও মাথা খারাপ হয়ে গেল। চাষির ঘরে ঢুকে শিশিবোতল হাঁটকায়, ছিপি খুলে গন্ধ শোকে, আর বলে--তোর মাল খাস না? যা! মাল খাস না তো চাষবাস করার তাগদ পাস কীসে? মাল না খেলে শরীরে রক্ত হয় তোদের কী করে, অ্যাঁ! নগদা তিন চারটে টাকা থাকে না তোদের কাছে কেমন গেরস্তালী করিস তোরা! নাম ডোবালি।

ঠিক কী হয়েছিল তা বলা মুশকিল। তবে মেঘু ডাক্তার চলে আসার পর নাকি চাষা দেখতে পায় তার ঘরের একটা জিনিস খোয়া গেছে। তার বড় ছেলে বর্ধমানের কলেজে পড়ে, একটা সস্তার হাতঘড়ি শখ করে কিনেছিল। দেয়ালে পেরেকে ঝোলানো ছিল। নেই। মেঘু চারশো বিশ ছিল বটে, কিন্তু কখনও লোকের ঘরে ঢুকে কিছু সরায়নি এ যাবৎ। বেলদার সেই ঘড়ি দশ টাকায় বেচে কোকার এক স্যাঙাতের কাছে, তারপর তাদের সঙ্গে বসেই একনম্বর টেনেছে। কাল সকালে বহেরুর হেফাজতে। তারা কোকার স্যাঙাতদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। কোকার খোঁজেও এসেছিল। কিন্তু দলে ছিল না বলে ধরে নিয়ে যায়নি। পালান চোরাই ঘড়িটা কিনেছিল, সেটা বাড়িতে ফেলে রেখে বোকার মতো ফেরার হয়েছে। পুলিশ চোরাই ঘড়ির জন্য খুঁজছে, নাকি খুন সন্দেহ করছে, কিছু বলা যায় না। ঘড়িটড়ি সস্তা ব্যাপার নিয়ে তারা এত মাথা ঘামায় না। তবে কি খুন?

ব্রজগোপাল ভেবে পান না। মোদোমাতাল অপদার্থটাকে মেরে লাভটা কী? বহেরু তবু কাল বিকেলের দিকে ব্রজগোপালের কাছে এসে বলেছে—ডাক্তারটা রাজসাক্ষী ছিল বলে খুন হল না তো কর্তা!

ব্রজগোপাল অবাক হয়ে বলেন—খুন বুঝলি কীসে? এমনিতেই শরীরটা ঝাঁঝরা হয়ে ছিল, পট করে মরে যেত যে কোনও সময়ে।

বহেরু ধন্ধভাবে মাথা নেড়ে বলে—গ্যাঁজ উঠছিল যে মুখ দিয়ে।

ব্রজগোপাল বিরক্ত হয়ে বলেন—ওসব খেলে তো ওরকম হবেই।

বহেরু হেসে বলেছিল—পুলিশ কিছু একটা গন্ধ পেয়েছে। কেলো শুঁড়ির দোকানে কাল নাকি মেঘুকে পালান ওরা শাসিয়েছে—তুমি রাজসাক্ষী দিয়ে আমাদের ঘানি ঘুরিয়েছ, তোমার গর্দান যাবে।

ব্রজগোপালের তবু বিশ্বাস হয় না। শুঁড়িখানায় বসে কত মশামাছির মতো মানুষ রাজা-উজির মারে। তিনি বললেন—লাশ তো তুই দেখেছিস। কিছু টের পেলি?

বহেরু মাথা নেড়ে বলল—না, শরীর দেখে কিছু বোঝা যায় না। তবে ডাক্তারটা মদের নেশায় মাথার ঠিক রাখতে পারত না। কেউ যদি সে সময়ে পোকামারার বিষ এগিয়ে দেয় তো তাই ঢাকাকে ঢেলে দেবে গলায়। এই বলে একটা শ্বাস ফেলে বহেরু বলল—কোকাটার জন্য ভারী চিন্তা হয় কর্তা।

ব্রজগোপাল চিন্তিত হয়ে বললেন—চিন্তা করিস না। ও তো দলে ছিল না। মাঠেঘাটে লাশ পাওয়া গেলে পুলিশ একটু নড়াচড়া করে। কাটাকুটি করে দেখবে। ওসব কিছু না।

—তা পালান পালিয়েছে কেন? সেটাও তো দেখতে হবে!

—দূর বোকা। ও পালিয়েছে ভয়ে। ঘরপোড়া গোরু, একবার পুলিশ ছুঁলে আঠারো ঘা। তার ওপর চোরাই ঘড়িটা কিনেছে, ভয় থাকবে না?

বহেরু বুঝল। তবু একটু সন্দেহ প্রকাশ করে বলে—খুন যদি নাও হয়ে থাকে মেঘু, তবু কিন্তু মনে লয় কোকার স্যাঙাতরা সব খালাস হয়ে এসেছে, শাসাচ্ছে-টাসাচ্ছে দেখে ডাক্তারটা ভয় খেয়ে মরে গেল না তো। তেমন তেমন ভয়-ডরের বাতাস লাগলে মানুষ সিঁটিয়ে মরে যায়।

সেটাও ব্রজগোপালের বিশ্বাস হয় না। মেঘু বাস্তব জগৎ সম্পর্কে খুব খেয়াল করত না ইদানীং। এক-একটা বোধহীনতা মানুষকে পেয়ে বসে, যখন বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়ার তফাত করতে পারে না। বউ মরে যাওয়ার পর থেকে পরশু ইস্তক মেঘু ডাক্তারের আত্মবোধ ছিল বলে মনে হয় না। 'আমি আছি' এমনতর হুঁশ থাকলে তবে তো ভয়ডর? কেবল নেশায় বাধা দিত বলে বালবিধবা বোনটাকে সমঝে চলত। আর সুস্থ অবস্থায় মেঘু ডাক্তার ভয় খেত মাতাল মেঘুকে। কতবার মেঘু এসে ব্রজগোপালের পা চেপে ধরে বলেছে—দাদা, কাল সাঁঝের ঘোরে শীতলাতলায় আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, অবিহিত কিছু বলে ফেলেছি হয়তো, সম্মান রাখতে পারিনি। মাতাল-টাতাল মানুষ, ক্ষমা ঘেন্না করে নেবেন। মেঘুর তাই সমস্যা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, নিজের মধ্যে দুটো মানুষকে সামাল দেওয়া। একটার সঙ্গে অন্যটার দেখা হয় না। একটা জাগলে অন্যটা ঘুমোয়। একটা ঘুমোয় তো অন্যটা জাগে। কতদিন মেঘু তার বোনের পা চেপে ধরে চেঁচিয়েছে—বেঁধে রাখ, বেঁধে রাখ আমাকে গোশালে। ঢেঁকিতে লটকে রেখে দে। তখন অন্য মেঘুটা অশরীরী হয়ে এসে এই মেঘুটাকে ইশারা-ইঙ্গিত করত ভূতের মতো। ছাইগাদায় দাঁড়িয়ে, ঘের পাঁচিলের ওপর উঠে, মাদার গাছের ডালে বসে দাঁত কেলিয়ে হাসত মেদুর কাণ্ড দেখে। নিঃশব্দে মেঘুর কানে কানে বলত—দূর বাবু, রসের বানে দুনিয়া ভেসে যাচ্ছে, তুমি কেন গা শুকনো সন্নিসি হয়ি থাকবে? কোন কচুপোড়া হবে তাতে? এই দুনিয়া তোমার জন্য কোন সুখ-শান্তির বন্দোবস্ত রেখেছে শুনি! তাই যদি ভেবে থাকো তো থাকো বোনের পায়ে লটকে, কিন্তু কিছু হওয়ার নয়। দুনিয়া এখন তোমার কাছে বাওয়া ডিম বাবা, এ থেকে আর কিছু বেরোবে না। তখন মেঘু উঠে চোর-চোখে চারদিকে চাইত। বোন সে চাউনি চিনত। ঘরের বাসন-কোসন বা দামি জিনিস সব তালাচাবি বন্ধ, পয়সাকড়ি লুকনো। নিজেকে গালমন্দ করতে করতে মেঘু তখন খারাপ হওয়ার জন্য অন্য মেঘুর হাত ধরে বেরিয়ে পড়ত।

তাই ব্রজগোপাল ভাবেন মেঘুর কাছে দুনিয়ার ঘটনাবলির কোনও অর্থ ছিল না। দু-দুটো মেঘুর টানা-হ্যাঁচড়ায় সে তখন নিজের ঘায়ে কুকুর-পাগল। সে যে রাজসাক্ষী হয়েছিল, এ হুঁশই ছিল না।

তবু নানা চিন্তা এসে চেপে ধরে। পাপের এক হাওয়া-বাতাস এসে গেছে দুনিয়ায়। কিছু বিচিত্র নয়। কোকা সেই ছোকরাকে খুন করার পর যেমন বলেছিল—আজকাল তো সবাই মানুষ মারে, কারও কিছু হয় না। কোকা কেবলমাত্র সেই কারণেই ছোকরাকে মেরে দেখেছিল কেমন লাগে। এমন তুচ্ছ কৌতূহলে যদি মানুষ মারা যায় তা হলে বলতেই হয়, সবার ঘাড়ে ভূত চেপেছে।

আবার এও মনে হয় মেঘুটা এমনিতেই মরল। মরার সময় হয়েছিল, দুনিয়ার মেয়াদ শেষ হয়েছে। এখন শুদ্ধ-মুক্ত হয়ে বউয়ের পাশটিতে বসেছে কলজে ঠান্ডা করে, একটা বউয়ের জন্য যে একটা মানুষ এমন শোক-পাগল হতে পারে তা আর দেখেননি ব্রজগোপাল।

গভীর রাতে তিনি একটা শ্বাস ফেলে পাশ ফিরলেন। গায়ের কাঁথাটা সরে গেল। ঠান্ডা ঢুকছে। হারিকেনের একবিন্দু নীল আগুন স্থির হয়ে আছে। নীলের ওপর একটু হলদে চুড়ো। ঘরময় কেরোসিনের গন্ধ। তাঁতি লোকটা ঘুমের মধ্যে একবার বলল—ডাঁড়াও না...আ্ তারপর চুপ করে ঘুমোত থাকে। ঘড়িটা বন্ধ, সময়টা ঠিক বুঝতে পারেন না ব্রজগোপাল।

এমনি সময়ে গন্ধ বিশ্বেস হা-হা করে চেঁচিয়ে উঠল। আজও মুতের হাঁড়ি উলটে ফেলেছে। বহেরুর বড়জামাইয়ের গলার স্বর আসে। গলায় সুরের নামগন্ধ নেই, তবু একরকম একঘেয়ে পাঁচালির মতো আবেগে গাইতে থাকে—জাইগতে হবে, উইঠতে হবে, লাইগতে হবে কাজে...

তারপর হঠাৎ সমস্ত পৃথিবী চমকে উঠে চুপ করে যায়। দিগম্বরের খোলে প্রথম চাঁটিটি পড়ে গুম করে। তোপের আওয়াজের মতো ওই একটি ধ্বনিই সবাইকে জানিয়ে দেয়, শব্দে ভগবান আছেন। শব্দ নমস্য।

নিঃশব্দে ব্রজগোপাল ওঠেন। বাইরে এখনও নিশুত রাতের মতো অন্ধকার। কুয়াশায় আবছা হিম। বৃষ্টির মতো শিশিরে ভিজে আছে চারধার। তবু ভোরের অনেক আগেই এখানে দিন শুরু হয়। দিগম্বরের আনন্দিত খোল শব্দে মাতাল হয়ে লহরায় ভাসিয়ে নিচ্ছে জগৎসংসার।

হারিকেন হাতে, খড়মের শব্দ না করে ব্রজগোপাল পুকুরের ঘাটে পা দিয়ে একটু চমকে ওঠেন। পৈঠায় কে যেন বসে আছে, অন্ধকারে একা। এটা ব্রজগোপালের নিজস্ব ঘাট। ব্রাহ্মণের ঘাট কারও কোনও কাজ করার নিয়ম নেই। ব্রজগোপাল হারিকেনটা তুলে বললেন—কে?

॥ পঁচিশ ॥

গার্ড সাহেবের মতো লণ্ঠন উঁচুতে তুলে ধরে ব্রজগোপাল ঠাহর করে দেখলেন। খেজুর গাছ চেঁছে, খোঁটা পুঁতে মজবুত ঘাট তৈরি করে দিয়েছে বহেরু। সবাই বলে, বামুনকর্তার ঘাট, এ ঘাটে আর কেউ ধোয়া পাখলা করে না। অন্য মানুষ তাঁর ঘাটে বসে আছে দেখে ব্রজগোপাল অসন্তুষ্ট হন। আচার-বিচার সহবত সব কমে আসছে নাকি!

কুয়াশা আর লণ্ঠনের হলুদ আলোয় রহস্যের মাখামাখি। লোকটা মুখ ফিরিয়ে বলল—বামুনজ্যাঠা।।

ব্রজগোপালের চোখ আজকাল কমজোরি। লণ্ঠনের আলো থেকে চোখ আড়াল করে ঠাহর পেলেন, কোকা। তার কান মাথা ঢেকে একটা কমফর্টার জড়ানো, গায়ে চাদর। অলিসান চেহারা নিয়ে বসেছিল, ব্রজগোপালকে দেখে উঠে দাঁড়ায়। গালে একটা দাঁতনকাঠি গোঁজা।

ব্রজগোপাল একটু অবাক হয়ে বলেন—কী রে!

কোকা নিঃশব্দে একটু হাসল। বলল—রাতে একদম ঘুম হল না। তাই উঠে ঠান্ডায় একটু বসে আছি।

ব্রজগোপাল খড়ম ছেড়ে লণ্ঠন হাতে জলের কাছে নামলেন। জল হিম হয়ে আছে। চবাক করে বড় মাছ ঘাই দেয়। ব্রজগোপাল কানে গোঁজা দাঁতনটা ধুয়ে নিয়ে বলেন—কাঁচা বয়সে ঘুম আসবে না কেন? সারাদিন দত্যিপানা করে বেড়াস, ঢলে ঘুমনোর কথা।

—মাথাটা গরম লাগে।

—কেন রে?

মেঘুখুড়ো ঝাঁৎ করে মরে গেল, পুলিশ ডাক খোঁজ করতে লেগেছে। আবার না পেছুতে লাগে।

ছেলেটা যে খুব স্বাভাবিক নেই, তা ব্রজগোপাল বাতাস শুঁকে বুঝতে পারলেন। অসম্ভব নয় যে ছোকরা সারা রাত ঘরে ছিল না। বোধ হয় ভোর ভোর গুঁড়িখানা থেকে ফিরেছে। তবে একেবারে বেহেড নয়।

ব্রজগোপাল বললেন—বৃত্তান্তটা কী, কিছু খবর পেয়েছিস?

—কে জানে! তবে বাবা কাল রাতে ডেকে বলল, তুই পালিয়ে যা।

—বহেরু বলেছে? ব্রজগোপাল অবাক হন।

—হ্যাঁ। তাই ভাবছি, পালাব কোথায়।

—পালাবি কেন! পালালে আরও লোকের সন্দেহ বাড়ে।

—পালান পালিয়েছে, আরও সব গা ঢাকা দিয়ে আছে। আমার ওরকম ভাল লাগে না। এই তো অ্যাদ্দিন মেয়াদ খেটে এলাম। ঘরের ভাত পেটে পড়তে না পড়তেই আবার সবাই হুড়ো দিতে লেগেছে। বেড়াল কুকুর হয়ে গেলাম নাকি!

ব্রজগোপাল সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারেন না। তাঁর ছোট ছেলেটারও এই বয়স। এই বয়সে অভিজ্ঞতার বা বোধবুদ্ধির পাকা রং লাগে না। দাঁতনটার তিতকুটে স্বাদ মুখে ছড়িয়ে যেতে থাকে। একটু ভেবে ব্রজগোপাল বলেন—পুলিশের পাকা খাতায় নাম উঠিয়ে ফেললি। এখন তো একটু ভয়ে ভয়ে থাকতে হবেই।

কোকা একটু অভিমানভরে বলে—যা করেছি তার তো সাজা হয়েই গেল। লাথি গুঁতো কিছু কম দিয়েছে নাকি! আমার বড়সড় শরীলটা দেখে ওদের আরও যেন মারধরের রোখ চাপত। তার ওপর বেগার দিয়ে তো পাপের শোধ করেছি। কিন্তু তবু এখন এলাকায় কিছু ভালমন্দ হলেই যদি পুলিশ পেছুতে লাগে তো বড় ঝঞ্ঝাটের কথা!

ব্রজগোপাল মাথা নাড়লেন। বুঝেছেন। একটু তেতো হাসি হাসলেন, বললেন—পাপের। শোধ কি মেয়াদ খেটে হয়! কত চোর-জোচ্চোর-খুনে জেল খাটছে, তারা সব জেলখানায় থেকে ভাল হয়ে যাচ্ছে নাকি! লাথি গুঁতো দেয়, আটকে রাখে, আর ভাবে যে খুব সাজা হচ্ছে। মানুষ ওতে আরও ক্ষ্যাপাটে হয়ে যায়। কর্তারা সব সাজা দিয়ে খালাস, মানুষ শোধরানোর দায় নেবে কে? নিজেকে নিয়েই ভেবে দ্যাখ, জেলখানায় তোর কোনও শিক্ষা হয়েছে? শোধরানোর চেষ্টা করেছে তোকে?

মাথাটা নেড়ে গুম হয়ে থাকে কোকা। বোধ হয় জেলখানার স্মৃতি মনে আসে। মুখটায় একটু কঠিন ভাব ফোটে। বলে—তো আশ্চিত্তির হয় কীসে? তার কী করা লাগবে?

ব্রজগোপাল বলেন—প্রায়শ্চিত্ত হল চিত্তে গমন। অত শক্ত কথা তুই বুঝবি না।

কোকা ব্রজগোপালের দিকে চেয়ে দাঁতনটা অন্যমনস্কভাবে চিবোয়। তারপর হঠাৎ বলে—আমি সেই ছেলেটার গায়ে হাত না দিলেও কিন্তু পুলিশ ওকে পেলে মেরে দিত। কাজটা তো একই।

ব্রজগোপাল ম্লান হাসলেন। পুলিশ যে আইনসঙ্গত খুনি, এ সত্য কে না জানে বললেন- তোর সে সব কথায় দরকার কী? তুই নিজের কথা মনে রাখলেই হল। একটা পাতক করে ফেলেছিস, এখন হাত ধুয়ে ফ্যাল। আর কখনও ওসব দিকে মন দিস না। বেঁচে থাকাটা সকলেরই দরকার।

দিগম্বরের খোল তার বোল পালটেছে। বুড়ো হাতে খোলের চামড়ায় এক অলৌকিক ডেকে আনছে সে। ধ্বনি ওঠে, প্রতিধ্বনি হয়ে ফেরে, যতদূর যায় ততদূর বধির করে দেয় সব কিছুকে। কথার মাঝখানে ব্রজগোপাল উৎকর্ণ হয়ে শোনেন। তাঁর আজ্ঞাচক্রের জপ, তাঁর গোপন বীজধ্বনি যেন ওই শব্দের তালে তালে ধ্বনিত হয়।

কোকা বলে—বামুনজ্যাঠা।

অন্যমনস্ক ব্রজগোপাল একটা 'হুঁ' দেন কেবল।

—আপনাকে একটা কথা কয়ে রাখি।

—কী কথা!

—আমি যদি এখান থেকে না পালাই তো বাবা ফের আমাকে ধরিয়ে দেবে।

ব্রজগোপাল কথাটা বুঝতে পারলেন না। বললেন—কোথায় ধরিয়ে দেবে?

—পুলিশে।

কোকা মুখখানা এমনধারা করল যেন কাউকে ভ্যাঙাচ্ছে। বলল-বাবাই তো ধরিয়ে দিয়েছিল সেবার, যখন খুনটা হয়ে গেল হাত দিয়ে...বলে কোকা তার দুখানা অপরাধী হাত চাদরের তলা থেকে বের করে সামনে

বাড়িয়ে দেখাল।

—বহেরু ধরাবে কেন? তোর যত বিদ্‌ঘুটে কথা!

—তবে আর ক'লাম কী! খুনটা হয়ে যেতে মাথাটা গোলমাল হয়ে গেল। সে রাতে জ্বরও এসেছিল খুব। বিকারের অবস্থা। চারদিকের কিছু ঠাহর পাচ্ছিলাম না। যেন ভূতে ধরেছে। ভোর রাতে বাবা ঠেলে তুলে দিল, একটা কম্বল চাপা দিয়ে বলল—চল। তখন কিছু বুঝতে পারছিলাম না। ভাবলাম, বাবা লাঠেল লোক আছে, ঠিক বাঁচিয়ে দেবে। কেবল 'বাবা বাবা' করছি। বাবা যেমন ভগবান। বাবা আর বড় বোনাই সঙ্গে নিয়ে স্টেশনে গেল, গাড়িতে তুলে দেবে। স্টেশনঘর থেকে দূরে গাছতলায় বেঞ্চের ওপর বসিয়ে রেখে দিল, গাড়ির তখন দেরি আছে। বড়বোনাই আমার হাতখানা ধরে রেখে ঠাকুর দেবতার নাম করছে, বাবা গেল গাড়ির খোঁজখবর করতে কি টিকিট কাটতে কে জানে। স্টেশন একদম হা-হা শূন্য, জনমানুষ নেই। আমি কম্বলমুড়ি দিয়ে বসে ভয়ে ডরে আর জ্বরের ঘোরে কাঁপছি। সময়ের জ্ঞান ছিল না। কতক্ষণ পরে হঠাৎ আঁধার ফুঁড়ে দুটো পুলিশ এসে সামনে দাঁড়িয়ে গেল। বড়বোনাই তখন ভিরমি খায় আর কি! আমিও কোনও কথা মনে করতে পারি না। পুলিশ নাম জিজ্ঞেস করল, নিজের নামটা পর্যন্ত তখন মনে আনতে পারছি না।

—বহেরু কোথায় ছিল?

কোকা তাচ্ছিল্যের ঠোঁট উলটে বলে—কে জানে? কিন্তু পুলিশের একটু পরেই বাবা হাজির হয়ে গেল। কী কথাবার্তা বলল পুলিশের সঙ্গে কিছু বুঝতে পারলাম না। আমাকে ধরে নিয়ে গেল। পরে বড়বোনাই আমাকে ইশারায় বলেছে, পুলিশ বাবাই ডাকিয়েছিল। ওই রাতে স্টেশনে আমি কে, বা কী বৃত্তান্ত তা পুলিশ টের পায় কী করে? তখন অবশ্য কিছু টের পাইনি। পুলিশ যখন টেনে নিচ্ছে তখনও বাবাকে চেঁচিয়ে ডাকিয়ে ডাকাডাকি করছিলাম—ও বাবা, বাবা গো...

ব্রজগোপাল দাঁতনটা ফেলে দিলেন। বুকের মধ্যে একটা ভাব খামচে ধরে। চিরকালের একটা বাপের বাস বুকের মধ্যে। সেখানে একটা কাঁটা পট করে বিঁধে যায়।

মুখে ব্রজগোপাল বললেন—তখন কি আর তোর হুঁশ ছিল! জ্বরের ঘোরে, আর ভয়ে ডরে কী দেখতে কী দেখেছিস, ভুলভাল ভেবেছিস। কালীপদ কি আর মানুষের মতো মানুষ নাকি! আবোলতাবোল বুঝিয়েছে।

কোকার মুখে হাসি নেই। গম্ভীর মুখেই সে বলে-বাবা আমাকে দু-চোখে বিষ দেখে।

—দূর!

পাখিরা এ-ওকে ডাকে। ক্রমে বড় গোলমাল বাধিয়ে তোলে চারদিকে। পুবের আকাশে ফ্যাকাশে রং লাগে। চারদিকে মানুষের, পাখির, জন্তুজানোয়ারের জেগে ওঠার শব্দ হয়। আর তখন দিগম্বরের খোল মিহি শব্দের গুঁড়ো ছড়ায়।

ব্রজগোপাল জলের কাছে উবু হয়ে গাড়ু ভরতে থাকেন। জলভরার গুব গুব শব্দ হতে থাকে। পিছনে পৈঠায় কোকা দাঁড়িয়ে থাকে পাহাড়ের মতো নিশ্চল। কানে পৈতে জড়িয়ে ব্রজগোপাল ঘাট ছেড়ে উঠে আসেন। একবার তাকান কোকার দিকে।

কোকা হারিকেনটা তুলে কল ঘুরিয়ে নিবিয়ে দিয়ে বলে—আপনি মাঠের দিকে যান, আমি হারিকেন ঘরে রেখে আসছি।

ব্রজগোপাল বললেন—মনটাই মানুষের শত্রু। কাজকর্ম নিয়ে লেগে থাকবি মনটা বেশ থাকবে।

ব্রজগোপাল মাঠের দিকে হাঁটতে থাকেন। কোকা সঙ্গে সঙ্গে আসতে আসতে বলে—খুনখারাপি বাবাও কিছু কম করেনি। তবে আমাকে ভয় পায় কেন?

—ওসব তোর মাথাগরমের কথা।

কোকা একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ একটু হতাশার সুরে বলে—বামুনজ্যাঠা, আমাকে কিছু মন্ত্রতন্ত্র দেন।

—কেন?

—কিছু নিয়ে লেগে পড়ে থাকি। বলে কোকা হাসে।

তখন আবার হঠাৎ ভুরভুরে মদের গন্ধ আসে ওর শ্বাস থেকে। ছেলেটা স্বাভাবিক নেই। ব্রজগোপাল শ্বাস ফেলে বললেন—মনকে যা ত্রাণ করে তাই মন্ত্র। কিন্তু তোরা কি ত্রাণ পেতে চাস?

তাঁতিটা তাঁতঘরে বসে সারাদিন শানা মাকু নিয়ে খুটখাট করছে। সুতো ছিড়ে রাস করেছে। পেটের খোঁদলটা এখনও টোপো হয়ে ফুলে ওঠেনি বটে, তবে বহেরুর ভাতের গুণে শরীর সেরেছে একটু। দেঁতো মুখে একটু অপ্রতিভ হাসি। বহেরু তাঁতঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বাঘের মতো গুল্লু গুল্লু চোখে কাণ্ডটা চেয়ে দেখে। বাঘের মতোই হাঁক ছাড়ে মাঝে মাঝে—হচ্ছে তো তাঁতির পো?

তাঁতি তার দশ আঙুলে ছেড়া সুতো গোলা পাকাতে পাকাতে বলে—হয়ে যাবে।

দুশো সুতোর কাপড় শুনে সবাই হাসে। বহেরু হাল ছাড়ে না। লেগে থাকে। এখনও চন্দ্র-সূর্য ওঠে, সংসারের আনাচে-কানাচে ভগবান বাতাস ভর করে ঘুরে বেড়ান, মানুষ তাই এখনও পুরোটা পদার্থ ফেরেব্বাজ হয়ে যায়নি। লোকটা যদি দুশো সুতোর কাপড় বুনে দেখাতে পারে তবে বহেরুর এই বিশ্বাসটা পাকা হয়। তাঁতির এলেমে আর কেউ বিশ্বাস করে না, বহেরু করে। তাই সে মাঝে মাঝে বিড় বিড় করে বলে—পারবে, তাঁতিটা পারবে।

আজকাল প্রায় সারাদিনই বহেরু নানা কথা বিড় বিড় করে বকে। তে-ঠেঙে লম্বা সাঁওতালটা কদিন পড়ে পড়ে ধুঁকছে। অতখানি লম্বা বলেই তাকে আদর করে ঠাঁই দিয়েছিল বহেরু, দেখার মতো জিনিস। কিন্তু রুগ্ন-রোগা। লোকটা তার শরীরের ভার আর বইতে পারে না। লক্ষণ ভাল নয়। মেঘু ডাক্তার ওষুধপত্র দিয়েছিল, কাজ হয়নি। লোকটা ঘোরের মধ্যে পড়ে আছে, খেতে চায় না, ওঠে না, হাঁটে না। চিড়িয়াখানার ধার ঘেঁষে একখানা ঘর তুলে দিয়েছিল বহেরু। মস্ত লম্বা মাচান করে দিয়েছে। সেইখানে শুয়ে আছে লোকটা। দরজায় দাঁড়িয়ে বহেরু তাকে দেখে। বুঝতে পারে লোকটার কাল হয়ে এল। শরীরের লম্বা কাঠামোখানা কঙ্কালের মতো দেখাচ্ছে। চোয়াল আর খুলির হাড় চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে ক্রমে। এত বড় শরীরটা কোনও কাজে লাগাতে পারল না হতভাগা। প্রায় ভাগাড় থেকেই লোকটাকে টেনে এনেছিল সে। নলহাটি স্টেশনে বিনা টিকিটে গাড়িতে উঠে পড়েছিল। পেটে খাবার নেই, গাড়ির কামরায় পড়ে ধুঁকছিল। সেই অবস্থায় বর্ধমানে তাকে রেলের বাবুরা ঢেলে দিয়ে যায়। বহেরু সেখান থেকে নিয়ে আসে। তিন মাসও টিকল না।

বহেরু একটা শ্বাস ফেলে। কী একটু বিড় বিড় করে। তার চিড়িয়াখানার বাঁদরটা চুপ করে বসে ঠিক মনিষ্যির মতো পেট চুলকোয়। বহেরুকে দেখে একটা কুক ছেড়ে ঝাঁপ খেয়ে আসে। দরজাটা তার দিয়ে বাঁধা। বহেরু তার খুলে বাঁদরটাকে কাঁধে নেয়। মানুষজন আর জীবজন্তুর প্রতি ইদানীং একটা মায়া এসে যাচ্ছে। বাঁদরটা বহেরুর মাথা দু-হাতে ধরে কাঁধে ঠ্যাং ঝুলিয়ে শিশুর মতো বসে থাকে। মাঝে মাঝে নিজের থেকেই

কাঁধ বদল করে অন্য কাঁধে চলে যায়। ভারী একটা আদুরে ভাব। বহেরু বাঁদরটাকে খানিক আদর করে। গালে গাল ঘষে দেয়। একটা চিমসে গন্ধ হয়েছে গায়ে। বহেরু বাঁদরটার লোম উলটে পোকাটোকা খুঁজে দেখল গায়ে নেই। চোখ পিট পিট করে জানোয়ারটা আদর খায়। মুখখানা উল্লুকের মতো হলে কী হয়, কোথায় যেন একটু বাঁদুরে হাসি লুকিয়ে আছে ভ্যাংচানো মুখে। 'খচ্চর' বলে গাল দেয় বহেরু।

জাড়ের সময় প্রায় শেষ হয়ে এল। উত্তরে কাঁটাঝোপের জঙ্গলে একটিও পাতা নেই। গাছের কঙ্কাল কাঁটা আর ডালপালা মেলে সুভুঙ্গে হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এদিকটায় শ্মশান দেবে বলে ঠিক করে রেখেছে, তাই চাষ দেয়নি। সাপখোপ আর শেয়ালের আড্ডা হয়ে আছে। বহেরুগাঁয়ে এ পর্যন্ত মরেনি কেউ। তাই শ্মশানটা কাজে লাগেনি। কাকে দিয়ে বউনি হবে তা বহেরু ভেবে পায়নি। আজ একবার উদাস চোখে চেয়ে দেখল জঙ্গলটার দিকে। সাঁওতাল লোকটা আর কদিনের মধ্যেই যাবে।

সন্ধের মুখে পশ্চিম দিকের আকাশে এক পোঁচড়া সাদাটে কুয়াসা আলোটাকে ভণ্ডুল করে দিয়েছে। দুনিয়াটা কেমন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। শুকনো মাঠঘাট থেকে একটা ধুলোটে হাওয়া উঠে চারপাশের রং মেরে দিল। আর সেই ফ্যাকাশে আলোয় কাঁটাঝোপের মধ্যিখানে একটা মেয়েছেলেকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বহেরু। প্রথমে ভাবল কাঠকুটো কুড়োতে এসেছে কেউ। কত আসে! পরমুহূর্তেই বুঝতে পারে, মস্ত চুলের রাশি এলো করে দাঁড়িয়ে আছে কে এক এলোকেশী! পশ্চিম দিকে মুখ ফেরানো। কয়েক কদম এগিয়ে বহেরু ভারী চমকে যায়। মেয়েছেলেটা ল্যাংটা। বুক পর্যন্ত গাছপালায় আড়াল থাকায় এতক্ষণ ঠাহর হয়নি। অচেনা মানুষ নয়, তা হলে কুকুরগুলো খ্যাঁকাত।

—কোন শালি রে! বলে দাঁত কড়মড় করে বহেরু। বাঁদরটাকে নিঃশব্দে ছেড়ে দিয়ে গায়ের চাদরটা কোমরে পেঁচিয়ে নেয় সে। সত্তর বছরের ঋজু শরীরটায় রাগ যেন যৌবনকাল এনে দেয়। মড় মড়াৎ করে আগাছা ভেঙে বহেরু চোটেপটে এগোয়। একটা হাতের থাবা চুলের মুঠিটা ধরার জন্য উদ্যত হয়ে আছে।

সাড়া পেয়ে মেয়েটা হেলা ভরে ফিরে তাকায়। আর তৎক্ষণাৎ ভেড়া হয়ে যায় বহেরু। এ যে তার মেয়ে, নয়নতারা!

ঘোলাটে দুখানা চক্ষু। তাতে আঁজি আঁজি সোনালি আভা। কপালে মস্ত তেল-সিঁদুরের টিপ। মোটা দু-খানা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। মানুষখেকো পেতনির মতো খোনাসুরে বলল—খবর্দার, কাঁছে আসবি না। আমি বামুন জাঁনিস।

বহেরু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখে। ওপরে ঘোলা ময়লা একটা আকাশ, চারধারে কুয়াশার আস্তরণ পড়ে যাচ্ছে। আলো, রংমরা এক বিটকেল বেলা। কাঁটাঝোপের ফাঁকে আঁকাবাঁকা অন্ধকার। নয়নতারা ভিন-জগতের জিনপরির মতো দাঁড়িয়ে।

বহেরু জিজ্ঞেস করে—কে তুই? নয়নতারা?

—নয়নতারাকে খাঁব। আমি মেঘু ডাক্তার।

রাগে মাথাটা হঠাৎ বাজপড়া তালগাছের ডগার মতো জ্বলে ওঠে। দুই লাফ দিয়ে এগিয়ে যায় বহেরু—হারামজাদি, দুই চটকানে তোর ভূত যদি না ভাগাই তো...

—খবর্দার! বলে একটা বুকফাটা চিকার দেয় নয়নতারা। তারপর হঠাৎ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে। যম-নখের মতো কাঁটা ওঁত পেতে আছে চারধারে। কাঁটায় যেমন কাপড় ফেঁসে যায় ফ্যাঁস করে, তেমন ছিঁড়ে ফেঁসে যাচ্ছে

গায়ের চামড়া। বুক ছিঁড়ে হাপর হাপর শ্বাস। নয়নতারা তবু লঘু পায়ে দৌড়োয়, চেঁচিয়ে বলে—ধরবি তো মেয়েটাকে শেষ করে ফেলব!

বহেরু কাঁটাগাছ চেনে। তার গায়ে পিরান, কোমরে চাদর, পরেনে ধুতি। কাঁটায় কাঁটায় সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যেতে থাকে। কাঁটা খিমচে নিচ্ছে চামড়া, মাংস। বহেরু দৃকপাত করে না। দাঁতের ভিতর দিয়ে কেবল একটা রাগি সাপের শিসানীর শব্দ তুলে সে এগোয়।

মাঝখানে কয়েকটা বুড়ো খেজুর গাছ। তার চারপাশে একটু খোলা জমি। ভাঙা ইট, পাথর আর সাপের খোলস পড়ে আছে। একটা মজা ডোবা, তার গায়ে শেয়ালের গর্ত। মেঠো ছুঁচো কয়েকটা দৌড়ে গেল। জায়গাটা গহীন, বাইরের কিছু নজরে আসে না। নয়নতারা সেখানে পৌঁছে গেল প্রথমে।

বহেরু গাছগাছালি ভেঙে সেখানটায় পা দিতে না দিতেই নয়নতারা আধখানা ইট তুলে ছুঁড়ে মারে বহেরুর দিকে। চেঁচিয়ে বলে—তোঁকে নির্বংশ করব হারামজাদা।

ইট লাগে না। কিন্তু তেজে উড়ে বেরিয়ে যায়। নয়নতারার গায়ে আলাদা শক্তি ভর করেছে। বহেরু থমকে ঠাকুর-দেবতার নাম নেয়। তারপরই বেড়ালের মতো পায়ে কোলকুঁজো হয়ে, তীব্র চোখে চেয়ে এগোতে থাকে।

—গু খা, গু খা, গু খা, মড়া খা, মড়া খা...চিৎকার করতে থাকে নয়নতারা। দু-হাতে মাটি খামচে তুলে বুকে মাখে, থুথু ছিটায় চারদিকে—থু...থুঃ..থুঃ...

—হারামজাদি দণ্ডী কাটছে! এই বলে বহেরু একখানা ইট তুলে নেয়। বিশাল হাতে আস্ত ইটটা উঁচু করে লক্ষ্য স্থির করে।

॥ ছাব্বিশ ॥

নয়নতারা চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে আছে। শেষ বেলার রক্ত-আলো কুয়াশা আর মেঘ ছিঁড়ে তিরের মতো এসে বিঁধেছে ওর মুখে। দুটো পদ্মপাপড়ির মতো চোখ এখন ঝলসাচ্ছে টাঙ্গির ফলার মতো। ন্যাংটো, ভয়ংকরী চামুণ্ডা এলোচুল কালসাপের মতো ফণা তুলে আছে ওর পিছনে।

নয়নতারা রক্তমাখা থুথু ছিটোয়। বলে—থুঃ থুঃ...মর, মর সব মরে যা...

ইট ধরা ডানহাতখানা তুলে ধরে তাকিয়ে আছে বহেরু। মারবে! কিন্তু সে নিজেই টের পায়, তার ভিতরে আগুনটা সেঁতিয়ে গেছে। সামনে ওই ন্যাঙটা উদোম যুবতী, তার তেজি মেয়েটা ও যেন-বা বহেরুর কেউ নয়। দুনিয়ার মানুষের পাপ বেনো বর্ষার জলের মতো কুল ছাপিয়ে উঠেছে। এই কালসন্ধ্যায় বহেরুর মেয়ের শরীরে নেমে এসেছে কলকি-অবতার। নাকি মেঘু? ঠিক বুঝতে পারে না বহেরু। তবে তার শরীর কেটে ইঁদুরের মতো একটা ভয় ভিতরে ঢুকে গেছে ইদানীং। সেই ভয়ের ইঁদুরটা নড়াচড়া করে ভিতরে।

নয়নতারা মুঠো করে ধুলো তুলে চারদিকে ছিটিয়ে দিতে থাকে। বলে—থুঃ, থুঃ...সব অন্ধকার হয়ে যা, সব শ্মশান হয়ে যা...

অবাক ভাবটা আর নেই। তার বদলে শরীরে একটা থরথরানি উঠে আসে বহেরুর। শীতটা জোর লাগে। সে একবার তার বাঘা গলায় ডাক ছাড়ে—তারা! ভাল হবে না বলে দিচ্ছি!

শুনে খলখল করে হেসে ওঠে নয়নতারা, বলে—শ্মশান হয়ে যাবে, বুঝলি! সব বসে যাবে মাটির নীচে। রক্তবৃষ্টি হবে।

ফ্যাকাশে বেলাটা যাই-যাই করেও দাঁড়িয়ে আছে। চারধারে পাতাঝরা গাছের কঙ্কাল দুর্ভিক্ষের মানুষের মতো রোগা হাত-পা ছড়িয়ে ঘিরে আছে। রং নেই, সৌন্দর্য নেই। একটা দাঁড়কাক ডাকছে খা-খা করে।

বহেরু চোখের জল মুছে নিল। জীবনে তার চোখ বেয়ে জল নেমেছে বলে মনে পড়ে না। এই বোধ হয় প্রথম। পাথর থেকে জল বেরিয়ে এল। চারধারে বড় অলক্ষণ। বহেরু ধরা গলায় ডাকল—মা! মাগো!

নয়নতারা আকাশের দিকে দু-হাত তুলে কাকে যেন ডাকতে থাকে—আয়! আয়!

শরীর শিউরে ওঠে বহেরু। কোন পিশাচ, ভূতপ্রেত, কোন ভবিতব্যকে ডাকে মেয়েটা! নাকি মরণ ডাকছে প্রাণভরে!

বহেরু আর ভাবল না। ইটটা তুলল ফের। তার প্রকাণ্ড হাত, হাতে অসুরের জোর। দু-পা এগিয়ে 'মা' বলে একটা হাঁফ ছেড়ে ইট-টা সই করে দিল সে।

লাগল বাঁ-ধারে স্তনের ওপরে। পাখি যেমন জোরালো গুডুল খেয়ে গুডুলের গতির সঙ্গে ছিটকে যায়, তেমনি নয়নতারাকে নিয়ে ইটটা ছিটকে গেল। ব্যথা-বেদনার কোনও চিৎকার দিল না নয়নতারা। কেবল মাটিতে পড়ে খিঁচুতে থাকে। তার হাত পায়ের ঘষটানিতে ধুলো ওড়ে!

একটু দূরে দাঁড়িয়ে হতবাক হয়ে বহেরু দৃশ্যটা দেখতে থাকে। ফাঁকা জায়গা দিয়ে একটা হলদে শেয়াল দৌড়ে গেল চোর-পায়ে। পিছনের শিমুল গাছে একটা বড় পাখি নামল ঝুপ করে। কিছুক্ষণ নড়েচড়ে নয়নতারা স্থির হয়ে পড়ে থাকে। চারধারে বেঁটে বেঁটে আগাছা, ন্যাড়া জমি।

এইখানে শান্তিরামের ভিটে ছিল একসময়। বংশটা মরে হেজে গেছে। জমিটার দক্ষিণ অংশটা বহুকাল দখল করে আছে বহেরু। বাকিটা পড়ে আছে, দাবিদার নেই। সন্ধ্যা ঘুলিয়ে উঠছে চারধারে। প্রেতছায়া ঘনিয়ে আসে। কঙ্কালসার গাছের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে শেয়ালের চোখ। মগডাল থেকে নজর দিচ্ছে বড় কালো পাখি। শান্তিরামের পোড়ো ভিটেয় অশরীরীরা হাওয়া বাতাসে ফিসফাস করে।

বহেরু নয়নতারার ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখে, মেয়েটা গলাটানা দিয়ে পড়ে আছে। গোরুর ঝিমুনিরোগ হলে এরকম পড়ে থাকে। শিবনেত্র, মুখে গ্যাঁজলা। শ্বাস বইছে, তবে কাঁপা-কাঁপা দীর্ঘশ্বাসের মতো, ফোঁপানির মতো, হিক্কার মতো। ডানকাত হয়ে আছে। বহেরু তাকে আস্তে উলটে চিৎ করে শেয়াল। নিজের যুবতী মেয়ের নগ্ন শরীরটা এতক্ষণ মানুষের মতো চেয়ে দেখেনি বহেরু। রাগে অন্ধ হয়েছিল। এইবার দৃশ্যটা দেখে লজ্জায় চোখ বুজে জিভ কাটল। কোমর থেকে চাদরটা খুলে ঢাকা দিল শরীর। কপাল থেকে চুল সরিয়ে দিল যত্নে। আগেই মেয়েটা পড়ে গিয়েছিল কোথাও, ঠোঁটটা কেটে ফুলে আছে। রক্ত গড়াচ্ছে। চোখের জল মুছে, মুখের লালা জড়ানো ঠোঁটে একবার অস্ফুট ডাকল—মা! মাগো!

তারপর পাঁজাকোলে শরীরটা তুলে নিল সে।

চারধারে বড় অলক্ষণ দেখা যাচ্ছে আজকাল। কলির শেষ হয়ে এল নাকি!

পরের দিন। মেঘুর মড়া পুলিশ ছেড়ে দিয়েছে। তার শরীরে বিষক্রিয়া পাওয়া যায়নি, চোট একটু-আধটু যা ছিল তা আলের ওপর থেকে পড়ে গিয়েও হতে পারে। অতিরিক্ত কড়া মদেই কমজোরি কলজেটা গেছে। পেটে বিদঘুটে আলসার ছিল। হার্টের রোগ ছিল, কিডনি ভাল ছিল না। সব মিলেজুলে গ্রহদোষে খণ্ডে গেছে। শুদ্ধ মুক্ত মেঘু কি এখন অন্তরীক্ষে তার বউয়ের পাশটিতে গিয়ে বসেছে! কলজেটা কি এবার ঠান্ডা হয়েছে তার? বউ মরার শোকেই না অমন পাগল হয়েছিল মেঘু! মরার পর ক্ষ্যাপা লোকটার সব শান্তি হয়েছে কি!

ব্রজগোপাল মেঘুর উঠোনের মধ্যেখানে দাঁড়িয়ে এসব ভাবেন। পাশে কালীপদ উবু হয়ে বসে হাতের পাতার আড়াল দিয়ে বিড়ি টানছে। গাঁয়ের ছেলেরা গেছে মেঘুর মড়া আনতে। যখন-তখন এসে পড়বে।

বারান্দায় ঠেসান দিয়ে মেঘুর বাল-বিধবা বোনটা বসে আছে। মৃত্যু সংবাদ পেয়ে পাড়া-প্রতিবেশীরা কিছু এসেছিল। আজ মড়া আসবে শুনে দু-চারজন এসেছে। একটা কুপি জ্বলছে দাউ দাউ করে, তার আগুনে দু-একজন ভূতুড়ে চেহারার সাদাটে বিধবাকে দেখা যায়। ছেলেপুলেরা কেউ তেমন কচিটি নয় মেঘুর, সবচেয়ে ছোট ছেলেটার বয়সই হবে সাত-আট বছর। বড় জনের বছর বারো বয়স। গোবিন্দপুরের হাটে তাকে বখে-যাওয়া ছেলেদের সঙ্গে বিড়ি খেতে ব্রজগোপাল নিজের চোখে দেখেছেন। কাপড় জড়িয়ে সেই ছেলেদুটো এখন শীতে ঠকঠকিয়ে কাঁপছে ছাঁচতলায় দাঁড়িয়ে। দুটি মেয়ে মেঘুর। অভাব দুঃখ কষ্টের মধ্যেও তাদের বাড় বিস্ময়কর। আট-দশ বছরের মধ্যেই দু-জনের বয়স হবে। মাথায় বেশ লম্বা, শরীরও কিছু খারাপ না। ঘরের মধ্যে মাদুরে শুয়ে দু-জন কাঁদছিল। একবার উঠে এসে উঠোনের দরজা দিয়ে রাস্তার দিকে দেখে আসছে।

সবচেয়ে বেশি শোকটা লেগেছে বাল-বিধবা বোনটারই। ছেলেমেয়েগুলোর বয়স কম, এ বয়সের শোক গভীর হয় না, জলের দাগের মতো, বিস্মৃতির ভাপ এসে মুছে দেয়। কিন্তু বোনটার আলো নিবে গেছে। পৃথিবীটা এখন বিশাল, দিকহারা, অনিশ্চয়। কদিন এত কেঁদেছে যে আর কাঁদার মতো দম নেই। চুপ করে বসে আছে। ব্রজগোপাল কুড়িটা টাকা দিয়েছিলেন হাতে। দুটো দশ টাকার নোট এখনও দুমড়ে পড়ে আছে পাশে। আঁচলে বাঁধার কথাও খেয়াল হয়নি।

একজন বিধবা দাওয়ায় একটা ছোট্ট মাদুরের আসন পেতে কাছে এসে বলল- ঠাকুরমশাই, আপনি বসুন গিয়ে।

ব্রজগোপাল মাথা নাড়লেন। বসবেন না।

বিধবাটি বলে—কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন! ওদের আসতে দেরি আছে।

শোকের বাড়িতে একটা অদ্ভুত হবিষ্যির ঘি ঘি গন্ধ ছড়িয়ে থাকে। এটা বহুবার লক্ষ করেছেন ব্রজগোপাল। আর বাতাসে একটা মৃদু সূক্ষ্ম জীবাণু সংক্রমণের মতো অশুচিতার স্পর্শ।

মেঘুর ছেলেরা পিসির পাশে গিয়ে বসল খানিক। বড়জনকে ব্রজগোপাল বলতে শুনলেন—ও পিসি, শ্মশানে আমাকে দিয়ে কী করবে? বাবার মুখে আমি আগুন দিতে পারব না।

পিসি উত্তর দেয় না। মেয়ে দুজন হুড়মুড় করে উঠে আসে বাইরে। অস্ফুট রামনাম করে। শ্মশান আর বাবার কথা শুনে ভয় পেয়েছে। বেঁচে থাকতে মানুষ আপন, মরে গেলেই ভূতকে ভয়।

ব্রজগোপাল জরিপ করে দেখেন। মেঘু এই ছেলেপুলে, বিধবা বোন, দুটো তক্তপোষ, ভাঙা বাড়ি, গোটা দুই অকেজো আলমারি এইসবই রেখে গেছে। এই দুর্দিনে মেঘু ডঙ্কা মেরে চলে গেল। গেছে খারাপ না। ভোগেনি, কাউকে ভোগায়নি। পড়েছে, আর মরেছে। কিন্তু এ দৃশ্যটা মেঘু যদি দেখত! দাউ দাউ কুপির আগুন আবছায়া তার রক্তের সন্তান, তার শোকাতাপা বোনটা কেমন শীতবাতাসে, সামনের দীর্ঘ অভাবগ্রস্ত ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে ভয়ে-ভাবনায় মোয়া বেঁধে বসে আছে মানুষের পিণ্ডের মতো! মেঘুটার আক্কেল ছিল না। এতকটা প্রাণীকে সে কখনও গ্রাহ্য করেনি। ভালবাসার বউ মরে গিয়ে ভগবান ভবিতব্য সব কিছুর ওপর ক্ষেপে গিয়ে একটা পরিবার লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেল।

অবশ্য মানুষ তার সন্তান-সন্ততির জন্য কীই বা রেখে যেতে পারে! ব্রজগোপাল তাঁর মামাবাড়ির কথা মনে করেন। দাদামশাই তাঁর এগারোটি সন্তানের জন্য যথেষ্ট রেখে গিয়েছিলেন। ঢাকা শহরে বাড়ি, বঙ্গলক্ষ্মীর শেয়ার, আটাচাক্কি, বগুড়ার লোনব্যাঙ্কে টাকা, নগদ আর সোনাদানায় আরও লাখ দেড় দুই; সে আমলের টাকার দামে এখনকার আরও বেশি। বড় দুই মামা কয়েক বছরের মধ্যেই পুরো সম্পত্তিটা ফুঁকে দিল। বাপ মরার পর তাদের বড়লোকি চালচলন বেড়ে গিয়েছিল হাজার গুণ। মেজোজন রেলের চাকরি ছেড়ে বাপের টাকায় ব্যাবসা দিল। ব্যাবসার বারফাট্টাই ছিল খুব, পিছনে না ছিল নিষ্ঠা, না পরিশ্রম অন্য মামা মাসিরা তখন নাবালক! বড় হয়ে তারা দেখে, চারদিকে দুঃখের সংসার। সেই যে ভাইয়ে ভাইয়ে বখেরা লেগে গেল তা শেষজীবনতক মেটেনি।

ব্রজগোপাল ভাবেন, মানুষ কী রেখে যেতে পারে সন্তানের জন্য? এমনকী আছে যা নষ্ট পায় না, ঠকবাজে ঠকিয়ে নিতে পারে না, যা স্থায়ী হয় এবং বর্মের মতো ঘিরে রক্ষা করে মানুষের সন্তানকে?

কালীপদ লুকিয়ে বিড়ি খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়ায়। একটু কেশে বলে—ঠাকুরমশাই, এখন মেলা করবেন নাকি?

ব্রজগোপাল চিন্তিত মুখে বলেন—দেরি যখন হচ্ছে তখন আর কতক্ষণ দাঁড়াব! চল।

এই বলে টর্চটা একটু জ্বালেন ব্রজগোপাল। অন্ধকারের মধ্যে চারপাশটা একটু দেখে নেন। পৃথিবীটা ঘোর অন্ধকার হয়ে আসছে ক্রমে। ছেলেপুলের কথা বড্ড মনে পড়ে। ছোট মেয়েটা বহুকাল দেখেন না। মেয়েটা বড় বাপভক্ত ছিল।

এ সব কথা মনে হলে পৃথিবীটা অন্ধকার লাগে। টর্চবাতিটা জ্বেলে অন্ধকারটা তাড়ানোর চেষ্টা করেন ব্রজগোপাল। কেশে নিয়ে কমফর্টারটা খুলে আবার গলায় জড়িয়ে নেন। মেঘুর বোন উঠে আসে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে মুখটা ঘোমটায় আড়াল করে কী যেন বলে। ওর গলা ভেঙে বসে গেছে, আওয়াজ হচ্ছে না। ব্রজগোপাল দু-পা এগিয়ে বলেন—কিছু বলছ মা?

মেঘুর বোন মাথা নেড়ে কষ্টে স্বর বের করে বলে—দাদা বড় পাপী ছিল। আপনাকে কেবল দেবতার মতো দেখত। শ্রাদ্ধটা আপনি করবেন।

—শ্রাদ্ধ! ব্রজগোপাল অবাক হন। ইতস্তত করে বলেন, ওসব তো আমি করিই না মা।। আচ্ছা, দেখব। শরীর গতিক যদি ভাল বুঝি তো...

—দাদার খুব ইচ্ছে ছিল কোনও সৎ ব্রাহ্মণ যাতে শ্রাদ্ধ করে। বউদি সতীলক্ষ্মী ছিল। তার কাছে পৌছুতে হলে পুণ্যি লাগে। দাদা বড় পাপী ছিল।

পাপী ছিল। ছিল বই কী। ঠাকুরের একটা কথা আছে, রক্ষা থেকে যা পাতিত করে তাই পাপ। জীবনধর্মের বিরুদ্ধে চলা যদি পাপ হয় তো মেঘু পাপী নিশ্চয়ই। সঠিক ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকাটা ধর্ম বলো ধর্ম, পুণ্য বলো পুণ্য। ব্রজগোপাল এই শোকের বাড়িতে দাঁড়িয়েও মনে মনে হাসেন। সৎ বিপ্রের হাতে কি চাবিকাঠি আছে যে এ-পাড় থেকে কল টিপে ওপাড়ের আত্মাদের একের সঙ্গে অন্যকে মিলিয়ে দেবে? একটু দীর্ঘশ্বাসও ফেলেন ব্রজগোপাল। মেঘুটা তার বউকে সত্যি ভালবাসত। সবাই চায়, মরার পর মেঘু তার বউয়ের সঙ্গে মিলেজুলে থাক।

ব্রজগোপাল আর কালীপদ গোবিন্দপুর ছেড়ে বরাবর খামারবাড়ির দিকে হাঁটা দেওয়ার পর মাঝ রাস্তায় হরিধ্বনি কানে আসে। উলটোদিক থেকে হারিকেন আসছে। সামনে মাচানের ওপর মেঘুর শরীরটা। ব্রজগোপাল রাস্তা ছেড়ে দাঁড়ান। চোখের সামনে দিয়ে ভাসতে ভাসতে মেঘু চলে যায়। কালীপদ জোড়হাত কপালে ঠেকায়। হারিকেন কোকার হাতে। সে একটু পিছিয়ে দাঁড়িয়ে লণ্ঠন তুলে বলে—বামুনজ্যাঠা!

—হুঁ।

—আমি শ্মশানে যাচ্ছি।

—যা।

ভক করে মদের গন্ধ ভেসে আসে। ব্রজগোপাল উদ্বিগ্ন বোধ করেন।

আবার হাঁটতে হাঁটতে কালীপদ পিছন থেকে হঠাৎ বলে, ঠাকুরমশাই, মেঘু ডাক্তারের গতিমুক্তি হল না তা হলে?

—কেন?

—এই যে নয়নতারার ওপর ভর করল! গাঁ গঞ্জে সবাই বলাবলি করছে।

ব্রজগোপাল বিরক্ত হন। উত্তর দেন না। কালীপদটা কিছু বোকা। বোকা না হলে কেউ ঘরজামাই থাকে। জামাই হয়েও বহেরুর বন্ধু লোক, একসঙ্গে বসে গাঁজাটাজা খায়। এখানেই গেঁথে গেছে।

কালীপদ আবার বলে—চুরির দায়টা ঘাড়ে নিয়ে গেল, তার ওপর অপঘাত!

ব্রজগোপাল একটা গম্ভীর 'হুঁ' দিয়ে হাঁটতে থাকেন।

কালীপদ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকে। তারপর হঠাৎ গুণ গুণ করে গান ধরে—কে হে বট, বাঁশের দোলাতে চইড়ে যাইচ্ছ চইলে শ্মশান ঘাটে! তোমার পোটলাপাটলি রইল পইড়ে, জুড়ি গাড়ি কে হাঁকাবে...

তুলসী গঙ্গাজলের ছিটে গায়ে দিয়ে ব্রজগোপাল ঘরে এসে ল্যাম্পটা জ্বালেন। জামাকাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়বেন। রাতে খই আর দুধ খান, আজ সেটাও খেতে ইচ্ছে করছে না। বাচ্চাকাচ্চা কাউকে ডেকে দুধটা দিয়ে দেবেন বলে উঠতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় আঁধার ফুড়ে বহেরু এসে দরজায় দাঁড়াল। উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা। বলল—কর্তা!

—কী রে?

বহেরু মেঝের ওপর বসে মুখ তুলে বলে—কলিকালের কি শেষ হয়ে আসছে?

ব্রজগোপাল বহেরুর দিকে চিন্তিতভাবে চেয়ে থাকেন।

বহেরু বলে—যদি রক্তবৃষ্টি হয়! যদি পৃথিবী ডেবে যায় মাটির ভিতরে!

॥ সাতাশ ॥

অবশেষে একদিন দুপুরে কড়া নড়ে উঠল।

বীণা ভিতরের ঘরে এ সময়টায় দরজা বন্ধ করে ঘুমোয়। ননীবালা খুটুর-খাটুর করে কাজকর্ম করেন। একটু শুয়ে চোখ বুজবেন তার উপায় নেই, ঝিম হয়ে পড়ে থাকলেই নানা অঘটনের চিন্তা আসে মাথায়। ঘুম যদি আসে তো সেই সঙ্গে দুঃস্বপ্ন দেখা দেয়।

কদিন হল শরীরটা ভাল না। মাঝে মাঝে মাথাটা পাক দেয়। প্রেসারটা বেড়েছে বোধ হয়। পাড়ার চেনা ডাক্তারের কাছে সময়মতো গেলেই প্রেসার দেখে দেয়। আলিস্যিতে যাওয়া হয় না, এ বয়সে ভালমন্দ যদি কিছু হয়ে যায় তো হোক। তাতে তাঁর আক্ষেপ নেই। বেঁচে থাকা একরকমের শেষ হয়েছে। দেখতে না দেখতেই একটা জীবন কেমন শেষ হয়ে গেল। তেমন করে কিছু বুঝতেই পারলেন না ননীবালা। এই তো সেদিনও শিশুটি ছিলেন, বগুড়ায় রেলস্টেশনের ধারে তাঁদের পাড়ার রাস্তায় ঘাটে খেলে বেড়িয়েছেন, ধারে-কাছের কথা তেমন মনে পড়ে না, কিন্তু শিশু বয়সের কথা মনে পড়ে ঠিকই। স্পষ্ট, যেন বায়স্কোপের ছবি। বিন্দি, কাতু, শৈলী—সব মিলেমিশে সে এক পরির রাজ্য। বৃষ্টি পড়ত, শীতের কুয়াশা ঘিরে থাকত, রোদ উঠত—সবই কেমন অদ্ভুত গন্ধমাখা, নতুন বুক-কেমন-করা। সে আমলে মেয়েদের লেখাপড়ার চাপ ছিল না। কেবল সারাদিন শিশু ভাই বা বোন টানতে হত। সে তেমন খারাপ লাগত না। নাজিরের বারান্দায় থুবা করে বসিয়ে রেখে চুলে আলগা হাতে বড় খোঁপা বেঁধে এক্কা-দোক্কার কোর্টে ঝাঁপিয়ে পড়া তারপর কিছু মনে থাকত না। ঘামে ভিজে যেত অঙ্গ, গায়ে ধুলোবালি লাগত, নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠত দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসে, তবু খেলার কী যে নেশা ছিল! একদিন দেড়-বছরের বোকা ভাইটা বারান্দা থেকে গড়িয়ে পড়ে কপাল ফাটাল, মা মেরেছিল খুব চিরুনি দিয়ে। এখনও যেন কনুইয়ের হাড়ে ব্যথাটা চিনচিন করে। মনে হয়, এই তো সেদিনের কথা সব। শৈলী নাকি বুড়ো হয়ে গেছে! হায়রে! কতটুকু ছিল শৈলী। ঢলঢলে চেহারা, ফরসা ঠোঁটদুটো একটু বোকাটে ভাবে ফাঁক হয়ে থাকত সব সময়ে, সামনের দাঁতে একটা ফাঁক ছিল মাঝখানটিতে। সাহেবি সব নাম ছিল ওদের। চার বোন ছিল মাইথলী, মেয়রা, পিকলি আর বিউটি, দুই ভাই ছিল শচীন আর বুয়া। শৈলীর ইস্কুলের নাম ছিল বিউটি। বিলিতি ফ্রক পরত, বিলিতি সাবান মাখত, বিলিতি বিস্কুট খেত, ওদের বাড়িতে আসত সব সাহেব মেম। জজের বাড়ি, না হবেই বা কেন! যে কোনও মেয়ের সঙ্গে শৈলীরা মিশত না। কেবল ননীবালার চুল দেখে ইস্কুলে সেধে ভাব করেছিল শৈলী। সেই ভাব থেকে সই। এসব কি গতজন্মের কথা! নৌকোর মতো দেখতে ঝকঝকে পালিশওয়ালা একটা ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে শৈলী আর পিকলি তাঁদের বাড়িতে এসে কতবার একটা বেলাই কাটিয়ে গেছে হয়তো। আবার ননীবালাও গেছেন। ভারী চপচাপ বাড়িটা ছিল ওদের, সে বাড়িতে কুকুর পর্যন্ত গম্ভীর। জজ নাকি হাসে না। তা হবে। শৈলীর বাবাকে কখনও হাসতে দেখেননি ননীবালা। কিন্তু সেই জজসাহেবও একবার ননীবালার খোলা চুল দেখে বলেছিলেন—বাঃ, এ তো

অরণ্য! মনে আছে। সব স্পষ্ট মনে আছে, গলার স্বরটা পর্যন্ত কানে বাজে এখনও। সেই স্বপ্নের ছেলেবেলা থেকে এক হ্যাঁচকা টানে কোনও অচেনা, অকূল পাথারে রওনা হলেন একদিন। তখনও তাঁর শরীরটুকু ঘিরে শিশুরই গন্ধ, ভাল করে ভাবতে শেখেননি, বুঝতে শেখেননি। খুলনা থেকে বর এল, টোপর পরে। সে কি ভয়াবহ হুলুধ্বনি, শঙ্খনাদ! বুকের ভিতরে ভূমিকম্প, ভেঙে পড়ছে পুতুলের ঘর, ফাটল ধরে গেল এক্কা-দোক্কার কোর্টে, ছিঁড়ে গেল জন্মাবধি মা-বাপের ভাই-বোনের শক্ত বাঁধন। যেন রশি ছিঁড়ে স্টিমার পড়ল দরিয়ায়। অচেনা একদল লোক লুটেরার মতো ঘিরে নিয়ে চলল তাঁকে, আঁচল বাঁধা একটা অচেনা লোকের আঁচলে, কত কান্নাই কেঁদেছিলেন ননীবালা! সে কান্না যেন ফুরোবার নয়। হিক্কার মতো উঠতে লাগল অবশেষে। ব্রজগোপাল চোরের মতো অপরাধী চোখে চেয়ে দেখছিলেন তাঁকে গোপনে। অবশেষে ননীবালা ভারী অবাক হয়ে দেখেছিলেন, তাঁর অচেনা স্বামীটি উড়নির প্রান্ত দিয়ে লুকিয়ে চোখের জল মুছছে। সেই দেখে খানিকটা ধাতস্থ হয়েছিলেন। ননীবালা, যা হোক একেবারে পাষণ্ডের হাতে পড়েননি। মনটা নরম-সরম আছে। ফুলশয্যার রাতে কথাটা উঠতে ব্রজগোপাল প্রথমে স্বীকার করেননি, পরে অনেক ঝুলোঝুলি করলে লাজুক মুখে বলেছিলেন—কী জানো, কান্না দেখলে আমার কান্না পায়। কথাটা ঠিক নয়। ননীবালা জানেন, ব্রজগোপাল কান্না দেখে কাঁদেননি। ননীবালার জন্যই কেঁদেছিলেন। এসব কি বহুদিনের কথা!

আজকাল বড় ভুল হয়ে যায়। নাতি-নাতনির নাম ঠিকঠাক মনে থাকে না। সোমেনকে শতবার রণো বলে ডাকেন, চাবির গোছা কোথায় রেখেছেন মনে থাকে না। তবু শিশুবেলার কথা কেন স্পষ্ট মনে থাকে!

একেই কি বুড়োবয়েস বলে!

আজকাল একা থাকলে এই বুড়োবয়সটাই জ্বালায়। তাই দুপুরে ঘুমান না বড় একটা। শরীর খারাপ থাকলে পড়ে থাকেন বটে, কিন্তু বড় শাস্তি। ক্ষণে ক্ষণে উঠে জল খান, পান মুখে দেন, বেলা ঠাহর করেন জানালায় দাঁড়িয়ে। ছেলেপুলেরা ইস্কুল থেকে ফেরে দুপুরে। বীণার কড়া নিয়ম, বেলায় খেয়ে বাচ্চারা ঘুমোবে, যাতে সন্ধেবেলায় পড়ার সময়ে কারও ঢুলুনি না পায়। সবাই ঘুমোয় বলে নিঃঝুম বাড়িটা ফাঁকা আর বড় হয়ে যায়।

এমনি এক দুপুরে কড়া নড়ল। কত কেউ আসতে পারে। ননীবালা ঝিমুনি ভেঙে উঠে বসতেই পেটে অম্বলের চাকা নড়ে উঠল। বুকটা ধড়াস ধড়াস করে।

—কে? বলে উঠে এলেন কষ্টে।

বাইরে থেকে সাড়া এল—পিওন। রেজিস্ট্রি চিঠি আছে।

ব্রজগোপালের টাকা এল বোধ হয়। বুকটা খামচে ওঠে হঠাৎ। আনন্দে না দুঃখে ঠিক বুঝতে পারেন না তিনি। দরজা খুলে অল্পবয়সি পিওনকে বললেন—কার চিঠি?

—ব্রজগোপাল লাহিড়ি।

—উনি তো নেই এখানে, দূরে থাকেন। আমি সই করে নিলে হবে? উনি আমার স্বামী।

পিওন একটু ভাবে। তারপর একরকম অনিচ্ছের সঙ্গে বলে—নিন।

উত্তেজনায় কলম খুঁজতে ঘরে ঢুকে খুঁজে পান না ননীবালা। ভীতকণ্ঠে বলেন—দাঁড়াও বাবা, কলম-টলম খুঁজে পাচ্ছি না, একটু দাঁড়াও।

পিওন হেসে বলে—কলম নিন না, আমার কাছেই রয়েছে।

পিওন ছেলেটা সই করার জায়গা দেখিয়ে দেয়, ননীবালা গোটা গোটা বাংলা হরফে দস্তখৎ করার চেষ্টা করেন। অক্ষরগুলো কেঁপে যাচ্ছে, জ্যাবড়া হয়ে যাচ্ছে। এই প্রথম একসঙ্গে অনেকগুলো টাকা এল হাতে। ব্রজগোপালের টাকা। বিশ্বাস হতে চায় না।

পিওন ছেলেটা চিঠি দিয়ে ক্ষণকাল বোধ হয় বকশিশের জন্য অপেক্ষা করে। তারপর চলে যায়। ননীবালা দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরে আসেন। শরীরটা বড় খারাপ করেছে আজ। বুকটা বশ মানছে না। বুকের ধুকধুকুনিটা যেন হঠাৎ একটু থেমে আবার হঠাৎ আছড়ে পড়ছে বুকের ভিতর।

অনেক টাকা। অনেক। খামটা খুলে চেকটার দিকে চেয়ে থাকেন। টানা হাতের লেখাটা বুঝতে পারেন না। একটা খোপের মধ্যে সংখ্যাটা লেখা। দশ হাজারের চেয়ে অনেক বেশি। একটা বাড়ি উঠে যাবে না এতে? খুশি হবে না সবাই?

বোধ হয় হবে। তবু বুকের ভিতরটা কী একরকম যেন লাগে। এতকাল এই টাকা ক'টার পথ চেয়ে বসেছিলেন ননীবালা। টাকা তুলে ব্রজগোপাল তাঁর হাতে দেবেন তিনি ছেলেদের হাতে। জমিটা রেজিষ্ট্রি হবে। ছেলেদের আর ছেলের বউয়ের কাছে ননীবালার মুখরক্ষা হবে। এই সংসারে তিনি আর একটু জোরের সঙ্গে ভারের সঙ্গে থাকতে পারবেন।

কিন্তু তাই কি হয়! হয় না। বীণা খুশি হবে না, রণোটাও কি খুশি হবে!

ননীবালা চেকটা পিকদানির নীচে চাপা রেখে শুলেন একটু। শরীর ভাল না, মন ভাল না। চোখে হঠাৎ জল আসে কেন যে! মনে হয়, সংসারে কেউই আসলে কারও নয়, এই যে একা দুপুরে মন-খারাপ হয়ে পড়ে থাকা, দিনের পর দিন, কাছের কেউ থাকলে এ দশা হবে কেন তাঁর। কেন এমন ভার লাগে দিন! সময়ের চাকা ঘোরেই না যেন।

একেই কি বুড়োবয়েস বলে!

চেকটা আর একবারও হাতে নিলেন না তিনি। পিকদানির নীচে সেটা চাপা রইল। জানালা দিয়ে হাওয়া আসছে, তাতে ফরফর করে পাখা নেড়ে চেকটা জানান দিতে লাগল সে আছে। ননীবালা একটু বেশি সময় ধরে কাঁদলেন আজ। ঘুম হল না। ঠিকে ঝি কড়া নাড়তে চোখ মুছে উঠলেন।

সন্ধেবেলা রণেন এলে তাকে ডেকে চেকটা হাতে দিলেন ননীবালা, কেবল বললেন—দুপুরে এসেছে।

রণেন খুশি হবে না, এমনটাই আশা করেছিলেন তিনি। কিন্তু রণেন খুশি হল, চেকটা টেবিলে চাপা দিয়ে রেখে, জুতো মোজা খুলতে খুলতে সত্যিকারের খুশি হয়ে বলে—এসেছে! যাক, বাঁচা গেল। কালই অজিতকে খবর দেব। লক্ষ্মণের কোন পিসেমশাই খুব ঘুরঘুর করছেন জমির জন্য।

ননীবালা কথা বললেন না, শরীরটা বশ নেই। এ-বেলা বীণা রান্নাঘর সামলাচ্ছে, তিনি ছুটি নিয়েছেন। বীণা কৌতূহল দেখাল না। রান্নাঘরেই বসে রইল। তার এই চুপ করে থাকা, ওই গা-আলগা ভাব দেখে মনে মনে বড় কাহিল লাগে ননীবালার। শ্বশুরের টাকায় তার কোনও আগ্রহ নেই। গ্রাহ্য করে না।

গা ঘেঁষে ক্ষুদে নাতিটা দাঁড়িয়ে আছে। বলল—ঠানু, মশা কামড়াচ্ছে। কোলে নাও।

তাকে কোলে নিলেন ননীবালা। আঁচলে পা ঢেকে শিশু শরীরটায় গায়ের ওম্ দিতে দিতে মনটা হালকা হল। সংসারে এই বিচ্ছুগুলোকে ভগবান পাঠিয়ে দেন মানুষের মনের ধুলোময়লা ভাসিয়ে নিতেই বোধ হয়।

সোমেন আজকাল অনেক রাতে ফেরে। কোলের ছেলেটা ধাঁ করে ভিন্‌মানুষ হয়ে উঠেছে আজকাল। কথা বলেই না। কারও সঙ্গেই না। কেবল ভাইপো-ভাইঝির সঙ্গে একটু-আধটু। ননীবালা জানেন, ও অন্য জায়গায় বাসা খুঁজছে। শীলার বাড়িতে গিয়ে একদিন জানতে পেরেছেন। কাউকে বলেননি কিছু। কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, তাঁর আঁচলে বাঁধা ছেলেটা এ সংসার থেকে বার হতে চাইছে।

সেদিন ব্রজগোপাল এসেছিলেন, যাওয়ার সময়ে সোমেন গেল সঙ্গে। টিউশনি সেরে রাতে ফিরে এসে সে কী চোটপাট ননীবালাকে—তুমি কেন বাবাকে বলেছ যে আমি আলাদা বাসা খুঁজছি। তুমি জানলে কোত্থেকে?

ননীবালা ভয় পেয়ে বলেন—আমাকে শীলা বলেছে তুই নাকি ওদের বাসায় কদিন থাকতে চেয়েছিস!

—তার মানে কি বাসা খোঁজা! দিদির বাড়িতে ভাই গিয়ে থাকলে ভিন্ন বাসা হয় নাকি।

—না হয় ভুল বুঝেছি, রাগিস কেন?

রাগব না! বাবাকে সংসারের সব কেলেঙ্কারি জানানোর দরকার কী? বাবার না জানলেও চলত।

ননীবালা একটু কঠিন হওয়ার চেষ্টা করে বলেন—তাকে জানাব না কেন? সে কি তোদের পর?

রাগী ছেলেটা ফুঁসে উঠে বলে তখন—পর কি না সেকথা জিজ্ঞেস করতে তোমার লজ্জা হয় না?

এ কথার উত্তরে কিছু বলার নেই, ছেলেরা বড় হলে আলাদা বোধ বুদ্ধি হয়। মায়ের শেখানো কথা তোতা পাখির মতো বলেছে এক সময়ে এই ছেলেই। এখন সংসারের নানা দাঁড়ে বসে নানা কথা শিখেছে। বোধ হয়, বাপের ওই দূরে দূরে থাকা ছেলেটার ভাল লাগে না। বোধ হয় ছেলেটা বাপের জন্য খোঁড়ে মনে মনে আর সেজন্য দায়ী করে রেখেছে ননীবালা আর রণেনকে।

তবু সেজন্য ছেলেটার ওপর রাগ হয় না ননীবালার। বরং আলাদা একটা গভীর মায়া জন্মায়। সে লোকটাকে ভালবাসার কেউ তো নেই আর। ছেলেমেয়েরা পর, বউ চোখের বিষ। যদি এই ছেলেটার টান থাকে তবে ব্রজগোপালের ওইটুকুই আছে। ছেলের ভিতর দিয়ে তার বাপের প্রতি একরকম আবছা কী যেন ভাব টের পান ননীবালা। বোধ হয় বুড়োবয়সের জন্যই।

একেই কি বুড়োবয়েস বলে!

আজ ননীবালা রাতে শোওয়ার সময়ে একটু সেধে কথা বলেন ছেলেটার সঙ্গে। বলেন—হ্যাঁরে, চাকরির কিছু হল না?

—কী হবে!

—শৈলীর কাছে আর একবার গেলি না! মুখচোরা ছেলে, নিজে না পারিস আমাকে একদিন নিয়ে যাস। কতকাল দেখি না।

—গিয়েছিলাম আর একদিন। সোমেন নরম গলায় বলে।

—গিয়েছিলি? কী বলল?

সোমেন বড্ড সিগারেট খায় আজকাল। একটার আগুন থেকে আর একটা ধরিয়ে নিয়ে বলল—বলার অবস্থা নয়।

—কেন?

—ওরা খুব ব্যস্ত।

—কীসে ব্যস্ত? শৈলীর শরীর খারাপ নাকি!

—না, শুনলাম মেয়ের বিয়ের ঠিকঠাক হচ্ছে। তাই নিয়ে ব্যস্ত। বলে সিগারেটটা পুরো খেয়ে ফেলে দেয় সোমেন।

॥ আঠাশ ॥

ননীবালা অবাক হয়ে বলেন—ও মা! সে তো গুয়ের গ্যাংলা মেয়ে শুনেছি! ওইটুকু মেয়ের বিয়ে দেবে!

কেমন নিরাসক্ত গলায় সোমেন বলে—ওইটুকু আবার কী! তোমার কত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল?

ননীবালা শ্বাস ফেলে বলেন—সে তখন জ্ঞানবুদ্ধি হয়নি। কিন্তু আমাদের আমলে যা হত তা কি আজকাল হয়? তার ওপর বড়লোকের মেয়ে, আদুরে, এত তাড়াতাড়ি তাকে বিদায় করবে কেন শৈলী!

—সে তোমার শৈলীই জানে!

এই বলে সোমেন আবার সিগারেটের জন্য হাত বাড়ায়।

ননীবালা বলেন—এক্ষুনি তো খেলি? বুকটা শেষ করবি নাকি! ওসব বেশি খেলে কী। যেন সব রোগ বালাই হয়, লোকে বলে।

—কিছু হবে না। এই বলে অস্থির হাতে আবার দেশলাই জ্বালে সোমেন।

আর তখনই ননীবালা ছেলের মধ্যে একটু গোলমালের গন্ধ পান। কী যেন হিসেবে মিলছে না।

সময়ের একটু ফাঁক রাখেন ননীবালা, তারপর আস্তে করে জিজ্ঞেস করেন—হ্যাঁ রে, শৈলীর মেয়ে দেখতে-শুনতে কেমন?

—কেন?

—এমনিই জিজ্ঞেস করছি, শৈলী দেখতে বেশ ছিল, একটু হাবা মতন ছিল অবিশ্যি। মেয়েটা কেমন?

—কালো।

—চোখমুখ?

—ভালই। আলগা চটক আছে।

—তোর সঙ্গে কথাটথা বলল না?

—বলবে না কেন? এ কী তোমাদের আমলের মেয়ে পুরুষের সম্পর্ক নাকি?

ননীবালা বললেন—তা নয়। বলছিলাম, বড়লোকের মেয়ে বলে দেমাক নেই তো!

—থাকলেই বা, কে পরোয়া করে!

এটা উত্তর নয়। রাগ। ননীবালা বুঝলেন। একটু ছায়া মনের মধ্যে খেলা করে গেল। বুড়ো বয়সে সব মনে পড়ে। ছেলেবেলায় তিনি কতবার শৈলীর পুতুলের সঙ্গে নিজের পুতুলের বিয়ে দিয়েছেন। এখন যদি বুড়োবয়সে পুতুল খেলার ইচ্ছে হয়? ভাবতেই একটু শ্বাস বেরিয়ে যায় বুক থেকে। তাই কি হয়! শৈলীরা কত বড়লোক। জজের বাড়িতে জন্মেছে, বিয়েও হয়েছে আর এক মস্ত বড় ঘরে। সুখ ছাড়া আর কিছু কি ওরা জানে! ননীবালার ঘরে কী আছে? ওই তো ছেলে, চেহারাটি কেমন রোগার মধ্যে তিরতিরে সুন্দর। বলতে নেই। থুঃ থু! অমন সুন্দর ছেলেটা তাঁর সারাদিন ছন্নছাড়ার মতো ঘোরে। কোন বাড়িতে বুঝি একটু পড়ায়।

ব্যস। এ ছাড়া কোনও কাজ নেই। এই ছেলে কবে দাঁড়াবে, কবে তার বিয়ের কথা ভাববেন তা বুঝতে পারেন না তিনি। বড় রাগী আর অভিমানী ছেলে। শৈলীর মেয়ে ওকে আবার তেমন কিছু বলেনি তো!

ননীবালা হঠাৎ একটু আদুরে গলায় বলেন—ওরে ছেলে, আমাকে একবার শৈলীর বাড়ি নিয়ে যাবি? সে যে খুব দেখতে চেয়েছিল আমাকে!

—বিয়েটা হয়ে যাক, তারপর যেয়ো। এখন ওই ঝঞ্ঝাটের মধ্যে গিয়ে লাভ কি? কথাবার্তা বলতে পারবে না, সবাই ব্যস্ত।

—বিয়ের পাকা কথা হয়ে গেছে?

সোমেন একটু ঝাঁঝ দিয়ে ওঠে—অত জানি না।

রাগ দেখে ননীবালা দমেন না, সুর খুব নরম করে বলে—ধমকাস না বাবা। মরে যদি তোর ঘরে জন্মাই ফের, তবে তো শাসনের চোটে দম বের করে দিবি। মা হয়ে বকা খাচ্ছি, মেয়ে হয়ে তো খাবই।

সোমেন হাসে হঠাৎ। বলে—মরতে বলেছে কে?

—বলতে হয় না, হঠাৎ কার কখন মেয়াদ শেষ হয়। তা শৈলী তোকে বিয়ের কথা কী বলল?

—বলবে আবার কী! বাবাকে বাসে তুলে দিয়ে সেদিন হাতে সময় ছিল। গিয়েছিলাম। দেখি, বাড়িতে বেশ কিছু লোকজন। সবাই ব্যস্ত। শৈলীমাসির ঘরেও কয়েকজন বসে আছে। আমাকে দেখে খুব আদর করে বসাল, অনেক মিষ্টি খাওয়াল। বলল—বাবা, রিখির বিয়ে দিচ্ছি। ফাল্গুনে, নয়তো বৈশাখে। তোমাকে বলা রইল কিন্তু।

—আর কিছু বলল না?

—হুঁ। ছেলে বিলেতে মেম বিয়ে করেছে, আর আসবে না, সেজন্য খুব দুঃখ করল। বলল—ছেলে তো আপন হল না, এখন দেখি জামাই যদি আপন হয়। ছেলে লিখেছে, ভারতবর্ষ ভিখিরির দেশ, ওখানে মানুষ থাকতে পারে না। লন্ডনে ষাট হাজার পাউন্ডে বাড়ি কিনেছে। গাড়িটাড়ি তো কিনেছেই।

—ও আবার কেমন ছেলে! ননীবালা দুঃখ পেয়ে বলেন।

মিটমিটে হেসে সোমেন বলে—আমি যেমন!

—তোর সঙ্গে কীসের তুলনা? ননীবালা অবাক হয়ে বলেন—তুই আমার কোলপোঁছা ছেলে। এখনও বিপাকে পড়লে কেমন মা-মা করিস!

—সে সবাই করে। আবার সুযোগ পেলে কেটেও পড়ে। আমিও তো বাসা ছাড়ার প্ল্যান করছি, তুমি তো জানোই। একই ব্যাপার।

ননীবালা অবহেলা ভরে, কিন্তু আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন—হুঁ! তুই আবার যাবি!

—যাবই তো। সোমেন তেমনি হাসিমুখে বলে—শুধু যে বাসা ছাড়ব তা নয়, দেশও ছাড়তে পারি।

—তার মানে?

আমার এক বন্ধু জার্মানিতে চাকরি করে। সে লিখেছে, আমাকে ওখানে নেওয়ার ব্যবস্থা করবে।

—গিয়ে কী করবি?

সোমেন আধশোয়া হয়ে বলে—চাকরি করব আর তোমাকে টাকা পাঠাব।

—অমন টাকায় আমার দরকার নেই। ননীবালা বলেন—আগে শুনতাম লোকে পড়াশুনো করতে বিলেত-টিলেত যায়। আজকাল দেখি সবাই যায় চাকরি করতে।

সোমেন চিত হয়ে শুয়ে ঠ্যাং নাচাতে নাচাতে বলে—তো এদেশে চাকরি না পেলে কী করবে?

ননীবালা বেশি কথা বলেন না। কেবল গলায় একটা ক্ষীণ নিরুদ্বেগের ভাব ফুটিয়ে বলেন—বেশ, যাবি তো যা না! বিদেশে গেলে ছেড়ে তো দিতেই হবে। যতদিন এদিকে আছিস ততদিন বাইরে কোথাও না থাকলেই হয়।

সোমেন উত্তর দিল না। সিগারেট টানতে টানতে কী যেন ভাবে।

ছেলেটাকে ভয় পান ননীবালা। দুই ছেলের মধ্যে, বলতে নেই, এই ছেলেটার প্রতিই ননীবালার পক্ষপাতিত্ব একটু বেশি। কোলের ছেলে, একটু বেশি বয়স পর্যন্ত বুকের দুধ খেয়েছে, সংসারে আছে একটু কম জোরে। দেওয়া-থোওয়া করতে পারে না তো। সংসারে দেওয়া-থোওয়া করতে না পারলে আদর হয় না। সেই জন্যই অসহায় ছেলেটার দিকে তাঁর টান বেশি। কিন্তু এ ছেলেটাই তাঁকে একদম পাত্তা দেয় না। ডাকখোঁজ করে বটে, কিন্তু দড়ি-আলগা ভাব। জাহাজ যেন জেটিতে ঠিকমতো বাঁধা নেই। জলের ঢেউয়ে নড়েচড়ে দোল খায়। বুঝিবা যে কোনও সময়ে ভেসে চলে যাবে। ওর মনটা কি একটু শক্ত? মায়াদয়া একটু কি কম! চুলের জট ছাড়াতে ছাড়াতে ননীবালা ভাবেন। সংসারে কেউ তো কারও নয়। বুড়ো বয়সে এইসব টের পাওয়া যায়।

আজকাল চলে-যাওয়ার একটা বাতাস এসেছে দুনিয়ায়। হুটহাট শুনতে পান, তরতাজা ছেলেরা সব বিলেত বিদেশে চলে যাচ্ছে। ছেলেধরা যেমন খেলনা বা লজেঞ্চুস দেখিয়ে ছেলে ভুলিয়ে নিয়ে যায়, এও তেমনি। গুণী ছেলেদের টেনে নেয় সাহেবরা। বড়জামাই অজিতের বন্ধু লক্ষ্মণকেও টেনে নিয়েছে ওইরকম। সে আর আসবে না। জমিটা তাই সস্তায় পাওয়া গেল। কিন্তু জমির কথা আর ভাবেন না ননীবালা। মাথার মধ্যে শৈলী, শৈলীর মেয়ে, বিলেত বিদেশ, সোমেন, সব জট পাকিয়ে যায়। আর মনে হয়, পৃথিবীটা মস্ত বড়, কূলহারা অথৈ, ছেলেবেলায় মনে হত যতদূর দেখা যাচ্ছে ততদূর পর্যন্ত পৃথিবীটা সত্যিকারের। তার পরের পৃথিবীটা ভূতপ্রেত দত্যি-দানোর রাজত্ব। বুড়ো বয়সে সেটাই আবার মনে হয়। চেনাজানার বাইরে পৃথিবীটা জিনপরি দত্যি-দানোর হাতে। ঘরের ছেলেকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ডেকে নিয়ে যাবে।

ননীবালা শ্বাস ছাড়েন, থাক সবাই নিজেদের মনে সুখে থাক। যেখানে খুশি থাক।

—বাতি নেবাব মা? সোমেন জিজ্ঞেস করে।

—হুঁ। বলে ননীবালা শুয়ে পড়েন। শরীরটা আজ বড্ড খারাপ। রক্তের চাপ খুব বেড়েছে। সকালে একবার ডাক্তারের কাছে যাবেন কাল।

কলকাতার শৌখিন শীত শেষ হয়ে এল। বাতাসে চোরা গরম টের পাওয়া যায়। খবরের কাগজে মহামারীর কথা লেখে। খুব ধুলো ওড়ে চারদিকে। এ শহরে কেন যে তেমন শীত পড়ে না ননীবালা বোঝেন না। মানুষ বেশি বলে সকলের গায়ের ভাপে শীত কমে যায় না কি! কিংবা সেই যে অ্যাটম বোমা ফাটিয়েছিল, তাইতেই শীত পালিয়ে গেছে। কথাটা একদিন সোমেনকে বলেছিলেন, সোমেন ধমকেছিল। ছেলেটা বড্ড বকে তাঁকে। শীতের। জন্য একরকম দুঃখ হয়। শ্বশুরবাড়িতে সেই কোন ভোরে উঠে কাঠের জ্বালে রোগা ছেলের জন্য কালোজিরে চালের ভাত বসাতেন। চারধারে পৃথিবীটা কী হিম, কী কনকনে ঠান্ডা! নাকে চোখে জল আসত, হাড়ের ভিতরে ব্যথিয়ে উঠ শীত। বাগানে কপির পরতে, পালংয়ের পাতায় কুয়াশা জমে থাকত।

জলের ফোঁটা গড়িয়ে নামত টিনের চাল থেকে। বাচ্চাদের গায়ে গরম জামাটামা জুটত না, খাটো খাটো মোটা সুতির চাদর জড়িয়ে ঘাড়ের পিছনে গিট বেঁধে দেওয়া হত, দেখতে হত ছোট ছোট পা-অলা পাশ বালিশের মতো, সারা উঠোন দৌড়ে বেড়াত। রোদ যতক্ষণ না উঠত ততক্ষণ সিঁটিয়ে থাকত হাত পা, আঙুল অবশ হয়ে বেঁকে যেতে চাইত। গরমে গরম হবে, বর্ষায় বৃষ্টি, শীতে শীত এই জেনে এসেছেন এতকাল। কিন্তু কলকাতার ধারা আলাদা। এখানে সারা বছরই কেমন একরকমের ভ্যাপসা গরমি ভাব। মানুষের গায়ের তাপ, কিংবা অ্যাটম বোমা কিছু একটা কারণ আছেই। ছেলেরা বোঝে না। বহুকাল হয়ে গেল এ শহরে, তবু ঠিক আপন করতে পারলেন না জায়গাটাকে। মায়া জন্মাল না। কেবলই মনে হয়, আমার দেশ আছে দূরে, এখানে প্রবাসে আছি। অথচ তা তো নয়। কলকাতাতেই সবচেয়ে বেশি সময়টা কাটল জীবনের, ভগবান করলে এখানেই বাড়িঘর হবে, এখানেই গঙ্গা পেয়ে যাবেন। তবু কেন যে এটাকে নিজের জায়গা বলে ভাবতে পারেন না!

একদিন সকালে বড়জামাই এসে হাজির। বলল—মা, আমাদের বাড়িতে চলুন।

বুকটা কেঁপে ওঠে, হাত-পা ঝিম ঝিম করে। কষ্টে ননীবালা বললেন—কেন বাবা, কী হয়েছে?

অজিত মুখটা গম্ভীর রেখেই বলে—চলুন নিজেই দেখবেন।

গলা আটকে আসে ননীবালার। শীলুর চোট লেগেছিল পেটে, কোনও অঘটন হয়নি তো! কষ্টে জিজ্ঞেস করেন—শীলুর কিছু হয়েছে?

জামাই লজ্জা পায়। চোখ নামিয়ে বলে—আপনার একবার যাওয়া দরকার। আপনার মেয়ে আপনার জন্য অস্থির।

বীণা নন্দাইকে চা করে খাওয়ায়, খাবার দেয়, দু-একটা ঠাট্টার কথাও বলে। ওদের কারও দুশ্চিন্তা নেই। কেবল ননীবালারই হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে আসে। কতকাল ধরে সন্তানের জন্য অপেক্ষা করেছে ওরা। প্রায় বুড়ো বয়সেই হতে চলেছে সন্তান, যদি কিছু ঘটে তো মেয়েটা জামাইটা শয্যা নেবে। সংসারের সুখ নিবে যাবে।

ননীবালা কথা বাড়ান না। সোমেনের একটা কিটব্যাগে কাপড়চোপড় গোছাতে থাকেন। ছেলেরা কেউ বাড়ি নেই। কাউকে বলে যাওয়া হল না। জামাই তাড়া দিচ্ছে, ঘরদোর কিছু সিজিল-মিছিল করে যাবেন তার উপায় নেই। ননীবালা বাড়ির বার হলেই বীণা ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র হাঁটকে দেখে। কী এক শত্রুতা তৈরি হয়েছে বউটার সঙ্গে! তার ওপর চেক ভাঙিয়ে টাকা তুলতে যে কোনওদিন গোবিন্দপুর থেকে শনিঠাকুরটি আসবেন। আর এক শত্রু। কিন্তু শত্রু হোক আর যাইহোক, তার একটা মর্যাদা আছে। ননীবালা মানুষটাকে যতই মুখ করুন, এ সংসারের আর কেউ তাকে অমর্যাদা করলে ননীবালার বড় লাগে। ননীবালা থাকবেন না, তখন যদি আসে তো ছেলের বউ হয়তো বসতেও বলবে না, আদর আপ্যায়ন করবে না দাঁড়ানোর ওপর বিদায় দেবে। সে লোকও বড় অভিমানী, একটু অনাদর দেখলে নিজেকে সে জায়গা থেকে সরিয়ে নেয়। আর সোমেনের চিন্তা তো আছেই। বাপের মতোই স্বভাব, একটুতে রেগে যায়। মুখ ফুটে কারও কাছে একগ্লাস জল পর্যন্ত চায় না। ননীবালার কাছেই যত আবদার। বয়স্ক খোকা একটি।

এইসব দুশ্চিন্তা করেন ননীবালা, আর ব্যাগ গুছিয়ে নেন। সংসারে শত দড়িদড়া দিয়ে বাঁধা জীবন। কত মায়া, কত চিন্তা, কত নিজেকে দরকারি মানুষ বলে ভাবা! তবু তো সব ছেড়ে একদিন রওনা হতে হয়! কিছু

আটকে থাকে না। এসব বুনো বয়সের চিন্তা। আঁচলটায় চোখ মুছে নেন তিনি।

এই যে শীলু আর জামাই ছেলে-ছেলে করে পাগল, তার তো কোনও মানে নেই। হচ্ছে না, সে একরকম। কিন্তু হলেই কি সুখ নাকি? মুখখানা দেখলেই মায়া এসে গেল তো গেলই। আর একটা জীবন ছাড়ান-কাটান নেই। মুখ দেখে সুখ যেমন, আবার জীবনভর দুঃখও কম নাকি! পেটের শত্রুর চেয়ে শত্রু নেই, লোকে বলে —সে মিছে কথা নয়। বাপ-পা যত ভালবাসে ছেলেমেয়েকে ছেলেমেয়ে কোনওকালে উলটে ভালবাসে না তত। নিজেকে দিয়েই জানেন। রণেন, শীলু হওয়ার পর জগৎসংসার যেন ওদের মধ্যেই বাসা বাঁধল, ভালবাসা নিঙড়ে নিল। আবার এখন রণেনকে দেখেন, ছেলেপুলে নিয়ে কত চিন্তা, কত ভালবাসা!

ননীবালা বীণাকে ডেকে বললেন—যাই।

—আসুন। বলে বীণা প্রণাম করল।

বড় ভাল লাগল ননীবালার। পিঠে হাত রেখে গভীর মনে আশীর্বাদ করলেন। এরা ভালবাসা নিতে জানে না, জানলে, ননীবালা যে কত ভালবাসতে পারেন তা দেখতে পেত।

॥ উনত্রিশ ॥

ননী, ছেলেকে পাঠিয়েছিলি, কিন্তু নিজে তো কই একদিনও এলি না। বগুড়ার কথা বলব এমন মানুষ পাই না। সেই আমাদের বগুড়ার ছেলেবেলার সাক্ষী কেই বা আছে! একা পড়ে আছি কতকাল। তোকে পেলে কত কথা যে বলব! তোর ছেলেটা বড় লাজুক, আজকাল আসে না তো! ওকে সঙ্গে নিয়ে আসবি। কবে মরে যাই কে জানে? সকলের জন্য বড় মায়া হয় আজকাল। আসিস....

মার চৌকিটা ন্যাড়া হয়ে পড়ে আছে। বিছানাটা গোটানো, তার ওপরে শতরঞ্চির বেড়। চৌকির ওপর ধুলোর আস্তরণ পড়েছে। তোশকের নীচে গুঁজে রাখা অনেক টুকিটাকি কাগজ, লন্ড্রির বিল, পুরনো চিঠি তার মধ্যে শৈলীমাসির দেওয়া চিঠিটাও পড়ে আছে। মা এখনও বড়দির বাড়ি থেকে আসেনি। দুদিন ধরে পড়ে আছে চিঠিটা, মার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসা হয়নি। থাকগে। এমন কিছু জরুরি চিঠি নয়।

কেমন একটা বিষন্ন ঋতু এসেছে এখন। শীতের টান শেষ হয়ে বাতাস ভেপে উঠেছে ক্রমে। সাঁঝ সকালে অন্ধ কুয়াশা আর ধুলো ঢেকে রাখে চারধার। কলকাতার পচনের ভ্যাপসা গন্ধ চাপ হয়ে বসে থাকে শহরের বুকে। মন বড় আনমনা। ভাল লাগে না। কিছু ভাল লাগে না।

গতকালও অণিমার সঙ্গে দেখা, মুক্ত অঙ্গনে ওরা নাটক করবে। মিহির বোস নাটক লিখেছে, পরিচালনাও তার। নাটকের দল তৈরি হয়ে গেছে, দলের নাম হইচই। সোমেনকে একটা পার্ট নেওয়ানোর জন্য ঝুলোঝুলি। সবশেষে বলল—বড্ড অহংকারি তুমি। অহংকার সবাইকে মানায় না সোমেন।

একটু কি রেগে গিয়েছিল অণিমা! কিন্তু সোমেনের ওসব ছেলেমানুষি আর ভাল লাগে না। বয়স বাড়ছে। গেস্ট কিন উইলিয়ামসে ঢুকে গেল চিত্তপ্রিয়। আই সি আইতে ডি গ্রেড কেরানির চাকরি পেয়ে গেছে হেমন্ত। সত্যেন তার বাড়িতে টিউটোরিয়াল খুলে পয়সা করছে। সোমেনেরও একটা কিছু করা দরকার। কিছু করার জন্য হাত-পা নিশপিশ করে। কিন্তু শূন্য কাজে বেলা কেটে যায়।

দুপুরে ঘুমিয়ে উঠে নতুন প্যান্টটা পরে বেরোতে যাচ্ছিল সোমেন, বউদি ডেকে বলল—চা করছি, খেয়ে যাবে নাকি!

বউদির সঙ্গে খুব একটা কথাবার্তা হয় না আজকাল। সোমেন কথা বলতে আলসেমি বোধ করে। চুপচাপ থাকতেই ভাল লাগে। যেন বা হঠাৎ তার অভিজ্ঞতা বেড়েছে, বয়স হয়েছে, ধীর-স্থির বিবেচক গম্ভীর মানুষ একজন।

চায়ের কথায় বেরোতে গিয়েও ঘুরে এসে সোফায় বসে বলল—দাও।

গ্যাস উনুন থেকে কেটলি নামিয়ে, চা ভিজতে দিয়ে বউদি উঠে এসে বলল—এই প্যান্ট করালে?

—হুঁ।

—বেলবটম করালে না কেন?

সোমেন একটু হাসে। দাদাকে আজকাল বউদি খুব আধুনিক পোশাক পরায়। দাদা স্টাইল বোঝে না। মোটাসোটা মানুষ বলে মানায়ও না কিছু। তবু নির্বিকার মানুষের মতো বউদি যা পরায় তাই পরে।

সোমেন বলল—বেলটম আমার ভাল লাগে না। পায়ের গোড়ালির কাছে একগোছ বাড়তি কাপড় হাতির কানের মতো লটরপটর করবে, সে ভারী বিশ্রি। বোকা-বোকা।

বউদি বলে—দাঁড়াও তো, দেখি।

সোমেন দাঁড়ায়। বউদি চারধারে ঘুরে প্যান্টের ফিটিং দেখে মুখ টিপে হেসে বলে—খারাপ হয়নি। তা অমন সুন্দর বিলিতি কাপড়ের প্যান্টের সঙ্গে কি ওই অখন্দে তিলেপড়া নীল শার্টটা পরে বেরোবে নাকি?

সোমেন পা নাচাতে নাচাতে বলে—এইটাই আমার সবচেয়ে ভাল শার্ট।

—উদো একটা। টাকা দিচ্ছি, আজই একটা সাদা রঙের ইজিপসিয়ান বা টেরিকটন শার্ট করতে দেবে...

সোমেন বাধা দেওয়ার আগেই বউদি ভিতরের ঘরে তোশকের তলা থেকে মুহূর্তের মধ্যে পঞ্চাশটা টাকা এনে প্যান্টের পকেটে গুঁজে দিয়ে বলে—রেডিমেড ভাল পেলে তাও। কিনতে পারো।

সোমেন একটু চুপ করে থাকে। বউদি চা এনে দেয়। চুমুক দিতে দিতে বলে—তব দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে...

বউদি হেসে ফেলে, বলে—তার মানে?

কাঁধ ঝাঁকিয়ে সোমেন বলে—দয়া ছাড়া গতি কী বলে?

—দয়া নয় ঠাকুরদা, তুমি তো বড্ড বেশি বোঝো?

—দয়া নয়? তবে কী! জয় তোমার করুণা...

—আজ তোমার জন্মদিন।

সোমেন একটু অবাক হয়। বলে—আজ দোসরা ফাল্গুন নাকি?

—হ্যাঁ। কিছুই তো খেয়াল রাখো না। রাতে তোমার দাদা মাংস আনবে, আর ফ্রায়েড রাইস করব। তোমার নিজের এসব খেয়াল না থাকলেও আমাদের থাকে মশাই।

—কত বয়স হল বলো তো?

—পঁচিশে পা দিলে। চব্বিশ পূর্ণ হয়ে গেল।

—পঁচিশ! বলে হঠাৎ বিড়বিড়িয়ে ওঠে সোমেন, কবজি উলটে ঘড়ি দেখে বলে— পঁচিশ! তা হলে তো একদম সময় নেই।

বউদি অবাক হয়ে বলে—কীসের সময় নেই?

সোমেন বউদির মুখের দিকে চেয়ে বলে—খুব তাড়াতাড়ি একটা কিছু করা দরকার বুঝেছ! বয়স বাড়ছে।

বউদি বড় বড় চোখ চেয়ে বলে—বুঝেছি। কিন্তু বাড়ি থেকে বেরোবার সময়ে সেলুন থেকে দাড়িটা কেটে নেওয়ার যেন সময় হয়। ওই প্যান্টটার সঙ্গে তোমার একদম ম্যাচিং হচ্ছে না। লোকে দেখলে ভাববে কার প্যান্ট চুরি করে এনে পরেছ।

সোমেন গাল চুলকোয়, থুতনিতে হাত দিয়ে হাসে। ঘরে ঘুমন্ত বাচ্চাদের মধ্যে কে যেন কেঁদে উঠল। বউদি ও-ঘরে যাওয়ার দরজায় দাঁড়িয়ে বলল—ফের যেন শোকতাপ পাওয়া বুড়ো ঠাকুরদার মতো চেহারায় না দেখি। মা এসে দেখলে ভাববে তার ছেলেকে খেতে দিইনি কদিন।

সেলুনে দাড়ি কামিয়ে নিল সোমেন। গড়িয়াহাটার ভাল দোকান থেকে দুধসাদা একটা টেরিকটনের শার্ট কিনে নিল। দোকানের ট্রায়াল রুমে ঢুকে পরে নিল শার্টটা। ট্রায়াল রুমটা অদ্ভুত। অন্ধকার ছিল, ভিতরে পা দিতেই পায়ের তলায় চৌকো পাটাতন দুলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে পাখা ঘুরতে থাকে মাথার ওপর। আলো জ্বলে ওঠে। সবই অটোমেটিক। এই সব কায়দার জন্যই বোধ হয় বড় দোকানটায় শার্টটার দাম টাকা দশেক বেশি পড়ল। ফুটপাত থেকে কিনলেই হত।

নিজেকে আয়নায় দেখে খুশি হচ্ছিল না সোমেন। পঁচিশ বছর বয়সের ছাপ পড়ল নাকি মুখে! কোন বয়সের পর যেন মানুষ আর বাড়ে না। কোন বয়স থেকে যেন ক্ষয় শুরু হয়! একটা আবছা ভয় হঠাৎ বুক শুকিয়ে দেয়। যৌবন বয়স তো চিরকাল থাকে না। কিন্তু কত দিন থাকে?

অণিমাদের বাড়িতে গাব্বুর পড়ার ঘরে ঢুকে একটু অবাক হয় সোমেন। সবাই হাজির। অপালা, পূর্বা, অণিমা, শ্যামল, মিহির বোস ছাড়াও ইউনিভার্সিটির কয়েকজন ছেলেমেয়ে, দু-চারজন অচেনাও রয়েছে। একটা চেয়ারের ওপর এক পা তুলে দাঁড়িয়ে আছে মিহির বোস, হাতে নাটকের পাণ্ডুলিপি, মুখচোখ খুব সিরিয়াস। যেমন বোকা বোকা লেগেছিল তাকে প্রথম দিন। এখন আর তেমন লাগছে না। আত্মবিশ্বাসী উচ্চাকাঙ্ক্ষাসম্পন্ন একজন চালাক-চতুর লোকের মতোই দেখাচ্ছিল। অপালা তার দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে আছে।

সে ঘরের দরজায় পরদা সরিয়ে দাঁড়ায়। পূর্বা অণিমাকে ঠেলা দিয়ে অবহেলার সঙ্গে। বলে—তোদের প্রাইভেট টিউটারটা এসেছে, দ্যাখ, অণি!

অণিমা মুখ ফিরিয়ে হাসল। বলল—প্রাইভেট টিউটার ছাড়া আর কী! ওর কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই।

অপালা মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখে ভ্রূ কোঁচকাল।

মিহির বোস একটু নিরস গলায় বলল—আসুন সোমেনবাবু।

সোমেন বুঝতে পারে সবাই তার ওপর রেগে আছে। সোমেনের মৃদু একটু বোকা-হাসি আছে, যা দেখে সবাই ওকে ক্ষমা করে। সেই হাসিটা সে হাসল এখন। ঘরে ঢুকে অণিমার পাশে সোফায় বসে বলে—গাব্বু পড়বে না?

—কী জানি! ও ওদিককার একটা ঘরে শিফট করেছে। এ ঘরটা আপাতত হইচই দলের। এখানে তোমার ভাল না লাগলে গাব্বুর ঘরে যেতে পারো।

সোমেন উত্তর দিল না, বসে রইল। মিহির বোস তার প্রতীক নাটকের থিম বোঝাচ্ছিল। একটু থেমে আবার শুরু করল এখন।

পূর্বা চেয়ারে বসেছিল। উঠে এসে সোমেনের পাশে সোফায় বসে ফিসফিস করে বলল—নাটকটা কিছু বুঝতে পারছি না মাইরি। একটা লোক একদিন মাথা ধরার ট্যাবলেট মনে করে নাকি চাঁদটাকে গিলে ফেলেছিল। সেই থেকে প্রবলেম শুরু তারপর থেকে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, ইউ এন ও সবাই লোকটার কাছে কৈফিয়ত চেয়ে পাঠায়। লোকটার প্রেমিকা আত্মহত্যা করতে চাইছে, আর লোকটা তাকে বিরাট বিরাট বক্তৃতা দিয়ে কী যেন বোঝাচ্ছে। সবাই বলছে, দারুণ নাটক। আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না।

সোমেন সমবেদনার স্বরে বলে—ততার মাথাটা নিয়ে আমারও চিন্তায় রাতে ঘুম হয় ড়া।

—যাঃ। বলে পূর্বা হেসে ওঠে।

মিহির বোস নাটকের থিম বোঝাতে বোঝাতে ব্যথিত চোখে তাকায়। পরদা সরিয়ে অনিল রায় উঁকি দেন—আসতে পারি?

সবাই সমস্বরে বলে ওঠে—আসুন স্যার।

অনিল রায়ের হাঁটা দেখেই বোঝা যায়, পেটে ঈষৎ মদ আছে। চোখ দুটো চকচকে লাল; মুখে বেসামাল একটা হাসি। তাঁর সঙ্গে ম্যাক্স! সেও টেনে এসেছে তবে অনেক স্টেডি, আর কিছু গম্ভীর। অনিল রায় সোমেনের কাছে এলে সোমেন উঠে জায়গা ছেড়ে দিয়ে বলে—বসুন স্যার।

—সোমেন না?

—হ্যাঁ স্যার। আপনি আমাকে কেবল ভুলে যান।

অনিল রায় বসে হাসলেন। বললেন—বয়সে পেয়েছে, বুঝলে! সেদিন নিজের ছেলেটার সঙ্গে দেখা এক বিয়েবাড়িতে, প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল আচমকা, চিনতেই পারলাম না। অবশ্য আমাদের ডিভোর্সের সময়ে ওর বয়স কম ছিল। এখন বেশ লম্বা চওড়া হয়েছে। সাত বছর সময় তো কম নয়! তবু চেনা উচিত ছিল। আফটার অল নিজেরই তো ছেলে। শেষে অদিতিই এগিয়ে এসে বলল—অনিল, বান্টিকে চিনতে পারছ না! অনিল রায় হাসলেন—কী কাণ্ড বলো!

পূর্বা হিহি করে হাসছিল। অনিল রায় ধমকালেন—কী হল? ও ছুঁড়ি হাসছে কেন? মিহিরের নাটকটা কি খুব হিউমারাস?

অণিমা বলে—না স্যার, হাসিই ওর রোগ। হাসতে হাসতে একদম বেহেড হয়ে যায়।

—না না, ও আমার ছেলের কথা শুনে হাসছে। আজকাল প্যাথেটিক কথাতেও লোকে হাসে। সোমেন, একটা সিগারেট দাও তো।

—নেই স্যার, এনে দিচ্ছি। বলে সোমেন উঠতে যাচ্ছিল। মিহির বোস নিজের সিগারেটের প্যাকেট বের করে এগিয়ে আসে।

—আমার কাছে আছে, নিন।

পূর্বা মুখ তুলে বলে—আজ সারা বিকেল ধরে হাসিটা চেপেছিলাম। এতক্ষণে বেরিয়ে গেল।

অনিল রায় অবাক হয়ে বলেন—কেন?

—নাটকটা স্যার কিছু বুঝতে পারছি না। কেবল হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু অপালা যা গম্ভীর হয়েছিল, হাসতে সাহস হয়নি।

অপালা তার প্রতিমার মতো বড় বড় চোখ ফিরিয়ে তাকিয়ে বলল—মারব থাপ্পড়। বাথরুমে যাওয়ার নাম করে অন্তত বার দশেক হাসবার জন্য উঠে গেছিস, আমি বুঝে টের পায়নি।

আবার হিহি করে হেসে ওঠে পূর্বা। তার হাসি দেখে সবাই হাসে। অপ্রস্তুত মিহির বোসও হাসতে থাকে সবার মাঝখানে দাঁড়িয়ে অকপটে। পূর্বা বলে—তোর হাসি পায়নি অপা?

—পেলেই যেখানে-সেখানে হাসতে হবে নাকি? হাসলে মিহিরবাবু বুঝি আর ফিরে তাকাতেন আমাদের দিকে? নিজের ভবিষ্যৎ কেউ হেসে নষ্ট করে, বলুন স্যার?

সোমেন চাপা স্বরে বলে—জঘন্য।

অনিমা শুনতে পেয়ে বড় বড় চোখে তারদিকে চেয়ে বলে—কী জঘন্য সোমেন?

—তোমরা?

—ওমা! কেন?

—তোমরা জীবনেও কাউকে ভালবাসতে পারবে না। কেবল ইয়ারকি। ঘরে ঢুকে অপালার ভাসবাস দেখে মনে হয়েছিল, মিহির বোসের প্রেমে পড়েছে বুঝি। এ তো দেখছি, এখনও বাঁদরনাচ নাচাচ্ছে।

একটু পা নাচিয়ে অণিমা বলে—ভালবাসার লোককে নিয়ে বুঝি ইয়ারকি করতে নেই! তোমাকে নিয়ে আমি ঠাট্টা করি না?

—ফের? বলে তাকায় সোমেন।

—আচ্ছা বাবা, ঠাট্টা করব না আর। কান ধরছি। সত্যিই অণিমা কান ধরে।

—ও কী রে? চেঁচিয়ে ওঠে অপালা।

—অণিমা ম্লান মুখে বলে—ও ধরতে বলল যে।

—কে?

—ও। বলে ভারী লাজুক ভঙ্গিতে সোমেনকে দেখিয়ে দিয়েই মাথা নত করে অণিমা। সকলে উচ্চকিত হয়ে হাসতে থাকে। সোমেনের কান মুখ গরম হয়ে যায়। পূর্বা দাঁতে ঠোঁট টিপে বলে—তোর বাড়ির টিউটরটার তো ভারী সাহস অণি!

—তুমি আর কেলিও না। বলে পূর্বাকে ধমক দেয় সোমেন।

পূর্বা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে—দেখেছেন স্যার! ওকে আমি সবচেয়ে বেশি ফেবার করি, আর ও সব সময়ে আমাকে ইনসাল্ট করে।

গোলমালটা একটু থিতিয়ে আসে। মিহির বোস তার কভার ফাইল খুলে নাটকের পাণ্ডুলিপি বের করে।

সোমেন উঠে বলে—আমি গাব্বুর ঘরে যাচ্ছি।

কেউ তারদিকে মনোযোগ দিল না। নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে সোমেন প্যাসেজে পা দিল। নীচের তলায় অনেকগুলো ঘর। কেউ থাকে না। ফাঁকা নিঝুম। পায়ে পায়ে এঘর-ওঘর ঘুরে দেখছিল সোমেন। গাব্বু কোনও ঘরেই নেই।

ভিতর দিকে একটা ঢাকা বারান্দার মতো। আলো নেই। প্যাসেজের আলোর ক্ষীণ আভা আসছে। পিছন দিকেও ওদের বাগান আছে। মৃদু গোলাপের গন্ধ আসছে, আর গাছগাছালির বুনো গন্ধ। সোমেন ডাকল—গাব্বু।

কেউ সাড়া দিল না।

পিছন ফিরতেই চমকে গেল সোমেন। পিছনে মৃদু আলো, আবছায়ায় ছায়ামূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে অণিমা। সোমেন হেসে ফেলে বলে—চমকে গিয়েছিলাম। শব্দ করোনি তো।

অণিমা উত্তর দিল না। নড়লও না। কেবল তাকিয়ে থাকল।

সোমেনের বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল হঠাৎ। অজানা একটা ভয়। একটা অনিশ্চয়তা। সে সহজ হওয়ার জন্য বলল—গাব্বু কোথায় কোথায় বললে?

—এসো। বলে হাত বাড়াল অণিমা। সোমেনের হাতখানা ধরল। বলল—এস, দেখিয়ে দিচ্ছি।

সোমেন এত ভয় কখনও পায়নি। অণিমা হাত ধরেছে বলে নয়, অণিমা কাছ ঘেঁষে রয়েছে বলেও নয়। সোমেন লক্ষ করেছে, ওর গলার স্বর বসা, আবেগরুদ্ধ। এসব সময়ে মানুষ গলার স্বর লুকোতে পারে না।

অন্ধকার একটা ঘরে এনে তার হাত ছাড়ল অণিমা। আলো জ্বালল না। বাগানের দিকে একটা মস্ত খোলা জানালা। জানালার ওপাশে হয়তো জ্যোৎস্না, কিংবা ফ্লুরোসেন্ট আলো। সেই আলোয় ছায়ামূর্তির মতো পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে অণিমা ডাকল—সোমেন।

—কী?

—এখন সেই কথাটা বলো।

সোমেন কেঁপে ওঠে। বোঝে যে অণিমা ঠাট্টা করছে না।

॥ ত্রিশ ॥

অণিমার সান্নিধ্য কোনওদিনই খারাপ লাগেনি সোমেনের। ওকে ভয় পাওয়ারও কিছু ছিল না। খুব ঠান্ডা মাথার মেয়ে অণিমা। সব সময়ে মুখখানা সিরিয়াস করে বিচ্ছুর মতো ইয়ারকি দেয়।

কিন্তু এ অণিমা যেন সে নয়।

অণিমা ফিরে তাকাল। আবছা অন্ধকারে ওর মুখচোখ দেখা যায় না। কিন্তু শ্বাসের শব্দ আসে। অণিমা খুব নার্ভাস আজ! যেন বা শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, এমনভাবে নাক টানল। বলল—বললে না?

সোমেনের গলার স্বর অন্যরকম হয়ে গেল। সে প্রায় ধরা গলায় বলে—কোন কথাটা? অণিমা জানালার দিকে পিছন ফিরে জানালার গ্রিল-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাত দুটো তুলে পিছনে মুড়ে জানালার গ্রিল ধরে আছে। ভঙ্গিটা শিথিল, কেমন যেন। বলল সেই কথাটা। যেদিন চাঁদ উঠবে, ফুল ফুটবে, লোডশেডিং থাকবে, সেদিন আমরা দুজন দূরে কোথাও গিয়ে

—ও। বলে হাসল সোমেন। প্রাণহীন হাসি।

— কথাটা কিন্তু কোনওদিনই বলোনি।

—আজ কি বলব অণিমা?

—বলো। কেন, শুনে কী হবে?

—শুনতে ইচ্ছে করছে। কেউ তো কোনওদিন বলেনি।

—যাঃ। তোমাকে অনেকে বলেছে।

অণিমা একটু হাসল, বলল—বললেই বা। তুমি তো বললানি।

—ভয় পেতাম অণিমা। যা মেয়ে তুমি, শুনেই হেসে উঠবে হয়তো।

—নইলে সিরিয়াসলি বলতে?

সোমেন উত্তর দিল না।

একটা ফোঁপানির মতো কাঁপা শ্বাস ফেলে অণিমা বলে—আমি খুব ইয়ারকি করি, না?

আর তৎক্ষণাৎ ঘটনাটা ঘটল বজ্রপাতের মতো। সোমেন জানত না, এতটা হবে।

ঘরের মাঝ বরাবর দাঁড়িয়েছিল সোমেন, প্রতিরোধহীন। জানালার চৌকো আলোর পরদায় ছায়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল অণিমা। হঠাৎ অণিমার ছায়া খসে পড়ল। নিঃশব্দ, নরম পায়ে অণিমা ছুটে এসে হঠাৎ দুটো জোরালো হাতে সোমেনের দু-কাঁধ খামচে ধরল আশ্লেষে, টেনে আনল নিজের দিকে। অন্ধকারে একটু বুঝি সময় লাগল অণিমার। সোমেনের ঠোঁট দু-খানা খুঁজতে। তারপরই সোমেন দু-খানা তুলোর চেয়েও নরম, উত্তপ্ত, আঠালো ঠোঁটের স্বাদ পেল নিজের ঠোঁটে।

বিশ্বাস হয় না। তবু ঘটনাটা ঘটছে। এমন নয় যে, সোমেন কাউকে কখনও চুমু খায়নি। কিন্তু অণিমা এত অন্যরকম। কী করে হয়! ভেবে কাঠের মতো হয়ে গেল সোমেন। শরীরে থরথরানি, কিন্তু আড়ষ্ট, ভীত। কী গভীর ঝড়ের মতো শ্বাস ফেলল অণিমা তার মুখে। সেই শ্বাসের বাতাস এত গরম যেন চামড়া পুড়ে যায় সোমেনের। অণিমার শরীরের ভিতরে বুঝি জ্বর? ভয়ংকর এক জ্বর! দুই হাতে সোমেন অণিমাকে ধরতে যাচ্ছিল বুঝি। অণিমা তখন সরে গেল আচমকা।

জানালায় ঠিক আগের মতো হয়ে দাঁড়াল। সোমেনের দিকে পিঠ। আস্তে করে বলল—এটা কিন্তু ইয়ারকি নয়।

অণিমার গলাটা ধরা-ধরা। প্রবল শ্বাস। হাঁফাচ্ছে। সোমেন হাতের পিঠে ঠেটি মুছে নেয়। কিছু বলার নেই। জীবনে এরকম কিছু কিছু ঘটনা ঘটে যার কোনও অর্থ হয় না। আর কি কোনওদিন সোমেন ইয়ারকি করতে পারবে অণিমাকে নিয়ে? কেমন যেন মন খারাপ হয়ে গেল সোমেনের। বলল—তুমি পাগল আছ, মাইরি!

অন্ধকারেই অণিমা একবার ফিরে তাকাল তারদিকে। একবার নাক টানল। তারপর খুব সহজ হয়ে একবার বলল—ও ঘরে যাও সোমেন। গাব্বু আজ পড়বে না।

করিডোরটা পার হয়ে সামনের ঘরে আসবার পথটুকুতে সোমেন তার শরীরে অণিমার গন্ধ পাচ্ছিল। অণিমার গায়ে কোনও দামি সুগন্ধী ছিল, মুখে ছিল রূপটান। এসব অণিমা বড় একটা মাখে না। আজ কেন মেখেছিল কে বলবে? সবচেয়ে বেশি সজাগ হয়ে আছে সোমেনের ঠোঁটে অণিমার মুখের স্বাদ। সেই সঙ্গে একটা অনিচ্ছুক, কিন্তু তীব্র কামবোধ। শরীর তো মনের বশ নয়। সোমেনের বুকের মধ্যে একটা ধুকধুকুনি উঠেছে, চোখেমুখে রক্তোচ্ছাস। বাইরের ঘরের আলো আর অনেক চোখের চাউনির মধ্যে এসে দাঁড়াতেই তার বড্ড লজ্জা হতে লাগল।

ঘরের মাঝখানে ম্যাক্স দাঁড়িয়ে আছে। হাতে একটা চোথা কাগজ। চোখ দুটোয় নীল আগুন। ওই আগুনের রহস্য আজও ভেদ হয়নি সোমেনের কাছে। ওই নিরীহ রোগা সাহেব লোকটার চোখ ওরকম জ্বলে কেন? কাগজ হাতে ম্যাক্স দাঁড়িয়ে চারধারটা ওই আগুনে-চোখে দেখে নিচ্ছিল।

ঘরের কোণে একটা প্রকাণ্ড গোল টেবিলের ওপর বসেছিল অপালা। ঝুটো হারের লকেটটা মুখে পুরে চুষছে। সোমেনকে বড় বড় চোখের দৃষ্টিতে প্রায় ছ্যাঁদা করে দিল। ঝামরে বলল—কোথায় গিয়েছিলি?

পূর্বা সোফায় অনিল রায়ের পাশে বসে আছে। মুখ ফিরিয়ে বলল—ও তো প্রাইভেট টিউটর এ বাড়ির, জানিস না?

সে কথার কোনও উত্তর দিল না অপালা। বড় স্থির চোখের চাউনিতে তাকিয়ে থেকে বলল—এখানে এসে চুপ করে বোস। ম্যাক্স একটা কবিতা পড়বে।

অনিল রায় হাত তুলে বললেন—চুপ। হাশ্ সায়লেন্স।

গোলটেবিলের ওপর অপালার পাশে উঠে বসে সোমেন। ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করে ম্যাক্স কবিতা লেখে? জানতাম না তো।

অপালা মাথা নেড়ে বলে—লেখে। আরও কত কী করে!

বাঙালির চেয়ে কয়েক পরদা গম্ভীর বাজ ডাকার মতো গুরগুরে গলায় ম্যাক্স কবিতা পড়তে শুরু করে। কবিতার নাম—গ্র্যান্ড রেস্টুরেন্ট। ইংরেজি কবিতাটার অর্থ এরকম—আমি একদিন গ্র্যান্ড রেস্টুরেন্টে যাই।

তখন সকালবেলা। রেস্টুরেন্টে লোকজন ছিল না। কী চমৎকার সেই দোকানঘর! দেয়ালে দেয়ালে সুরেলা রং। কাচের তৈরি সব জানালা দরজা। মেঝেতে পুরু কার্পেট। একধারে নাচের জায়গা। টেবিল-চেয়ারগুলি কী চমৎকার। সেই সকালেও ব্যান্ড বাজছে রেস্টুরেন্টে। সেই সুর শুনে মনে হয়, পৃথিবীর সব দুঃখ বুঝি ঘুচে গেছে। আমি সেখানে বসে রইলাম অনেকক্ষণ, মনটা বড় ভাল হয়ে যাচ্ছিল। তারপর আমার একবার ল্যাভেটারিতে যাওয়ার দরকার হলে আমি বেয়ারাকে ডেকে বললাম—তোমাদের ল্যাভেটারি কোনদিকে? লোকটা খুব বিনীতভাবে আমাকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দিল ল্যাভেটারিটা, দূর থেকে। আমি ল্যাভেটারির দরজা খুলে ঢুকেই কিন্তু শিউরে উঠলাম। এ কী নরক চারদিকে! মেঝের ওপর পড়ে আছে শেষ রাতের মাতালের বমি, বেসিনের গায়ে ফাটা আর ময়লার দাগ। মেঝেয় জল জমে আছে। আয়নাটা নোংরা। তেমন নোংরা ওদের কমোড। আমি দৌড়ে ফিরে এলাম, সোজা গিয়ে ম্যানেজারের সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগলাম—কেন তোমার সামনের দোকানটা এত ঝকমকে? আর কেনই বা তোমার ল্যাভেটারি এত নোংরা? কেন তোমার ল্যাভেটারিটাও নয় তোমার রেস্টুরেতে মতোই পরিষ্কার? আমি এই কথা চিৎকার করে যত বলি, লোকটা তত অসহায়ের মতো বলে—আমি কী করব, তামার কী করার আছে?

কয়েকজন ক্ষীণ হাততালি দিল। বোঝা গেল যে, কেউ কিছু বোঝেনি।

অপালা সোমেনের কানে কানে বলে—কী সব পড়ল রে? বাথরুমটা নোংরা বলে অত রাগ কেন?

সোমেন খানিকটা স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। হঠাৎ সম্বিৎ পেয়ে বলল—ওটা আসলে বাথরুম নয়।

—তবে কী?

—সভ্যতার অভ্যন্তর। সভ্যতার বাইরের দিকটাই চকচকে, ভিতরটায় নোংরা জমে যাচ্ছে।

অপালা চোখ বড় বড় করে বলে—বাঃ, তুই তো বেশ কবিতা বুঝিস।

সোমেন মাথা নেড়ে বলে—আমি বেশি বুঝি না, তবে তোরা কিছু কম বুঝিস।

—আমরাও কিছু কম বুঝি না। বলে অপালা বড় বড় চোখে একবার সোমেনের দিকে দেখে নিয়ে মুখটা ফিরিয়ে বলে—মেয়েদের কাছে তোর এখনও ঢের শেখার আছে।

কবিতার মাঝখানে কখন যেন অণিমা ঘরে এসেছে। একটু ঘুরল এদিক-ওদিক। ম্যাক্স যে মোড়ায় বসে আছে তারই পাশে মেঝের ওপর বসল দীনদরিদ্রের মতো। মুখখানা এখনও বুঝি একটু লাল। আর কিছুটা অন্যমনস্ক। সোমেনের চোখে চোখ পড়ল একবার। একটু ক্ষীণ হাসল। চোখ সরিয়ে নিল আস্তে আস্তে। কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যেই ওর কি কিছু পরিবর্তন ঘটে গেল? লজ্জা করছিল সোমেনের।

চায়ের আর বিস্কুটের ট্রে নিয়ে চাকর এল ঘরে। সবাই চা নিচ্ছে, ঘরের মাঝখানে একটু হুড়োহুড়ি। কেবল সোমেন চা নিতে উঠল না, অণিমাও নয়। সোমেন ভাবে—আমরা অন্যরকম হয়ে গেলাম। এরকমই কি হওয়া উচিত ছিল? এটা কি স্বাভাবিক! ভাবতে গেলে অস্বাভাবিক কিছু নয়। বয়সের ছেলেমেয়ে, হলে দোষ কী? কিন্তু মনটা কখনও প্রস্তুত ছিল না তো সোমেনের! প্রেম নিয়ে কত ঠাট্টা করেছে তারা। বিপজ্জনক সব ঠাট্টা। মনে কিছু থাকলে কি ওরকম ঠাট্টা করা যায়!

চায়ের পর রিহার্সাল শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু হুল্লোড়ে তা আর হল না। এখন নিছক আড্ডা চলবে। সোমেনের কিছুক্ষণ একা হয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল। সকলের অন্যমনস্কতায় সে টুপ করে উঠে পড়ল

একসময়। দরজার কাছ বরাবর গিয়ে একবার চোর-চোখে ফিরে তাকাল। দেখল আর কেউ নয়, কিন্তু অণিমা ঠিক অপলক চোখে চেয়ে আছে।

সোমেন মুখটা ফিরিয়ে নিল। বারান্দা পার হয়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতেই অণিমার ডাক শুনতে পেল—শোনো।

সোমেন দাঁড়ায়—কী?

—গাব্বুকে এরপর পড়াবে তো?

সোমেন যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক গলায় বলে—পড়াব না কেন?

অণিমা একটু হেসে বলল—ভয় ছিল, তুমি—তোমার খুব রাগ হয়নি তো!

সোমেন মাথা নেড়ে বলে—না তো! তবে কেমন অন্যরকম লাগল অণিমা।

—বোকা, অন্যরকম আবার কী! তুমি ভারী উলটোপালটা মনের ছেলে।

—এতকাল টের পাইনি তো কিছু।

—সে তোমার বোঝার দোষ। কিছু ভুল হয়নি সোমেন। আমি তোমাকে জানাতে চাইছিলাম। হয়তো কাজটা নির্লজ্জ হয়েছে।

সোমেন মুখ তুলে অণিমাকে দেখল। বেশ সুন্দরীই অণিমা। বয়স সোমেনেরই মতো। তাদের ভালবাসা হতে কিছু আটকায় না। তবু কেন যে সোমেনের মনটা দোমড়ানো কাগজের মতো হয়ে আছে! তাতে অনেক ভাঁজ, অনেক আলো অন্ধকারের ইকড়ি-মিকড়ি। কোথায় যেন আটকাচ্ছে।

—চলি। সোমেন বলল।

অণিমা বুঝি কিছু আকুলতাভরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে আসতে বলে—শোনো, আর একটা কথা।

—কী?

—তোমার কোনও ভয় নেই। আমি ভূতের মতো তোমার ঘাড়ে ভর করব না।

—বুঝলাম না আণিমা।

— বলছি। আজ যা করেছি তা একটা স্মৃতিচিহ্নের মতো রইল।

সোমেন অবাক হয়ে বলে—তার মানে?

অণিমা হাসল। আকাশে জ্যোৎস্না রয়েছে। সেই জ্যোৎস্নায় বড় ম্লান দেখাল হাসিটি। বলল—আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। বৈশাখে। কাউকে এখনও জানাইনি। তোমাকে জানালাম প্রথম।

সোমেনের শরীরে একটা বিদ্যুৎ স্পর্শ করল হঠাৎ। বাতুলের মতো চেয়ে থেকে সে বলে—কী বলছ অণিমা?

—সত্যি সোমেন। গাড়ি-বাড়িঅলা এক ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে।

সোমেনের বুকটা হঠাৎ বায়ুশূন্য হয়ে যায়। দম নিতে কষ্ট হয় তার। বড় আশ্চর্য ব্যাপার। একটু আগে অণিমা যখন চুমু খেয়েছিল তখন থেকে এই সময়টুকুর মধ্যে তার মনে মনে একটা প্রত্যাশা তেরি হয়েছিল। তার ভিতরে যেন সর্বদাই বাস করে অন্য এক সোমেনের যার সঙ্গে এই সোমেনের ইচ্ছের মিল নেই। সেই অন্য সোমেন বুঝি এই ক্ষণেক সময়টুকুতেই অণিমাকে নিজের বলে চিহ্নিত করে রেখে দিয়েছিল। ভিতরের সেই সোমেনটাই এখন মার খেয়ে মুষড়ে ওঠে।

—তা হলে আজকের ব্যাপারটা কেন করলে অণিমা?

অণিমা ঘন গভীর শ্বাস ফেলে একটা। বলে—তোমাকে জানিয়ে দিলাম যে, জীবনে আমি কত অসুখী হব। ওরকম না করলে তুমি বুঝতে না সোমেন। এখন বুঝবে। মনে রাখবে।

হঠাৎ সোমেন তার ভুবনজয়ী হাসিটা হাসে। বলে—ধ্যাৎ। তুমি ভারি ইমোশনাল, এমন তো ছিলে না?

অণিমাও হাসে। হঠাৎ ডান হাতখানা বাড়িয়ে পাকা জুয়াড়ির মতো গলায় বলে—কুইটস।

সোমেন হাতটা ধরে। বলে—শোধবোধ।

অণিমা হাতটা ছেড়ে দিয়ে বলে—এসো সোমেন। গাব্বুকে পড়িও। লজ্জার কিছু নেই। সোমেন মাথা নাড়ল।

নির্জন বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সোমেন ভাবে—অণিমার হাতটা কেন অত ঠান্ডা?

সোমেন বড় অস্থির বোধ করে। অনেক দূর রাস্তা আপনমনে হাঁটতে থাকে। মাথাটা গরম হয়। একবার নিজের থেকেই হেসে উঠল সে। একবার মাথা নেড়ে বলল—আহা রে। এবং প্রথম বুঝতে পারল, অণিমার বিয়ে হয়ে গেলে তার মন খুব খারাপ লাগবে। বড্ড একা লাগবে তার।

কয়েক দিন ধরে মনটা খারাপ রইল সোমেনের। একটি মুহূর্তের ঘটনাটুকুকে কিছুতেই ব্যাখ্যা করা গেল না। বার বার ম্লান জ্যোৎস্নায় অণিমার প্রেত হাসিটুকু মনে পড়ে। বুকটা বায়ুশূন্য হয়ে যায়।

কয়েকদিন গাব্বুকে পড়াতে গেল না সোমেন। খুব আড্ডা দিয়ে বেড়াল এদিক-ওদিক। কিন্তু মনের মধ্যে কেবলই বুকচাপা দম আটকানো কষ্ট হয়। এই বয়সের মধ্যে সোমেন কখনও এমন গভীর কষ্ট ভোগ করেনি। বার বার ভাবে, একটা সিদ্ধান্তে আসতে চেষ্টা করে। কিন্তু কিছু হয় না। কষ্টটা থেকে যায়। ঘুমের মধ্যেও ছটফট করে সোমেন। যখন জেগে থাকে তখন বড় আনমনা হয়ে থাকে। অণিমা সবই স্পষ্ট করে বলেছে তাকে। তবু সসামেনের বড় ঝাপসা লাগে। মাঝে মাঝে তার পাগলামি করতে ইচ্ছে করে।

আবার একদিন গাব্বুকে পড়াতে গেল সোমেন। যতক্ষণ পড়াল ততক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে রইল, বারবার ফিরে তাকাল দরজার দিকে। অণিমার দেখা পাওয়া গেল না। গাব্বুকে অণিমার কথা জিজ্ঞেস করতে তার ভয় হচ্ছিল, যদি গাব্বু কিছু টের পেয়ে যায়!

দু-চারদিন পড়ানোর পর একদিন ধৈর্য হারিয়ে জিজ্ঞেস করে ফেলল সোমেন—তোমার দিদিভাই কোথায়?

মোটাসোটা ফরসা আর খুব স্মার্ট ছেলে গাব্বু। চোখে কথা খেলাতে পারে। মিচকি হেসে বলে—আপনি জানেন না! দিল্লি গেছে পিসির বাড়ি বেড়াতে।

সোমেনের আর কিছু বলার থাকে না। সে কেবল ক্রমে একজন দুঃখী যুবকের রূপ ধরতে থাকে। একটা চুমু কি ভীষণ ট্র্যাজিক হতে পারে!

এই দুঃখের দিনে আচমকা একটা ঘটনা ঘটে গেল একদিন।

॥ একত্রিশ ॥

আজকাল কেমন বিকেলবেলার মতো বিষয় হয়ে থাকে সোমেনের মন। মনের মধ্যে যেন এক বাসাবদল চলছে। নিজের ঠাঁই ছেড়ে মন চলল কোথায়! চৈত্রের বুক-শুকনো করা গরম বাতাস বয় এখন। সারা গায়ে ধুলো মেখে পিঙ্গল হয়ে থাকে কলকাতা। গাছপালাহীন শানবাঁধানো শহরের আবহে জ্বোরো রুগির গায়ের তাপ। দীর্ঘ গ্রীষ্মকাল আসছে। ঋতুর এই পরিবর্তন তেমন লক্ষ করে না সোমেন। অন্যমনস্কতাই তার সঙ্গী আজকাল। একটি চুম্বনে তাকে বিদীর্ণ করে দিয়ে গেছে অণিমা।

মাঝে মাঝে শীত করার মতো শিউরে ওঠে গা। মাঝে মাঝে তাকে চাবুক মারে স্মৃতি। মনে পড়ে সেই পাগল চুমু-খাওয়া। কোনও মানে হয় না। এও কি অণিমার কোনও ইয়ারকি। এক-একবার ইয়ারকি বলে মনে হয়। তখন বুকে একরকমের কষ্ট টের পায়। যখন ভাবে, ইয়ারকি নয়, তখন একরকমের রহস্যের ঘন গন্ধ ভরে ওঠে বুক।

মানুষের ভিতরে এক অনন্ত জগৎ রয়েছে। নিজের ভিতরে ডুবুরির মতো নেমে যেতে সারলে দেখা যায়, এক ক্ষ্যাপা সেখানে আজব শহর-বন্দর তৈরি করে রেখেছে। অকল্পনীয় সব রঙের বুরুশ ঘষে চারদিক রঙিন করে রেখেছে সে। সেখানে অদ্ভুত সব মানুষের আনাগোনা—যাদের আর কোনওদিন পাওয়া যাবে না। সেখানে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে। নাটকের মতো, বায়োস্কোপের মতো। একটা চুমু-খাওয়া তেমন কিছু আণবিক বিস্ফোরণ নয়, তবু বজ্রপাতের মতো মাঝে মাঝে গর্জে ওঠে সেই চুম্বনের স্মৃতি। মাথার মধ্যে ঝলসে ওঠে নীল ফসফরাস। অণিমা কি তাকে ভালবাসত? নাকি ইয়ারকি করে গেল? তার চব্বিশ পূর্ণ হওয়ার জন্মদিনে ও কীরকম উপহার অণিমার, ক্ষতচিহ্নের মতো চিরস্থায়ী? মনের সেই অলীক ক্ষ্যাপা জগতে অণিমার উষ্ণ শ্বস কুসুমগন্ধের মতো ছড়িয়ে থাকে। নাড়া-খাওয়া গাছের মতো কেঁপে ওঠে সোমেন। শীত করে ওঠে গায়ে কাঁটা দিয়ে এই চৈত্রেও।

অণিমাকে ভালবাসার কথা কখনও তেমন ভাবেনি সোমেন ইদানীং। এখন নাগালের বাইরে গিয়েই কি শতগুণে ফিরে এল অণিমা।

গাব্বুকে পড়াতে যায় ঠিকই। মাস—মাইনে হাত পেতে নেয়, অবিকল টিউটরের মতো। অণিমা থাকলে এই হীনমন্যতাটুকু আসত না। মাসে একশো টাকা না পেলেও চলে যাচ্ছিল একদিন। এখন ওই একশো টাকার একটা বাজেট তৈরি হয়ে গেছে মাসে। মায়ের একপো দুধের দাম, নিজের সিগারেট-দেশলাই, লন্ড্রি কিংবা রেস্টুরেন্ট, কিছু পত্র-পত্রিকা। এই দুর্দিনে একশো টাকার টিউশনি ভাবাই যায় না। স্কুল-কলেজ ছেড়ে বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। কৃষিবিপ্লবের জন্য গ্রামীণ ভারতে ডাক দেওয়া হচ্ছে ছেলেদের। কলকাতার ছেলেরাও দেয়ালে দেয়ালে সেইসব কথা লিখল ঠিকই, কিন্তু স্কুল-কলেজ ছাড়ল না। পরীক্ষাটাকেই আরও সহজ করে নিল তারা। আগুন বোমা, গুলি আর ছুরি ঝলসে ওঠে চারদিকে। স্কুল-কলেজে ছাত্ররা বই

খুলে পরীক্ষায় বসে। এ অবস্থায় প্রাইভেট পড়বে কে, কোন দুঃখে! পাস করা অনেক সহজ হয়ে গেছে এখন। অণিমার দেওয়া টিউশনিটা তাই বড় দুর্লভ বলে মনে হয়।

অন্যমনস্কতার মধ্যেই সেদিন গাব্বুকে পড়িয়ে ফিরছিল সোমেন। এই সব ভাল পাড়ার ভিতরে আলোর চেয়ে অন্ধকারই বেশি। খুব নির্জন। গাছপালার ছায়ায় ঘনায়মান রহস্য। একলা হাঁটতে একটু ভয় করে। কখন নিরালা ফুঁড়ে প্রেতের মতো কয়েকজন এসে ঘিরে ধরবে চারদিক থেকে, ওরা চলে গেলে পড়ে থাকবে সোমেনের লাশ। চারদিক দেখে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে সোমেন আবার মনের মধ্যে ডুবে হাঁটছিল। মনের মধ্যে এক ক্ষ্যাপার তৈরি জগৎ। দুঃখের বা পিপাসার কোনও রং নেই। কিন্তু মনের মধ্যে সেইসব অলীক রঙের আভা ঠিকই ধরা পড়ে। কত কথা ভাবে সোমেন! বুড়োমানুষদের এরকম হয়, আর কিছুই ঘটবে না, তাই তারা অতীতের স্মৃতি নিয়ে থাকে। সোমেনেরও সেই দশা আজকাল। যেন বা, যা ঘটার ঘটে গেছে জীবনে। এখন আছে শুধু তার স্মৃতি। সোমেন আজকাল বড় ভাবে।

সামনেই রাস্তার আলোর স্তম্ভ। তার নীচে গাছের ঘন এবড়ো-খেবড়ো ছেঁড়া ছায়া। সেই ছায়ায় একটা মস্ত লম্বা গাড়ি এসে ধীর হয়ে থামল। পিছনের দরজা খুলে কে যেন নামছে। লক্ষ করার মতোই দামি বিদেশি গাড়ি, অঢেল কালো টাকায় কেনা। সোমেন অবহেলাভরে একবার মুখ তুলে দেখল। গাড়ির পিছনে দামি জড়োয়া গয়নার মতো লাল আলোর অলংকার একবার উজ্জ্বল হয়ে নিল।

আধো অন্ধকারে সোমেন পেরিয়ে যাচ্ছিল গাড়িটা। যে মেয়েটি গাড়ি থেকে নেমেছে সে ঝুঁকে গাড়ির সিট থেকে তার ব্যাগ কুড়িয়ে নিয়ে সোজা হতেই সোমেনের মুখোমুখি দেখা। এত আবছায়ায় চিনবার কথা নয়। তবু বলল—আরে! আপনি!

রিখিয়া! সচেতন হয়ে সোমেন চেয়ে দেখল, এই তো রিখিয়াদের বাড়ি। সে অন্য মনস্কতায় পেরিয়ে যাচ্ছিল। কোনও ভুল নেই। রাস্তার আলো পড়েছে রিখিয়াদের ঘের-দেয়ালের গায়ে। তাতে আলকাতরা দিয়ে লেখা—প্রতিশোধ, প্রতিরোধ, প্রতিবাদ কমরেড, গড়ে তোলো, গড়ে তোলো, গড়ে তোলো ব্যারিকেড। এই কথাটা রিখিয়াদের দেয়ালে সে তো দেখছে।

চুমকি বসানো কী একরকম শাড়ি পরেছে রিখিয়া, অন্ধকারেও চমকাচ্ছিল।

ভারি অপ্রস্তুত লাগছিল সোমেনের। সে কদিন দাড়ি কামায়নি। পরনে যদিও সেই বড়দির দেওয়া দামি প্যান্ট, আর বউদির দেওয়া শার্ট, তবু দুটোই চৈত্রের ধুলোয় বড় ময়লা হয়ে গেছে। বুকটায় পাখি ঝাপটাল। গলার স্বর হয়ে গেল অন্যরকম। বলল—যাচ্ছিলাম।

এটা কোনও জবাব হল না। রিখিয়া অন্যরকম বুঝল। বলল—কোথায় যাচ্ছিলেন? আমাদের বাড়ি?

যদি সোমেন 'হ্যাঁ' বলে এখন তবে হয়তো ভাববে—হ্যাংলা সেধে সেধে বাড়ি আসে। আর যদি 'না' বলে, তবে হয়তো ভাববে—ইস্, আমাদের জন্য একটুও ভাবে না তো!

সুসময়ে তো আসতই সোমেন। কিন্তু সুসময় তো আসে না।

সোমেন উত্তর না দিয়ে হাসল। তার সেই বিখ্যাত ভুবনজয়ী হাসিটি। দাড়ির জন্য চিন্তিত ছিল সোমেন। কিন্তু এও জানে, অল্প দাড়ি থাকলে তাকে যুবা বয়সের রবীন্দ্রনাথের মতো দেখায়।

রিখিয়ার কথা বলার সময়ে একটু মাথা নাড়ার রোগ আছে। তাতে ওকে খারাপ লাগে না। এখন মাথা নাড়ল, কানের ঝুটা ঝুমকো ঝিকিয়ে ওঠে। বলে—যাচ্ছিলেন না আর কিছু। আপনি প্রায় সময়েই তো এদিক

দিয়ে হেঁটে যান। আসেন না।

—তুমি দেখেছ?

—না দেখলে বললাম কী করে?

—ডাকোনি তো!

—আমি ডাকব কেন? যার আসবার আসবে।

এমন অভিমানের গলায় বলল! ছেলেমানুষ। নইলে অমনভাবে বলে? বুকের মধ্যে তোলপাড় করে ওঠে যে!

সোমেন কবজির ঘড়ি দেখে বলল—সাড়ে সাতটা বাজে। আর একদিন আসব।

—মায়ের খুব অসুখ।

—কী হয়েছে?

রিখিয়া কিন্তু হাসল। বলল—খুব কিছু নয়। মার তো নানারকম। এখন শ্বাসকষ্ট হয়। আর চোখে নাকি ভাল দেখছে না। ডাক্তার বলেছে, রেটিন্যাল হেমারেজ। সব্বাইকে দেখার জন্য পাগল। আপনার মাকে নিয়ে আসার কথা ছিল না? প্রায় সময়েই ননীবালার চুলের গল্প শুনি।

সোমেনের গলার স্বর তীব্র শ্বাসবায়ুর প্রভাবে কেঁপে গেল। বলল—আর একদিন—

রিখিয়া মাথা নাড়ে, বলে—তা কেন? এই তো দু-পা। মা এখনও ঘুমোয়নি।

সোমেনের চোখে পড়ল আবার সেই লেখাটা। কমরেড, গড়ে তোলো, গড়ে তোলো, গড়ে তোলো ব্যারিকেড। দারোয়ান গেটটা খুলে দিল। গাড়িটা আলো জ্বেলে বাঁক নিয়ে ঢুকে যাচ্ছে গ্যারেজে। একটা কুকুর ডেকে উঠল দোতলায়। সোমেন সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বলল—চলো। শৈলীমাসির কথা আমিও খুব ভাবি।

শান-বাঁধানো বাগানের একটুখানি রাস্তায় আগে হেঁটে যেতে যেতে রিখিয়া বলল—আহা! ভেবে ভেবে ঘুম হয় না বেচারির!

শৈলীমাসির ঘরে তেমনি কোমল অন্ধকার। সবুজ ঘেরাটোপে ঢাকা বাতিদান। ওষুধের গন্ধ, অডিকোলনের গন্ধ। খুব মৃদু শব্দ করে চলেছে এয়ারকুলার। সামান্য ঠান্ডা ঘর। নাইলনের সাদা মশারি ফেলা। বিছানার পাশে আজ একটা অক্সিজেন সিলিন্ডার দেখা যাচ্ছে। সিলিন্ডারের পাশে একটু মোটা মতো, লম্বা লোক গম্ভীরভাবে চেয়ারে বসে আছে।

ঘরে ঢুকে তাকে ডেকে রিখিয়া বলে—বাপি, এই হচ্ছে ননীমাসির ছেলে।

ভদ্রলোক একবার সোমেনের দিকে চাইলেন। চেনার কথা নয়। তার ওপর উনি উদ্বিগ্ন। বললেন—রাখু, উনি কিন্তু ট্র্যাংকুইলাইজারটা খেলেন না। ঘুমিয়ে পড়লেন।

সোমেন প্রণাম করবার জন্য উপুড় হয়ে ভদ্রলোকের পা খুঁজে পাচ্ছিল না মেঝের অন্ধকারে। একটা পা পেল, অন্যটা না পেয়ে চেয়ারের পায়ার হাত ছুঁইয়ে মাথায় ঠেকাল। উনি গ্রাহ্য করলেন না। স্ত্রীর জন্য বোধ হয় খুবই উদ্বিগ্ন। একবার তাকিয়ে বললেন—কে বললি?

রিখিয়া বোধ হয় বাপকে তেমন আমল দেয় না। আদুরে মেয়েরা এরকমই হয়। হঠাৎ একটা ঝাঁঝের গলায় বলল—বললাম তো। ননীমাসির ছেলে। চুলঅলা ননীবালার গল্প শোনোনি!

—ও। বলে উনি খুব গম্ভীর হয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ সোমেনের দিকে চেয়ে নালিশ করার মতো বললেন—অক্সিজেন নেওয়াটা ওর এক বাতিক। নাকে নল নিয়ে নিয়ে ঘায়ের মতো হয়ে গেছে—

সোমেন কী বলবে। চুপ করে রইল। যখন প্রণাম করছিল তখন ভদ্রলোক পা দুটো এগিয়ে দেননি। সেই রাগটা সোমেনকে খানিকটা উত্তপ্ত রেখেছে।

উনি রিখিয়াকে বললেন—রাতের খাওয়াটা আজ ঠিক খেয়েছেন। অন্য দিনের মতো গোলমাল করেননি।

রিখিয়া তার বাবার দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল কেবল। বলল—এখানে বসে অত কথা বোলো না। ডিস্টার্ব হয়।

উনি কিন্তু বসে রইলেন। কেমন একটু ঘোর-লাগা ভাব। পরনে একটা গোলাপি। পায়জামা, একই রঙের টিলা কোটের মতো জামা গায়ে। দেখে মনে হয় না যে লোকটার রুচি বা বুদ্ধি-সুদ্ধি আছে। অথচ কত টাকা করেছে। সোমেনের ভারী হিংসে হয়। বোধবুদ্ধিহীন এরকম কত মানুষ লাখ লাখ টাকা কামিয়ে নিচ্ছে বাতাস থেকে। ভদ্রলোকের কোনও ব্যক্তিত্বও নেই। মেয়ে তার সঙ্গে কেমন ঝাঁঝিয়ে কথা বলে! হয়তো বা ভদ্রলোক কিছুটা স্ত্রৈণও। অন্ধ কুকুরের মতো বসে আছে বশংবদ। মনে মনে নিজের বাবার সঙ্গে তুলনা করে দেখে সোমেন। বাবাকে অনেক মহৎ মানুষ বলে মনে হয়। সৎ, চরিত্রবান, শুভ্র মানুষ। মায়ের দেওয়া ছোট্ট চিরকুটটা যখন ব্যগ্রভাবে খুঁজে দেখছিলেন সেদিন তখনই সোমেন টের পেয়েছিল, মায়ের প্রতি বাবার মমতা এখনও কী গভীর। তবু ব্রজগোপালের চরিত্রে একটুও স্ত্রৈণতা নেই। অসফল মানুষ, তবু সোজা গনগনে মানুষ। শরীর শক্ত হাড়গোড় আছে।

সামান্য অ্যালকোহলের একঝলক গন্ধ আজও পেল সোমেন। অন্ধ কুকুরটা টলতে টলতে এল ঘরে। মুখ তুলে চাইল রিখিয়ার দিকে। না, চাইবে কী করে! ও তো দেখে না। কেবল শ্রবণ উৎকর্ণ করে বাতাস শু^কছে। রিখিয়ার বাবা হাত বাড়ালেন কুকুরটার দিকে। মৃদু গলায় বললেন—আয়!

কুকুরটা মাথা নামিয়ে লুটিয়ে পড়ল পায়ের কাছে। চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। সামনের দুটো পা নুলোর মতো বুকের ওপর জড়ো করে, পিঁছনের পা দুটো ছড়িয়ে অদ্ভুত আদরখেকো ভঙ্গিতে পড়ে আছে। রিখিয়ার বাবা চটিসুদ্ধ পা তুলে ওর গলার কাছটা রগড়াতে রগড়াতে বললেন—আজও খুব রিন্টুর কথা বলছিলেন। সে আসছে না কেন। দোষটা যেন আমার। সে যদি তার মা-বাবার কথা না ভাবে—

বলে উনি চাইলেন রিখিয়ার দিকে। রিখিয়া বুঝি চোখ দিয়ে একটু শাসন করল। বাইরের লোকের সামনে ঘরের কথা বলা ঠিক নয়। উনি তাই কথাটা শেষ করলেন না।

রিখিয়া সোমেনের দিকে চেয়ে বলল—মা তো ঘুমিয়েছে। আপনি এ ঘরে এসে বসুন।

কুকুরের ওপরে আদুরে পা রেখে ভদ্রলোক বসে থাকলেন অক্সিজেন সিলিন্ডারের পাশে। ফিরে ও দেখলেন না, সোমেন আর রিখিয়া কোথায় গেল। কিন্তু এই প্রথম সোমেনের কষ্ট হল লোকটার জন্য। মনে হল, সংসার থেকে লোকটা খুব বেশি কিছু পায়নি। ছেলে বিলেতে, স্ত্রী শয্যাশায়ী, মেয়ে আমল দেয় না। টাকা ছাড়া ওই লোকটার আছে কি? টাকা আর একা। আর বোধ হয় আদর করার জন্য একটা অন্ধ কুকুর।

রিখিয়ার বসবার ঘরে উজ্জ্বল আলো। টক টক করছে লাল উলের মস্ত পা-পোশ। উজ্জ্বল আলোয় এসেই সোমেনের লজ্জা করছিল। বলল—আমি আজ যাই—

—ও মা! কেন?

—রাত হয়ে গেছে।

—ইস্। কী লক্ষ্মী ছেলে! রাত আটটায় রোজ বাড়ি ফেরা হয় বুঝি!

—তা নয়। তোমাদেরও অসুবিধে।

—সেটা আমরা বুঝব। বসুন।

আসলে সোমেনের কেমন একরকম হচ্ছে। এ মেয়েটার বিয়ে হয়ে যাবে, আজ বাদে কাল যে কোনও দিন। প্রথমদিন যেমন একরকমের ভালবাসা বোধ করেছিল, আজ তেমনি একটা হতাশা মাখানো হিংসে হচ্ছে কেবল। মন বলছে—কমরেড, গড়ে তোলো, গড়ে তোলো, গড়ে তোলো ব্যারিকেড।

আজও একই জায়গায় পড়ে আছে অবহেলাভরে সেই পেনট্যাক্স ক্যামেরা। আজ শুধু লেনসের ওপর ঠুলি পরানো।

রিখিয়া হঠাৎ বলে—বাবা একটু ওইরকম।

সোমেন অবাক হয়ে বলে—কীরকম?

—সন্ধের পর বলে—কথাটা শেষ করল না রিখিয়া! আবার বলল—দাদার জন্যই।

মুখোমুখি বসল রিখিয়া। চুমকির শাড়ি আলো পেয়ে এখন আগুন হয়ে ঝলসাচ্ছে। মুখে আজ কিছু প্রসাধন। খোঁপাটা দোকানে বাঁধা, দেখলেই বোঝা যায়। চওড়া ব্যান্ডে বাঁধা বড় ঘড়ি বাঁ হাতে। হাতের তেলোয় একটু বুঝি মেহেদির রং। কী জীবন্ত চোখ। সোমেন চোখ সরিয়ে নেয়। মেয়েদের চোখের দিকে সে এখনও তেমন করে চাইতে শেখেনি।

—যতক্ষণ বাড়িতে থাকে ততক্ষণ ওই কুকুরটাকে নিয়ে থাকে।

সোমেন বুঝতে না পেরে বলে—কে? বলেই বুঝতে পারে, রিখিয়া তার বাবার কথা বলছে। মুখটা কিছু ভারাক্রান্ত রিখিয়ার।

সোমেন টপ করে বলে—তুমি কী নিয়ে থাকো সারাদিন? ক্যামেরা?

রিখিয়া বিষণ্ণতা থেকে নিজেকে তুলে আনে। একটু হেসে বলে—হ্যাঁ। খুব ছবি তুলি।

—পারো?

—ও মা! পারব না কেন?

—ও সব ক্যামেরায় তো অনেক গ্যাজেট থাকে।

—খুব সোজা। বলে রিখিয়া লাফিয়ে উঠে বলে—দাঁড়ান, আপনার একটা তুলে রাখি। ফ্ল্যাশটা চার্জ করতে দিয়েছি প্লাগে। আনছি।

রিখিয়া চলে যেতে ফাঁকা ঘরে এতক্ষণে যেন একটু হাঁফ ছাড়ে সোমেন। বুকটা কাঁফছিল ভীষণ। শ্বাস টানতেই একটা সুগন্ধ পেল। রিখিয়া ফেলে গেছে তার গায়ের ঘ্রাণ। এই গন্ধটুকু কি চিরকাল থেকে যাবে সোমেনের জীবনে, যেমন থেকে যাবে অণিমার সেই চুম্বনের স্মৃতি?

॥ বত্রিশ ॥

একা ঘরে সোমেন বসে আছে। এ ঘরে এয়ারকুলার নেই, মাথার ওপর পাখা ঘুরছে। বাতাসে শিস টানার শব্দ। ওই শব্দটুকু ছাড়া সারা বাড়িটা নিস্তব্ধতায় ডুবে আছে। কেবল ঘুরে যাচ্ছে পাখা। অক্লান্ত যান্ত্রিক।

শৈলীমাসির ঘরের দরজাটা আটকানো। দরজা খোলা থাকলে ঠান্ডাভাব বেরিয়ে যাবে বলে দরজায় যন্ত্র লাগানো আছে। আপনিই বন্ধ হয়ে যায়। ওই ঠান্ডা ঘরে শুয়ে আছে শৈলীমাসি, পাশে বশংবদ স্বামী। এই সময়টায় লোকটা একটু নেশা করে নিশ্চয়ই, মুখে কেমন ভ্যাবলা ভাব, রিখিয়ার বাবা বা শৈলীমাসির স্বামী বলে মোটেই মনে হয় না। এদের চেয়ে অনেক ভোঁতা চেহারা। লোকটার কথা কিছুতেই ভুলতে পারছে না সোমেন। এত টাকার ওপরে বসে আছে, তবু কেমন লক্ষ্মীছাড়া চেহারা। শোকাতাপা, সংসারে যেন কেউ নেই। অভিমানী কী! তার বাবা ব্রজোগোপালও অভিমানী।

বন্ধ দরজাটায় নখের আঁচড় আর কুঁই কুঁই একটা শব্দ আসছে। পাল্লাটা খুব হালকা নয়। সোমেন তাকিয়ে থাকে। দরজাটা দুলছে অল্প। নখে আঁচড়াচ্ছে কুকুরটা। দরজাটা ঠেল আসবার চেষ্টা করছে। দরজাটা খুলে কুকুরটাকে আসতে দেবে কিনা ভাবছিল সোমেন। তার দরকার হল না। কয়েকবার ধাক্কা দিয়ে দরজাটার দুলুনি বাড়িয়ে পাল্লার একটু ফাঁক দিয়ে ঘষটে কুকুরটা এ ঘরে এল। একটু ধীর গতি, সাবধানী। ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে আছে। কান দুটো খাড়া হয়ে আছে, ঘ্রাণ সজাগ, মুখ ওপর দিকে তুলে কিছু বুঝবার চেষ্টা করছে। কী যেন টের পেয়েছে! চেনা ঘরে অচেনা মানুষের গন্ধ। সোমেন একটু ভয় খায়। কামড়াবে না তো! অন্ধ মানুষেরা বড় ভাল লোক হয়। আজ পর্যন্ত কোনও অন্ধ মানুষকে খারাপ লোক হতে দেখেনি সোমেন। যত অন্ধকে সে দেখেছে তারা সবাই ভদ্র, বিনয়ী, নরম ও সহনশীল মানুষ। চোখ থাকলে তারা কে কীরকম হত, বলা শক্ত। কিন্তু অন্ধ হলে মানুষের মধ্যে ওই গুণগুলো জন্ম নেয় বোধ হয়। এই অন্ধ কুকুরটার মধ্যে সেই নিয়ম অনুসারেই হয়তো হিংস্রতা নেই।

জীবনে আর কোনও অন্ধ কুকুর দেখেনি সোমেন। দুটি চোখে গভীর ক্ষতচিহ্ন। চোখে জল গড়িয়ে পড়বার দাগ। যখন ছোট ছিল তখন কোনও নিষ্ঠুর ছেলে ওর চোখ দুটো গেলে দিয়েছে বোধ হয়। তাই হবে, নইলে কুকুর কখনও অন্ধ হয় না তো!

সোমেন সাবধানে ডাকে—আ—তু—

বনগাঁর ক্যাম্পে তারা কিছুকাল ছিল। বাবা তখনও চাকরি পাননি। সে সময়ে সংসারে নির্মম অভাব ছিল, কিন্তু ছেলেবেলাটা এমন যে কিছুই গায়ে লাগে না। নতুন পৃথিবীর শব্দ গন্ধ বর্ণ সব দুঃখ ভুলিয়ে রাখে। কষ্টে ভাত জুটত তখন। তবু সেই ভাতের শেষ গ্রাসটা কখনও খায়নি সোমেন। মুঠ করে নিয়ে দৌড়ে ঘাটলার দিকে যেতে যেতে হাঁক পাড়ত —আ—তু—। কোথাও কিছু নেই, সেই ডাকের জাদুতে ঠিক আঁদাড়-পাঁদাড়

ভেঙে কচুবন মাড়িয়ে ভাঙা বেড়ার ফোকর দিয়ে দুটো দিশি কুকুর ছুটে আসত। খাড়া কান, ল্যাজ নড়ছে, চোখে নিবিড় লোভ।

এ কুকুরটা তেমন নয়। লোভ নেই। কিন্তু ডাক শুনে ল্যাজ নাড়ল প্রবলভাবে। এক-পা দু-পা করে কাছে আসতে থাকে। আসে ঠিক, ভুল দিকে যায় না। মাটি শুঁকে শুঁকে এসে মুখ তোলে কোলের কাছে। খুব আদরখেকো কুকুর। তেজ-টেজ নেই। সোমেন ওর মাথায় হাত রাখতেই 'কুঁ কুঁ' একটা শব্দ গলায় তুলে আদুরে ভাবে ভেজা নাকটা সোমেনের হাতে ঘষে দেয়, পায়ের কাছে বসে মুখটা তুলে রাখে ওপরে। সোমেন আর একবার মাথায় হাত দিতেই কুকুরটা চিত হয়ে শুয়ে পিছনের ঠ্যাং ছড়িয়ে দেয়, সামনের পা দুটো বুকের ওপর নুলো করে রেখে ঘাড় কাত করে শরীর ছেড়ে দেয়। এই হল ওর আদর খাওয়ার ভঙ্গি। সবই ঠিক আছে, কেবল চোখ দুটো নেই। তবু সবই বুঝি টের পায়। সোমেন নিচু হয়ে ওর গলার কোমল কম্বলে আঙুল দিয়ে খানিক আদর করল, তারপর বলল—যাঃ।

কুকুরটা গেল না। পায়ের ওপরে মাথা ঘষছে। বিরক্তি। সোমেন উঠে অন্য চেয়ারে গিয়ে বসে। কুকুরটা টের পায় ঠিক। গন্ধে গন্ধে কাছে আসে ফের। আদুরে শব্দ করে ভিখিরির মতো মুখ তুলে থাকে। সোমেন বিরক্ত হয়ে বলে—জানিস না তো, আমি এ বাড়ির কেউ নই, হতে পারতাম—

আচমকা কথা ফাঁকা ঘরে বলে ফেলেই চারদিকে চায় সোমেন। কেউ নেই। সোমেন কুকুরটার কাছ থেকে সরে বসে। ফের কাছে আসে কুকুরটা। জ্বালাতন।

বাইরের দিকে একটা ঝুলবারান্দা, অন্ধকার মতো। সোমেন সেখানে এসে দাঁড়ায়। হাতের নাগালে একটা নিবিড় আমগাছ। বৌলে ছেয়ে আছে। মাতলা গন্ধ। গাছ থেকে আধোঘুমে পাখিপক্ষীর ডানার শব্দ আসে। বাতাস বয়ে যাচ্ছে সাপের মতো হিলহিল করে। তার পায়ে নাক ঠেকিয়ে প্রণাম করে কুকুরটা ঊর্ধ্বমুখে প্রত্যাশায় লেজ নাড়ে।

সোমেন শ্বাস ছাড়ে। বলে—পেয়ে বসলি যে!

অন্ধদের নিয়ে তোলা একটা ডকুমেন্টারি ছবিতে সে দেখেছিল, অন্ধ মানুষকে রাস্তা চিনিয়ে নিয়ে চলেছে পোষা কুকুর। ট্রাফিকের আলো দেখে থামছে, গাড়িঘোড়ার ব্যস্ত রাস্তা পার করে দিচ্ছে সাবধানে। আর এ কুকুরটা নিজেই অন্ধ।

হঠাৎ সোমেন নিচু হয়ে ওর গলার বকলশটা ধরল। তারপর চোখ বুজে থেকে ঠোঁট টিপে হেসে বলল—দেখি কেমন পারিস! চল।

কুকুরটা কী বুঝল কে জানে! কিন্তু হঠাৎ শরীর ঝাড়া দিয়ে উঠল। লেজ নাড়ছে, প্রবল কুঁই কুঁই শব্দ করছে। কিন্তু আস্তে আস্তে টেনে নিতে লাগল সোমেনকে। সোমেন চোখ খুলল না, কুঁজো হয়ে কুকুরটার টানে টানে হাঁটতে লাগল। যে ঘরে সোমেন বসেছিল সে ঘরে নয়, করিডোর দিয়ে অন্য কোনও ঘরে নিয়ে যাচ্ছে তাকে। কোথায়! রিখিয়ার ঘরে?

অচেনা বাড়ি। খেলাটা বিপজ্জনক। তবু চোখ খোলে না সোমেন। দেখা যাক না!

—ও কী! বলে চেঁচিয়ে উঠল রিখিয়া। আর সেই মুহূর্তেই ঝলসে উঠল ফ্ল্যাশগান-এর আলো।

চমকে সোমেন চোখ খোলে। রিখিয়ার ঘরের দরজায় সে দাঁড়িয়ে। অপ্রস্তুত অবস্থা। ভিতরে রিখিয়া, ঘরের ঠিক মাঝখানে। অবাক চোখ, হাতে ক্যামেরা।

সোমেন বলে—কুকুরটার কাছে ট্রেনিং নিচ্ছিলাম।

রিখিয়া ভ্রূ কুঁচকে বলে—কেন? ড্যাবা ড্যাবা দুটো চোখ তো রয়েছে।

—এমনি।

—এমনি না। মাথায় ছিট। যা চমকে গিয়েছিলাম না! বলে রিখিয়া হাসে। স্নিগ্ধ এক রকমের রাগহীন হাসি। বলে—কম্পোজিশনটা কিন্তু দারুণ হয়েছিল। প্রিন্ট করি, দেখবেন।

—ছবি তুললে?

—হুঁ। দাঁড়ান, আর একটা তুলি।

—এ ঘরে?

—হুঁ। বলে অন্যমনস্ক রিখিয়া তার ক্যামেরায় মুখ নিচু করে কী সব কলকব্জা নাড়াচাড়া করে।

তখন সোমেন মনে মনে বলে—তোমার শোওয়ার ঘরে আমার ছবি উঠবে? তা কি ভাল হয় রিখিয়া? ছবি তো দলিল হয়ে থাকবে। চিরকালের জন্য। সে ভাল নয়। আমি তো আসিনি তোমার ঘরে, কুকুরটা নিয়ে এসেছে। কেন, কে জানে!

ক্যামেরা ঠিক করতে করতে রিখিয়া বলে—বোকা লোকেরা ক্যামেরা দেখলেই কেমন ক্যাবলা হয়ে যায়। অমন চোরের মতো দাঁড়িয়ে আছেন কেন দরজায়? ওই বুককেশটার উপর হাতের ভর রেখে দাঁড়ান। পিছনে পরদা, পাশে ফুলদানি, ফ্রেমটা দারুণ হবে।

সম্পূর্ণ ক্যামেরামগ্ন চোখে চেয়ে রিখিয়া কপালের ওপর থেকে চুলের ঘুরলি সরিয়ে ভিউফাইন্ডারে চোখ রাখে।

—আমার ছবি দিয়ে কি হবে? সোমেন তখন বলে। মনে মনে বলে—আমার ছবি রাখবে কেন? আমি কে?

—কী আবার হবে! ছবি ভেজে খাব। রিখিয়া ঝাঁঝ দিয়ে বলে। আদুরে মেয়েদের এরকম রাগী স্বভাব হয় বটে। পরক্ষণেই রিখিয়া হেসে ফেলে বলে—আমি ভীষণ ছবি তুলি, সব জিনিসের। দাঁড়ান না!

ছেলেমানুষি একরকমের অভিমান বুকে মেঘলা ঘনিয়ে তুলল সোমেনের। সে মাথা! নেড়ে বলে—না। ছবি নয়।

—কেন?

—আমার ছবি ভাল ওঠে না।

—আচ্ছা দেখবেন, আমি কীরকম ভাল তুলে দিই!

সোমেন মাথা নাড়ল। আমি কি শুধু ক্যামেরার চোখ দিয়ে দেখবার! আমি কি কেবলই ছবি! শুধু পটে লিখা। আর কিছু নই! রিখিয়া! সোমেন মুখ ফিরিয়ে নিল।

সেই মুখ-ফেরানো অভিমানী মুখের ভঙ্গিমা দেখে রিখিয়ার ক্যামেরাটা আর একবার চমকায়। একটু হাসে রিখিয়া। বলে—রাগী বোকা মুখ তুলে রাখলাম।

সোমেন রাগে মুখ ফিরিয়ে বলে—তুমি বড় পাকা মেয়ে।

রিখিয়া রাগে না। ক্যামেরাটা তার বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে দেয়। অবশ্য ক্যামেরাটা চোট পায় না। ফোম রবারের গদির বিছানায় নিঃশব্দে লাফিয়ে উঠে কাত হয়ে থাকে। মস্ত একটা নিথর চোখ চেয়ে থাকে

সোমেনের দিকে।

রিখিয়া মৃদু হেসে বলে—পাকাই তো। সবাই বলে।

সোমেন কী করবে বুঝতে পারে না।

রিখিয়া তখন বলে—বসুন। চা আসছে।

—এ ঘরে?

রিখিয়া অবাক হয়ে বলে—বারবার এ-ঘরে এ-ঘরে করছেন কেন? এ ঘরটা আমার, অন্য কারও নয়। বসুন। বিছানাতেই বসুন।

এটা রিখিয়ার শোওয়ার ঘর। এ কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারে না সোমেন।

—শোওয়ার ঘরে কেউ বাইরের উটকো লোককে বসতে বলে! আপনজন হলে অন্য কথা। সোমেন মুখ ফেরানো অবস্থাতেই বলে। বুকে অকারণ অভিমান।

রিখিয়া অধৈর্যের গলায় বলে—বাব্বাঃ, আমার অত শুচিবাই নেই।

—থাকা ভাল। সোমেন জ্যাঠামশাইয়ের মতো মাতব্বরী গলায় বলে—বিয়ে হচ্ছে, এখন বালিকাবুদ্ধি থাকা ভাল নয়।

—কার বিয়ে হচ্ছে? বলে রিখিয়া ভ্রূ কোঁচকায়।

করিডোর দিয়ে বসার ঘরের দিকে হাঁটতে থাকে সোমেন। তার পায়ের শব্দ শুনে আসে কুকুরটা, পিছনে রিখিয়া।

সোমেন মুখ না ফিরিয়ে বলে—সব শুনেছি।

—কী? রিখিয়ার প্রশ্ন আসে।

—বিয়ে ঠিক হওয়ার কথা।

—ও! বলে রিখিয়া চুপ করে যায়।

সোমেন ফিরে তাকিয়ে বলে—খুব ভাল খবর।

রিখিয়ার মুখটা ছুটে পড়ছে। কিছু রাগে, কিছু বুঝি অপমানে।

বসবার ঘরে এসে বলল—বসুন। চা আসছে। ক্যামেরাটা কুড়িয়ে এনেছে। রাগ দেখানোর জন্যই শব্দ করে বুককেসের ওপর রাখল।

মুখোমুখি বসল। গলায় হারের লকেটটা তুলে দুই ঠোঁট চেপে ধরল। অন্যমনস্ক।

কিছু বলার নেই। সোমেন ভাবল, বিয়ের কথা শুনে খুশি হয়নি রিখিয়া। কথাটা ঘোরানোর জন্য সোমেন বলে—আমার ছবি সত্যিই ভাল ওঠে না, বুঝলে রিখিয়া!

—ওঠে না-ই তো।

রাগের কথা। সোমেন হাসল। কিছু বলার নেই, তাই বলল—ভাল ক্যামেরায় ছবি তোলা খুব শক্ত। তুমি তোলো কী করে?

এক চটকায় উত্তর দিল না। অন্যমনস্ক মুখটা আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে এল। আচমকা একটু হাসল সে। বোঝা গেল, ক্যামেরা ওর ভীষণ প্রিয়। বলল—ডেভেলপ আর প্রিন্ট করা আরও শক্ত। আমি সব নিজে করি। আমাদের ডার্করুম আছে।

শোওয়ার ঘরে গিয়ে কখন যেন চুমকি বসানো শাড়িটা ছেড়ে একটা গাঢ় কালচে লাল শাড়ি পরেছে সে। শাড়ি পালটানোর সময়ে ভাগ্যিস গিয়ে হাজির হয়নি সোমেন। ব্যাপারটা ভাবতেই লজ্জা করছিল তার। লাল শাড়িটাতেও কেমন মানিয়েছে! একদম বালিকা বয়স, অহংকারে ডগোমগো মুখ, হাঁসের মতো গলা উঁচু করে বসে আছে কিশোরী-দেমাকে। তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে, বুকের ভিতরে মায়া জন্মায়।

সোমেন অবাক হওয়ার ভান করে বলে—তাই নাকি! এইটুকু বয়সে!

রিখিয়া লকেটটা দাঁতে চেপে রেখেছিল। ছেড়ে দিয়ে বলল—বয়স কী কম! লকেটটা গড়িয়ে পড়ল ওর বুকের ওপর, ঢাকা দুটি কোমল স্তনের মাঝখানে।

সোমেন চোখ তুলে নেয়। বলে—এরকম আর কী কী জানো তুমি? গাড়ি চালাতে?

—ওমা! সোজা। অবশ্য লাইসেন্স নেই। ময়দানে গিয়ে চালাই। স্কুটারও পারি। বলে হাসল।

সোমেন সিগারেট ধরাল। কত কী জানো তুমি! আমি কিচ্ছু পারি না। ভারী লজ্জার কথা। তুমি এত জানো কেন? প্রিসিসন ক্যামেরায় অঙ্ক কষে ছবি তোলো, বড় গাড়ি চালাও, স্কুটার জানো। বড় পাকা মেয়ে। দূর, তোমার সঙ্গে আমাকে মানাত না।

—কে বলেছে শুনি! রিখিয়া হঠাৎ জিজ্ঞেস করে।

সোমেন চমকে ওঠে। মনে মনে বলা কথা সব শুনতে পেল নাকি ও?

—কে কী বলেছে? বোকার মতো জিজ্ঞেস করে সোমেন।

—ওই কথাটা! রিখিয়া নিজের হাতের পাতার দিকে চেয়ে বলে।

সোমেন একটু হাসে। বলে—বিয়ের কথা তো?

—তাই তো বলছিলেন।

সোমেন মাথা নেড়ে বলে—বাজে লোক বলেনি। শৈলীমাসি।

রিখিয়া কথা বলল না।

ফরসা কাপড়পরা চাকর ট্রে রেখে যায়। অনেক খাবার। ভারী ভাল চায়ের গন্ধ। খেতে ইচ্ছে করছিল না সোমেনের। তার ভিতর অনেক রকম ভাবনা চিন্তার চোরাস্রোত। ক্ষিদে মরে গেছে।

সোমেন চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে বলে—তোমার বিয়ের দিন এসে খাবার খাব। আজ নয়।

রিখিয়া একরকম ধমক-চোখে তাকায়। পরমুহূর্তে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলে—খুব খারাপ হচ্ছে কিন্তু।

হঠাৎ কি একটা আশা আকাঙক্ষা মায়া ভালবাসা অন্ধের মতো নড়ে ওঠে সোমেনের মধ্যে। আবহাওয়ার বার্তায় যেমন বলে, বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপ, ঝড় উঠবে।

সোমেনের চা চলকে যায়, একটুখানি, নামিয়ে রাখে কাপ।

বলে—আচ্ছা খাচ্ছি।

॥ তেত্রিশ ॥

কেমন এক অভিমানী মুখ নিয়ে বসেছিল রিখিয়া। পায়ের কাছে কুকুর, আর বুক-কেসের ওপর সেই ঝকঝকে আসাহি পেন্ট্যাক্স ক্যামেরা, কখন আবার কুড়িয়ে এনে রেখেছে। দৃশ্যটা ছবি হয়ে আছে। ওই অভিমানী ভঙ্গিতে এক ভিন্ন রকমের সৌন্দর্য ছিল। যেন ওই নতমুখ তুলে জলভারে আক্রান্ত তীব্র চোখে সোমেনকে দায়ী করে বলবে—কে বলল অন্য কোথাও আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে! তা কি হয়! তুমি বলো!

তা অবশ্য বলেনি রিখিয়া। কেন বলবে? সোমেনের ছেলেমানুষি মন কত কী ভেবে নেয়। এমনকী সোমেন বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারেনি ওই অভিমানী সুন্দর ভঙ্গির দিকে। মেয়েদের দিকে সোজাসুজি তাকাতে তার ভয় করে। সেই অবশ্যম্ভাবী ভিটামিনের অভাব তার মধ্যে আজও। রাস্তায়-ঘাটে অনেক পুরুষকে দেখেছে সোমেন, যারা মেয়েছেলে দেখলেই আত্মহারা হয়ে যায়। চোখের পলক না ফেলে, চারদিককে ভুলে গিয়ে হাঁ করে দেখে। দেখতে দেখতে আত্মজ্ঞান, চক্ষুলজ্জা, লোকভয় লুপ্ত হয়। তখন চিমটি কাটলেও টের পাবে না, অপমান করলেও গায়ে মাখবে না। মেয়েটা কী ভাবছে তাও ভেবে দেখে না। সোমেনের বন্ধু হেমন্তর সেবার চোখ খারাপ হল, তো অ্যাট্রোফিন চোখে দিয়ে ডাক্তারের চেম্বারে যাওয়ার সময়ে সোমেনকে সঙ্গে নিয়েছিল, পাছে আবছাচোখে কোনও দুর্ঘটনা ঘটে। কিন্তু দুর্ঘটনা একটা ছোট রকমের ঘটল ডাক্তারের চেম্বারেই। একটি অবাঙালি বিবাহিতা সুন্দরী তেজি মহিলা বসেছিলেন সেখানে। হেমন্তর কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেল। অ্যাট্রোফিন দেওয়া চোখে এমন ডেলা পাকিয়ে চেয়ে রইল যে মহিলার ভারী অস্বস্তি। বাঙালি মেয়েরা সাধারণত এমন অবস্থায় ভ্রূ কোঁচকায়, বিরক্তির ভাব করে। কিন্তু সরাসরি কিছু করে না। কিন্তু এ মহিলার ধাত অন্যরকম। কিছুক্ষণ হেমন্তর তাকানোটা লক্ষ্য করে হঠাৎ উঠে তেড়ে এল—আপনি ওভাবে তাকাচ্ছেন কেন? লজ্জা নেই, বেশরম? ঘর ভরতি লোকের সামনে কী যে বে-ইজ্জতী তা বলার নয়, হেমন্ত অবশ্য খুব বিনয়ের সঙ্গে বলল—আমার চোখে অ্যাট্রোফিন, কিছু দেখছি না। এ কথা শুনে দু-চারজন হাসতে থাকে, মহিলাও একটু থমকে যান। সেই ফাঁকে দুঃসাহসী হেমন্ত গলা একটু নিচু করে জোরাল শ্বাসধ্বনির শব্দে বলল—আপনি ভীষণ সুন্দর।

এ সবই হচ্ছে ভিটামিনের কাজ। মেয়েদের দিকে তাকানো, চালাক, চতুর কথাবার্তা, সংকোচহীন মেলামেশা। সেখানে সোমেনের কিছু খাঁকতি আছে। নইলে কিশোরী রিখিয়ার দিকে আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকা যেত, প্রশ্ন করা যেত—তোমার বিয়ে কি সত্যিই ঠিক হয়ে নেই?

সে প্রশ্ন করা হল না। রহস্য রয়ে গেল। বিয়ের কথায় কেন রেগে গিয়েছিল রিখিয়া? কেন ওই অভিমান? হয়তো তা টের পেয়েছিল অন্ধ কুকুরটা, দু-পায়ে কোলের ওপর শরীর তুলে মুখটা বাড়িয়ে শুনছিল রিখিয়ার কম্পিত শ্বাসের শব্দ। অস্পষ্ট সান্ত্বনার আওয়াজ করেছিল। অবোলা জীব, হয়তো বলতে চেয়েছিল—দুঃখ কোরো না রিখিয়ার মনের মতো বর আসবে। বুক-কেসের ওপর থেকে করুণ একটি চোখ মেলে ক্যামেরাটা

দেখেছিল রিখিয়াকে। বলেছিল—কেঁদো না রিখিয়া, সব ছবি আমার তোলা রয়েছে। কোথায় পালাবে তোমার প্রেমিক। তাকে বন্দি করে এনে দেব তোমার কাছে।

তাই আবার অন্ধ কুকুরটার কথা মনে পড়ে সোমেনের। মনে পড়ে, আসাহি পেন্ট্যাক্স ক্যামেরার একটিমাত্র চোখ। সে ঘরে আর একটু বসে থাকতে পারত সোমেন, হাতে কোনও কাজ ছিল না, রিখিয়াদের বাড়ির কেউ কিছু মনে করত না, তেমন রাতও হয়ে যায়নি। তবু সোমেনের মনে হতে লাগল, সে বড় বেশিক্ষণ আছে এদের বাড়িতে। দৃষ্টিকটু হচ্ছে কিশোরী রিখিয়ার সঙ্গে এতক্ষণ বসে থাকা। এবার তার চলে যাওয়া উচিত। সে এমনও ভাবল— এরা বড়লোক, এদের বাড়িতে থাকা ভাল নয় বেশিক্ষণ।

শুকনো সন্দেশ জল দিয়ে গিলে ফেলে সোমেন, সন্দেশের তেমন কোনও স্বাদ পায় না সে। দামি চায়ে চুমুক দিয়ে তার মনে হল, ভারী বিস্বাদ। খাবার খাওয়ার শাস্তিটুকু ভোগ করে সে খুব ব্যস্ততার ভাব দেখিয়ে উঠে গেল। যেন খুব তাড়া আছে এমনভাবে বলে—চলি।

রিখিয়া নতমুখে চেয়ে একখানা আদরের হাত রেখেছে কুকুরটার মাথায়। অন্য হাতে মাথার একগুচ্ছি চুল টেনে এনে আঙুলে ঘুরলি পাকাচ্ছে। ভঙ্গিতে একটা আভিজাত্য ফুটে আছে। একটু অহংকারও। সোমেনের গলা শুনে চোখ তুলল।

সেই তাকানোতে কী ছিল কে জানে! কিন্তু সোমেন কত কী ভেবে নিল। ভাবল, বুঝি রিখিয়ার চোখে বিতৃষ্ণা, বিরক্তি। রিখিয়া তাকে বুঝি পছন্দ করে না।

রিখিয়া তার কিশোরীসুলভ উঁচু স্বরে বলল—সবাই জেনে গেছে, না?

—কী?

—বিয়ের কথা?

—জানবে না কেন? ভাল খবর।

রিখিয়া আবার মাথা নত করে রইল। আর সোমেনের মনে হল, রিখিয়ার ভঙ্গিতে অবহেলা। উপেক্ষা। একটু দূরের মানুষ হয়ে যাওয়া।

সোমেন আবার বলল—চলি।

রিখিয়া মাথা নেড়ে বলে—আচ্ছা।

বলল না আবার আসবেন। একটু হতাশ হল সোমেন। ওটুকু অন্তত না বললে সোমেন। আসে কী করে! যদি রিখিয়া ডাকত, তবে আসত কোনওদিন। না ডাকলে কি বড়লোকদের বাড়িতে আসা যায় ঘন ঘন?

ব্যস্ততার ভান করে নেমে এল সোমেন। আলোছায়াময় রাস্তায় পা দিয়ে দেখে, গ্রীষ্মের বিকেলে কলকাতার সুন্দর হাওয়াটি বয়ে যাচ্ছে। কী নিবিড় ঝিরঝির স্রোতস্বিনীর মতো শব্দ উঠেছে গাছে গাছে। অবিরল বয়ে চলেছে সেই ঘুমপাড়ানি শব্দ। দূর থেকে রিখিয়ার কুকুরটা একবার ডাকল। পিয়ানোর মতো হর্নের শব্দ করে বিশাল এক গাড়ি সোমেনকে সতর্ক করে দিয়ে পাশ ঘেঁষে চলে যায়। চলন্ত গাড়ি থেকে রেডিয়োর গানের শব্দ এল। গাড়ির আলোয় দেয়ালের লিখনটি স্পষ্ট হল একবার। তারপর মিলিয়ে গেল। প্রতিশোধ, প্রতিরোধ, প্রতিবাদ কমরেড, গড়ে তোলো, গড়ে তোলো, গড়ে তোলো ব্যারিকেড।

রাস্তায় এসে সে মেনের যেন আর সময় কাটে না। রাস্তা ফুরোয় না। রিখিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিলে যেন আর কোথায় যাওয়ার থাকে না।

বহুদিন বাদে অণিমাকে আবার দেখল সোমেন, নাটকের দিন, মুক্ত অঙ্গনে। অবশ্য দূর থেকে দেখা। একটা দৃশ্যে অল্পক্ষণের জন্য মঞ্চে এল অণিমা। বয়স্কা প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকায় তার অল্পক্ষণের অভিনয়। এই দৃশ্যে বিভ্রম সৃষ্টি করার জন্য মঞ্চে খুব মৃদু আলো। ঘোর সবুজ সেই ম্লান আলোয় অণিমাকে চেনাই যাচ্ছিল না। শুধু দেখা গেল সে এক সাদা-খোলের শাড়ি পরেছে আর ডানদিকের মাথার চুলে একগুছি পাকা চুল। যে লোকটা চাঁদ গিলে ফেলেছিল তার কাছে কৈফিয়ত চাইছেন প্রধানমন্ত্রী, বিধিভঙ্গের দায়ে দায়ী করছেন।

মঞ্চে সেই আবছায়া মূর্তির দিকে চেয়ে নিথর হয়ে থাকে সোমেন। বুকের মধ্যে একটা কেমন কষ্ট হয়। প্রধানমন্ত্রীর মঞ্চে আবির্ভাবমাত্র দর্শকরা হাততালি দিচ্ছিল। যদিও প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং নন, তাঁর ভূমিকায় অন্যজন। তবু জনগণ খুশি, এটা বোঝা গেল। সোমেন প্রধানমন্ত্রীকে দেখছিল না। দেখছিল অণিমাকে।

পাশে বসে ম্যাক্স দাঁত দিয়ে নখ খুঁটছিল। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে পরিষ্কার বাংলায় বলে— সোমেন, কোনও দেশেই প্রধানমন্ত্রীরা এত ইম্পর্ট্যান্ট নন।

সোমেন ঘাড়টা নাড়ল কেবল।

ম্যাক্স ভারী হতাশ গলায় মৃদুস্বরে স্বগতোক্তির মতো বলে—নিউজপেপার খুলেই হেডিং দেখি, প্রধানমন্ত্রী এই কথা বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী এই কথা বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী এরকম উপদেশ দিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী ক্ষুব্ধ হয়েছেন বা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। রেডিয়ো খুলেই নিউজ-এ শুনি, কি প্রাইমমিনিস্টার হ্যাজ স্টেটেড দ্যাট...। তোমরা এত প্রধানমন্ত্রীর ভক্ত কেন?

সোমেন কী উত্তর দেবে? একবার আবছায়ায় ম্যাক্সের মুখটা দেখল। মুখে একটু কৌতুক। সোমেন বলল—আমরা ওইরকম।

ম্যাক্স মাথা নেড়ে বলল—আইডোল্যাট্রি! আমি তোমাদের দুর্গাপুজো, কালীপুজো, গণেশপুজো সব দেখেছি। কিন্তু তোমাদের গ্রেটেস্ট গড হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী। অল অ্যালং তোমরা তোমাদের সব প্রধানমন্ত্রীকে সবচেয়ে বেশি পুজো করে এসেছ। বাচ্চারা যেমন মা-বাবা ছাড়া কিছু বোঝে না, তোমরা সেরকম প্রধানমন্ত্রী বোঝো। হোয়াই?

পিছন থেকে কে যেন বলল—আস্তে।

ম্যাক্স চুপ করে আবার নখ খুঁটতে থাকে দাঁতে। তার মুখে ভ্রূকুটি চোখে নীলচে ফসফরাস জ্বলছে।

সোমেনের ডানপাশে কয়েকজন অচেনা লোক, তার ওপাশে পূর্বা বসেছিল আর দুটি মেয়ের সঙ্গে। সারাক্ষণ নিচু স্বরে বক বক করছিল আর হাসছিল। ওদের আশপাশের লোক বিরক্ত। নাটকের মাঝামাঝি হঠাৎ উঠে এসে সোমেনের পাশের লোকটাকে কী বলল। লোকটা উঠে গেল পূর্বার জায়গায়। পূর্বা সোমেনের পাশে বসেই হাসতে থাকে—বুঝতে পারছিস?

সোমেন মুখটায় বিরক্তভাব করে বলে—জ্বালাতে এলি।

—আহা, আমি বুঝি সব সময়ে জ্বালাই।

—জ্বালাস না? সেবার লাইটহাউস থেকে তোর জন্য উঠে আসতে হয়েছিল মাঝপথে, মনে নেই?

—আহা। সে তো ড্রাকুলার ছবি দেখে ভয় পেয়ে চিৎকার করেছিলাম বলে!

—ব্যাপারটা একই। হয় ভয় পাবি, নয়তো হাসবি, নাহলে কেবল বক বক করবি। চুপ করে থাকতে পারিস না কেন?

—পেট ফুলে ওঠে যে! দু-তিনঘণ্টা চুপ করে থাকা সোজা কথা?

পিছন থেকে কে আবার বলে—আস্তে। একটু আস্তে হোক।

সোমেন পূর্বার দিকে চেয়ে বলে—ওই শোন।

পূর্বা মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাসতে থাকে। সোমেন চাপা স্বরে বলে—পেট ফুলে উঠলে অ্যান্টাসিড খাস।

পূর্বা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। মঞ্চের একদিকে অন্ধকার, অন্যদিকে আলো। আলোতে নায়িকার ভূমিকায় দাঁড়িয়ে আছে অপালা। অন্ধকারে আবছা দেখা যাচ্ছে মিহির বোসকে, সে নায়ক। নায়িকা দায়ী করছে নায়ককে, পৃথিবী থেকে সবচেয়ে সুন্দর জিনিস জ্যোৎস্নাকে হরণ করার জন্য। বলছে, সে নাকি আত্মহত্যা করবে। কারণ জ্যোৎস্নার অভাবে তার ভিতরকার ভালবাসা মরে যাচ্ছে।

পূর্বা হঠাৎ চাপা স্বরে বলল—পিছনের লোকটা কী বলছিল রে? আস্তে, একটু আস্তে হোক। কী হওয়ার কথা বলছিল?

—জিজ্ঞেস করে আসব?

—ধ্যুৎ। তুই বুঝি জানিস না?

অন্ধকারেই সোমেন পূর্বার দিকে একটু তাকায়। বলে—খুব পেকেছ খুকি!

মঞ্চে হঠাৎ মাকবেথ নাটকের একটা সংলাপের অনুকরণে হাহাকার করে ওঠে অপালার তীব্র গলা—তুমি চাঁদকে হত্যা করেছ, তাই তুমি কোনওদিন কারও ভালবাসা পাবে না।

অন্ধকারে মঞ্চের অন্য ধারে মিহির বোস একথা শুনে গম্ভীর গলায় বলে ওঠে—ভালবাসা! ভালবাসা নিয়ে কী হবে। আমার গলায় মহামূল্য চাঁদ। কে ভালবাসা চায়।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী-সমস্যা ম্যাক্সের এখনও মেটেনি। সে আবার তার নীল ফসফরাস জ্বালা চোখে চেয়ে বলল—অল অফ ইউ আর ইটিং আউট অফ পি-এম'স হ্যান্ড, ইজনট ইট? ভারতে যদি পি এম না থাকে কোনওদিন, তা হলে তোমাদের কী হবে সোমেন?

ডান কানে ঝুঁকে পূর্বা তখন বলল—পেকেছিই তো। বড়দের দেখে ছোটরা শেখে। তোমাদের সব ব্যাপার-স্যাপার জানি মশাই।

গুল। পূর্বা কিছু জানে না। জানলে কেঁদে ভাসাত। তবু একটু চমকে ওঠে সোমেন, মঞ্চে নায়িকার ভালবাসার সংকট, বাঁ পাশে ম্যাক্সের প্রধানমন্ত্রী ধাঁধাঁ থেকে সরে এসে সে পূর্বার দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করে—কী জানিস?

পূর্বা ঠ্যাং নাচিয়ে নিরুদ্বেগ মুখে বলে—এভরিথিং।

সোমেনের বিশ্বাস হয় না। অণিমা যেদিন তাকে চুমু খায় সেদিন ঘরটা অন্ধকার ছিল এবং কেউ তাদের অনুসরণ করেনি। তবু বুকটা কেঁপে ওঠে। দরজাটা বন্ধ করেনি অণিমা, সে কি ইচ্ছে করে?

সোমেন প্রসঙ্গটা পাশে সরিয়ে হঠাৎ বলল—আমরা বুঝি তোর চেয়ে বয়সে বড়! আর তোমার বুঝি এখনও দাঁত ওঠেনি!

পূর্বার ঠ্যাং নাচানো বন্ধ হয়, চোখ ফিরিয়ে সোমেনের দিকে চেয়ে বলে—কে, বলেছে আমি ছোট?

—এই যে বললি বড়দের দেখে ছোটরা শেখে! তুই কি ছোট?

পূর্বা সঙ্গে সঙ্গে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে—কখন বললাম! এ মা! যাঃ!

—বলেছিস।

একটা হাত কাঁধে এসে পড়ে পিছন থেকে, একটা স্বর বলে—দাদা, কাইন্ডলি একটু আস্তে।

একটা চিনেবাদামের খোলা ভাঙার শব্দ হয়, কাছেই। আর তখনই হঠাৎ অপালা মঞ্চ থেকে চেঁচিয়ে বলে—হায় চাঁদ! হায় প্রেম!

মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়। অন্ধকারে টানাটানি করে কারা পরবর্তী দৃশ্যের দৃশ্যপট সাজাচ্ছে।

পূর্বা হঠাৎ মনে-পড়ায় ব্যগ্র কণ্ঠে বলে—বলেছি তো, কিন্তু সে তুই আমাকে খুকি বলেছিস বলে।

—ও। সোমেন উদাস গলায় বলে।

—রাগ করলি? পূর্বা অন্ধকারেই চেয়ে থাকে তার দিকে।

—না।

—করেছিস। মাইরি, রাগ করিস না। জানিস তো, কেউ আমার ওপর রাগ করলে আমার ভীষণ মন খারাপ হয়ে যায়।

—করিনি।

তৃতীয় দৃশ্যের মাঝ বরাবর সোমেন বেরিয়ে এল।

গ্রিনরুমের গলিতে ঢুকেই চমকে ওঠে সোমেন। অণিমা দাঁড়িয়ে আছে। চুলে এখনও সাদা মেক-আপ লেগে আছে। সাদা খোলের শাড়িটাও পরনে। দিল্লির জলহাওয়ায় শরীরে একটা ঢল এসেছে। এত শ্রী ওর আগে কখনও দেখেনি সোমেন। রং-ও বোধ হয় ফরসা হয়েছে, মেক-আপের জন্য ভাল বোঝা যাচ্ছে না।

চোখে চোখ পড়তেই মুখটা কেমন অপরাধী লজ্জায় মাখা হয়ে গেল অণিমার। চোখটা নামিয়ে নিয়ে আবার তুলল। ভারী চশমার ভিতরে ওর চোখ বরাবরই ছোট দেখাত। সে-চোখ দুটির দিকে অনেকবার অলস মন নিয়ে তাকিয়ে দেখেছে সোমেন। আজকের দেখার মধ্যে একটু অনুসন্ধিৎসা ছিল। ছিল রহস্যমোচন।

ভারী মিষ্টি একটা লাজুক হাসি হাসল অণিমা। অণিমার সর্বাঙ্গে আর কোথাও এতটুকু ইয়ারকির ভাব নেই। গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল—চলে যাচ্ছ?

সোমেন থমকে বলল—তুমিও যাবে নাকি!

অণিমা তার চোখে চোখ না রেখে একটু অপ্রস্তুত হেসে বলল—কী করে যাই! এই দৃশ্যেও পাট রয়েছে। শেষটা দেখে যাবে না?

সোমেন একটু হেসে বলে—তোমাদের বাড়িতেই যাচ্ছি। গাব্বুর টার্মিনাল, একবার যাব বলেছিলাম। আর বেশি দেরি করলে রাত হয়ে যাবে।

—ও! ভারী নরম বিস্ময় প্রকাশ করে অণিমা।

—কবে ফিরেছ?

—এই তো কদিন।

—খুব বেড়ালে?

—উঁ! বলে একটু চুপ করে থাকে অণিমা, তারপর আস্তে দু-দিকে মাথা নেড়ে বলে—না। বেড়াইনি খুব একটা। ভাল লাগত না। ঘরে বসে থাকতাম। রেকর্ড শুনতাম।

—তবে গেলে কেন?

অণিমা তেমনি সুন্দর হেসে মৃদু গলায় বলল—বিয়ের আগে শরীর সারাতে।

সোমেন সিগারেট ধরিয়ে বলে—তোমার শরীর সেরেছে অণিমা।

অণিমা লজ্জা পেল। মুখ নামিয়ে নিল।

তারপর বলল—কিন্তু তুমি রোগা হয়ে গেছ সোমেন। কেন?

—কী জানি! সোমেন উত্তর দিল।

ভিতর থেকে কে এসে ডাকল—অণিমা!—যাচ্ছি। অণিমা তাকে বলল। তারপর সোমেনের দিকে চেয়ে বলল—যাই সোমেন।

—আচ্ছা। বলে হাসে সোমেন—দেখা হবে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী!

অণিমা মৃদু হাসল। কী লাজুক, সুন্দর হাসি। সেই ইয়ারবাজ মেয়েটার চিহ্ন আর নেই ওর কোথাও।

ফুটপাথে দাঁড়িয়ে সিগারেটটা শেষ করল সোমেন। হাঁটতে হাঁটতে আজও যেন আবার সোমেনের রাস্তা ফুরোয় না। সময় কাটে না।

একটা লাইন আজকাল প্রায়ই অকারণে মনে পড়ে সোমেনের। প্রতিশোধ, প্রতিরোধ, প্রতিবাদ, কমরেড, গড়ে তোলো, গড়ে তোলো, গড়ে তোলো ব্যারিকেড।

রিখিয়াদের দেয়ালে কে এই লাইনটা লিখেছিল কে জানে! যে লিখেছিল সে কি বেঁচে আছে! না কি মুক্তি সংগ্রামের হাওয়ায় ছেঁড়া পোস্টারের কাগজের মতো উড়ে গেছে দুনিয়া ছেড়ে! ওই স্লোগান এখন কেউ আর লক্ষও করে না দেয়ালটায়। কিন্তু লাইনটা বড় আশ্চর্যভাবে বেঁচে থাকে সোমেনের মধ্যে। অকারণে মনে পড়ে। চারদিকে গতিময়, ক্ষিপ্র কলকাতা বয়ে যায়। কর্মহীন সোমেনের অলসভাবে চলতে-ফিরতে হঠাৎ ওই লাইনটা মনে পড়ে যায়।

জীবনের সুখী সুন্দর দিনগুলি বুঝি শেষ হয়ে এল!

॥ চৌত্রিশ ॥

ব্যাঙ্কের লকারের জন্য বহুদিন আগে দরখাস্ত করে রেখেছিল রণেন। তিন-চারটে ব্যাঙ্কে। আজ ব্রাবোর্ন রোডের একটা ব্যাঙ্কে খোঁজ নিয়ে জানল, বীণা লাহিড়ির নামে একটা লকার পাওয়া যাবে সামনের মাসে। লকার নিয়ে আজকাল বড় কাড়াকাড়ি। সকলেরই কিছু না কিছু লুকনো টাকা, সোনাদানা বা গয়নাগাটি আছে।

আজ শনিবার। অফিসে কাজ ছিল না। একটা ইনস্পেকশন রিপোর্ট দিয়ে আসবার সময়ে বুড়ো রামসদয় ঘোষকে খবরটা দিল। ফাঁকা অফিস। সবাই চলে গেছে। কেবল ঘোষ বসে বসে একটা আন-অফিসিয়াল অঙ্ক কষছিল। মুখ তুলে বলল—ছেলেটা কাল রাতে টেস্টপেপার থেকে অঙ্কটা কষতে গিয়ে পারেনি। তাই আমি অফিসে নিয়ে এসেছি। কেউ পারল না সবাইকে দেখিয়েছি। আমি সারাদিন ধরে বার দশেক করলাম।

ঘোষকে প্রায়ই এরকম আফিসে বসে অঙ্ক কষতে দেখেছে রণেন। ওটা ঘোষের নেশা। রণেন হেসে বলে—তাই বলুন। আমি ভাবছিলাম অফিসের কাজকর্ম।

—নাঃ। অফিস আবার কী! এ বছরই রিটায়ারমেন্ট, ডিসেম্বরে। ত্রিশ বছর ঢের কাজ করেছি। এবার ছোট ছেলেটাকে দাঁড় করাতে পারলে নিজের কাজ হবে।

টেরিলিনের জামাকাপড় পরলে বড় ঘাম হয়। এ গরমে সবচেয়ে আরামের হল ধুতি পাঞ্জাবি, নয়তো সুতির জামাকাপড়। বীণা সে সব পাট চুকিয়ে দিয়েছে। টেরিলিনের জন্যই পাখার তলায় বসেও রণেন ঘামে। একটা পাতলা ফাইল তুলে হাওয়া খেতে খেতে বলল—লকারটা পেয়ে গেছি।

—লকার? ব্যাঙ্কের নাকি? বলে অন্যমনস্ক ঘোষ মাথা নাড়ে—সে তো বড়লোকি ব্যাপার।

মনে মনে রণেন বলে—তাই তো, সেটা বুঝতে দেরি হয় কেন রে শালা? মুখে বলল—না না। আজকাল যা চুরি-ছিনতাই গেরস্থরাও লকার রাখে। সেফ।

—সেফ আবার কী! একটা চাবি তো ম্যানেজারের কাছে থাকে শুনেছি।

—তা থাকে। তাও সেফ।

মাথা নেড়ে ঘোষ বলে—ধরুন, লকারে গিয়ে যদি একদিন দেখেন যে, টাকাপয়সা সোনাদানা সব হাওয়া, তখন কী হবে? ব্যাঙ্ক ক্ষতিপূরণ দেবে?

—না, তেমন নিয়ম নেই।

—তবে! সে আবার কী! চাবি যখন ওদের কাছে থাকে তখন একটা ডুপ্লিকেট করে রাখলে আটকাচ্ছে কে! চাবি-দাওয়া যখন চলবে না তখন সিকিউরিটি কী থাকল! তার ওপর পুলিশ এসে জোর করে খেলে আজকাল, সেও ফ্যাসাদ।

রণেন একটু দ্বিধায় পড়ে।

ঘোষ অঙ্কটা কষতে কষতে না তাকিয়েই বলে—সবচেয়ে ভাল হল লোহার সিন্দুক। লকার কি বউমার নামে নিলেন নাকি?

—হুঁ।

—ভাল। স্ত্রী কৈবল্যদায়িনী। এ যুগটা বউদেরই যুগ। সবাই বউয়ের নামে সব করে। আমার বউটা বেঁচে থাকলে আমিও তার নামে কিছু না কিছু করতাম।

রণেন অবাক হয়ে বলে—কিছু করেননি?

—কী করব? তিলজলায় খানিকটা জমি কিনেছিলাম বউয়ের তাগিদে, যেদিন ভিত পুজো সেদিনই সুট করে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেল। অলক্ষণ দেখে জমি বেচে দিই, আর কিছু করিনি।

—রিটায়ারমেন্টের পর?

—ছেলেরা আছে। তবে বল-ভরসা কেউ নয়। বড় দুজন বিয়ে শাদি করে বউ চিনেছে। ভরসা ছোটটা, তা এও বড় হয়ে হাতে হারিকেন ধরিয়ে দেবে। প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাটা তাই মুঠো করে বসে থাকব, সেই টাকার জোরে যা সেবাযত্ন পাই পাব। বুড় বয়েস বউ না থাকলে ভারী মুশকিল। জোর খাটানো, রাগ দেখানোর মানুষ থাকে না। অথচ কেরানি-টেরানির তো এই বুড়ো বয়সটাই খিটকেল মেজাজের বয়স। তখন মনের মধ্যে নতুন রাগ অভিমানের দাঁত গজায়, কিন্তু বউ না থাকলে কামড়ানোর কিছু থাকে না। ভারী মুশকিল।

লকার পাওয়ার যে আনন্দটা ছিল তা যেন হঠাৎ নিবে গেল রণেনের। মানুষের মুশকিল, নানুষ মরণশীল। দূর ভবিষ্যতের একটা অচেনা, অজানা, একাকীত্বের ছবি ভেবে কেন যে শিউরে উঠল রণেন। হঠাৎ মনে হল, লকার-টকার এ-সব মিথ্যে প্রয়োজন। সিকিউরিটি কোথাও নেই।

উঠতে যাচ্ছিল, ঘোষ অঙ্কটা কষতে কষতেই বলল—বউয়ের নামে সর্বস্ব উচ্ছুগ্যু করবেন, তাতে মাগিদের বড় তেল হয়। এদিক-ওদিক নিজের নামেও কিছু রাখবেন।

—নিজের নামে? কিন্তু ইনকাম ট্যাক্স...

ঘোষ মুখ না তুলেই বলে—ইনকাম ট্যাক্স, অ্যান্টি করাপশ্যান, আর বউ, এ তিনের মধ্যে বউ সবচেয়ে ডেঞ্জারাস। পুরুষমানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু।

রণেনের ঘেমো শরীরে গরম ছুঁড়ে একটা শীত এসে লাগে। কথাটা মনের মতো। সে বলল—আমার বউ...

ঘোষ কথাটা শেষ করতে দিল না, তেমনি ছোট ছেলের আঁক কষতে কষতে বলল—ও জানি। সব্বার বউয়ের গল্পই একরকম। নারীরাই এখন লড়ছে ভাল। পুরুষসিংহের বড় অভাব।

রণেন উঠতে উঠতে বলে—কিন্তু লকারের ব্যাপারে একটা ভাবনায় ফেলে দিলেন ঘোষদা। এখন মনে হচ্ছে, লকার তেমন সেফ নয়।

ঘোষ হাসল। এই বয়সেও ভাল চেহারা, লম্বা—ফরসা। একহারা। চোখেমুখে ভাল বংশ এবং বুদ্ধির ছাপ আছে। সেই সঙ্গে একটু ক্লান্তিও। লাল ঠোঁট চিরে একটু হাসল, বলল— মানুষকে ভয় দেখানোটা আমার হবি, যেমন হচ্ছে ছেলের অঙ্ক কষা। ওসব কিছু নয়। সবাই রাখছে, আপনিও রাখবেন। বউয়ের নামে যে এককাঁড়ি নিন্দেমন্দ করলাম সেও কি সব সত্যি? ভড়কে দেওয়ার জন্য বলি। এই যে অফিস ছুটির পর বসে

অঙ্ক কষছি, বউ থাকলে পারতাম? বুড়োগুড়ো, কালো-কুচ্ছিৎ যাইহোক, বউ বেঁচে থাকলে ঠিকই সংসারের দিকে, বাসার দিকে একটা টান থাকত। ওই টানটুকুর জন্যই সংসারী, নইলে সব ব্যাটা সন্ন্যাসী।

ঘোষ আবার কিছুক্ষণ নীরবে অঙ্ক কষে। বিরক্তিকর। রণেন বুকের বোতাম খুলে গেঞ্জি ফাঁক করে ভিতরে হাওয়া ঢোকানোর চেষ্টা করে। বড্ড গরম।

ঘোষ বলে—কিন্তু মেয়েছেলেদের উলটো। বউ মরলে পুরুষে যেমন একাবোকা হয়ে যায় আমার মতো, মেয়েদের তা হয় না। বুক চাপড়ে কাঁদেটাঁদে প্রথমটায় ঠিকই, তারপর আবার হামলে সংসার করে, ছেলেপুলে, নাতি-নাতনি টানে। ভুলে-টুলে যায় তাড়াতাড়ি।

—আজ উঠি।

—বাজে বকছি, না? টাকা-পয়সা কেমন করেছেন?

—দূর! কই? বলে রণেন লাজুক হাসে।

ঘোষ একপলক তাকিয়ে দেখে নেয়। মুখটা নামিয়ে নিয়ে বলে—খবরটবর সব পাই। করুন না দোষের কিছু তো নয়। লোকের হাতে আজকাল অঢেল টাকা। বাজারে কোনও জিনিস পড়ে থাকে না, তা সে যত দামই হোক। দোকান-পসারও কত বেড়ে গেছে দেখেছেন? কত বাহারি শোকেস? লুকনো টাকা ধরার ফাঁদ। তবু কেন যে লোকে দেশের দুরবস্থার কথা বলে! ওপর ওপর কিছু ফালতু লোক না খেয়ে মরছে, কিন্তু মোটের ওপর মানুষ সুখেই আছে। নাকি! বলে ফের অঙ্কটা একটু করেই বলে ওঠে—ওই যাঃ!

—কী হল?

ঘোষ খুব হতাশার সুরে বলে—অঙ্কটা মিলে গেল।

—ভালই তো।

ঘোষ খুব বিমর্ষভাবে মাথা নেড়ে বলে—হুঁ।

তার ভ্রূ কোঁচকানো মুখ দেখে পরিষ্কার বোঝা যায় যে ঘোষ খুশি হয়নি। অঙ্কর সঙ্গে আর কিছুক্ষণ লড়ালড়ির ইচ্ছে ছিল বোধ হয়। টেবিলের টানা খুলে একটা ছেঁড়া-খোঁড়া পুরনো টেস্ট পেপার বের করে পাতা উলটে আবার অঙ্ক খোঁজে ঘোষ।

রণেন বলে—আপনি তো এখন অঙ্ক কষবেন। আমি উঠি।

—আরে কেবল উঠি-উঠি করছেন কেন? বসুন না। ঘোষ বলে।

—একটু খোলা হাওয়ায় যাই, এখানে বড় গরম। বলে রণেন মাথার ওপর সিলিং ফ্যানটার দিকে চেয়ে বলে—আজকাল যে কেন ফ্যানগুলোর হাওয়া হয় না?

—ফ্যানের দোষ নেই, ওটা টাকার গরম। বলে ঘোষ হাসল।

ঠাট্টা বিদ্রূপ করলেও এই ঘোষ লোকটাই বরাবর রণেনকে বুদ্ধিটুদ্ধি দেয়। ভারী ঠান্ডা মাথা। রিটায়ারমেন্টের কাছাকাছি এসে এখন একটু নিস্পৃহ হয়ে গেছে। মনের মতো একটা অঙ্ক বুঝি খুঁজে পেল ঘোষ। কাগজে সেটা টুকতে টুকতে বলল—জমি জায়গা করেছেন?

রণেন বিমর্ষভাবে বলে—এখনও নয়। তবে টালিগঞ্জে খানিকটা জমি মায়ের নামে।

ঘোষ সবিস্ময়ে চোখ তুলে বলে—মায়ের নামে! আপনি তো দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ! আজকাল কেউ মায়ের নামে জমি করে?

রণেন বাধা দিয়ে বলে—না না। বাবা টাকা দিচ্ছেন।

—বাবা বেঁচে আছেন এখনও? বলে লাল ঠোঁট চিরে এরকম গা-জ্বালানো হাসি হেসে ঘোষ বলে—ভারী অন্যায়।

ঘোষ ব্রজগোপালকে চেনে। এক ডিপার্টমেন্টে কিছুকাল একসঙ্গে কাজ করেছে। ব্রজগোপালকে যারা চেনে তাদের সামনে রণেন একটু অস্বস্তি বোধ করে।

ঘোষ অঙ্কের দিকে চেয়েই বলে—উনি টাকা পেলেন কোথায়?

—পলিসির টাকা।

ঘোষ একটা নিশ্চিন্ত হওয়ার শ্বাস ছেড়ে বলে—তাই বলুন। হঠাৎ ব্রজগোপালদার টাকার কথা শুনে চমকে গিয়েছিলাম। ওরকম মানুষের তো বাড়তি টাকা থাকার কথা নয়। সারাজীবন অন্যের ফাইফরমাস খাটতেন, এটা-ওটা কিনে এনে দিতেন কলিগদের, কিন্তু কখনও কারও টাকা নিজের বা অন্য কারও টাকার সঙ্গে মেশাতেন না, সব আলাদা রাখতেন। বলতেন মেশালে সূক্ষ্মভাবে গো-বিটউইন হয়। মনে নাকি একটা দ্বন্দ্বীবৃত্তি আসে। বলে ঘোষ নিঃশ্বাস ফেলে হাসল—এ টোটাল মিসফিট। তবু ওরকম দু-চারজন লোক বেঁচে আছেন বলেই এখনও চন্দ্রসূর্য ওঠে।

রণেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায়। একটু অস্বস্তি হতে থাকে। একটা ঘুমন্ত আবেগ হঠাৎ বুকের মধ্যে ধড়ফড় করে জেগে উঠতে চায়। যার বাবা সৎ সে কত ভাগ্যবান। ভাবতেই চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। সে উঠে দাঁড়ায়।

—চললেন? ঘোষ জিজ্ঞেস করে।

—চলি। আপনি যাবেন না?

ঘোষ উদাসভাবে বলে—কোথায় যাব? বসে বসে অঙ্কটা কষি। একটু বাদে দারোয়ানরা বন্ধ করতে আসবে, তখন উঠে পড়ব।

ঘোষ আবার অঙ্কের মধ্যে ডুবে যায়।

বড় ঘরটা পার হয়ে দরজার কাছ বরাবর এসে একটু তাকিয়ে দেখে রণেন। সারি সারি খালি টেবিল। ফাঁকা ঘরে একা ঘোষ বসে আছে এতটুকুন হয়ে। অঙ্ক কষছে। হঠাৎ ভিতরটায় একটু চমকা ভয় জেগে ওঠে। মনে পড়ে বুড়োবয়েস, একাকীত্ব। মনে পড়ে মৃত্যু। মাথাটা একটা টাল খায়। ভারী ব্যাগটা একহাতে ধরে রেখেই কষ্টে একটা সিগারেট জ্বালে রণেন। ঘোষের সামনে খায় না, বাবার কলিগ ছিল। সিগারেটের ধোঁয়া ভিতরে যেতেই একটু অন্যরকম লাগে।

ছটা বাজে। বাইরে এখনও বেশ রোদ। বাইরে এসে বুক ভরে শ্বাস নেয় রণেন, কিন্তু তবু একটা শ্বাসরোধকারী কী যেন কাজ করছে ভিতরে! ভয়? নিরাপত্তার অভাব? মৃত্যু?

মনটা ভারী খারাপ লাগতে থাকে। শরীরটাকে কয়েকবার ঝাঁকি দেয় রণেন, হাতের ব্যাগটা দোলায়। মনটাকে হালকা করে দেওয়ার জন্য মুখ ছুঁচলো করে শিস্ দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। উৎকট শ্বাসবায়ুর শব্দ বের হয়। লম্বা লম্বা সব বাড়ির ছায়ায় হাঁটে। ধুলোটে গরম হাওয়া দিচ্ছে, নাকে ধুলোর গন্ধ। উদ্ভিদহীন, শান বাঁধানো কলকাতা নির্মম তাপ বিকীরণ করছে। একটা পাম্পসেটের দোকানের শো-কেসের সামনে দাঁড়াল

রণেন। কাচে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখল। গায়ে কলকা ছাপ, টেরিকটনের বুশ শার্ট, পরনে চেক প্যান্ট, পায়ে দামি জুতো। তবু চেহারাটা লোকাল ট্রেনের ফেরিঅলার মতো কেন যে লাগে!

মনটা খারাপ। মনটা বড্ড খারাপ। কেবলই মনে পড়ে, মলিন অফিস ঘরে ছুটির পর নিরালায় বসে ঘোষ আঁক কষছে। একটা সময় আসে যখন আয়ুটাকে ফালতু সময় বলে মনে হয়। না? আর আসে একাকীত্ব! মৃত্যু!

অনেকে আছে, মন খারাপ থাকলে একা থাকতে ভালবাসে। নিরালায় ছাদে-টাদে গিয়ে চুপচাপ থাকে। রণেন সেরকম নয়। তার উলটো। মন খারাপ থাকলে তার খুব ইচ্ছে করে কোনও আপনার জনের কাছে গিয়ে বসে, আদর খায়, ভরভর করে অনেক কথা বলে।

সন্ধ্যাবেলা বাসায় ফিরে এল রণেন। মা নেই। গত তিন মাসে মা এই নিয়ে বারচারেক শীলার বাড়িতে গিয়ে থাকছে। এই সময়টায় সোমেন থাকে না। বড় ছেলেমেয়ে দুজন বাইরের ঘরে ছোকরা মাস্টারের কাছে পড়ছে। নতুন রাখা হয়েছে টিউটরটিকে, ফালতু পঞ্চাশ টাকা চলে যাচ্ছে মাসে মাসে। সোমেনই পড়াতে পারে, পড়ায় না। সংসারের সবাই বড় উদাসীন রণেনের প্রতি, এমন মনে হয়।

টুবাই সন্ধেয় ঘুমোয়। শোওয়ার ঘরে মশারি ফেলা। রণেন ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালতেই নাইলেক্সের মশারির ভিতর থেকে বীণা ঘুম চোখে আলো লাগাতে চোখ পিট পিট করে বলে—আঃ নেবাও না। ছেলেটা এইমাত্র ঘুমিয়েছে, উঠে পড়বে।

ভারী অপমান বোধ করে রণেন। বড় সহজেই বীণা আজকাল তাকে ধমকায়। মনটা ভাল নেই বলে অভিমানটা যেন আরও গাঢ় হয়ে মেঘলা করে দিল মনটা। রণেন সবুজ রঙের ঘুম-আলোটা জ্বেলে বড় আলো নিবিয়ে দিল। লুঙ্গি পরতে পরতেই অভিমানটা খসে গেল খানিক। ডাকল—বীণা।

—উঁ।

—শুয়ে কেন? বেরিয়ে এস।

—চা চাই নাকি!

—সে পরে হবে। এখন তোমাকে চাই।

—হঠাৎ এত প্রেম?

এটাও অপমান। রণেন ড্রেসিং টেবিলের সামনে টুলে বসে আয়নায় মুখ দেখতে দেখতে একটা সিগারেট ধরাল। এই কায়দায় অশোককুমার সিগারেট ধরাত একসময়ে। বিছানায় বীণার শাড়ির আর গয়নার শব্দ উঠল। বসে খোঁপাটা বেঁধে নিল। অনেকখানি আঁচল বিছানায় রেখে বেরিয়ে এল, তারপর শ্লথ হাতে অফুরান আচলটা টেনে আনতে থাকল বিছানা থেকে।

রণেন বাইরের ঘরের দিককার দরজাটা বন্ধ করে দিল উঠে।

বীণা বলল—ও কী! বাইরের লোক রয়েছে, কী ভাববে?

কাম নয়, একটা তীব্র সঙ্গলিপ্সায় আকুল রণেন দু-হাতে জাপটে ধরল বীণাকে, প্রথম প্রেমিকের মতো কাঁপা গলায় পুরনো বউকে ডাকল—বীণা!

—ইস্! কী যে করো না! বীণা রোগাটে হলেও গায়ে জোর কম নয়। দু-হাতে ঝটাপটি করে ছাড়িয়ে নিল।

—তোমাকে আমার ভীষণ দরকার। রণেন হাঁফসানো গলায় বলে।

—রাতে হবে। বীণা নিস্পৃহ গলায় বলে।

—সে সব নয়। এমনি এসো, কাছাকাছি জড়াজড়ি করে বসে থাকি। কথা বলি।

বিরক্ত হয়ে বীণা বলে—কিছু খেয়েছ নাকি!

বলে কাছে এসে মুখটুখ শুঁকে বলে—না তো! তবে হল কী?

আকুল দু-হাতে আবার ভালুকের মতো তাকে চেপে ধরে রণেন—শোনো। আমার কোনও কথা তুমি আজকাল শুনতে চাও না। বড় সংসারী হয়ে গেছ বীণা। আজ একটু বোসো।

বীণা বলে—ধ্যেৎ। বলে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়। বলে—দরজাটা খুলে দাও। খুব বিশ্রী দেখাচ্ছে। ছেলেটা কি না জানি ভাবছে! তুমি একটা কী বলো তো!

বীণা দরজাটা খুলে দেয়। বাইরের ঘরের স্টিক লাইটের আলো পরদার ফাঁক দিয়ে ঘরে এসে পড়ল। বীণা গেল রান্নাঘরে। আয়নার সামনে বসে রইল রণেন। অ্যাশট্রের ওপর রেখে দেওয়া সিগারেটটার কথা ভুলে গিয়ে নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল। অন্য সিগারেটটা ধূপ কাঠির মতো জ্বলতে থাকল একা-একা।

ঘোর সবুজ আলোয় ঘরটা কেমন ভৌতিক দেখাচ্ছে এখন। প্রাচীন অরণ্যের অন্ধকারে একটা ধ্বংসস্তূপ। পাখার হাওয়ায় মশারি কাঁপছে। ঢেউ দিচ্ছে। আয়নায় তার আবছা প্রতিবিম্ব। কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগে সব কিছু। কেমন যেন রোজকার মতো নয়। বুকটা ফাঁকা। গায়ে ঘাম। সিগারেটের ধোঁয়ার কর্কশ গন্ধ। রণেনের মাথার ভিতরটা ক্রমে পাগল-পাগল হয়ে যাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি উঠে বড় আলোটা জ্বালল রণেন। জানালার কাছে দৌড়ে গিয়ে বাইরের বাতাস টানল। অস্থিরতা। তার নিজের মানুষ যেন কেউ নেই পৃথিবীতে। এমন কেন লাগছে। উজ্জ্বল আলোয় নিজের হোঁৎকা শরীরের প্রতিবিম্বের দিকে আয়নায় চেয়ে থাকে রণেন। তীব্র একটা ঘেন্না হয় লোকটাকে।

একটা সেফটিপিন পড়ে আছে টেবিলের ওপর। কিছু না ভেবে সেটা তুলে নিল রণেন। এবং দাঁতে দাঁত ঘষে আচমকা খোলা সেফটিপিনটা বসিয়ে দিল বাঁ হাতের কবজির ওপর। ক্যাঁচ করে ঢুকে গেল সেটা। প্রথম একটা তীক্ষ্ণ ব্যথা, তারপর হাতটার একটা অবশ ভাব। গাঁথা সেফটিপিনটা তুলল না রণেন। একটু পরে দুই বিন্দু রক্ত উপচে এল। চেয়ে রইল সে, একা ফাঁকা অফিসঘরে ঘোষ বসে আঁক কষছে, ছুটির পর কিছু করার নেই...কোথাও যাওয়ার নেই! মানুষ এরকম অবস্থা সহ্য করে কী করে? মাথাটা ঘুলিয়ে ওঠে আবার। মৃত্যু! একা! কেউ নেই।

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

চুপ করে জেগে শুয়েছিল রণেন। পাশে বউ বীণা। ওপাশে বাচ্চারা। পাঁচ বাই সাত খাটে জায়গা হয় না বলে দেয়ালের দিকে একটা বেঞ্চ খাটের সঙ্গে জোড়া হয়েছে। বেঞ্চটার পায়ায় দোষ আছে। বাচ্চাদের কে একজন ঘুমের মধ্যে দাঁত কিড়মিড় করছে। কৃমি। পাশ ফিরতেই বেঞ্চটায় মচাং শব্দ হল। রাস্তায় ঘেয়ো কুকুররা ঝগড়া করছে। সোমেনের ঘরে পুরনো পাখার একটা খটাং খটাং শব্দ হয়। এ সব রণেন একা শোনে। বিশ্বসংসার ঘুমোয়।

রণেনের ঘুম এমনিতে ভালই। স্বপ্ন খুব কম দেখে। নেশারুর মতো ঘুম তার। আজ মনটা বড় খারাপ। সে একবার ঘুমন্ত বীণার গায়ে হাত রাখল। এই মেয়েমানুষটা তার। নিজস্ব। ঘাঁটাঘাঁটি খুব কম হয়নি, তবু কি সবটা চেনা হয়েছে! প্রতিদিন শ্বাসে শ্বাস মিলে যায়, উভয়ের মিলেমিশে তৈরি করা ওই সব সন্তান, তবু দু-জনের মাঝখানে সমুদ্রের ব্যবধান।

ঘুমন্ত বীণার শরীরের সর্বত্র তৃষিতের মতো হাত রাখে রণেন। ঘুমের মধ্যেই বিরক্তির শব্দ করে বীণা হাত সরিয়ে দেয়। একবার অস্ফুট স্বরে বলে—বড় গরম, উঃ!

অপ্রতিভ রণেন বলে—ঘুমোলে?

উত্তর পায় না। বাঁ-হাতের কবজির কাছটায় বড় যন্ত্রণা। ফুলে আছে, টাটাচ্ছে। একটু ডেটল বা কিছু লাগালে হত। পিনটা বের করার পর রক্ত পড়েছে অনেকটা। পেকে ফুলেটুলে ওঠে যদি! আঙুলগুলো কয়েকবার মুঠো করে রণেন। কবজি ঘোরায়, ব্যথা।

বীণা ঘুমন্ত অবস্থায় একবার পাশ ফেরে। তার একটা হাত এসে বুকের ওপর দিয়ে জড়িয়ে ধরে, একটা পা উঠে আসে তলপেটের ওপর। এই ঘুমন্ত আলিঙ্গনটা এখন বড় অস্বস্তিকর। রণেন চায়, এখন তার সঙ্গে কেউ জেগে থাকে। জেগে থেকে আদরে, ভালবাসায় তাকে ঘুম পাড়াক।

বাঁ-হাতির কবজির ওপরেই বীণার শরীরের ভার। হাতটা অবশ হয়ে আসছে। সরার জায়গা নেই। বীণা জেটির দড়ির মতো বেঁধে রেখেছে। ঘরে সবজে রঙের ঘুম-আলোটা জ্বালা আছে। সেই আলোয় একবার বীণার মুখটা দেখে রণেন। শরীর জুড়োলেই কি মেয়েমানুষের প্রয়োজন ফুরোয় পুরুষের কাছে! আর কি চাওয়ার আছে মেয়েমানুষের কাছে? বেশ দেখতে বীণা। মেয়েমানুষের যা যা থাকা দরকার সবই আছে। তবু যেন বেশি কিছু নেই।

রণেন একবার দুঃসাহসে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল—এই।

বীণা বলে—উঃ!

—সরে শোও।

বীণা পাশ ফিরে সরে যায়।

চারদিক থেকে রাতের শব্দ আসে। খাপছাড়া, হঠাৎ শব্দ সব। ইঁদুরের দৌড়-পায়ের আওয়াজ, ইঞ্জিনের ভোঁ, একটা ডাইনামোর আওয়াজ, কাশি, রাস্তায় পায়ের শব্দ, রিকশার ঘণ্টি, রাতচড়া মোটর চলে যাচ্ছে, বহুদূরে কোথায় লাউডস্পিকারে গান হচ্ছে। ঘুম হবে না।

রণেন উঠে মশারি থেকে বেরিয়ে আসে। বাইরের ঘরে এসে শোওয়ার ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয় সাবধানে। আলো জ্বেলে রেডিয়োগ্রামের খোপে নিবিষ্ট হয়ে খুঁজতে থাকে একটা রেকর্ড। গতবারে খামখেয়ালে কিনেছিল, আছে কিনা কে জানে!

আছে। রবিঠাকুরের নিজের গলায় গাওয়া গানের রেকর্ডটা চাপিয়ে দিয়ে আস্তে ছেড়ে দিল রেডিয়ো। একটু খোনাসুরে, রিক্ত বার্ধক্যের গলায় বৃদ্ধ কবির গান হতে থাকে—অন্ধজনে দেহ আলো, মৃতজনে দেহ প্রাণ...

দুর্বল গলা, সুরের ওপর স্থায়ী হতে পারছে না, দম ফুরিয়ে যাচ্ছে। স্বাসবায়ুর শব্দ আসছে। তবু হাহাকার ভরা কেমন মরুভূমি ফুটে উঠছে চোখের সামনে। উদ্ভিদহীন এক রুক্ষ ধূসর পৃথিবীর ওপর হাঁটু গেড়ে বসেছে বয়সের ভারে ন্যুব্জ, শোকে তাপে জর্জরিত অপমানিত, অসহায় মানুষ। তার পোশাক ধুলোয় লুটোচ্ছে। ক্ষীণদৃষ্টি সে-মানুষ অস্পষ্ট আকাশের দিকে চেয়ে দুহাত তুলে বলছে—অন্ধজনে দেহ আলো, মৃতজনে...

রেকর্ডটা আবার ফিরিয়ে দেয় রণেন। চোখের জল মুছে নেয়। মানুষ যা ছিল তাই আছে। অন্ধ ও মৃত। আকাশের দিকে নিরন্তর বাড়ানো আছে তার দুই হাত। রবিঠাকুর গাও। রবীন্দ্রনাথ গাইতে থাকেন, কাঁপা কাঁপা, বুড়োটে গলায়, অশ্রুহীন শুষ্ক ক্রন্দনের মতো—অন্ধজনে দেহ আলো...

আর সেই শব্দে মুচড়ে ওঠে বুক। ঝলকে ঝলকে নিঙড়ানো বুক থেকে উঠে আসে চোখের জল। টাগরা ব্যথা করে, কান্নার দলা ঠেলে ধরে টনসিলকে। বয়স ভুলে, সংসার ভুলে, হঠাৎ সব ছদ্মবেশ ঝেড়ে ফেলে ধুলোয় লুটনো শিশুর মতো অসহায়ভাবে 'মা' বলে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করে। কেন কাঁদবে তা তো জানে না রণেন। কেন কাঁদবে? কোনও কারণ নেই। কিংবা হয়তো খুবই তুচ্ছ সেই কারণ। কেবল কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করে।

কয়েকবার রেকর্ডটা শুনল রণেন। আরও খারাপ হয়ে গেল। রাস্তায় কুকুরেরা ডাকছে। তাতে যেন আরও নির্জন লাগে কলকাতাকে। আরও ভয়াবহ। বৃশ্চিক রাশির শেষ জীবনটা নাকি ভাল কাটে না। কোষ্ঠীতে রণেনের রাশি বৃশ্চিক নয়, কিন্তু ইংরেজি একটা বইতে সে পড়েছিল, সায়ন মতে জন্মতারিখ অনুযায়ী তার রাশি বৃশ্চিক। শেষ জীবনে সে হয় পাগল হয়ে যাবে, অপঘাতে মারা যাবে। শেষ জীবনের এখনও অনেক দেরি। তবু কেন যে মনে পড়ে!

রাতে ভাল ঘুম হল না, রবিবার সকালটা বাজার করে এসে রণেন তার চার জোড়া জুতোর কালি লাগাল। বাথরুম ঘষল। গেঞ্জি, আন্ডারওয়্যার, টেরিলিন কাচল কয়েকটা। বাচ্চাদের সবকটাকে ধরে ধরে সাবান ঘষে স্নান করাল। কাজকর্মের মধ্যে মন-খারাপটাকে যদি ডুবিয়ে মারা যায়।

পাগল হয়ে যাব না তো! এই কথাটা সারাদিন ধরে মাঝে মাঝে মনে হয়। মরে যাব একদিন! ভেবে চমকে ওঠে সে। স্নানের ঘরে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করে রণেন। উৎকট শিস দেওয়ার চেষ্টা করে। গান গায়—অন্ধজনে দেহ আলো...সুরটা লাগে না। মেঠো সুরহীন। গলায় রামপ্রসাদী গানের মতো হয়ে যায় রবীন্দ্রসংগীত।

স্নান করতে করতেই জলের শব্দের মধ্যেই শুনল, কে যেন এসেছে। বাইরের লোকই হবে। কড়া নাড়ার শব্দ। সোমেন ফিরল বোধ হয় আড়া সেরে। না, সোমেন নয়। সোমেন হলে চেঁচাত। বীণা উঁচু বিরক্তির গলায় জিজ্ঞেস করল—কে? না জিজ্ঞেস করে বীণা দরজা খোলে না। দিনকাল ভাল নয়। ছোট ছেলেটাকে বোধ হয় খাওয়াতে বসেছে। ছুটির দিনে আত্মীয়স্বজনরা আসে। বাদুড়বাগানের সম্বন্ধী, কিংবা গড়িয়ার পিসি। তাদেরই কেউ হবে। ছিটকিনি খোলার শব্দ পেল রণেন। নীরস গলায় বীণা আগন্তুককে বলল—ঘরে এসে বসুন। তারপর বাথরুমের দরজার কাছে এসে বলল—শুনছ, বাবা এসেছেন।

বাবা! বাবার কথা ভারী ভুল হয়ে যায় আজকাল। মনেই থাকে না যে বাবা আছেন। কাল একবার মনে হয়েছিল, ঘোষের কথায়। তাড়াতাড়ি জল ঢেলে স্নানটা সম্পূর্ণ করে রণেন। বুকের ভিতরে একটা আকুলি-বিকুলি। মনটা কেবলই বায়নাদার বাচ্চার মতো আপনজনের গন্ধ খুঁজছে। কোথায় আছে মায়ের কোল, বাপের গন্ধ, বউয়ের শরীর। কেউ যেন নেই। বাবা এসেছে শুনে বুকটা তাই কেমন করে উঠল।

গামছা-পরা অবস্থায় বেরিয়েই খানিকক্ষণ বাবার দিকে চেয়ে দেখল রণেন। গায়ে হাফ-হাতা সাদা ফতুয়া, একটু উঁচুতে তোলা ধুতি। শরীরটা বেশ রোগা। বেতের চেয়ারে বসে ধুতির খুঁটে মুখটা মুছছেন। রুমাল রাখেন না। চেয়ারের পাশে মেঝের ওপর রাখা সেই ক্যাম্বিসের ব্যাগ।

মুখ মুছে তাকালেন একটু। কথা বললেন না।

রণেন বলল—এই রোদে বেরিয়েছেন?

ব্রজগোপাল হাসলেন একটু। বললেন—আর সব কোথায়?

রণেন বুঝল, মার কথা বলছেন। বলল—মা তো শীলার কাছেই আছেন। ওর বাচ্চা হবে, কাছে থাকেন।

—ও। আর সোমেন?

—বেরিয়েছে। বসুন, এই সময়ে আসে।

বীণা রান্নাঘর থেকে জিজ্ঞেস করল—চা খাবেন তো!

ব্রজগোপাল মাথা নেড়ে বলেন—বরং একটু জল দিয়ো। হাতের কাজ সেরে নিয়ে।

রণেনের কান-মুখ গরম হয়ে ওঠে। রাগে, লজ্জায়। অতিথি তো নয়, বাবা। ভরদুপুরে তাঁকে কেউ চায়ের কথা বলে। বলা উচিত—ভাত খেয়ে যাবেন। কিংবা বলারও দরকার। নেই। ভাত বেড়ে ডাকতে হয়।

লুঙ্গি পরে, চুল আঁচড়ে এসে বসে রণেন। বাবার কাছাকাছি বসতেই যেন একটা শস্য, ফুল আর যজ্ঞমাটির গন্ধ পাওয়া গেল। বীণা পাখাটা খুলে দিয়ে যেতে ভুলে গেছে, রণেন পাখা খুলল। বলল—অনেকদিন বাদে এলেন। শরীরটরীর ভাল তো!

—শরীর ভাল। তবে ওদিককার খবর ভাল না।

—কেন, কী হয়েছে?

ব্রজগোপাল স্পষ্ট কিছু বললে না। কেবল বললেন—কী আর হবে! বহেরুর বয়স হচ্ছে। আমারও। বুড়োরা এবার পা বাড়িয়ে রয়েছি। এই বেলা সব বুঝে না নিলে...

সেই পুরনো কথা। রণেন চুপ করে থাকে।

বীণা হাত ধুয়ে এক গ্লাস জল রেখে যায় টেবিলের ওপর। ব্রজগোপাল জলটার দিকে চেয়ে থাকেন। বলেন—সে যাকগে। আমার অ্যাকাউন্টে এল আই সি'র চেকটা ক্যাশ হয়ে এসেছে নাকি?

—সে তো কবে!

—তা হলে টাকাটা দিয়ে যাই। সেজন্যেই এসেছি। তোমাদেরও জমিটার ব্যাপারে দেরি হয়ে যাচ্ছে।

ক্যাম্বিসের ব্যাগ থেকে খুঁজে খুঁজে হাঁতড়ে দোমড়ানো চেক বইটা বের করলেন বাবা। বুকপকেট থেকে ট্রেনের ফেরিঅলার কাছ থেকে কেনা সস্তা কলম বের করে বললেন—উনি দশ হাজার চেয়েছিলেন, না কি পলিসির পুরো টাকাটাই, তুমি জানো?

রণেন বিপদে পড়ে মাথা নেড়ে বলল—না।

—কার নামে লিখলে ভাল হয়?

—মার তো অ্যাকাউন্ট নেই।

—নেই? বলে একটু দ্বিধায় পড়লেন ব্রজগোপাল।

—আমার আছে।

—তোমার নামে লিখব? বলে ব্রজগোপাল রণেনের দিকে তাকালেন। চোখের দৃষ্টি কেমন যেন সংশয় ভরা। যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না।

ভারী অভিমান হল রণেনের। চুপ করে রইল।

ব্রজগোপাল কলম রেখে জলটা খেলেন। কোঁচার খুঁটে মুখ মুছে বললেন—তোমার তো ইনকাম ট্যাক্সের ঝামেলা আছে। বরং তোমার মায়ের নামে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে নাও। বলে একটু চুপ থেকে বললেন—তোমার মাকেই টাকাটা দেওয়ার কথা আমার। তোমার নামে লিখলে কথা রাখা হল না। কাজের সুবিধে হলেও সেটা উচিত হবে না।

—তবে মার নামেই লিখুন।

ব্রজগোপাল তাই লিখলেন। সাবধানে চেকটা ক্রস করে অ্যাকাউন্ট পেয়ি করে দিলেন। রণেন দেখল, ব্রজগোপাল পলিসির পুরো টাকাটাই লিখে দিয়েছেন।

চেকটা হাতে দিয়ে বললেন—তোমার মায়ের হাতে দিতে পারলেই ভাল হত।

রণেন বলল—শীলার বাড়ি তো দূর নয়। খাওয়া-দাওয়া করে নিন, তারপর, একটা ট্যাক্সি করে চলে গেলেই হবে।

ব্রজগোপাল ভারী লাজুক একটু হেসে বলেন—ওখানে যাওয়ার কী দরকার? তুমি ওঁর নামে ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে দিয়ো।

ব্রজগোপালের কাজ ফুরিয়েছে, এক্ষুনি বুঝি চলে যাবেন। ফলে রাতের সেই কান্নার দলাটা আজও ঠেলা দিয়ে উঠল রণেনের টনসিলের কাছে। বাবা চলে গেলেই বড় একা লাগবে। রণেন তাই তাড়াতাড়ি বলল—চলুন না। শীলা অজিতদেরও বহুদিন দেখেননি।

ব্রজগোপাল কী ভেবে চেয়ারে ঠেসান দিয়ে বললেন—তা হলে তুমি তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। আমি বসছি।

—আপনি খাবেন না?

—আমি! ব্রজগোপাল ভারী অবাক হয়ে বললেন। মাথা নেড়ে বলেন—আমি তো স্বপাক খাই। নিরামিষ। খেয়েই এসেছি।

বীণা ভিতরের ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। তাকে ঘিরে ছানাপোনা। সবাই অবাক হয়ে ব্রজগোপালকে দেখছে। বীণা বলল—কিছুই খাবেন না?

সংকোচের সঙ্গে ব্রজগোপাল বললেন—খাওয়ার দরকার নেই। ওই ডানদিকেরটি বুঝি সুপ্রসন্ন? না, কি যেন ওর নাম রেখেছ?

বীণা লজ্জা পেয়ে বলে—মনোজিৎ, ছেলেকে একটু ঠেলা দিয়ে বলে—যাও, দাদুর কাছে যাও।

—এস দাদা। বলে হাত বাড়ান ব্রজগোপাল। তাঁর দুই গর্তে ঢাকা চোখে কী একটা অন্তর্নিহিত পিপাসা ঝিকিয়ে ওঠে। আপনজন! রক্তের মানুষ! উত্তরাধিকার!

ভয়ে ভয়ে বুবাই এক-পা দু-পা করে এগিয়ে আসতে থাকে। এই বুড়ো মানুষটা তার দাদু, সে জানে। কিন্তু পবিচয়হীনতার দূরত্বটুকু পার হতে সময় লাগে তার।

ব্রজগোপাল নিচু হয়ে ক্যাম্বিসের ব্যাগ তোলপাড় করে কাগজে মোড়া এক ডেলা আমসত্ত বের করে আনেন, একটা ঠোঙায় কিছু শুকনো কুল, আমসি, প্লাস্টিকের ঠোঙায় কিছু ক্ষোয়া ক্ষীর। নাতির হাতে দিয়ে বলেন—সবাই খেয়ো।

নাতির পিঠে একবার হাত রাখলেন। কোলে নিলেন না। অভ্যাস ভাল নয়। ফিরে গিয়ে মনটা আবার গর্ত খুঁড়বে। পিঠে হাতটা রেখে বললেন—যাও, মায়ের কাছে যাও।

খেয়ে নিতে একটুও সময় নষ্ট করল না রণেন। ঘরের মধ্যে তার হাঁপ ধরে আসছে। একটা ধুতি আর পাঞ্জাবি পরে বেরিয়ে এসে বলল—চলুন।

চেকটা টেবিলের ওপর পড়েছিল। ব্রজগোপাল সেটা সযত্নে ভাঁজ করে ভিতরের পকেটে রাখলেন। ব্যাগটা হাতে নিয়ে বললেন—তোমাদের জমিটাও ওইখানেই?

—হ্যাঁ, জমিটাও দেখা হয়ে যাবে আপনার। রণেন বলে।

—আমি দেখে কী করব! তোমরা থাকবে, তোমাদের পছন্দ হলেই হল।

রণেন উত্তর দিল না।

বেরোবার মুখে দরজার কাছ বরাবর একটু দাঁড়ালেন ব্রজগোপাল। ইতস্তত করে বললেন—সোমেন এল না এখনও? রোজ এরকম বেলা করে নাকি!

বীণা হেসে বলে—কিছু ঠিক নেই।

—ভাল কথা নয়। অনিয়ম করে এ বয়সে শরীর ভাঙলে খুব বিপদ। চাকরিবাকরি কিছু হয়নি?

—না। বীণা উত্তর দেয়।

ট্যাক্সিতে বসে রণেন বলে—বাবা।

ব্রজগাপাল অন্যমনস্ক ছিলেন। উত্তর দিলেন না। কিন্তু হঠাৎ মুখটা ফিরিয়ে বললেন—ট্যাক্সিতে চড়ে পয়সা নষ্ট করো কেন? এ বয়সে আয়েশি হলে শরীর বসে যায়, মনটাও আলসে হয়।

—বাসে-ট্রামে চড়া যায় না। বড় ভিড়।

—তোমরাই ভিড় বাড়াচ্ছ। ভিড় তো তোমাদেরই। বলে আবার মুখটা বাইরের দিকে ফিরিয়ে বলেন—কলকাতায় যারা থাকে তারা ক্রমে মানুষকে ঘেন্না করতে শেখে। এ বড় পাপ।

রণেন আবার ডাকল—বাবা।

—উঁ! বলে ব্রজগোপাল মুখ ফেরালেন।

রণেনের তখন বড় লজ্জা করল। কী বলবে? বাবাকে তার কিছু বলার নেই। মুখে পান ছিল। গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল—বাড়িটা যদি হয় তো আমাদের কাছেই এসে থাকুন।

ব্রজগোপালের ভিতর যে অভিমানী কঠিন মানুষটির বাস সেই মানুষটিই যেন ঈষৎ উষ্মভরে জবাব দেন—কেন?

ঠিকই তো। কেনো? বাবা কেনো থাকবেন তাদের সঙ্গে!

ব্রজগোপাল আরও কিছুক্ষণ আলগা চোখে বাইরের দিকে কলকাতার অপসৃয়মান বাড়িঘর দেখলেন। গাড়ি আনোয়ার শা রোড ধরে শীলাদের বাড়ির গলির কাছাকাছি এসে পড়ল। ট্যাক্সি থামলে ব্রজগোপাল হঠাৎ চমকে উঠে বললেন—এসে গেলাম নাকি!

—হুঁ। রণেন নেমে ভাড়া দিতে দিতে বলে। এবং টের পায়, বাবা এখনও মায়ের সাহচর্যে আসতে কত লাজুক ও অপ্রতিভ হয়ে যান। বাবা ও মার মধ্যে তবে কি ভালবাসা আছে আজও?

॥ ছত্রিশ ॥

অজিত দরজা খুলে ভারী অবাক হয়। শ্বশুরমশাইকে তার বাড়িতে সে একদম প্রত্যাশা করেনি। তারওপর দুপুরের কাঁচা ঘুম থেকে উঠে এসেছে, ভারী থতমত খেয়ে গেল। এ সময়টায়, বিশেষত ছুটির দুপুরে সবাই ঘুমোয়।

ব্রজগোপালের মুখে-চোখে একটু অপ্রসন্নতার ছাপ। বললেন—আছে সবাই?

—আসুন। বলে দরজার পাল্লা হাট করে দিয়ে বলে অজিত—ঘুমোচ্ছে। ডাকছি।

ব্রজগোপাল ঘরে এসে বসলেন। চারদিকে চেয়ে-টেয়ে বললেন—ভালই।

অজিত সেন্টার টেবিল থেকে সন্তর্পণে তার সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার সরিয়ে নিচ্ছিল। ব্রজগোপাল সেটা নিশ্চয়ই চোখে দেখলেন। অজিত তাঁকে অন্যমনস্ক করার জন্য বলল—কী ভাল? বাড়ি?

ব্রজগোপাল মাথা নাড়লেন। বললেন—ঘরদোর তো বেশ বড় বড় দেখছি। কখানা?

—দুটো বেডরুম আছে দুদিকে। একটা প্যাসেজ, আর যা যা সব থাকে। বলে হাই তুলল।

রণেন একটু দূরে বসেছে। এতক্ষণে কথা খুঁজে পেয়ে বলল—ওরা দোতলা করে নীচের তলাটা ভাড়া দেবে।

ব্রজগোপাল উদাস গলায় বলেন—লাভ কী?

—বাড়ির কষ্টটা খানিকটা উঠে আসে।

—ভাড়াটেদের সঙ্গে থাকা সঙ্গত নয়। ব্রজগোপাল তেমনি নিশ্চিত স্বরে বলেন—বাড়ির বড় মায়া। পরমানুষ দেয়ালে পেরেক ঠুকলেও বুকে লাগে।

—আমিও ভাবছিলাম, বাড়িটা যদি হয় তো তিনতলার ভিত গেঁথে করব। একতলাটা ভাড়াটে, দোতলা আর তিনতলায় আমরা।

ব্রজগোপাল একবার ছেলের মুখ নিরীক্ষণ করলেন। তারপর মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বললেন—তোমরাই থাকবে, তোমাদের যা ইচ্ছে।

অজিত ভিতরের ঘরে এসে দেখে শীলা এক কাত হয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছ। এ সময়টায় চেহারা রুক্ষ হয়ে যায়, মুখে মেচেতার মতো দাগ পড়ে। চোখ বসা, কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে আছে। কিছু পেটে রাখতে পারে না, সব উলটে বের করে দেয়। তা হোক। তবু পেটের বাচ্চাটিকে ধরে রাখতে পেরেছে। নষ্ট হয়নি শেষ পর্যন্ত। ঘুমন্ত শীলাকে ডাকতে বড় মায়া হয়। পাশেই শাশুড়ি ঠাকরুন গুটিসুটি হয়ে শুয়ে আছেন। ঘুমের মধ্যেও মাথায় ঘোমটা।

অজিত গলাখাঁকারি দিল। শাশুড়িকে মা বা শ্বশুরকে বাবা বলে ডাকার অভ্যাসটা তার এখনও হয়নি? শীলা সেজন্য রাগ করে। বলে—তোমার মা-বাবাকে আমি মা বাবা ডাকতে পারি, আর তুমি আমার মা-বাবাকে

পারো না? অজিত অবশ্য ঝগড়া করে না, কিন্তু ডাকেও না।

অজিত গলাখাঁকারি দিতেই অবশ্য ননীবালা মুখখানা সন্তর্পণে তুলে বললেন—কে এসেছে? বাইরের ঘরে আওয়াজ পাচ্ছি।

অজিত ইতস্তত করে বলে—উনি।

ননীবালাকে আর বলতে হল না। বুঝলেন। যেন উনি বলতে বিশ্বসংসারে একজনই আছে। শীলাকে একটু ঠেলা দিয়ে বললেন—ওঠ্।

শীলা আদুরে ঘুম-গলায় বলে—উঁ।

—উনি এসেছেন। উঠতে হয়। তোর বাড়িতে প্রথম এলেন।

ঘুম থেকে উঠলেই একটা সিগারেটের তেষ্টা পায়। অজিত তাই বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট টেনে নিতে থাকে দ্রুতবেগে। পরশুদিন একটু বৃষ্টি হয়েছিল। সামান্য বৃষ্টিতেই সামনের রাস্তার ধুলো ধুয়ে পাঁজর বেরিয়ে পড়েছে। খাটালের জমানো গোবরের টাল থেকে পচাটে গন্ধ আসে। ওপরে ধুলোটে আকাশ। ফরসা রোদ। শুকনো গরম হাওয়া দিচ্ছে। বহু ওপরে আকাশের গায়ে দাগের মতো বড় পাখি চিল বা শকুন উড়ছে। ভারী নিরালা দুপুর। আকাশে চড়ানো ডানামেলা পাখি, রোদ, বিস্তার দেখে অজিতের মনটাও নিরালা হয়ে যায়। আত্মীয়স্বজন আজকাল তার ভাল লাগে না। আগেও লাগত না। মা বাবা ভবানীপুরের সংসার ছেড়ে এসে আরও নিষ্ঠুর হয়ে গেছে সে। বাড়িতে আত্মীয় এলে তার অকারণ উৎপাত মনে হয়। কথা বলতে হবে, সামনে গিয়ে বসে থাকতে হবে, সিগারেট লুকোতে হবে। কিংবা আবার ভদ্রতা রক্ষার জন্য কখনও-সখনও যেতে হবে তাদের বাড়িতেও। ভাবতেই ক্লান্তি লাগে। নিজের মতো নিরালা জীবন পাওয়াটাই সবচেয়ে প্রিয় ছিল তার কাছে।

তাড়াতাড়ি জোরে টান দেওয়ায় সিগারেটটা তেতে গেছে, ধোঁয়া আসছে না। সেটা ফেলে দিয়ে বাথরুমে গিয়ে চোখেমুখে জল দিল সে। যতক্ষণ সময় কাটানো যায়। জলের ঝাপটা চোখেমুখে দিতে গিয়ে এক কোষ জল নাকে ঢুকে দম আটকে দিল। অস্বস্তি। জলের গন্ধে কী যেন একরকম লাগে। বুকচাপা নিঃসঙ্গতা। অজিত জানে, পৃথিবীতে তার কেউ নেই। একদম কেউ না। ছিল লক্ষ্মণ। তাকে একা করার জন্যই ভগবান বুঝি তাকে দূরে নিয়ে গেলেন। অবশ্য ভগবান মানে না অজিত, ভাগ্যও না। তবু ওইরকম মাঝে মাঝে মনে হয়। কার অদৃশ্য হাত তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধুটিকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। তাকে একাকীত্বে রেখে দেখার জন্যই বুঝি!

বাথরুমের দরজাটা ভেজানো ছিল। সেটা ধাক্কা দিয়ে অধৈর্য হাতে খুলে শীলা ঢুকল। বলল—ইস্, বাথরুমে এত দেরি কেন, মেয়েদের মতো? বাইরে যাও।

ধীরেসুস্থে অজিত তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলে—তাড়া কীসের?

—ভীষণ পেয়েছে। তুমি যাও তো, বাবা বসে আছেন। মেয়ে-জামাইয়ের বাড়িতে প্রথম এলেন, জামাইয়ের পাত্তা নেই। শীলার গলায় যথেষ্ট রাগ।

ডাক্তারের মত নিয়ে শীলা আজকাল ইস্কুলে যায়। রিকশায় করে। একবার বাইরের স্বাদ পেলে মেয়েরা আর ঘরবন্দি থাকতে চায় না। হাঁপিয়ে ওঠে। কদিন আগে সন্ধেবেলা বাসায় ফিরে অজিত একটু অবাক হয়ে দেখে, বাইরের ঘরে একটা অপরিচিত ছেলে বসে আছে। ভারী সুন্দর চেহারা, আর ভীষণ স্মার্ট। শীলা পরিচয় করিয়ে দিল। তার নাম সুভদ্র। বলল—শোভনাদির লিভ ভ্যাকেন্সিতে চাকরি করছিল আমাদের স্কুলে।

শোভনাদি ফিরে এসে জয়েন করেছেন, বেচারির চাকরি গেছে। এখন তোমার কাছে এসেছে, যদি তুমি ওকে এ আই সি'র একটা এজেন্সি পাইয়ে দাও।

একটু অবাক হয়েছিল অজিত। এল আই সি'র এজেন্সি পাওয়া কোনও শক্ত ব্যাপার নয়। ধরা করার দরকার হয় না। তা হলে তার কাছে আসা কেন। সে-রহস্যের ভেদ হল না বটে কিন্তু ছেলেটাকে বেশ ভাল লেগে গেল। এ ছেলেটা খুব সুন্দর বটে কিন্তু নিজের সৌন্দর্য সম্পর্কে সচেতন নয়। গালে দাড়ি আছে, লালচে রকম গোঁফ আছে একটু। পোশাক-আশাকে সাধারণ। চমৎকার কথা বলে। ভীষণ হাসায়। টকটকে ফরসা রং, লম্বা এবং গোরাটে চেহারার মধ্যে আবার একটু বাচ্চাদের মতো লাজুকতাও আছে।

যতক্ষণ সুভদ্র ছিল ততক্ষণ শীলার চেহারাই অন্য রকম। চোখেমুখে একটা উত্তেজিত চকচকে ভাব। ঠোঁটে হাসি, মুখে অনর্গল কথা। বারোটা মিষ্টি সব যত্ন করে সাজিয়ে দিল। লম্বা সোফাটায় সুভদ্র বসেছিল, অন্য ধারে বসল শীলা। নিঃসংকোচে। কোনও হাসির কথা উঠলে ঝুঁকে সুভদ্রকে ঠেলা দিয়ে বলছিল—এই সুভদ্র, বলুন না সেই নক্সালাইটরা ইস্কুলে বোমা ফেললে অচলাদি আর দীপ্তিদি কেমন করে পায়খানায় ঢুকে গিয়েছিলেন, আর ঢুকেই দেখেন সেখানে পণ্ডিতমশাই...হি...হি....

রাত ন'টা পর্যন্ত সুভদ্র ছিল। ততক্ষণ শীলাকে মনে হচ্ছিল একটি কুমারী মেয়ে। শরীরে কোনও অস্বস্তি নেই। কোনও সম্পর্ক নেই অজিতের সঙ্গে।

সুভদ্র চলে গেলে এ বাড়ির ভূতটা নেমে এল। তখন শাশুড়ি ঠাকরুন ছিলেন না। শুধু অজিত আর শীলা থাকলে এ বাড়িতে ভূত নামে। সে ভূতটার নাম গাম্ভীর্য। কথার শব্দ নেই, হাসির শব্দ নেই, ফাঁকা নিঃসঙ্গতা শুধু। শীলার শরীর তখন খারাপ লাগতে লাগল বলে গিয়ে শুয়ে রইল ঘর অন্ধকার করে। পাশের ঘরে অজিত নতুন কেনা একটা ফাঁকা কাচের টিউব থেকে অন্তহীন রুমাল বের করতে থাকল। দর্শকহীন ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ম্যাজিকের প্যাটার মুখস্ত বলে যেতে যেতে একটা জাম্বো কার্ডের খেলা দেখাতে লাগল নিজেকে। ম্যাজিক মানেই হাত, চোখ, মুখ, ভঙ্গি আর কথার কৌশল। জীবন মানেও কি তাই নয়? কিন্তু সেইসব কৌশল অজিতের জানা নেই। তাই বাড়িতে ভূত নামে। অনেকক্ষণ ম্যাজিক করে ক্লান্ত অজিত সিগারেট ধরিয়ে একা বাইরের ঘরে এসে বসে থাকল। ঘরে আলো জ্বালেনি, পাশের ঘর থেকে আবছা আলো আসছে। বসে থেকে থেকে সে টের পেল, এ বাড়ির ভূতটা সে নিজেই। ভূত মানে, যে ছিল, এবং এখন আর নেই। অজিত তো তাই। সে ছিল, সে এখন আর নেই, নইলে ওই যে সুন্দর চেহারার ছেলেটা, সুভদ্র, ওর কারণে একটু হিংসে হতে পারত তার। একটু সন্দেহ। কিন্তু কিছু হচ্ছে না। বরং অজিত ভাবছিল, শীলা আর কাউকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলে বড় ভাল হয়। সে নিজে আর একটু আলগা হতে পারে, আর একটু একা। একা হওয়া কী ভীষণ ভাল। আহা, শীলা ওই ছেলেটার সঙ্গে হালকা একটু প্রেম করুক না। ক্ষতি কী?

জীবন মানেও একরকম কৌশল। স্বামী-স্ত্রী হিসেবে তারা দুজনেই ভারী নিস্তেজ, পরস্পর সম্পর্কে কৌতুহলহীন। তাই মাঝে মাঝে নিজেকে একটু উসকে নেয় অজিত, শীলাকেও উসকে নেয়। এইভাবে অনুভব করার চেষ্টা করে যে, তারা সম্পর্কিত, তারা আছে।

বাথরুমের বাইরে যাওয়ার জন্য শীলা তাড়া দিচ্ছিল, অজিত র‍্যাকে তোয়ালেটা রেখে বেসিনের ওপর ছোট আয়নার দিকে চেয়ে আঙুলে চুল পাট করতে করতে বলল—লজ্জা কী, বসে পড়ো না। আমি দেখছি না।

—সে খালি বাড়িতে। এখন দেয়ালা কোরো না। বাইকে যাও তো শীগগির। কেউ এসে পড়লে...ছি ছি...

অজিত গম্ভীরভাবে বলল—শোনো, একটা কথা।

—পরে হবে। উঃ। বাবা বসে আছেন, দাদা মা...তুমি একটা কী বলো তো!

—কী?

—এখন যাও না।

—আমার কানে কয়েকটা উড়ো কথা এসেছে শীলা।

—পরে শুনব।

—না, এখনই। সুভদ্রর সম্পর্কে...

শীলা হঠাৎ যেন থমকে গেল। গলার স্বরটা হয়ে গেল অন্যরকম। বলল—কী কথা? কী শুনছ?

—তোমার সঙ্গে সুভদ্রর রিলেশনটা...

—কীরকম?

—লোকে বলে।

—কে লোক?

—আছে। তুমি চিনবে না।

বাথরুমের ঝুঁঝকো আলোয় শীলা কেমন ছাইরঙা হয়ে গেল। অবাক বড় চোখ, ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে আছে, ক্ষতচিহ্নের মতো।

—তারা কী বলেছে? শীলা নরম গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করে।

শীলার চেহারা দেখে অজিত ভয় পেয়ে গেল। ঠাট্টার এমন প্রতিক্রিয়া হবে, এতটা পালটে যাবে শীলা তা সে ভাবেনি। হাত বাড়িয়ে বলল—কী হয়েছে? শরীর খারাপ লাগছে নাকি!

—তুমি ও কথা বললে? শীলার গলায় মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। কাঁদবে।

—কিছু না। কেউ কিছু বলেনি। বলল অজিত। কিন্তু গলায় কোনও আন্তরিকতা ফোটাতে পারল না। মাঝে মাঝে মানুষের বড় ভুল হয়ে যায়। গলা খাঁকারি দিয়ে অজিত বলে—ঠাট্টা করছিলাম। আমি যাচ্ছি।

ম্লান মনে বেরিয়ে এল অজিত। হঠাৎ বুঝতে পারল, সে যে ঠাট্টা করে কথাটা বলেছে তী শীলাকে কোনওদিন বিশ্বাস করানো কঠিন হবে। কিন্তু ঠাট্টাটা কী? অজিতের মনেও কি কিছু ছিল না!

সম্পূর্ণ আনমনা অজিত বাইরের ঘরে এসে দেখল তার শ্বশুর ব্রজগোপাল লাহিড়ি তার শাশুড়ি ননীবালা লাহিড়ির হাতে মোটা টাকার চেক তুলে দিচ্ছেন। দৃশ্যটা অনেকটা খবরের কাগজের ছবির মতো, কোনও সংস্থার পক্ষ থেকে কেউ যখন বন্যাত্রাণ বা ওইরকম কিছুর জন্য রাজ্যপাল বা প্রধানমন্ত্রীর হাতে চেক তুলে দেয়, স্রেফ পাবলিসিটির জন্য। বিজ্ঞাপন দেওয়ার চেয়ে সংবাদে নাম তোলা অনেক বড় বিজ্ঞাপন। আজকাল সবাই সংবাদ হতে চায়। পারিবারিক ক্ষেত্রে ব্রজগোপালও এখন সংবাদ। শেষ পর্যন্ত টাকা তিনি দেবেন এমন বিশ্বাস অনেকেরই ছিল না। কিন্তু এই মুহূর্তে চেকটা দেওয়ার সময়ে তাঁর ভাবমূর্তিটা বেশ বড়সড় হয়ে উঠল। ননীবালা বাঁ-হাতে চোখ মুছে ধরা গলায় বললেন—রণোর নামে দিলেই তো পারতে!

ব্রজগোপাল রক্তাভ লাজুক মুখে বললেন—তোমাকেই দেওয়ার কথা ছিল।

শ্বশুরকে বহুকাল বাদে একটু মন দিয়ে দেখল অজিত। ক্ষ্যাপাটে, বাতিকগ্রস্ত বুড়ো। তবু মুখের ওই রক্তাভাব যে লাজুকভাব, যে চাপা অস্থিরতা তার মধ্যে একটা গভীর মমতাময় হৃদয়ের চিহ্ন আছে। বুড়ো

মানুষরা চিঠির শেষে পাঠ লেখে ইতি নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী অমুক। সেটা কথার কথা। কিন্তু এই লোকটার শরীরের মধ্যে যেন সেই কথাটা গোপনে ভোগবতীর মতো বয়ে যাচ্ছে—নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী।

ননীবালার চোখে বুঝি জল এল আবার। প্রায় রুদ্ধ গলায় বললেন—বাড়িটা যদি হয় তাহলে...

বলে একরকম প্রত্যাশায় তাকালেন স্বামীর দিকে। ঘোমটাটা আর একটু টেনে মুখখানা প্রায় ঢেকে বললেন—রণো বলছিল, বাড়ি করলে বাবার জন্য একটা আলাদা ঘর করব।

কথাটায় ইঙ্গিত ছিল। নিরুদ্দিষ্টের প্রতি আহ্বান।

ব্রজগোপাল একটু চেয়ে রইলেন ননীবালার দিকে। তারপর মাথা নেড়ে বললেন—কতকাতায় আর না। তোমরা থাকো। গোবিন্দপুর ছেড়ে আসা হবে না। তা হলে সব দেখবে কে?

ননীবালা উত্তর দিলেন না। রণেন চুপ করে বসে আছে। কিংবা ঠিক চুপ করেও নেই। তার ঠোঁট নড়ছে নিঃশব্দে। আপনমনে কথা বলছে নাকি?

অজিত সকলের কাছ থেকে দূরে। ঘরের কোণে একটা গদি আঁটা শান্তিনিকেতনি মোড়ায় বসে রইল। ব্রজগোপালের দিকে চোখ। এ লোকটাকে তার বড় হিংসে হয়। সব থেকেও কেমন একা, আলগা। হৃদয়হীন বলে মনে হয়। মনে হয়, বুঝি সন্ন্যাসী।

সে যাইহোক, লোকটা সংসারকে লাথি মারতে পেরেছে। বুকের পাটা আছে এ বয়সেও।

উৎকর্ণ হয়ে বসেছিল অজিত। বাথরুমে শীলা অনেকক্ষণ সময় নিচ্ছে। বড় ভয় হয়। পাঁচ মাসের পেট নিয়ে, যদি পড়েটড়ে যায়। ঠাট্টাটা করা ঠিক হয়নি।

আবার অজিত ভাবে, ঠাট্টা! ঠাট্টাই কী! আর কিছু নয়? উৎকর্ণ হয়ে থাকে। এ বাড়ির নিঃসঙ্গতার ভূতটা কখন যে কার ঘাড়ে ভর করে কী অনর্থ ঘটায়! সেই নিঃসঙ্গতা ভাগিয়ে দেওয়ার জন্য একজন আসছে। উগ্র আগ্রহে অপেক্ষা করছে অজিত। শীলা, পড়েটড়ে যেয়ে না, সাবধান! মন খারাপ কোরো না, ওটা একটা ভূতুড়ে ইয়ারকি।

ব্রজগোপাল চেক-দান অনুষ্ঠানের ভাবগম্ভীরতা থেকে হঠাৎ সম্বিৎ পেয়ে চারদিকে চেয়ে বললেন—শীলুকে দেখছি না!

ননীবালা ডাকলেন—অ শীলা।

—বাথরুমে। জবাব দিল অজিত।

—ও। ব্রজগোপাল খানিক চুপ করে থেকে বললেন—শীলুর বাড়িতে এলাম, অথচ ওর জন্য হাতে করে কিছু আনিনি।

—কী আনবে! ননীবালা বলেন।

— বাচ্চাদের কাছে আসতে বাপের কিছু হাতে করে আনতে হয়। ব্রজগোপাল বলেন।

—ওরা কি বাচ্চা! ত্রিশের কাছে বয়স হল। বলেন ননীবালা। একটু হাসলেনও বুঝি।

বড় হয়েছে! বলে ভ্রূকুটি করেন ব্রজগোপাল। যেন বা তাঁর বাচ্চারা যে বড় হয়েছে এটা তাঁর বিশ্বাস হয় না। তিনি জানেন, ওরা এখনও ভুলে ভরা, বায়নাদার, অবুঝ শিশু তাঁর। বড় হয়নি, একদম বড় হয়নি।

বাচ্চা ঝিটা বাইরে থেকে মিষ্টি নিয়ে ঘরে এল। রান্নাঘর থেকে চায়ের জলের শিস শোনা যাচ্ছে। শীলার এবার বাথরুম থেকে বেরনো উচিত।

ব্রজগোপাল জামার ভিতরের পকেট থেকে দশটা টাকা বের করে অজিতের দিকে চেয়ে বললেন—তোমরা মিষ্টি খেয়ো।

অজিত হাসল, বলল—না, না। সে কী!

রণেন দৃশ্যটা দেখে হাসল। ননীবালাও হেসে বললেন—ওরা কি আর সেই ছোটটি আছে যে বাপ মিষ্টি খেতে টাকা দেবে!

ব্রজগোপাল নিপাট গম্ভীর চোখে চেয়ে বললেন—নাও।

হাতটা বাড়িয়ে রইলেন। অজিত বাচ্চা ছেলের মতো লাজুক ভঙ্গিতে উঠে গিয়ে হাত বাড়িয়ে নিল। কিছু বলার নেই।

—উঠি। ব্রজগোপাল বলেন।

—বসুন! চা হচ্ছে। অজিত বলল।

—পরমানুষের মতো কেবল উঠি-উঠি ভাব কেন? শীলা আসুক। ননীবালা এই বলে মুখের পানের ছিবড়ে ফেলে এলেন জানালা দিয়ে।

অজিত উৎকর্ণ হয়ে আছে। শীলার কোনও শব্দ নেই। বড় দেরি করছে শীলা। এত দেরি হওয়ার কথা নয়।

॥ সাঁইত্রিশ ॥

ব্রজগোপাল আর ননীবালা কথা বলছেন। সেই ফাঁকে নিঃশব্দে উঠে গেল অজিত। নিঃশব্দ পায়ে বাথরুমের দরজার কাছে চলে এল। ভিতরে কলের জল বয়ে যাওয়ার শব্দ। খুব মৃদু দুটো টোকা দিল অজিত। সাড়া নেই। আর একটু জোরে টোকা দিতেই আটকানো কপাটের পাল্লা নরমভাবে একটু খুলে গেল। ভিতরে অন্ধকার। অজিত কাছেপিঠে কেউ নেই দেখে ঢুকে গেল ভিতরে।

শীলা বেসিনের ওপর উপুড় হয়ে আছে। বাড়ানো হাতে দেয়ালে ভর। হিক্কার মতো শব্দ করছে। গলায় আঙুল দিয়ে একঝলক বমি করল। পিছন থেকে অজিত পিঠে হাত রাখে। অন্য হাতে মাথাটা ধরে শীলার। বমির সময় কেউ মাথা চেপে ধরে রাখলে কষ্ট কম হয়।

কিন্তু বমি আর এল না। শীল জলের ছাঁটে চোখ মুখ ভিজিয়ে নিতে থাকে। অজিত মৃদু গলায় বলে—শ্বশুরমশাই বসে আছেন। তাড়াতাড়ি করো।

জলে ভেজা মুখটা ফেরাল শীলা। তীব্র, সজল, বড় বড় চোখ। একপলক তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলে—আমি যাব না।

অজিত বুঝল, রেগেছে খুব। বলে—বিশ্রী দেখাচ্ছে কিন্তু। চলো। ওঁরা অপেক্ষা করছেন।

একটু ক্লান্তির স্বরে শীলা বলে—তুমি যাও।

অজিত বলে—যাচ্ছি। দেরি কোরো না, প্লিজ।

বেরিয়ে আসতে যাচ্ছিল, ঠিক এ সময়ে শীলা নাটুকে ভঙ্গিতে হাতটা বাড়াল। বলল—ওগো!

অনেকটা আর্তস্বরের মতো ডাক। অজিত একটা শ্বাস ছাড়ল মাত্র। এটা দেয়াল। নইলে ও এমন কিছু অসুস্থ নয় যে, হেঁটে ঘরে যেতে পারবে না। এ অবস্থায় বমি কে না করে! গত চার মাস ধরে শীলাও করছে।

অজিত একটু কুণ্ঠিতভাবে বলে—কী?

—ধরো। পারছি না। শীলা হাত বাড়িয়ে চেয়ে আছে। অভিমান ঘনিয়ে আসছে চোখে।

অজিত বিরক্তি চেপে বলে—বাইরের ঘরে শ্বশুরমশাই। দেখতে পাবেন।

শীলা সেটা শুনল না। জীবনের শেষতম প্রশ্নের মতো গভীর গলায় বলে—ধরবে না?

আর একটা অসহায় শ্বাস ছেড়ে অজিত হাত বাড়িয়ে শীলার কোমর ধরল। শীলার ভেজা হাত বেষ্টন করে তার কাঁধ, খুবই ঘনিষ্ঠ ভঙ্গি। এইভাবেই তারা বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে। পুরো নাটক। শীলা হঠাৎ মুখটা তুলে কাঁধে মুখ ঘষে কান্নায় ধরা গলায় বলে—তুমি কী নিষ্ঠুর!

সব স্ত্রীই স্বামীকে এই কথা বলে। কারণে, অকারণে। তবু শীলার এই কথাটা যত আলগাভাবে বলা ততটা মিথ্যে নয়। অজিত তো জানে, সে কত নিস্পৃহ! কত উদাস! এ বোধ হয় অর্থনীতির ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধি! ডিমিনিশিং ইউটিলিটি। না কি, তারা কেবলমাত্র যৌন অংশীদার? নাকি পারস্পরিক নিরাপত্তার জন্য

একটা প্রাইভেট লিমিটেড? বিবাহ শব্দটির মধ্যে একটি বহ্ ধাতু আছে। তার মানে কি বহন করা? বহন করাই যদি হয়, তবে সে বড় কষ্টের। বহন কেন করবে? একদিন অফিস যাওয়ার আগে থেকে উঠে পোশাক পরছিল অজিত। হঠাৎ মাথার মধ্যে চিড়বিড়িয়ে উঠল একটা রগ। বিদ্যুৎ খেলে গেল মাথায়। সেরিব্রাল থ্রম্বসিস এভাবেই হঠাৎ হয়, জানা ছিল। সেই স্মৃতিই বোধ হয় আচমকা এসেছিল মাথায়। দু-হাতে মাথা চেপে ধরে 'এ কী। এ কী' বলে বসে পড়েছিল অজিত। শীলার সায়া-ব্লাউজ পরা হয়ে গেছে, শাড়িটা ফেরত দিয়েছিল মাত্র, অজিতের কাণ্ড দেখে শাড়িটা দু-হাতে খামচে খুলে পক্ষিণীর মতো জাপটে ধরল তাকে, দু-হাতে মাথা বুকে নিয়ে 'ঠাকুর! ঠাকুর! এ কী সর্বনাশ'। বলে চেঁচিয়ে উঠল। বলে চেঁচিয়ে উঠল। সেও জানে এইভাবে আজকাল আচমকা থ্রম্বসিস হয়, মানুষ চলে যায় বিনা নোটিশে। কিছুক্ষণ বসে থেকে সামলে নিল অজিত। কিছু না। তবু শীলা অফিস যেতে দিল না, নিজেও গেল না স্কুলে। সারা দিন আগলে বসে পাহারা দিল অজিতকে। কয়েক দিন চোখে চোখে রাখল। বিবর্ণতার মধ্যে সে ছিল উজ্জ্বল কয়েকটা দিন। প্রেমে পূর্ণ, নির্ভরতায় গদগদ। তবু অজিত ভাবে, কেন ওই পক্ষিণীর মতো ছুটে আসা, কেন আগলে ধরা! সে কি ভালবাসা! নাকি নিরাপত্তার জন্য? সে কি নান্দনিক! না কি অর্থনৈতিক। তবে কি দুটোই? ভেবে পায় না অজিত। শুধু বোঝে, মৃত্যুই মানুষকে কখনও কখনও মূল্যবান করে তোলে, নিতান্ত অপদার্থও হয়ে ওঠে নয়নের মণি। মৃত্যু নামে এক ভাবাবেগহীন, অবশ্যম্ভাবী শীতল ঘটনা মানুষের সব সময়ে মনে থাকে না, যখন মনে পড়ে, যখন মৃত্যুর কাছাকাছি এসে যায় কেউ, তখনই জাতিস্মরের মতো তার ভালবাসার কথা মনে আসে, বিরহ মনে পড়ে। জীবন বুঝি মৃত্যুর বিরুদ্ধে এক নিরন্তর লড়াই। নানাভাবে ভেবেছে অজিত। সিগারেট পুড়েছে কত! কোনও সিদ্ধান্তে আসেনি আজও।

বাইরের ঘরের পরদাটা উড়ছে ফ্যানের হাওয়ায়। স্পষ্ট ব্রজগোপালকে দেখা যাচ্ছে। উনিও চেয়ে আছেন হয়তো। দেখছেন। তবু শীলাকে ওইরকম ঘনিষ্ঠভাবে ধরে বিছানা পর্যন্ত নিয়ে আসে অজিত। বহন করা যাকে বলে।

শীলা বিছানায় বসে। সময়োচিত কয়েকটা ব্যথা বেদনার শব্দ করে। মেয়েরা বোঝে না পুরুষ কখন তাদের সম্পর্কে বিরক্ত বোধ করে। যেমন এখন। অজিত জানে শীলার কিছু হয়নি। তবু বড় বড় চোখে চেয়ে খাস টানছে শীলা, মুখে যথোচিত বেদনার ভাব ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করছে। সুভদ্রর প্রসঙ্গটার ওপর ওইভাবেই সে কি জয়ী হতে চায়? বড় বোকা। ও জানেও না সুভদ্রর প্রতি কোনও হিংসা বিন্দুমাত্র বোধ করে না অজিত। বরং মাঝে মাঝে ভাবে, ওইরকম করে যদি সময়টা ভালই কাটে শীলার, কাটুক। তবু কথাটা বেরিয়ে গেছে অজিতের মুখ থেকে। এখন তার প্রায়শ্চিত্ত।

—এখন কেমন? অজিত খুব আন্তরিকতা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে গলায়।

শীলা বোধ হয় বুঝতে পারে। যতই চেষ্টা করুক অজিত। আন্তরিকতা বোধ হয় ফোটে না। অজিতের ভাঙা, মেদহীন মুখে কয়েকটা অবশ্যম্ভাবী রাগ, বিরক্তি, হতাশার রেখা আছে, যা ফুটে ওঠে। সে লুকোতে পারে না। শীলা বোধ হয় সেটা টের পায়। অভিমানে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বলে—ভাল। তুমি যাও।

অজিত এসে আবার বাইরের ঘরে মোড়ায় বসে। একটু অন্যমনস্কভাবে শ্বশুরের দিকে তাকায়। একটা সিরাগেট খেতে বড় ইচ্ছে করছে। পায়জামার পকেটে একবার বে-খেয়ালে সিগারেটের প্যাকেটটার জন্য হাত ভরেছিল। মনে পড়ল শ্বশুর বসে আছে সামনে।

অবশ্য ব্রজগোপাল অজিতকে লক্ষ করছিলেন না। ওদিকের চেয়ারে রণেন এতক্ষণ নিঃশব্দে কথা বলছিল। ঠোঁট নড়ছে, হাতের আঙুল নাড়ছে। একটা মূক অভিনয় যেন। ব্রজগোপাল অবাক হয়ে সেদিকে চেয়েছিলেন। রণেন খেয়াল করেনি। হঠাৎ ব্রজগোপালের চোখে চোখ পড়তেই থেমে গেল। খুব বিনীতভাবে বসে রইল, মাথা নামিয়ে দু-হাত কোলের ওপর জড়ো করে।

পুরো ব্যাপারটা নজরে এল অজিতের। ও কি করছিল রণেন? অদ্ভুত তো মাঝে মাঝে রাস্তায়-ঘাটে অজিত দেখেছে বটে একটু খ্যাপাটে ধরনের এক-আধজন লোক এ রকম একা-একা কথা বলতে বলতে যায়। হয়তো পাগল নয়, কিন্তু ওরকমই। রণেনের সেরকম কিছু হয় নাকি আজকাল!

ব্রজগোপাল থমথমে মুখটা ফিরিয়ে অজিতকে বলেন—শীলুটা! কী করছে? শরীর খারাপ নাকি?

একটু চমকে অজিত বলে না—। এই আসছে।

ব্রজগোপাল একটু গলা পরিষ্কার করলেন। বললেন—তোমার এ বাড়ি কদিনের?

বিনীতভাবে অজিত বলে—কয়েক বছর হয়ে গেল। আপনি তো দেখেননি?

—না। বলে একটু চুপ করে থাকেন ব্রজগোপাল, বলেন—আসতে ইচ্ছে হলেও কী আসা সোজা! কলকাতার রাস্তাঘাট আজকাল একটুও চিনতে পারি না। নতুন নতুন বাড়ি উঠে সব অচেনা হয়ে যাচ্ছে। এত ভিড়ে ঠিক দিশেও পাই না।

কলকাতার ওপর ব্রজগোপালের একটা জাতক্রোধ আছে, অজিত তা জানে। তাই একটু উদাস গলায় বলল—পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ছে, কলকাতায় তো বাড়বেই।

ব্রজগোপাল উত্তরটা আশা করেননি। একবার তাকালেন। মাথা নাড়লেন। বললেন—সবাই তাই বলে। জনসংখ্যা। আজকাল জন-টাকে কেউ পাত্তা দেয় না, সংখ্যাটা নিয়ে মাথা ঘামায়। মানুষকে কেবল সমষ্টিগত করে দেখা ভাল না।

অজিত এককালে বিস্তর পলিটিক্সি করেছে। পথ-সভা, বিতর্ক, দাবি আদায়ের বৈঠক। তর্কের গন্ধ পেলে আজও চনমন হয়ে ওঠে। এই ছবির বিশ্বাসের মানুষটাকে যদিও কিছু বোঝানো যাবে না, তবু একটু ধাক্কা দেওয়ার জন্য সে বলে—সমষ্টিই তো আমাদের কাছে সব। সমষ্টিই শক্তির উৎস। তাকে নিয়ে তাই মাথা ঘামানোর দরকার। প্রতি জনকে নিয়ে মাথা ঘামানো সম্ভব নয়।

ব্রজগোপাল বুঝদারের মতো মাথা নাড়লেন। তারপর আস্তে করে বললেন—কোনও মানুষই নিজেকে ভিড়ের একজন বলে ভাবতে ভালবাসে না বাপু। এ হচ্ছে মিথ্যা কথা। বুকের মধ্যে সব মানুষই টের পায়, সে একজন আলাদা মানুষ, সবার মতো নয়। তিনশো কোটি মানুষের মধ্যে আমি একজনা বেনম্বরি মানুষ, গোবিন্দপুরের হেলে চাষাটাও এমন ভাবতে ভালবাসে না। বাসে, বলো?

—না বাসলেও কথাটা তো সত্যি!

—সত্যি কিনা কে জানে। তবে আজকাল যাকে রাষ্ট্র বলো, সেই রাষ্ট্র তোমাকে আমাকে মানুষের সমুদ্রে সত্তাহীন একফোঁটা জল যেমন, তেমন মনে করে। রাষ্ট্রযন্ত্রের কাছে মানুষ পিণ্ডাকার একটা সমষ্টিসত্তা। কোথায় কোন মানুষ মরল, কোন মানুষ বেঁচে রইল, কে ঠ্যাং ভেঙে পড়ে থাকল, কে পাগল হয়ে গেল তাতে তার কিছু যায় আসে না। রাষ্ট্র তা টেরও পায় না, পৃথিবীর ভারও তাতে কমেও না বাড়েও না। মানুষ যখন এটা টের পেতে শুরু করে, তখনই তার মধ্যে হতাশা, ক্লান্তি আর নানারকম বিকৃতি আসতে থাকে। দু-চারজন

যারা বড়টড় হয়, তাদের কথা ছেড়ে দাও। যারা গোলা মানুষ, অল্পবুদ্ধি, বা যারা তেমন বড়টড় হতে পারেনি, তারা নিজেদের নিয়ে পড়ে যায় বড় মুশকিলে। এই বিপুল রাষ্ট্রে তাদের স্থান কোথায়, কাজ কী, কেন তাকে পৃথিবীর দরকার, এ সব বুঝতে না পেরে সে ক্রমে নিজেকে ফালতু লোক বলে ভাবতে শুরু করে। কটা লোক ভাবতে সাহস পায় যে, তাকে ছাড়া পৃথিবী চলবে না? শহরে, গাঁয়েগঞ্জে, জনে জনে জিজ্ঞেস করে দেখো তো বাপু, এ রাষ্ট্রের তারা কে, পৃথিবীর তারা কে, এটা টের পায় কিনা?

ব্রজগোপাল একটু অন্যমনস্ক হয়ে যান বুঝি। চোখটায় একটা ঘোর লাগা ভাব, মাথা নেড়ে বলেন—বেঁচে থাকার একটা জৈব তাগিদ আছে। মরতে কেউ চায় না। কেবল সেই তাগিদে যে যার মতো পৃথিবীর সঙ্গে সেঁটে আছে প্রাণপণে। নইলে সবাই জানে সে মরলে বা পড়লে পৃথিবীর কাঁচাকলা। এই কথা সার বুঝে গেছে বলেই আজ আর কেউ রাষ্ট্র বলো, দুনিয়া বলো, জনগণ বলো, কারও কাছে কোনও দায় আছে বলে মনে করে না। বুঝে গেছে, সার হচ্ছে নিজের দায়িত্বে বেঁচে থাকা। সে কেন, কোন দুঃখে রাষ্ট্র-ফাষ্ট্র, দুনিয়া-টুনিয়া, ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামাবে! সে তো জনগণ, জনসংখ্যা, ভিড়ের একজন।

অজিত শ্বশুরের দিকে চেয়ে থাকে। একটু ক্রুদ্ধ দৃষ্টি। বলে—কোনও মানুষই তো বিচ্ছিন্ন নয়। আলাদা ব্যষ্টি হয়ে যেমন, তেমনি আবার সে সমষ্টিরও একজন। কোনওটাই মিথ্যে নয়।

—মিথ্যে হওয়া উচিতও নয়। ঠিকই তো। মানুষ যেমন আলাদা আবার তারা গোষ্ঠীবদ্ধও। কে না স্বীকার করবে? কিন্তু এখনকার রীতিই হচ্ছে আগে সমষ্টিকে দেখা, ব্যক্তির কথা তারপরে। আগে সংখ্যা, তারপর জন। কিন্তু আবার তোমার বিজ্ঞানই বলছে, পৃথিবীর কোনও দুটো জিনিসই হুবহু একরকমের নয়। পৃথিবীর প্রতিটি বালুকণা, প্রতি গাছ, প্রতি ফল, প্রতিটিই আলাদা রকমের। সে হিসেবে পৃথিবীতে ঠিক একরকমের জিনিস একাধিক নেই। তাই কারও সঙ্গে কাউকে যোগ করে এক-এ এক-এ দুই করাই যায় না। কারণ প্রতিটি একই আলাদা এক। তার কোনও দ্বিতীয় নেই। এটা আগে সবাই তোমরা বোঝো তার সমষ্টির কথা ভেব। জনগণ বা জনসখ্যা এ কথাগুলো অস্পষ্ট। প্রতিটি মানুষকে আগে বুঝতে দাও যে সে সমাজ সংসারের অপরিহার্য একজন। তাকে না হলে চলে না। নইলে মানুষ কেবলমাত্র সংখ্যাতত্ত্ব হয়ে যাবে, মানুষের ভিড় দেখে মানুষেরই ক্লান্তি আসবে। ভবিষ্যৎ বচনেরও দরকার নেই, এসে গেছে।

এই সব তত্ত্বকথা শুনেই বোধ হয় ননীবালা উঠে পড়লেন। বললেন—যাই দেখি গে।

ব্রজগোপাল নড়েচড়ে বললেন—আমিও উঠে পড়ি।

ননীবালা মাথা নেড়ে বললেন—উঠবে কী! বোসো। আসছি।

ননীবালা চলে গেলেন। রন্নাঘরের দিকেই বোধ হয়। সেদিক থেকে তাঁর গলা পাওয়া গেল, বাচ্চা ঝিটাকে বকছেন—তুই খাবার বেড়ে নিয়ে যাচ্ছিস কিরে! সবাইকে কী আর ঝি-চাকরে খাবার দিতে আছে! এ কী যে সে লোক। রাখ, আমি নিয়ে যাচ্ছি।

অজিত চুরি করে একটু হাসল। শ্বশুরমশাইয়ের দেওয়া অনেক হাজার টাকার চেক আঁচলে বেঁধে শাশুড়ি ঠাকুরুনের ভালবাসাটাসা সম্মানবোধ সব মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। বিয়ের সম্পর্কটা কি তবে অর্থনৈতিক। ভালবাসার জান কি টাকা আর নিরাপত্তার ভিতরে বীজাকারে নিহিত রয়েছে! সংসার থেকে প্রায় বহিষ্কৃত ব্রজগোপালের তো এত সম্মান প্রাপ্য নয়! সংসারের কারও ব্রজগোপালের প্রতি কোনও দরদ আছে বলে অজিত জানে না। সবাই বলে, এ লোক হচ্ছে একগুঁয়ে জেদি মানুষ, কারও সঙ্গে বনে না। কথাটা ঠিক। তবু

অজিত মনে মনে এ-লোকটাকে হিংসে করে। এ লোককে দিনে দশবার বউয়ের অকারণ রাগ অভিমান ভাঙাতে হয় না, এ লোক বিবাহের বহন করার কষ্টকর কাজ থেকে কৌশলে নিজেকে সরিয়ে নিতে পেরেছে। এ সব তো বটেই। তার ওপর অজিত দেখেছে, এ লোকটার ভিতরে এখনও ভালবাসা মরে যায়নি। নইলে কেউ বয়স্ক জামাইয়ের হাতে মিষ্টি খাওয়ার টাকা দিতে পারে। অজিত হলে পারত না।

একটা চমৎকার মিঠে কমলা রঙের শাড়ি সদ্য পরে ঘর আলো করে শীলা ঘরে এল। চুলটুল আঁচড়ে এসেছে। চোখে এখনও কান্নার ফোলাভাব। কপালে সিঁথিতে সিঁদুর দগদগে। মুখে একটু পাইডারের ছোঁয়া। এ সবই মুখের ভাব, কান্নার চিহ্ন ঢাকার ছদ্মবেশ। কোনও কথা না বলে প্রণাম করল বাপকে। ব্রজগোপাল মাথায় হাত রাখলেন। একটু বেশিক্ষণ রাখলেন যেন। চোখটা বুজলেন। ইষ্ট স্মরণ করলেন বোধ হয়।

শীলা বাপের পাশ ঘেঁষে বসল। আঁচলটা কুড়িয়ে নিয়ে মুখে চাপা দিল একটু বলল—কেমন আছ বাবা?

ব্রজগোপাল উদাস স্বরে বললেন—আছি। আমাদের আর বিশেষ কী। তোরা কেমন?

শীলা মাথা নেড়ে বলে—ভাল।

ব্রজগোপাল একটা শ্বাস ছেড়ে বলেন—সংসারের কাজটাজ সব করিস নিজের হাতে?

শীলা হাসল একটু। বিবাহিতা বয়স্ক মেয়ের উপযুক্ত প্রশ্ন নয়; তবু বলল—করি।

—করিস! বলে ব্রজগোপাল হাসেন—কখন করিস? তুই তো চাকরি করছিস, শুনেছি।

—দুটোই করি।

—চাকরি করিস কেন? অজিতের আয়ে তোদের চলে না? ওর তো রোজগার ভালই।

—আজকাল সব মেয়েই করে।

—তাই করিস? নিজের ইচ্ছেয় নয়? প্রয়োজনও নেই?

শীলা একটু অপ্রস্তুত হয়। অনেকদিন পর বাপের সঙ্গে দেখা, তাই বোধ হয় মানুষটাকে ঠিক বুঝতে পারে না। একপলক বাবাকে দেখে নিয়ে বলে—টাকার দরকার তো আছেই। সময় কাটে না। লেখাপড়া শিখেছি, সেটাও তো কাজে লাগানো উচিত।

—ও। বলে ব্রজগোপাল বুড়োটে মুখে দুষ্টুমির হাসি হাসেন। যেন তাঁর এ-মেয়েটা নাবালিকা এবং তিনি তার সঙ্গে খুনসুটি করছেন। বলেন—মেয়েরা যেন এত টাকার ফিকির খোঁজে রে? পুরুষ যদি খাওয়াতে পরাতে না পারে তখন না হয় কিছু করলি। এমনি খামোকা চাকরি করবি কেন? এককাঁড়ি টাকার মধ্যে কি সুখ? বেশি বহির্মুখী হলে মেয়েদের মধ্যে ব্যাটাছেলের ভাব এসে যায়। সংসারেও বিরক্তি আসে। স্বামীর সঙ্গে পাল্লা টানে। ও ভাল নয়।

শীলা মাথা নিচু করে চুপ করে আছে। তর্ক করে লাভ কী!

ব্রজগোপাল তেমনি দুষ্টুমির হাসি হাসেন। আচমকা বলেন—ট্রামে বাসে পুরুষের বগলের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে রোজ যাতায়াত। সেও বিশ্রী। পুরুষেরাও তো ভাল নয়। কত লোকের মনে কত বিকৃতি আছে। তারচেয়ে বরং হামলে সংসার করবি। নিজের হাতে রেঁধেবেড়ে দিবি। স্বামীর সেবা নিজের হাতে করলে ভালবাসা আসে। এ তো আর অংশীদারি কারবার নয় যে, যে-যার ভাগের টাকা ঢেলে সংসার চালালি।

ব্রজগোপাল ডান হাতে মেয়ের দীর্ঘ এলো চুলে একটু হাত বুলিয়ে দিলেন। বললেন—বাচ্চাকাচ্চা যখন হবে তখন দেখবি। মা-বাপ ছাড়া বাড়িতে কেমন অনাথ হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

ননীবালা খাবারের প্লেট আর চা হাতে এলেন।

ব্রজগোপাল একটু তাকালেন মাত্র সেদিকে। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন—ও নিয়ে যাও।

—মেয়ের বাড়িতে এসেছ, একটু মুখে দিতে হয়।

—যখন-তখন খাই না আজকাল। অভ্যেসও নেই। ওদের সব দাও।

বলে ছেলের দিকে তাকালেন। অজিত লক্ষ করে, রণেনের ঠোঁট আবার নড়ছে। আঙুলে বাতাসের একটু শূন্য আঁকল রণেন। কাকে যেন উদ্দেশ করে নিঃশব্দে কী বলে যাচ্ছে।

॥ আটত্রিশ ॥

এই ছেলেটার বরাবরই বড় ঘাম হয়। ধুতি পাঞ্জাবি পরা, মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে, তবু গলা বগল ভিজে গেছে। ননীবালা উঠে ফ্যানের স্পিড বাড়িয়ে দিয়ে বলেন—তুই অত ঘামিস কেন?

রণেন দু-হাতে মাথা চেপে বসেছিল। মুখ তুলে কেমন একরকম ভাবে তাকায়। পাঁজর কাঁপিয়ে একটা শ্বাস ছাড়ে। হঠাৎ চোখের ডিম উলটে শিবনেত্র হয়ে বলে—মা! মাগো!

গর্ভধারিণীকে নয়, যেন জগজ্জননীকে ডাকছে। ডাকটা বেখাপ্পা শোনাল। এ ছেলেটা ননীবালার তেমন সুখী নয়। বউটা তেমন হয়নি, বড্ড খোঁড়ে। ছেলেটা বউয়ের তাল রাখতে পারে না। বোধ হয় ঝগড়াটগড়া হয়েছে আবার। এখন তো বাসায় ননীবালা নেই, রক্তারক্তি হলে চেঁচাবে কে, আটকাবে কে! ননীবালার বুকটা তাই কেঁপে ওঠে। কী করার আছে! বুড়ো হলে মানুষের আর সংসারে বিশেষ কিছু করার থাকে না। এখন তো আর কোলের সেই ন্যাংলা রণো নয়, এখন পুরোদস্তুর স্বামী-বাপ সংসারের ভিত। এই ছেলেকে ননীবালা আগলে রাখেন কী করে! তবু মনের মধ্যে একটা দুশ্চিন্তা ছায়া ফেলে। বড়বেশি দিন মেয়ের বাড়িতে থাকা হল। এবার একবার ওদিককার সংসারে একবার গা ফেলবেন।

বলেন—কবে নিয়ে যাবি আমাকে?

রণেন চোখ বুজে ছিল। বলল—যবে খুশি।

—আজই চল। বুবাই-টুবাই ঠাকুমা ছাড়া কেমন করে সব? মা তো জো পেয়ে খুব ঠ্যাঙায়। ঠ্যাঙাড়ে বাড়ির মেয়ে।

খাবারটাবার সব পড়ে আছে। কেউই ছোঁয়নি এখনও। শীলা বলল—বাবা, খাও।

ব্রজগোপাল প্লেটের দিকে তাকিয়ে বলেন—তোরা খা। এ বয়সে যখন-তখন খাওয়া বড় অপয়া। যত কম খাই, তত ভাল থাকি।

—একটু শরবত দিই বাবা?

ব্রজগোপাল একটু ঘাড় নাড়লেন। মুখে দুশ্চিন্তার চিহ্ন। বললেন—সেটা বরং সহজে গলা দিয়ে নামবে। নিজের হাতে করে আনিস যদি।

—আনছি। বলে শীলা উঠে গেল।

ব্রজগোপাল চারদিকে একবার তাকালেন। কিন্তু কিছুই দেখলেন না। দৃষ্টিটা এসে স্থির হল ননীবালার চোখে। ননীবালাও চেয়ে আছেন। একদৃষ্টে। তাঁদের ভালবাসা ছিল। সে-আমল এখনকার মতো নয়। সারা দিন কেউ কারও দেখা পেতেন না। রাতে দেখা হত, কিন্তু কথা হত ফিসফিসিয়ে, যেন গহীন রাতের চোরেও না শুনতে পায়। এই যে এখন যেমন, মা-বাপের সামনে মেয়ে আর জামাই বসে থাকে, কিংবা ছেলে আর ছেলের বউ, এরকমটা ভাবা যেত না। নিজের বাবার সঙ্গে কখনও বসে কথা বলেননি ব্রজগোপাল, সর্বদা দাঁড়িয়ে

থাকতেন। ননীবালার সঙ্গে যৌবন বয়সে বেড়াতে বেরিয়েছেন জোড়ে, এমন মনে পড়ে না। বউ ছিল শুধু রাতটুকুর জন্য, বেহানেই সে হয়ে যেত সংসারের একজন, স্বামীর কেউ নয়। তুব ভালবাসা তো কিছু কম ছিল না। আর এখন স্বামী-স্ত্রী বড় বেশি পায় পরস্পরকে। এদের বিরহ কম। এদের বিবাহের পুরোহিত হচ্ছে কামস্পৃহা। মনে মনে তাই বড় তাড়াতাড়ি দূরের হয়ে যায়। কাছে কাছে থেকেও। কামটুকু ফুরোলেই আর থাকে কী! অবশ্য ব্রজগোপাল আর প্রমাণ করতে পারেন না যে, তাঁর এবং ননীবালার মধ্যে ভালবাসা ছিল। প্রমাণের দরকারই বা কী? মনে মনে তিনি তো জানেন, তাঁর হৃদয় ননীবালার নিরন্তর মঙ্গল প্রার্থনা করে। স্থির জানেন, পরজন্মেও তাঁর বউ হবে এই ননীবালাই। ছাড়ান কাটান নেই, এই এক সম্পর্ক। এসব কি প্রমাণ করা যায়।

ননীবালার চোখে চোখে আটকে গেল। ননীবালাই সামলালেন আগে। ঘোমটা ডান কানের পাশে দিয়ে একটু টেনে দিয়ে বলেন— বুকের ব্যথাটা কি আর হয়?

—না।

শরীর-টরীর খারাপ হলেও তো খবরবার্তা কেউ দেয় না যে গিয়ে পড়ব।

ব্রজগোপাল মুখটা ফিরিয়ে নেন। বলেন—ব্যস্ত হওয়ার মতো ব্যাপার কী! মেঘু ডাক্তার আমলকী আর মধু খেতে বলেছিল। সেই খেয়ে এখন ভালই আছি।

—রাতে বোবায়-টোবায় ধরলে কে ডেকে দেয়! বুড়ো বয়সে একা শোওয়া ভাল নয়, রাতটা ভয়ের।

ব্রজোগোপাল তাচ্ছিল্যের ভাব করে বলেন—শোয় একজন। উটকো লোক, পেল্লায় ঘুম তার। আর বোবায় ধরবে কাকে, ঘুমই নেই।

ননীবালা বলেন—মাটির ভিত্-এর ঘর। এই গ্রীষ্মকালটায় সাপখোপ সব ঘরেদোরে চলে আসে। বহেরু যেন ঘরের গর্তটর্ত সব বুজিয়ে দেয়।

ব্রজগোপাল উত্তর করলেন না। তবু ননীবালার এই উদ্বেগটুকু বহুকাল বাদে তাঁর বেশ লাগছিল। এটা টাকায় কেনা জিনিস নয়, স্বার্থত্যাগ মানুষকে কখনও-সখনও একটু বা মহৎ করে। ব্রজগোপালের মূর্তিটা বোধ হয় ননীবালার বুকের মধ্যে ঘষা-মাজা খেয়ে একটু স্পষ্ট হল।

কিন্তু মেয়েমানুষের দোষ হল, সে বেশিক্ষণ আলগা ভালবাসার কথা বলতে পারে না। তার মধ্যে হঠাৎ বিষয় সম্পর্কিত কিংবা সংসারের আর পাঁচটা কথা এনে ফেলে। বেসুর বাজতে থাকে।

যেমন ননীবালা এসব কথার পর হঠাৎ বলেন—এবারও বহেরু ধানের দাম কম দিল।

ব্রজগোপাল মাথা নাড়লেন। বললেন—বহেরুর হাতে তো সব নয়। ছেলেরাই এখন সব করছে।

—কেন, বহেরুর কী হয়েছে?

ব্রজগোপাল হাসলেন। বললেন—কী আর হবে। বুড়ো হয়েছে। সে যতদিন দেখত ততদিন বুঝেসুঝে দিত। ছেলেরা দেবে কেন? তারা বর্গা ভাল জানে। যা দেবে, তাই নিতে হবে।

—তুমি তো আছো, তুমি দেখতে পারো।

ব্রজগোপাল মাথা নেড়ে বলেন—ছড়ানো জমি, অত কি একটা মানুষ দেখতে পারে! তার ওপর মাঝেমধ্যে তো মানুষের মন বিষয় থেকে উঠে যায়। আমার ওসব আর ভাল লাগে না। নিজের হাতে গাছপালা যে

এখনও করি সে ফুলপাকুড় খাব কী টাকা হবে বলে নয়। গাছ জন্মায়, ফল দেয়, ফুল ফোটে, সেটা চোখে দেখার একটা মায়া আছে, তাই।

ননীবালা রাগ করেন না, তবু অনুযোগের সুরে বলেন—সেটা কি কোনও কাজের কথা! ছেলেরা যেতে পারে না বলে তুমি রাগ করো। কিন্তু তারা কি তোমার মতো বিষয়বুদ্ধি রাখে! তুমি না দেখলে তো হবে না।

ব্রজগোপাল একটু চুপ করে থেকে বলেন—তারা না গেল, তা বলে আমাকে যক্ষবুড়ো হয়ে থাকতে হবে কেন? তোমার তো মোটে পাঁচ কী ছ-বিঘে, আমার তারচেয়ে ঢের বেশি। যা ফসল হয় তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ রাখি, বাকি, চার ভাগ খয়রাতিতে যায়।

—সে কেন?

—ওটা আমার একটা ব্রত।

—দেবত্র করলে নাকি?

—ওরকমই।

ভারী উদ্বিগ্ন হয়ে ননীবালা প্রশ্ন করেন—সে কেন?

ব্রজগোপাল ননীবালার উদ্বেগটা টের পেয়ে হেসে মাথা নেড়ে বললেন—ভয়ের কিছু না। ঠাকুর দেবতার নামে লিখে দিইনি, আমার নামেই আছে, আমার ওয়ারিশ যারা তারাই পাবে। কিন্তু পেলেও আমার ব্রতটা যেন তারা না ভাঙে। ফসলের পাঁচ ভাগের এক ভাগ নেবে, বাকি থেকে যা আয় হবে তা দিয়ে সম্পত্তি বাড়াবে। আর মানুষকে দেবেথোবে, অনাহারীকে খাওয়াবে, গরিব গুর্বোদের দেখবে, কাঙাল ফকিরকে সাহায্য করবে।

—সে তো ভূতভোজন হল। তবে ওরা খাবে কী?

ওদের খেতে বারণ নেই। খেয়েপরেও অনেকের খানিকটা থাকে। দেয় না।

—সে যাদের অনেক আছে তারা দিকগে। আমাদের তো জমিদারি নেই। বছরে সামান্য কটা টাকা। সেও ভূতভোজনে গেলে জমি লোকে করে কেন?

—নিজের জন্যেই করে। জমি, সম্পত্তি, চাকরি সবই নিজের জন্য। সে একশোবার। আবার গরিব গুর্বো, শিয়াল কুকুর, কাক শালিখকেও ভাত দেয়, সেও নিজের স্বার্থেই দেয়। জগৎসংসারে থাকতে হলে প্রতিকূলভাবে না থেকে অনুকূলভাবেই থাকা ভাল। আমি তৃপ্ত হই, আমার চারদিক তৃপ্ত হোক।

—ওসব ভাল কথার দিন কি আর আছে! শখের গয়না বেচে জমি কিনেছিলে, আমারটা খয়রাতি হতে দেব কেন?

ব্রজগোপাল ননীবালার দিকে একটু চেয়ে থাকেন। সামান্য বুঝি অভিমান ভরে বলেন— তোমার দুঃখ কী! সংসারে আটকা আছো, বুঝতে পারো না মানুষজন কীভাবে বেঁচে আছে। চারদিকে মানুষজন যত উপোসী থাকবে, যত অতৃপ্ত অশান্ত হবে তত তোমার সংসারে তাদের হাত এসে পড়বে। ছেলেদের ভালই যদি চাও তো তারা যে সমাজ সংসারে আছে তার আগে ভাল করো। শুধু আলাদা করে রণেন সোমেনের ভাল চাইলেই কি ভাল হয়?

ননীবালা ধৈর্য রাখতে পারেন না। আঁচলে বাঁধা চেকটার কথা ভুলে গিয়েই বুঝি তেড়ে ওঠেন—ওসব আমি বুঝি না। ব্রতট্রত ওরা মানতে পারবে না। পুরো ফসলের হিসেব যদি না পাই তো জমি বেচে দেব।

অজিত এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। একটু বিষণ্ণ, একটু অনুতপ্ত, শীলার জন্যই। এখন হঠাৎ বলল—উনি বোধ হয় ওইভাবে একটা ব্যালান্স অফ ইকনমির চেষ্টা করছেন।

ননীবালা জামাইয়ের দিকে একটু ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন। জামাইটা বড় ট্যাটন। লঘুজন-গুরুজন মানে না, পট পট কথা বলে। একটু আগে বুড়ো শ্বশুরের মুখে মুখে জবাব করছিল। বললেন—কী বললে?

অজিত হেসে বলে—গরিবকে দিয়েথুয়ে খুশি রাখলে বড়লোকদের এরকম সুবিধেই হয়। ধর্মও হয়, শোষণের সুবিধে হয়।

ননীবালা কথাটা বুঝলেন না। মানলেনও না। গম্ভীরভাবে বললেন—বড়লোকরা যা খুশি করুক। আমরা করতে যাব কেন?

শীলা চমৎকার কাচের গ্লাসে ঠান্ডা শরবত এনে রাখলে টেবিলে। মুখখানা একটু ভার, একটু নত। বাপের কাছে বসে মুখ তুলে মাকে বলল—চুপ করো তো মা। বাবার জমি যা খুশি করুক, তোমার কী!

—আহা, বড় বাপসোহাগী হলেন! ননীবালা এই ঢঙে কথা বলে রাগের মাঝখানেও হেসে ফেললেন একটু। পরমুহূর্তে গম্ভীর হয়ে বললেন—ওঁর জমি মানে ছেলেদেরও। ছেলেরা তো আকাশ থেকে পড়েনি, ওঁরই জন। পর নয়।

ব্রজগোপাল মলিন একটু হাসলেন। বললেন—ছেলেরা বাপের পর হবে কেন, তারা শ্রাদ্ধের অধিকারী।

কথাটার মধ্যে একটু ব্যঙ্গ ছিল, আর বুঝি নিজের মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দিয়ে ভয় দেখানোর চেষ্টা। ননীবালা দমলেন না, বললেন—শ্রাদ্ধের কথা ওঠে কেন? বেঁচে থাকতে কি অধিকার থাকে না নাকি?

মাথাটা দু-হাতে কঠিনভাবে চেপে ধরে বসেছিল রণেন। হঠাৎ উত্তেজিত মুখ তুলে বলে—মা!

এবার জগজ্জননীকে নয়, নিজের নাকেই বলা। বরাবর এ ছেলেটা বাপের পক্ষ হয়ে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করেছে। শেষমেষ বাপের উপরেও বিরক্তি এসেছিল। তবু বুঝি এখনও কিছু পক্ষপাত রয়ে গেছে। ননীবালা ঝাঁকি দিয়ে বললেন—কী, বলবি কী? বাপের সম্পত্তিতে তোর দরকার নেই এই তো! তোর না থাকে, সোমেনের আছে। আমি ছাড়ব না।

ব্রজগোপাল খানিকটা হতভম্বের মতো চেয়ে থাকলেন। শীলা শরবতের গ্লাসটা তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বলে—বাবা খেয়ে নাও তো। ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করে এনেছি, আবার গরম হয়ে যাবে।

ব্রজগোপাল গ্লাসটা ধরলেন না। ননীবালার দিকে চেয়ে বললেন—বরাবর দেখে আসছি তুমি সংসারের দুটো পক্ষ তৈরি করে নিয়েছ। আমি একদিকে, ছেলেরা আর তুমি অন্যদিকে।

শীলা মাকে একটু চোখ টিপে বলে—মা, তুমি একটু রান্নাঘরে যাও তো। ঝি মেয়েটাকে দুধ জাল দিতে বলে এসেছি, ও গ্যাসের উনুন নেবাতে পারে না। যাও।

ননীবালা নড়লেন না। এর একটা বিহিত করতে হবে বলে বসে রইলেন। বললেন—ওঁর কথাটা শুনিছিস। আমি দুপক্ষকে পর করেছি। ঝগড়া লাগিয়েছি।

—তা নয়। ব্রজগোপাল মাথা নেড়ে বললেন—তা নয়। দু'পক্ষকে বুঝতে দিলে না। তাদের সম্পর্কে কী। কথাটা বোঝানো শক্ত। তর্ক করে বোঝানো যাবে না। তবু তোমাকে একটা জিনিস বুঝতে বলি, আমিও ছেলেদের ভাল চাই।

—ভাল চাইলে আর দেবত্র করে দেবে কেন?

অজিত আবার আস্তে করে বলে—ব্যালান্স অফ ইকনমি।

ঠাট্টা! ব্রজগোপাল জামাইয়ের দিকে তাকালেন। তারপর নিজের ক্যাম্বিসের ব্যাগটার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন—না বাবা, ব্যালান্স অফ ইকনমি আমি বুঝি না। আমি বড় স্বার্থপর। সার বুঝি, আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে সেইজন্যই ভয় খাই। আমার সন্তানের দুধ ভাত একদিন নিরন্ন, বর্বর মানুষ যদি কেড়ে নেয়! তাই এই ত্যক্তেন ভূঞ্জীথাঃ। তবে একজন অ্যাকচুয়ারির সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। বিজ্ঞ লোক। সে ওই ব্রতর কথা শুনে বলেছিল—এ ভারী আশ্চর্য জিনিস, ব্রজদা, ঘরে ঘরে সবাই এমন করলে মুহূর্তের মধ্যে আমাদের দুর্দিন, অভাব কষ্ট সব লোপাট হয়ে যাবে। আমি তো অত বুঝি না। বুড়ো বামুন যেমন বলে গেছে তেমন করি। আমার বুঝটা বড় সাদামাটা।

কেউ কোনও কথা বলার আগেই ব্রজগোপাল উঠে দাঁড়ালেন। ভারী ক্লান্ত দেখাছিল। শীলা উদ্বিগ্ন মুখে বলে—শরবতটা খেলে না বাবা!

ব্রজগোপাল সে কথায় কান না দিয়ে বললেন—ভূতভোজনের কথা বলছ, ভয় বোধ হয় হ্যাঙালি ক্যাঙালিরা এসে রোজ ভাগাড়ের শকুনের মতো পড়বে। কিন্তু এ কাঙালি ভোজনের ব্যবস্থা নয়, দরিদ্র নারায়ণ সেবাও নয়। বসিয়ে খাওয়ালে মানুষের গতরে মরচে পড়ে যায়, আর নড়ে না। এ কে না জানে! অযোগ্য অপাত্রে দান, দাতা গ্রহীতা দুই-ই ম্লান। কিন্তু সেবাবুদ্ধি থাকলে মানুষের ঠিক অভাবের জায়গায় হাত বাড়ানো যায়। কত বড়মানুষেরও কত অভাব আছে। আমি যেমন বলছি তেমন করলে নিজের মধ্যেও সেবাবুদ্ধি জাগে, পাঁচজনেও দেখে শেখে। তা এসব কথা তো তোমাদের কাছে অবান্তর।

ননীবালা কী বলতে যাচ্ছিলেন, রণেন আবার বলল—মা!

ননীবালা ছেলের দিকে চেয়ে সামলে গেলেন। রণেনের মুখ লাল। চোখ দুটো বড় ঘোলাটে লাগল। ননীবালা একটা দীর্ঘশ্বাস, ফেললেন। ব্রজগোপালের দিকে চেয়ে বললেন—উঠলে নাকি?

—উঠি। অনেক দূর যেতে হবে।

ননীবালা বাধা দিলেন না। বললেন—দুর্গা, দুর্গা। জোড়হাত কপালে ঠেকিয়ে শীলার দিকে চেয়ে বলেন—আজ আমি একবার ও-বাড়ি যাব। ছাদ থেকে আমার জামাকাপড়গুলো আনতে বল তো!

রণেন রয়ে গেল, মাকে নিয়ে বাসায় ফিরবে। ব্রজগোপাল একাই বেরিয়ে এলেন। রাস্তায় পা দিয়ে হঠাৎ টের পেলেন, তিনি বড় বেশি একা। ভয়ংকর একা। বুকের ভিতরটা যেন এক চৈত্রের ফুটি-ফাটা মাঠ, সেখানে এক ন্যাড়া গাছে বসে দাঁড়কাক ডাকছে—খা, খা।

উত্তজনা বীজমন্ত্রের খেই হারিয়ে গিয়েছিল। ছেঁড়া সুতোটা মনের মধ্যে কাটা ঘুড়ির সুতোর মতো ভেসে বেড়াচ্ছে। বীজনাম অতিদ্রুত স্পন্দিত হতে থাকল শরীরে, রক্তে, হৃৎস্পন্দনে। নির্ঝরের মতো। অবগাহন হতে থাকে। তবু মনটা ভাল না। ছেলেটা ভাল নেই, মেয়ে-জামাইয়ের মধ্যে একটা কেমনতর ভাব! আর ননীবালা! এখনও এই আয়ুর সাঁঝবেলায় দু-হাতে ছেলেদের স্বার্থ আগলাচ্ছে। ব্রজগোপাল তাই এই মস্ত জগৎসংসারে বড় একা।

নির্জন পাড়াটা পার হয়ে বড় রাস্তায় লোকজনের মাঝখানে চলে এলেন ব্রজগোপাল। তখনও মনটা ওইরকম খাঁ-খাঁ করছে। আপন মনে বলেন—দূর বেটা, তুই যে নেংটে নেই নেংটে। একা আবার কী? একটা

শ্বাস ছেড়ে ব্রজগোপাল বাস-স্টপে ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। চারদিকে ফুলিয়ে ওঠা কলকাতার ভিড়, ট্রামে-বাসে লাদাই ভিড়, ধুলোটে আকাশ। তারই মাঝখানে হঠাৎ যেন বহুদূরের এক চিত্র ভেসে ওঠে। যজ্ঞস্থলীতে অনেক মানুষ জড়ো হয়েছে। যজ্ঞধূমের গন্ধ ভেসে আসে। কী পবিত্র পৃথিবী! কী পরিষ্কার এর বাতাস! ব্রজগোপাল তাঁর পরিবারের কথা ভুলে গেলেন। বুড়ো বামুনের মুখটা ভেসে ভেসে ওঠে নাসামূলের আজ্ঞাচক্রে।

ননীবালা যখন ঢাকুরিয়ার বাড়িতে পা দিলেন তখন সন্ধে হয়ে গেছে। নাতি-নাতনিরা মাস্টারের কাছে পড়ছিল, ঠাকুমাকে দেখে দৌড়ে এসে সাপটে ধরল। ঠাকুমা, ঠাকুমা ডাকে অস্থির। বাচ্চাকাচ্চা না থাকলে আর বাড়ি কী! শালির বাড়িতে এ ক'দিন যেন হানাবাড়িতে কেটেছে। হাঁফ ধরে গিয়েছিল।

ছোট নাতিকে ট্যাঁকে গুঁজে নিজের ঘরের তক্তপোশে এসে বসলেন। ভারী একটা নিশ্চিন্তভাব। বীণা একবার উঁকি দিয়ে জিজ্ঞেস করে গেল—চা খাবেন তো! হচ্ছে।

—দিয়ো, বললেন ননীবালা। নাতিটা ধামসাচ্ছে। বললেন—বড় ডাকাত হয়েছিস দাদা।

চারদিকে চেয়ে দেখলেন। সোমেনের টেবিলে ছাইদানিটা উপচে পড়ছে পোড়া সিগারেট, দেশলাই কাঠি আর ছাইতে। বিছানার চাদর নোংরার হদ্দ। মশারিটা আগে খুলে ভাঁজ করে রাখা হয়, এখন চালি করে রাখা, তাতে ময়লা হয়েছে। বিছানায় ছাড়া জামাকাপড় পড়ে আছে।

এসব সারতে থাকেন ননীবালা, আর আপনমনে বক বক করেন। পরোক্ষে বউকেই শোনান।

ঘরদোর সেরে পরনের কাপড়টা পালটে নিলেন। ভাঁজ করে তুলে রাখতে যাবেন এমন সময়ে আঁচলের গেরোটা চোখে পড়ল। সাবধানে পেট আঁচলে বেঁধে এনেছেন। সেই চেকটা খুলে শত ভাঁজের দাগ ধরা চেকটা আলোয় দেখলেন একটু। চোখে জল এল। অনেকগুলো টাকা। এত টাকা ও-মানুষ জন্মে কখনও দেননি ননীবালাকে। এতকাল গরিবেরই ঘর করেছেন ননীবালা, টাকার মুখ বড় একটা দেখেননি। লোকটা যে শেষ পর্যন্ত দেবে এমন বিশ্বাস ছিল না। তবু দিল তো!

ননীবালা চেক হাতে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। চোখে জল। বুকে বৃষ্টিপাত। নাতিটা অন্যধারে বসে চিঁড়ের মোয়া খায় টুক-টুক করে। ননীবালার মনটা উদাস হয়ে যায়। লোকটা অনেক টাকা এককথায় দিয়ে দিল। বিষয় সম্পত্তিও সব দেবত্র না কী যেন মাথামুণ্ডু করছে। হল কী মানুষটার! চিরকালই ঘর-জ্বলানি, পর-ভুলানি ছিল বটে, কিন্তু এখনকার রকমসকম বুঝি কিছু আলাদা। সংসারের ওপর থেকে মায়া তুলে নিচ্ছে না তো! দুম করে একদিন ননীবালাকে রেখে চলে যাবে না তো! বুকটা কেঁপে ওঠে। গভীর শ্বাস পড়ে।

ও-ঘরে বীণার খর গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কী যেন হল। একটু কান পাতলেন ননীবালা। কিছু বুঝতে পারলেন না।

বীণা এসে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে চাপা স্বরে বলে—মা, একবার ও-ঘরে আসুন।

—কী হল?

—আপনার ছেলে কেমন করছে।

বীণার মুখটা থমথমে। ননীবালা উঠলেন, বললেন—ওকে সবাই বড় জ্বালায়।

শোওয়ার ঘরে রণেন বসে আছে চেয়ারে। কপালে একটা জায়গায় থেঁতলে যাওয়ার ক্ষতচিহ্ন, রক্ত।

ননীবালা গিয়ে ছেলেকে ধরলেন—কী হল?

বীণা বাইরের ঘরের দিকের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলে—ওঁকে আমি বলেছিলাম হাতমুখ ধুয়ে এসে চা খাও। উনি গেলেন না। তারপর আমি রান্নাঘর থেকে ঘুরে এসে দেখি। ড্রেসিং টেবিলের কোনায় মাথা ঠুকছেন।

—কে কী? ননীবালা রণেনের দু-কাঁধ ধরে মুখ নিচু করে বড় ছেলের মুখ দেখলেন ঠিক যেমন করে মা শিশু-ছেলের মুখ দেখে—কী হয়েছে তোর, ও রণো! মাথা খুঁড়ছিলি কেন?

রণেন তার তীব্র ঘোলাটে চোখ তুলে একবার অদ্ভুতভাবে তাকাল। গভীর শ্বাসের মতো শব্দ করে বলল—মা!

॥ উনচল্লিশ ॥

মানুষ কত অসুখী! এরা জানেই না কী করে জীবনযাপন করতে হয়। ব্রজগোপালের মন বড় কু-ডাক ডাকে। সবাইকে ছেড়ে আলগা আছেন তবু সমস্ত মনপ্রাণটা ওদের দিকে চেয়ে। বসে থাকে। ঠাকুর ওদের সুখে রাখো।

হাওড়ায় এসে ট্রেন ধরলেন ব্রজগোপাল। অফিস-ভাঙা-ভিড়। আজকাল বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে পা-দুটো রসস্থ হয়। ওপরে ঝোলানো হাতল ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছিল, তাই হাতটাও ভেরে আসে। ক্যাম্বিসের ব্যাগটা ধরে রাখতে কষ্ট হয়। চারধারে মানুষের শরীরের ভাপ, গরম, ঘাম, দুর্গন্ধ। মাথার ওপর পাখা নেই। হাওয়ার জন্য দরজার হাতলে বিপজ্জনকভাবে মানুষ ঝুলছে। বদ্ধ, চাপা অবস্থায় দাঁড়িয়ে থেকে ব্রজগোপালের মাথাটা দুবার চক্কর খেল। মাথাঘোরার রোগটা তাঁর যৌবন বয়স থেকেই। তালুতে তিল তিল চেপে ঠান্ডা জলে মাথা ধুলে একটু আরাম লাগে। দাঁড়িয়ে ব্রজগোপাল বারবার বীজমন্ত্র জপ করার চেষ্টা করেন। বারবার সুতো ছিঁড়ে যায়। কাটা ঘুড়ির মতো বনটা ভেসে বেড়াচ্ছে। একবার রণেনের মুখটা মনে পড়ে, একবার ননীবালার, মেয়ে-জামাই, ছেলে-বউ, নাতি-নাতনি সকলের কথাই ভাবেন। বীজমন্ত্র ধরে রাখতে পারেন না। শরীরটা আজ বড় বেগোছ। এই দমচাপা অবস্থায় কারা ভিতরের দিকে ফুটবলের ব্যাপার নিয়ে চেঁচামেচি করছে। সেই গোলমালটা অসহ্য লাগে, আর সিগারেটের ধোঁয়া।

পরপর কয়েকটা স্টেশন পার হতেই ভিড় পাতলা হয়ে গেল। উত্তরপাড়া পার হয়ে বসার জায়গা পেলেন ব্রজগোপাল। ব্যাগটা কোলের ওপর রেখে বসলেন। হালকা জিনিসপত্র কখনও ব্যাঙ্কের ওপর রাখেন না তিনি। যদি চুরি যায়! চুরি যাওয়া ভাল নয়। যার চুরি যায় তার চরিত্রের মধ্যে কোথাও ঢিলেমি আছে, অসংলগ্নতা আছে। যত সামান্য জিনিসও হোক, ব্রজগোপাল সদাসতর্ক থেকে পাহারা দেন!

একটা মোটামতো পশ্চিমা লোক সরে বসে ব্রজগোপালকে জায়গা করে দিয়েছিল, লোকটার গায়ে খয়েরি রঙের এরটা পাঞ্জাবি, পরনে পরিষ্কার ধুতি, মাথায় একটু টিকি আছে, হাতে ভোলা একটা ছোট বই। খুব মন দিয়ে বইটা পড়ছে। ব্রজগোপাল একটু উঁকি দিয়ে দেখেন, বইটার পাতা জুড়ে দেবনাগরী অক্ষরে কেবল একটা কথাই ছাপা আছে, সীতারাম, সীতারাম, সীতারাম। প্রথমটায় কিছু বুঝতে পারলেন না তিনি। পশ্চিমা লোকটা পাতা ওলটাল। আবার দেখেন, ওই একই কথা লেখা সারা পাতায়, সীতারাম, সীতারাম, সীতারাম। বুঝলেন, সারা বই জুড়ে ওই একটি কথাই আছে। গল্প না, প্রবন্ধ না, ধর্মকথা না।

ব্রজগোপাল একটু ঝুঁকে বললেন—এটা কীসের বই ভাই?

লোকটা মুখ তুলে একটু হাসল। পাকানো মোচের নীচে বেশ ঝকঝকে হাসি। মাঝবয়সি মানুষ। দেখে মনে হয় কোথাও বেশ ভাল বেতনের দায়োরান-টারোয়ানের চাকরি করে বলল—রামসীতার নাম আছে বুড়াবাবা, আর কুছু নাই।

—সে তো মনে মনে জপ করলেও হয়।

—এ ভি জপ আছে। পড়তে পড়তে জপ হয়ে যায়।

তাই তো! ব্রজগোপাল ভারী মুগ্ধ হয়ে যান। এই হচ্ছে এৎফাঁকি বুদ্ধি। দুনিয়ার টানাপোড়েন, গণ্ডগোলে অস্থির মন যখন জপ করে রাখতে পারে না তখন এইভাবে নিজেকে জপে বদ্ধ করা যায় বটে। লোকটার ওপর ভারী শ্রদ্ধা হয় ব্রজগোপালের। কেমন নিবিষ্ট মনে নিজেকে রামসীতার নামের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছে! লোকটার সঙ্গে একটু কথা বলতে ইচ্ছে করে তাঁর। কিন্তু ইষ্টনাম জপে বাধা হবে বলে বলেন না। কিন্তু মানুষের মধ্যে আন্তরিক ভক্তিভাব দেখলে তাঁর চোখে জল আসে।

গ্রীষ্মকালে হাওড়া স্টেশনে বেশ সস্তায় নাগপুর না কানপুর কোথাকার যেন কমলালেবু বিক্রি হয়। কদমার মতো ছোট ছোট লেবু, ভারী মিষ্টি। বোঁটার কাছে কিছু পচা-পচা ভাব থাকে, সেটুকু চেঁছে ফেলে বেশ খাওয়া যায়। হাওড়া স্টেশনে গাড়ি ছাড়বার আগে এক বুড়ো মানুষকে লেবু কিনতে দেখেছিলেন। সঙ্গে পোঁটলা-পুঁটলি আছে, বৃদ্ধা স্ত্রীও আছেন সঙ্গে। এই ভিড়ে 'আমি বুড়ো মানুষ বাবা, সঙ্গে মেয়েছেলে আছে বাবা' এইসব বলতে বলতে ঠেলেঠুলে গাড়িতে উঠে পড়তেও দেখেছিলেন। এখন ভিড় পাতলা হওয়াতে দেখা গেল, সেই বুড়ো মানুষটি বেশ গুছিয়ে বসেছেন উলটোদিকের দূরের জানালার ধারে। জানালার ধারের জায়গা দখল করা এই গরমকালে বেশ মুশকিল। কিন্তু ঘোড়েল গোছের লোকটা দিব্যি জায়গাটা বন্দোবস্ত করেছেন। এও এৎফাঁকি বুদ্ধি। বুড়োর উলটোদিকে কয়েকটা চ্যাংড়া ছেলে বসেছে, ইয়ারবাজ। তাদের সঙ্গে জমিয়ে তুলেছেন বেশ। পাশে আধ-ঘোমটায় গিন্নি মানুষটির মুখ বেশ প্রসন্ন। দেখলেই বোঝা যায়, এরা বেশ সুখী লোক। বিষয় সম্পত্তি আছে, ছেলেরা প্রতিষ্ঠিত, তেমন কোনও দুশ্চিন্তা নেই। চপাচপ লেবু খাচ্ছেন, মুখে হাসি।

চ্যাংড়াদের একজন বলে—জায়গাটা যে ছেড়ে দিলাম দাদু, তার বদলে কী দেবেন?

—কী দেব বাবা, বুড়ো মানুষ আমরা, পরের ভরসায় রাস্তায় বেরোই। তোমরা জায়গা ছাড়বে না তো কে ছাড়বে! ইয়ং ম্যান সব, স্পিরিটেড।

—ওসব গ্যাস ছাড়ুন। বর্ধমানে কিন্তু মিহিদানা খাওয়াতে হবে।

—আর মিহিদানা! সে বস্তু কী আর আছে। এখন কেবল বেসম আর চিনির রস। ও আমরা খাই না। আবার লেবু মুখে দিয়ে কোয়ার ফ্যাঁকড়া মুখ থেকে টেনে বের করতে করতে বলেন—তোমাদের বয়সে বুড়ো মানুষ আর মেয়েছেলে দেখলেই আমরা জায়গা ছেড়ে দিতুম।

—আমরাও তো দিলাম। আর একজন চ্যাংড়া বলে—আরও কিছু করতে হবে নাকি বলুন না। আর খুব পরোপকারী। বয়সের নাতনি-টাতনি থাকলে বলুন, দায় উদ্ধার করে দেব।

লোকটা খুব ঘোড়েল। একটুও ঘাবড়ায় না। হাতের আধখানা লেবু গিন্নির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে—ধরো! গিন্নি মুখটা ফিরিয়ে নেন, হাতের একটা ঝাপটা দিয়ে সরিয়ে দেন হাত। বুড়ো লেবুটা ফিরিয়ে নিয়ে বলে—না ভাই, নাতনি-টাতনি নেই। দুই ছেলে। ছোটটির জন্যই, মেয়ে দেখতে গিয়েছিলাম কলকাতায়।

একজন সঙ্গে সঙ্গে বলে—পছন্দ হল?

—না বাবা। বড্ড রোগা। মুখখানা আছে একরকম, কিন্তু হাওয়ায় হেলেপড়া চেহারা। ও আমার পছন্দ নয়।

—তা ওখানে খ্যাঁটটা কেমন হল দাদু?

বুড়ো হাসে। মাথা নেড়ে বলে—খাইয়েছে ভাল। এই দুর্দিনে বেশ বড় বড় রাজভোগ পায়েস, ফলটল।

—বছরে কবার মেয়ে দেখেন দাদু? দু-তিনবার করে হলে তো বেশ ভালই ম্যানেজ হয়, কী বলেন? আচ্ছা ম্যানেজার বাবা!

অন্য একটা চ্যাংড়া বলে—বুড়ো ভাম।

বুড়ো সবই শোনে। একটু হাসিমুখে লেবু খায়, আর বলে—তা ছেলের বিয়ে দিতে হলে মেয়ে তো দেখতেই হবে।

—হুঁ! ওদের চোখকে বিশ্বাস কী? বয়সের ছেলে, কটা চামড়া কী ভাসা ভাসা চোখ, কী একটু পাতলা হাসি দেখে মাথা ঘুরে যাবে। আমাদের চোখ অন্যরকম।

—দুরকম চোখ দাদু? ছুঁচে সুতো পরাতে পারেন?

বুড়ো হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বলে—চোখ দুখানা এখনও আছে, বুঝলে! ঘরে লক্ষ্মীনারায়ণের সেবা হয়। রোজ সকালে নিজের হাতে মালা গেঁথে পরাই। লক্ষ্মীনারায়ণকে বলে রেখেছি, যেদিন চোখের দোষ হবে সেদিন থেকেই মালা বন্ধ।

বলে ঘোড়েল মানুষটা মাথা নেড়ে হেসে বলে—বুঝলে তো! চোখে আজ তাই পষ্ট দেখি। লক্ষ্মীনারায়ণের প্রাণে ভয় আছে না, মালা বন্ধ হয়ে যাবে যে!

ব্রজগোপাল মুখটা ফিরিয়ে নেন। পশ্চিমা লোকটা সীতারামের নাম পড়ে যাচ্ছে নীরবে। জপ করছে। অন্তরের গভীরতম প্রার্থনা সংসার থেকে সুতো বেয়ে চলে যাচ্ছে কী তাঁর কাছে! ব্রজগোপাল চোখ বুজে একটা গভীর শ্বাস ফেলেন। রণেনের কথা কেন যে এতবার মনে হচ্ছে! ভাবতে ভাবতে একটু শিউরে ওঠেন বুঝি! ছেলেটা শীলার বাসায় বসে একা-একা কথা বলছিল। সংসারে বোধ হয় ন্যাজে-গোবরে হচ্ছে একটু অল্প বুদ্ধির ছেলেটা। ছেলেবেলায় টাইফয়েডের পর মাথার দোষ হয়েছিল। মাথাটা কমজোরি। তেমন ভাবনা-চিন্তার চাপ পড়লে কী হয় না হয়। সংসারের আত্মীয়রা বড় স্বার্থপর, মন বুঝে, অবস্থা বুঝে চলে না। রণেনের মনে ব্যথা দিয়ে কারও কিছু করা উচিত নয়। কিন্তু সে কি ওর বউ বোঝে! না কি ননীবালাই বোঝেন? না কি বাচ্চাকাচ্চা বা ভাই-ই বোঝে! সংসার এত মন বুঝে চললে তো স্বর্গ হয়ে যেত। রণেনের জন্য ব্রজগোপালের মনটা তাই ভাল লাগে না। ওকে বোধ হয় সবাই অতিষ্ঠ করে, অপমান করে। কিছুকাল আগে একবার দৌড়ে গিয়েছিল গোবিন্দপুরে। স্টেশনে দেখা হতে বলেছিল—সংসারে যত অশান্তি। আজকেও একবার ট্যাক্সিতে হঠাৎ 'বাবা' বলে ডেকেছিল, কিন্তু কিছু বলেনি। কিছু যেন বলার ছিল। লজ্জায় পারেনি।

ব্রজগোপাল চোখ বুজে চাপ ধরা বুকের ভারটা আর একটা দীর্ঘশ্বাসে নামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। মনের মধ্যে বলে রাখলেন—সব ভাল রেখো। ওদের সুখে রেখো।

সংসারে ওই যে লেবু খাচ্ছে ঘোড়েল লোকটা, মান অপমান জ্ঞান কিছু কম, লোভী ওই সব মানুষেরা একরকম সুখেই আছে। ঠাকুরদেবতার সঙ্গে পর্যন্ত চুক্তি করে কাজ করে। ব্রজগোপাল আবার একটা শ্বাস ছাড়লেন। পাশের লোকটা আপনমনে সীতারামের নাম পড়ে যাচ্ছে। ওটা বুঝি বুড়ো বামুনেরই ইঙ্গিত। ব্রজগোপাল ছিঁড়ে-যাওয়া জপের সুতোটা আবার চেপে ধরলেন। জপ চলতে থাকল।

স্টেশনে যখন নামলেন তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। এদিকে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। প্ল্যাটফর্মের মোরম ভেজা। বাতাসে ভেজা মাটির আঁশটে গন্ধ। গাছপালার হাওয়া-বাতাসের পাগল শব্দ। আকাশে হালকা

মেঘ রেলগাড়ির মতো চলে যাচ্ছে, অন্ধকারেও বোঝা যায়। প্ল্যাটফর্মে নেমে দাঁড়াতেই ওই বাতাস, ওই গাছ-মাটির গন্ধ, পৃথিবী-জোড়া অন্ধকার ব্রজগোপালের মন থেকে ধুলোবালি ঝরিয়ে দিল। মনখারাপটা ভুল পড়ল একটু।

প্ল্যাটফর্মের গাছতলায় কাঠের বেঞ্চ-এ একজন লোক গা মাথা একটা গামছায় ঢেকে বসে আছে। বেঞ্চের নীচে, পায়ের কাছে হারিকেন। আলোটা বাতাসে দাপাচ্ছে। নিববে। লোকটার পাশে রাখা একটা ছাতা, খোলেনি, প্রকাণ্ড অন্ধকার চেহারাটা দেখেই চিনতে পারেন ব্রজগোপাল।

একটু এগিয়ে গিয়ে বলেন—বহেরু।

লোকটা নড়েচড়ে উঠে বসে, বলে—আলেন?

—হুঁ।

—ভয় লাগতে ছিল, ভাবলাম বুঝি আজ আর আলেন না। ঠাকরোন আর ছানা-পোনারা সব ভাল?

—হুঁ, তুই কখন থেকে বসে আছিস?

—অনেকক্ষণ। তখন বেলা ছিল।

বহেরু উঠে দাঁড়ায়। বলে—আজকাল আপনি না থাকলি ভাল লাগে না।

ব্রজগোপাল চুপ করে থাকেন। একটু কষ্ট হয়। বহেরুটা এবার বুড়ো হল এই সত্তর বাহাত্তর বছর বয়সে। বলেন—তা তুই কেন বসে আছিস দুপুর থেকে, আমার তো রাতেই ফেরার কথা, তখন না হয় কালীপদ বা কোকা আসতে পারত!

—তাদের বড় গরজ! বামুনকর্তার মহিমা তারা কী বুঝবে!

—তা না হয় আমি একাই যেতাম। অভ্যেস তো আছে। দুপুর-দুপুর এসে বসে আছিস, বাদলায় ভিজেছিস নাকি!

স্টেশনের বেড়া পার হয়ে রাস্তায় পড়ে বহেরু ডান ধার বাঁ ধার তাকিয়ে দেখে নিয়ে বলে—না। স্টেশনের ঘরে গিয়ে বসলাম তখন। বাদলা তেমন হয়ওনি। ছিটে-ফোঁটা। হারিকেনটা তুলে একবার দেখল বহেরু। আগুনটা দাপাচ্ছে। বলল—এটা নিবে গেলেই চিত্তির।

—টর্চ তো ছিল।

—সে কোন বাবু নিয়ে বেরিয়েছে কী হারিয়ে এসেছে কে তার খোঁজ রাখে। রাবণের গুষ্টি। বলে বহেরু খুব বিরক্তির গলায় বলে—বেরুনোর সময়ে খুঁজে পেলাম না। আপনারও তো একটা ছিল।

ব্রজগোপাল থেমে ক্যাম্বিসের ব্যাগ হাতড়ে ছোট্ট টর্চবাতি বের করে দেখেন বোতাম টিপতে একটা অত্যন্ত মলিন লাল আলো ধীরে জ্বলে উঠল। ব্রজগোপাল মাথা নেড়ে বলেন—এটারও ব্যাটারি ফুরিয়েছে। আজ আনব বলে ঠিক করেছিলাম, তাড়াহুড়োয় ভুলে গেলাম।

—নলিনীর দোকানে পাওয়া যায়।

—দূর! ও ব্যাটা চোর। তিন আনার জিনিস আট আনা হাঁকে। কলকাতায় কিছু সস্তা হয়। গায়ে গায়ে সব দোকান গজিয়েছে, রেষারেষি করে বিক্রি করে। তাই সস্তা।

বহেরু বুঝদারের মতো মাথা নাড়ল। বলল—ভারী শহর। বহুকাল যাই না। বহেরু একটু থেমে গিয়ে ব্রজগোপালের হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে বলে—আপনি একটু আগু হোন। আলো পেছনে থাকলিই ভাল।

ব্রজগোপাল এগোন। বহেরু পিছনে বোধ হয় ফস করে বিড়ি ধরাল। অলোতে সামনে ছায়াটা লম্বা হয়ে দিগন্তের অন্ধকারে মিশে গেছে। ব্রজগোপাল ঠাহর করে হাঁটেন। বহেরু বলে—সেই দুপুর থেকে বসে বসে মাছি মশা তাড়াচ্ছি। কত ট্রেন গেল।

ব্রজগোপাল শুধু বিরক্তিসূচকভাবে বললেন—হুঁ।

—বাসায় বসে দিন কাটে না।

—তোর তো কত কাজ। ব্রজগোপাল বলেন।

একঝলক বিড়ির গন্ধ আসে পিছনে থেকে। বহেরু নিরাসক্ত গলায় বলে—করতে গেলে কাজ ফুরোয় না, সে ঠিক। কিন্তু এখন মনে করি, আর কাজ কী কাজে! কাজ করে মেলা কাজি হয়েছি। সংসার বেশি দেখতে গেলে কাজিয়া লেগে যায়। ছেলেগুলো সব হারামি, জানেন তো।

ব্রজগোপাল একটু ভেবেচিন্তে বলেন—তোরই রক্তের ধাত তো। পাজি তুই কি কিছু কম ছিলি?

বহেরু একটু হাসল। বলল—বুড়োও তো হলাম।

—বুড়ো মনে করলেই বুড়ো। মনে যদি বয়স না ধরিস তো বুড়ো আবার কী! বুড়োটে ভাবটাই ভাল না।

বহেরু একটু চুপ করে থাকে। বলে—এক পাঞ্জাবি জ্যোতিষকে ধরে এনেছিলাম পরশুদিন। বললাম থাকার জায়গা দেবো, ভাতকাপড়ের ব্যবস্থা করব, থাকো। রাজি হল না। তা সে হাতটাত দেখে বলল, আমার কপাল নাকি খুব ভাল। তীর্থে মরব।

ব্রজগোপাল মরার কথা সহ্য করতে পারেন না। একটু এঁটেল মতো পিছল জায়গা পার। হচ্ছিলেন সাবধানে। একটু ঝাঁকি মেরে বললেন—তীর্তে মরলে কি আর দুটো করে হাত পা গজাবে নাকি! যত ইল্লুতে কথা! বেঁচে থেকে কী কী করতে পারবি তাই ভাব।

—আর কী করব! আপনি কথা কবেন, পায়ের কাছে বসে শুনব। পাপ তাপ কেটে যাবে। কত কুকর্ম করেছি।

—কর্মের পাপ কর্ম দিয়ে কাটাতে হয়। তত্ত্ব শুনলে কাটে না।

—আপনার কেবল ওই কথা। কাজ তো অনেক হল।

—তবে কি তোর পছন্দমতো কথা বলতে হবে নাকি! কাজকে তোর এত ভয় কীসের?

বহেরু একটু চুপ করে থাকে। বিড়ির ধোঁয়া বুকে চেপে রাখতে গিয়ে দু-দমক কাশি আসে। বলে কাজকে ভয় নেই। ছেলেগুলো বড় ব্যাদড়া। সামলাতে পারি না। এই সেদিনও রক্তের দলা ছিল সব, এখন ডাকাত হয়ে উঠেছে।

—হলই বা। বিশ্বসংসারের কাজ বলতে কী কেবল নিজেব সংসারের কলকাঠি নাড়া? অন্য কিছু নেই?

—কিছুতেই মন লাগে না। মেধু ডাক্তারের ভূত নয়নতারাকে ভর করে রাতবিরেতে কত কথা বলে?

—কী বলে? ব্রজগোপাল ধমক দিয়ে বলেন।

পুরনো একটা সাঁকো পার হয়ে ব্রজগোপাল বড় রাস্তা ছেড়ে আল ধরার জন্য নেমে পড়লেন। বহেরু রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল, লণ্ঠনটা উঁচু করে ধরে বলল—দুর্যোগে ফুলতলার রাস্তা দিয়ে যাবেন নাকি!

—ভারী তো দুর্যোগ! ক’ফোঁটা বৃষ্টি হয়েছে, সেইজন্য আধ মাইল ঘুরপথে যাব নাকি!

বহেরু ইতস্তত করে বলে—রাস্তাটা ভাল নয়। রাম রাম।

ব্রজগোপালের মায়া হল। বহেরুর কোনওকালে ভয়ডর বলে বস্তু ছিল না। এখন কেমন কোলঘেঁষা ছেলের মতো ভয় পায়। ব্রজগোপাল নীচে থেকে রাস্তার ওপর ওর বিশাল ছায়াটা দেখলেন। হারিকেনের খুব নিবন্ত আলোয় চোখমুখ অসুরের মতো দেখায়। এখন লোকে ওকে দেখলে ভয় খেয়ে যাবে। কিন্তু আদতে বহেরু ডাকাতের নিজের প্রাণেই এখন নানা ভয়ভীতির বাসা। ব্রজগোপাল বললেন—ভয়টা কীসের? বলে আবার রাস্তায় উঠে এলেন, যেখানে জেদি কুকুরের মতো পা জড়িয়ে আছে বহেরু। এখন ওকে টেনেও নেওয়া যাবে না।

আবার আগে আগে হাঁটেন ব্রজগোপাল, পিছনে বহেরু। বহেরু পিছনে গলা খাঁকারি দেয়। বলে—ঘরে বসেই সব শুনতে পাই। রাতবিরেতে নয়নতারা কাঁদে। ঘুমোয় না মেয়েটা। কেবল বোনাসুরে বলে-রক্ত বৃষ্টি হবে, মাটির তলায় বসে যাবে গ্রামগঞ্জ। আর আমার নাম ধরে ডেকে বলে—তুই মরবি শেয়াল কুকুরের মতো, ধাঙড়ে পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে ফেলে দিয়ে আসবে ভাগাড়ে। গতিমুক্তি হবে না, অন্ধকারে হাতড়ে মরবি চিরকাল, জন্ম হবে না। এই সব বলে।

ছাতাটা একটু মাটিতে ঠুকল বহেরু। গলাখাঁকারি দিল। আলোটা তুলে কল ঘুরিয়ে তেজি-কমী করল। ব্রজগোপাল ফিরে তাকালেন একটু। মুখের কাছে আলোটা তুলেছে তাই মুখটা দেখতে পেলেন। আর কিছু নয়, কেবল মুখে একটা আলগা বুড়োটে ছাপ পড়েছে। ব্রজগোপাল একটু চিন্তিতভাবে হাঁটেন। অনেকক্ষণ বাদে হঠাৎ একটু ফুর্তির সুরে বলেন— দূর ব্যাটা! দলমাদল কামান দাগায়ে দে, সব ভয়ভীতি খসে পড়বে।

বহেরু পিছন থেকে তাড়াতাড়ি দু-কদম এগিয়ে আসে—কী বলেন কর্তা?

—কী কী! জয়গুরু জগন্নাথ। তুই ছিলি কাজের কাজি, এখন হয়েছিস ভাবন কাজি। এত ভাবিস ক্যান? চাষাভুষো মানুষকে কি ভাবনাচিন্তা সয়? মনের মুখে নাড়া জ্বেলে দে। দুনিয়া কি তোর? এত ভাবনা কেন?

তত্ত্বকথার গন্ধ পেয়ে বহেরু কান খাড়া করে। ব্রজগোপালের ঘাড়ে শ্বাস ফেলে পিছু পিছু হাঁটে গৃহপালিতের মতো। বলে—ঠাকুর থাকবেন তত আমার কাছে? ছাড়ে যাবেন না তো!

দূর ব্যাটা।

বহেরু একটা শ্বাস ফেলে। বিড়বিড় করে বলে—ঠাকুর, থাকেন। থাকেন।

॥ চল্লিশ ॥

মাথায় ধপধপে সাদা পাগড়ি বাঁধা, ছোটখাটো কালো-কোলো, গোপাল-গোপাল চেহারার একটি বছর তেইশ-চব্বিশের ছোকরা সেদিন সকালে এ গাঁয়ের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিল। সঙ্গে পাঁচ-সাতজন লোক। সঙ্গীরা সব বয়সে বড়, কিন্তু হাবভাবে বোঝা যাচ্ছিল ওই ছোকরাই ওদের সর্দার, সঙ্গে সাপের ঝাঁপি।

রাতটা ভাল কাটেনি বহেরুর। গন্ধ বিশ্বেস এখনও বেঁচে আছে; আশি কি নব্বুই পার হয়ে গেল বুঝি। এই সব বয়সে সে মানুষ বড় জ্বালাতন করে। বোধ-বুদ্ধি সব জল হয়ে যায়। গন্ধ বিশ্বেস তার ওপর আবার চোখে দেখে না। দিনরাত লোকজনকে হাঁকডাক পাড়ে। সবচেয়ে বেশি জ্বালায় খাওয়া আর হাগা-মোতা নিয়ে। তার ওপর আছে মিথ্যে কথা। খেয়ে বলে খাইনি। বিছানায় হেগে-মুতে ফেললে বেড়াল কুকুরের ঘাড়ে দোষ চাপায়। নিপাট ভালমানুষের মতো এইসব করে। কাছেপিঠে ছেলেপুলেদের হাতে মোয়াটা নাড়ুটা আছে টের পেলে কেড়ে খেয়ে ফেলে। অশ্রাব্য গালাগাল দেয় আজকাল রেগে গেলে। ভয় পায় বহেরুকে।

বহেরু আজকাল কেমন চুপসে গেছে। এই গরমকালটায় উঠোনে কি দাওয়ায় তাড়ির ওপর এক ছিলিম গাঁজা চড়িয়ে গামছার ওপর পড়ে থাকত। বড়জোর একটা খাটিয়ায় একটু শক্ত একটা বালিশ। তাতেই খুব বড়মানুষি। খুবই অথৈ ঘুম তার। তবু একটু-আধটু শব্দ হলেই কুকুরের মতো উঠে বসে। নেশা-টেশা ঘুম-টুম কোথায় কেটে যায়। হাঁক ছেড়ে বৃন্দাবনকে ডাকে। বৃন্দাবন এক সময়ে দোস্তো-মানুষ ছিল বহেরুর। জাতে নমঃশূদ্র। এখন সে বহেরুকে মনিব বলে মানে। বহেরু গাঁ রাত-বিরেতে পাহারা দেয়। হাঁক ছাড়তেই দুটো চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই এসে যায় বৃন্দাবন। গহীন রাতে আর চাকর-মনিবের সম্পর্ক থাকে না বটে, তবু লাঠি-গাছটা আর লালটেম নামিয়ে রেখে একটু দূরে বসে সে। গাঁজা সাজে। প্রথমটায় বহেরু টানে, পরে বৃন্দাবন। বিষয়ী কথাবার্তা হয় দু-চারটে। বন্দাবন কম কথার মানুষ। এই রাতবিরেতেই যা তার পেট থেকে কিছু কথা বেরোয়। বহেরুর গোটা দুই খুনের সে জলজ্যান্ত সাক্ষী আছে। কিন্তু 'রা' কাড়ে না কখনও। এমনকী কখনও বহেরুর চোখে চোখও রাখে না। ওই এক ধারার মানুষ। বিশ্বাসী, কর্মঠ, কিন্তু একটু আবছামতো। দুনিয়ায় সে কী জন্য আছে, কী তার ভবিষ্যৎ, কার জন্য করছে কম্মাচ্ছে তা বোঝাই যায় না। মুখে টিকিট আঁটা আছে। সারাদিন তার দেখা পায় না বহেরু। শুধু এই রাতে দু-একবার। দু-একবারই ওঠে বহেরু। আবার ঘুমোয়। ভোরবেলা, আলো ফোটার অনেক আগে প্রথম জাগে খুড়োমশাইয়ের পবিত্র খোল। কালীপদর প্রভাতী শোনা যায়—জাইগতে হবে, উইঠতে হবে, লাইগতে হবে কাজে...। পেছুতে তিনটে লাথি কষাতে হয় জামাই শালার। কোনওকালে বহেরুর কোনও কম্মে লাগেনি। মাগ-ছেলের টানে পড়ে আছে। তিনটে লাথি ওর বহুকাল ধরে পাওনা হয়ে আছে, দিনক্ষণ দেখে একদিন সেই তিনটে ঝাড়বে বহেরু, বিদেয় করে দেবে বহেরু গাঁ থেকে। কালীপদর পর বা আগে ওঠেন ব্রজকর্তা। ততক্ষণে ভোরের জানান পড়ে যায়।

এইরকমই ছিল নিয়ম। কিন্তু বহেরুর ঘুমটাকে পেঁচোয় পেয়েছে আজকাল। তাড়ি-গাঁজার চাপান সত্ত্বেও পয়লা প্রহরটায় শেয়ালের হুড়ড়া শুনে কাটে। তারপর ঝিমুনি আসে। কিন্তু সে কতক্ষণ? হঠাৎ যেন বুকের মধ্যে ধড়াধ্বড় ধাক্কা খেয়ে উঠে বসে। চারদিকে কোনও রাতে জ্যোৎস্নার দুধ চলকে ভেসে যায়। কোনও রাতে বা শ্যামা মায়ের এলোকেশ। বহেরু সেই নিশুত রাতের মধ্যে জেগে উঠেই কেমন একা-বোকা বোধ করে। ভয় হয় হঠাৎ সব মরেটরে গেল নাকি! এত নিঝুম কেন চারদিক! নাকি আমিই মরে এলাম পরকালের রাজ্যে! হাঁক পাড়লে বৃন্দাবন আসে ঠিকই, গাঁজার চাপানও হয়। কিন্তু গা বড় ছমছম করে আজকাল, গুণীন এসে খুব কষে ঝাঁটাপেটা করে গেছে নয়নতারার ভূতকে। আজকাল নয়ন খুব নিঃসাড়ে পড়ে থাকে সারাদিন। কথাবার্তা কয় না, খেতে চায় না, উঠতে চায় না, চুল বাঁধে না। মেঘুর ভূত যদি ছেড়েও থাকে তবু অন্য কোন্ ভূত আবার চেপে বসেছে কে জানে! ছলছলে চোখে চেয়ে থাকে, কাঁদে মাঝে মাঝে। বিপদ বুঝে জামাইয়ের সন্ধানে একদিন গিয়েছিল বহেরু। আগের দিনে পেয়াদারা বাবু হত না কোনওদিন। আজকাল হয়। বিষড়ের এক কেমিক্যাল কোম্পানিতে লোকটা পিওন ছিল, এখন কেরানি। কী ভেবে সে শ্বশুরকে তুমি-তুমি করে বলতে লাগল। মেয়েকে ফিরে নেওয়ার কথা বলতেই খুব রাগ, বলে—ওকে ঠান্ডা করা আমার কর্ম নয় বাপু। তোমাদের ঘরের ধাত আলাদা। আমাদের সঙ্গে মেলে না।

সুমুন্দির পো। নিল না। ফিরে বিয়ে করেছে, নেওয়ার জো-ও নেই। তবু নয়নতারা যে কাঁদে তা বোধ হয় সেই লোকটার কথা ভেবেই। যৌবন বয়সে অনেক ছটফটানি ছিল। এখন সে সব মরে টান এসেছে বুঝি। রাতে ঘুম ভেঙে সেই কান্নার গোঙানি মাঝেমধ্যে শোনে বহেরু। দুঃখ বড় একটা হয় না, কেবল নিশুতরাতে ওই কান্না শুনে কেমন একটা ধন্ধভরা ভয় লাগে।

কদিন হল আর একা শোয় না সে। দোকা লাগে। কিন্তু দোকা পাওয়াই মুশকিল। বড় বড় ছেলেপুলে নাতিপুতি নিয়ে শোয়, বয়সের মানুষ, তার কথা ওঠে না। বিন্দুর মাও লজ্জা পায় বোধ হয়। রাজি হয় না। লোকলজ্জা বলে কথা আছে। ব্রজ বামুন থাকেন গাঁয়ে। বলবেন। কী! অগত্যা বড় ছেলে কপিল বাপের কাছে-পিঠে বিছানা ফেলে শোয়। এরা বাবু মানুষ। গদি ছাড়া ঘুম হয় না। তোষক বালিশ কত কী লাগে, বউ এসে মশারি গুঁজে দিয়ে যায়। তার ওপর রাতবিরেতে উঠে উঁকি মেরে দেখো, বাবু হাওয়া। কখন গিয়ে বউয়ের পাশবালিশ হয়ে পড়ে আছে। এখন এই দোকা পাওয়াটাই একটা সমস্যা। নিশুত রাতটা বড় নটখটে জিনিস। চাষার দুর্বল মাথায় কত আকাশ-পাতাল ঢুকিয়ে দেয়! হাঁক পাড়লে বৃন্দাবন আসে ঠিকই, কিন্তু সে তো ওই রকম বিটকেল মানুষ। রসকষ নেই। তা ছাড়া আপনজনা কেউ তো নয়। দূরের মানুষ দূর হয়ে বসে থাকে। বহেরুর বড় দোকা হতে ইচ্ছে করে আজকাল। মাঝলা ছেলে কোকাকে বললে সে এসে শোয়। কিন্তু বড় ভয় বহেরুর গায়ে খুনের রক্ত, বাপকেও ভাল চোখে দেখে না। টুঁটি টিপে ধরে যদি ঘুমের মধ্যে। যদি কৈফিয়ত চায়?

রাতে উঠে তাই আজকাল বহেরু ছমছম করা চারধারের মধ্যে বসে বসে ভাবে। কাল রাতেও ভাবছিল, দোকা ছাড়া পৃথিবীতে বাঁচা যায় না। এই যে এত জমি-জোত, ধান-পান, কার জন্য! দশভূতে খাচ্ছে। সে খাক, একা খাওয়ারও তো মানে হয় না, সে খাওয়ার আনন্দ নেই। কিন্তু কেবলই মনে হয়, একজন বুকের কাছের আপনজন হলে তার জন্য সব-কিছুর একটা আলাদা আনন্দ থাকত। কত ফিসফিসানো কথা জমে আছে বুকের মধ্যে! বলত। সে থাকলে এই রাতের ভয় তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারত। কিন্তু সে মনিষ্যিটা কে!

মেয়েমানুষ কোনও? নাকি ছেলেপুলে? নাকি নাতিপুতি? কে? কার জন্য এত সব করেও কিছুই নেই বলে তিন প্রহর রাতে উঠে বসে থাকে বহেরু? বুকের ফাঁকা জায়গা থেকে শ্বাসবায়ু বেরিয়ে এলে মনে হয় ফের বুঝি বাতাস টানতে পারবে না। গেল দম ফুরিয়ে কলের পুতুলের। নয়নতারার ঘাড়ে ভর করে মেঘু যে শাপশাপান্ত করেছিল তা কি ফলে গেল নাকি! এত ফাঁকা ফাঁকা তো লাগত না কখনও!

পাঁচ রবিবারে এবারের বোশেখ মাস গেছে। ঝড়া কিংবা খরায় যাবে। ঝড়ার লক্ষণ নেই। খরায় ধরেছে বছরকে। সে সবও ভাবে বহেরু। জোত-জমি ধান-পান, গরু-ছাগল ছেলে-পুলে, বউ-নাতি। সব ভেবেও একটা জায়গায় এসে থেমে যায়। জীবনের একটু বৃত্তান্ত জানা হল না। কার জন্য? কে সেই আপনজনা!

কাল রাতে ঘুমটা এসেছিল সময়মতো। একটু আফিং দিয়েছিল বৃন্দাবন। সেইটে খাওয়াতে ঠিক যেমন চেনা লোক মজা করতে পিছন থেকে থেকে চোখ টিপে ধরে, বিন্দুর মায়ের সঙ্গে যখন দেওর-বউঠান সম্পর্ক ছিল তখন বিন্দুর মাও এসে ও-রকম ধরত পিছন থেকে, ঠিক তেমনি ঘুমটা এসে পিছন থেকে চোখ টিপে ধরল। মাইরি-ঘুম একেবারে। সেই সময়ে একঝাঁক শিয়াল চেঁচিয়ে উঠেছিল, আর সেই সঙ্গে গন্ধ বিশ্বেস। কোথাও কিছু না, 'চোর, চোর বলে চেঁচাল খানিক। লাঠি ঠুকে ঠুকে কেসে বুকের গয়ের তুলে ফেলল ঘরের মেঝেয়। পেচ্ছাপের হাঁড়ি ওলটাল একটু বাদে। বেড়াল কুকুরদের শ্রাদ্ধ করতে লাগল। হাঁড়িটা যে বেড়ালে উলটিয়েছে সেটা প্রমাণ করার জন্যই বোধ হয় লাঠি দিয়ে ঘা-কতক বসাল ওদিকে। বেড়ালে, কুকুরে, গন্ধ বিশ্বেসে সে এক তুলকালাম কাণ্ড। বেড়ালরাই বা ছাড়বে কেন, কার লেজ মাড়িয়েছে, সেও ফ্যাঁস করে দিয়েছে আঁচড়ে, মাঝরাতে গন্ধর তখন হাপুস নয়নে কান্না। বহেরু তখন উঠে গিয়ে ইঞ্জিনের মতো ফুঁসতে ফুঁসতে গন্ধর ঘরের ঝাঁপের দড়ি খুলে ঢুকেছে। গন্ধ চোখে দেখে না বলে হারিকেনের রেওয়াজ নেই। অন্ধকারে মাটির ভিটেয় তরল পদার্থ গড়িয়ে পিছল, তার মধ্যে পা হড়কাল বহেরুর। দাঁতে দাঁত কড়মড় করে বহেরু গিয়ে গন্ধ বিশ্বেসকে টেনে তুলল মেঝে থেকে। বসাতে যাচ্ছিল ঘা কতক। প্রথম থাবড়াটা মেরেই খেয়াল গেল, আরে, এ লোকটাও যে একা! সারাদিন খাই-খাই করে, হাগে-মোতে, কাঁদে, যাই করে, সেও তো দোকা নয় বলেই। গন্ধ তখন ভয়ে কাঁপছে, আর ধরা গলায় বলে—আমি কিছু জানি না বাবা, আমি কিছু জানি না বাবা...

বুড়ো বয়সে বাপ ভাইয়ের তফাত গুলিয়ে ফেলেছে ভয়ে। গন্ধকে তাই মায়াবশে ছেড়ে দিল বহেরু। বেড়ালগুলোকে অন্ধকারেই সাঁত সাঁত করে কয়েকটা লাথি কষাল। বড় রাগ। চারধারে পৃথিবীটার ওপরেই বড় রাগ তখন বহেরুর। দুর্গন্ধের চোটে গন্ধর ঘরে টেকা যায় না, তবু অন্ধকারে খানিক দাঁড়াল বহেরু। গন্ধর বুড়ো হাতটা এসে তার হাত ধরল। নাকের জলে চোখের জলে ফঁত ফঁত শব্দ করতে করতে গন্ধ বলে—তুমি মা-বাপ বাবা, মেরো না গো। কাঁকালের হাড়টায় মটাং করে বড় লেগেছে।

বহেরু হাতটা ধরে বিছানায় তুলে দিল। বলল—ফের চেঁচাবে না। পড়ে থাকো মটকা মেরে।

তারপর বৃন্দাবনকে ডেকে গাঁজা টেনে আবার পড়ে থেকেছে বহেরু। ঘুম আসেনি। দাদার গায়ে হাত তোলাটা ঠিক হল না। ভাবল। আবার ভাবে, ওই রকমভাবে সেও বেঁচে থাকবে নাকি! পাগল! বয়সে যখন ভাঁটি বুঝবে তখনই পোকামারা বিষ তাড়ির সঙ্গে গুলে খেয়ে রাখবে একদিন। ব্রহ্মময়ী, মরণটা যেন সুন্দর হয়।

কথাটা ছ্যাঁৎ করে নিজেকেই লাগে। মরণ! ও কথাটা এতকাল ভাবার ফুরসত হয়নি তো!

রাতটা ভাল গেল না। হিজিবিজি হয়ে কেটে গেল। সকাল ইস্তক দাওয়া গরম করে উঠে পড়া বহেরু। সাঁওতালটা কদিন ধরে শ্বাস টেনে যাচ্ছে। মরেনি। কমাস ধরেই পড়ে আছে। যাই-যাচ্ছি করে এখনও ঠেকিয়ে রেখেছে অন্তিমকাল। সময় মাপা আছে, সেটা ফুরনোর ওয়াস্তা। ইচ্ছে করলেই তো মরা যায় না। তার ঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে বহেরু। বিড়-বিড় করে বলে—বেঁচে থাকো বাপু, টিঁকে থাকো। একটা বেঁটে বক্কেশ্বরকে আনাচ্ছি, দুজনে মিলে বাহার হয়ে ঘুরবে।

আলো ফুটতে না ফুটতেই ছোকরাটাকে দেখা গেল, বহেরুর খামারবাড়ির আশে-পাশে ঘুরঘুর করছে। ঝোপঝাড়ে উঁকিঝুঁকি মারছে, গোয়ালঘরের পেছুতে গিয়ে কি খুঁজছে। কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে ছুটে গেছে, কাচ্চা বাচ্চারাও মুখের এড়ানি, চোখের পিঁচুটি ধোয়ার সময় পায়নি, মজা দেখে জুটে গেছে।

গোয়ালঘরের সামনেটায় এসে দাঁড়িয়েছিল বহেরু, লোকটা সে সময়ে এসে কপালে হাত ঠেকিয়ে একটু সম্মান দেখাল। বলল—এ হচ্ছে নাগভিটে। বাস্তু আমরা ধরি না। অন্য সাপ থাকলে ধরব?

বহেরু লোকটার দিকে চেয়েই বুঝতে পারে, গুণি লোক। তার চোখ চকচক করে। বলে—ধরো। দেখি।

এক গ্লাস জল আর একটা তুলসিপাতা চেয়ে নিল লোকটা। পোঁটলা থেকে একটা এতটুকুন মা কামরূপ কামাখ্যার ছবি বের করে ধরল গ্লাসটার ওপর। রেলগাড়ির মতো মন্ত্র পাঠ করতে লাগল। স্যাঙাতরা সব ঘিরে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ কামাখ্যার ছবির দর্পণে কী দেখে চেঁচিয়ে বলল—গোয়ালের পিছনে, খড়ের গাদায়। যাঃ।

স্যাঙাতদের হাতে একটা শুকনো শিকড়। তারই টুকরো-টাকরা ভেঙে গোয়াল ঘরের চারধারে ছিটোতে থাকে। ছানাপোনারা ভিড় করে সঙ্গে সঙ্গে এগোয়। বহেরু হাঁক ছাড়ে— তফাত যা।

ওদের কজনা গোয়ালের ভিতরে ঢুকে যায়। একজন গোয়ালঘরের পিছন দিকে গিয়ে দাঁড়ায়। ভিতরে খড়ের গাদায় একটা সর-সর শব্দ ওঠে, ফোঁসানি শোনা যায়। গায়ে কাঁটা দেয় বহেরুর। আজকাল বড় একটা ভয়-ভয় ভাব ধরেছে তাকে। গোয়ালে খড়ের গাদায় সাপখোপ, বিছে তো থাকবেই। জানা কথা। না ঘাঁটালে ওরা ওদের মতো থাকে। তবু এখন কেমন ভয় খায় সে। নিত্যি তিরিশ দিন দোবেলা গোয়াল ঘাঁটে সে, যদি কোনওদিন দিত। ঠুকে! ভাবতেই গা হিম।

পিছনের বেড়ায় একটা টিন আলগা লাগানো। বাইরে দাঁড়ানো লোকটা সটান সেই টিনটা টেনে খুলে ফেলল মড়াত করে। সাঁত করে হাত ঢুকিয়ে দিল ফোকর দিয়ে। একটা হ্যাঁচকা টানে হাতটা বের করে আনতেই সবাই দেখে, মাঝারি লম্বা একটা গোখরো। লেজের দিকটা ধরে আছে, মাথাটা শূন্যে ঝুলছে, একটু একটু তোলার চেষ্টা করছে মাত্র। ঝাঁপি নিয়ে একজন এগিয়ে আসে। পাগড়ি বাঁধা লোকটা সাপের গায়ে মন্ত্র পড়ে হাত বুলিয়ে দেয়। সাপটা ঝাঁপিতে পড়ে থাকে।

বহেরুর গা কাঁটা দেয়। মাগো! সাক্ষাৎ যমদূত।

আবার তুলসিপাতা আর জলের ওপর কামরূপ কামাখ্যার ছবি রেখে লোকটা কি যেন দেখতে পায়। দক্ষিণের কলাবাগানের দিকে হাত তুলে বলে—এই মোটা, মস্ত একটা ওখানে রয়েছে। কতগুলো ডাঁড়াশ সাপ আছে, আশে-পাশে, তাড়িয়ে দিস। বড়টাকে ধরবি।

লোকগুলো ঠিক জায়গায় চলে যায়। ঘিরে ধরে শিকড় ছিটিয়ে ছিটিয়ে এগোতে থাকে। বহেরু দেখে, ঠিকই কতগুলো ডাঁড়াশ সাপ পালাচ্ছে। তারপরই ফোঁসানি শোনা যায়। মাটি ফুঁড়ে মাথা তোলা দেয় এক গোক্ষুরো। মা গো! কী তার চেহারা। তেল-পিছল গায়ে বাদামি আলো ঠিকরোচ্ছে। ধাঁই করে বেরিয়ে পালাচ্ছে, বেঁটে

মতো কালো একটা লোক লেজটা নিচু হয়ে ধরে তুলে ফেলল। হাত উঁচু করে ধরেছে, তবু মাথাটা মাটি ছুঁই-ছুঁই। বাচ্চাগুলো, মানুষজন সব ঘিরে ধরেছে লোকটাকে। বড্ড কাছাকাছি চলে গেছে। বহেরু হাঁক ছেড়ে সবাইকে সতর্ক করে দেয়—তফাত যা, তফাত যা।

পাগড়ি মাথায় ওস্তাদ ছেলেটা হেসে বলে ভয় নাই, ভয় নাই বাবু, আমি তো আছি। সুনীল নাগা জুহুরি আজ্ঞে, সাতপুরুষের পেশা।

বহেরু ধাতস্থ হয়ে তাকে ডেকে দাওয়ায় বসাল। বিড়ি দিলে লোকটা হাত তুলে বলল— এখন নয়।

—সাপ খেলাও নাকি? বহেরু জিজ্ঞেস করে।

লোকটা মাথা নেড়ে বলে—না। চাষবাস, আছে। এ পৈতৃক পেশা। বছরে এক-দুবার বেরোই। আসাম পর্যন্ত চলে যাই আমরা সাপ ধরতে। খেলাই না।

—ধরে করো কী?

—বেচে দিই। সরকার কেনে। এক ভরি বিষ তিনশো আশি টাকা। যোলোটা সাপে এক ভরি হয়।

লোকটার বয়স ভারী কম বলে মনে হয়। গোঁফদাড়ি এখনও ওঠেনি তেমন। লাউয়ের গায়ের রোঁয়ার মতো নরম কিছু রোঁয়া উঠেছে গালে। গোঁফের কাছে আবছা রেখা দেখা যায়। সেখানে ঘাম জমেছে। মুখের ডৌলটুকু বড় মিঠে। বহেরু তার কাছ ঘেঁষে বসে, বলে—বাড়ি কোথা?

—বহরমপুর। এই বলে লোকটা উঠে যায়। তার স্যাঙাতরা চারধারে ঘুরছে। এখান-সেখান থেকে মাটি খুঁটে হাতে নিয়ে শুঁকছে। সতর্ক চোখ।

বহেরু উঠে গিয়ে নাগা জহুরির সঙ্গ ধরল, বলল—শোঁকো কী?

নাগা জহুরির মুখে হাজির হাসি। বলে—এ হচ্ছে নাগভিটে। বাস্তু সাপ-টাপ থাকতে পারে। তাই দেখছে সব।

—শুঁকে কী বোঝে সব?

—বাস্তু সাপ যেখানে থাকে সেখানকার মাটিতে সুন্দর গন্ধ পাওয়া যায়। যে সে অবশ্য বোঝে না। গুণিন ঠিক পায়। আর এমনি বিষের সাপ যেখানে থাকে সেখানে পচাটে গন্ধ।

—বাস্তু সাপ আছে নাকি? দেখিনি তো কখনও।

নাগা জহুরি মাথা নাড়ল। একটু বিমর্ষভাব দেখিয়ে বলল—ছিল। বড় পবিত্র প্রাণী। একটা জোড়া ছিল। কখনও এঁটো জলটল কিছু ছিটে লেগেছিল বোধ হয়, তাই জোড়া ভেঙে চলে গেছে।

বহেরু চেয়ে থাকে। বড় একটা শ্বাস ফেলে বলে—কবে গেল?

তুলসির জলের ওপর কামাখ্যার কালীর ছবি ধরে থেকে নাগা জহুরি বলে— বছরখানেক হবে।

—গেলে হয়টা কী?

—সংসারে নানা অশান্তি লাগে।

বহেরু নীরবে মাথা নাড়ল। বুঝেছে। একটা শ্বাস ফেলে বলল—তোমরা সব দুপুরে এখানেই খেওখন। বুঝলে! এখন চা খাও।

বলে বিন্দুকে ডাকাডাকি করতে থাকে বহেরু। হেলেদুলে বিন্দু আসে, মুখে একটু হাসির আভা ছড়ানো! টস্ টস্ করছে লোভি ঠোঁট। একটা চোখ হানল নাগা জহুরিকে। বহেরু একবার চোর-চোখে দেখে নিল, নাগা

জহুরির কলজেটা কেমন। দেখল, খুব মজবুত নয়। বাচ্চা ছেলে, রোঁয়া ওঠেনি। একটু ভ্যাবলা বনে গেছে মেয়েটাকে দেখে। বহেরু এসব খুব উপভোগ করে। মেয়েটা তারই ঔরসের। তেজি আছে। বহেরু অন্যদিকে চেয়ে বলে—চা করে নিয়ে আয়।

বিন্দু মাথা নেড়ে চলে গেল। সেই দিক পানে চেয়ে আছে নাগা জহুরি। বহেরু সুযোগটা ছাড়ল না। বলল—এখানে থাকবে নাকি?

নাগা জহুরি মুখ ফিরিয়ে বলে—থাকবে মানে?

—জমিটমি দেব। ঘর করে দেব। বলে একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বলে—বিয়েশাদিও করতে পারো, এখানেই। বলে আবছা ইঙ্গিতটা হজম করতে দিল জহুরিকে। বিড়ি ধরিয়ে মিটমিট করে চেয়ে চেয়ে দেখছিল জহুরির মুখে কেমন ভাব খেলা করে।

তা অনেক ভাব খেলল। বিন্দু হারামজাদি জানে বটে রঙ্গরস। একেবারে কাম্‌নী ডোম। বহেরুর মনটা হে-হে করে হাসছিল। পাণ্ডুয়ার বামনবীরটা আসতে চাইছে না। চিড়িয়াখানাটা জমছে না তেমন। সাঁওতালটাও টেঁসে যাবেই। এ লোকটা যদি থাকতে রাজি হয় তো বেশ হবে। কিন্তু বেশি ঝোলাঝুলি করলে টানের সুতো ছিঁড়ে যায়। তাই প্রস্তাবটা দিয়েই বহেরু কিছুক্ষণ পরে অন্য কথা পাড়ে। লোকটা বাঁ হাতের তেলোয় এক ডেলা শিকড়। সেটা দেখিয়ে বলে—ওটা কী বস্তু?

জহুরি অদূরে উবু হয়ে বসে পড়ে। পরনের ফেরত দেওয়া কাপড়ের কোনাটা তুলে মুখ মুছে নেয়। বলে—এ হচ্ছে বিদ্যাসুন্দর গাছের শিকড়। দুর্লভ বস্তু কিছু নয়। জঙ্গল-পঙ্গলে একটু খুঁজলেই পাওয়া যায়।

—দেখি। বলে হাত বাড়াল বহেরু।

লোকটা নির্দ্বিধায় দিয়ে দিল, বলল—শুঁকে দেখুন।

দেখল বহেরু। ভারী মিষ্টি ধূপের গন্ধের মতো মৃদু গন্ধ।

জহুরি বলে বেশ গন্ধটা না। কিন্তু সাপ ও গন্ধ সইতে পারে না। গন্ধ পেলেই গর্ত থেকে বেরিয়ে পালায়। তখন আমরা ধরি।

—তা হলে এ জিনিস সঙ্গে থাকলে সাপে ঠুকবে না বলো।

জহুরি মাথা নেড়ে বলে—তার ঠিক নেই। কথায় বলে সাপের লেখা বাঘের দেখা। শিকড় ছিটোলে পালায় জানি। তা বলে সঙ্গে রাখলে কামড়াবে না তা নয়। তবে ও বস্তুর আরও গুণ আছে। গায়ে রাখলে বাত, অম্বল আর হাঁপানির বড় উপকার।

বহেরু একটা শ্বাস ফেলে বলে—এ দিয়ে কী হবে! তুমি থাকলে বরং বল ভরসার কথা।

লোকটা উত্তর দিল না। চেয়ে রইল।

সারাদিন কেরামতি দেখাল অনেক। বুড়ো আঙুলের নখে কখনও সিঁদুর কখনও কালি লাগিয়ে নখদর্পণ দেখাল। ফণা তোলা দাঁতাল সাপের মুখের কাছে মুঠো করে হাত এগিয়ে দিয়ে দেখাল সাপটি কেমন মিইয়ে যায়। একটা পয়সাও নিল না। তার স্যাঙাতরা অবশ্য গোটা কুড়ি সাপ ধরে নিয়ে গেল। এইটুকু জায়গায় এত সাপ ছিল কে জানত!

ব্রজগোপাল সবটাই লক্ষ করেছেন। রাতের বেলা বসে সাপ ধরার বৃত্তান্তটা লিখে রাখছিলেন ডায়েরিতে। লিখতে লিখতে একটা শ্বাস পড়ল। কার জন্য লিখছেন? কাকে দিয়ে যাবেন এইসব কুড়িয়ে পাওয়া মণিমুক্তা?

ছেলেরা বিজ্ঞানের যুগে বাস করে। এ সব দেখলে হাসবে।

এ সময়ে বহেরু এসে বসল পায়ের কাছে মাটিতে। মুখখানা তুলে দুঃখের স্বরে বলে—জহুরি চলে গেল কর্তা। রাখা গেল না।

ব্রজগোপাল বললেন—হুঁ।

—রাখতে পারলে হত। বুকটা বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

ফের ব্রজগোপাল বলেন—হুঁ।

বহেরু বুক কাঁপিয়ে একটা শ্বাস ছেড়ে বলে—মানুষজন সব যেন দূরে দূরে হেঁটে চলে যাচ্ছে বহেরু গাঁ থেকে। কবে আসবে সব! কাতারে কাতারে!

॥ একচল্লিশ ॥

আকাশে ছমছম করছে মেঘ। গম্ভীর মেঘধ্বনি। ঘন কালো ছায়ায় দুপুরেই ডুবে গেল কলকাতা। যেন বা প্রলয় হবে। ঠান্ডা একটা বাতাস এল, তাতে ভেজা মাটির গন্ধ।

রাস্তা পার হবে বলে রণেন দাঁড়িয়েছিল ফুটপাথে। বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের সরু ফুটপাথ, দাঁড়ানোর পক্ষে সুবিধের নয়। ক্রমান্বয়ে চলমান মানুষ গা ঘেঁষে ধাক্কা দিয়ে চলে যাচ্ছে। রাস্তায় গায়ে গায়ে গাড়ি, ট্রাম, ঠেলা সব দাঁড়িয়ে। জ্যাম। চিনেদের জুতোর দোকান থেকে চামড়ার কটু গন্ধ আসছে। একঝলক হাওয়া রাস্তার ধুলো কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারল মুখেচোখে। জীবাণুতে ভরতি কলকাতার বিষাক্ত ধুলো।

রণেন আকাশের দিকে মুখ তুলে দেখল। বাড়ির চূড়ায় চূড়ায় বিঁধে আছে সরু একফালি আকাশ। কিংবা আকাশের গলি। তার মধ্যে মুশ্‌কো কালো শরীর বাড়িয়ে দিয়েছে প্রলয়ংকর মেঘখানা। রণেন ঘাম মুছল রুমালে। হাতের ভারী ব্যাগটা হাত বদল করল একবার। শরীরটা ভাল নেই। মেঘ করলে মাথার মধ্যে কেমন যেন করে।

নীল একটা ঝলক চাবুকের মতো খেলে গেল চারধারে। তারপরই কানের কাছ বরাবর সর্বনাশের শব্দ হয়। রণেনের বুকের মধ্যে ধড়ফড় করে হৃৎযন্ত্র নড়ে ওঠে। শরীর অবশ লাগে। ঘাম হয়। প্রেসারটা বেড়েছে। কদিন আগে ডাক্তার ডেকেছিল বীণা। ডাক্তার প্রেসার দেখল, বুক দেখল, পেচ্ছাব পরীক্ষা করাল। কটা দিন বাড়িতে আটকে রেখেছিল বীণা। সে এক অসহ্য যন্ত্রণা। ঘরের মধ্যে আজকাল রণেন থাকতেই পারে না। রাতে যখন সদরদরজা বন্ধ হয়, তখনই রণেন ভারী ভয় পেয়ে যায়। কেবলই মনে হয়, রাতে ঘুমোলে যদি ভূমিকম্প হয় কি, আগুন লাগে, তা হলে বেরোবো কি করে তাড়াতাড়ি? বীণা যখন শোয়ার ঘরের দরজা দেয় রাত্তিরে, তখনও একটা বোবা ভয় তাকে ভালুকের মতো এসে ধরে। ঘরের ভিতর থেকে যেন বা সে আর কোনওদিন বেরোতে পারবে না। ভিতরকার চৌখুপির বাতাস বড় কম। বুক ভরে কবার দম নিলেই তা ফুরিয়ে যায়। তারপর আসবে দমবন্ধ করা এক অস্বস্তি, শ্বাসকষ্ট। মৃত্যু? হ্যাঁ। তাই।

সে ককিয়ে উঠে বলে—দরজা খুলে দাও।

বীণা দাঁতে ঠোঁট চেপে বলে—কেন?

—আমার অস্থির লাগে। দরজা জানালা সব খুলে দাও।

বীণার একটু ঠান্ডার বাই আছে। এই ঘোর গ্রীষ্মেও নাকি শেষ রাত্রে হিম পড়ে। বাচ্চাদের ঠান্ডা লাগে যদি! বীণার নিজেরও ইসিনোফেলিয়া শতকরা নয়। ভাগ। ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস। বীণা দরজা খুলে দেয়, কিন্তু জানালা সব খুলতে রাজি হয় না। কেবল ড্রেসিং টেবিলের ধারের জানালার একটা পাট খুলে রাখে। বিছানার ধারের জানালা খোলে না। ঘরে সবজে একটা ঘুম-আলো জ্বলে। সেই ঘোর সবুজ রঙের মধ্যে শুয়ে থেকে রণেন সেই এক-পাট খোলা জানালার দিকে চেয়ে থাকে। ওই একটু এক চিলতে ফাঁক—ওইটুকু যেন তার প্রাণ,

তার পরমায়ু, তার শ্বাসের বাতাস। রাতে ঘুম হয় না। প্রেসারের বড়ি আর ট্রাংকুলাইজার খায়। তাতে হয়তো প্রেসার কমে, টেনশনও কমতে পারে। কিন্তু শরীরটা বড় দুর্বল লাগে। সারাদিন অবসাদ। মা এসে বুকে হাত বুলিয়ে দেয়, মাথার তালুতে তেল চাপড়ে দেয়। দিতে দিতে চোখের জল ফেলে বলে— আজকাল কচিবয়সেই এ-সব তোদের কী রোগ হয় রে?

কচি বয়স? মায়ের কাছে অবশ্য ছেলের বয়স বাড়ে না। কিন্তু বয়স কথাটা আজকাল বড় ধাক্কা দেয় রণেনকে। তার বোধ হয় আটত্রিশ পেরিয়ে উনচল্লিশ চলছে। আর একটা বছর ত্রিশের কোঠায়। তারপরই চল্লিশ। মধ্যবয়স, প্রৌঢ়ত্ব। সে ধাপটা পেরোলেই বুড়ো। বড় সাংঘাতিক। বয়স যত ঘনায় তত একে একে প্রিয়জন খসে পড়তে থাকে। বাবা যাবে, মা যাবে, বয়স্করা যাবে। একদিন তারও যাওয়ার সময় এসে পড়বে।

কেমন হবে সেই দিনটা? মেঘলা? নাকি রৌদ্রোজ্জ্বল? শীত? না কি গ্রীষ্মকাল? বর্ষা হবে না তো! দিন, না রাত্রি? ভাবতে ভাবতে বিছানায় উঠে বসে রণেন। খুব কাছে কে যেন বলে ওঠে—সব মরে যাবে। চমকে ওঠে রণেন। কে বলল ও কথা? পরমুহূর্তেই বুঝতে পারে যে, সে নিজেই বলেছে। তার ঠোঁট নড়ে উঠল এইমাত্র। আবার বলল—উঃ, মা গো!

নিজের ঠোঁটে হাত রাখে রণেন। সে এই একা-একা কথা বলাকে বড় ভয় পায়। সন্দেহ করে। কিন্তু ঠেকাতেও পারে না। আজকাল মাঝে মাঝে সে টের পায়, তার ঠোঁট নড়ে, জিব নড়ে, কথা উঠে আসে বুক থেকে। আপনিই চমকে ওঠে রণেন। ঠোঁট চাপা দেয়, নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করে। আর তখনই আবার বলে ওঠে—ক্যাডাভ্যারাস, ক্যাডাভ্যারাস, ইউ...ইউ...ইউ...

কথাগুলোর অর্থ কী! তবু বুক থেকে, মাথা থেকে ওইরকম সব অর্থহীন শব্দ উঠে আসছে আজকাল। কী হয়েছে তার? খুব শক্ত অসুখ? ঘোর সবুজ আবছা আলোয় সে আয়নার দিকে তাকিয়ে মুখ ভ্যাঙচার। হাসে। ওই মৃদু আলোতেও বুঝতে পারে, তার চোখে না ঘুমোনোর ক্লান্তি। একটু ঝুঁকে গেছে মোটা শরীর। ঘুম ভেঙে কখনও বীণা উঠে ধমক দেয়—কি হচ্ছে কি পাগলামি? বিছানায় এস। ঘুমোও।

রণেন বিছানায় যায়। শুয়ে থাকে। ঘুমোয় না। বিড়বিড় করে বলেচছক্যাডাভ্যারাস, ক্যাডাভ্যারাস, ইউ..ইউ...ইউ...

কদিন ঘরবন্দি রেখেছিল বীণা আর মা। এখন আবার বেরোয় রণেন। জোর করেই বেরোয়। শরীর খারাপ বলে আজকাল আর তাকে বাইরে ঘুরতে হয় না। অফিসেরই একটা সেকশনে বসে থাকে চুপচাপ। কিন্তু অফিসের লোকজন আজকাল তাকে বড় বেশি লক্ষ্য করে। হঠাৎ হঠাৎ কথা বলে ওঠে রণেন। সবাই তার দিকে ফিরে তাকায়। এও এক জ্বালাতন। তাই আবার আজকাল বাইরে বেরোয় সে। শরীর খারাপ লাগলেও মনটা একরকম থাকে।

একদিন অফিসে ঘোষের কাছে গিয়ে হাক্লান্ত রণেন বলেছিল—ঘোষদা, একটা কথা বলতে পারেন?

ঘোষ অফিসের ফাইল আজকাল প্রায় ছোঁয় না। ডিসেম্বরে রিটায়ারমেন্ট, কাজ করে হবে কী? বসে বসে পুরনো টেস্ট পেপার থেকে খুঁজে পেতে অঙ্ক কষছিল অফিসের কাগজে। অঙ্কটা কষতে কষতেই বলল কী?

—মানুষ মরার পর কি হয় বলুন তো, আত্মা-টাত্মা বলে কিছু আছে নাকি সত্যিই?

ঘোষ চোখ তুলে তাকে একবার দেখে নিয়ে মিচকে হাসে। বলে—বাঃ। বেড়ে প্রশ্ন। আজকাল এ-সব নিয়ে কেউ ভাবে নাকি আপনার বয়সে?

ঘোষ জানে অনেক। ভারী স্থির বুদ্ধি। তবে কথাবার্তায় সবসময়ে একটু বাঁকাভাব থাকে।

রণেন বলেছিল—বলুন না ঘোষদা।

ঘোষ কাগজপত্র সরিয়ে রেখে চেয়ারে পা তুলে বসল, বলল—মশাই, আপনি যে আছেন, এটা কি সত্যি?

রণেন মাথা নাড়ে—সে তো আছিই।

ঘোষ তখন মৃদু হেসে বলে—আপনার থাকাটা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তবে আপনি যে ছিলেন, এও সত্যি। আর, আপনি যে থাকবেন, তাও সত্যি। এটা লজিক্যালি প্রুভড। আপনি ছিলেন না, আপনি থাকবেন না, অথচ আপনি আছেন—তা হয় কী করে? যুক্তিতে আসে না। সুতরাং জন্মের আগেও আপনি ছিলেন, মৃত্যুর পরেও আপনি থাকবেন। এটা থিয়োরেটিক্যালি প্রমাণ করা যায়।

রণেন কিছুটা উজ্জ্বল হয়ে বলে—কিন্তু কীভাবে থাকব, কীভাবে ছিলাম।

ঘোষ অন্যমনস্ক ও গম্ভীরভাবে বলে—বলা মুশকিল। তবে শুনেছি, অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ আত্মা একটা ভাবভূমিতে অবস্থান করে। তার অঙ্গও থাকে, বোধও থাকে তবে সে মর্ত্যের মতো নয়। অন্যরকম।

রণেন একটু কেঁপে উঠে বলেছিল—সে জায়গা কেমন?

ঘোষ একটু হেসে বলে—কী করে বলি? না মরলে তো জানতে পারা যাবে না। তবে শুনেছি, সেখানে আলো-অন্ধকার নেই, শীত-গ্রীষ্ম নেই।

তবে সে কি অনন্ত গোধূলির দেশ? চিরবসন্ত? ঠিক বিশ্বাস হয় না, কিন্তু বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে। পরমুহূর্তেই ঘোষের দিকে চেয়ে থেকে তার আবার সেই একাকীত্বের কথা মনে পড়ে। লোকটার বউ নেই, ছেলেরা আত্মসর্বস্ব। এ লোকটা চাকরি শেষ হওয়ার পর একদম একা হয়ে যাবে। প্রাণের কথা বলা মানুষ না থাকলে মানুষ বড় কষ্ট পায়। তার গভীর মনের সঙ্গে বাইরের পৃথিবীটার কোনও সম্পর্ক থাকে না। ঘোষের দিকে চেয়ে তাই একরকম ভয় পায় রণেন। বলে—ঘোষদা, রিটায়ার করে কী করবেন?

ঘোষ প্রশ্ন শুনে হাসল। চেয়ার থেকে ঠ্যাং নামিয়ে ঝুঁকে অঙ্ক কষার কাগজপত্র টেনে নিল আবার। বলল—বসে থাকব, যতদিন না মরি।

কথাটা বড় ন্যাংটো, কড় কঠিন সত্য। বসে থাকব, যতদিন না মরি। রণেন বড় অস্থির বোধ করেছিল। উঠে আসছিল, ঘোষ পিছন থেকে ডেকে বলল—ব্রজদা আছেন কেমন?

—ক্ষেত খামার নিয়ে থাকেন! ভালই আছেন।

ঘোষ বুঝদারের মতো মাথা নাড়ল। হঠাৎ বলল—মাঝেমধ্যে শ্মশানে গিয়ে বসে থাকবেন। দেখবেন তাতে মৃত্যু সম্পর্কে জড়তা কেটে যায়। আমি এখনও সময় পেলে নিমতলার গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসে থাকি। সন্ধেবেলাটায় বেশ লাগে।

তাও গিয়েছিল রণেন। কেওড়াতলাটা কাছে হয়। দুপুর-দুপুর একদিন চলে গেল। দেয়ালঘেরা বদ্ধ জায়গা, রোদের তাপ, চিতার আগুন, সব মিলিয়ে বীভৎস গরম। ছাই, ধোঁয়া চারদিক অন্ধকার করে রেখেছে। পোড়া ঘিয়ের কটু গন্ধ। মানুষের পোড়া-আধপোড়া-না পোড়া শরীর চারধারে। মাথার মধ্যে একটা ভয়-ভাবনা ঘুলিয়ে উঠল। একধারে একটা টিনের টুকরো চাপা গাদির মড়া পড়ে আছে। টিনের তলা থেকে সিঁটোনো দুজোড়া সাদা পা বেরিয়ে আছে। ঠিক তার পাশেই সাদা পাকানো গোঁফঅলা একটা পশ্চিমা লোকের মাথা। সবগুলো রাতে

এত চিতায় দাহ হবে। রণেন পালিয়ে এল। সে-রাতে জেগে থেকে অনেক রকম শব্দ করেছিল সে। মনে হচ্ছিল, ওরকম আগুনে পুড়ে যেতে সে কোনওদিন পারবে না।

রাতের বেলাটা একা ভয় করে জেগে থাকতে। কিন্তু সঙ্গে জেগে থাকার কেউ তো নেই। বীণা মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে উঠে ধমক দেয়, শুয়ে পড়তে বলে। কখনও-কখনও একটু আদরও করে কাছে ডেকে। তারপরই বীণার কাজ ফুরোয়। পুরনো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আর কিই বা কথাবার্তা থাকবে। রণেন জানে, তার কেউ নেই।

রাস্তাটা পার হওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছে রণেন। পার হতে পারছে না। দুদিকের দুমুখো গাড়ির আঁটো জ্যাম। আকাশে মুখ তুলে দেখে, বৃষ্টি এল বলে। কালো মেঘ নিচু হয়ে ঢলে যাচ্ছে রেলগাড়ির মতো। বাতাসে বৃষ্টির গন্ধ। খড়কুটো, ধুলোবালি উড়ে ঝাপটা মারছে। ফুটপাথের দোকানিরা দ্রুত মালপত্র তুলে নিচ্ছে। কলকাতার ড্রাইভারদের মনুষত্ববোধ কিছু কম। রাস্তা ফাঁকা পেলে মানুষজন মানে না। রণেন রাস্তা পার হওয়ার সময়ে যদি সামনের গাড়ি দুহাত এগোয় তবে পিছনের গাড়িও হয়তো রণেনকে উপেক্ষা করে দুহাত এগোবে। ড্রাইভারদের ঠিক বিশ্বাস করে না রণেন। এমনিতে তারা হয়তো তোক সবাই খারাপ না। কিন্তু কলকাতার জ্যাম, লক্ষ গাড়ি আর কোটি মানুষের ভিড়ে ভরা সরু অকল্পনীয় রাস্তা, পদে পদে থেমে থাকা—এসব থেকে মানুষ খ্যাপাটে হয়ে যায়—আসে রাগ বিরক্তি, অধৈর্য ক্লান্তি। তখন আর স্বত্ব স্বত্ত্ব জ্ঞান থাকে না। শুধু ড্রাইভার কেন, কলকাতার সব মানুষই কি তাই নয়? বিরক্ত, রাগী, উদাসীন ও নিষ্ঠুর। রণেনের চারদিকটা তাই ভয়ে ভরা।

রাস্তা পার হতে না পেরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে রণেন। মেঘ ডাকছে সিংহের মতো। জোর বাড়ছে হাওয়ার। টপাস করে একটা ফোঁটা এসে ফাটল রণেনের ডান গালে। কী ঠান্ডা ফোঁটা! রণেন ব্যাগটা হাতবদল করে নিয়ে ফুটপাথ ধরে আস্তে আস্তে হাঁটে। যতদূর যায় ততদূর পর্যন্ত রাস্তা আটকে সারা সার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। অথচ রাস্তাটা পার হওয়া দরকার।

পান খাওয়া ডাক্তার বারণ করে গেছে। রণেন তবু খায়। কালাপাতি, পিলাপাতি আর মোহিনী দেওয়া কড়া পান। প্রথম প্রথম মুখ জ্বলে যেত, গলায় ধক্ লেগে মাথা ঘুরত। আজকাল সয়ে গেছে। সকাল থেকে আজ পান খায়নি। চড়বড় করে বৃষ্টির ফোঁটা হেঁটে যাচ্ছে চারধারে। এখনও মুষলধারে নামেনি। কিন্তু প্যারেডের সৈন্যর মতো তারা এগিয়ে আসছে। আরও কবার নীল চাবুক ঝলসে গেল চারধারে। মেঘলা আর বৃষ্টির দিনে রণেনের মাথা বড় ভার হয়। বুকের ভিতরটা অন্ধকার লাগে।

পানের দোকানের অল্প একটু ছাউনির ভিতরে মাথাটা গুঁজে রণেন দেখল, বিশুষ্ক সব দেয়ালে বৃষ্টির প্রথম কয়েকটি ফোঁটা অনেকগুলো তেরচা দাগ টেনেছে। ভেজা দেয়ালের চুণ-চুণ একরকম গন্ধ। পানের প্রথম ঢোঁকটা গিলে ফেলল রণেন। কড়া জর্দার পান। মাথাটা একবার পাক খেল। সামলে গেল। পিক ফেলে দিয়ে গলাটা ঝাড়ল একটু। প্রেসারটা বেড়েছে, রক্তে চিনি আছে, হার্টও ভাল না। কী হবে? মাথাটা নাড়ল রণেন। বলল-দূর ফোসকা পড়বে। বলেই চমকে উঠল। এখনও সে চিতার আগুনের কথা ভাবছে।

থেমে থাকা ট্রাম থেকে অধৈর্য কয়েকজন মানুষ নেমে পড়ল। তাদের মধ্যে একটি কিশোরী মেয়ে। কিশোরী? না, ঠিক কিশোরী নয়, তবে রোগা বলে ওইরকম দেখাল বোধ হয়। বাঁ হাতে খাতা উঁচু করে মুখ আড়াল দিয়ে নামল। সামনেই বাটার রিডাকশান সেল-এর দোকান। এক দৌড়ে উঠে গেল দোকানে, যেখানে মাথা বাঁচাতে ইতিমধ্যে জড়ো হয়েছে কিছু লোক।

হেঁটে আসছে বৃষ্টি। দেয়ালে দ্রুত ফোঁটার দাগ মিলিয়ে যাচ্ছে। ভিজে যাচ্ছে ময়লা দেয়াল। বিবর্ণতা। পানের দোকান থেকে রণেন সরে আসে। বাটার দোকানে উঠে দাঁড়ায়। বৃষ্টি দেখে। কী গভীর বৃষ্টিপাত!

মেয়েটা হাতের খাতা বুকে চেপে দাঁড়িয়ে আছে। খুব দূরে নয়। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। লম্বা, রোগাটে চেহারা। কিন্তু চামড়ায় কচি বয়সের চিকণতা। বয়সের দাগধরা, ছোপধরা নয়। মুখখানায় বয়সের অহংকার। পাতলা নাক, একটু মোটা ঠোঁট, দুখানা চোখ চঞ্চল, মাথায় তেলহীন নরম চুল, তাতে এখনও কয়েক ফোঁটা জল লেগে আছে। ডানধারে ঠোঁটের ওপরে একটা আঁচিল। ফরসা মুখে আঁচিল পাগল করে দেয় না, যদি জায়গা মতো হয়?

রণেনের দোষ সে যখন কোনও মেয়েকে দেখে তখন আর বাহ্যজ্ঞান থাকে না, ভদ্রতাবোধ লোপ পায়। তাই চেয়ে ছিল রণেন। সময়ের জ্ঞান ছিল না। ওই রকম লাগাতার চেয়ে থাকার জন্যই বোধ হয় মেয়েটা তার দিকে তাকাল। একবার স্বাভাবিক কৌতূহলে, পরেরবার ভ্রূ কুঁচকে। গহীন চুলের মধ্যে পথরেখার মতো সিঁথি ডুবে গেছে। মুখখানা লম্বাটে, থুতনির খাঁজ গভীর। কাপড় বা শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপনে অনেকটা এরকম মুখের ছবি ছাপা হয়। বাঙালি মুখ, তবু যেন বিদেশি কাটছাঁটে তৈরি।

রণেনকে পছন্দ হয়নি মেয়েটির। ভ্রূ কোঁচকানো মুখ ফিরিয়ে নিল ঝামড়ে। তাতে অবশ্য রণেনের কিছু যায় আসে না। মেয়েদের মনের মতো চেহারা তার নয়, সে জানে না কি! তবু একটা শ্বাস ফেলে রণেন। এখনকার দিনকাল বড় ভাল। সোমেনের কথা একবার মনে এল। কেমন শ্রীমান চেহারা ভাইটার! ওদের সময়টাও ভালো, মেয়েদের সঙ্গে হুল্লোড় করে বেড়ায়, বকবক করে। রণেনের কলেজ জীবন কেটেছে নন কো-এডুকেশনে, ইউনিভার্সিটিতে যায়নি। বরাবরই তার চরিত্রের খ্যাতি ছিল। সে নাকি মেয়েদের দিকে তাকায় না। সারা যৌবনকালটা সেই খ্যাতি রক্ষা করে গেছে রণেন। মেয়েদের উপেক্ষা করেছে। তাকায়নি। কেবল বহেরুর খামারবাড়িতে এক-আধবার নয়নতারার সঙ্গে...। কিন্তু সেও কিছু নয়। যৌবন বয়সের ভাল ছেলে রণেন আজও একরকম বাঁধা আছে নিয়তির কাছে। বয়স ফুরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু পৃথিবী জুড়ে এখনও নেমে আসছে সুন্দর, কচি, হৃদয়বতী মেয়েরা।

রণেন দুপা পিছিয়ে গেল। ছাঁট আসছে। চশমা ভিজে গেছে। রুমালে কাচ দুটো মুছে নিয়ে ভাল করে তাকাল। মেয়েটা ঘাড় ঈষৎ সামনের দিকে বাঁকিয়ে বড় বড় অন্যমনস্ক চোখে বাইরের দিকে চেয়ে আছে। ঠোঁট দুটো অল্প ফাঁক উত্তেজক।

নিজের শ্বাসের ঝোড়ো শব্দে চমকে ওঠে রণেন। ভিতরে ভিতরে এক তীব্র কামবোধ আনন্দস্পৃহা জেগে ওঠে। চামড়ার তলায় শরীরের ভিতরকার অন্ধকারে ঝিঁঝি করে লুকনো বীজ। মাথার সব চিন্তা লোপাট হয়ে যায়। চোখের পাতা নড়ে না। ভিতরে ভিতরে ভালো ছেলে রণেন কি নারীধর্ষণকারী নয়? যেদিন বীণাকে মেরেছিল সেদিন সোমেন আর মা না চেঁচালে বীণা খুন হয়ে যেত তার হাতে। তা হলে, ভিতরে ভিতরে সে কি খুনিও?

রণেন নিজের মনে মাথা নাড়ল। হ্যাঁ, সে যেমন খুন করতে পারে তেমনি নারীধর্ষণ করতে পারে। আরও পারে বহু কিছু। মানুষের অস্পৃশ্য অনেক পাপ। ভয়ে বা লজ্জায় বা অনভ্যাসে করে না। কিন্তু পারে।

মেয়েটা তাকাচ্ছে না, কিন্তু লক্ষ্য করেছে ঠিকই যে একজন মধ্যবয়সি মোটা লোক তাকে নজর দিচ্ছে। কচি বয়স, এ বয়সে যে কোনও পুরুষেরই চোখে নিজেকে জরিপ করে নিতে ইচ্ছে যায়। মেয়েটা তাই রণেনের

উদ্দেশ্যেই বোধ হয় আঁচল টেনে টান করে দিল কিছুটা। স্পষ্ট ফুটে ওঠে বুকের ডৌল। নাভির নীচে কাপড়, খাটো ব্লাউজ। পেটের অনেকখানি দেখা যায় নীলচে একটা জার্মানি জর্জেটের শাড়ি পরনে। ভাবা যায়?

বৃথা গেল বয়স। বৃথা গেল সময়, মাথা খুঁড়লেও ফিরে আসবে না।

রণেন তাই নিজের মনের কাছে বলে রাখল—আমি কিছুই পাইনি জীবনে।

মেয়েটি বৃষ্টির দিকে চেয়েছিল। চুল নড়ছে হাওয়ায়। মোটা বেণী। নীরবে সেই যেন উত্তর দিয়ে দিল রণেনকে—আহা।

—আমি মোটা মানুষ, ব্যক্তিত্বহীন, হাবা।

—একটু বয়সের পুরুষই ভাল। তারা হৃদয়বান হয়, চঞ্চলতা থাকে না। তুমি ভাল।

রণেন মাথা নাড়ে, বলে—সবাই তাই বলে। কিন্তু আমি আর ভাল থাকতে চাই না। ভাল থাকা বড় একঘেয়ে ক্লান্তিকর। একটু খারাপ হয়ে দেখি না! আমাকে খারাপ করবে? প্লিজ!

মেয়েটা মৃদু হাসল। সৌরভময় শ্বাস ফেলে বলে—মোটা তো কী! কেমন ফরসা তোমার রং, কেমন ঠান্ডা মাথা। চাকরিও ভাল।

—কেমন লাগছে আমাকে? ভাল?

মেয়েটা চোখ তুলে তাকাল, শুভদৃষ্টির সময়কার মতো চোখ। কী লজ্জা ও শিহরনে ভরা বিদ্যুৎ! কথা বলল না।

রণেন বলে—আমি আর একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করব।

—তার মানে কি দুটো জীবন?

রণেন মাথা নাড়ল—শুধু বউ হলে আনতাম। কিন্তু বাচ্চাগুলো রয়েছে যে। বড় মায়া।

মেয়েটি বুঝেছে। মাথা নাড়ল। তৎক্ষণাৎ একটা নাম দিল রণেন—লীনা। এই নামের একটা মেয়েকে বালকবয়সে ভালবেসে ছিল রণেন, যার সঙ্গে কোনওদিন কথাবার্তা হয়নি। লীনা করুণ চোখে চেয়ে মাথা নয়াল। বলল—তাই হবে।।

হবে! বাঃ! চমৎকার! সব সমস্যার কেমন সমাধান হয়ে গেল। সবাই থাকবে। বাচ্চারা, বীণা, আলাদা ফ্ল্যাটে লীনাও! বাঃ।

ভারী খুশি হয়ে ওঠে রণেন।

দুঘণ্টার বৃষ্টি কলকাতাকে লণ্ডভণ্ড করে গিয়ে গেল। ট্রাম বন্ধ, বাসে লাদাই ভিড়, ট্যাক্সির মিটার সব লাল কাপড়ে ঢাকা। বৃষ্টির পর কলকাতা থেমে যায়, কিংবা খুব আস্তে চলে। রথের মেলার মতো মানুষ জমে আছে সর্বত্র। থিকথিক করছে জীবাণুর মতো মানুষ।

রণেন অফিসের হলঘরে তার ভেজা জামা আর গেঞ্জি ফ্যানের তলায় চেয়ারের পিঠে মেলে দিয়েছে। বসে আছে চুপচাপ। অফিসে এখনও কিছু লোকজন আছে। জনা ছয়েক লোক একধারে ফিস খেলছে। অন্যধারে ব্রিজের আড্ডা বসেছে। শুধু মুখোমুখি ঘোষ বসে নীরবে অঙ্ক কষছে। রণেন চোখ বুজে ছিল। ভাবছিল সবাইকে ডেকে বলে দেবে, মরবার পর যেন তাকে না পুড়িয়ে কবর দেওয়া হয়: পোড়ানোটা বড় বীভৎস ব্যাপার। আবার পরক্ষণেই মনে হল,কবর! ওরেব্বাস, সেও তো মাটি চাপা হয়ে দমবন্ধ হবে। হাঁসফাঁস করতে হবে কেবলই।

ভেবেই সে হঠাৎ জোরে বলল—না না।

বলেই চমকে ওঠে। ঘোষ একবার মুখ তুলেই চোখ নামিয়ে নিল। কিছু জিজ্ঞেস করল না।রণেন লজ্জা পেল বটে, কিন্তু ঘোষ বড় বিবেচক মানুষ বলে লজ্জাটাকে সামলে গেল।

সাতটা বেজে গেছে। ফিসের আড্ডা থেকে দুজন বেরিয়ে গেল। একজন চেঁচিয়ে বলল—ঘোষদা, এই বৃষ্টিতে কি ভাল জমে বলুন তো?

ঘোষ উত্তর দিল না। ব্রিজের আড্ডা থেকে একজন চেঁচিয়ে বলল—ভূতের গল্প, খিচুড়ি আর মেয়েছেলে।

—দূর। ঘোষদাকে বলতে দিন।

ঘোষ উত্তর দিল না। একটু হাসল কেবল, অঙ্ক কষতে লাগল।

আর একজন বলে—ইলিশ।

—কত করে কেজি জানিস? ওই লাহিড়ি জানে, জিজ্ঞেস কর।

কে একজন চেঁচিয়ে ডাকে—লাহিড়ি, ও লাহিড়ি।

রণেন তাকাল। অ্যাকাউন্টসের বিপুল সেন। ভ্রূ কুঁচকে রণেন বলে—কী?

—ইলিশ মাছ কত করে যাচ্ছে?

—কী জানি!

—আমাদের মধ্যে তো এক আপনাকেই দেখছি যিনি ইলিশটিলিশ খান। আমরা তো আঁশটাও চোখে দেখি না। ইন্সপেক্টর না হলে সুখ কী!

রণেন মুখটা ফিরিয়ে নেয়। ব্যক্তিত্ব না থাকলে এরকম হয়। যে-সে যা খুশি বলে সারতে পারে।

কে একজন বলল—ইলিশ খেয়ে পয়সা নষ্ট করবে কেন! লাহিড়ি লকারে রাখছে। টালিগঞ্জে বাড়ি হাঁকড়াচ্ছে, সব খবর রাখি।

হলঘরের দরজাটা খোলা। কে একজন ছাতা মুড়ে, গা থেকে বর্ষাতি খুলতে খুলতে দরজা দিয়ে ঢুকে এল। দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে চারধারে চাইছে।

রণেন চিনতে পারল। সোমেন। বুকটা কেঁপে উঠল হঠাৎ। সোমেন অফিসে কেন? কোনও খারাপ খবর নেই তো! বাবা, মা, বীণা, বুবাই, টুবাই, খুকি, শীলা, অজিত—কত প্রিয়জনের নাম ঘাই মারে বুকের মধ্যে।

রণেন ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়।

সোমেন তাকে দেখে এগিয়ে আসে।

॥ বিয়াল্লিশ ॥

মা আর বউদি দুজনে ঠেলে পাঠিয়েছে সোমেনকে দাদার ফিরতে দেরি হচ্ছে কেন তা দেখে আসতে। বৃষ্টি বাদলায় মানুষের দেরি হয়, কিন্তু কে বুঝবে সে কথা। সোমেন তাই খুব বিরক্তির সঙ্গে এসেছে।

মনটা ভাল নেই। গতকাল অণিমা এসেছিল বাসায়। সাদাখোলের শাড়ি পরা, চেহারাটা অনেক ভাল হয়েছে আজকাল। অনেক ধীরস্থির আগের চেয়ে। একটা চমৎকার হ্যান্ডমেড কাগজের কার্ডে ছাপা বিয়ের চিঠি দিয়ে বলল—যেও না সোমেন। সব নিমন্ত্রণে যেতে নেই।

এরকম কথা কখনও শোনেনি সোমেন। কেউ নেমন্তন্ন করতে এসে বারণ করে যায় নাকি!

ঘরে বসে কথা বলার সুবিধে নেই। তাই অণিমার সঙ্গে বেরিয়ে এল সোমেন। কোনও দিন নিজেদের গাড়িতে চড়ে কোথাও অণিমাকে যেতে দেখেনি সোমেন। অণিমার রুচিবোধ বড় প্রবল। গাড়ি আছে—এটা কাউকে দেখাতে চায়নি কখনও। কাল কিন্তু গাড়ি করে এসেছিল। সাদা অ্যামবাসাডার। অণিমার সঙ্গে পিছনের সিটে উঠে বসল। সামনে ড্রাইভার।

কথা হচ্ছিল না। একটা লালরঙা নাইলনের খাপে-ভরা নিমন্ত্রণের চিঠিগুলি সোমেন আর অণিমার মাঝখানে পড়েছিল। অণিমা দরজার কাছে অনেকটা সরে বসেছে। আলগা দূরের মানুষ, প্রায় পরস্ত্রী। সোমেন বলে—আমাকে গড়িয়াহাটায় নামিয়ে দিয়ো অণিমা।।

অণিমা উত্তর দিল না। অনেকক্ষণ বাদে বলল—পরীক্ষাটা দেবে না?

সোমেন হাসল, বলল—তুমি বড় বেরসিক। পরীক্ষাটা কোনও ফ্যাক্টর নয়। দিলেও যা, না দিলেও তাই। একজন গ্র্যাজুয়েট বেকার আছি, তখন না হয় এম-এ পাস বেকার হবো।।

—তা কেন? প্রফেসারির জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে।

সোমেন হাসল। গড়িয়াহাটা ব্রিজের ঢালু বেয়ে গাড়িটা গড়িয়ে নামছে তখন। অণিমা বাইরের দিকেই চেয়েছিল। যেন অন্যমনস্ক। আসলে তা নয়। চেহারা ভাল হলেও অণিমার মুখে একটা খড়ি-ওঠা বিষন্নতার গুঁড়ো মাখানো। সোমেনের বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড নেচে ওঠে। একই সঙ্গে একটা জয়ের আনন্দ ও হারানোর দুঃখ তাকে মুহূর্তের জন্য পাগল করে দেয়। একটু ঝুঁকে সে প্রশ্ন করে—বিয়ের পর কোথায় অণিমা?

অণিমা ভারী চশমার ভিতরে তার ছোট হয়ে আসা চোখে তাকাল সোমেনের দিকে। বলল—সিন্ধ্রি।

—অনেক দূর।

—দূর! বলে একটু ভাবে অণিমা। পরে হেসে বলে—তেমন দূর নয়। তবে দূরত্বটা রাখাই ভাল।

ব্যগ্র, লোভী সোমেন বলল—কেন অণিমা?

—গড়িয়াহাটা এসে গেল, সোমেন নামবে না?

—আর একটু যাই।

অণিমা শ্বাস ফেলে বলে—চলো।

গাড়ি চলে। খুব মৃদু ইন্টিমেট সুগন্ধীর একটা বাসি গন্ধ গাড়ির ভিতরে। স্নো-পাউডার কখনও মাখত না অনিমা। এখন কি মাখে? মৃদু সুবাস তার চারদিকে। মহীয়সীর মতো দেখাচ্ছে সাদা খোলের শাড়িতে। চওড়া পেটা জরির পাড়। এত দুর্লভ কখনও অণিমাকে দেখাত না। ঠাট্টা-ইয়ারকি একদম কি ভুলে গেল অনিমা?

—অনিমা, তোমার কাছে টাকা আছে?

অনিমা অবাক হয়ে বলে—কেন?

—ধার দেবে? একটা জিনিস কিনব?

সোমেন কোনওদিন ধার চায় না। অনিমা ব্যাগ খুলে দেখেটেখে বলে—কত বলল তো!

—জানি না। জিনিসটা শো-কেশে দেখলাম একটা দোকানে, ফেলে এসেছি পিছনে। গাড়িটা ঘোরাতে বলো।

গাড়ি ঘুরল। গড়িয়াহাটার দিকে ফিরে আসতে একটা দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল সোমেন। শো-কেসে একটা চওড়া লালপেড়ে বিষ্ণুপুরী শাড়ি। সোমেন নেমে গিয়ে দাম জিজ্ঞেস করল। দেড়শো টাকা।

গাড়ির কাছে ফিরে এসে বলল—দেড়শো টাকা দেবে?

কী একটা সন্দেহ করে অনিমা। একটু ইতস্তত করে টাকা বের করে দিয়ে বলল—মাঝে মাঝে পাগলামির ভূত চাপে, না?

সোমেন তার ভুবনজয়ী মিষ্টি হাসি হেসে বলল—পাগলই তো।

শাড়িটা কিনে এনে প্যাকেটটা গাড়ির সিটে রেখে উঠে বসল গাড়িতে। বলল—তোমাকে সাদা খোলের শাড়িতে বড় মহীয়সী মনে হয়।

—তাই নাকি?

বিয়ের দিন ওই কারণেই তোমাকে না দেখা ভাল। ওইদিন তো তোমাকে রঙিন বেনারসি পরাবে, ফুলের সাজ, চন্দন—এ সব তোমাকে মানায় না।

অনিমা সত্যিকারের হাসি হাসল একটু। বলল—সেটা দৃষ্টিভঙ্গির তফাত বলে। তোমার সঙ্গে যদি হতো তা হলে কী করতে? শুভদৃষ্টির সময়ে তাকাতে না সোমেন?

এ কথাটায় ঠাট্টা ছিল হয়তো। তারা হাসলও। কিন্তু হাসি কারও ঠোঁটের গভীরে গেল না।

দেশপ্রিয় পার্কের কাছে সোমেন নেমে গেল। অনিমা পিছন থেকে বলল—এই শাড়ির বাক্স পড়ে রইল যে!

সোমেন দরজাটা দড়াম করে ঠেলে দিয়ে বলল—তোমার জন্য। বিয়েতে তো যাওয়া। বারণ, তাই আজ দিয়ে রাখলাম।

—যাঃ। এই সোমেন, শোনো, শোননা...

সোমেন শোনেনি। চলে এসেছে।

কাল থেকে সারাক্ষণ মনটা তাই খারাপ। কেমন যেন। পিপাসা পায়, বুক খালি-খালি লাগে। আবার একটা ভূতুড়ে আনন্দে রক্তে আগুন ধরে যায়। মনের এই অবস্থায় একা বসে ভাবতে ভাল লাগে, আর কিছু ভাল লাগে না। কালকেও বিকেলে পড়াতে গিয়েছিল গাব্বুকে। অণিমা বাড়িতে ছিল না। গাব্বর কাছে একটা সাঁটা

খাম রেখে গেছে। বাড়িতে ফিরে সেটা খুলে দেখেছে সোমেন। প্যাডের একটা কাগজের ঠিক মাঝখানে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা—নিলাম। মনে থাকবে। ভুলে যেয়ো। অ।

বাড়িতে একটা টেনশন চলছে আজকাল। সারাদিন সোমেন থাকে না। দুপুরে একটু থাকে, আর রাতে। প্রায় রাতেই মা আজকাল ঘুমনোর আগে দাদার কথা বলে। দাদার শরীর ভাল নেই। বউদির সঙ্গে গোলমাল হয়ে থাকবে, মনটাও তাই বোধ হয় ভাল থাকে না। বউদি মানুষটা খারাপ নয়, দাদা তো ভালই। কিন্তু দুজন ভালর জাত আলাদা। মা কিন্তু বরাবর দাদার পক্ষে। সোমেনকে রাত জাগিয়ে রেখে মা এক কাঁড়ি কথার হাঁড়ি খুলে বসে। সোমেন বিরক্ত হয়। সংসারের এত সব কথার মধ্যে বরাবর ডুবে মরে মন। তখন মনে হয়, অনিমা কিংবা রিখিয়ার কথা কত অবাস্তব! সংসারটা এত রোমাঞ্চহীন!

আজ বিকেল থেকে আকাশ কুঁসছে। বৃষ্টি এল। সোমেন বেরোতে পারেনি। সন্ধেবেলা প্রথমে মা, তারপর বউদি এসে ধরল। দাদা কেন ফিরছে না! সোমেন একটা কবিতার খসড়া তৈরি করছিল, এ সময়ে এই ঝামেলা। অত বড় লোকটা, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন, সে যাবে কোথায়, তার হবেটাই বা কী! কিন্তু কেউ বুঝল না। বৃষ্টির ধারাটা কমতেই তাই সোমেনকে বেরোতে হয়েছে। বউদি ট্যাক্সির ভাড়া দিয়েছিল। কিন্তু ট্যাক্সি পাওয়া যায়নি। গড়িয়াহাটা থেকে ট্রাম ধরে এসেছে। মনে বিরক্তি রাগ।

কিন্তু এখন অফিসের দরজা পার হয়ে যখন দাদাকে দেখতে পেল সোমেন তখনই বড় চমকে উঠল। খালি গায়ে দাদা দাঁড়িয়ে, পরনে শুধু আধভেজা ফুলপ্যান্ট, আড়া-আড়ি বুকের ওপর ময়লা পৈতে। মোটা গোল গণেশ মুখ। ভুঁড়িটা ঠেলে বেরিয়ে আছে। শরীরটা ঢিলেঢালা, চামড়ার ভাঁজ। মুখেচোখে একটা ভ্যাবলা বোবা ভাব। বড় বড় চোখে সোমেনের দিকে চেয়ে আছে। চাউনিতে একটা নির্বোধ ভয়। দাদার এমন চেহারা কখনও দেখেনি সোমেন। সোমেন কাছে যেতেই বলল—কী হয়েছে? অ্যাঁ! কী হয়েছে?

সোমেন ভ্রূ তুলে বলে কী হবে!

—কার অসুখ? না কি অ্যাকসিডেন্ট?

সোমেন বুঝতে পারল না দাদা কী বলতে চাইছে। একটু অবাক হল। বলল—কী বলছে দাদা! আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

—নিয়ে যাবি?

—মা বউদি সব ভাবছে দেরি দেখে।

এতক্ষণে যেন বা একটু স্বাভাবিক হল চোখ। দু-পা ফাঁক করে গম্বুজের মতো দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ অবসন্নের মতো বসে পড়ে বলল—ও।

—চলল। প্রায় আটটা বাজে।

রণেন মাথা নাড়ল। তারপর ভেজা জামা গেঞ্জি তুলে পরতে লাগল। হাত অল্প অল্প কাঁপছে। দৃশ্যটা দেখে সোমেনের সমস্ত হৃদয় বহুকাল বাদে দাদার দিকে ধাবিত হল একবার। কী হয়েছে দাদার? বহুদিন হয় এই লোকটাকে সে লক্ষই করেনি। লক্ষ করেনি, তার কারণ, রণেন কখনও লক্ষ করায়নি। বরাবর দাদা একটু গম্ভীর মানুষ, একটু চুপচাপ। নীরবে সে সংসারের দায়িত্ব বহন করে। সোমেন একটু বড় হওয়ার পর থেকেই দেখেছে, এই লোকটা সংসারের অভিভাবক। দু-ভাইতে কথা হয় খুব কম। কিন্তু আজও নিজের কোটটা প্যান্টটা, সাধ-আহ্লাদের নানা জিনিস সোমেনকে নিঃশব্দে দিয়ে দেয়। দাদা কখনও কাউকে খারাপ জিনিস দেয়

না। বাজার থেকে কখনও সস্তা জিনিস আনে না। সোমেনের ফিরতে রাত হলে চৌরাস্তার মোড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সেই দাদা। শান্ত, উদার, স্নেহশীল। দাদাকে কেন এতকাল লক্ষ করেনি সোমেন? দাদার কী হয়েছে?

হাওয়াই শার্টের বোতাম এঁটে রণেন ব্যাগটা তুলে নিল। বলল—ঘোষদা, যাই।

ঘোষ মুখ তুলে বলে—এটি কে? ভাই?

—হ্যাঁ।

ঘোষ মাথা নাড়ল। বলল—যান। বাড়ির সবাই ভাবছে। বলে একটু ব্যাঙের হাসি হাসল যেন। আবার মাথা নেড়ে বলে—আমাদেরই ভাবাভাবির কেউ নেই। বাঁচা গেছে।

বৃষ্টির কলকাতায় জীবাণুর মতো থিকথিক করছ মানুষ, এখনও এই রাত আটটায়। বৃষ্টি কমে গেছে, তবু ঝিরঝির চলছে এখনও। গাড়িবারান্দার তলায় তলায় ভিড় জমে আছে। মানুষের পিণ্ড।

রণেন চারদিকে চেয়ে বলে—কী করে যাবি?

—দাঁড়াও একটা ট্যাক্সি যদি ধরতে পারি।

রণেন মাথা নেড়ে বলল—পাবি না।

—তা হলে? মা আর বউদি ভাববে।

রণেন উদাস গলায় বলে—ভাবুক। আয় কিছু খাই। খিদে পেয়েছে।

—খাবে?

দাদার সঙ্গে রেস্টুরেন্টে বসে খাওয়ার কোনও অভিজ্ঞতা সোমেনের নেই। তার বড় লজ্জা করছিল। রণেনের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। গদাই লস্করের মতো হেঁটে বৃষ্টি ছাঁট উপেক্ষা করে সে ঢুকে গেল একটা রেস্টুরেন্টে। পিছু পিছু সোমেন। কিন্তু সেখানেও ভিড়। টেবিল খালি নেই। চারদিকে হতাশভাবে চেয়ে রণেন সোমেনের দিকে চেয়ে যেন নালিশ করল—খিদে পেয়েছে।

—বাড়িতে গিয়ে খেয়ো।

অধৈর্যের সঙ্গে রণেন বলে—সে তো অনেক দেরি। বলে সোমেনের দিকে রাগ আর নালিশভরা একরকম চোখে চেয়ে থাকে।

এ-কদিনেই দাদার ভিতরে একটা ওলটপালট হয়ে গেছে। সেটা সোমেন এই টের পেল। স্বাভাবিক রণেন এভাবে কথা বলে না তাকায় না। রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে সোমেন বলে— শেয়ারের ট্যাক্সি মেট্রোর উলটোদিকে দাঁড়ায়। চলো, যদি পেয়ে যাই।

রণেন কিছু বলল না। কিন্তু সোমেনের সঙ্গে হাঁটতে লাগল।।

দুদিন বৃষ্টির পর কলকাতা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল। এখানে-সেখানে কিছু জল দাঁড়িয়ে আছে। তবু রোদ উঠেছে। আকাশ গভীর নীল। দুদিন সাংঘাতিক বৃষ্টি হয়ে গেল। সবাই ঘরবন্দি। এই দুদিন সোমেন কেবলই শুনেছে দাদার ঘর থেকে দাদা মাঝে মাঝেই চেঁচিয়ে বলছে—দরজা খুলে দাও। জানালা খোলা রাখো।

—বৃষ্টির ছাঁটে ঘর ভিজে যাচ্ছে। বউদি রাগ করে বলে।

দাদা তখন ভীষণ হতাশভাবে বলে—ওঃ হোঃ হোঃ। ইস কী অন্ধকার। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

মা প্রায় সারাক্ষণ ওই ঘরে। এ ঘরে একা সোমেন। বুকের মধ্যে দুশ্চিন্তা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। দাদার কী হয়েছে? মাঝে মাঝে ও ঘরে গিয়ে উঁকি মেরে দেখে আসে। দাদা নির্জীব হয়ে শুয়ে আছে কিংবা মাথা হাঁটুর ফাঁকে রেখে বসে। ছেলে-মেয়েদের মুখ করুণ, শুষ্ক। তার মধ্যেই মাঝে মাঝে বাবার কাণ্ড দেখে হেসে ফেলে। বেশির ভাগ সময়েই বাইরের ঘরে খেলা করে। বউদি ভাল করে খায় না। রাতেও বোধ হয় ঘুম নেই। শরীর এ-কদিনেই শুকিয়ে গেছে। একটা বিপদের আশঙ্কায় থমথম করে ঘরের আবহাওয়া। ঘরে তাই সোমেনের মন টেকে না।

সোমেন এ কয়দিন খুব সিগারেট খেল। ভাবল। কেমন যেন মনে হয় এবার সংসারে একটা পরিবর্তন আসবে, ছক পালটাবে। সেই আগের মতো নিশ্চিন্ত জীবন আর থাকবে না।

গভীর রাতে একদিন ঘুম ভেঙে শুনল কলের গান বাজছে। খুব আস্তে বাজছে, আর সেই সঙ্গে বাইরের ঘরে কার যেন নড়াচড়ার শব্দ, গভীর শ্বাস আর 'আঃ উঃ শব্দ'।

দরজা খুলে সোমেন অবাক হয়ে দেখে, অদ্ভুত দৃশ্য। আলো জ্বালা হয়নি, তবু জানালা সব খোলা বলে বাইরের আলো এসে পড়েছে। রেডিয়োগ্রামের চৌকো ব্যান্ডে আলো জ্বলছে, স্থির হয়ে আছে সবুজ ম্যাজিক আই। আর রেডিয়োর সেই আলো চৌখুপির কাছে একটা মাথা অনড় হয়ে আছে। প্রথমটায় আবছায়ায় বুঝতে পারেনি সোমেন। তারপর দেখে, দাদা একটা আন্ডারওয়ার মাত্র পরে মেঝের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে বসে আছে। রেডিয়োর স্পিকারটা নিচুতে। স্পিকারের সঙ্গে কান লাগিয়ে শুনছে রবিঠাকুরের গলায় গাওয়া গানের রেকর্ড—'অন্ধজনে দেহো আলো, মৃতজনে দেহে প্রাণ...'

সোমেন আস্তে করে ডাকল—দাদা!

রণেন মুখটা ঘুরিয়ে তাকে দেখল, তর্জনী ঠোঁটের কাছে তুলে বলল—চুপ।

আবার গান শুনতে লাগল। রেকর্ড ফুরিয়ে গেলে আবার ফিরে চালিয়ে দিল। সোমেনের দিকে ফিরেও তাকাল না। বোধ হয় ভুলে গেল যে কেউ তাকে দেখছে। দীর্ঘকাল সে যেন গান শোনেনি। আকণ্ঠ পান করে নিচ্ছে। যেন চৈত্রের মাঠ শুষে নেয় বৈশাখের বৃষ্টি। এখন ওর আর কেউ নেই, ওই গানটুকু, ওই কাঁপা কাঁপা রিক্ত কণ্ঠস্বর ছাড়া।

বহুকাল কাঁদে না সোমেন। কোনওকালে তার চোখে জল আসে না সহজে। এখন হঠাৎ হাতের পিঠে চোখ মুছল। গলা, কণ্ঠা অবরোধ করে কান্না উঠে আসে। সোমেন ঘরে এসে অন্ধকার হাতড়ে সিগারেট ধরায়। বসে থাকে। ঘুম হয় না।

দুদিন বৃষ্টির পর রোদ উঠতেই সে বেরিয়ে পড়ল সকালে। খাওয়ার জায়গা অনেক আছে। কিন্তু ঠিক কোথায় যে যেতে ইচ্ছে করছে তা বুঝতে পারছিল না। বুকের মধ্যে টনটন করে গুপ্ত ব্যথা। একা থাকতে ইচ্ছে করে। মেঘভাঙা রোদে ভ্যাপসা গরম। বাতাস নেই। এদিক-ওদিক কিছুক্ষণ হেঁটে সোমেন যখন আবার বাড়ির রাস্তায় ঢুকতে যাচ্ছিল তখনই দেখে পূর্বা আগে আগে যাচ্ছে।

সোমেন ডাকল—এই।

পূর্বা চমকে ফিরে তাকিয়েই হেসে ফেলল—ইস, এমন ভয় পাইয়ে দিস না!

—ভয়ের কী?

—রাস্তায় কেউ আচমকা ডাকলে ভয় করে না? তোর কাছেই যাচ্ছিলাম।

—সে বুঝেছি, নইলে এ পাড়ায় তোর আর কে লাভার আছে!

—গাঁট্টা খাবি। ছ্যাবলা কোথাকার!

—সংবাদ কী শুনি বৃন্দেদূতী।

পূর্বা মুখ ভ্যাঙাল। বলল—জানি না। অনিল রায় তোকে ডেকেছেন।

—কেন?

—বললেন, সোমেনের নাকি চাকরি দরকার! আমার ডিপার্টমেন্টে একটা পোস্ট খালি আছে, ওকে দেখা করতে বলো।

সোমেন ভ্রূ কুঁচকে বলে—আমার চাকরি দরকার সে কথা ওকে বলল কে?

পূর্বা উদাস গলায় বলে—কে জানে! তোমার তো হিতৈষী আর হিতৈষিণীর অভাব নেই। আমাদের জন্যই কেউ ভাবে না।

সোমেন খুব নাক উঁচু গলায় বলে—কি চাকরি জানিস?

—না। তবে প্রফেসারি নয় এটুকু বলতে পারি।

—এম এ পরীক্ষা দিইনি বলে ঠেস দেওয়া হচ্ছে?

—আহা, কী এমন বালিশটা যে ঠেস দেবো?

সোমেন হাসল। বলল—চা খাবি?

—তোর বাসায়? না বাবা, রাস্তায় দেখা হয়ে গিয়ে ভাল হল। একদিন তোর বাড়ি গিয়েছিলাম, অনেক দিন আগে, তুই ছিলি না। তোর মা সেদিন আমার জাত গোত্র জিজ্ঞেস করে অস্থির করে তুলেছিল। পালিয়ে বাঁচি। আজও ভয়ে ভয়ে যাচ্ছিলাম, নেহাত চাকরির খবর না দিলে নয়।

—আমার চাকরির খবরে তোর অত ইন্টারেস্ট কেন? সোমেন মিচকে হেসে বলে।

—আহা! বেকার বসে আছিস না!

—থাকলেই কী?

হাঁটতে হাঁটতে দুজনে বাসস্টপে চলে এল। রবিবার। বাস ফাঁকা যাচ্ছে। সোমেন একটা আটের বি থামতে দেখে বলল—ওঠ!

অবাক হয়ে পূর্বা বলে—কোথায় যাবি?

—হাওড়া। তারপর ট্রেন ধরব।

—ওমা। কেন?

—তোকে নিয়ে আজ পালিয়ে যাচ্ছি।

॥ তেতাল্লিশ ॥

আটের বি বাসটা ছেড়ে গেল। পূর্বা উঠল না। একটু পিছিয়ে দাঁড়িয়ে হেসে বলল— পালাব কেন? বাড়িতে বলেকয়ে এলেই তো হয়। কেউ আটকাবে না।

সোমেন ভ্রূ কুঁচকে একটু তাকায় পূর্বার দিকে। গম্ভীর হয়ে বলে—চান্সটা মিস করলি।

—বয়ে গেল।

দুজনে আস্তে আস্তে হেঁটে ব্রিজের ওপর উঠতে থাকে। কোথায় যাওয়া নয়, কেবলমাত্র হাঁটা। বৃষ্টির পর রোদ বড় তেজি। ভ্যাপসা গরম। ব্রিজের ঢালু বেয়ে ওপরে উঠতে একটু হাওয়া লাগল। রেলিঙের ধার ঘেঁষে দুজনে দাঁড়ায়। সোমেন বলে—লোকে আমাদের কী ভাবছে বলতো!

—যা খুশি ভাবুক গে। কত হাজার হাজার জোড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে কলকাতায়, লোকের ভাবতে বয়ে গেছে।

—তোর বাবা যদি এখন বাসে যেতে যেতে আমাদের দেখে ফেলে? সোমেন একটু কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলে।

পূর্বা চোখ বড় বড় করে বলে—দেখেনি নাকি? কতবার কত ছেলের সঙ্গে দেখেছে। প্রথম প্রথম মার ওপর রাগারাগি করত। এখন ভাবেই না।

একটা ইলেকট্রিক ট্রেন তলা দিয়ে চলে গেল শিস টেনে। রেললাইনের ধারে বস্তি। আপ-লাইনের ওপর কাঁথা কাপড় শুকোচ্ছে রোদে, বাচ্চা-কাচ্চারা খেলছে, রোগা রোগা কালো চেহারর কজন মেয়েছেলে বসে আছে লাইনের ওপর, খুব নিশ্চিন্ত। ট্রেন এলে একটু সরে বসবে, ট্রেন চলে গেলে আবার লাইনের ওপর হামা টানবে দুধের শিশু, কাঁথা কাপড় শুকোবে।

দৃশ্যটা দেখিয়ে পূর্বা বলে—ভেবেছিস, কী সাহস! আমার হাত-পা শিরশির করছে।

—ওদের কিছু হয় না। রেললাইন ওদের উঠোন।

পূর্বা চুপ করে দৃশ্যটা দেখে একটু। ঠিক মুখের ওপর রোদ পড়ছে। হাতের মুঠোয় এক কণা রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে বলল—অণিমার বিয়েতে কি দেওয়া যায় বলত। আমরা সবাই একসঙ্গে দেবো, শ্যামল বলেছে পারহেড কুড়ি টাকা। বড্ড বেশি না?

সোমেনের বুকের মধ্যে সেই কাঁপুনিটা ওঠে। একটা ব্যথা, একটা আনন্দ। মুখটা পূর্বার চোখের আড়াল করার জন্যই ঘুরিয়ে নিয়ে বলল—বেশি আর কী?

পূর্বা রাগের গলায় বলে—বেশ বেশি।

কথাটা কাউকে বলার নয়। চিরকাল এক বুক অন্ধকারে চাপা থাকবে অনিমার ভালবাসার কথা। সোমেন আর অণিমা ছাড়া আর কেউ জানবে না। কিন্তু সেটা সহ্য করা যায় কি? অণিমা যে তাকে ভালবাসত এর

মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে তার নিজের জয়। কাউকে না বলে থাকে কী করে সোমেন? বুকের ভার একা বওয়া যায় না। বলবে না বলে বার বার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল সোমেন। তবু মনটা তরল হয়ে যাচ্ছিল।

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে বলল—অণিমাটা না একটা পাগল? জানিস?

পূর্বা মুখ তুলে বলল---কেন?

'বোলো না, বোলো না পূর্বা সবাইকে বলে দেবে।' এই বলে নিজেকে মনে মনে ধমকাল সোমেন। কিন্তু সামলাতে পারল না। ভাবল, অণিমা তো বলতে বারণ করেনি!

মুখে সে পূর্বাকে বলল—কাউকে বলবি না? গা ছুঁয়ে বল।

পূর্বা তার হাত ছুঁয়ে বলল—প্রমিস।

—একদিন না...

বলে ফেলল সোমেন। অনর্গল বুক থেকে কথা বেরিয়ে গেল। আটকানো গেল না। পূর্বা অবাক হয়ে চেয়েছিল। কিন্তু পূর্বাকে নয়, গোটা পৃথিবীকেই যেন জানানোর দরকার ছিল।

বলে ফেলেই হঠাৎ যেন নিবে গেল সোমেন। গভীর এক ক্লান্তি মনের ভিতরে। বলা উচিত হল না, বলা উচিত হল না। সবাই জেনে যাবে। অণিমার কানেও উঠবে কোনওদিন। ভাববে, সোমেন কেমন পুরুষ? হায় ঈশ্বর, ওকে আমি কেন ভালবেসে ছিলাম!

সোমেনের বড় ভয় করল! অণিমার বিয়ে হয়ে যাক, ভিন্ন পুরুষের ঘর করুক, তবু চিরকাল মনে মনে সোমেনকে ভালবাসুক—এই কি চায় না সোমেন? যদি সে কোনওদিন জানতে পারে যে অনিমার সেই গোপন ভালবাসা ফুরিয়েছে, তা হলে কি গভীরভাবে হতাশ হবে সোমেন?

পূর্বাকে বাসে তুলে দিয়ে ফিরে এল সোমেন। সারাটা দুপুর কেবল ভাবল। সে এত দুর্বল কেন? কেন বলে দিল পূর্বাকে। নিজেকে বড় ছোট মানুষ বলে মনে হয়।

নিজের ওপর বিরক্তিটাই ইদানীং বড় প্রবল। বড় রেগে থাকে সোমেন। বাড়ির লোকেরা কথা বলতে সাহসই পায় না। বউদি এসে একদিন বলল—টুবাইটার ট্রিপল অ্যান্ডজেন-এর শেষ ডোজটা বাকি আছে, চারু ডাক্তারের দোকান থেকে দিইয়ে আনবে সোমেন?

—পারব না। বলে রেগে উঠে গেল সোমেন। একটু বাদে ফিরে এসে দেখল বউদি রান্নাঘরে উবু বয়ে বসে আছে, দু-হাঁটুর ভিতরে গোঁজা মাথা, চোখের জল মুছছে। বড় মায়া হল। নিঃশব্দে টুবাইকে কোলে নিয়ে চারু ডাক্তারের ডিসপেন্সারিতে গেল সোমেন।।

এই রকম হয়েছে তার আজকাল। হঠাৎ রাগ উঠে পড়ে, হঠাৎ বড় মায়া হয়। বাসায় সবসময়ে এক শোকের মতো স্তব্ধতা। দাদা অফিসে যায় না। বড় একজন সাইকিয়াট্রিস্ট দেখে ওষুধ দিয়েছে। চেঁচামেচিটা একটু কম করে। কিন্তু ভ্যাবলা ভাবটা যায়নি এখনও। তেমন গুরুতর কিছু নয় বোধ হয়। কিন্তু মা আর বউদি অনেকটা রোগা হয়ে গেছে। সারাদিন তাদের মুখ শুকনো। এই গুমোট, কথাশূন্য, মন-খারাপ বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকা যায় না। এখনও রোগ, শোক, দুঃখ-টুঃখ ঠিক নিতে পারে না সোমেন। পালিয়ে বেড়ায়। কিন্তু যাওয়ার তেমন কোনও জায়গা নেই। বন্ধুরা অধিকাংশই চাকরি করে। আড্ডা দেয় সন্ধের পর। কিন্তু সারাদিনটা সোমেন করে কী! এক-আধদিন বন্ধুদের অফিসে গিয়ে হানা দেয়। বেশি যেতে লজ্জা করে। অহংকারে লাগে।

ম্যাক্স এখনও কলকাতায় আছে। মাসখানেকের মধ্যে দেশে ফিরে যাবে। কয়েকদিন বেনারসে কাটিয়ে এল। মুখচোখ খুব উদাস। আরও একটু রোগা হয়ে গেছে। পেটে ফাংগাস হয়েছে। সোমেনকে একদিন বুঝিয়ে বলল—আই হ্যাভ এ গার্ডেন ইন মাই স্টমাক। পেটের মধ্যে শ্যাওলা পড়েছে। লাল রিংঅলা দুটো সিগারেট দিল একদিন, বলল—পিওর টোবাকো নয়। একটু গাঁজা আছে কিন্তু।

সোমেনের তাতে কিছু যায় আসে না। গাঁজা খেলেই কী! দুটো সিগারেট একঘণ্টায় শেষ করে দিল সোমেন। দেখে একটু হাসল ম্যাক্স। কিছু বলল না। অনেকক্ষণ হালকা ওজনশূন্য শরীর আর ভাসন্ত মাথার এক অদ্ভুত নেশা রইল সোমেনের। মনটা টল টল করে। আরও দুটো সিগারেট চেয়ে রেখে দিল সোমেন, বদলে পাঁচ প্যাকেট দিশি সিগারেট কিনে দিল ম্যাক্সকে। গঙ্গার ধার ধরে দুজনে বিস্তর হাঁটল।

—ম্যাক্স।

—উঁ।

—তুমি অণিমাকে ভালবাসো?

ম্যাক্সের মাথায় পাখির বাসার মতো চুলের ঝোপড়া। গঙ্গার দিক থেকে মুখ ফেরাল ম্যাক্স। অমনি দুরন্ত বাতাসের ঝাপটায় চুলের রাশি এসে পড়ল গালে। কপালে। একটু পিঙ্গল দাড়ি গোঁফের ভিতরে আচ্ছন্ন মুখ। চোখের ফসফরাস আজও জ্বলে ওঠে। কিন্তু ওকে বিপজ্জনক মানুষ বলে মনে হয় না।

ম্যাক্স একটু হাসল, বলল —বাঙালি মেয়েরা বিদেশিকে ভয় পায়।

—তুমি প্রোপোজ করেছিলে?

ম্যাক্স মাথা নাড়ল। বলল—হুঁ—হুঁ। কিন্তু ও রাজি হয়নি, আমিও সেজন্য দুঃখিত নই। অণিমা ভাল মেয়ে, কিন্তু বড় মর্যালিস্ট।

—তোমার ওকে ভাল লাগে না?

—লাগে। সো হোআট? বলে আবার একটু হাসে ম্যাক্স, বলে—আই হ্যাভ স্লেপট উইথ ওভার টু হ্যান্ড্রেড গার্লস। নো অ্যাটাচমেন্ট। আই অ্যাম অলমোস্ট এ সেইন্ট।

এই রোগা সাহেবটা দুশো মেয়ের সঙ্গে শুয়েছে? ভারী অবাক হয়ে তাকায় সোমেন, বলে—লায়ার!

—ওঃ নো। বলে ম্যাক্স হাসে, বলে—আমার একটা নোটবই আছে। প্রত্যেকটা মেয়ের নাম আর ডেট তাতে লিখে রেখেছি। ইট ওয়াজ এ হবি। অবশ্য এসব বেশিরভাগই ঘটেছিল অস্ট্রেলিয়ায়।

ফুচকাওলার সামনে দাঁড়িয়ে গেল তারা। গঙ্গার বাতাসে জলের ছলাৎছল ভেজা শব্দ আসে। বাজে জাহাজের ভোঁ, ডাক দিয়ে যায় দশদিকে ছড়ানো মহাবিশ্বের অপার বিস্তারে। গাঁজার নেশা আর ফুচকার ঝাল-টক স্বাদ ভেদ করে মর্মমূলে একটা গুপ্ত পেরেকের যন্ত্রণা নড়েচড়ে ওঠে।

—আর, ইন্ডিয়ায়? সোমেন প্রশ্ন করে।

—এ ফিউ। বেশির ভাগই প্রস্টিটিউটস। মেয়ে মাত্র কয়েকজন।

হঠাৎ বিষম খায় সোমেন। কয়েকজন! কে সেই কয়েকজন? বুকটা হঠাৎ কেঁপে ওঠে। ম্যাক্সের একটা হাত ধরে বলে—কারা? আমাদের চেনা মেয়ে?

ম্যাক্স শালপাতার ঠোঙা উলটে ফুচকার জল খাচ্ছিল। প্রচণ্ড ঝাল। নীলচে চোখ ভরে জল এসেছে, ঝালের চোটে কাশল খানিক। মুখ ছুঁচলো করে শিসাতে শিসাতে বলে-ওঃ লিভ দ্যাট। মেয়েছেলের ব্যাপারে আমি খুব

ক্লান্ত। এখন একটু মজা পাই নেশায়, অন্য কিছুতে নয়। গার্লস উইল বি, গার্লস। দে অলওয়েজ টিজ ইউ।।

ম্যাক্সের হাতটা আরও শক্ত করে ধরল সোমেন। বলল—বলো ম্যাক্স। আমি জানতে চাই।

—কেন?

—সোমেন হাসল, বলল-মেয়েগুলোকে চিনে রাখব?

—কেন?

—চিনে রাখা ভাল, যদি ওদের কারও সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে যায়।

ম্যাক্স সোমেনের হাতটা ছাড়িয়ে দিল। মুখটা কিছু গম্ভীর, বিষন্ন। বলল—তুমি বড় অর্থডক্স সোমেন।

এই বলে ম্যাক্স আবার ফুচকা নেয়। দ্রুত খেতে থাকে। ঝালের জন্য জিভে রাখতে পারে না, গিলে ফেলে কোঁত করে। বলে—তোমাকে বলি, আমি এখন রক্ষণশীল মানুষদেরই বেশি পছন্দ করি।

সোমেন হাতের শালপাতা ফেলে দিয়ে রুমালে হাত মুছতে মুছতে বলে—পূর্বা নয়তো!

—ওঃ নো।

—অপালা?

—গুডনেস, নো।

একটু ইতস্তত করে সোমেন। বড় ভয় করে। বুক কাঁপে। অবশেষে দাঁতে দাঁত চেপে বলে—অণিমা?

আকাশের দিকে মুখ তুলে ম্যাক্স ফুচকাটা মুখের মধ্যে ফেলে দেয়। গলা ঝাড়ে। উত্তর দেয় না। সোমেন চেয়ে থাকে। নেশাটা কেটে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। হাতে পায়ে ঝিমঝিমিনি ভাব। একটু দুর্বল লাগে।।

ম্যাক্স তারদিকে তাকায়। গম্ভীর চোখে। সোমেন সেই চোখ দুটোর দিকে চেয়ে থাকে।

তারপর আস্তে আস্তে, দুর্বলভাবে ঘাসের ওপর বসে পড়ে সোমেন, ফুচকাঅলার পায়ের কাছে। এবং বসে বসে যেন রসাতলে নেমে যাচ্ছিল সে।

গঙ্গার ধার ঘেঁষে ঘাসজমির ওপর চুপচাপ কিছুক্ষণ পড়ে রইল দুজন। নেশা কাটছে।

অনেকক্ষণ বাদে সোমেন মাথা তুলে বলে-ও আমাকে ভালবাসত।

ম্যাক্স পাশ ফিরে একটু দেখল সোমেনকে। চোখে কৌতুক ঝিলিক দেয় বলল—তাই নাকি? তারপর আবার উদাসী চোখ সরিয়ে নিয়ে বলে—তুমি ভাগ্যবান।।

—তুমি ওকে কী করছ সাহেব?

ম্যাক্স চিত হয়ে শুয়ে আছে, মাথার নীচে দুই হাতের তেলো, আকাশে চোখ। উদাস গলায় বলে—নাথিং।

—লায়ার।

ম্যাক্স হাসল। মিষ্টি, বিষন্ন হাসি। বলল—তোমার খুব নেশা হয়েছে।

—আলবত হবে! বলে উঠে বসে সোমেন। আর একটা লাফ রিংঅলা সিগারেট বের করে ধরাতে যাচ্ছিল, ম্যাক্স হাত বাড়িয়ে ঠোঁট থেকে কেড়ে নিল, বলল—আর নয়। তা হলে মুশকিলে পড়বে।

সোমেন হামাগুড়ি দিয়ে সাহেবের কাছে আসে। বলে—সত্যি কথা বলে।

ম্যাক্স একটু অবাক হয়ে চেয়ে রইল। বলল—আমার লুকনোর কিছু নেই সোমেন। আমি নক্সালাইটদের সঙ্গে দু-তিনমাস আন্ডারগ্রাউন্ডে ছিলাম অ্যান্ড আই হ্যাড ট্রাবল উইথ দি পলিস। কিছুদিন আমাকে জেলেও রাখা হয়েছিল। আমার সময় ছিল না যে কিছু করি।।

তবু সোমেনের মনে হচ্ছিল, ম্যাক্স মিথ্যে কথা বলছে। বললেই বা কী! অণিমার জন্য সোমেনের আর কী আসে যায়! সে তো ভালবাসত না অণিমাকে? এই তো কদিন পরে অণিমা এক সম্পূর্ণ অচেনা মানুষের সঙ্গে বাস করবে, তখনই বা কী করার থাকবে সোমেনের?

তবু সোমেন ম্যাক্সের গলার কাছে জামাটা আলগা হাতে মুঠো করে ধরে বলে—সত্যি কথা বলো ম্যাক্স। আমি জানতে চাই।

ম্যাক্স জিভ দিয়ে চুক চুক একটা শব্দ করল। মাথা নেড়ে বলল—ইউ আর এ চাইল্ড। আমি বিদেশি বলেই তুমি আমাকে সন্দেহ করো সোমেন। তুমি ভাবো, যৌনতার ব্যাপারে আমাদের কোনও বাছবিচার নেই। সেটা সত্যিও বটে।

বলতে বলতে উঠে কনুইয়ের ওপর ভর রেখে একটু কাত হয়ে সোমেনের মুখের দিকে তাকায় ম্যাক্স। বলে—এর আগের বার বেনারসে স্যানক্রিট শেখার জন্য আমি এক পণ্ডিতের কাছে যেতাম। সে লোকটা বুড়ো, কিন্তু খুব স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ। সে লোকটা আমাকে একটা শ্লোক শিখিয়েছিল। তোমাদের যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে আছে, স্বামী-স্ত্রীর যৌন মিলনের আগে স্বামী-স্ত্রীর নাভিতে হাত রেখে বলবে প্রসীদ জগজ্জননী। হে জগতের মা, তুমি প্রসন্ন হও। আমাকে তোমার ভিতরে গ্রহণ করো। আমি যেন তোমার ভিতর দিয়ে পুত্ররূপে আবার জীবন লাভ করি। ওইভাবে আমার সত্তা অনন্ত ও অখণ্ড হোক। ওই হচ্ছে গর্ভধারণের মন্ত্র, প্রসীদ জগজ্জননী। তুমি জানো?

সোমেন মাথা নাড়ল। জানে না।

ম্যাক্স আবার তেমনি চিত হয়ে শোয়। উদায় হয়ে যায় বুঝিবা। গঙ্গার বানডাকা বাতাস বয়ে যায় বুকের ওপর দিয়ে। অনন্ত আকাশ ঝুঁকে আছে মুখের ওপরে উদাসীন ভাবে। সেখানে ফিরোজা রং ধীরে মুছে দিচ্ছে গোধূলির বেলা। নক্ষত্রের জগৎ ভেসে উঠতে থাকে। ম্যাক্স বলে—আমরা সৃষ্টিকর্তা নই সোমেন। আমাদের ভিতর দিয়ে যে পুত্র কন্যারা আসে আমরা তাদের সৃষ্টি করি না। আমরা কেবল প্রজননের উপলক্ষ। যৌনতা আমাদের যে আনন্দ দেয় তা একটা প্রলোভন মাত্র, ওই প্রলোভনে আমরা নারীর সঙ্গে মিলিত হই, কিন্তু আসলে ওই ভাবে প্রলুব্ধ করে প্রকৃতি আমাদের দিয়ে তার কাজ করিয়ে নেয়। উই রিপ্রোডিউস। এ হচ্ছে বায়োলজি। আমি বায়োলজি জানি। কিন্তু যৌনতার কোনও দর্শন আমার ছিল না। দুশো মেয়ের সঙ্গে শুয়েছি, কিন্তু তারা আমাকে শেখায়নি। একটা ছোট্ট শ্লোকে আমি তা শিখে গেছি।

সোমেন অধৈর্যের সঙ্গে বলে—তুমি এত জানো কেন ম্যাক্স?

ম্যাক্স তেমনি উদাসীনভাবে শুয়ে রইল। চোখ বোজা। বলল—তোমাদের জানবার জন্য আমি মাইলের পর মাইল ঘুরে বেড়িয়েছি, গ্রামে-গঞ্জে হাটে-বাজারে পড়ে থেকেছি, ভিখিরিদের সঙ্গে থেকেছি। খুঁজেছি, যতভাবে খোঁজা যায়। বেনারসে একবার একটা রেস্টুরেন্টে বসে খাচ্ছি। দুপুরবেলা। আমার টেবিলে একটা ছেলে আর মেয়ে এসে বসল। হিপি টাইপ। ছেলেটির চুল দাড়ি আছে, বিশাল চেহারা। মেয়েটার ভারী কম বয়স। একটু রোগা, সারা গায়ে ময়লা। সে একটা লম্বা ঝুলের ফ্রক পরেছিল। তার ফ্রকের নীচে কাঁচুলি ছিল না, স্তনের বোঁটা ফুটে আছে জামার ওপর। আমেরিকান। তারা ব্যাগ থেকে জ্যাম-এর কৌটো বের করে রুটিতে মাখিয়ে খাচ্ছিল। আমার সঙ্গে কয়েকটা কলা ছিল, আমি তাদের দিলাম। তারা আমার রুটিতে তাদের জ্যাম মাখিয়ে দিল। ওইভাবে পরিচয়। আমাদের কোনও পিছুটান নেই, তাই তক্ষুনি দল বেঁধে ফেললাম। সেই

রাতে আমি আমার ধর্মশালা ছেড়ে ওদের ধর্মশালায় গিয়ে উঠলাম। একটু বেশি রাতে মেয়েটা আমার বিছানায় চলে এল। আমি তখন খুব উত্তেজিত ছিলাম, কারণ ওই মন্ত্র তখন আমার ভিতরে ঘুরছে। একটি মেয়ের ওপর ওই মন্ত্রটার প্রভাব লক্ষ করা আমার দরকার ছিল। তখন নিশুতিরাত। মেয়েটি নগ্ন হয়ে শুয়ে আছে, আমি বসে তার নাভিতে হাত রেখে বললাম—প্রসীদ জগজ্জননী। সে জিজ্ঞেস করল এর অর্থ কী! বুঝিয়ে বললাম। মেয়েটা অনেকক্ষণ কথা বলতে পারেনি। যৌন মিলনের আগে এ রকম ভারী কথা শুনে সে কেমন হয়ে গেল। নিশুত রাত, এক বিছানায় আমরা দুটি নরনারী, ন্যাংটো। তবু আমরা মিলিত হতে পারছিলাম না। আমি বার বার জিজ্ঞেস করছিলাম—ডু ইউ ফিল লাইক জগজ্জননী? তুমি কি প্রসন্ন হয়েছ? সে বার বার মাথা নেড়ে বলে—ওঃ নো। আই ফিল রেস্টলেস। অবশেষে আমি তাকে বললাম- তা হলে তোমার সঙ্গীর কাছে যাও। ও তোমাকে তৃপ্ত করুক। মেয়েটা আমাকে আঁকড়ে ধরে বলল—ও লোকটা ইম্পোটেন্ট। আমি ওর কাছে যাব না। অবাক হয়ে বলি—ইম্পোটেন্ট হয়ে থাকলে ওর কাছে আছ কেন? আমেরিকানরা সহজে কাঁদে না। মেয়েটাও কাঁদল না, কিন্তু ওর গলার স্বরে শুকনো কান্না ছিল। বলল—হোয়েন আই ফিল লো অ্যান্ড ডাউন, যখন আমি ভয়ংকর ভাবে ভেঙে পড়ি, তখন ও আমাকে একটা ট্যাবলেট দিয়ে বলে—সোয়ালো ওয়ান, অ্যান্ড ইউ ফিল ডিভাইন। সেই ট্যাবলেট খেলে আমি সত্যিই স্বর্গে পৌঁছে যাই। বুঝলাম, ও ড্রাগ খায়। এল-এস-ডি, ককেইন বা ওইরকম কিছু। আইওয়া ইউনিভার্সিটির ছাত্রী ছিল, একদিন হঠাৎ ওর মনে হয়েছিল, বেঁচে থাকাটা বড় একঘেয়ে। মাত্র আঠারো কি উনিশ বছর বয়সে সব রকম যৌন মিলনের আনন্দ সে পেয়েছে, ভাল পোশাক, ভাল গাড়ি, গান, শিল্প, সাহিত্য-সবরকমের আনন্দ উপভোগ করেছে। নেচেছে, সাঁতার কেটেছে, প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখেছে, দেশ ভ্রমণ করেছে। মৃত্যুশোক পায়নি, প্রেমে ব্যর্থ হয়নি, তবু জীবনটা বড় একঘেয়ে। একদিন মনে হল, জীবনে কিছু নেই। মাথার ওপর পুরনো আকাশ, নদীর ওপর শীতের একঘেয়ে কুয়াশা জমে থাকে, তুষারপাতে ঢেকে যায় সবকিছু, আবার বসন্ত আসে, আসে গ্রীষ্মকাল। একই রকম ভাবে। হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি চলে অবিরল, স্থির হয়ে থাকে মাথা উঁচু বাড়িঘর। নিত্য নতুন সঙ্গী জোটে, কিন্তু সেই একই রকম লাগে। কিছুতেই বুঝতে পারে না পৃথিবীতে সে জন্মগ্রহণ করেছে কেন! রাত জেগে কখনও-সখনও পুঁথির পাতায় খুঁজে হাজারো জবাব পেয়েছে, গেছে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে। অবশেষে একদিন এই ছেলেটির কাছ থেকে পেয়ে গেল জবাব। একটা সাদা ইনোসেন্ট ট্যাবলেট। খাও, স্বর্গে পৌঁছে যাবে। কিন্তু মুশকিল এই যে, একবার ট্যাবলেটের স্বর্গে পৌঁছলে আর পৃথিবীকে কিছুতেই অন্য অবস্থায় সহ্য করা যায় না। সেই নেশা কেটে যায় তখনই মনে হয়, পৃথিবীতে বেঁচে থাকার মধ্যে কোনও সুখ নেই; সে বড় দুঃখী। ফালতু মানুষ। নানা দুঃখের হাওয়া এসে বুকে ধাক্কা দেয়। মনে হয় জীবন এক এমন নৌকো যা মৃত্যুনদী ভেদ করে চলেছে। চারদিকে মৃত্যুর বাতাস, মৃত্যুর গন্ধ। বেঁচে থাকা এক প্রগল্ভতা মাত্র। তাই আবার ট্যাবলেট খাও, পৌছে যাও তুরীয় আনন্দে, কুঁদ হয়ে থাকো। সিগারেট, কফি বা মদ কোনও নেশাই এর ধারেকাছে আসতে পারে না। এ নেশা যেন ঈশ্বরের আশীর্বাদ। নেশা কেটে গেলেই দিন দিন পৃথিবী আরও বীভৎস হতে থাকে। মেয়েটা তাই ওর সঙ্গীকে ছাড়তে পারে না। তারা মৃত্যুর চুক্তিতে আবদ্ধ। পৃথিবী জুড়ে মানুষ নানাভাবে খুঁজে বেড়াচ্ছে তার অস্তিত্ব, তার প্রয়োজনীয়তা, তার জন্মের কারণ। সে চার্চে যায়, শুঁড়িখানায় যায়, মেয়েমানুষের কাছে যায়, সে পৃথিবী লোপাট করে টাকা কুড়িয়ে আনে। সে অসুরের মতো খাটে, নাচে, সাঁতার কাটে। বিপ্লব করে, যুদ্ধে যায়, চাঁদের মাটি কুড়িয়ে আনে। তবু তার নিজের ভিতরে অনড় হয়ে থাকে কুয়াশায় ঢাকা একটু

রহস্য—সে কে? সে কেন? এই রাতে ছোট্ট কম্বলের বিছানায় আমরা দুই অনাবৃত নারী-পুরুষ বসে রইলাম। আমাদের মাঝখানে ওই কুয়াশা, ওই রহস্য। আমি তাকে বার বার জিজ্ঞেস করলাম—তুমি কি বুঝতে পারছ তোমার মধ্যেই সৃষ্টির নিহিত রহস্য? তোমার ভিতর দিয়েই আসে প্রাণ? তুমি জগতের জননী? সে মাথা নেড়ে ততবার বলে—না, আই ডোন্ট ফিল লাইক মাদার মেরি। আই ফিল রেস্টলেস। আমি হতাশ হয়ে অবশেষে তাকে জিজ্ঞেস করলাম—তুমি মেয়েমানুষ, এটা অনুভব করো কি? ওইভাবেই রাত কেটে গেল। একটা রাত, হয়তো বা একটা যৌন ব্যর্থতার রাত। পরদিন আমি মেয়েটাকে নিয়ে ধর্মশালা থেকে চলে এলাম, ওর সঙ্গী বাধা দিল না। তাকিয়ে একটু দেখল কেবল। আর একটা বিশ্রি গালাগাল দিল। মেয়েটাকে নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। ধর্মশালায়, হোটেলে, রাস্তায়। আমাদের যৌন মিলন হয়নি যে তা নয়। না হলে মেয়েটাকে নিয়ে আমার এক্সপেরিমেন্ট সম্ভব হত না। বড় রেস্টলেস ছিল মেয়েটি। বেনারসে থাকবার সময়ে সে প্রায়ই আমাকে ফাঁকি দিয়ে তার পুরুষ সঙ্গীর কাছে চলে যেত, ট্যাবলেট খেয়ে আসত। কিন্তু থাকত আমার সঙ্গেই। প্রতি রাতেই আমি তার নাভিতে হাত রেখে বলতাম—প্রসীদ জগজ্জননী। সে মাথা নাড়ত। না। সে কিছু অনুভব করছে না। ড্রাগের নেশাড়ুদের যে সব দোষ থাকে সবই তার ছিল। মাঝে মাঝে সে আমাকে প্রচণ্ড গালাগাল করত, চিৎকার করত। আবার ট্যাবলেট খেলে তার মুখে চোখে অদ্ভুত তৃপ্তি আর আনন্দ ফুটে উঠত। সে আমাকে প্রায়ই বলত—ম্যাক্স, তুমিও খাবে ট্যাবলেট? খাও, ইউ ফিল ডিভাইন। সে আমাকে ট্যাবলেট দিত।

ম্যাক্স উঠে বসে কেতরে প্যান্টের পকেট থেকে একটা নাইনলের ফোল্ডার বের করে আনে। হাতের তেলায় ঢালে কয়েকটা ট্যাবলেট। আতঙ্কিত সোমেন চেয়ে থাকে।

ম্যাক্স আবার ফোল্ডার রেখে দিয়ে বলে—বয়ে বেড়াচ্ছি। স্মৃতিচিহ্ন। মেয়েটাকে শেষবার দিল্লির হাউজ খাস-এ একটা বাড়িতে গাড়িবারান্দার তলায় ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে চলে আসছিলাম। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, ভোরের আবছা আলোয় কম্বল জড়িয়ে শুয়ে আছে। উওম্যান, মেয়েছেলে। সমস্ত অবয়বে কোনও ঘাটতি নেই। মেয়েমানুষের সব অঙ্গই অটুট। তবু ও ঠিক মেয়েমানুষ নয়। যুদ্ধের সময়ে সোলজারদের একরকম রবারের পুতুল দেওয়া হয়, উইথ ফেমিনিন অর্গানস। ও অনেকটা সে রকম। তবু ও পুতুলও নয়। ও চেঁচায়, গাল দেয়, ইচ্ছা অনিচ্ছা প্রকাশ করে। তাই পুরুষেরা ওকে ওই রকমভাবে ফেলে ফেলে যায়। অন্য কেউ এসে ফের তুলে নেয়। কেবল সেই পুরুষ সঙ্গীটি, যে ইম্পোটেন্ট তার সঙ্গেই ও বাঁধা আছে। মৃত্যুচুক্তি। সুইসাইডাল প্যাক্ট। যেখানেই থাকুক, ঠিক তার কাছে ছুটে যায়। কোথায় তার মধ্যে জগজ্জননী! কোথায় প্রসন্নতা! এরপরও অনেকবার অনেক বেশ্যাকে ওই মন্ত্র বলেছি, দু-একজন ভারতীয় মহিলাকেও। তারা হেসেছে। না, তারাও জানে না ওই মন্ত্র। কখনও শোনেনি। বরং আমি ভারতবর্ষে ঘুরে দেখেছি উইমেনস লিবারেশন আন্দোলন চলছে। ইয়োরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ায় মেয়েছেলে বলতে আর কেউই প্রায় নেই, যারা আছে অল আর মেন উইথ ফিমেল অর্গানস। মহিলার অঙ্গলক্ষ্মণযুক্ত পুরুষ, তাদের লিবারেশন ঘটে গেছে। তাই পুরুষেরা আর মেয়েছেলে খুঁজে পায় না। পায় যৌন অঙ্গ, আর পার্টনার। সেই হাওয়া আসছে এ দেশেও। পৃথিবী থেকে মেয়েমানুষ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে সোমেন। একদিন একটা বাঙালি মেয়েকে টেনিস খেলতে দেখে আমি সোজা গিয়ে তাকে বললাম—তুমি টেনিস খেল কেন? এ তো তোমাদের খেলা নয়। মেয়েটা

অবাক। বলে—কী করে বুঝলে যে এ আমাদের খেলা নয়! আমি তাকে বোঝাতে পারলাম না। কিন্তু আমার কেবলই মনে হয়, কোথায় যেন ভুল হচ্ছে। ভীষণ ভুল হচ্ছে। মেয়েরা দুনিয়া জুড়ে কী একটা ভুল করছে, তাই এই অবস্থা। একদিন অণিমা বলেছিল—ম্যাক্স, তুমি সমাজপতিদের মতো কথা বললো কেন? মেয়েদের লিবারেশন তোমার ভাল না লাগতে পারে, কিন্তু জেনো মেয়েরা যে বেহায়া হয়ে উঠছে তা পুরুষেরা তাদের ওইরকম চায় বলেই। এখনও মেয়েরা পুরুষদেরই ক্রীতদাসী। তারা যেমন চায় তেমনই হয়ে ওঠে মেয়েরা। তোমরা যদি জগজ্জননী চাও তো মেয়েরা একদিন তাই হবে। একথা শুনে আমি অণিমার প্রেমে পড়েছিলাম। ও যে আমাকে রিফিউজ করেছে তাতেও আমি খুশি। শি ওয়াজ অর্থডক্স। আর, রক্ষণশীল মানুষ আমি খুব পছন্দ করি সোমেন।

সোমেন তর্ক করল না। কেবল শুনল। মাথাটা টালমাটাল। হাওয়ায় শুয়ে থাকতে বড় ভাল লাগছিল। ঠান্ডা বাতাসে একটু জলীয় গন্ধ। বয়ার গায়ে জলের শব্দ। মাঝগাঙ থেকে মাল্লাদের সুর ভেসে আসে কখনও। দেয়ালের মতো উঁচু একটা জাহাজ দক্ষিণ থেকে উত্তরে চলে যায়।

॥ চুয়াল্লিশ ॥

কাল অণিমার বিয়ে। শাড়ির দামটা এখনও অণিমাকে দেওয়া হয়নি। ভাবলেই লজ্জা করে সোমেনের। পাগলামিটা না করলেও চলত। দেড়শোটা টাকা হুট করে খরচ করা কি তার উচিত? হাতে টাকা নেই বহুদিন। মাসের প্রথমে অণিমাদেরই বাসা থেকে খামে করা একশো টাকা পেয়ে যায় সে, তারপর সারা মাস অনাবৃষ্টি। কী ভীষণ খরচ করতে ইচ্ছে করে সোমেনের, হাত পা নিশপিশ করে খরচ করার জন্য। টাকা থাকলে কত কী করত সে। দাদা, বউদি, মা আর ভাইপো-ভাইঝিদের জন্য রাজ্যের জিনিস কিনত। দিত বাবাকেও, এক আধ প্যাকেট গোল্ডফ্লেক কিনতে ইচ্ছে করে, কিছু বই মাঝে মাঝে ট্রামবাসের ভিড় ছেড়ে ট্যাক্সি করতে। সামান্য ইচ্ছে। কত লোকের কত বেশি টাকা আছে। কিনে শেষ করতে পারে না। কালো টাকা। যাদের নেই তারা আক্রোশে আক্ষেপে গভর্নমেন্টকে গালাগাল দেয় ট্রামে বাসে আড্ডায়। প্রতি বছর বাজেটের খবর বেরোলে হতাশায় দেখে, আবার সিগারেটের দাম বাড়ল, জামাকাপড় মহার্ঘ হয়ে গেল, সিলিং ফ্যান আর কেনা যাবে না। পূর্ব এসপ্ল্যানেডে অবরোধ জোরদার হয়, মিছিল বাড়ে, ছায়াময়ী হতাশার মেঘ গুমোট করে রাখে সারা দেশকে। লাথি মারতে ইচ্ছে করে সোমেনের। লাথিতে লাথিতে ভেঙে ফ্যালে কলকাতা, বাংলাদেশ, ভারতবর্ষ।

বউদির খোঁজে একবার দাদার ঘরে উঁকি দিল সোমেন। বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে। খেয়াল ছিল না, এ সময়ে বউদি টুবাইকে ইস্কুল-বাস থেকে নামিয়ে আনবার জন্য রাস্তার মোড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বড় দুজন আরও পরে ফেরে। ফাঁকা ঘরে একা দাদা বসে আছে বিছানায়। উঁকি দিতেই চোখে চোখ পড়ে গেল। দাদার চোখ দুটো কিছু অস্বাভাবিক, ঘোলা এবং উজ্জ্বল লালচে আভাযুক্ত। তাকিয়ে বলল—কে রে? সোমেন?

—সোমেন পরদা সরিয়ে একটু হেসে বলে—কেমন আছো দাদা?

রণেন যেন অবাক হয় প্রশ্ন শুনে। বলে—কেমন থাকব! ভালই আছি। আমার হয়েছেটা কী যে, জিজ্ঞেস করছিস কেমন আছি?

ভুলটা বুঝতে পারে সোমেন। প্রশ্নটা করা উচিত হয়নি। বলল—শরীর খারাপ শুনেছিলাম।

রণেন মাথা নেড়ে বলে—না। বেশ আছি। এরা সব কোথায় গেল? আমাকে এখনও সকালের চা দেয়নি।

সোমেন অবাক হয়ে বলে—তুমি এই ঘুম থেকে উঠলে নাকি?

রণেন ভ্রূ কুঁচকে বলে হ্যাঁ। কেন, খুব বেলা হয়ে গেছে নাকি! বলে টেবিলের ওপর ঘড়িটা দেখে নিয়ে বলে —তাই তো! কেউ ডেকে দেয়নি, অনেক বেলা হয়ে গেছে। ওরা কোথায় গেল?

—বউদি বাচ্চাদের আনতে গেছে। মা পুজো করছে।

রণেন একটু বিরক্তির সঙ্গে চেয়ে থাকে সোমেনের দিকে। তারপর মুখটা বিকৃত করে বলে—বাচ্চাদের ইস্কুলে পাঠাতে বারণ করেছি, তবু পাঠিয়েছে?

সোমেন ঠিক বুঝতে না পেরে বলে—বারণ করেছিলে কেন?

রণেন একটু উত্তেজিতভাবে বলে—রাস্তাঘাটে আজকাল বাচ্চাদের বেরোতে আছে! কলকাতায় কীরকম অ্যাকসিডেন্ট দেখিস না। বলে রণেন পাশে পড়ে থাকা খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে বলে—দ্যাখ, সব দাগিয়ে রেখেছি। কাছে আয়।

সোমেন কাছে গিয়ে দেখে খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় দুর্ঘটনার খবরগুলিতে লাল পেন্সিলের দাগ।

রণেন মুখ তুলে বলে—দেখেছিস?

সোমেন মাথা নাড়ল।

রণেন উত্তেজিতভাবে বলে—কীরকম ভাবে মানুষ মরে যাচ্ছে! আর তোর বউদি কোন সাহসে বাচ্চাদের ঘরের বার করে? যদি কিছু হয়?

সোমেন মৃদু স্বরে বলে—কিছু হবে না। ওরা তো বাস-এ যায়।।

রণেন মাথা নেড়ে সেই ঈষৎ উঁচু গলায় বলে—বাস অ্যাকসিডেন্ট করে না? কে গ্যারান্টি দিয়েছে? বলতে বলতে উঠে ঘরময় পায়চারি করে রণেন। বিড়বিড় করে বলে—আমি ঘুমোচ্ছিলাম, সেই ফাঁকে বাচ্চাদের বের করেছে। কোনওদিন সর্বনাশ ঘটে যাবে। একটাও ফিরবে না।

বলতে বলতে যেন দৃশ্যটা চোখের সামনে দেখে একটা ঝাঁকি খায় রণেন। দাঁড়িয়ে পড়ে। আবার পায়চারি করে।

সোমেন বোকার মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর চা-এর কথা মনে পড়তেই বলে—দাঁড়াও, মাকে তোমার চা-এর কথা বলে আসি।

জপের সময় কথা বলেন না ননীবালা। সোমেন পিছনে থেকে বার দুই ডাকল, ননীবালা হাতের ইশারায় ডাকতে বারণ করলেন।

সোমেন একটু ইতস্তত করে। দাদার জন্য সে বহুকাল কিছু করেনি। দাদাকে সে লক্ষই করে না আজকাল। আজ তাই একটু কিছু করতে ইচ্ছে হল।

চা চিনি দুধের ঠিকানা জানে না সোমেন। কেটলিটা রান্নাঘরের ট্যাপ-এর কাছে খুঁজে পেল। গ্যাস উনুন কখনও জ্বালেনি। একটু ভয়-ভয় করছিল, তবু কল ঘুরিয়ে গ্যাস ছেড়ে দেশলাই জ্বেলে দিল।

কেটলি বসিয়ে অনেক কৌটোটৌটো নেড়ে চা-পাতা আর চিনি খুঁজে পেল, দুধের ডেকচিটা মিটসেফ থেকে বের করছিল, এ সময়ে রণেন এসে দাঁড়ায়, বলে—কী করছিস?

—একটু চমকে উঠেছিল সোমেন, হেসে বলল—তুমি ঘরে গিয়ে বসো, আমি চা করে আনছি।।

—তুই করবি! রণেন অবাক হয়ে বলে—গ্যাস ফেটে কত লোক মরে যায় জানিস? বলে মুখ ফিরিয়ে নিল। হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে আপনমনে বলল—সিকিউরিটি! সিকিউরিটি! মানুষ তার বেশি আর কিছু চায় না।

এই বলে ঘরে চলে গেল রণেন। ঘরে বসে ভাববে। একা একা কত কথা আর বলবে।

চা-পাতা বেশি পড়ে গেছে, লিকারটা হয়েছে ঘন কাথের মতো। ননীবালা উঠে এসে দেখে বললেন—এই কি পুরুষমানুষের কাজ! বউমা তো চৌপর দিন চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। ঘরসংসার ভেসে যায় তো যাক।

চা নিয়ে রণেনের ঘরে ঢুকে সোমেন দেখে দাদা ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে আছে। খুব সজাগ ভাব, যেন দূরের কোনও শব্দ শুনবার চেষ্টা করছে কিংবা অস্পষ্ট কোনও গন্ধ শুঁকছে বাতাসে।

চা দেখে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে—ইচ্ছে করছে না। নিয়ে যা।

সোমেন হেসে বলে—তোমার জন্য কত কষ্ট করে করে আনলাম, নাও।

ভ্রূ কুঁচকে আবার রণেন সোমেনের দিকে চায়, বলে—বাসায় কেউ নেই?

—কাকে চাইছ?

—মা।

এমনভাবে মা কথাটা উচ্চারণ করল যেমনভাবে টুবাই ঘুম থেকে উঠে করে। রান্নাঘর থেকে ননীবালার স্বর শোনা যাচ্ছিল, একা-একা বউমাকে বকছিল। সেই স্বরটাই বোধ হয় উৎকর্ণ হয়ে শুনল রণেন। প্রাণে জল এসেছে এমন হঠাৎ-পাওয়ার মতো বলল—ওই তো মা!

—মাকে পাঠিয়ে দেব? সোমেন জিজ্ঞেস করে।

রণেন চায়ের কাপ তুলে চুমুক দেয়। ভ্রূ কোঁচকানো। বলে—মার কত বয়স হয়ে গেল! আর কতদিন বাঁচবে? অ্যাঁ! যদি মরে যায় তা হলে থাকব কি করে মা ছাড়া!

সোমেন বিছানার ওপর বসে দাদার দিকে চেয়ে থাকে। দাদাকে এক প্রকাণ্ড শিশুর মতো লাগে। বলে—ওসব ভাববা কেন?

—ভাবব না? বলিস কী! চা খেয়ে কাপটা নামিয়ে রেখে বলে—সবাই থাকবে আমি চলে যাব, সেটাই ভাল। কারও মরা আমি সহ্য করতে পারব না সোমেন।।

—দাদা।

—যদি মার মরার সময় হয় তো তার আগে মরে যাব।

দাদা একটা সিগারেট ধরায়। নিজের হাতের তালুর দিকে নিবিষ্টভাবে চেয়ে থেকে বলে—মা ম্রিয়স্ব, মা জহি, শক্যতে চেৎ মৃত্যুমবলোপয়।

শ্লোকটা সোমেন বাবার কাছে কতবার শুনেছে। মেরো না, মোরো না, পারো তো মৃত্যুকে অবলুপ্ত করো। পরের দুর্দশা দেখে, মৃত্যু দেখে নিজের দুর্দশা ও মৃত্যুর কথা মানুষের মনে পড়ে। সেটাই দুর্বলতা। যার হৃদয় সবল সে তা ভাবে না, বরং ওই সব অবস্থায় যেন আর কেউ বিক্ষিপ্ত না হয়, তারই উপায় চিন্তা করে। ওই হচ্ছে সবল হৃদয়ের দৃষ্টান্ত, বুদ্ধদেবের যেমন হয়েছিল। বাবা বলতেন। বাবার কথা আজকাল সোমেনেরও বড় মনে হয়। সেদিন যখন ম্যাক্স তার জগজ্জননীর গল্প বলছিল তখনও অস্পষ্টভাবে কেবলই বাবার কথা ভেবেছিল সোমেন। ওই সব মন্ত্র-তন্ত্র ওই সব প্রাচীন ভারতীয় মনোভাবের সঙ্গে যেন বাবার নাড়ির যোগ। বংশধারা বেয়ে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যধারা যেন বা ব্রজগোপাল পর্যন্ত আসতে পেরেছিল বহু কষ্টে। তারপর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। স্তব্ধ হয়ে গেছে। ভারতবর্ষ আর নেই। যে দেশটা পড়ে আছে সে দেশকে লাথি মেরে রসাতলে পাঠিয়ে দিতে ইচ্ছে করে কেবল। মনে হয়, লক্ষ্মণদা আমেরিকায় কত মজায় আছে। এরকম পালিয়ে যেতে পারলে বেশ হত। কে চায় ভিখিরি ভারতবর্ষের নাগরিকত্ব, কে চায় এ দেশের আজন্মমৃত্যু বন্দিদশা?

বউদি ফিরতেই সোমেন আড়ালে ডেকে টাকাটা চাইল। ক্ষণকাল বউদি তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। অনেকক্ষণ রোদে দাঁড়িয়েছিল বীণা। মুখটায় তাই তামাটে রক্তাভা, কপালে ঘাম, ঠোঁটে বিশুষ্ক ভাব। একটু অস্বস্তির সঙ্গে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল—হঠাৎ এত টাকার আবার কী দরকার পড়ল?

—একটা প্রেস্টিজের ব্যাপার। খুব আটকে গেছি। দেবে?

বউদি মুখটা নত করে বলে—তোমার দাদা যদি নর্মাল থাকত তবে কি ভাবতাম ভাই? ও বেরোলেই টাকা। মাইনের টাকা আর কদিন! কিন্তু সে সব তো বন্ধ। আমার লুকনো-চুরনো কিছু থাকতে পারে, কিন্তু বেশি নেই আর, খরচ তো হচ্ছে। দেখি।

মনটা খারাপ হয়ে গেল আবার।

সোমেন একটু ভেবে বলল—আচ্ছা থাক। দেখি, যদি অন্য কোথাও পাই।

বউদি ঘরে চলে যেতে যেতেই হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বলল—মার কাছে চাও না। মার তো ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে টাকা পড়ে আছে।

তাই তো! মনে পড়ে গেল সোমেনের। জমির টাকাটা পড়ে আছে এখনও। দাদার অসুখের জন্য পিছিয়ে যাচ্ছে তারিখ। এ ক'টা টাকা মাও দিয়ে দিতে পারে। মায়ের ঘরের দিকে ফিরেও থেমে গেল সোমেন। মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা বাধা। চাইলেই যে মা দেবে তা নয়, অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করবে, সন্দেহজনক সব প্রশ্ন করবে। তারপর সোমেন রেগে গেলে লক্ষ্মী মেয়ের মতো সুড়সুড় করে চেক কেটে দেবে সেটা সোমেন জানে। কিন্তু বাধা অন্য জায়গায়। টাকাটার ইতিহাস মনে করলে আর চাইতে ইচ্ছে করে না। বাবার কত কষ্টের টাকা! কত বছরের অপেক্ষার পর পাওয়া। টালিগঞ্জের জমিটুকু ঘিরে কত সুখের স্বপ্ন মায়ের।

সোমেন টাকা চাইল না। বেরিয়ে পড়ল সন্ধেবেলায়। দেড়শো টাকার সমস্যাটা তেমন কঠিন হওয়া উচিত নয়। টাকাটা বাইরে কোথাও থেকে ঠিক পেয়ে যাবে সোমেন।

অনিল রায় স্খলিত গলায় গান গাইছিলেন। অথবা গান গাওয়া এ নয়। গলা সাধাই হবে হয়তো। চাকর দরজা খুলে দিতেই শব্দটা কানে এল। শ্লেষ্ম কিংবা কান্নায় আবিষ্ট গলা, সঙ্গে তানপুরার আওয়াজ, সুর মিলছে না। তিনশো টাকা ভাড়ার চমৎকার সরকারি ফ্ল্যাট, প্রচুর জায়গা। খোলামেলা। প্রথম ঘরটায় একটা গোদরেজের সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপর ডাঁই করা বই, আলমারি ঠাসা কেবল বই। দ্বিতীয় ঘরটা শোওয়ার। সেখানে একটা বেতের চৌকিতে তুচ্ছ বিছানা। মেঝেয় কার্পেটের ওপর তানপুরা হাতে বসে আছেন অনিল রায়, পিঠে কাঁধে প্রচুর লোম, কানের লম্বা লোমগুলো ছেটে ফেলেন অনিল রায়। পাশে মদের বোতল, গেলাস, সোডা, কিছু চিজ লাগানো নোনতা বিস্কুট।

সোমেনকে দেখে তানপুরা শোয়ালেন, গেলাস তুলে নিয়ে বললেন—খাও, ঢেলে নিয়ে খাও। ষষ্ঠী, আর একটা গেলাস দিয়ে যা।

—না স্যার, মা টের পেলে বকাবকি করবে।

অনিল রায় উত্তর দিলেন না। ষষ্ঠী বিনা শব্দে এসে গেলাস রেখে গেল। বাড়িটা অসম্ভব স্তব্ধ। কানে তালা লেগে যায়। নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ পাওয়া যায়।

অনিল রায় বসে বসেই টলছিলেন। বললেন, তা হলে কফি?

—তা একটু খেতে পারি।

কিন্তু কফির কথা ষষ্ঠীকে বলতে ভুলে গেলেন অনিল রায়। কার্পেটের ওপর এক ধারে একটা পাশবালিশ পড়ে আছে, সেইটাতে ঠেসান দিয়ে বসে বললেন—গান কাকে বলে জানো? অ্যাটমসফেরিক ডান্স অব দি ভয়েস, বুঝলে?

—না স্যার।

—বাংলায় কী বলে! বাংলা নিয়ে আমার বড় মুশকিল। ও ভাষাটা বড় আদুরে বাবু ভাষা। এক্সপ্রেশন হয় না। বলা যায়, কণ্ঠস্বরের আবহনৃত্য। সুরের পাখিরা বেরিয়ে এসে চারদিকে নেচে নেচে বেড়ায়।

সোমেন একটু হাসল।

অনিল রায় হাতের পিঠে ঠোঁট মুছে নিয়ে বলেন—একটু নেশা করে গাইতে বসলে ঠিক টের পাই, পাখিগুলো চারদিকে উড়ে উড়ে নাচছে, নামছে, আনন্দে চিৎকার করছে। তারপর পাখিগুলো ঠোকরাতে শুরু করে। ঠুকরে ঠুকরে খায়। আমাকে খায়। খেয়েটেয়ে কিছুক্ষণ পরে বোধ হয় ভাল লাগে না, আধ-খাওয়া করে ফেলে রেখে যায়। তখন ভারী মুশকিল। আধ-খাওয়া হয়ে পড়ে থাকি, বড় ভয় করে তখন। ষষ্ঠীচরণ ঘুমোয়, আর বাড়িটা খাঁ-খাঁ করতে থাকে। নিজেকে মনে হয় কেবলমাত্র মাতাল, বলে অনিল রায় গেলাস শেষ করেন। আবার সোডার আর মদের মিশ্রণ তৈরি করে নিয়ে বলেন—শালা মাতাল। বাস্টার্ড।

টাকার কথাটা আর ভোলা যাবেনা, সোমেন বুঝল। মাতালদের একটা অন্য চোখে দেখে সোমেন। যেমন সবাই দেখে। মাতাল অবস্থায় কারও কাছ থেকে কিছু চাইতে বা নিতে সংকোচ হয়। মনে হয়, লোকটাকে ঠকাচ্ছি, ওর তো মনে থাকবে না।

অনিল রায় একটু ঝুঁকে বললেন—দেরি করে এলে। চাকরিটায় অন্য লোক নেওয়া হয়ে গেছে। অবশ্য তেমন কিছু নয়, একটা ক্ল্যারিক্যাল জব।

সংবাদ শুনে সোমেন দুঃখিত হল না। ছোটখাটো চাকরির জন্য তার মাথাব্যথা নেই। সে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে চায়, অনেক বেশি খরচ করতে চায়। এ চাকরি না হলেই কী? বলল—ঠিক আছে।

অনিল রায় গেলাস তুলে চোখের সামনে ধরে আছেন। গেলাসের স্বচ্ছ কাচে একটু হলুদ মদ। তার ভিতর দিয়ে সোমেনকে দেখলেন একটু। বললেন দাঁড়াও, দাঁড়াও। তোমার প্রোফাইলটা তো অদ্ভুত। বায়রনের মতো। দাঁড়াও, তোমার একটা ছবি তুলে রাখি।

বলে টলতে টলতে উঠলেন অনিল রায়। বিছানার বালিশের খাঁজ থেকে একটা চামড়ার খাপ টেনে বের করলেন। সোমেন চমকে উঠে বলে—স্যার, ওটা রিভলবার।

অনিল রায় স্তম্ভিত হয়ে হাতের খাপসুদ্ধ রিভলভারটার দিকে চেয়ে থাকেন একটু। একটু ম্লান হেসে মাথা নেড়ে বলেন—তাই তো। দাঁড়াও, ক্যামেরাটাও এখানেই আছে। এ অবস্থায় নত্বসত্ব জ্ঞান থাকে না, বুঝলে।

খুঁজে পেতে খাপসুদ্ধ ক্যামেরাটা বার করেন অনিল রায়। দুর্ধর্ষ জাপানি মিনোল্টা ক্যামেরা। ঝকঝক করছে। ফ্ল্যাশ গান লাগানো, ভিউ ফাইন্ডারে চোখ রেখে অনিল রায় তাক করছেন। হাত টলছে, শরীর টলছে।

সোমেনেরও বুক টলে হঠাৎ। শেষ বেলায় সবুজ ক্ষেতের ওপর দিয়ে সূর্যাস্তের রং মেখে একটা একা পাখি যেন বহু দূর পাড়ি দিয়ে ফিরে যাচ্ছে ঘরে। আধো অন্ধকার জমে ওঠা খড়কুটোর বাসা। ওম্, নিরাপত্তা, বিশ্রাম। পাখি ফেরে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটা আসাহি পেন্টাক্স ক্যামেরার নিষ্প্রাণ চোখ। অলক্ষ্যে ডেকে ওঠে একটা অন্ধ কুকুর।

অনিল রায় স্খলিত গলায় বলেন—তোমার মুখটা কোথায়? অ্যাঁ! খুঁজে পাচ্ছি না।

সোমেন ম্লান একটু হাসে।

অনিল রায় বলেন—ওঃ, এই তো।...তোমার দুটো মুখ, অ্যাঁ! দুটো!...ডাবল ফেসেড বাস্টার্ড! না না, তোমাকে নয়। নিজেকেই বলছি। এ ডাবল ফেসেড বাস্টার্ড।

দুঃখিত চিত্তে সোমেন ওঠে, অনিল রায় ঝুঁকে পড়ে যেতে যেতে সামলে নেন। ক্যামেরায় চোখ। বলেন— হ্যাঁ। ঠিক আছে। বাঃ!

সোমেন ঘর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে। বড় সদর দরজাটা খোলা। চৌকাঠে পা দিয়ে শুনতে পেল, একা ফাঁকা ঘরে অনিল রায়ের গলার স্বর—হ্যাঁ, তোমাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তুমি ফাঁকা, তুমি শূন্য, এ বায়রনিক ভ্যাকুয়াম। ঘাড় ঘুরিও না। ঠিক আছে।

একটা অস্পষ্ট আলোর ঝিলিক ঘরের মধ্যে চমকে উঠল। টের পেল সোমেন। ফাঁকা ঘরে অনিল রায় তার ছবি তুললেন। সোমেন সিড়ি দিয়ে দ্রুত নেমে এল। রাত হয়ে যাচ্ছে। সময় নেই। মুহুর্মুহু ডাকে এক অন্ধ কুকুর। আসাহি পেন্টাক্স ক্যামেরার একটিমাত্র চোখ চেয়ে আছে প্রতীক্ষায়।

সোমেন যাবে।

॥ পঁয়তাল্লিশ ॥

খুব ভোরবেলা। এখনও আকাশে ঝিলমিল করছে নক্ষত্র। পুবের দিকে আকাশটা একটু ফিকে ফিরোজা। ভূতুড়ে সব গাছের ছায়া। ভোর ভোর বেলায় এখন একটু জুড়িয়ে যাওয়া মিঠে ভাব চারদিকে। বহেরুর খামার ছেড়ে ব্রজগোপাল টর্চের আলো ফেললেন আলের ওপর। এ রাস্তাটা ভাল নয়, তবু অনেক তাড়াতাড়ি হয় ইস্টিশন। কলকাতামুখো প্রথম গাড়িটা এতক্ষণে বর্ধমান ছেড়েছে। ঘুর পথে বড় রাস্তায় গেলে ধরা যাবে না।

পিছনে বহেরু দাঁড়িয়ে। উঁচু বাঁধের মতো ঢিবি, খামারের শেষ সীমানা। তার ওপর আলিসান ছায়ামূর্তি। আজকাল বড় সন্দেহের বাতিক। কাল থেকে ব্রজগোপালকে পাখি পড়া করে বলছে—চলে যাবেন না ঠাকুর, আসবেন কিন্তু।

চলে যাওয়ার কি তা তা ব্রজগোপাল বোঝেন না। চলে তিনি যাবেন কোথায়? কিন্তু বহেরুর ওই এক ভয় ঢুকেছে আজকাল। কর্তা বুঝি বউ-ছেলে সংসারের টানে এতটা ভাঁটেন বুঝি আবার উজিয়ে যান। পাগুলে কথা সব। গেলেই কি আটকাতে পারে বহেরু? পারে না, তর কাঙাল ভিখিরির মতো কেবলই হাত কচলে ওই কথা পাড়ে। ব্রজগোপাল বিরক্ত হন। তোর সঙ্গে আমার গূঢ় সম্পর্কটা কী, না কি দাসখত লিখে দেওয়া আছে! আবার ফেলতেও পারেন না বহেরুকে। কদিন আগেই এ সংসারে ও ছিল কর্তাব্যক্তি, হাঁক ডাকে চারদিক কাঁপত। কিন্তু বয়সে পায় মানুষকে, ভাগ্যে পায়, গাছগাছালির পোকামাকড়ের মতো কর্মফলেরা এসে কুট কুট করে খায়। সেই ক্ষয়ে ধরেছে বহেরুকে। আমান মানুষটা তখনও খাড়া হয়ে দাঁড়ালে দশাসই, কিন্তু তার আগুনটা নিভে গেছে। ছেলেরা শকুনের মতো নজর রাখছে। কদিন বাদে গন্ধ বিশ্বেসে বহেরুতে তফাত থাকবে না।

টর্চ বাতিটা একবার ঘুরিয়ে ফেললেন ব্রজগোপাল। বহেরু এখনও দাঁড়িয়ে। একা। একটু কী যেন বুকে বেঁধে। ওবেলাই ফিরে আসবেন তবু মনে হয় এই যে যাচ্ছেন, আর হয়তো ফিরবেন না।

পরশু চিঠিটা এসেছে। জমি রেজিস্ট্রি হয়ে গেল। ভিত পুজোও সারা। তবু কাজ আটকে আছে। ননীবালা লিখেছেন—তুমি একবার এস। রণোর বড় শরীর খারাপ। মাথাটার একটু গণ্ডগোল হয়েছে বুঝি। আমার মন ভাল নেই।

এমন কিছু একটা আন্দাজ করেই এসেছিলেন ব্রজগোপাল সেবার। মাঝখানে বহুকাল যাওয়া হয়নি। জোর একটা বর্ষা গেল। চারধারে চাষের উৎসব লেগে গিয়েছিল। সে উৎসব ছেড়ে কোথায় যাবেন?

ফ্যাকাশে আয়নার মতো জল জমা ক্ষেত পড়ে আছে চিত হয়ে। তাতে চিকচিকে অঙ্কুর। পায়ের নীচে আঠালো জমি, কাদা, জল। দুর্গম রাস্তা। ব্রজগোপাল টর্চের আলো ফেলে হাঁটেন। উঁচুতে তোলা কাপড়, পায়ে রবারের জুতো, বগলে ছাতা। চারদিকে ঘাস, ফসল জমির একটা নিবিড় উপস্থিতি। কাছেই হাতের নাগালে তারাভরা আকাশ। অন্ধকারে বাতাসের স্পর্শ মায়ের হাতখানার মতো। গভীর মায়া মাখানো এই বিশালতা।

মনের মধ্যে একটা প্রণাম তৈরি হয়ে যায় আপনা থেকেই। বুড়ো বামুনের গায়ের গন্ধ যেন চারদিকে ছড়ানো। আয়ুর বেলা ফুরিয়ে এল। টের পান, অলক্ষ্যে বৈতরণীর কুলকুলু শব্দ ক্রমে কাছে এগিয়ে আসছে। যত এগিয়ে আসে শব্দ তত মায়া বাড়ে। তবু সেই আবছায়া নদীর শব্দ আসে, আসে। আর ততই মনে হয়, লতানে গাছ যেমন আঁকুশি দিয়ে যা পারে আঁকড়ে ধরে, তেমনি এই শরীর পৃথিবীর মাটি বাতাসে আবহের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছে আঁকুশি। বাপ- পিতামোর কাছ থেকে পাওয়া প্রাণ, এই ব্যক্ত জীবন, এ ছেড়ে কার যেতে ইচ্ছে করে?

হাঁটতে হাঁটতে পুবের আকাশ ফরসা হয়ে এল। নিবে যাচ্ছে নক্ষত্রেরা। বেলদার বাজারের কাছে ব্রজগোপাল টিউবওয়েলে জুতোজোড়া আর কাদা মাখা পা দুখানা ধুয়ে নেন। চায়ের দোকানের ঝাঁপ খুলেছে ভোরেই, দিন মজুর আর কামিনরা বসে ধোঁয়াটে চা খাচ্ছে, সঙ্গে সস্তা বিস্কুট। আসাম-চায়ের কড়া লিকারের গন্ধে জায়গাটা ম ম করে। মানুষজনের দিকে একটু চেয়ে থাকেন ব্রজগোপাল। বুকের মধ্যে বড় মায়া। মানুষেরা সব বেঁচে থাক।

অফিসের ভিড় শুরু হওয়ার আগেই কলকাতায় পৌঁছে গেলেন। বাসটাও ফাঁকা রাস্তায় চল্লিশ মিনিটে ঢাকুরিয়ায় নামিয়ে দিয়ে গেল। সংকুচিত ব্রজগোপাল সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলেন। একটু সকাল সকালই এসেছেন ইচ্ছে করে। বেলায় এলে দুই ছেলেকে পাওয়া যায় না।

দরজা খুলল বীণা। দেখে খুশি হল না বিরক্ত হল তা বোঝা গেল না। চেহারাটা কিছু রোগা হয়ে গেছে, হনুর হাড় উঁচু হয়ে আছে শ্রীহীনভাবে। মুখে হাসি ছিল না। একটু তাকিয়ে রইল, যেন চিনতে পারছে না। তারপর সরে গিয়ে বলল—আসুন।

ঘরে ঢুকতেই এক বদ্ধ চাপা ভ্যাপসা ভাব। বাসি ঘরদোরের গন্ধ। পরিষ্কার দেখতে পান পরদার ফাঁক দিয়ে এখনও বিছানায় মশারি ফেলা। সবাই ঘুম থেকে ওঠেনি। ঠিকে ঝিয়ের বাসনমাজার শব্দ আসছে। বেলা পর্যন্ত ঘুমোয় সব। খারাপ অভ্যাস।

সোফার ওপর একটু হেলান দিয়ে বসলেন। কলকাতার এইসব বাক্স-বাড়িতে এরা দিনের পর দিন কি করে থাকে তা আজকাল ভাবতে বড় অবাক লাগে। এ শহরে যারা আছে, ব্যাপারি-ফড়ে-দালাল তারা চিবিয়ে চিবিয়ে রস নিংড়ে নিচ্ছে অহরহ। পড়ে আছে একটা ছিবড়ে শহর। কলকাতার প্রতি মানুষের মোহ আছে, মায়া নেই। মায়া জন্মায় বড় অদ্ভুতভাবে। যেখানে জনপদে মানুষ চাষ করে, গাছ লাগায়, গৃহপালিত পশু পাখিকে ভুক্তাবশিষ্ট দেয়, যেখানে মাটির সঙ্গে সহজ যোগ, মায়া সেখানে জন্মায়।।

ব্রজগোপাল বললেন—কেউ ওঠেনি এখনও?

বীণা বলে—মা উঠেছেন। জপ করতে বসলেন এইমাত্র। আর কেউ ওঠেনি, মোটে তো সাতটা বাজে।

গোবিন্দপুরের সকাল সাতটা মানে অনেক বেলা। ব্রজগোপাল গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বলেন—রণো?

—ওঠেনি। ওষুধ খেয়ে ঘুমোয়। নিজে থেকে না উঠলে ডাক্তার ডাকতে বারণ করেছে।

—হয়েছে কী?

বীণার ভিতরের রাগ আর ক্ষোভ চাপা ছিল। হঠাৎ যেন এই প্রশ্নে সেটা আগুনের মতো উসকে উঠল। একটু চাপা গলায় বলে—হবে আর কী! বংশের রোগ।

ব্রজগোপাল একটু অবাক হন। মেয়েটা বলে কী? বংশের রোগ? তাঁদের বংশে কারও কোনও মানসিক রোগ ছিল বলে তিনি জানেন না। রণোরই প্রথম মানসিক ভারসাম্যের অভাব দেখা দিয়েছিল সেই

ছেলেবেলায়, টাইফয়েডের পর। বীণার দিকে চেয়ে অন্যমনস্ক ব্রজগোপাল বললেন—বংশের রোগ। সে কীরকম?

বীণা উত্তর দিল না। বাথরুমের দরজায় গিয়ে ঝিকে ধমক দিল- কতদিন বলেছি সকালবেলাটায় বাথরুম বেশিক্ষণ আটকে রাখবে না!

ব্রজগোপাল অসহায়ভাবে একা বসে থাকেন। সবাই ঘুমোচ্ছে, কেবল ছোট নাতিটা বোধ হয় এইমাত্র উঠে 'মা' বলে কাঁদছে। বীণা পলকে দৌড়ে গেল। ব্রজগোপাল শুনলেন গুমুর গুমুর দুটো-তিনটে কিল ছেলের পিঠে বসিয়ে বীণা বলল—কতদিন বলেছি সকালে ঘুম থেকে উঠে কাঁদবে না। কোন মা মরা ছেলে যে কাঁদতে বসেছ? বাবা ঘুমোচ্ছে দেখছ না! ছেলেটা ভয়ে চুপ করে গেল।

ব্রজগোপাল শুনলেন। কিছু করার বা বলার নেই। চুপচাপ বসে থাকা। কতক্ষণ এভাবে বসে থাকতে হবে তা বোঝা যাচ্ছে না। বোধ হয় ওদের সময়ের অনুসারে একটু তাড়াতাড়ি চলে এসেছেন। এতটা সকালে না এলেই হত। বংশের রোগ। কথাটা মন থেকে তাড়াতে পারেন না তিনি। বউটা এ কথা বলল কেন? তাঁদের বংশে কার ওই রোগ ছিল?

বসে বসে ভাবছিলেন ব্রজগোপাল। বড় ছেলের ঘর থেকে একটা কোঁকানির শব্দ এল। বিকট 'উফ' করে কে যেন পাশ ফেরে। বোধ হয় রণোই। বীণা চাপা স্বরে বলে—উঠছ কেন? শুয়ে থাকো!

রণোর গলার স্বর পাওয়া গেল—উঠব না! ক'টা বাজে?

গলার স্বরটাই অন্যরকম। কেমন অবাকভাব, শিশুর মতো। ব্রজগোপাল নিবিষ্ট হয়ে শুনছিলেন।

বীণা বলে—বেশি বাজেনি। আর একটু ঘুমোও।

রণো বলল—ঘুম হবে না। বাথরুমে যাব।

বীণা ধমক দিয়ে বলে—আঃ এখন উঠবে না।।

আবার একটা ককিয়ে ওঠার শব্দ পান ব্রজগোপাল, তখন ব্রজগোপাল একটু কাশলেন। ইঙ্গিতবহ কাশি। রণো যদি শুনতে পায়, ঠিক বুঝবে যে বাবা এসেছে।

রণেন শুনল। জিজ্ঞেস করল—বাইরের ঘকে কে?

বীণা চাপা স্বরে কী যেন বলে।

রণার স্বর শোনা যায় বলোনি কেন এতক্ষণ?

একটা বড় শরীর বিছানা থেকে উঠল, শব্দ পেলেন ব্রজগোপাল। পর মুহুর্তেই নীল লুঙ্গিপরা খালি-গা রণো পরদা সরিয়ে চৌকাঠ জুড়ে দাঁড়াল।

—বাবা!

ব্রজগোপালের এ বয়সে বোধ হয় একটু ভুলভ্রান্তি স্বাভাবিক। হঠাৎ যেন বা আত্মবিস্মৃত ব্রজগোপাল চোখ তুলে তাঁর দিকে ছোট রণোকে দেখতে পান। যেভাবে শিশু পুত্রের দিকে হাত বাড়ায় বাপ তেমনি হাত বাড়িয়ে বললেন—আয়।

রণেন দৌড়ে এল না। কিন্তু এক-পা দু-পা করে কাছটিতে এসে পাশে বসল। ব্রজগোপালের মুখের দিকে নিবিড় দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে প্রবল উৎকণ্ঠাভরে বলল—কেমন আছো?

এটা নিছকমাত্র কুশল প্রশ্ন নয়, এর মধ্যে যেন-বা জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। ব্রজগোপাল রণেনের মাথায় আলতো হাত রেখে বললেন—বাপকু সোনা, কেমন আছো বাবা?

বাপকু সোনা বলে সেই রণোর ছেলেবেলায় ডাকতেন তিনি। বহুকাল অব্যবহারে নামটা ভুলে গিয়েছিলেন। এক্ষুনি মনে পড়ল।

রণেনের ঠোঁট দুখানা একটু কাঁপে। পরমুহূর্তেই দুহাতের পাতায় মুখ ঢেকে মাথা নাড়ে প্রবলভাবে। অর্থাৎ ভাল নেই।

ব্রজগোপাল অন্যদিকে তাকিয়ে আস্তে করে বলেন—তুমি বড় ভাল ছেলে বাবা, সংসার তোমার কাঁধে ফেলে রেখে আমি চলে গেছি, তুমি সব টেনেছ। বড় অপরাধী আছি তোমার কাছে বাবা।

রণেন নিস্তব্ধভাবে বসেছিল হাতের পাতায় মুখ ঢেকে। অনেকক্ষণ বাদে হঠাৎ সে একটু ফুপিয়ে ওঠে। ধরা গলায় বলে—এরা আমাকে আটকে রেখেছে।

ব্রজগোপাল ছেলের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে ছিলেন, বললেন—তোমারই সংসার। আটকে কেন রাখবে? ওসব ভাবো কেন? কেউ আটকে রাখেনি।

বীণা ছেলে কোলে করে এ-ঘরে এল। দৃশ্যটা একপলকে তাকিয়ে দেখে বলল—বাথরুম খালি হয়ে গেছে। যাও।

রণেন মুখ তুলে বীণার দিকে তাকাল, চোখে ভয়। বলল—যাই।

—যাও। ব্রজগোপাল বললেন, হাত ধরে তুলে দিলেন ছেলেকে। বাথরুমের দিকে যতক্ষণ গেল ততক্ষণ চেয়ে রইলেন। রণেন খুব ধীরে ধীরে থপ থপ করে হেঁটে যাচ্ছিল, গায়ে যেন জোরবল নেই। প্রকাণ্ড শরীরের ভার যেন টানতে পারছে না।

কাল রাতে সোমেন যখন এল তখন তার সঙ্গে চুলদাড়িঅলা রাঙা এক সাহেব। বগুড়ার ছেলেবেলায় অনেক সাহেব দেখেছেন ননীবালা, কী সুন্দর সাজপোশাক কেমন ঝলমলে চেহারা। কিন্তু এ কি একটা সাহেবকে ধরে এনেছে সোমেন? রোগা, পরনে পায়জামা পাঞ্জাবি, সারা গায়ে ধুলোময়লা, চোখে মুখে ভীতু-ভীতু ভাব।

এসেই বলল—মা, আজ রাত্রে ম্যাক্স আমার কাছে থাকবে।

শুনে কপালে চোখ তুলেছেন ননীবালা। সাহেব মানুষরা বাংলাটাংলা বোঝে না, তাই তার সামনেই ননীবালা বলে ফেলেছিলেন—ও মা! সে কিরে, ওরা খ্রিস্টান...

সোমেন গলা নামিয়ে বলে—ও কিন্তু বাংলা জানে।

ননীবালা সামলে গেছেন। কিন্তু ছেলের আক্কেল দেখে অবাক। হিন্দু বাড়ির অন্দরমহলে কেউ সাহেবসুবো ধরে আনে? আচারবিচারের কথা না হয় ছেড়েই দিলেন, ঘরদোর জায়গাও নেই তেমন, রণোর অসুখের পর খাওয়া-দাওয়ারও আয়োজন তেমন নেই, দু-বেলা দুটো ডালভাত কি একটু মাছের ঝোল মাত্র রান্না হয়। এ দিয়ে কি অতিথিকে খাওয়াতে আছে! বীণাও খুশি হয়নি সাহেব দেখে। কেবল নাতি-নাতনিরা খুব ঘুরেফিরে সাহেব দেখছিল।

সাহেব হলেও ছেলেটা ভালই। এ-বাড়ির কেউ যে তাকে দেখে খুশি হয়নি তা বুঝতে পেরেই বোধ হয় বাইরের ঘরে জড়োসড়ো হয়ে বসেছিল। চোখেমুখে ভারি ভালমানুষি আর ভয় মাখানো। মা-বাবা ছেড়ে কতদূরে পড়তে এসেছে। দেখেশুনে বুকের ভিতরটা 'আহা' করে উঠল ননীবালার।

রান্নাঘরে তাকে আর ঢোকাননি ননীবালা, বাইরের ঘরেই সোমেনের পাশে ঠাঁই করে খেতে দিলেন। আসনপিঁড়ি হয়ে বসে বেশ খেল। ঝিঙেপোস্ত, মুগের ডাল আর ট্যাংরার ঝাল। কোনও আপত্তি করল না। মাঝে মাঝে নীল রঙের চোখটা যখন তুলে তাকাচ্ছিল তখনই টের পাওয়া যাচ্ছিল যে বাঙালি ঘরের ছেলে নয়, নইলে ভাবভঙ্গি সব বাঙালির মতো। এতক্ষণ কথা বলেনি, বোবার মতো চুপ করেছিল। খেতে বসে কথা বলল—মা, ঝিঙেপোস্ত খুব ভাল হয়েছে।

মা! ননীবালা বড় অবাক। সাহেব ছেলেটা তাকে মা বলে ডাকছে! ননীবালা বিস্ময়টা সামলে নিয়ে বলেন—মা বলে ডাকছ বাবা? কার কাছে শিখলে-

ছেলেটা হেসে বলল—এখানে সবাই ডাকে। মেয়ে মাত্রই মা। আমার দেশে এরকম ডাকে না। আমি এ দেশে শিখেছি।

ননীবালা নিবিষ্টভাবে রোগা ছেলেটার দিকে চেয়ে থাকেন। ছেলেটা চেহারার যত্ন করে না, চুলদাড়িতে কেমন জঙ্গল হয়ে আছে মুখ। একটু যত্ন করলে গৌরাঙ্গের মতো চেহারাখানা চোখ জুড়িয়ে দিত।

ননীবালা শ্বাস ফেলে বলেন—মা বলে ডেকোনা বাবা, তা হলে ছেড়ে দিতে কষ্ট হবে। বলে একটু চুপ করে থেকে বলেন—মা হওয়ার জ্বালাই কী কম! সামনের জন্মে ছেলে হয়ে জন্মব, তা হলে আর মা হতে হবে না।

ছেলেটা চোখ তুলে বলে আবার জন্ম হবে? ঠিক জানেন?

ননীবালা অবাক হয়ে বলেন—জন্মব না? কর্মফল যতদিন না কাটে—

ম্যাক্স দুঃখিতভাবে বলে—আমরা খ্রিস্টানরা জন্মাই না, আমরা মাটির নীচে শুয়ে থাকি। টিল দ্য ডে অব জাজমেন্ট।

ননীবালা ফাঁপরে পড়ে বললেন—সাহেবরা জন্মায় না? তা হলে এত সাহেব জন্মাচ্ছে কোথা থেকে বাবা?

সোমেন বেদম হাসতে গিয়ে বিষম খেল। সঙ্গে বীণাও। ননীবালা বিরক্ত হয়ে বলেন—ওতে হাসার কী! সাহেবরা হয়তো জন্মায় না, কিন্তু আমরা হিন্দুরা ঠিক জন্মাই।

এইভাবে ছেলেটার সঙ্গে দিব্বি আলাপ-সালাপ হয়ে গেল। সাহেব হলেও নেইআঁকড়ে ভাব। দু-চোখে সব সময় কী যেন খুঁজছে, কী যেন দেখছে। সোমেন রণেন যেন অল্প বয়সেই বুড়িয়ে যাওয়া সবজান্তা ভাব, চোখের আলো নিবে যাওয়া রকম, ও তেমন নয়। ওর মনের কোনও আলিস্যি নেই।

ননীবালা নিজের বিছানায় সোমেনকে শুতে দিলেন, সোমেনের বিছানায় ম্যাক্স। ওরা নাকি রাত জেগে গল্প করবে। ননীবালা তাই বাইরের ঘরের সোফা-কাম-বেড-এ বিছানা পেতে নিলেন। সোফা-কাম-বেড-এ বড় অস্বস্তি, মাঝখানের দাঁড়াটা বড় পিঠে লাগে। এক কাৎ-এ শুয়েছিলেন, হঠাৎ মাঝরাতে দেখেন, আধো অন্ধকারে রণেন আন্ডারপ্যান্ট পরা অবস্থায় রেডিয়োর সামনে বসে। আস্তে রেডিয়ো ছেড়ে গান শুনছে, ওইরকমই সব করে আজকাল। উঠে বসে ছেলেকে ডাকলেন। সাড়া দিল না। থাক শুনুক। কিন্তু ননীবালার আর ঘুম হল না।।

ননীবালার জপ সারতে একটু সময় লাগে। জপ করতে করতেই সংসারের নানান শব্দের দিকে কান রাখেন। রাখতে হয়। আজও শব্দ পেলেন। মানুষটা এসেছে। জপ তাই জমল না। সময়টা পার করে দিয়ে উঠেই প্রথমে ছোট ছেলেটাকে ঠেলে তুলে দিলেন—ওঠ, ওঠ, তোদের বাপ এসেছে।

সোমেন উঠল। বসে টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেট দেশলাই আর অ্যাশট্রে সরিয়ে চৌকির তলায় ঠেলে দিতে দিতে বলল—এ ঘরে উঁকি দেননি তো?

ননীবালা লক্ষ করে বলেন—দিলেই কী! বয়সের ছেলে, বিড়িটা সিগারেটটা তো খাবেই! এতে লজ্জার কী! বাসি বিছানাটা বরং তুলে ফেলো তাড়াতাড়ি, বেলা পর্যন্ত ঘুমনো উনি পছন্দ করেন না।

এইটুকু বলে ননীবালা এ ঘরে এলেন। মুখটুখ ধুয়ে রণেন এসে আবার বাপের কাছে বসেছে। খুবই ঘনিষ্ঠ ভঙ্গি। ব্রজগোপালের চোখমুখের ভাব কিছু দৃঢ়, কঠিন। একটু চাপা, তীব্র স্বরে বলছেন, বলো, আমি অক্রোধী, আমি অমানী, আমি নিরলস, কাম-লোভ-জিৎ বশী, আমি ইষ্টপ্রাণ, সেবাপটু, অতি-বৃদ্ধি-যাজন-জৈত্র পরমানন্দ, উদ্দীপ্ত শক্তি-সংবৃদ্ধ, তোমারই সন্তান, প্রেমপৃষ্ট, চিরচেতন, অজর, অমর, আমার গ্রহণ করো, আমার প্রণাম হও।

রণেন বলল। ব্রজগোপাল আবার বললেন। আবার রণেন বলল, ব্রজগোপাল ছেলের দিকে তীব্র চোখ চেয়ে বলেন—কথাগুলো মনের মধ্যে গেঁথে নাও। রোজ সকালে নিজেকেই নিজে বলবে। সারাদিন বলবে। বলতে বলতে ওর একটা পলি পড়ে যাবে মনের ওপর। বুঝেছ?

রণেন মাথা নাড়ল। বুঝেছে।

ননীবালা স্বামীর দিকে চেয়েছিলেন। সেই পাগল। চোখে চোখ পড়তেই বললেন-ওটা শেখাচ্ছ ওকে?

ব্রজগোপাল স্ত্রীর দিকে চেয়ে একটু যেন সামলে গেলেন। দীপ্তিটা চোখ থেকে নিবে গেল। বললেন—ও হচ্ছে অটো সাজেশান। স্বতঃ অনুজ্ঞা। যখন মানুষের কেউ থাকে না তখন এই অনুভা থাকে। এই চালিয়ে নেয় মানুষকে।

ননীবালা শ্বাস ফেলে বলেন—ওর কে নেই? আমরা ওকে বুক বুক করে রাখি।

ব্রজগোপাল একলহমায় উত্তর দিলেন না। একটু ভেবেচিন্তে বললেন—আছে। সবাই আছে।

—তবে?

—তবু কেউ নেই।

কথাটা ঠিক বুঝলেন না ননীবালা। তবু ইঙ্গিতটা ধরে নিলেন। এই সকালে ঝগড়া করতে ইচ্ছে যায় না। নইলে ক'টা কথা মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে এখন। বলা যেত। বলা যে যায় না তার আরও কারণ আছে। জমিটা কিনেও অনেক টাকা বেঁচে গেছে ননীবালার। বাড়ির ভিতটা উঠে যাবে। বাথরুম থেকে ঘুরে এসে ননীবালা অবাক হয়ে দেখেন, সাড়াশব্দে কখন নিঃশব্দে উঠে এসেছে সাহেব ছেলেটা। কোনও সংকোচ নেই, বেশ ব্রজগোপালের পাশটিতে বসেছে। ব্রজগোপাল তাকে অটো সাজেশান শেখাচ্ছেন।

বাণীর সঙ্গে ননীবালার একটা জায়গায় বড় মিল। ননীবালা জানেন যে এ হচ্ছে পাগলের বংশ। বংশের ধাত অনুযায়ী কম-বেশি পাগলামি এদের সবার। স্বামীর দিকে চেয়ে থেকে তার এই কথাটা আজ আমার মনে হল।

মাঝরাতেই ঠিক পলকা ঘুম ভেঙে যায় ব্রজগোপালের। ঝিঁঝি ডাকছে। চোরের পায়ের মতো হালকা পায়ে কে হেঁটে যায়, ব্রজগোপাল জানেন, শেয়াল। ঘুম ভাঙলেই মনের বিষণ্নতা টের পান। ঘুমের মধ্যে কার একটা শ্বাস যেন মুখে এসে লেগেছিল। কেউ নয়। ঘুমের মধ্যে কত কী মনে হয়।

তাঁতি লোকটা আজকাল তাঁতঘরে জায়গা নিয়েছে। এখন এ-ঘরে বহেরু শোয়। ঘরে শোয়া কোনওকালে অভ্যাস নেই বহেরুর। শীতকালটা ছাড়া। বড় ভয়ে ধরেছে আজকাল ওকে। কেবলই বলে—কত পাপ করেছি, কতজনার কত সর্বনাশ! কে এসে ঘুমের মধ্যে কুপিয়ে রেখে যায়, কী নলিটা কুচ করে কেটে দেয়, কে জানে!

মেঝের উপর পোয়ালের গাদিভরা চটের গদি, তার ওপর শতরঞ্চি, বালিশ-টালিশ নেই। পড়ে আছে। ছেলেরা বড় হয়েছে, কোকা ছাড়া পেয়ে এসে জুটেছে। বহেরু আর শান্তিতে ঘুমোতে পারে না। কেবল এই ঘরে এসে ঘুমোয়। তার ভাবখানা—বামুনকর্তা তো সারারাত জেগেই থাকেন। চোখে চোখে রাখবেনখন।।

তা ঠিক। ব্রজগোপাল জেগেই থাকেন আজকাল। বড় ঘুমের সময় আসছে। একটা আবছায়া নদী, তার পারাপার দেখা যায় না, ঘোর কুয়াশার ঢাকা। সেই নদীর শব্দ পান। উঠে বসেন নিঃঝুম মাঝরাতে। মশারির বাইরে মশাদের বিপুল কীর্তন। শিরদাঁড়াটা সোজা করে বসেন। বীজমন্ত্রের ধারা নেমে উঠে সারা শরীর আর সত্তায় ছড়িয়ে পড়ে। নাসামূলে ইঞ্চিটাক গভীরে তেসরা তিল। সেখানে দয়াল দেশ। বুড়ো বামুনের মাভৈঃ মুখ।

ধ্যানের মধ্যেই ব্রজগোপাল হাসেন। হারিয়ে যান।

তবু হারিয়ে যাওয়াও যায় না। সে তো ধর্ম নয়।

॥ ছেচল্লিশ ॥

ম্যাক্সের পুরনো জুতোজোড়া ছিঁড়ে গেছে। পোঁটলা-পুঁটলিও ওর বেশি কিছু নেই। আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসে যখন থাকত তখনও ওর কিছু শৌখিন জিনিস ছিল। ক্যামেরা, একটা টেপ রেকর্ডার, দামি কিছু স্যুট, ঘড়ি। তার বেশিরভাগই চুরি হয়ে গেছে। রাস্তায় ঘাটে পড়ে থাকত ছেলেটা কিংবা ধর্মশালায়, শ্মশানে। সেই সময়েই গেছে। বাকি যা ছিল তা বিলিয়ে দিয়েছে কাঙালদের। এখন ওর যা কিছু সম্পত্তি তা একটা শান্তিনিকেতনি ঝোলা ব্যাগে এঁটে যায়।

সোমেনের বাড়িতে দুরাত্তির কাটিয়ে সকালবেলায় ব্যাগটা গুছিয়ে নিল ম্যাক্স। সোমেন তাকিয়ে দেখছিল। একটা দাঁত মাজার ব্রাশ, একটা বাড়তি পায়জামা, একটা বাঁকুড়ার গামছা, একটা গেঞ্জি, একটা পাঞ্জাবি, দুটো ডায়েরি, আর তিনটে কি চারটে ডটপেন। বুকপকেটে পাশপোর্ট থাকে একটা প্লাস্টিকের ফোল্ডারে, তাতেই গোঁজা আছে কিছু টাকা, গায়ের পাঞ্জাবির পকেটে একটা রুমাল, কিছু খুচরো পয়সা, দেশলাই আর কয়েক প্যাকেট সিগারেট, একপ্যাকেট সস্তা চুয়িং গাম। ব্যস। এত অল্পে একটা লোকের চলে কী করে! ম্যাক্স এত উঞ্ছবৃত্তি শিখল কোথায়?

মাকে বলল—মা, চললাম। বউদিকে বলল, বউদি, আসি। দাদার কাছ থেকেও বিদায় নিল। বাচ্চাদের কাছ থেকেও।

সোমেন ওকে খানিক দূরে এগিয়ে দেবে বলে সঙ্গে চলল। রাস্তায় নেমেই ম্যাক্স ছেঁড়া স্যামসন জুতোজোড়া পা থেকে খুলে সোমেনকে দেখিয়ে বলল—হোপলেস। বলে ফুটপাথে ছুঁড়ে ফেলে দিল।।

সোমেন বলল—আমার বাড়তি একজোড়া আছে, পরে যাও।।

ম্যাক্স মাথা নাড়ল, নো। এই ভাল, ভারতবর্ষের সঙ্গে এই শেষ ক'টা দিন আর্থ কন্ট্যাক্টে থাকি। ইয়োরস ইজ এ গুড কান্ট্রি।

সোমেন ভারতবর্ষ কী তা জানে না। শুনেছে, এ-এক মহান দেশ, সে- এক সমৃদ্ধ সভ্যতার উত্তরাধিকারী। কিন্তু সোমেনের কোনও ধারণা নেই, সে কিছু বোধ করে না। তবু ম্যাক্স যখন ওই কথা বলল তখন তার বুকের মধ্যে এক ঘুমিয়ে থাকা দেশপ্রেম যেন আধো জেগে উঠে একটু অস্পষ্ট কথা বলে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

সোমেন বলল—কোথায় যাবে?

খালি পায়ে বেলা দশটার তড়পানো রোদে পিচের ওপর হাঁটতে হাঁটতে ম্যাক্স একটু অন্যমনস্কভাবে বলে, কলকাতায় যখন প্রথম এলাম সোমেন, তখন এখানে ভিখিরি আর অভাগাদের দেখে আমি পাগল হয়ে যাই। প্রথম কয়েক মাস আমি লেখাপড়া করতে পারিনি; আমি খুব অবাক হয়ে যাই দেখে যে, এইরকম জঘন্য যেখানকার সামাজিক অবস্থা, সেখানে যুবক-যুবতীরা প্রেম করে বেড়ায়, সিনেমা দেখে, সাজপোশাক করে।

বড়লোকেরা নির্বিকারভাবে বিদেশি গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়ায়। আর কেউ কেউ দেশের অবস্থায় দুঃখিত হয়ে চায়ের দোকানে বসে মাথা গরম করা তর্ক করে। ওই অবস্থায় আমি পাগলের মতো খুঁজে বেড়াতাম, একজনও ভারতীয় আছে কি না যে সক্রিয়ভাবে দেশের জন্য কিছু ভাবছে বা করছে। অনেক খুঁজে আমি একজনকে পেয়েছিলাম। সত্যিকারের একজন ভারতীয় এবং দেশপ্রেমিক। মাদার টেরেসা। আমি আজকাল তোমাদের জন্মান্তরে বিশ্বাস করি সোমেন। আমার মনে হয় মাদার টেরেসাই হচ্ছেন মেরি ম্যাকডেলিন, আর আমরা যত হতভাগা আছি সবাই তাঁর খ্রিস্ট। আমি তক্ষুনি তাঁর দলে ভিড়ে যাই। সে সময়ে আমি তার জন্য কিছু টাকা তুলেছিলাম, আর কিছু নিজের স্কলারশিপ থেকে জমিয়েছিলাম। মাদারের সঙ্গে কাজ করতে করতে আমার কিছুদিন পরে মনে হয়েছিল, সমস্যার উৎসমুখ খুলে রাখা আছে। তুমি যতই করো, অভাব বা দ্রারিদ্র ঘুচবার নয়, তখন সশস্ত্র বিপ্লবের কথা ভাবতাম। আই জয়েনড নক্সালাইটস। টাকাগুলো আর মাদারের হাতে দেওয়া হয়নি। আজকের দিনটা তাই মাদার টেরেসার জন্য টাকা তুলব।

—কীভাবে?

ম্যাক্স মৃদু হেসে বলে, ভিক্ষে করব। আমার অভ্যাস আছে। তা ছাড়া খারাপও লাগে না। আমি যতবার ভিক্ষে করেছি সব সময়েই নতুন নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে। ভারতবর্ষে ভিক্ষে করায় বাধা নেই। মস্ত সুবিধা। যখন তোমার কিছু থাকে না, ইউ মে অলওয়েজ বেগ। ভিক্ষের কোনও শেষ নেই এখানে। তা ছাড়া মাদার টেরেসাকে আমি ঠকাতে চাই না। তাকে দেখলেই মহত্বের কথা মনে হয়, চোখে জল আসে। আর মানুষ নিজেকে ছাড়িয়ে উঠে মহৎ কিছুর জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়ে।

ব্রিজের গোড়া পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিল সোমেন। ম্যাক্স বাসে উঠল না। খালি পায়ে ব্রিজের চড়াই ভাঙতে ভাঙতে মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে বলল—আজ বড় ভাল দিন। না?

রেলিঙের ধার ঘেঁষে উঠে যাচ্ছিল ম্যাক্স। নীল আকাশের গায়ে ওর মাথা। সোনালি বড় বড় চুল হাওয়ায় উড়ছে। সোমেন সেদিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল একটুক্ষণ, হঠাৎ আবেগে চোখে জল আসে। গলা রুদ্ধ হয়ে যায়। সে নিজে ভারতবর্ষের জন্য কিছু করেনি।

রিখিয়ার জন্য 'রেড'টা পকেটের মুখে রেখে দিল সোমেন। ফেলল না। স্ট্রাইকার ভুল জায়গায় লেগে ঘুরে চলে গেল অন্যদিকে।

রিখিয়া নিবিষ্ট মনোযোগে চেয়েছিল গুটিটার দিকে। সোমেন পারল না দেখে মুখ তুলে বলল—ইস, পারলেন না! বলে একটু হাসল।

সোমেন মাথা নাড়ল দুঃখিতভাবে। স্ট্রাইকার এগিয়ে দিয়ে দেখল রিখিয়ার মুখখানা। ও কি এখনও বালিকা! লাল গুটিটার জন্য কি শিশুর মতো লোভ ওর! বয়সকালের আগুনগুলি এখনও জ্বলে ওঠেনি ওর ভিতরে! শৈশবের তুষ ঢেকে রেখেছে সেই তাপে। বড় ছেলেমানুষ। পকেটের মুখে আলগা হয়ে বসে আছে গুটিটা, রিখিয়ার দিকে চেয়ে হাসছে, টোকা লাগলেই পড়ে যাবে।

রিখিয়া স্ট্রাইকার বসিয়ে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য স্থির করে।

সোমেন গম্ভীরভাবে বলল—দেখো, ডবল ফাইন কোরো না।

রিখিয়া টোকা দেওয়ার মুহূর্তে থেমে মুখ তুলল। ভ্রূ কোঁচকাল। স্ট্রাইকারটা সরিয়ে দিয়ে বলল—খেলব না আপনার সঙ্গে।

—কেন, কী হল?

—ডবল ফাইনের কথা বললেন কেন? এখন ঠিক আমার ডবল ফাইন হবে।

এই বলে গম্ভীর রিখিয়া নিজের হাতের নোখ দেখতে লাগল। মুখখানা কান্নার আগেকার গাম্ভীর্যে মাখা।

সোমেন খুব শান্ত গলায় বলে—হলেই বা কি! যখনই হোক রেডটা তুমি ঠিক ফেলতে পারবে।

রিখিয়া সতেজ গলায় বলে—আমার জন্য 'রেড' বসে থাকবে, না? আর একটা চান্স পেলেই তো আপনি ফেলে দেবেন।

সোমেন মাথা নেড়ে বলল—কোনওদিন পারিনি। আমার রেড অ্যালার্জি আছে, নার্ভাস হয়ে পড়ি।

লম্বা সোফার ওপর একটা মেয়ে শুয়ে এতক্ষণ জুনিয়র স্টেটসম্যান, ফেমিনা, ফিলম ফেয়ার আর ইলাস্ট্রেটেড উইকলি একগাদা নিয়ে ডুবেছিল। সে সোমেনকে ফিরেও দেখেনি এতক্ষণ। বোঝা যায়, ও বড় ঘরের মেয়ে। ফরসা আদুরি-আদুরি চেহারা, চোখে বিশাল ফ্রেমের চশমা, পরনে বেলবটম আর কামিজ, রিখিয়ারই বয়সি। ওর বন্ধুটন্ধু কেউ হবে। এবার সে মুখের সামনে থেকে পত্রিকাটা সরিয়ে বলল—অবজেকশনেবল। রেড অ্যালার্জি কথাটা ভীষণ অবজেকশনেবল।।

অবাক হয়ে সোমেন বলে-কেন?

মেয়েটা তার গোলপানা মুখটায় বিরক্তি ঘেন্নার ভাব ফুটিয়ে যেন বাতাসের গন্ধ শুঁকে বলল—স্টিনকস উইথ ব্যাড পলিটিকস। আপনি রি-অ্যাকশনারি।

সোমেন অবাক হয়ে মেয়েটাকে দেখছিল। উত্তর দেবে কি দেবে না, তা ঠিক করতে পারছিল না। অতটুকু মেয়ে!

রিখিয়া তার ডান হাতটা ঝাড়ছিল, আঙুলগুলো টেনে ঠিকঠাক করে নিচ্ছিল রেড ফেলার আগে। সোমেনের দিকে একপলক তাকিয়ে বলল—মধুমিতা না ভীষণ লেফটিস্ট, জানেন! ও কিছুদিন আন্ডারগ্রাউন্ডেও ছিল। অ্যাকশনও করেছে।

সোমেন মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলে—ওঃ! আজকাল সবাই দেখছি পলিটিক্স করলেই আন্ডারগ্রাউন্ডে যায়। আন্ডারগ্রাউন্ডে কী আছে?

মেয়েটা হাতের ম্যাগাজিনটা সপাট করে টেবিলে রেখে স্প্রিংয়ের গদিতে উঠে বসে। শরীরটা উত্তেজনায় দোল খায়! বুকের ওপর থেকে বেণীটা পিঠের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলে— মোটেই আমি আন্ডারগ্রাউন্ডে ছিলাম না, অপরাজিতা। সবাই জানে সে সময়ে আমি বাপির সঙ্গে জয়পুরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ইটস এ স্টিংকিং লাই।

সোমেন বুঝল, মেয়েটা স্টিংক কথাটা ব্যবহার করতে ভালবাসে। ও বোধ হয় ওর চারদিকে একটা পচা পৃথিবীর দুর্গন্ধ পায় সব সময়ে। এতক্ষণ মেয়েটার গোলপানা মুখ আর আদুরি চেহারার মধ্যে তেমন কিছু ছিল না। কিন্তু এখন হঠাৎ তার ফরসা মুখে রাগের একটা আগুনে রং যখন ফুটে উঠে, দুটো ভ্রূ যখন দুটি নিক্ষিপ্ত তীরের মতো মুখোমুখি পরস্পরকে চুম্বন করে আছে, কপালের মাঝখানে যখন রাজটিকার মতো একটি শিরা জেগে উঠেছে তখনই তার অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের সৌন্দর্যটা ফুটে উঠল। মেয়েটা যে ঠিক ওর চেহারার মতোই নয়,

তা চেহারা পালটে ফেলে বুঝতে দিল। সোমেন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। প্রয়োজনের চেয়ে কয়েক পলক বেশি চেয়ে রইল সে।

তখন রিখিয়া হঠাৎ গম্ভীর মুখে স্ট্রাইকারটা বোর্ডে রেখে বলে ওঠে—'রেড' ফেলছি কিন্তু।

সোমেন চোখ সরিয়ে এনে বলে—ওঃ হ্যাঁ!

রিখিয়া গম্ভীর মুখেই বলে—ডবল ফাইন হলে কী হবে?

সোমেন বলে—দুটো সাদা গুটি উঠবে, আর রেড।

ফের স্ট্রাইকার থেকে হাত সরিয়ে রিখিয়া বলে—মোটেই না।

—তবে?

—একটা সাদা গুটি, আর রেড।

—সোমেন মাথা নাড়ে—উঁহু, দুটো সাদা আর রেড।

রিখিয়া কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে—ইস, বললেই হল! এই মধুমিতা, তুই বল তো! রেড আর স্ট্রাইকার পড়লে....

মধুমিতা আবার শুয়ে পড়েছে, একটা হাঁটুর ওপর অন্য পা নির্লজ্জভাবে তোলা, মাথার নীচে একটা হাত, অন্য হাতে ম্যাগাজিন। ম্যাগাজিনের আড়াল থেকেই বলল—জানি না। ক্যারম নিয়ে কে মাথা ঘামায়!

ঘরে আর কেউ নেই। রিখিয়া আর কার কাছে নালিশ করবে! নীচের ঠোঁট দাঁতে চেপে সে অসহায়ভাবে সোমেনের দিকেই তাকাল। সোমেন মৃদু হেসে বলল—আচ্ছা আচ্ছা। একটা সাদা, আর রেড।

রিখিয়া হাসল না, খুশিও হল না। থমথমে মুখ। স্ট্রাইকারটা ফের সরিয়ে দিয়ে বলে— আগে কেন বললেন না!

বলেই হঠাৎ মধুমিতার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে—তুই বুঝি অ্যাকশন করিসনি! স্কুলের ক্লাসরুমে মাও সে-তুঙের টেনসিলের ছাপ দিয়েছিল কে?

মধুমিতা একবার অবহেলাভরে তাকিয়ে বলে—তাতে কি! ওটা বুঝি অ্যাকশন! তা হলে ক্যারম খেলাটাও অ্যাকশন। ফুঃ!

রিখিয়া চুপ করে থাকে একটুক্ষণ। সোমেন অপেক্ষা করে। রিখিয়া কী ভেবে হঠাৎ নিচু হয়ে স্ট্রাইকারটা বসিয়ে পাকা ফলের মতো পকেটের মুখে ঝুলে থাকা রেডকে ফেলার জন্য টোকা দিল। সোমেন অবাক হয়ে দেখল, রিখিয়া ঠিক ডবল ফাইন করেছে। পটপট করে রেড আর স্ট্রাইকার চলে গেল পকেটে।

দুঃখিত সোমেন রিখিয়ার দিকে তাকাল না। রেড আর সাদা গুটি তুলে চমৎকার একটা চাপ সাজিয়ে দিল রিখিয়াকে। স্ট্রাইকার এগিয়ে দেওয়ার সময়ে সন্তর্পণে চেয়ে দেখল, রিখিয়া হাতের পিঠে চোখের জল মুছছে।

—এই, কী হল?

—আমি খেলব না। রিখিয়া মাথা নেড়ে বলে।

—কেন?

রিখিয়া রাগ আর ফেঁপানির গলায় বলে—আপনি ডবল ফাইনের কথা বললেন কেন?

বলে রিখিয়া স্ট্রাইকার ছুঁড়ে ফেলে দিল।

সোমেন মাথা নাড়ল আপনমনে। খেলা নয়, এ তো খেলা নয়। হেরে গেছ? কে বলে ও-কথা? বিজয়িনী, তুমি বিজয়িনী। এখনও তোমার বয়স কম। ছোট্ট খুকি, নইলে এক্ষুনি আমি কী যে করতাম!

ছোট্ট সোপায় গিয়ে বসল রিখিয়া। ক্যারম খেলার আগে সে অ্যালবাম থেকে সোমেনকে ছবি দেখিয়েছিল সেইটা আবার খুলে বসল গম্ভীরভাবে।

পকেট থেকে গুটিগুলো তুলে টুকটাক করে সাজাচ্ছিল সোমেন। আড়চোখে রিখিয়া একবার চেয়ে দেখল। পৃথিবী থেকে মেয়েমানুষ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, দুঃখ করে বলেছিল ম্যাক্স। কই? এই তো শতকরা একশো ভাগ একটা মেয়ে। ভীষণ মেয়ে। মেয়েমানুষ ছাড়া আর কিছু নয়। ভাবতে ভাবতে সোমেন একটু হাসে।

রিখিয়া ছবি দেখছে। সোমেনের ছবি। একটা অন্ধ কুকুরের পিছনে চোখ বুজে হাঁটছে সোমেন, যুধিষ্ঠিরের মতো। কিংবা রাগী মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছবিগুলো দেখতে দেখতে রিখিয়া একটু হাসল। মুখ তুলে বলল—বোকা।

ছবিগুলো একটু আবছা হয়ে গেছে। ঠিকমতো ফোকাস করার সময় পায়নি। এর আগের. দিন যখন এসেছিল তখনই আবার পটাপট কয়েকটা ছবি তুলে রেখেছিল। সেদিনই ক্যারমে উনত্রিশ-কুড়ি পয়েন্টে গেম খেয়েছিল সোমেন। প্রথমবার হারতে হয়।

ম্যাগাজিনটা ফেলে উঠে বসল মধুমিতা। চশমাটা বেঁকে গিয়েছিল, সোজা করে বসাল নাকে। আধুনিক ফ্যাশনের চশমা, চোখে এঁটে থাকে না, একটু নেমে আসে নাকের ওপর। শেয়াল-পণ্ডিতের মতো দেখায়। ঢিলা কামিজের তলায় বিদ্রোহী দুটি কিশোরী স্তন, কামিজটা টান হওয়ার পর ফুটে উঠল। কপালের চুল সরিয়ে মধুমিতা গম্ভীর মুখে একটু চাইল সোমেনের দিকে। দৃষ্টিতে তাচ্ছিল্য। একটা হাই তুলে বলল—অপরাজিতা, ম্যাগাজিনগুলো আমি নিয়ে যাচ্ছি।

—যা।

—ক'টা বাজল, সাতটা? আটটায় আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট। কবজির ঘড়িটা কানে তুলে একটু শব্দ শুনল মধুমিতা। আবার তাকাল সোমেনের দিকে। এবার চোখটা অন্য রকম। একটু যেন মেপে দেখল সোমেনকে। চোখে কোনও মায়া-মোহ বা রহস্য নেই। কেমন যেন পুরুষমানুষের মতো তাকায় মেয়েটা। বেশ লম্বা, অথচ নরম-সরম চেহারা। মুখে তেলতেলে একরকমের পেইন্ট, কপালে টিপ নেই, কানে দুল বা গলায় হার নেই, দুহাতে শুধু দুগাছা গালার চুড়ি, ডান হাতে ঘড়িটা। সব মিলিয়ে মেয়েটা নিজের অস্তিত্বকে চারধারে ছড়িয়ে দিয়েছে। রিখিয়াকে ওর পাশে অনেক লাজুক, ম্লান আর ছোট্ট লাগে।

মেয়েটা আর একটা হাই বাঁ-হাতের তিনটে আঙুলে চাপা দিল। চমৎকার আঙুল। নখগুলোর পালিশ ঝিকিয়ে উঠল। হাইটা চেপে দিয়ে বলল—আপনি কোথায় থাকেন?

সোমেন খানিকটা অবহেলার ভাব করে বলে—ঢাকুরিয়া।

মধুমিতা বলল—আমি যোধপুরে, আপনাকে একটা লিফট দিতে পারি। যাবেন। রিখিয়া ভ্রূ কুঁচকে অ্যালবামের দিকে চেয়ে আছে, সেখানে সোমেনের আবছা ছবি।

মধুমিতা উঠে বলল—আপনার রেড অ্যালার্জিটা সারানো দরকার।

সোমেন হেসে বলল—আমার অ্যালার্জিটা পলিটিক্যাল নয়।

—নয়? বলে একটু অবাক হওয়ার ভাব করল মধুমিতা। তারপরই হাসল। এই প্রথম ওর হাসি দেখল সোমেন। কি পরিষ্কার দাঁত, কেমন ভরপুর হাসি। তবু হাসিটাও ঠিক মেয়েমানুষের মতো নয়। পুরুষঘেঁষা। বলল—আপনার কালার কী?

সোমেন চোখটা সরিয়ে নিয়ে তার নিজস্ব ভুবনজয়ী হাসিটা হেসে বলল—হোয়াইট, এ কালার অফ সারেন্ডার।

॥ সাতচল্লিশ ॥

—সারেন্ডার! শুনে চোখ দুখানা ফের গোল করে একবার রিখিয়ার দিকে তাকাল, তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল আবার সোমেনের মুখে। যেন কিছু একটা টের পেল এই মাত্র, সোমেন আর রিখিয়ার মধ্যবর্তী শূন্যতায়।

বোগেনভেলিয়ার লালচে পাপড়িগুলি অবিরল ঝরে পড়ছে নীচের চাতালে, একটা ইউক্যালিপটাসের চারাগাছ উঁকি মারছে জানালা দিয়ে, সারা গায়ের বাকল খসছে। রিখিয়াদের ছোট্ট বাগানের এই সব দৃশ্য একটু দেখল সোমেন।

মধুমিতা ম্যাগাজিনের একটা গোছা হাতে তুলে নিয়ে বলল—আপনি খুব সহজেই সারেন্ডার করেন, না?

সোমেন মুখ ফেরাল। রিখিয়া সেই রকমভাবেই মাথা নত করে বসে। কোলে খোলা অ্যালবাম। সোমেন মুখ টিপে হেসে বলল—করি।

মধুমিতা অখুশি হল বোধ হয় কথাটা শুনে। বলল—মোটেই ভাল নয় ওরকম। চলুন।

সোমেন রিখিয়ার নতমুখের দিকে চেয়ে একটু হালকা গলায় বলে—হবে নাকি আর এক গেম?

রিখিয়া মুখ না তুলেই মাথা নাড়ল। খেলবে না।

একটু ইতস্তত করে সোমেন। এত তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার জন্য সে আসেনি। কিন্তু রিখিয়া থাকতে না বললে থাকে কী করে?

মধুমিতা ঘাড়টা একবার তুলেই ছেড়ে দিয়ে বলল—ক্যারাম আবার একটা খেলা। খুটখাট গুটি ফেলা দুচোক্ষে দেখতে পারি না। খেলা হল বাস্কেট।

একটা চাপা ঝগড়া পাকিয়ে উঠছে, সোমেন বাতাসে বারুদের গন্ধ পায়।

রিখিয়া মুখ তুলল। চোখে তীব্র চাউনি। বলল—আহা, ক্যারাম খেলা নয়, না। তোর তো সব ছেলেদের খেলা ভাল লাগে।

—লাগেই তো! অ্যাটাক, কাউন্টার অ্যাটাক আর অ্যাগ্রেসিভনেস না থাকলে আবার খেলা কী! আই লাইক ম্যাসকুলিন গেমস।

রিখিয়া রেগে গিয়েছিল, কিন্তু তেমন স্মার্ট কথাবার্তা বোধ হয় ওর আসে না, রিফ্লেক্স কিছু কম, কেবল বলল—হ্যাঁ তোকে বলেছে!

মধুমিতা তার পাম্প-শু-র মতো দেখতে জুতোর একপাটি খুলে বোধ হয় একটা কাঁকর ঝেড়ে ফেলল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল—আমি সোমেনবাবুকে নিয়ে যাচ্ছি। ফর কম্প্যানি।

এটা জিজ্ঞাসা নয়, সিদ্ধান্ত। সোমেন অসহায়ভাবে একবার রিখিয়ার দিকে তাকাল। ও কি একবারও মুখ ফুটে সোমেনকে আর একটু থাকতে বলবে না! না বললে, সোমেন তেমন নির্লজ্জ নয় যে থাকবে।

মধুমিতা তার গোলগাল চশমার ভিতর দিয়ে গোল চোখ করে চেয়ে আছে। মুখখানাও গোল। সোমেন টেনশন টের পেল। তাকে নিয়ে একটু দড়ি টানাটানি চলছে। দড়িটা টেনেই নিয়েছে মধুমিতা। সোমেন ঘাড় নেড়ে বলে—চলুন।

বলে রিখিয়ার দিকে একপলক চাইল সোমেন, চাপা গলায় বলল—আজ তা হলে যাই রিখিয়া।

রিখিয়া উত্তর দিল না।

মধুমিতা বলল—অপরাজিতা ভীষণ সেন্টিমেন্টাল। একটুতেই ওর গাল ভারী হয়। ইস্কুলে সবাই ওকে তাই খ্যাপাই।

বলে হাসল মধুমিতা। চোখ ঠারল সোমেনকে। অর্থাৎ ইচ্ছে করে রিখিয়াকে রাগাতে চায়। চোখ ঠেরে সোমেনের সঙ্গে একটা সন্ধি করে নিল।

সোমেন একটু হাসল বটে, কিন্তু এ খেলায় সে নেই। ওই নতমুখী, একটু আনস্মার্ট মেয়েটিকে কেউ খ্যাপায় এটা সে চায় না। ইস্কুলে ওর বন্ধুরা ওকে খ্যাপায় জেনে মনটা খারাপ হয়ে গেল তার। কেন, ওরা রিখিয়াকে খ্যাপাবে কেন?

মধুমিতা দাঁতে ঠোঁট কামড়ে বলল—একটুতেই কেঁদে ফেলে অপরাজিতা। গতবার ডিবেটে ওর উলটোদিকের ডিবেটারদের মধ্যে কে যেন বলেছিল অপরাজিতা একটা ভুল কোটেশন দিয়েছে। সেটাকে ও পারসোনাল অ্যাটাক মনে করে...বলে মধুমিতা কোমরে হাত দিয়ে মুখ ছাদের দিকে তুলে ঠিক পুরুষ ছেলের মতো হাসল, তারপর মুখে হাতচাপা দিয়ে বলল—কেঁদে ভাসিয়েছিল।

বিপদের গন্ধ পাচ্ছিল সোমেন। মধুমিতা নিশ্চয়ই খুব শক্ত প্রতিপক্ষ, বোধ হয় ভাল ডিবেট করে, রিখিয়াকে ইচ্ছা করলেই ও নাস্তানাবুদ করতে পারে। রিখিয়া পলকা মেয়ে। যদি রেগে যায় তা হলে হয়তো এখন এমন কিছু বলে ফেলবে যা মেয়েমানুষি রাগে ভরা। হয়তো নিতান্তই ছেলেমানুষি কিছু বলে ফেলতে পারে। তা হলে মধুমিতা ওকে আরও অপমান করবে। তাই মনে মনে সোমেন টেলিপ্যাথি পাঠাতে লাগল রিখিয়াকে—রেগো না রিখিয়া, মাথা স্থির রাখো। দোহাই প্লিজ, আমার সামনে যেন ও তোমাকে অপমান না করতে পারে। ওকে সুযোগ দিয়ো না।

আশ্চর্য এই রিখিয়াকে সেই তরঙ্গ স্পর্শ করল বোধ হয়। টেলিপ্যাথির বার্তা পৌঁছল নাকি!

রিখিয়া মধুমিতাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে তার অভিমানী মুখখানা তুলে সোমেনকে বলল—মাকে দেখে গেলেন না তো? মা কত আপনার কথা বলে!

এই তো! এরকমই কিছু শুনতে চাইছিল সোমেন। মধুমিতার কাছ থেকে তাকে কেড়ে রেখে দিক রিখিয়া। মধুমিতার হাতের দড়ি ঢিলে হয়ে গেল, রিখিয়া টানছে।

সোমেন গম্ভীর মুখে বলল—ওঃ তাই তো। একদম ভুলে গিয়েছিলাম।।

বলে একটু অসহায় মুখ করে তাকাল মধুমিতার দিকে।

মধুমিতা তার কবজির ঘড়িটা দেখল, মুখটায় সামান্য বিরক্তির ভাব করে বলল—আই ক্যান গিভ ইউ টেন মিনিটস।

রিখিয়া হঠাৎ ঝামরে উঠে বলে—তোর তাড়া থাকলে তুই যা না। ও পরে যাবে।

ও! সোমেনের হঠাৎ আন্তরিকভাবে লাফিয়ে উঠতে ইচ্ছে করে, 'ও' সর্বনামটি বোধ হয় সবচেয়ে রোমাঞ্চকর। বিদ্যুৎবাহী।

মধুমিতা আর একবার কাঁধ ঝাঁকাল। সোফায় আবার ধপ করে বসে পড়ে বলল—না, আমি সোমেনবাবুর জন্য ওয়েট করব। বলে সোমেনের দিকে চেয়ে আর একবার চোখ ঠারল, মধুমিতা চাপা হাসি হেসে বলল—ডোন্ট মেক মি ওয়েট ফর এভার দেখা করে আসুন। একসঙ্গে যাব।

শৈলীমাসির ঘরের পরদাটা পার হয়েই রিখিয়া চাপা রাগের গলায় বলল—ভীষণ পুরুষচাটা মেয়ে। একদম পাত্তা দেবেন না।

সোমেনের হৃদয়ের স্তব্ধতার ভিতরে যেন এইমাত্র বোঁটা খসে একটা ফুল এসে পড়ল। সোমেন তার হৃদয়ের মধ্যেই কুড়িয়ে নিল সেই ফুল, সুঘ্রাণে ভরে গেল ভিতরটা।

বলল—পাত্তা! না, না, তাই কি হয়......

আসলে কথা হারিয়ে যাচ্ছিল সোমেনের। কত মেয়ের সঙ্গে কত অনায়াসে মিশেছে সোমেন, তবু এই একটা মেয়ের কাছে এখন কথা হারিয়ে যাচ্ছিল।

শৈলীমাসি বই রেখে আধশোয়া হলেন। পিঠের নীচে বালিশের ঠেকনো দিয়ে দিল রিখিয়া। তারপর খাটের মাথার দিকে চুপ করে দাঁড়িয়ে একটু করুণ চোখে চেয়ে রইল। সোমেনের দিকে। ভারী অন্যরকম লাগছিল ওকে। বড়লোকের মেয়ে দামি ক্যামেরায় ছবি তোলে, গাড়ি চালায়, কত কী করে, তবু যেন ও সে নয়। যেন বা দুর্বল, সহানুভূতি পেতে ও ভালবাসে, কেউ ওকে দেখে 'আহা' বললে বুঝি খুশি হয়।

শৈলীমাসি উঠে বসে বললেন—ও ঘরে ক্যারম খেলা হচ্ছিল। খবর পেয়েছি। তখন থেকে অপেক্ষা করে আছি। ননীর ছেলে কখন এ ঘরে আসবে, দুটো কথা বলে বাঁচব। এতক্ষণে এলে?

সোমেনের বড় লজ্জা করছিল, আর একটু হলেই সে চলে যাচ্ছিল মধুমিতার সঙ্গে। শৈলীমাসির অপেক্ষা শেষ হত না।

চওড়া জানালাগুলো আজ খোলা রয়েছে। এয়ারকুলার বন্ধ। শৈলীমাসি বাইরের আবছা অন্ধকারে একটু গুলঞ্চ গাছের ডালপালার দিকে চেয়ে থেকে বললেন—মানুষের সঙ্গে যে কত কথা বলতে ইচ্ছে করে! যেতে তো পারি না, তাই যে দু-চারজন আসে তাদের সঙ্গে সাধ মিটিয়ে বলে নিই, তুমি কিন্তু বড় মুখচোরা ছেলে, একটুও কথা বলো না। তোমাদের কত কথা জানতে ইচ্ছে করে।

সোমেন তার স্বভাবসিদ্ধ সুন্দর হাসিটা হাসে। উত্তর দেয় না। শৈলীমাসির মাথার পিছনে রিখিয়া দাঁড়িয়া আছে। দেখছে।

শৈলীমাসি মুখ না ফিরিয়েই বোধ হয় টের পেলেন যে রিখিয়া তাঁর মাথার পিছনে দাঁড়িয়ে। তাই মাথাটা পিছনে একটু হেলিয়ে হাতটা একবার পিছনপানে বাড়িয়ে বললেন—এই মেয়েটা আমার, এও কথা বলার সময় পায় না আজকাল।

রিখিয়া বলল—উঃ, রোজ কত কথা বলি।

শৈলীমাসি স্নিগ্ধ হেসে মুখ ফিরিয়ে মেয়েকে দেখলেন। সোমেনের দিকে চেয়ে বললেন—আগে ওর যত কথা ছিল আমার সঙ্গে। কোনও কথা গোপন করত না। সব বলত, বন্ধুবান্ধবদের কথা, স্কুলের কথা, পাড়ার দুষ্ট ছেলেদের কথাও। সব বলে দিত।

—এখন বুঝি বলি না। রিখিয়া চাপা গলায় বলে।

—কম বলিস। বলে শৈলীমাসি গেলাস তুলে একঢোক জল খেলেন। সোমেনকে বললেন—তোমার সম্বন্ধে কি বলেছে জানো?

রিখিয়া হঠাৎ বিড়বিড়িয়ে উঠে বলে—উঃ মাঃ বোলো না, বোলো না। তুমি ভীষণ খারাপ।

বলেই পিছন থেকে হাত চাপা দিল মায়ের মুখে। শৈলীমাসি হাতটা আস্তে করে সরিয়ে দিয়ে স্মিতমুখে বলেন—বলব না। সোমেনের দিকে চেয়ে বললেন—তুমি বাবা, শুনতে চেয়ো না। ও লজ্জা পায়।

সোমেন তটস্থ হয়ে বলে—নিন্দে নয় তো!

রিখিয়া বলে—নিন্দে তো নিন্দে।

—না, নিন্দে নয়। শৈলীমাসি বলেন—ওকে খেতে দিয়েছিস রিখি?

—না।

—দে।

সোমেন আপত্তি করে বলে—না, কিছু খাব না, রোজই খেতে হবে নাকি!

—একটু খাও। বলেন শৈলীমাসি। বড় সুন্দর শান্তস্বরে বলেন। স্বরটা মিনতিতে ভরা। আবার বলান—তুমি খাওয়ার ব্যাপারে খুব খুঁতখুঁতে, না?

সোমেন হেসে বলে—একটু।

—তাই শরীরটা সারেনি। খাওয়ায় খুঁতখুঁতে হলে শরীর ভাল হয় না। আমার ছেলেটারও ওরকম ছিল। কালো মাছ খাবে না, আঁশ ছাড়া মাছ খাবে না, সবজি খাবে না, খাসির মাংস খাবে না, নেমন্তন্ন বাড়িতে গেলে ভারী মুশকিল ছিল ওকে নিয়ে। রোগা, রাগী আর অহংকারী ছিল খুব। তা এখন শুনি বিদেশে সব খায়।

বলতে বলতে একটা কান্নার মেঘ করে এল বুঝি ভিতরে। সেটা চাপা দেওয়ার জন্যই বললেন—বগুড়া স্টেশনের কাছে মুটে মজুররা কদমগাছের তলায় বসে ছাতু মেখে খেত। একটা প্রকাণ্ড ছাতুর দলা পেতলের কানা-উঁচু থালায়, শালপাতায় একটু চাটনি, ঘটিভর জল। কী তৃপ্তি করে যে খেত কাঁচা লঙ্কার কামড় দিয়ে। সেই সস্তাগণ্ডার দিনেও ওই সব খেত, আমরা দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখতুম। সেই খাওয়া দেখার মধ্যেই একটা ভীষণ সুখ ছিল। একবার একটা সাঁওতালকে দেখেছিলুম জুতোর বাক্সের ঢাকনায় একটা মাঝারি বড় আলুসেদ্ধ তেল ছাড়া কেবল নুন আর মরিচ দিয়ে খুব যত্ন করে মাখছে, পাশে জুতোর বাক্সে একবাক্স ভাত। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম সেই সাঁওতালটা ওই অনেক ভাত একটুখানি আলুসেদ্ধর টাকনা দিয়ে টাউ টাউ করে খেয়ে নিল। ঠান্ডা জল খেল পুকুর থেকে। ব্যস তৃপ্তি। ফের কাজে লেগে গেল। কী স্বাস্থ্য! আমরা গরিবের দুঃখের কথা ভেবে কত চেঁচামেচি করি বাবা, কিন্তু সে সব বুঝি মনগড়া কথা! ও খাওয়া দেখলেই বোঝা যায় কী সতেজ সুখী মানুষ সব। নিজেদের দুঃখের ধারণা ওদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে দুঃখী ভাবলে কী হবে, আমাদের চেয়ে ঢের সুখী ওরা। বলে আবার একটু চুপ করে থাকেন শৈলীমাসি, ফের বলেন—আমি চাকর দারোয়ানদের মাঝে মাঝে সামনে বসে খেতে বলি, দেখব। তা তারা সব আমার সামনে লজ্জা পায়, ভাল করে খায় না। খুব ইচ্ছে করে রাস্তায় ঘাটে, স্টেশনে ঘুরে ঘুরে ওই সব মুটে মজুরদের খাওয়া দেখি। কত তুচ্ছ জিনিস কী যত্ন করে খায়। ফেলে না, ছড়ায় না, শেষ দানাটি পর্যন্ত খুঁটে খায়। কিন্তু যেতে তো পারি না। জেলখানায় আটকে আছি।

সোমেনের কিছু করুণার উদ্রেক হয়েছিল। বলল—কী অসুখ শৈলীমাসি?

—সে বলার নয়। মেয়েমানুষ হচ্ছে রোগের আধার। যখন বিয়ের সময় হবে তখন খুব দেখে বুঝে বিয়ে করো। বাঙালি মেয়েরা বড্ড রোগা রোগা। বলে নিজের ঠাট্টায় একটু হাসলেন। বললেন—অসুখ কখন হয় জানো। যখন মনের মধ্যে অসুখের ভাবটা আসে তখনই শরীরে অসুখ ভর করে। মনটা পরিষ্কার থাকলে, অসুখের ভাবনা না ভাবলে বড় একটা অসুখ হয় না। আমি সারাদিন রোগের ভাবনা ভেবে রোগ ডেকে এনেছি। এই শরীরটুকুর ওপর পাঁচবার ছুরি কাঁচি চালিয়েছে। কতক রোগ ধরা পড়েছে, কতক পড়েনি। আমি ভুগি সেই সব আর্নট্রেইসেবল ডিজিজে। রোগবন্দি। মেয়েমানুষ খাড়া না থাকলে সংসার ভেসে যায়। আমারটাও গেছে।

সোমেন কথা খুঁজে পায় না। উৎসারিত ওই বেদনা তাকে স্পর্শ করে না ঠিকই, কিন্তু অপ্রতিভ করে দেয়। হয়তো দু-চারটে সান্ত্বনার কথা আছে যা খুঁজে পায় না সে। নিস্তব্ধ ঘরে সে যেন অস্পষ্ট টের পায় শৈলীমাসির অস্তিত্ব থেকে বায়ুবাহী বিষন্নতার জীবাণুরা তার দিকে এগিয়ে আসছে। ছেঁকে ধরেছে তাকে। একটা শ্বাসরোধকারী প্রতিক্রিয়া হতে থাকে তার মধ্যে। এইরকম অবিরল বিছানায় পড়ে থাকা কী ভয়ংকর, কী মারাত্মক, যখন বাইরে অসীম আকাশের প্রসার, শহর-বন্দর-মাঠ-ঘাটে বিস্তৃত জীবন, তখন এ কেমন কয়েদ? শৈলীমাসির অস্তিত্ব যেন তাকে অস্থির করে তোলে।

উনি বললেন—ছেলেটার রাশ ধরতে পারলাম না, রোগা মাকে ছেড়ে পালিয়ে গেল। রোগের বাড়িতে আর ফিরে আসবে না। আর মেয়েটা এ লোনলি চায়ল্ড, ছেলেবেলা থেকে সঙ্গীসাথী নেই, মা রোগে পড়ে থাকে, বাবা ব্যস্ত। বড় একা। আপনমনে বড় হয়েছে মেয়েটা। কঁদত না, কাঁদলে কে থামাবে। হাসতও না তেমন, হাসবার মতো কিছু তো দেখত না। তাই মেলাংকলিক, অভিমানী। একটু বড় হয়ে যখন স্কুলে যায় তখনও ওর একাচোরা স্বভাব। তাই কারও সঙ্গে সহজে মিশতে পারত না। আজও ওর তেমন কোনও বন্ধু নেই। তাই আপনমনে ক্যামেরায় ছবি তোলে, গান গায়, গাড়ি চালানো শেখে, কিন্তু লোনলি, অসম্ভব একা। আমি তো মা, তাই বুঝি!

সোমেন মাথা নাড়ল। হঠাৎ বলল—আপনাল ইংরেজি উচ্চারণগুলি কী সুন্দর। কোথায় শিখলেন?

মুখের বিষন্নতা, লেবুর রস ফেললে যেমন গরম দুধ ছানা কেটে যায়, তেমনি কেটে গেল। হাসলেন, বললেন—বগুড়ায় ইংরেজি মিডিয়ামে বাড়িতে পড়তাম। বাড়িতে মেমসাহেব রেখে শিখিয়েছিলেন বাবা। তার কাছে শিখেছি। এখনকার সব ইংলিশ মিডিয়ামে যেমন নামকোবাস্তে ইংরেজি শেখায় তখন তেমন ছিল না। খাঁটি সাহেব মেমসাহেবরা খাঁটি ইংরেজি শেখাত।

শৈলীমাসির এই তৃপ্তিটুকু থাকতে থাকতেই সোমেন বেরিয়ে আসতে পারল সেদিন। রিখিয়া এসে ডাকল। পাশের আর একটা ঘরে রিখিয়ার মুখোমুখি বসে অনেক খেল সোমেন। রিখিয়া একটু গম্ভীর। সোমেনও তেমন কথা বলতে পারল না। যখন উঠল তখন মনে এক হর্ষ ও বিষাদ।

পরদার ওপাশে মধুমিতা বসে আছে এখনও। ও ঘরে পা দেওয়ার আগে রিখিয়া বলল—আবার আসবেন।

ঘরে পা দিতেই হাতের পত্রিকাটা ফেলে উঠে দাঁড়াল মূর্তিমতী উইমেনস লিব। মধুমিতা ঘড়ি দেখে বলল—দ্যাট ওয়াজ ওয়েটিং ফর গোডো।

॥ আটচল্লিশ ॥

বাইরে মেঘধ্বনি। পরদাটা ওড়ে হঠাৎ হাওয়ায়। উড়ে আসে খড়কুটো, ধুলো, গাছের পাতা, বোগেনভেলিয়ার পাপড়ি, বাতাসে ঠান্ডা জলগন্ধ। বৃষ্টির প্রথম একটা দুটি ফোঁটা গাছের পাতায় পড়ে। একটা আহত নীল বাঘ ঝাপিয়ে পড়ে মাটিতে, তীব্র গর্জনে কেঁপে ওঠে ঘরের মেঝে।

নীল আলোটা ঝলসাতেই কানে আঙুল দিয়েছিল রিখিয়া। চোখে ভয়।

মধুমিতার ভয় নেই। ব্যাগ খুলে সে মাথা ধরার বড়ির স্ট্রিপ থেকে একটা বড়ি ছিঁড়ে নিল। শুকনো বড়িটা মুখে ফেলে গিলে ফেলল। জল ছাড়াই। ভ্রূটা একটু কেঁচকানো।

বৃষ্টি এল। রিখিয়া কান থেকে হাত নামিয়ে বলে। মুখে একটু হাসি। সোমেনের দিকেই চেয়েছিল, বলল—যাওয়া হবে না।

মধুমিতার নিশ্চয়ই মাথা ধরার রোগ আছে। ডান হাতের বুড়ো আর মাঝের আঙুলে কপালের দুধার টিপে ধরে থেকে বলল-বৃষ্টি তো কী?

—কেমন ঝোড়ো বাতাস! রিখিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলে।

জানালা দরজা তাড়াতাড়ি বন্ধ করছে চাকরেরা। দুর্যোগের আভাস পেয়ে কোথা থেকে কুকুরটা একবার ডাকল, সঙ্গে শেকলের ঠুন ঠুন শব্দ। আজ কুকুরটাকে বেঁধে রেখেছে। খর বৃষ্টির শব্দ উঠল চারধারে, ভাষাহীন কোলাহল। হামাল বাতাস বন্ধ কপাট নাড়া দিচ্ছে মুহুর্মুহু। আকাশের নীল বাঘেরা ঝাঁপিয়ে পড়ছে মাটিতে।

মধুমিতা ঠোঁটটা একটু রাগের ভঙ্গিতে টিপে বলল—ব্রিজের নীচে ঠিক জল জমে যাবে। গাড়ি আটকে গেলে মুশকিল।

বলে সোমেনের দিকে তাকাল, কোমরে হাত রেখে একটু তেরছা চেয়ে বলল---আপনার জন্যই তো। যা দেরি করালেন!

সোমেন সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল—তোমার খুব মাথা ধরে?

মধুমিতা একটু অসহায়ের মতো বলল—খুব। যখন শুরু হয় তখন পাগল পাগল হয়ে যাই ব্যথায়। মুঠো মুঠো ট্যাবলেট খেতে হয়।

—তাই দেখছি। জল ছাড়া ট্যাবলেট খাও কী করে?

—সব সময়ে খাই তো, অভ্যেস হয়ে গেছে। রাস্তায় ঘাটে হরঘড়ি জল তো পাওয়া যায় না।

—এত ট্যাবলেট খাওয়া ভাল নয়।

মধুমিতা ধৈর্যহীন গলায় বলে—সবাই ওকথা বলে। কিন্তু ট্যাবলেট ছাড়া ব্যথা কী করে সারে তা কেউ বলতে পারে না। ডাক্তাররাও বলে—ট্যাবলেট খেয়ো না।

বলে যেন এক অসহায় তীব্র রাগে সোমেনের দিকে চেয়ে রইল। দাঁতে ঠোঁট টিপে বলল—কতবার মাথা এক্সরে করেছে ডাক্তাররা, রোগ পরীক্ষা করেছে। রোগ ধরতে পারে না। সামনের মাসে ভেলোরে যাচ্ছি।

—কেন?

তেমনি এক অসহায় রাগে, এবং বুঝি একটু অভিমানে বলল—ডাক্তাররা সন্দেহ করছে, ব্রেনে টিউমার, অপারেশন হবে। ভেলোরে ছাড়া ওসব অপারেশন হয় না।

বলে একটু হাসল। বড় করুণ হাসিটি। ওই গোল চশমা, ছটফটে ভাব, স্মার্ট পোশাক সব ভেদ করে একটা ব্যথা-বেদনা ফুটে উঠল। বলল-শক্ত অপারেশন। বাঁচে না। আজকাল মা আর বাপি আমাকে খুব আদর করে জানেন! বাঁচব না তো!

সোমেনের মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। এক পরদা মেঘ ঢেকে দিল মনটাকে। বলল— কে বলল বাঁচবে না? এটা বিজ্ঞানের যুগ, অত সহজে লোকে মরে না।

সান্ত্বনাটুকুর কোনও দরকার মধুমিতার নেই, এ-ওরদিকে চেয়ে দেখলেই বোঝা যায়, এ বয়সে মৃত্যুর ভয় বড় একটা থাকে না, 'মরে যাব' একথা ভাবতে একরকমের রোমহর্যময় রহস্য জেগে ওঠে। সকলের করুণা, চোখের জল, শোক—এই সব পেতে ইচ্ছে করে, চারদিকের ওপর ঘনিয়ে ওঠে অভিমান। সোমেন জানে।

—এখন কে বেশি সেন্টিমেন্টাল শুনি। বলে রিখিয়া সোমেনের দিকে তাকায়—সব বোগাস, জানেন। আমারও কত মাথা ধরে।

মধুমিতা কারও কথারই উত্তর দিল না। গোল চশমার ভিতর দিয়ে চেয়ে রইল ক্যারামবোর্ডে সাজানো ঘুটিগুলোর দিকে। ঠোঁটে থমকানো হাসি লেগে আছে।

হঠাৎ সম্বিৎ পেয়ে রিখিয়ার দিকে চেয়ে বলল—অপরাজিতা, আমি বাড়িতে একটা ফোন করব।

—আয়।

—এক মিনিট। আসছি। বলে একটা চাউনি সোমেনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল। মধুমিতা।

আরও জোর বাতাস এল। চারধারে রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, লোহার বিম, কাচের শার্শি সব ভেঙে পড়ছে বৃষ্টিতে, কলকাতার সাজগোজ ধুয়ে গেল। অজ পাড়াগাঁর মতো অসহায়ভাবে কলকাতা ভিজছে।

একাকী সিঁড়ির মুখে দাড়িয়ে আছে রিখিয়া। দেখছে, মধুমিতা নিয়ে গেল সোমেনকে।

মধুমিতা সোমেনকে নিয়ে যাচ্ছে, ঠিক এইভাবেই কি দৃশ্যটা দেখল রিখিয়া? সোমেন তা জানে না। তবু আর একবার টেলিপ্যাথি পাঠাল—আমি তো নিজের ইচ্ছেয় যাচ্ছি না, তুমি তো জানো।

সিঁড়ির শেষ ধাপ থেকে একবার ঘাড় ঘোরাল সোমেন। রিখিয়া তাকিয়ে আছে। কী করুণ চোখ! অন্ধ কুকুরটা ওর গা ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে, মুখটা ওপরে তোলা কি যেন গভীরভাবে বুঝবার চেষ্টা করছে, একটা গোঙানির শব্দ করল।

দেখে পা ফেলেনি সোমেন। শেষ ধাপে পা'টা ঘুরে পড়ল। আচমকা একটা ঝাঁকুনি খেল সোমেন।

তক্ষুনি হেসে ফেলল রিখিয়া, বলল—বেশ হয়েছে।

সোমেন ঠোঁট উলটে একটা অগ্রাহ্যের ভঙ্গি করে। একটু হাসে।

রিখিয়া রেলিং থেকে ঝুঁকে বলে—আপনার ফটোগুলো নিয়ে গেলেন না?

সোমেন ফটোগুলো ইচ্ছে করে নেয়নি, সব শোধবোধ হয়ে যাওয়া কি ভাল? কিছু থাক। তাই হেসে বলল—আর একদিন নিয়ে যাব।

—ফটোগুলো ভাল হয়নি, না? তাই নিলেন না। রিখিয়ার যে কতরকম কমপ্লেকস, মুখখানায় ফের অন্ধকার ঘনিয়ে এল।

সোমেন সিঁড়ির গোড়া থেকে মুখ তুলে বলে—ভাল হয়নি, কে বলল? আমি যেমন, ঠিক তেমনি হয়েছে। আবার আসব তো, তখন নিয়ে যাব।

রিখিয়া একটু হাসল, অন্ধকার মুখে সেই হাসিটুকু জোনাকির মতো একটু আলো ছড়িয়ে দিল।

ওই হাসিটুকু বুকের মধ্যে পদ্মপত্রে জলবৎ টলটল করছিল।

খোলা গেট দিয়ে মধুমিতার ছোট্ট গাড়িখানা ব্যাক করে এল গাড়িবারান্দার তলায়। বৃষ্টিতে ঝাপসা হয়ে গেছে গাড়িটা। হেডলাইটের আলোয় অজস্র কাজের নলের মতো বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে দেখা যায়, পিছনের দরজাটা ভিতর থেকেই খুলে দিল ড্রাইভার। একদৌড়ে মধুমিতা ঢুকে গেল, পিছনে সোমেন।

মধুমিতা তার চশমার কাচ কামিজের কোনা দিয়ে মুছতে মুছতে বলল—এ গাড়িটা বাপি আমাকে অলমোস্ট দিয়ে দিয়েছে। যেখানে খুশি যাই, কেউ কিছু বলে না। কেন জানেন? ওই অসুখটার জন্য। অসুখবিসুখ হলে খুব ইম্পর্ট্যান্স পাওয়া যায়।

বলে হাসল, কয়েকটা গোল চাকতির মততা, আর গোটা দুই ছোট পাশবালিশের মতো গদি পড়েছিল সিটের ওপর। তার দুটো সোমেনের কোলের ওপর ফেলে দিয়ে মধুমিতা বলল—রিল্যাক্স প্লিজ। সিগারেটও খেতে পারেন।

মধুমিতা দুটো বালিশ তলপেটে চেপে ধরে কুঁজো হয়ে বসল। মুখখানা হাতের তেলোয় রেখে পাশ ফিরিয়ে চেয়ে রইল সোমেনের মুখের দিকে। গাড়ির ভিতরে অন্ধকার, কাজ বন্ধ বলে ভ্যাপসা গরম। কাচের গায়ে ভাপ লেগে আবছা। সেই আবছা কাচ দিয়ে বাইরে একটা ভূতুড়ে শহরের অস্পষ্ট আলো-আঁধার দেখা যায়।

সোমেন বালিশ দুটো ফেলে রেখে কনুইয়ের ভর দিয়ে বসল। যথেষ্ট আরামপ্রদ গাড়ি, গভীর বসবার গদি। তবু আবার বালিশের কী দরকার তা বোঝা মুশকিল। বড়লোকদের কত বায়নাক্কা থাকে। গাড়ির পিছনের আর সামনের কাছে ছোট ছোট পুতুল সুতোয় বাঁধা হয়ে ঝুলছে। টেডিবিয়ার, মিকিমাউস, জাপানি মহিলা, ব্যালেরিনা।

—এইমাত্র বাপিকে ফোন করলাম তো! মধুমিতা বলল—বাপি একটুও রাগ করল না, খুব অ্যাংশাস। অসুখ না হলে কিন্তু দেরি হওয়ার জন্য রাগ করত।

—তোমার অসুখ কবে থেকে?

—একবছর, আগে অল্প অল্প মাথা ধরত। পরে সেটা খুব বেড়ে গেল।

—ব্রেন টিউমার, ঠিক বলছ?

—কী জানি! ওসব থাক। আপনি আমাকে মাঝে মাঝে ফোন করবেন?

সোমেন অবাক হয়ে বলে—কেন, কোনও দরকার আছে?

মধুমিতা মাথা নেড়ে বলে—না, লোকজনের সঙ্গে কমিউনিকেট করতে ইচ্ছে করে। আমার অনেক পেন-ফ্রেন্ড আছে, আবার অনেক টেলিফোন ফ্রেন্ডও আছে। টেলিফোন গাইড খুঁজে যে নামটা ভাল লাগে তাকে ফোন করি। এভাবে আমার অনেক বন্ধু জুটে গেছে। তাদের মধ্যে বেশিরভাগই বয়সে আমার অনেক বড়। কিন্তু তারা ঠিক ফ্রেন্ডশিপ রাখে। মাঝে মাঝে ফোন করে। অনেকে বাড়িতে আসে, প্রেজেন্টেশন বা বোকে দিয়ে যায়।

—তোমার তো এমনিতেই অনেক বন্ধু।

—আমি আরও বন্ধু চাই। অনেক বন্ধু। করবেন তো ফোন?

বলে হাসল মধুমিতা।

—করব।

মধুমিতা খুব খুশি হল। হঠাৎ একটা হাত বাড়িয়ে সোমেনের পড়ে-থাকা হাতটা চেপে ধরে বলল—কমরেড।।

হাতটা ছাড়ল না। নিবিড় আঙুলগুলি জড়িয়ে ধরে রইল। সামনের ড্রাইভার নিবিষ্ট হয়ে গাড়ি চালাচ্ছে। কেউ দেখছে না। তবু একটু শিউরে উঠল সোমেন।

মধুমিতা যুবতী নয়। এখন কৈশোরকাল। শরীরের চেতনাগুলি এখনও লাজুক থাকে। মনে থাকে ভয় ও কুণ্ঠা। এখনকার মেয়েরা কিছু বেশি প্রগলভ। তবু প্রথম চেনায় এতটা করে না। মধুমিতার যে ভয় বা লজ্জা নেই তা বুঝি ওই অসুখের জন্য। এখন ওর লজ্জা করার মতো সময় নেই। এখন ওকে তাড়াতাড়ি সম্পর্ক তৈরি করে নিতে হয়। কিংবা এও হতে পারে যে, স্বভাব পুরুষের মতো, মেয়েদের স্বাভাবিক লজ্জাবোধ ওর নেই।

আঙুলগুলি, হাতের উষ্ণ প্রসারটি সোমেন টের পেল না। তার মনে হল, হাতটা বড় শীতল। মৃত্যুর হিম লেগে আছে। সেই শীতলতা গ্রাস করে নিচ্ছে শরীর। শৈলীমাসির ঘরে যেমনটা হয়েছিল এখনও সেরকমটা হচ্ছিল তার। যেন মধুমিতার শরীর থেকে মৃত্যুর জীবাণু সংক্রামিত হচ্ছে তার শ্বাসের বাতাসে। এগিয়ে আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে। অধিকার করে নিচ্ছে তাকে। সে একটা অস্ফুট শ্বাসকষ্টজনিত শব্দ করল। বলল—জানালাটা খুলে দিই?

মধুমিতা বলল—ওমা! বৃষ্টি আসবে না!

তাই তো! অঝোর বৃষ্টি, সামনের উইন্ডস্ক্রিনে ক্রমান্বয়ে পাক খেয়ে খেয়ে জলস্রোত মুছে ফেলতে পারছে না ওয়াইপার। কাচের ভিতর দিয়ে এক ভঙ্গুর, বিমূর্ত শিল্পের মতো শহরকে দেখা যায়। তবু জানালাটা খোলা দরকার। কিছু পরিষ্কার বাতাসের একটু স্বাস বড় প্রয়োজন সোমেনের।

—আপনি খুব ঘামছেন। এই বলে মধুমিতা খুট করে সুইচ টিপতেই একটা ছোট্ট প্লাস্টিকের খেলনা ফ্যান বোঁ বোঁ করে ঘুরে বাতাস দিতে লাগল। ও মুখখানা আবার সোমেনের দিকে ঘুরিয়ে চেয়ে থেকে বলল—অপরাজিতা বড্ড গুডি-গুডি। পৃথিবীর কোনও খবর রাখে না।

সোমেন একটু হাসে। উত্তর দেয় না।

মধুমিতা ফের বলে—আমি কিন্তু ওরকমই নই। আই লিভ আপ টু দি টুয়েন্টিয়েথ, সেঞ্চুরি। অপরাজিতার সঙ্গে আমার মেলে না। খুব ঝগড়া হয়। আবার ভাবও হয়ে যায়।

সেই পুরুষালি স্বভাবের ডাঁটিয়াল মেয়েটি আর নেই। গাড়ির সিটে পা তুলে বসেছে এখন। তেলচোখে খুঁটে খুঁটে দেখছে সোমেনকে। আবছা আলোয় এই প্রথম ওর চোখে একটু মেয়েমানুষি কটাক্ষ দেখতে পেল সোমেন। তার অস্বস্তি হচ্ছিল।

মধুমিতা হাতটা সরিয়ে নিল হঠাৎ। হাঁটু দুটো দুহাতে জড়িয়ে ধরল বুকের সঙ্গে। ওই ভাবেই একটু দোল খেল।

সামনের দিকে চেয়ে বলল—আপনি কি এনগেজড?

সোমেন প্রথমটায় বুঝতে পারেনি। বলল—কী বলছ?

—আপনার কি কেউ আছে?

সোমেন এই প্রশ্নে হাসল। ভয়ও পেল। তার বয়স মাত্র চব্বিশ পূর্ণ হয়েছে। পঁচিশে পা। সদ্য যুবা পুরুষ। তবু মনে হয় তাদের যৌবনকালকে নস্যাৎ করে পরবর্তী যুবক-যুবতীরা দ্রুত জমি দখল করে নিয়েছে। মাঝখানে একটা যোগাযোগহীন শূন্যতা জেনারেশন গ্যাপ। তারা কখনও এত অল্প পরিচয়ে কাউকে এই প্রশ্ন এত অকপটে করতে পারেনি।

সোমেন মিথ্যে করে বলল—ন্‌নাঃ কেন?

—একটা কথা বলব? রাগ করবেন না?

—কী কথা?

—প্লিজ, রাগ করবেন না।

—না।

হাতটা আবার নরম বিসর্পিল আঙুলে চেপে ধরল মধুমিতা। নিবিড় উষ্ণ আঙুল, হাতের তেলোয় জ্বরাক্রান্তের তাপ। মৃত্যুর হিম আর নেই।

বলল—আই লাভ ইউ।

॥ উনপঞ্চাশ ॥

সেদিন শীলাকে সাধ দিলেন ননীবালা। সাধটুকু দিতেই কত না কষ্ট হল।

এখন এ সংসারে আর তেমন স্বচ্ছলতা নেই। রণেনের মনটা বড় ভাল, কোনও উদ্যোগ আয়োজন হলেই রাশিকৃত টাকা খরচ করে বাজার আনবে, জিনিস আনবে, হইচই করে হাট বাঁধিয়ে ফেলবে বাসায়। রান্নাঘরের চৌকাঠের ওপর উবু হয়ে বসে সবকিছু চাখবে। পালেপার্বণে বা নেমন্তন্নে যেদিন বাসায় ভালমন্দ হয় সেদিন ননীবালাকেই তাগাদা দেবে রণেন—ও মা, আজ তুমি হাতা-খুন্তি ধরো। তুমি হাতা ছুঁলেই রান্নার স্বাদ পালটে যায়।

রাঁধতে ননীবালার তেমন কষ্ট হয় না। প্রেশারটা বাড়লে একটু অসুবিধে হয়। ট্যাবলেট আর ট্রাংকুইলাইজার খেয়ে রাঁধতে বসেন গিয়ে। কিন্তু আজকাল সে সুখও গেছে। রণেনের অসুখটা হওয়ার পর থেকেই নেমন্তন্নের পাট গেল উঠে। রণেন আর মাকে রাঁধতে বলে না, কারণ রণেনও আর খাবারের স্বাদ পায় না। কোথায় যে ওর মনটা পড়ে দাপাচ্ছে তা কে জানে! ননীবালা জানেন না।

তবে এ নেমন্তন্নটা করতেই হয়। ছোট মেয়ে ইলারও ছেলে হল কিছুকাল আগে। ওরা মুম্বইতে থাকে বলে সাধ দিতে পারেননি, কেবল শতখানেক টাকা পাঠিয়েছিলেন একটা শাড়ি কেনার জন্য। বড় মেয়ের তো হবেই না ধরে নিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত হচ্ছে। ভেবেছিলেন, খুর ঘটা করে সাধ দেবেন। রণোর এ-রকম না হলে দিতেনও।

ভয়ে ভয়ে কথা পেড়েছিলেন বীণার কাছে-বউমা, শীলুর একটা সাধ না দিলে কেমন দেখাবে?

—দিন। বীণা সংক্ষেপে উত্তর দিল।

—ওর শ্বশুরবাড়ি থেকে খুব ভাল সাধ দিয়েছে শুনলাম। সাদা খোলের কেটের শাড়ি দিয়েছে, অনেক সধবা খাইয়েছে।

বীণা এ কথার উত্তর দিল না।

কিন্তু ননীবালা বুঝলেন। তিনি তো অবুঝ নন। ছেলের উপরি বন্ধ, সংসারটা মাইনের ক'টা টাকায় কেবলমাত্র চলে যায়। তার ওপর চিকিৎসার খরচও বড় কম নয়। বাড়িতে খরচ কোথা থেকে আসবে! তবু মনটা খুঁত খুঁত করে। শীলাকে ভালরকম একটা সাধই দেওয়ার কথা। এতকাল পরে সন্তান হচ্ছে, সেও বটে। আবার অন্যদিকটাও দেখার আছে। লুকিয়ে-চুরিয়ে শীলা ননীবালাকে চাটা-কে-টাকা, গুচ্ছের শাড়ি, একজোড়া সোনার বালা, ভাল চটি কত কী দিয়েছে! জামাই বোধ হয় এ-সব খুব একটা পছন্দ করে না, কিন্তু শীলা ঠিক চুপেচাপে নানা জিনিস পাঠিয়ে দেয়। বাড়িতে ভাল ঘি এল কী কোনও খাবার হল, কী বড় মাছের টুকরো এল, সঙ্গে সঙ্গে পাঠায়। এ সবের পালটি দিতে হয়, সে দেওয়ার ক্ষমতা তো ননীবালার নেই তাই সাধের সময় ভাল একটা কিছু দেবেন, ভেবেছিলেন।

হল না।

রণেনের কাছে এ সব কথা তুলতে চান না ননীবালা। ওর বোধ হয় কষ্ট হবে। কাউকে নেমন্তন্ন করে ভাল আয়োজন না করতে পারলে ও বড্ড খুঁত খুঁত করে। তাই বললে হয়তো দাপাবে মনে মনে। মনের কষ্ট বেড়ে যাবে। অথচ সাধের আগের দিনও বীণা তেমন গা করছিল না। জামাই মেয়েকে নেমন্তন্ন করা হয়ে গেছে, অথচ উদ্যোগ আয়োজন নেই। মনে মনে ভয় পেলেন ননীবালা।।

দুপুরে সোমেন বাড়িতে খেতে এল। খাওয়ার পর যখন সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে বসল, তখন ননীবালা তার কাছেই নালিশটা করলেন—কী করি বলো তো, কাল ওরা সব আসবে, অথচ কোনও উদ্যোগ আয়োজন নেই।

ছেলেটা বড্ড রাগী। কোনও কাজ নেই, তাই প্রায় সময়ই সব আবোলতাবোল কী যেন ভাবতে বসে। সে সময় কেউ ডেকে কথা বললে বড় রেগে যায়। তেমনি রাগের ঝাঁঝ দিয়ে বলল—নেমন্তন্ন করতে গেলে কেন? যত সব সেকেলে সংস্কার। সাধ! সাধ আবার কী? ওসব উঠে গেছে।

ননীবালাও রেগে গিয়ে বলেন-কী বলছিস যা তা? এতকাল পর মেয়ে পোয়াতি হল, সাধ দেব না?

—দেবে তো দাও। আমাদের যা রান্না হবে তাই খেয়ে যাবে। সংসারের অবস্থা তো ওরাও জানে।

ননীবালা আহাম্মক ছেলেটির কথা শুনে গায়ের জ্বালা টের পেলেন। বলেন—সংসারের কোনও ব্যাপারেই থাকিস না, এ ভাল নয়। একটা শাড়ি-টাড়ি কিছু না দিলে কেমন দেখায়?

সোমেন বলল—দাদা পারবে না।

—তবে?

সোমেন তখন ননীবালার দিকে চেয়ে খুব ঠান্ডা কিন্তু কঠিন গলায় বলল—তোমার টাকা তো ব্যাঙ্কে পচছে। চেক কেটে দাও, তুলে এনে দিই।

ননীবালা সঙ্গে সঙ্গে মিইয়ে যান। জমি কেনার পরও হাজার সাতেক টাকা পড়ে আছে ব্যাঙ্কে। সকলেরই নজর ওইদিকে। অথচ জমির ভিত পত্তনের জন্য যে টাকা দরকার তার জোগাড় নেই। ওইটুকুই ভরসা।

ননীবালা অসহায়ের মতো বললেন—ও টাকা ভেঙে ফেললে তোদের বাড়ি কোন দিন উঠবে?

—ও টাকাতেও বাড়ি উঠবে না। কেন বাজে কথা বলছ মা? আমাদের বাড়ি-টাড়ি হবে বরং বেশি দামে জমিটা বেচে দিয়ে। আর টাকাটা যক্ষী বুড়ির মতো আগলে বসে থেকো।

কী কথা ছেলের! ননীবালার দু-চোখে জল এল। সংসারে এরকম শাস্তি পেটের শত্রু ছাড়া কে দিতে পারে? কার ওপর রাগ অভিমান করবেন, কার কাছেই বা নিজের নানা সুখ-দুঃখ সাধ আহ্লাদের কথা জানাবেন? শেষ পর্যন্ত বুঝি একটা মানুষ ছাড়া পৃথিবীতে মেয়েদের আর কেউ থাকে না! কিন্তু ননীবালার সেই মানুষটা যদি মানুষের মতো হত।

অসহায়ের মতো ছেলের দিকে চেয়ে রইলেন। কী সুন্দর মুখখানা ছেলের। কাটা কাটা নাক মুখ, দিঘল চোখ, এক ঢল চুল, রোগার ওপর ভারী লক্ষ্মীমন্ত চেহারা। তবু ওর মনটা এত নির্দয় কেন? তবু তো এখনও বিয়ে করিসনি ছেলে, বিয়ে করলে আরও কত পর হয়ে যাবি!

অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন—হাতের পাতের দুটো টাকা। মানুষের কত বিপদ-আপদ আসে। দুর্দিনের জন্য রাখতে হয় না? হুট করে টাকা তুলে আনলেই হল?

সোমেন বিরক্তির সঙ্গে বলে—আর কত বিপদ আসবে? এটাই তো বিপদ। আসলে তুমি এ সংসারের জন্য নিজের টাকা খরচ করতে চাও না। তুমি ভীষণ সেলফিশ।

এই বলে সোমেন জামা-কাপড় পরে বেরিয়ে গেল গনগন করতে করতে। ভয়ে ননীবালা আর উত্তর করলেন না। কিন্তু ছেলেটা বেরিয়ে গেলে একা ঘরে কত কান্না যে কাঁদলেন! ভগবানকে কখনও দেখেননি, তবু ভগবানকে ডেকে কত কথা বললেন মনে মনে। এক সময়ে দেখেন ভগবানের বদলে সেই ব্রজগোপাল বলে মানুষটার মুখ মনের মধ্যে ভাসছে। সঙ্গে সঙ্গে মনটায় যেন রাগ-অভিমানের ঝড় এল। বললেন—তুমি যদি আমার মাথার ওপর থাকতে তা হলে ওরা আমাকে অত কথা বলার সাহস পায়? দেখো, আমাকে কি আঁস্তাকুড়ের বেড়ালছানার মতো ফেলে গেছ তুমি। পুরুষমানুষ হয়ে তোমার লজ্জা করে না?

এমনি সব কথা। কথার পর কথা। গভীর মেঘের স্তর যেমন বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে আর শেষ হতে চায় না, তেমনি, এত বছর ধরে শুধু রাগ আর অভিমান মনের মধ্যে স্তরের পর স্তর জমে থেকেছে। তাই অনেক সময় লাগল ননীবালার সামলাতে।

কালকে সাধ। একটা কিছু করতেই হয়। নইলে ছেলেদের কী, জামাই-মেয়ের সামনে তিনিই লজ্জায় বেরোতে পারবেন না। আবার শুধু সাধই তো নয়, প্রথম বাচ্চা হওয়ার সময়ে মেয়েদের বাপের বাড়ি থাকার কথা। খরচপত্রও বাপের বাড়ির কিন্তু সে কথা কার কাছে তুলবে ননীবালা?

বীণা ছেলেমানুষ নয়, তিন ছেলেমেয়ের মা। কানে যখন কথাটা তুলেছে তখন বীণা একটা শাড়ি-টাড়ি কিনে আনবে ঠিকই। কিন্তু তাতেও ভয় পান ননীবালা। তেমন ভাল দেখনসই শাড়ি কি কিনবে? শীলুর কত দামি দামি শাড়ি, নিজে রোজগার করে কেনে, বরও ঢেকে দেয় শাড়িতে। কত দামি শাড়ি ঝিয়েদের বিলিয়ে দেয়। আজেবাজে শাড়ি দিলে পরবেই না হয়তো। জামাইও কী ভাববে?

এই সব চিন্তায় পাগল-পাগল হয়ে গেলেন তিনি। এ সব আর কেউ ভাববে না। দায়দায়িত্ব সবই যেন তার একার।

তখনও দুপুর যায়নি। গরমের দুপুর তো, অনেকটা বেলা পর্যন্ত তার আঁচ থাকে। বীণা একটু ঘর বার করে কী ভেবে একটু বেরলো। সাজ-গোজ করেনি বেশিদুর যাবে না। যাওয়ার সময় আজকাল সব সময়ে বলে যায় না। কখনও খেয়াল হলে, মেজাজ ভাল থাকলে বলে—মা একটু অমুক জায়গা থেকে ঘুরে আসছি। আজ বলল না। বোধ হয় শিলুর সাধ নিয়ে মনে মনে একটু আড় হয়ে আছে।

বীণা বেরিয়ে গেলে ফাঁক পেয়ে ননীবালা রণেনের ঘরে এলেন। আর, ঘরে ঢুকেই বড় করুণ দৃশ্যটা দেখলেন। মস্ত বিছানায় বাচ্চাগুলো যে যার মতো ছড়িয়ে শুয়ে আছে। অঘোরে ঘুম। তাদেরই মাঝখানে শুয়ে রণেন। গরমে গায়ে কাপড় রাখতে পারে না, তাই আন্ডারপ্যান্ট পরে শোয়। ননীবালা দেখলেন, আন্ডারপ্যান্ট পরা রণেনকে ঠিক তার ছেলেদের মতোই দেখাচ্ছে। ও রকমই শিশু যেন। শুধু চেহারাটাই যা একটু বড়। একটা হাত ভাঁজ করে তার ওপর মাথা রেখে শুয়েছে। পা দুটো ভাঁজ করা গুটিসুটি। পাখার তলাতেও ওর কপালে, থুতনিতে, পিঠে টোপা টোপা ঘামের ফোঁটা ফুটে আছে।

ননীবালা শুনলেন ঘুমের মধ্যেই রণেন একটা বড় কষ্টের, বড় কাতরতার শব্দ করল। যেন শ্বাস টানতে পারছে না। শরীরটা একবার কেঁপে উঠল। ননীবালা তাড়াতাড়ি গিয়ে আঁচলে ছেলেটার পিঠের ঘাম মুছতে লাগলেন। স্নেহভরে ডাকলেন—রণো! ও রণো!

রণেন দেখছিল একটা বাগান। কী সুন্দর বাগান। চারদিকে হিম কুয়াশায় ভেজা গাছপালা। কী নিস্তব্ধ! এরকম গাছপালা আর কখনও দেখেনি রণেন। মোচার মতো বড় বড় ফুল ফুটে আছে গাছে। একটা নিমগাছের মতো কিন্তু নিমের চেয়েও অনেক সরল ও সুন্দর গাছ দেখল রণেন। বড় বড় ঘাস হাঁটু পর্যন্ত উঠে এসেছে। চারদিকে একটা গভীর সুঘ্রাণ। বেশ লাগছিল রণেনের। এমন বাগান সে জীবনে দেখেনি। মনটা জুড়িয়ে গেল। হাঁটু সমান ঘাস ভেদ করে আস্তে আস্তে ঘুরছিল সে ইতস্তত। হঠাৎ একবার আকাশের দিকে চোখ তুলে সে স্থির হয়ে গেল। ওইখানে, ওই আকাশে এতক্ষণ তারজন্যই একটা ষড়যন্ত্র তৈরি হয়ে ছিল। রণেন দেখে, আকাশের অনেকখানি জুড়ে এক মহা চাঁদ স্থির হয়ে আছে। এমন বিশাল অতিকায় চাঁদ সে আর কখনও দেখেনি। সেই চাঁদ তারদিকে গম্ভীর, নিস্তব্ধতাময় এক স্থির চাউনিতে চেয়ে আছে। কেবলমাত্র তারদিকেই, কারণ এ বাগানে বা আর কোথাও কেউ নেই। ভীষণ চমকে উঠল রণেন এবং হঠাৎ বুঝতে পারল, আকাশের ওই চাঁদটা চাঁদ নয়। ওই মহাকায় গোলকটিই পৃথিবী। মাধ্যাকর্ষণের কোন ফাঁকে সে পৃথিবী থেকে গলে পড়ে গেছে বহু দূরবর্তী এই বাগানে। যেখানে চেনা গাছ, চেনা ফুল, চেনা গন্ধ, কিংবা চেনা মানুষ কেউ নেই। আচমকা ভয় খেয়ে এক ভাষাহীন চিৎকার করে 'আঁ—আঁ' বলে ছুটতে লাগল রণেন। কিন্তু হাঁটু সমান উঁচু ঘাসগুলির ভিতরে ডুবে যায় পা, কিছুতেই সে নড়তে পারে না। আবার দৌড়োতে গিয়েই স্বপ্নটা পালটে যায়। দেখতে পায়, খুব নির্জন একটা মেঠো স্টেশন থেকে একটা ছোট্ট কালো রেলগাড়ি ছেড়ে যাচ্ছে। রেলগাড়ির জানালায় ব্রজগোপালের হাসিমুখ দেখা যাচ্ছে। রণেন মাঠের ভিতর দিয়ে প্রাণপণে দৌড়চ্ছে গাড়িটার উদ্দেশ্যে। পারছে না। কেমন যেন খিল ধরে আসছে হাতেপায়ে। যত জোরে দৌড়োয় তত আস্তে হয়ে যায় গতি। প্রাণপণে হাত উঁচু করে চেঁচিয়ে বলে—থামাও, থামাও, গাড়ি থামাও। বাবার সঙ্গে আমার কথা আছে। কিন্তু গলায় চিৎকার ফোটে না। এক অসহায় ফিসফিসানির শব্দ হয় কেবল। জরুরি কথাটা যে কী তা কিছুতেই মনে পড়ছে না। জনমানবহীন স্টেশনে কোন প্রেত ঢং ঢং করে গাড়ি ছাড়বার ঘণ্টা বাজিয়ে দিচ্ছে। ইঞ্জিনের শিস কানে আসে। দৌড়োতে দৌড়োতে দু-চোখ বেয়ে জলের ধারা নামে রণেনের। সে প্রচণ্ড কাঁদে, ছোটে। অন্তহীন মাঠটা আর পার হতে পারে না। ব্রজগোপাল আগ্রহভরে চেয়ে আছেন জানালা দিয়ে। জানতে চাইছেন, রণেন কী বলতে চায়। কিন্তু অত দূর! এত দূর থেকে কী করে বলবে রণেন? কথাগুলিও মনে পড়ে না। কেবল মনে হয়, বড় জরুরি কথা। বড় ভীষণ জরুরি কথা। এ স্বপ্ন থেকে পাশ ফিরতেই সে বড় ভয়াবহ আর একটা দেখল। কী সাংঘাতিক স্পষ্ট, কী বাস্তব দৃশ্য! ব্রজগোপালের মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে, শববাহকদের সঙ্গে সেও। নদীর পাড়ে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে নামাল। চুল্লি সাজানো। শববাহকদের মধ্যে একজন বুড়ো লোক একটা নুড়ো জ্বেলে তার হাতে দিয়ে বলল—কেঁদে আর কী হবে বাবা! বৃষ্টি আসছে। মুখাগ্নিটা করে ফেলো। এবং রণেন মুখাগ্নি করল। চিতা ধীরে ধীরে জ্বলে উঠল তলা থেকে। আগুনের শিখাগুলি উঠে আসছে ওপরে। হলুদ সাপের মতো। কী স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সবকিছু। কোথাও এতটুকু অস্পষ্টতা বা রহস্য নেই।

ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন ভেঙে উঠে বসেই সে সামনে মাকে দেখতে পায়। দেখে অবাক হয়। এখনও কেন মায়ের হাতে শাঁখা, কেন চওড়া পাড়ের শাড়ি, কেন সিঁদুর? সে হাত বাড়িয়ে মার হাতটা ধরে বলে—মা, গয়ায় গিয়ে পিণ্ডিটা দিয়ে আসতে হবে। ভেবো না। বলে আবার মায়ের দিকে চায়। বড় বেভুল লাগে। স্পষ্টই একটু আগে চিতাটা জ্বলছিল। কোনও ভুল নেই।

ননীবালা বললেন—কার পিণ্ডি দিবি? কী বলছিস, ও রণো?

জাগ্রত রণেন তখন মার দিকে চেয়ে থেকে ভুলটা বুঝতে পারল। স্বপ্ন! অত স্পষ্ট স্বপ্ন কেউ দেখে? অত নিখুঁত? সে চারধারে চেয়ে দেখল, না এ তো স্বপ্ন নয়। এই তো সে জেগে আছে!

হঠাৎ দু-হাতে মুখ চাপা দিল রণেন। ননীবালা উঠে গিয়ে পাখাটা আরও বাড়িয়ে দিলেন।

রণেন জিজ্ঞেস সরল—বাবা কেমন আছে মা?

—কেমন আছে কী করে বলি! কতকাল তো আসে না।

—চিঠিপত্র পাওনি ইদানীং?

—কই! সে চিঠিপত্র দেওয়ার মানুষ কিনা।

রণেন বিছানা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে নেমে আসতে আসতে বলল—আমি বাবার কাছে যাব।

এমনভাবে বলল যেমন দু-বছরের ছেলে বায়না করে বলে।

—যাবি কি! আসবেখন সে নিজেই।

—না। মাথা নাড়ল রণেন। ঠোঁট কেঁপে গেল থরথর করে কান্নায় বিকৃত গলায় বলল—বাবা মরে গেছে মা। আমি এই মাত্র স্বপ্ন দেখলাম।

ননীবালা বড় চমকে গেলেন। স্বপ্ন! স্বপ্ন কী ফ্যালনা নাকি! কত কী হয়! ব্যগ্র হয়ে বললেন—কী দেখলি?

—ওঃ! বলে প্রকাণ্ড আন্ডারপ্যান্ট পরা চেহারাটা নিয়ে সামনে দাঁড়াল রণেন। দু-হাতে কচলে চোখ মুছতে মুছতে বলল—আমি বাবার কাছে যাব। আমার সঙ্গে চলো মা।

সেই থেকে বুক কাঁপছে ননীবালার। সংসারে আর কত অশান্তি বাকি আছে, তার খেই পান না। জন্মাবার পর থেকেই বুঝি তাঁর হেন মেয়েমানুষের তপ্ত কড়াইতে বাস করা শুরু হয়। এ-ধারে পাশ ফিরলেও ছ্যাঁক, ও-ধারে পাশ ফিরলেও ছ্যাঁক।

বলেকয়ে রণেনকে শান্ত করলেন বটে। রাতটা কাটল ভয়ে-ভাবনায়, দুশ্চিন্তায় পরদিন সাধের রান্না বাঁধতে রাঁধতে অন্তত তিনবার উঠে গিয়ে ট্রাংকুইলাইজার খেলেন। সঙ্গে একখানা অ্যাডোলফেন বড়ি। প্রেশারটা বেড়েছে বোধ হয়।

রণেনও সারাদিন অস্থির। কেবলই দীর্ঘশ্বাস ফেলে 'ওঃ হোঃ হোঃ' বলে চিৎকার করে। পায়চারি করতে করতে হঠাৎ থেমে বলে 'বাবা'! একবার ননীবালা শুনলেন রণেন ঘরে বসে 'মধুবাতা ঋতায়তে...' মন্ত্র বলছে। এত চমকে গিয়েছিলেন ননীবালা যে সেই সময়েই তাঁর স্ট্রোক হয়ে যেতে পারত। মাথাটা ঘুরে, বুক অস্থির করে, পেটে একটা গোঁতলান দিয়ে শরীরটা যেন হাতের বাইরে চলে গেল। একটু সময় দেয়ালে ঠেস দিয়ে সামলে গেলেন।

রণেন ঘুরে ঘুরে রান্নাঘরের দরজায় এসে মাকে দেখে যায়। চোখ দুটো করুণ ছলছলে।

শীলা ওরাও ব্যাপারটা আঁচ করছিল বোধ হয়। শীলা একবার চুপি চুপি এসে জিজ্ঞেস করল—দাদা আজ ওরকম করছে কেন মা?

ননীবালা মাথা নেড়ে বলেন—ওরকমই করে তো।

—আজ যেন বেশি অস্থির।

সব কথা পেটের মেয়েকেই কি বলা যায়? বিয়ের পর ও তো একটু পর হয়েও গেছে। কত কথাই চেপে রাখতে হয় ননীবালাকে। এই কথা চেপে চেপেই বুঝি একদিন দমবন্ধ হয়ে মারা যাবেন।

বললেন—শাড়িটা দেখেছিস?

—বউমা এনেছে। দাম-টাম জিজ্ঞেস করিনি। দেখাল, একবার দেখলাম।

শীলা একটু হেসে বলে—তুমি যা ভাবছ তা নয়। ওই শাড়ির কিন্তু অনেক দাম। বউদি কম দামি জিনিস আনেনি। গড়িয়াহাটায় সেদিন একটা দাম করেছিলাম, একশো কুড়ি টাকা চাইল।

মনটা হঠাৎ তখন ঠান্ডা হল ননীবালার। মেয়েটার মুখের দিকে চাইলেন, উঁচু পেটটা হাঁটুতে একটু চেপে বসেছে। মুখটায় শ্রীহীন কর্কশ ভাব, কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে আছে। ঠোঁট শুকনো। ননীবালা নিরীক্ষণ করে বললেন —তোর তো ছেলে হবে।

—বলছ?

—বলছি। ও আমরা বুঝতে পারি।

ভালমন্দে সাধের দিনটা কেটে যেতেই রাতে তিনি বীণাকে ডেকে বললেন—বউমা, রণেনটা বড় অস্থির।।

—শুনেছি। কেবল বাবার কথা বলছেন।

—কী করবে? ননীবালা জিজ্ঞেস করলেন।

—আমি তো যেতে পারব না, বাচ্চাদের ইস্কুল। বরং আপনি ওঁকে নিয়ে যান, বাবার কাছ থেকে ঘুরে আসুন। বেড়ানোও হবে। আর ওখানে এক ফকির সাহেব আছেন শুনেছি, ওষুধ দেন।

সেই ঠিক হল। তারপরই মায়ে-পোয়ে চলে এসেছেন।

এসে ফাঁকা ঘর দেখে বুকটা সেই থেকে হু-হু খরার বাতাসে জ্বলে যাচ্ছে যেন।

ঘরের কী শ্রী! মাচানের বিছানাটা দেখলেই তো কান্না পায়। গুটিয়ে রাখা তোশকটা ফালা ফালা হয়ে ছিঁড়ে তুলোর চাপড়া বেরিয়ে আছে। মশারিটা কয়েক জায়গায় সেফটিপিন আটকানো, ননীবালার চোখ ছল ছল করে।

রামভক্ত হনুমানের মতো জোড়হাতে সামনে দাড়িয়ে বহেরু কেবল—মাঠান, মাঠান, করে যাচ্ছে। তারদিকে বড় বড় চোখে চেয়ে ননীবালা একবার বললেন—বহেরু, তুই বড় পাপী। বামুন মানুষটাকে এইভাবে রেখেছিস!

বহুকাল পরে যেন ননীবালার বুকের মধ্যে মায়া-মমতা মাথা-তোলা দিল।

বহেরু মাটিতে বসে পড়ে দুর্বল গলায় বলে—ওনারে আমি রাখব! কি বলেন। কারও কড়ি ধারেন নাকি! বরং উনিই আমাদের রেখেছেন।

থাকবেন, না ফিরে যাবেন তাই নিয়ে মুশকিলে পড়েছিলেন ননীবালা। কিন্তু বুকের মধ্যে কু-পাখি ডাকছে। তাই দোনামোনা করে থেকে গেলেন। বহেরুর লোকজন সব ভেঙে এল সেবা-যত্ন করতে। ঘরদোর সাফ করা হল নতুন করে, একটু সাজানো হল। তার ফাঁকে কাকে বহেরু বলছিল—কাউবে ঘকে ঢুকতে দেন না। জিনিসপত্র কেউ ধরলে ভারী চটে যান।

ননীবালা শোনেন। মাঝে মাঝে বুকের মধ্যে অবোলা ভয় শ্বাসযন্ত্রকে চেপে ধরে—লোকটা বেঁচে আছে তো! ফিরবে তো!

এই করেই কেটেছে অসহ্য দিনটা। কাটতে কি চায়! মনে মনে কত মানত, কত ঠাকুরদেবতার কাছে প্রার্থনা করেছেন ননীবালা।

॥ পঞ্চাশ ॥

মাটির উঠানে সাদা রোদ পড়ে আছে। ধান সেদ্ধ করার জোড়া উনুন, বড় মেটে হাঁড়ি কয়েকটা। ঝিঙে মাচানে ফুলের যুদ্ধু লেগে গেছে। ভিতরের ঝুঁঝকো আঁধারে উঁকি দিলে দেখা যায় সুঠাম শিশুরা ফুল ছেড়ে বেড়িয়ে পড়েছে ঝাঁকে ঝাঁকে।

মাটির দোতলা বাড়ি। ওপরে খোড়ো চাল। উঠানে পা দিতেই মণ্ডলরা তিন ভাই খবর পেয়ে বেরিয়ে এল। সঙ্গে ছেলেপুলে। সব উপুড় হয়ে পড়ল পায়ে। মুখে ভক্তি মেশানো হাসি।

ব্রজগোপাল হাতজোড় করে বলেন—সব ভাল তো?।

—আপনার যজমান, ভাল রাখবেন তো আপনি। মোজোভাই একথা বলল। বি-এ পাস ছেলে, ইস্কুলে পড়ায়।

কথাটা শুনে ব্রজগোপাল খুশি হন। বাড়ির মায়েরা সব আসে। বড় বড় ঘোমটা, দূর থেকে না ছুঁয়ে প্রণাম করে। বাড়িতে একটা চাপা আনন্দের বিদ্যুৎ খেলা করছে।

বড় ভাইয়ের গায়ে কাপড়ের খুঁট জড়ানো। গোটা কয় শশা তুলে আনল পটাপট বাগান থেকে। মুখখানা হাসিতে ভিজে আছে। কপালে কণ্ঠায় ঘাম। মমতার চোখে চেয়ে থাকেন ব্রজগোপাল। এইসব তাঁর মানুষ। তাঁর সম্পদ। বুড়ো বামুনের নাম দিয়ে বেড়ান তিনি। বদলে এঁদের পান। আর কিছু নেই।

দোতলার মাদুর পেতে দেওয়া হয়েছে বারান্দায়। ব্রজগোপাল কাঠের মই বেয়ে উঠে এলেন। পোঁটলাটা পাশে রাখলেন। বাচ্চা একটা ছেলে পাড় লাগানো হাতপাখা টানতে লাগল বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে। অন্য হাতে ঢিলে পেন্টুল সামলাচ্ছে।

—পুরনো তেঁতুল চেয়েছিলেন সেবার। মনে করে আনলাম। বলে ব্রজগোপাল পোঁটলার মুখ খুলে শালপাতায় জড়ানো আফিঙের মতো কালো পুরনো তেঁতুল বের করে দেন। শুকিয়ে ঝুরঝুরে হয়ে গেছে, মুখে দিলে টক লাগে না, মিষ্টি।

—বড় মণ্ডল অবাক হয়ে বলে—মনে রেখেছেন! আমিই তো ভুলে গেছি।

—তোদের ভুলো মন, কাজেকম্মে থাকিস। আমার তো ভুললে চলে না, তোদের নিয়ে কারবার। তোর খুকির একটা সম্বন্ধও এনেছি। বাশুলী গাঁয়ে।

বড় মণ্ডল একটু ইতস্তত করে বলে—এখানেও একটা ছিল। গয়লা ঘোষ। নিজেরা প্রস্তাব পাঠিয়েছে।

ব্রজগোপাল একবার তাকান। বড় মণ্ডল চুপ করে যায়। ব্রজগোপাল ধীর গম্ভীর স্বরে বলেন—ওসব মাথা দিবি না। বিয়ে দেওয়ার মালিক তুইও না, আমিও না। বর্ণাশ্রম ভাঙবি কেন? যোগেযাগে এই ঘুরে বেড়াচ্ছি দেশ-দেশান্তর, কত বিয়ে ঘটাচ্ছি, এ বড় পুণ্যকর্ম, ঠিক ঠিক বিয়ে ঘটালে দেশের কাজ হয়। ঘটকরা একসময়ে

ভাল বামনুই ছিল। বর্ণে, গোত্রে, শিক্ষায়, চরিত্রে ঠিক বিয়েটি ঘটিয়ে দিত। সেইসবের জন্যই জাতটা এতদিন টিকে গেল। ঘটকালিতে পয়সা ঢুকে সর্বনাশ। বাশুলী গাঁয়ের পাত্রও ভাল, তোদেরই স্বঘর মাহিষ্য।

লোকটা তর্কটর্ক, কী প্রতিবাদ জানে না। একগাল হাসল, বলল—আজ্ঞে।

ওই হাসিটুকু দেখে ব্রজগোপাল ভরসা পান। দু-মাস তিন-মাস ফাঁক দিয়ে এলে দেখেন ব্যাটারা রাজ্যের অনাচারী কর্ম করে বসে আছে। সব ঠিকঠাক করে মেরামত করে দিয়ে যান। মানুষ যন্ত্রটাই সবচেয়ে গোলমেলে। বিগড়োলে, ভুল কাজ করে যেতে থাকে। তাই বার বার আসতে হয়। ঘুরে ঘুরে আসেন, ঘড়ির কাঁটার মতো। তবে গেঁয়ো লোক, বিশ্বাসটা বড় সরল। খুব বেশি খাটতে হয় না পিছনে। ধর্মভয়ে কথা মেনে চলে।

হাত পা ধুয়ে দু-টুকরো শশা মুখে দিয়ে বিশ্রাম করছেন। উনুনে আগুন দিয়ে দুটো ফুটিয়ে নেবেন একটু বাদে। দোলনায় একটা বাচ্চা ঘুমোচ্ছে। অন্য একটা মেয়ে দোলাচ্ছে দোলনাটা। ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ আসে। বীজমন্ত্র জপে একটু বাধা হয়। তারপর বীজমন্ত্রের স্পন্দনটা আপনই দোলনার শব্দের সঙ্গে মিলে গেল। চার অক্ষরী বীজমন্ত্রটা আর দোলনার ক্যাঁচকোঁচ শব্দ, এই দুইয়ে যেন একটু লড়াই চলল খানিক। তারপর দোলনার শব্দটা মিলিয়ে গেল। কলকাতার স্বামীচরণ মুখুজ্জে তার হাওড়ার লোহার কারখানায় একটা লোককে কুড়ি টাকা বেশি মাইনে দেয়। কারণ নাকি, লোকটা যখন হাতুড়ি পেটায় তখন সেই শব্দের মধ্যে স্বামীচরণ বীজমন্ত্রের ধ্বনি শুনতে পান। ব্যাপারটা এখন বুঝলেন ব্রজগোপাল।

সেজো মণ্ডল এক আণ্ডিল ডাব কেটে নিয়ে এল। ডাব কেটে কেটে এগিয়ে দেয়। ব্রজগোপাল দুটো ডাব খেয়ে বলেন—ও নিয়ে যা।

—এ ক'টা খাবেন না?

—পাগল নাকি! দশটা ডাব খেলে পেটে সহ্য হবে না।

—আগে কিন্তু খেতেটেতে পারতেন। বলে মেজো মণ্ডল দুঃখিত চিত্তে নিজে গোটা চারেক খেল, একটু ফিরে বসে।

আকাশের দিকে মুখ করে যোজন জুড়ে পড়ে আছে চিতেন ঠাকুর। চিত হয়ে পড়ে থাকে বলেই ব্রজগোপাল ওই নাম দিয়েছেন। লোকে বলে মা-বসুন্ধরা, ব্রজগোপাল বলেন চিতেন ঠাকুর। শনির মতো বদমেজাজি দেবতা। বুক চিতিয়ে পড়ে থাকে বটে ভালমানুষের মতো, কিন্তু বুকখানার মধ্যে নানা রসিকতার বাসা। ফুক করে শ্বাস ছাড়লেন তো বীজ ছাই হয়ে গেল, আবার চোখের ইশারায় মেঘ তাড়িয়ে আনলেন ভেড়ার পালের মতো, ভাসালেন সেবার।

মণ্ডলদের বুড়ো বাপ এখনও বেঁচে। খবর পেয়ে মই বেয়ে উঠে এল। রোগা মানুষ। বয়সের যেন গাছপাথর নেই। উবু হয়ে সামনে বসে পড়ল। আজকাল একটু ভীমরতি হয়েছে। বলল—ছেলেরা বোরো চাষ দিয়েছে। মানা শুনল না। মাঠ দেখে এসেছেন? সব লাল হয়ে গেল। বীজধানটাই নষ্ট।

ব্রজগোপাল ব্যাপারটা জানেন। খরায় তিনটে-চারটে বড় পুকুর যখন মজে এসেছে তখন তাইতে বোরো লাগিয়েছিল মণ্ডল ভাইরা। বোরো চাষে জল লাগে। তাই খুব বুদ্ধি খাটিয়ে মজা পুকুরে চাষ দিয়েছিল। তলানি জলটুকু চোঁ করে টেনে নিয়েছে চারাগাছ। তারপর এখন শুকনো টনটনে হয়ে খরখর শব্দ তুলছে হাওয়ায়। বহেরুর মতো বড় চাষা এরা নয় যে পাম্পসেট কিনবে, কী ডিপ টিউবওয়েল বসাবে। আগের বার ব্রজগোপাল

দেখে গেছেন তিন পো পথ দূর দিয়ে খাল গেছে। সেখান থেকে খাত কেটে আনা যায়। বড় মণ্ডল বলল—তা অন্যের জমির ওপর দিয়ে নালা কাটতে দেবে কেন?

ব্রজগোপাল বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন—জমির মালিকদের বলেকয়ে দেখেছিস? সবার সঙ্গেই কী তোদের ঝগড়া নাকি?

বড় মণ্ডল মাথা চুলকে বলেছিল—তা বলিনি বটে। কিন্তু লোকের মন বুঝি তো, জমি ছাড়বে না।

ব্রজগোপাল বলেছিলেন—ছাড়বে। ছাড়াতে জানতে হয়। তোরা ব্যাটা কেবল স্বার্থের সময়ে লোকের খোঁজ করিস। এমনিতে খবর বার্তা নিস না। নিজেদের সামলাতে ব্যস্ত। পরের জন্য তোর যদি কিছু করা থাকে তো দরকারেও পরেই এসে বেগার দিয়ে যাবে। পাঁচহাত জমি ছাড়া তো কোনও ত্যাগই না। যা গিয়ে লোককে বোঝা গে, জল আনলে তাদেরও জমি সরেস হয়। আর বছর সীতাশাল ধান করা চাই।

কিন্তু কোথায় নালা! কোথায় কী? বোরো গেছে, বৃষ্টি না হলে বড় চাষও যাবে। চিতেন ঠাকুরের মতলব এবার ভাল না। টেরা চোখে চায় যদি! পরিবেশটা অনুকূল করে নিলে মানুষের কষ্ট থাকে না। প্রকৃতির সবদেওয়া আছে, মানুষে মানুষে আড় হয়ে সব নষ্ট করে। এইটে কতবার বুঝিয়েছেন, ওরা ভুলে যায়। লোককে সেবা দিয়ে সাহায্য দিয়ে নিজের মানুষ করে নিতে হয়। পরিবেশের রসকষ টেনে বেঁচে আছিস, পরিবেশটাকে রসস্থ রাখতে হবে না? নইলে ছিবড়ে হয়ে গেলে পরিবেশ তো রস ওগরাবে না, বাঁচবি কাকে নিয়ে?

বুড়ো মণ্ডল কপালে হাত চেপে কোঁকানির শব্দ করতে করতে বলে—আপনার চিতেন ঠাকুর আমাকে স্বপ্নে দেখা দেয়। বলে, মাটির সতীত্ব নাশ করেছিস হারামজাদা, ফসলে বিষ দিলি, নিজেরাই খেয়ে আস্তে আস্তে মরবি। তা বাবামশাই, পোকাও লাগে বটে। জন্মে এত পোকা দেখিনি।

ব্রজগোপাল বিরক্তির শব্দ করেন। চিতেন ঠাকুরের আর কাজ নেই, বুড়ো মণ্ডলকে স্বপ্নে পেয়ে গুহ্যকথা সব বলতে গেছেন। তবু ওর মধ্যে একটু সত্যি কথা আছে।

বুড়ো মণ্ডল বলে—ভয়ানক স্বপ্ন বাবা। শশা কাটছি তাতে পোকা বিজবিজ, আলু কাটছি তো পোকা বিজবিজ, রসাল চেহারার ঝিঙে কাটলুম তো ভিতর থেকে ঝুরঝুরিয়ে পোকা বেরিয়ে গেল হাসতে হাসতে। এই স্বপ্ন। তারপর দৌড়ে এসে দোলনার খোকাটাকে তুলতে গিয়ে দেখি তারও চোখে কানে নাকে মুখে পোকা থিকথিক করে ধরেছে। কী ভয়ানক বলুন দিকি। ওই যে সব কেমিকেলি সার দেয়, কলের লাঙল দিয়ে চাষ, বিষ ছড়ায়, ও হচ্ছে চিতেন ঠাকুরের বুকে হাঁটু দিয়ে ফসল আদায়। ওইতেই ঠাকুর ক্ষেপে যান। পচানো সার, বৃষ্টির কি খালের জল, কাঠের লাঙলে হেলেবলদ—এই হল গে লক্ষ্মীমন্ত চাষ। জোর করে ফসল ফলালে মাটি রক্ত উগরে দেয়। ভাল হয় না তাতে। না কি বলেন?

ব্রজগোপাল হাসেন। পুরনো দিনের লোক বুড়োমণ্ডল। সেই হেলেবলদে চাষ ভুলতে পারে না। তবে পোকার উপদ্রব বাড়ছে বটে। কেমিক্যাল সারের জন্যই।

জলের ব্যবস্থা একটা করে দিয়ে যেতে হয় এবার। বড় ভাইকে ডেকে বলেন—জলের কী করলি?

—উরেব্বাস, জল নিয়ে মারামারি। খাল থেকে জল চুরি যাচ্ছে। সেই নিয়ে মারদাঙ্গা। আমরা সে সবে গেলাম না এবার। বোরোটা ক্ষতি হল।

জলের কথাটা সারাদিন বসে ভাবেন ব্রজগোপাল। এই বুদ্ধিহীন যজমানগুলি ভেসে না যায় দুর্দিনে। গ্রাম ঘুরে কথাটথা বলেন লোকজনের সঙ্গে। লোকের তেমন গা নেই। যে যার ধান্ধায় আছে।

পরের দিন বড় আর ছোট দুভাই ব্রজগোপালকে তুলে দিতে এল বাসরাস্তায়। বাসের দেরি আছে, ব্রজগোপাল দুভাইকে দুদিকে নিয়ে বসেন গাছতলায়। বলেন—চাষবাস যো হোক গে, মানুষকে বুকে ঠেসে ধর, মানুষগুলোকে যদি অর্জন করতে পারিস তো তোদের ভাত উপচে পড়বে, এই বেলা মেখে ফ্যাল বাবা, একটু মিষ্টি কথা, একটু, হাসি, একটু দরদ সিঁচে সিঁচে দিয়ে মেখে ফ্যাল মানুষগুলোকে। খুব আকাল যখন আসবে তখন পাশে দাঁড়ানোর মতো জন পাবি।

—আকাল কি আসবেই?

—আসবেই।

ইদানীং কী হয়েছে। বাসায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না। বাস গোবিন্দপুরমুখো চলেছে। কিন্তু কেবলই সেই খুপরিতে গিয়ে উঠতে একটা অনিচ্ছা হতে থাকে। মাঝরাস্তায় শিবপুরে নেমে পড়েন। এখানেও যজমানদের বাড়ি। দিন সম্পূর্ণ হয়ে সন্ধ্যা লাগছে। তবু কিছু চিন্তা হয় না। পৃথিবীটা বেশ বড়সড় হয়ে উঠছে আজকাল। মাধ্যাকর্ষণ কি বেড়ে গেল এক লহমায়? মাঝে মাঝে ভাবেন, শেষ দিনটা আসার আর বুঝি দেরি নেই। তাই এত মায়া ভাবতে এখন আনন্দই হয়। মরে যেতে তেমন কষ্ট হবে না। তবে কাজ ঢের বাকি রয়ে যাবে না কি?

একটা ঢিবির উপর উঠে দাঁড়ান তিনি। বেশ জায়গাটা বাঁ ধারে একটা বাঁশবন। অবিকল পুজোর ঘণ্টার শব্দ করে একটা ঘন্টানাড়া পাখি ডেকে চলেছে। তপ্ত দিনের শেষে ঝিল থেকে ভাপ উঠে আসছে। তাতে জোলো গন্ধ। নিথর জলে একটা ডিঙি দাঁড়িয়ে আছে। তাতে একটা কালো মানুষ পিঁপড়ের মতো দাঁড়িয়ে, তার পিছনেই গলিত সোনার ঝোরা গলে গলে জলে মিশে যাচ্ছে। কী অপরূপ সন্ধ্যা। ব্রজগোপাল দাঁড়িয়ে থাকেন। তারা ফোটা দেখেন। ওই যে মেঘখণ্ডের ওপর তারা, ব্রাহ্মীমানুষেরা ওইরকম।

দু-দিনের নাম করে বেরিয়েছিলেন। ফিরে এলেন সাত দিন পরে।

বাড়ির হাতায় পা দিতে না দিতেই বহেরুর নাতি এসে হাঁটু পেঁচিয়ে ধরল—ও দাদু, একটা ধাপানী লাট্টু কিনে দেবে?

বাচ্চা সবে বেড়ে উঠেছে। ব্রজগোপালকে পেলে আর ছাড়তে চায় না। গায়ে গায়ে পুলটিশের মতো লেগে থাকে। কোথা থেকে সব আসে, কোন শূন্য থেকে শরীর ধারণ করে। জন্মে এক লহমায় পৃথিবীতে চারদিকে মায়ার আঠা মাখিয়ে দেয়। এই সেদিনও এটা ছিল না, আর আজকে কী গভীরভাবে আছে!

ব্রজগোপাল ছাড়িয়ে দিতে দিতে বলেন—দেব রে দাদা।

—মুকুন্দর দোকানে পাওয়া যায়।

—দেবখন। হাত মুখ ধুই, কাপড়-টাপড় ছাড়ি, কী লাট্টু বললি?

—ওই যে সুতো বাঁধা চাকতি, ছুঁড়ে দিলে ফের হাতে চলে আসে পালটি খেয়ে।

—বটে! তাজ্জব জিনিত তো!

ছেলেটা করুণ মুখ করে বলে—কিনে দেবে?

—তুই আমাকে কী দিবি তোর বদলে?

—পুজোর ফুল তুলে দেব সকালে। সাদা ফুল।

—যে ছড়াগুলো শিখিয়েছিলাম, বল তো! মনে আছে?

ছেলেটা একগাল হেসে মাথা নাড়ে। গম্ভীর হয়ে দাঁড়ায়। একটু দোল খেয়ে বলে—মানুষ আপন, টাকা পর, যত পারিস মানুষ ধর। ধর্মে সবাই বাঁচে বাড়ে, সম্প্রদায়টা ধর্ম না রে। মাতৃভক্তি অটুট যত, সেই ছেলেই কৃতী তত। মুখে জানে, ব্যবহারে নাই, সেই শিক্ষার মুখে ছাই। বাঁচা বাড়ার উলটো চলে, ম্লেচ্ছ জানিস তাদের বলে।

আরও চলত। ব্রজগোপাল থামালেন। হাঁটতে হাঁটতে প্রায় দোরগোড়ায় এসে পড়েছেন, ছেলেটা বলল ——দাদু, তোমার মা বড় রাগী।

—কে রাগী? ব্রজগোপাল জিজ্ঞেস করেন।

—তোমার মা। কাল এসেছে তো! তোমার ঘরে আমার সব খেলনাপত্র রেখেছি, যতবার নিতে যাই বকে দেয়। আর একটা মোটা মানুষ এসেছে, সেও ভারী রাগী। হাসে না।

ব্রজগোপাল বুঝতে পারলেন না কে এসেছে। মা? মা সেই কবে চলে গেছেন পৃথিবী ছেড়ে।

কপাট ভিতর থেকে বন্ধ। শেকল নাড়া দিলেন ব্রজগোপাল। বুকের মধ্যে কেমন একটা উলটো রক্তস্রোত বইছে। কে এল! কে এল!

—কে? একটু গম্ভীর বয়স্কা নারীকণ্ঠ সাড়া নেয়।

ও স্বর ভুলবার নয়। কতকাল বাদে এতদূর আসতে পারল মানুষটা। কোনওদিন আসবে না, ভেবেছিলেন ব্রজগোপাল।

—আমি। বলতেই গলার স্বর একটু কেঁপে গেল। প্রদীপের শিখা যেমন দোল খায়।

ননীবালা দরজা খুলে সামনে থেকে সরে গেলেন। ঘোমটা টেনে কপাল ঢেকে বললেন—এই এলে?

—হুঁ।

—আমি আর রণো কাল থাকে বসে দুর্ভাবনায় মরে যাচ্ছি। দু-দিনের নাম করে সাত দিন! এরকমই চলছে বুঝি আজকাল? দেখার কেউ নেই।

ব্রজগোপাল ঘরে ঢুকে দেখেন, তাঁর বিছানায় রণেন ঘুমোচ্ছে। একবার তাকালেন সেদিকে। তারপর ননীবালার দিকে ফিরে বললেন—কে থাকবে?

ননীবালা মুখটা ফিরিয়ে নিলেন।

॥ একান্ন ॥

ঠিক দুপুর বেলাতেই সুভদ্র আসে আজকাল। দুপুরটাই নিরাপদ সময়।

শীলার ইস্কুলের গ্রীষ্মের বন্ধ শেষ হয়ে এল। দুপুরে সে ঘুমোয় না ঠিক। শুয়ে থাকে। ঘুমোবে কি? পেটের মধ্যে ছেলেটা ফুটবল খেলছে সব সময়ে। কলকল করে জল নড়ে। ছেলেটা মায়ের শরীরের মধ্যে সাঁতরায়। ছেলেটা কি খেলোয়াড়ই হবে, নাকি সাঁতারু। এই ছেলে জন্মাবে, বড় হবে, বিয়ে করে বউ আনবে। ভাবা যায়? শীলা নিজের মুখ চেপে ধরে। মনটাই অলুক্ষুণে, উঠে পড়ে। ঘরদোরে ঘুরে ঘুরে জিনিস নাড়ে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখে, একটু হাঁটাচলা করে। আর ক'টা দিন। তারপর ইস্কুল খুললে দুপুরটা আর একা লাগবে না।

লাগেও না। সুভদ্র প্রায়ই আসে। কড়া নাড়ে না। বাইরে থেকে এ রকম শিসের শব্দ করে। দোর খুলে প্রায়ই শীলা বিরক্ত ভাব করে ভ্রূ কুঁচকে তাকায়। বলে—ও কী অসভ্যতা। শিস দিয়ে ডাকে কেউ? পাঁচজনে কী মনে করবে?

পাঁচজনের মনে করাকরি নিয়ে ভাবতে বয়ে গেছে সুভদ্রর। সে একথা শুনে কেবল হাসে। দাড়িটাড়ি বড় একটা কামায় না, মাঝেমধ্যে গালে ঝোপঝাড় গজায়, চুল বেড়ে হিপি হয়ে যায়। ইচ্ছে ক'রে করে না এসব, আলসেমি ক'রে করে। সাজুক বা না সাজুক, দাড়ি থাক বা নাই থাক, ও জানে সব অবস্থাতেই ওকে দারুণ সুন্দর দেখায়। গার্লস স্কুলে ওকে চাকরি দেওয়াটা খুব বিপজ্জনক কাজ হয়েছিল।

শীলা ওকে বাইরের ঘরে বসিয়ে শোওয়ার ঘরে চলে আসে। আয়নায় মুখখানা দেখে। কী শ্রী হয়েছে! চেনা যায় না। পেতনি একটা। চুলটা ফেরায়, মুখটা মুছে নেয়, পাউডারের পাফটা একটু বুলিয়ে নেয়, ব্লাউজটা পালটায় কখনও-সখনও। এটুকু করতেই হয়। মনে পাপ নেই। তবু।

ধৈর্যশীল সুভদ্র ততক্ষণ বসে থাকে। শীলা ফের ঘরে আসতেই বলে—কেস্ পাচ্ছি না এজেন্সিটা চলে যাবে।

—খাটতে হয়।

—খাটি না নাকি! সারাদিন ঘুরছি। গোটা কয়েক বড় কনসার্নে স্যালারি সেভিংস ধরতে পারলে খুব কাজ হত। কিন্তু কোনও জায়গাতেই চান্স পাচ্ছি না। সব জায়গায় আগে গিয়ে কে যেন কাজটা অলরেডি করে ফেলেছে। আমি লেট লতিফ।

শীলা মৃদু হেসে বলে—দুপুরে রোজ তো এখানে এসে আড্ডা হয়। ঘোরেন কখন?

সুভদ্র বলে—ইস্, রোজ নাকি? তাহলে আর বরং আসব না। উঠি।

শীলা পা নাচায়। নিশ্চিন্ত মনে বলে—রোজ না হোক, প্রায়ই।

—ঠিক আছে, আর আসব না।

—আসতে কে বারণ করেছে? এসে কাজের কথা তুলে গুচ্ছের মিছে কথা না বললেই হয়। আসলে এজেন্ট মানে তো দালাল, ওসব করতে আপনার ভাল না লাগবারই কথা।

সুভদ্র হাসে, বলে—ভাল লাগে না কে বলল! ঘুরতে ঘুরতে কত লোকের সঙ্গে আলাপ হয়! বেশ লাগে।

—তবে হচ্ছে না কেন?

—হবে কী করে! যাঁদের পলিসি করার তারা সব তিন চারটে করে পলিসি করে ফেলেছে। যারা করেনি তারা অন প্রিন্সিপল করবে না। তার ওপর এখন ব্যাঙ্কে রেকারিং ডিপোজিট-টিট করে এল আই সি-র পপুলারিটি কমিয়ে ফেলেছে। বললাম না, আমি সব জায়গায় লেট লতিফ।

শীলা হারের লকেকটা মুখে তুলে বলে—তা হলে কী করবেন?

—ভাবছেন কেন? কিছু একটা হয়ে যাবে।

এই রকমই সব কথা হয়। নির্দোষ কথা। কেউ সাক্ষী থাকে না অবিশ্যি। ঝি-মেয়েটা ঘুমোয়। পড়শিরা কেউ কান পাতে না। চারদিকে তবু কী যেন একটা ওত পেতে থাকে। লাফ দেবে, ছিঁড়ে খাবে। ঘরসংসার ভেঙে ফেলবে। বাতাসে তড়িৎক্ষেত্র রচিত হয়।

ভাল নয়। ভাল নয়। তবু কী ভীষণ ভাল!

কদিন আগে শীলার স্কুলে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা হয়ে গেল। গার্ড দেওয়ার লোকের অভাব ছিল না। কিন্তু মুশকিল হল, আজকাল মেয়েরা পরীক্ষা দিতে যখন আসে তখন তাদের সঙ্গে আসে ছেলে-বন্ধু, প্রেমিক বা পাড়ার দাদারা। বাইরে থেকে তারা হামলা করে, শাসায়, স্কুলের ঘরে ঘরে এসে অনায়াসে ঢুকে যায়। বড় দিদিমণি যদিও খুব কড়া লোক, তবু এ এবস্থায় তেমন কিছু করতে পারেন না আজকাল। পুলিশ পাহারা দিচ্ছে, তার মধ্যেই বাইরের ছেলেরা ঢুকছে স্কুলে, বাইরে থেকে নকল পাচার করছে ভিতরে।

সুভদ্রর তেমন কোনও কাজ নেই, তাই শীলা বড় দিদিমণিকে গিয়ে বলল—সুভদ্রকে গার্ড দেওয়ার জন্য ডাকুন না। ও তত বেকার বসে আছে। এক-আধজন পুরুষমানুষ থাকলে আমাদের সুবিধে হয়।

বড় দিদিমণি রাজি হলেন, এবং সুভদ্র গার্ড দিতে এল।

পরীক্ষার গার্ড দেওয়া বড় একঘেয়ে কাজ। কেবল ঘুরে বেড়ানো, কাগজ দেওয়া, স্টিচ করা, আর মাঝে মাঝে মৃদু ধমক দেওয়া। সময় কাটে না। কিন্তু সুভদ্র এল বলে চমৎকার কাটছিল সময়টা। যে তিনটে স্কুলে সিট পড়েছিল তার মধ্যে দুটো স্কুলই সুভদ্রর পাড়ার। প্রায় সবকটি মেয়ে ওকে চেনে। পরীক্ষা শুরু হওয়ার তিন দিনের দিন সুভদ্র স্কুলে পা দিতেই চারদিকের মেয়েদের মধ্যে চাপা বিদ্যুৎ খেলে গেল। তারপরই ডাকাডাকি—মিন্টুদা, এদিকে আসুন। মিন্টুদা, কোশ্চেন বুঝতে পারছি না। মিন্টুদা জল খাব। এমনকী বাইরে যে সব ইতর টাইপের ছেলে রোজ এসে জড়ো হয় তারাও হকে নকে এসে সুভদ্রকে ডাকাডাকি করে, গোপনে কথা বলে, খাতির জমানোর চেষ্টা করে। সুভদ্র তাদের তাড়া দিলে চলে যায়।

পাড়ায় যে সুভদ্রর যথেষ্ট প্রতিপত্তি তা বুঝতে কষ্ট হয় না। মেয়েরা পরীক্ষা দিতে দিতেও অনেকে মুখ তুলে সুভদ্রর দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতের হাসি হাসে, ছলে ছলে তাকে ডাকে, অকারণে কথা বলে। শীলার ভিতরটা জ্বালা করে ধিংগী মেয়েদের কাণ্ড দেখে। কী নির্লজ্জ বাবা! কোমরে আঁচলের আড়ালে, ব্লাউজের ফাঁকে সব বইয়ের পাতা, চোথা কাগজ নিয়ে বসেছে। তবু সিকিভাগ মেয়ে লিখতেই পারছে না। কিছুই পড়েনি,

কোথা থেকে টুকতে হবে তাও জানে না। কলম কামড়ে বসে থাকে তখনই তাদের কারও কারও সুভদ্রকে বড্ড বেশি দরকার হচ্ছে। মিন্টুদা, ও মিন্টুদা।

অবশেষে শীলা একদিন ঠাট্টা করে বলল—মিন্টুদা, আপনি হল্-এর বাইরে থাকুন। নইলে বড্ড মিস ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে।

সুভদ্র গাঢ় চোখে তাকিয়ে বলে—দোহাই, ওদের একটু লিখতে-টিখতে দিন। ওদের অনেকের একমাত্র ভরসা হায়ার সেকেন্ডারির সার্টিফিকেটখানা। আপনারা কড়া হলে ওদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

শীলার এটা সহ্য হয় না। ডিসিপ্লিন জিনিসটাকে সে বুক দিয়ে ভালবাসে। স্কুলে তারা ভীষণ ডিসিপ্লিন মেনে চলে। ক্লাস ফুরিয়ে গেলেও সবাই সাড়ে চারটে পর্যন্ত স্কুলে থাকে, আগে বেরোয় না। অ্যানুয়েল পরীক্ষার পর যখন ক্লাস থাকে না, তখনও তারা স্কুলে বসে এগারোটা থেকে সাড়ে চারটে পর্যন্ত উল বোনে, গল্প করে, তবু আগে চলে যায় না। মেয়েদের ব্যাপারেও তাই। ইউনিফর্ম ঠিক না থাকলে, ক্লাস-ওয়ার্কের খাতা না আনলে, কিংবা এ-রকম সামান্য কোনও ত্রুটি বিচ্যুতি হলে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়।

সুভদ্রর উদার নীতি দেখে তাই শীলা রেগে গিয়ে বলে—আপনাকে ডেকে আনাই ভুল হয়েছিল সুভদ্র।

সেই রাগ থেকেই শীলা একদিন একটা মেয়ের খাতা কেড়ে নিল। বের করে দিল ঘর থেকে। মেয়েটা প্রথমে শীলার সঙ্গে তর্ক করল, তারপর মিন্টুদার খোঁজ করল। সুভদ্র ছিল নীচের তলার ঘরে, তাই তাকে ডেকে না পেয়ে সোজা গিয়ে বাইরের ছেলেদের কাছে নালিশ করল। তারপরই ইস্কুলে ঢিল পড়তে শুরু করে, সেই সঙ্গে শাসানি। মেয়েটার গার্জিয়ান পরিচয় দিয়ে এক বয়স্কা মহিলা দুজন ছোকরাকে নিয়ে এসে শীলাকে ঘিরে কী তম্বী! সেই হাঁকডাক শুনে হেডমিস্ট্রেস উঠে এলেন, অন্য দিদিমণিরাও। কিন্তু মিটমাট করতে পারছেন না। এমন সময় সুভদ্র উঠে এল। শীলাকে সরিয়ে নিজে দাঁড়াল প্রতিপক্ষের মুখোমুখি। দুমিনিটে মিটিয়ে দিল ব্যাপারটা। মেয়েটি ফের এসে বস্‌ল পরীক্ষা দিতে।

ইস্কুলে একটা ছোট্ট ঘর আছে তিন তলার ল্যাবরেটরির পাশে। তাতে মেয়েদের গান বাজনা শেখার বাদ্যযন্ত্র থাকে, প্রাইমারি সেকশনের অফিস হয় সকালে। সেই ঘরে এসে শীলা টেবিলে মাথা রেখে কাঁদছিল। কী অঝোর কান্না! সেই মেয়েটা বা তার গার্জিয়ানের ওপর ততটা নয়, যতটা রাগ বা অভিমান তার সুভদ্রর ওপর। ও কেন এসে মাঝখানে পড়ল? ওর জন্যই তো নষ্ট হচ্ছে পরীক্ষা, আবহাওয়া দূষিত হয়ে যাচ্ছে।

একা ঘরে কাঁদতে কাঁদতেই টের পেল সুভদ্র এসেছে। ওর লজ্জা সংকোচ কিছু কম, সাহস বড্ড বেশি। পিঠে অনায়াসে হাত রাখল সে, বলল—এ মা, ছি ছি! কাঁদছেন কেন?

শীলা এক ঝাপটায় হাত সরিয়ে দিয়ে ফণা তুলে বলল—আপনি যান। আর ভালমানুষ সাজতে হবে না।

সুভদ্র গেল না। উলটোদিকের চেয়ারে বসল মুখোমুখি। শীলা কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। অভিমানের বান ডেকেছে বুকে। কান্না কি ফুরোয়? টেবিলের ওপর তার পড়ে-থাকা একখানা হাত দুহাতে ধরে সুভদ্র গাঢ় স্বরে বলল—ক্ষমা চাইছি, লক্ষ্মী মেয়ে। কাঁদে না। আপনি বরং আমাকে একটা চড় মারুন, বা যা খুশি করুন। তবু প্লিজ শান্ত হোন। আপনি কেন বুঝতে পারছেন না যে দিনকাল পালটে গেছে! যে কোনও স্কুলে গিয়ে দেখে আসুন, সকলের চোখের সামনে আনফেয়ার মিনসে চলছে। আপনি আমি ঠেকাব কী করে!

শীলা অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাল। মুখ তুলে বলল—আপনি ঠেকাচ্ছেন না কেন? আপনাকে তো ওরা চেনে, মানে।

সুভদ্র চুপ করে চেয়ে রইল একটু। তারপর চমৎকার দীনতার হাসি হেসে বলে—ওটা আপনার ভুল ধারণা। ওপর ওপর খাতির দেখাচ্ছে ঠিকই। কিন্তু যদি আমি কড়া হওয়ার চেষ্টা করি সঙ্গে সঙ্গে মস্তানদের ছুরি বেরোবে, বোমা ফাটবে। আপনি তাই চান?

না শীলা তা চায় না। তবু চুপ করে অভিমানভরে বসে রইল। উত্তর দিল না।

সুভদ্র ফের বলে—তা ছাড়া, আমি ওদের প্রতি সিমপ্যাথিটিক। জানি তো আমাদের এডুকেশনটা একটা ফোর্স। সেই প্রহসনের স্বরূপটা এবার লোকে ভাল করে জেনে যাক। দেশ-বিদেশে রটে যাক, এ দেশে শিক্ষার নামে কী চলছে। আপনি বাধা দেবেন না।

শীলা আর বাধা দেয়নি। বরং গার্ড দেওয়ার ছলে ঘুরতে ঘুরতে সুভদ্রর সঙ্গে আড্ডা মেয়েছে করিডোরে, বারান্দায়, তেতলার নির্জন ঘরে। মেয়েরা সুভদ্রকে ডাকলে খুব বিরক্ত হয়েছে। কী এত কথা ওদের সুভদ্রর সঙ্গে! কেবল মিন্টুদা, আর মিন্টুদা!

বলেছে—মেয়েরা আপনাকে অত খোঁজে কেন?

সুভদ্র হাসে, বলে—হিংসে হচ্ছে?

কী অকপট কথা! হিংসে! হিংসেই তো। শীলা তাই লজ্জায় লাল হয়।

সুভদ্র তখন বলে—পাড়ায় সবাই চেনে, তাই ডাকে। জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করে নেয় আর কী, পড়াশুনো তো করে না।

বড্ড বেশি উদার আপনি।

ভীষণ অসভ্য হয়ে গেছে সুভদ্র আজকাল। সাহসও বেড়েছে। প্রশ্রয় পায় তো। তাই দিব্যি চোখ হেনে বলল-কারও উদারতা বাড়ছে, কারও উদর।

শুনে শীলা লুকোবার পথ পায় না। হাতে একটা সাবমিট করা খাতা ছিল, পাকিয়ে হাতে নিয়ে ঘুরছিল, সেইটি দিয়ে ঠাস ঠাস মারে সুভদ্রকে। আর তখন একটা তাৎক্ষণিক আবেগে সুভদ্র একটা কাণ্ড করে ফেলেছিল, স্কুলের মধ্যে। চারদিকে লোকজন। তিনতলার নির্জনতা খুবই ক্ষণভঙ্গুর তখন, যেকোনও সময়ে লোকজন চলে আসতে পারে। তবু দুরন্ত পুরুষটি দু-হাতে খামচে ধরল কাঁধ, বুকের মধ্যে টেনে নিল। শীলা ঢেওয়ের মতো পড়ে গেল বুকের মধ্যে। তারপর তীব্র বিস্ময় অসহ্য একটা ধাঁধার মধ্যে সুভদ্রর জ্বরতপ্ত শুকনো ঠোঁট একপলকের জন্য স্পর্শ করেছিল তার গাল। শীলা পালিয়ে এসেছিল।

পরে দেখা হতে বলেছিল—আপনার সঙ্গে আর মিশব না।

সুভদ্র যথেষ্ট লজ্জিত, ভীত। চোখে আনত দৃষ্টি। খুব ভয় পেয়েছে। শীলা মনে মনে খুশি হল। কিন্তু ওর অত ভয়ের কী? 'মিশব না' কথাটা মুখের কথা মাত্র, কি কি ও বোঝে না? শীলার মুখে যে প্রশ্রয়ের হাসি, চোখে যে উজ্জ্বল দৃষ্টি তা কি অন্য কথা বলে না!

সুভদ্র আসে ঠিক দুপুরবেলায়। প্রচণ্ড গরমের দুপুর। বসে থাকে দরজা জানালা বন্ধ- করা শীলাদের ঠান্ডা বৈঠকখানায়। শীলা মুখোমুখি। রাজ্যের আজেবাজে কথা হয় দু-জনের। যা বলে না তা বুঝে নিতে কারও অসুবিধে হয় না।

শীলা জানে, শীলা ওকে ভালবাসে। ভীষণ ভালবাসে। বলে না। দরকার হয় না। সুভদ্র জানে সুভদ্র ওকে ভালবাসে। বলে না। দরকার কী?

অজিত আজকাল বড্ড ব্যস্ত। অফিসে তেমন কাজকর্ম নেই। আজকাল খুব ম্যাজিকের শো করার ডাক পায়। কথা ইংরেজি, হিন্দি আর বাংলায় আজকাল অনর্গল ম্যাজিকের প্যাটার বলে যেতে পারে। 'শো' করে স্কুল-কলেজে, ক্লাবে, পাড়ায়। বার দুই খবরের কাগজে ছোট্ট করে তার ম্যাজিকের খবর বেরিয়েছে। সবাই বলে, এবার নিউ এম্পায়ার বা আকাদেমি হল ভাড়া করে নিজের শো করতে। তাতে বড় করে খবর বেরোবে, জাতে উঠে যাবে। অজিতের ইচ্ছে করে না।

ম্যাজিক দেখানোর খবরটা কোন চিঠিতে যেন লক্ষ্মণকে লিখেছিল অজিত।লক্ষ্মণ জাহাকে এক প্যাকিং বাক্স ভরতি ম্যাজিকের জিনিস পাঠিয়েছে। নানারকমের তাস, জাম্বো কার্ড, হরেক অ্যাপারেটাস। সেইসঙ্গে কালো একটা ম্যাজিসিয়ানের স্যুট, টুপি সমেত। কাস্টমস থেকে বাক্সটা চাড়িয়ে এনে গলদঘর্ম হয়ে কদিন জিনিসগুলো নিয়ে ম্যাজিক অভ্যাস করল সে। কিন্তু বড্ড ক্লান্তি লাগে। তার ভাগ্য কেন তাকে ম্যাজিসিয়ান হওয়ার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কেন? জনতার সামনে দাঁড়িয়ে অবিরল মুখস্ত প্যাটার বলে যেতে যেতে, চোখমুখের নানা মেধাবী ভঙ্গি করে অবিরল ম্যাজিক দেখাতে তার ইচ্ছে করে না। তবু দেখাতে হয়। আজকাল সে ম্যাজিক দেখালে টাকা পায়। গত বছর পর্যন্ত পঞ্চাশ-ষাট টাকা পেত একটা 'শো'য়ে। এ-বছর দুশো তিনশো টাকা না চাইতেই অগ্রিম দিয়ে যায় তোক। এও একটা ঝামেলা। টাকা দিলে ফেরানো যায় না। নিতে হয়। টাকার প্রয়োজন তো ফুরোয় না কখনও। কিন্তু ওই টাকাটাই তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলছে ম্যাজিকের সঙ্গে। কিন্তু জীবনের কোথাও কোনও ম্যাজিক নেই, রহস্য নেই। সব রহস্য যেন তার জানা হয়ে গেছে। তাই বিস্বাদ।

॥ বাহান্ন ॥

কুমুদ বোস একদিন বলেছিল—ম্যাজিসিয়ান, তুমি শালা কী আর ম্যাজিক জানো? কুমারস্বামীর কাছে নিয়ে যাব তোমাকে একদিন, ব্যোমকে যাবে। তার হাতের পাঁচ আঙুলে গ্রহ-তারা নড়েচড়ে।

অজিত আগ্রহ বোধ করে না। কুমারস্বামীর কথা সে আগেও শুনেছে। অফিসের অনেকেই তার কাছে যায়। সেনদা এম এসসি পাশ, সায়েন্স কলেজে রিসার্চ করত, সেও একদিন এসে বলেছিল—ওরকম সিদ্ধপুরুষ দেখিনি। মিনিস্টার, বড় বড় মার্চেন্ট, ফিলমের লোকজন সব মাছির মতো জমে আছে। আমি ঘরে ঢুকতেই নাম ধরে ডেকে বলল— এতদিনে আসার সময় পেলি?

অজির হেসেছে। ভারতবর্ষে সিদ্ধপুরুষদের সংখ্যা ইদানীং খুব বেড়ে গেছে। তাদের গ্ল্যামার এখন সবয়েচে বেশি। তাদের কেউ ভোটে যদি দাঁড়ায় তো পি-এম পর্যন্ত হেরে যাবে। অবশ্য ভোটে দাঁড়ানোর দরকার হয় না, ভোটে জিতলে যা পাওয়া যায় তারা তার একশো গুণ পেয়ে যাচ্ছে ভক্তদের কাছ থেকে। টাকা, যশ, ভক্তি। এদের রবরবা যত বাড়ছে তত বোঝা যাচ্ছে যে জাতটার মেরুদণ্ড কত নমনীয়, ভঙ্গুর। জনসাধারণের প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন চোর, একজন ফাঁকিবাজ, তৃতীয়জন মস্তান। শতকরা হিসেব করলে পুরো একজনকেও পাওয়া যাবে না যে সৎ এবং চরিত্রবান। এই সব লোভী, স্বার্থপর, হৃদয়হীন মানুষদের সব সময়ে বিবেক পরিষ্কার রাখার জন্য সিদ্ধপুরুষরূপী একটা খুঁটির দরকার হয়। সেইখানে নিজেকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে ইচ্ছেমত চরে বেড়ায়। যে যতবড় ম্যাজিকওয়ালা সে তত বড় মহাপুরুষ। ম্যাজিক না দেখালে লোকের ভক্তি টসকে যায়।

এইসব কথা অজিত যখন বলে তখন কুমুদ বোস ভারী চটে যায়। সে একসময়ে গোবরবাবুর কাছে নাড়া বেঁধে কুস্তি শিখেছিল। হাতের গুলি দেখানোর জন্য হাফহাতা জামার হাতাও অনেকখানি গুটিয়ে তুলে রাখে। প্রকাণ্ড স্তম্ভের মতো হাত দু-খানা টেবিলের ওপর প্রদর্শনীর জন্য রেখে বলে—পাপ কথা মুখে আনবে তো ঝাপড় মারব। পি সি সরকারেরও একজন ধর্মীয় গুরু ছিলেন, সেটা জানো?

অজিত মাছি তাড়ানোর মতো হাত নেড়ে বলে—বোসদা, কটা কথা খুব ধীরস্থির ভাবে জেনে রাখুন। একনম্বর, ভগবান বলে কোথাও কিছু নেই। দু-নম্বর, একবার মরলে আর কেউ জন্মায় না। তিন নম্বর, ধর্ম হচ্ছে ব্ল্যাক মার্কেটিং, ভেজাল ঘুষ এসবের মতোই আর একটা জোচ্চুরি।

—আর, তুমি যে পলিটিক্স করতে সেটা জোচ্চুরি নয়? তুমি যে ম্যাজিক করো, সেটা জোচ্চুরি নয়?

অজিত একটুও উত্তেজিত না হয়ে বলে—বটেই তো, পলিটিক্স যে জোচ্চুরি তা সবাই জানে। তবু করতাম কেন জানেন? জোচ্চোরদের সঙ্গে লড়বার জন্য ওটাই সবচেয়ে আধুনিক অস্ত্র। আর আপনারা জানেনই না যে জোচ্চোরদের পাল্লায় পড়ে যাচ্ছেন। তফাতটা এখানেই। আমি যে ম্যাজিক করি, সেটাও একরকম লোক ঠকানো জোচ্চুরিই। লোকে জেনেশুনেও পয়সা খরচ করে দেখতে আসে। সে তবু ভাল। আমি তো ম্যাজিক

দেখানোর সময়ে বলেই দিই যে ম্যাজিকে মন্ত্র-টন্ত্র কিছু নেই, সবই হাত সাফাই। আপনার কুমারস্বামীর সে কথা বলার সাহস আছে?

কুমুদ বোসের চেহারাটা যেমন, বুদ্ধিটা তেমন নয়। তর্কে ঠিক যুৎ করতে পারে না সে। মাথা গরম করে চেঁচামিচি শুরু করে দেয়। তখন সবাই বলে—অজিতের সঙ্গে তুমি পারবে কেন বোসদা? ইউনিয়ন করে করে ও তর্কে পাকা হয়ে গেছে। তার ওপর বারেন্দ্র। ওদের মহা কূটবুদ্ধি।

অজিত টের পাচ্ছিল সে যত তর্কই করুক, ইদানীং কুমারস্বামীর একটা হাওয়া বইছে অফিসে। দুজন চারজন করে কুমারস্বামীর ভক্ত বাড়ছে। যারা সাতদিন আগেও ঠোঁট বেঁকিয়েছে তারা আজ গুজ গুজ ফুস ফুস করে কুমারস্বামীর মিরাকলের গল্প করছে। দু-চারজন তাকেও এসে ভজাবার চেষ্টা করে। খুবই ঠান্ডা চোখে তাকায় অজিত, ঠান্ডা গলায় কথা বলে। তারা সরে পড়ে।

শীলার বন্ধু সুভদ্র নামে সেই ছেলেটা দু-চারবার অফিসে এসে দেখা করে গেছে। বার দুই এসেছিল কমিশনের জন্য। তারপর একদিন এসে বলে—অজিতদা, আপনার তো অনেক জানাশুনো। আমাকে একটা অফিস বা স্কুল-কলেজ যাহোক স্যালারি সেভিংস ধরিয়ে দিন। সিংগল পলিসি করিয়ে লাভ হয় না।

ছেলেটার চেহারাটা এত সুন্দর যে চট করে মায়া বসে যায়। অজিত তাই ছেলেটাকে এড়িয়ে যায়নি। সেনদা একটা স্কুলের সেক্রেটারি, তাকে ধরে স্যালারি সেভিংস করিয়েও দিয়েছে। ওই সূত্রেই ছেলেটার সঙ্গে কিছু ঘনিষ্ঠতা। সুভদ্র কার্ল মার্কস-এর ভক্ত, অজিতও তাই। খানিকটা প্রশ্রয় অজিত তাকে দেয়। অফিস থেকে ফিরে কখনও-সখনও দেখে সুভদ্র বাইরের ঘরে বসে আছে, খুশি হয়েছে অজিত। ছেলেটাকে তার ভাল লাগে।

আবার এও ঠিক তার মনের মধ্যে একটা কাঁটা মাঝেমধ্যে খচ করে বেঁধে। ছেলেটাকে বড্ড বেশি পছন্দ করে শীলা। নইলে সুভদ্র যেদিন আসে সেদিন শীলার একটু সাজগোজ কেন? খুব বেশি কিছু নয়, তবু অজিত ঠিকই লক্ষ করে, শীলার মুখে হালকা ফাউন্ডেশন মেক-আপ লাগানো, ঠোঁটে পিলস্টিকের বিলীনপ্রায় রং পরনে একটু বেশি নির্লজ্জ ব্লাউজ, শাড়িটা সাধারণ হলেও পাটভাঙা, চুল এলো খোঁপায় বাঁধা, চোখে কাজল। সুভদ্রর সামনে ও একটু বেশি বড় বড় করে তাকায়, একটু বেশি ধীরে চলাফেরা করে, একটু বেশি সুরেলা গলায় কথায় বলে। এগুলো টের পাওয়া যায়। শীলা ওই সময়টায় আটপৌরে থাকে না।

সন্দেহটা প্রথমে মাঝেমধ্যে উঁকি মারত, তারপর নানা ভাবনা চিন্তা, কাজকর্ম আর ম্যাজিকের দমকা হাওয়ায় উড়ে যেত মন থেকে। কিন্তু ওই একফোঁটা বিষ—ও কখনও ফিকে হয় না। দিনে দিনে ঘনীভূত গাঢ় হয়ে ওঠে, ছড়ায়। একদিন নয়, বেশ কয়েকবারই অজিত অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসেছে। কিছু তেমন দেখতে পায়নি। প্রতিদিনই যে সুভদ্র ছিল, তাও নয়। দুদিন ছিল, কিন্তু ওরা দুজন দুদিকে বসে গল্প করছিল মাত্র। বেশ কয়েকবার অফিস কামাই করেও লক্ষ্য করেছে অজিত। মাঝে মাঝে আসে সুভদ্র। রোজ নয়।

একদিন শীলাকে বলল—ও এসে ওরকম শিস দেয় কেন বাইরে থেকে?

শীলাও বিরক্ত হয়ে বলেছে—দেখ না। ওইরকমই স্বভাব। কতবার বারণ করেছি, শোনে না।

শিস দিয়ে ডাকে। খুব সরলভাবে হাসে। চমৎকার কথা বলে। আর ওই সুন্দর চেহারা, যা দেখলে পুরুষেরও বুকে মায়া জন্মায়! ভাবতেই গায়ে একটা শিরশিরানি ওঠে অজিতের। বুকে ভয়। আর একটা কূট

তীব্র সন্দেহ মাঝে মাঝে সাপের দাঁদের মতো ঝিকিয়ে ওঠে বিষভরা। শীলার পেটে যে বাচ্চাটা....!

একদিন বলল—সেনদা, আপনি তো বায়োলজিক্যাল সায়েন্স পড়েছিলেন, না?

সেনদা মাথা নেড়ে বলেন—পড়েছিলাম। সেসব কিছু মনে নেই।

—হেরিডিটি ব্যাপারটা কী বলুন তো!

সেনদা হেসে বলেন—তোমার কার্ল মার্কস কী বলেন? হেরিডিটি কি তোমরা তেমন মানো?

অজিত চিন্তান্বিত মুখে বলে—মার্কস অবৈজ্ঞানিক ছিলেন না। যা মানা যুক্তিসঙ্গত তা মানতেন।

কুমারস্বামীর ব্যাপার থেকে সেনদা অজিতের ওপর একটু চটা। মাঝে মাঝে মার্কসকে খুঁচিয়ে কথা বলেন। কিন্তু অফিসের অন্য সকলের মতোই সেনদাও মার্কস-বিষয়ে কিছুই জানেন না, কথা বললেই বোঝা যায়। শুনে শুনে সবাই মার্কসিজম বা কমিউনিজিম সম্পর্কে এক একটা মনগড়া ধারণা সৃষ্টি করে নিয়েছে। সেই ধারণা থেকেই তর্ক করতে আসে, আর হেরে যায়।

সেনদা একটু বুদ্ধি রাখেন, তর্কে না গিয়ে বললেন—তুমি কী জানতে চাও?

—ছেলে বাপের কাছ থেকে কী কী পায়। রক্ত? স্বভাব? সংস্কার?

সেনদা হেসে বলেন—সেই হেরিডিটি আর এনভিরনমেন্টের প্রশ্ন তুলবে নাকি? তা হলে একটা কথা বলে নিই। সেদিন রিডার্স ডাইজেস্টে একটা হিউমার পড়ছিলাম, একজন বলছে—হেরিডিটি আর এনভিরনমেন্ট বিচার করা খুব সোজা। তোমার সন্তানের মুখে যদি তোমার আদল থাকে তবে সেটা হল হেরিডিটি, আর যদি তোমার সন্তানের মুখে তোমার প্রতিবেশীদের কারও আদল থাকে তবে তা হল এনভিরনমেন্ট।

কথাটা শুনেই অজিদ কেমনধারা হয়ে গেল। হাসির কথা, তবু সে হাসলও না তেমন। খুব অন্যমনস্ক আর অস্থির লাগছিল তার। সেনদা কিছু জেনে বলেনি, তবু তার মনের কোন গুপ্ত গভীরে ঠিক এইরকমই একটা প্রশ্ন ছিল। শীলার পেটের বাচ্চাটা...।

কোনওকালে কোথাও বেড়াতে-টেড়াতে যায় না অজিত। হঠাৎ এক রবিবারে একা বেরিয়ে পড়ল। বহুদূর পর্যন্ত একা একা ঘুরল সাবারবান ট্রেনে উঠে, বাসে, হেঁটে। মনটা বড় অস্থির। ঘুরে ঘুরে সে অনেক ভাবল। আর ভাবতে ভাবতে হঠাৎ টের পেল, পৃথিবীতে লক্ষণ ছাড়া তার আর একটাও আপনার জন নেই। এমন একটা লোক নেই তার নিজস্ব যার কাছে মনের সব দুঃখ বেদনার কথা, সব সন্দেহ ক্ষোভ আর হতাশার বীভৎস চেহারাটা খুলে দেখানো যায়। এই চল্লিশ বছর ধরে প্রতিদিন সে কত মানুষের সঙ্গে মিশেছে, কত ঝগড়া ভালবাসা হয়েছে, তবু কেউ লক্ষ্মণের মতো আপন হল না, ওই যে শীলা, যার দেহের আনাচকানাচ পর্যন্ত তার মুখস্ত হয়ে গেছে, যার আলজিবের স্বাদটি পর্যন্ত তার জানা, তাকেও কত কথা গোপন করে চলতে হয়। পৃথিবীতে এখন এমন একজন মানুষকে তার চাই যে তার হৃদয় থেকে ওই সব বিষ হরণ করে নেবে। তাকে শুদ্ধ করবে। লক্ষ্মণ ছাড়া আর কে আছে? কিন্তু লক্ষ্মণ কত দূরে! কত ভীষণ দূরে। সে যেন মৃত্যু নদীর পরপার এক বিদেশ। কবে আসবি লক্ষ্মণ?

লক্ষ্মণের শেষ চিঠিটা এসেছে নিউইয়র্ক থেকে। খুব বেশি কিছু লেখা নেই। তবু একটা খুব জরুরি খবর লুকিয়ে আছে চিঠিটায়। লক্ষ্মণ নিউইয়র্কে একটা পেল্লায় ভাল চাকরি পেয়েছে, কানাডায় আর ফিরবে না। কিন্তু ওর বউ কানাডায় ফিরে গেছে, সে নাকি নিউইয়র্ক সহ্য করতে পারেনি। এটাই সবচেয়ে জরুরি খবর। এমন নয় যে ওর বউ ছেড়ে গেছে চিরদিনের মতো, কিংবা বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে। তবু অজিতের প্রাণে একটা

সুবাতাস লাগে। যদি তাই হয় তবে কি আবার দেশে ফেরার কথা মনে পড়বে লক্ষ্মণের? অজিতের কথা মনে পড়বে?

চিঠিটা সারাদিনে কতবার পড়ল অজিত! ছোট চিঠিটায় কত রহস্যময় সংকেত রয়েছে যেন। দুর্গ্রহগুলো সরে যাচ্ছে আকাশ থেকে, শুভগ্রহেরা সন্নিবেশিত হচ্ছে অজিতের ভাগ্যে। লক্ষ্মণ কি আসবে? চমকে ওঠে অজিত। সে তো ভাগ্য মানে না। তবু কি মানুষের সুসময়, দুঃসময় বলে কিছু নেই!

লক্ষ্মণের কথা ভাবতে ভাবতে শীলা আর সুভদ্রর কথা প্রায় ভুলেই গেল সে। কয়েকটা দিন লক্ষ্মণই রইল মন জুড়ে। খুব সুন্দর দীর্ঘ একটা চিঠি লিখল সে লক্ষ্মণকে। লিখল...মেয়েমানুষদের কাছ থেকে আমরা কী চাই বলো তো! কিছু ঠিক পাই না। আমরা ভাবি, বউ বুঝি আমার নিজস্ব মেয়েমানুষ। কিন্তু তাই কি কখনও হয়? আমি এক খণ্ডিত মানুষ। ও-ও এক খণ্ডিত মেয়ে। আমাদের ভাঙা অংশগুলো যদি ঠিক ঠিক জোড় না মেলে তবে? আমি ওকে সব দিতে পারি না, ও-ও পারে না। কী করে তবে এক হই বলো তো!

গুছিয়ে লিখতে পারল না। কিন্তু আবেগ দিয়ে লিখল। অনেকটা। লিখে একরকমের স্বস্তি পেল।

তবু একধরনের অবিশ্বস্ততার ওপরে তার গড়া সংসার এখন দাঁড়িয়ে আছে। যে সন্তান আসছে মায়ের কোল জুড়ে—সেই বা কে? এই কঠিন ক্রুর প্রশ্নের কোনওদিন সঠিক উত্তর হয় না। তাই অজিত বড় অস্থির। কেবলই সিগারেট খায়। ঘুরে বেড়ায়। অফিসের পর অনেকক্ষণ বসে তাস খেলে, কাজ করে, রাত দশটার আগে বাড়ি ফেরে না। খাওয়া কমে গেছে। ঘুম কমে গেছে। যতটুকু সময় বাড়িতে থাকে ততক্ষণ অবিরল ম্যাজিকের পর ম্যাজিক দেখায় একা-একা, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে বলে—সোরসারার ওঃ সোরসারার ইউ আর নট গড। তারপর মাথা নেড়ে বলে—আমার ওপর নেই ভুবনের ভার...। এক প্যাকেট তাস খুলে সে নিজেকে দেখায়, বাহান্নখানা তাস রয়েছে, পলকে সেই তাসটাই আবার উলটোবাগে মেলে ধরে দেখায় বাহান্নখানা তাসই এক, হরতনের বিবি। বিদেশি ম্যাজিক কার্ড। লক্ষ্মণ পাঠিয়েছে।

অজিতকে আজকাল বড় ভয় পায় শীলা। খুব নরম গলায় কথা বলে, খুব ভদ্র ব্যবহার করে। যেন অতিথি সজ্জন কেউ। মাঝে মাঝে বলে—তোমার কী হয়েছে বলো তো!

—কী হবে! অফিসে বড্ড কাজের চাপ।

—শরীর ভাল আছে তো?

—ভালই।

শীলা আর বেশি কথা বাড়ায় না। তাদের সম্পর্ক এইরকমই। কখনও আদরে সোহাগে উজ্জ্বল, উচ্ছ্বল। কখনও বা তারা পরস্পর প্রায় অপরিচিত। নিস্পৃহ।

—ম্যাজিসিয়ান, চলো একবার কুমারস্বামীর কাছে তোমাকে নিয়ে যাব। কুমুদ বোস একদিন বলল।

অজিত খুব অন্যমনস্ক মুখ তুলে হঠাৎ হেসে বলল—যাব। আজই চলুন। বলেই উঠে পড়ল।

॥ তিপ্পান্ন ॥

ঘর-সংসারের যে ছবিটা হারিয়ে গিয়েছিল সেটাই কি ফিরে পেলেন ব্রজগোপাল!

গেঁয়ো ছুতোরের তৈরি দুটো ভারী চৌকি ঘরে এনে ফেলেছে বহেরু। তোশক, মশারি, চাদর, বালিশ, সবই জোগাড় করে এনেছে। ফাঁকা ঘরটা সংসারের সামগ্রীতে ঠাসাঠাসি। ব্রজগোপাল দেখেন।

ননীবালা বলেন—একটা দুটো দিনের জন্য এত ঝামেলা করছিস কেন বহেরু? মাটিতে খড়ের গদি পেতে দিবি শোওয়া যায়।

বহেরু চোখ কপালে তুলে বলে—একটা-দুটো দিন কি বলেন মা! তেরাত্তির কম সে কম থেকে যেতে হবে। কর্তামশাই একাবোকা পড়ে থাকেন, ওইভাবে জীবনটা কেটে গেল। এসে যখন পড়েছেন মা দুর্গা, একটু সব সিজিল মিছিল করে দিয়ে যান। ওঁর দেখবার কেউ নেই, আমাদের ছোঁয়া জলটুকু পর্যন্ত খান না। রোগেভোগে বড় মুশকিল।

ননীবালা উত্তর করেন না। এ লোককে কে দেখবে! কার দেখার তোয়াক্কা করেছে লোকটা?

হা ক্লান্ত ব্রজগোপাল পুকুর থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এসে আহ্নিক সেরে নিয়েছেন। শুদ্ধবস্ত্রটা ছাড়ছেন এমন সময় মাথায় আধ-ঘোমটা দিয়ে ননীবালা পাথরের বাটিতে কাটা পেঁপে সাজিয়ে আনলেন।

—খাও।

—এই কি খাওয়ার সময়!

—তবে কখন খাবে?

—এ সময়ে খাই না, একেবারে রাতে খই দুধ খাব।

ননীবালা একটা শ্বাস ফেললেন, বহুকাল ঘর করেননি, তাই লোকটার অভ্যাস-টভ্যাসগুলো জানা নেই। বললেন—না খেয়ে-খেয়ে শরীরটা যাচ্ছে।

—খেয়েই যায়। একটা বয়সের পর খাওয়ার সংযম ভাল।

—আমার হাতে রান্না খাবে তো! নাকি ছোঁয়া বারণ আছে?

উদাসভাবে ব্রজগোপাল বলেন—খাওয়া যায়।

রণেন ঘুম থেকে উঠল সন্ধ্যা পার করে। এখানে ফ্যান নেই, ঘরটাতেও বেশ গুমোট, তবু বহুকাল বাদে রণেন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছে। বড় এক শিশুর মতো ঘুম-চোখে উঠে বাবার দিকে চেয়ে রইল একটু। চোখ কচলে ফের দেখে একগাল হেসে বলল-বাবা!

ব্রজগোপাল উঠে এলেন কাছে। পিঠে হাতখানা রেখে বললেন—শরীরটা কেমন লাগে বাবা? ভাল?

রণেন মাথা নেড়ে বলে—ভাল।

—তুমি বড় ভাল ছেলে বাবা। সংসার তোমাকে নষ্ট করছে।

রণেন চেয়ে থাকে বাবার দিকে। চোখে এখনও অবোধ ভাব। বলে-বাবা, এবার আমাদের কাছে চলুন।

ব্রজগোপাল একটু বিষন্ন হেসে বললেন—কেন, তোমরা কি সেখানে খুব সুখে আছো?

রণেন কথাটা হয়তো বুঝতে পারে না। হয়তো পারে, বলে—আপনাকে কে দেখবে এখানে?

ব্রজগোপাল শ্বাস ফেলে বলেন—বাপকুসোনা, আমাকে দেখার জন্য তো লেকের দরকার নেই, বরং তোমাদেরই দেখাশোনা করার মানুষ চাই।

অনেকদিন বাদে রণেন বুদ্ধি খাটিয়ে একটা কথা বলতে পারল। বলল—সেইজন্যই তো আপনি যাবেন। আপনি না দেখলে কে দেখবে আমাদের?

ব্রজগোপাল একটু হাসলেন, বললেন—আমার ভালমন্দের বুঝ কি তোমাদের বুঝের সঙ্গে মেলে? দুদিন পর যখন মিলবে না, তখন আবার সম্পর্ক নষ্ট হবে। এই বেশ আছি। আমাকে বাবা ডাকার লোক আছে, এইটুকু জেনেই সন্তুষ্ট আছি।

—যাবেন না? করুণস্বরে রণেন জিজ্ঞেস করে।

—দূরে তো থাকি না। একদৌড়ের রাস্তা। যখনই মুশকিলে পড়বে তখনই চলে আসবে আমার কাছে। আমিও তো যাই মাঝে মাঝে।

দুঃখিত চিত্তে রণেন ঝুম হয়ে বসে রইল। ননীবালা বাইরে গেছেন। রণেন হঠাৎ জলভরা চোখ তুলে বলে —বাবা, সংসারে শান্তি নেই।

ব্রজগোপাল কথাটা আগেও শুনেছেন। একটু দৃঢ়স্বরে বললেন—শোনো। যেমন একটা সিঁড়ি, তা বেয়ে ওঠাও যায়, নামাও যায়, সংসারও তেমনি। তোমার বউ খারাপ তুমি ভাল, একথা আমার মনে হয় না। আসলে তোমরা দুজনেই ভালমন্দের মানুষ। জোড়টা ঠিক মেলেনি, তাই অশান্তি। হিসেব করলে আমিও সংসারকে শান্তি দিতে পারিনি, তাই পালিয়ে আছি। লোকে হাসে। তোমারও সংসার টানতে কত কষ্ট হয়েছে। অশান্তি আছে তো আছে, তুমি মনটা অন্যদিকে পেলে রাখো।

একদিন গায়ে হাত তুলেছিলাম বাবা।

ব্রজগোপাল তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে স্নিগ্ধস্বরে বলেন—ও আর কোরো না। বলে গলাটা একটু নামিয়ে ব্রজগোপাল বলেন—আজকালকার মেয়েরা স্বামীকে পুরোপুরি একলা-একলি চায়, বুঝলে। স্বামীটা যে সংসার বা সমাজের একজন তা হিসেব করে না। কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। স্বার্থপরতার যুগ তো, নিজের বুঝ বুঝে নিতে চায়। তুমি ওরকম ভাবটা হয়ো না বাপকু। বউয়ের গালে ঠোনা মেরে আদর দেখাবে, তলে তলে নিজের কাজ সারবে। হাত পা চালালেই কি পুরুষসিংহ হওয়া যায় বাবা! বরং ওতে মেয়েমানুষ আরও বেহাত হয়ে যায়।

খানিক চুপ করে থেকে বলেন—বাবা যেতেন বিদেশে। সারাটা বছরই প্রায় বাইরে বাইরে কাটত। মা শতখানটা হয়ে সংসার চালাতেন। এখনকার মতো সব ক্ষুদে সংসার তো নয়। বিশ ত্রিশ পাত পড়ত এক-এক বেলায়। বলতেন, বিয়ে হয়ে এসে যেন সংসার সমুদ্রে পড়ে গেলাম। পরের ঘরের মেয়ে, তাকে তো কেউ ছেড়ে কথা কইবে না। মা দেখলেন, বেশ প্রতিকূল অবস্থা। কিন্তু হাল ছাড়বার পাত্রী ছিলেন না। কোমর বেঁধে সবাইকে খুশি করতে লেগে গেলেন। শ্বশুর কেমন রান্না ভালবাসে, ভাসুরের কোনটা পছন্দ, দেওরদের কোনদিকে ঝোঁক। এই করতে করতে নামডাক ছড়িয়ে পড়ল। ঝগড়া করে নয়, লোকের প্রীতি অর্জন করে

করে বছর খানেকের মধ্যে দেখা গেল সেজ-বউ না হলে কারও চলে না। তিনদিন বাপের বাড়ি গিয়ে থাকতে পারেন না, শ্বশুরবাড়ি থেকে লোক গিয়ে হাজির হয়। নিজেও পারতেন না থাকতে। এইভাবেই দুবছরের মাথায় শাশুড়িকে পর্যন্ত বশ করে ফেললেন। বড় জায়েদের চপকে সংসারের কর্ত্রী হয়ে গেলেন। তখন বাবা বিদেশে থাকতে মার দেখেছি সব সময়ে সেই মানুষের চিন্তা। আমরা মায়ের মুখেই বাবার কথা শুনে শুনে মানুষটাকে চিনেছিলাম। তাঁর স্বভাব, চরিত্র, পরোপকারিতা সব। বাবা রাগী মানুষ ছিলেন, রাগটাগ করতেন বটে কিন্তু মা রা কাটতেন না। বাবাকে ঘিরে তিনি সম্মোহিত থাকতেন বেশ। সেই বাবাও মায়ের প্রশংসা করে বেড়াতেন পাঁচজনের কাছে। আমাদের শরীর স্বাস্থ্য এ সবের জন্য ডাক্তারের কাছে যেতে হয়নি কখনও। মা কতগুলো নিয়ম আমাদের মন-সই করে দিয়েছিলেন। নাকে, মুখে হাত দিলে হাত ধোয়া, হাত পা না ধুয়ে ঘরে না-ঢোকা, পরিষ্কার থাকা—এমনি অনেক। আজও মেনে চলি। অসুখবিসুখ হলে মা গিয়ে পাতাটাতা বেটে ওষুধ করে দিতেন। ছেলেপুলেদের জন্য সজাগ থেকে থেকে তাঁর স্বাভাবিক জ্ঞান অনেক বেড়ে যায়। পরে দেখেছি, তাঁর কাছে ওষুধ নিতে পাড়ার বউ-ঝিরা এসে ভিড় করে। এক কাজ করতেন সারাদিন, তবু কখনও তাঁকে অপরিচ্ছন্ন দেখিনি, মাথার ঘোমটাটি পর্যন্ত খসত না। আর কী করে যে একা হাতে অত কাজ করতেন সে এক রহস্য। আর সব কিছুর মধ্যেও তাঁর ছিল বাবার চিন্তা। একটা দোলন-চাঁপা গাছ বাবা রুয়ে গিয়েছিলেন, সারা বছর সেটাতে জল দিতেন মা, আর প্রতিদিন তাতে জল দিতে গিয়ে তাঁর একটা ফুস করে শ্বাস বেরিয়ে পড়ত। বুঝলে বাবা, সেই মাকে দেখে আমি মেয়েমানুষ চিনেছি। তাই আমার সহজে মন ভরে না। কিন্তু মেয়েমানুষ দেখলে আজও মাথাটা নুয়ে পড়ে। মনটা 'মা' বলে ডেকে ওঠে। মায়ের কথা শুরু করলে আর থামতে ইচ্ছে করে না। রেলগাড়ির মতো কেবল কথা বেরিয়ে আসতে থাকে গলার নল বেয়ে।

ব্রজগোপাল সামনের দিকে চেয়েছিলেন, সেখানে একটা তাজমহলের ছবিঅলা বাংলা ক্যালেন্ডার। কিন্তু সেই ক্যালেন্ডার ভেদ করে বহু দূরে মগ্ন হয়ে আছে চোখ। বললেন—বাবা, পৃথিবীজোড়া ভিড় দেখছ, কিন্তু লক্ষ করে দেখো মানুষ কত কমে গেছে। কাজের মানুষ, চরিত্রবান মানুষ, ব্রাহ্মী মানুষ আর চোখে পড়ে না। স্ত্রীর ভিতর দিয়ে স্বামীই প্রসূত হয়, তাই স্ত্রীকে বলে জায়া। স্ত্রী সন্তানকে মেপে দেয়। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর টান ও গুণগ্রহণমুখরতা যতটা এবং যেমন, ততটুকু ও তেমনই সে পারে সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত করতে। এটাই হচ্ছে পরিমাপ। তেমন বিয়েও হয় না, তেমন ভালবাসাও দেখি না। তাই 'শ্রদ্ধাহীন' প্রবৃত্তিপরায়ণ, ক্ষীণ মস্তিষ্ক আর প্রতিভাহীন মানুষে দেশ ছেয়ে যাচ্ছে।

ননীবালা চা করে নিয়ে এলেন। রণেনকে দিলেন, ব্রজগোপালকেও।

ব্রজগোপাল একটু ইতস্তত করছিলেন দেখে ননীবালা বলেন—চা খাও না?

ব্রজগোপাল হঠাৎ উদার হাসি হেসে বলেন—দাও, করেছ যখন।

দরজার কাছে কোকা এসে দাঁড়িয়ে আছে। বলল—দাদাবাবু, বেড়াতে যাবেন না?

রণেন মাথা নাড়ল—যাব।

—চলেন। খালপাড় থেকে ঘুরে আসি।

কোকার সঙ্গে রণেন বেরিয়ে গেলে ব্রজগোপাল আর ননীবালা একা হলেন বহুকাল এ-রকম একা ঘরে দুজনের দেখা হয়নি।

বাতিটা একটু কমিয়ে ননীবালা চৌকির একধারে বসে আছেন। ব্রজগোপাল এখনও অন্যমনস্কভাবে চেয়ে আছেন সুমুখে। বেড়াল ঢুকে রণেনের এঁটো কাপটা চেটে পায়ের ধাক্কায় টং করে ফেলে দিয়ে গেল। শব্দটা কেউ খেয়াল করলেন না।

ব্রজগোপাল জিজ্ঞেস করলেন—হঠাৎ সব আসা হল কেন? জমিজমা সব বিক্রি করে দিতে নাকি! না ধানের দায় বুঝতে!

—তোমার তো ওসবই মনে হবে। আমি স্বার্থ ছাড়া আর কিছু বুঝি না নাকি!

ব্রজগোপাল ক্ষণেক চুপ করে থেকে বলন—সেও খারাপ কথা নয়, কেউ যদি তোমরা না-ই আসতে পারো তো বরং বিক্রি করে দেওয়া ভাল। আমি আর কদিন। বিক্রি করতে চাইলে বহেরুই কিনে নেবে।

ননীবালা ঘোমটাটা তুলে দিয়ে হাতপাখা নাড়তে নাড়তে বলেন—সে সব ভাবনা ছিল না।রণো তোমার জন্য হঠাৎ অস্থির হল। কী সব কু স্বপ্ন দেখেছিল, মুখে আনা যায় না। একবার চোখের দেখা দেখতে আসা।

—ভাল। ব্রজগোপাল বললেন।

—শরীর তো ভাল দেখছি না।

শরীর তো পুষে রাখার জিনিস নয়, কাজে লাগাতে হয়। সব সময়ে তেল চুকচুকে কি রাখা যায়?

—কাজ তো জানি। পরের গোয়ালে ধোঁয়া দিয়ে বেড়ানো।

—সেইটেই আসল কাজ। নিজের গোয়াল যদি না থেকে। ধোঁয়া তো দিতে হবে।

ননীবালা এই চুরি ছিনতাইয়ের দিনেও মোটা বালা পরেন, ছগাছা করে চুড়ি রয়েছে হাতে, গলায় একটা বিছে হার। গয়নাগাটির একটু শব্দ হল, শাড়ির মাড় খস খস করল, শ্বাসপ্রশ্বাসের একটু টান শোনা গেল। অর্থাৎ ননীবালা আছেন। এই অস্তিত্বটুকু কতকাল টের পাননি ব্রজগোপাল।

অন্ধকারে একবার ঠাহর করে ননীবালাকে দেখে ব্রজগোপাল বললেন—ছেলেরা সব কে কেমন?

—তোমারই ছেলে।

—বনিবনা করে থাকতে পারবে?

—কে! আমি, না ছেলেরা?-সকলের কথাই জিজ্ঞেস করি।

—আমার আর থাকার কী! বাড়িটা তুলতে যদি পারি তো দুভাগে ভাগ করে দিয়ে যাব, দুই ছেলে থাকবে।

—ভাগাভাগির কথা আগেভাগেই ভেবে রেখেছ?

—সেইটেই তো বুদ্ধির কাজ। বলে ননীবালা উঠে পিক ফেলে এলেন বাইরে। বললেন—আগে থেকেই ভাগাভাগি করে দেওয়া ভাল।

ব্রজগোপাল বললেন—তার মানে, তোমার ছেলেরা মানুষ হয়নি।

ননীবালা পুত্রগতপ্রাণ। এ কথার একটা কড়া উত্তর দিতেন। কিন্তু এমন সময়ে নয়নতারা বাইরে দরজার কাছে এসে ডাকল। ভারী মিষ্টি ডাকটি—মা!

—কী রে? ননীবালা উঠলেন।

—বাবা মাছ পাঠিয়ে দিল। রান্নাঘরে রেখে যাব?

—দেখি। ননীবালা বাতিটা তুলে নিয়ে গিয়ে দেখেন—ওমা! এ কত মাছ রে! এত খাবে কে?

—এই তো কখানা।

—তোদের বাপু বড্ড গেঁয়ো ভাব। বলেন ননীবালা। তবু খুশি ঝরে পড়ে গলায়। কলকাতার বাড়িতে আজকাল আর বড় মাছের টুকরো আসে না। রণেনটা বড় মাছ ভালবাসে। কিন্তু সোমেন নয়। সে কেবল মুরগি মুরগি করে পাগল। বললেন—রান্নাঘরে রাখো। আসছি।

ননীবালা ঘরে আলোটা রেখে চলে গেলেন রান্নাঘরে। রান্নাঘরই আজকাল ভাল লাগে তাঁর। সেখানে বসে নয়নতারাকে ডেকে বললেন—তুইও বসে থাক না, কথা বলি। তোর স্বামীটা নাকি আবার বিয়ে করেছে শুনলাম!....

ঘরে বসে ব্রজগোপাল সেই কথার শব্দ শোনেন। অদ্ভুত লাগে। ননীবালা পাশের রান্নাঘরে বসে কথা বলছেন, এ যেন ঠিক বিশ্বাস হতে চায় না। এ কি সম্ভব? এ কি হয়?

রাত্রিবেলা শোওয়ার সময় ননীবালা বললেন—ও বাড়িতে কী হচ্ছে কে জানে! একা বীণার হাতে সংসার।

—কী করবে? ব্রজগোপাল মাচানের বিছানায় শুয়ে থেকে জিজ্ঞেস করেন।

—কালই চলে যাব।

—যেয়ো, ব্রজগোপাল বলেন। একটা শ্বাস চেপে রাখেন কষ্টে।

॥ চুয়ান্ন ॥

তিন বিঘের ওপর বহেরু একখানা বাগান করেছে। চুন-সুরকি দিয়ে গাঁথা ইটের দেওয়াল ঘেরা। ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন ননীবালা। কাঁঠালের কী ফলন। আগাপাশতলা ছেয়ে আছে ফলে। গাছের গোড়ায় খেজুর কাঁটার বেড়।

বহেরু বলল—শেয়ালের জন্য নয় মাঠান, কাঁটা দিলে ফলন ভাল হয়। গাছ শিউরে ওঠে তো।

জামরুল দেখে অবাক মানেন ননীবালা। আমগাছে যত পাতা তত ফল বলে ভ্রম হয়। বললেন—তোর হাতে মন্ত্র আছে বহেরু। কী ফলন! চোখ জুড়িয়ে যায়। বহেরু হাসে। বলে—ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ।

গাছে ফল ফলে, এ বহুকাল দুচোখে দেখেননি ননীবালা। কলকাতায় সবই মেলে, কিন্তু সে শুধু ফলটুকু। গাছের ফল গাছে দেখার আনন্দই আলাদা। কলকাতায় আসার আগে পর্যন্ত গাছগাছালির সঙ্গে যাহোক সম্পর্ক ছিল। এখন পায়ের নীচে কদাচিৎ মাটির স্পর্শ পান।

ঘুরে ঘুরে ঘেমে গেছেন। মুখচোখ লাল। কোথা থেকে একটা ছাতা নিয়ে এসে নয়নতারা পাশে পাশে চলতে থাকে, ননীবালার মাথায় ছাতাখানা ধরে। ভারী লক্ষ্মীমন্ত মেয়েটা। মুখখানায় কি লাবণ্যের ঢল! বহেরুর ঘরে সবই বেশ ফলে।

হাঁটতে হাঁটতে ননীবালা বলেন—তুই কেন হুট করে বুড়ো হয়ে গেলি বহেরু? চেহারাটা কেমন দুলদুল করে।

বহেরু গম্ভীরভাবে বলে—সময় হল। খোলস পালটাবে।

বহেরু নিয়ে গিয়ে বাস্তুজমিটা দেখাল। বলল—এইখানে কর্তা বাড়ি করবেন বলে ঠিক ছিল।

বলে খুব প্রত্যাশা নিয়ে তাকাল ননীবালার মুখের দিকে।

ননীবালা ফস করে বললেন—এখানে জমির দাম কী?

বহেরু শ্বাস ফেলে বলে—গাঁ গঞ্জ জায়গা, দাম আর কী হবে!

তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা জায়গাটায় রোদ পড়েছে। একটা পাতকুয়া। কয়েকটা গাছ। ননীবালার চোখে বালি পড়ল বোধ হয়। চোখটা করকর করে ওঠে। মনটাকে শক্ত করে বললেন—জমির দাম তো সব জায়গায় বাড়ছে।

বহেরু একটু ভয়-ভয় চোখে তাকায় ননীবালার দিকে। তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে বলে-কর্তামশাইয়ের জমি, তিনি তো বেচবেন না। দাম যাইহোক।

ননীবালা বে-খেয়ালে বলে ফেললেন—চিরকাল কি সে-ই থাকবে। জমিটা ভোগ করবে কে?

বলেই ননীবালা অন্তরে শিউরে ওঠেন। কী কথাটা বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে। মনটা কত বড় পাপী। সামলে নিয়ে বললেন—আমিও থাকব না, তুইও থাকবি না। তাই এখন ছেলেপুলেদের সুখ-সুবিধে বুঝে এসব জমি-

জোত করতে হয়। দেখাশোনার কেউ না থাকলে, বাড়িঘর না হলে এ জমি ধুয়ে জলটা খাবে কে? বেচবে না বলে গোঁ ধরলে কি হয়?

বহেরু শুনে হঠাৎ তার বুড়ো মুখে যুবকের হাসি হেসে মাথা নাড়ল। বলল—কর্তারে বোঝায় কে?

—তুই বোঝাবি।

—উরে বাস রে। এসব বললে খেয়ে ফেলতে আসেন।

পাশ থেকে নয়নতারা হঠাৎ তার নরম গলায় বলে—মা, জমিটা ব্রজকর্তা ষষ্ঠীপদর নামে লিখে দিয়েছেন।

ঠিক বুঝতে পারেন না ননীবালা। হাঁ করে তাকিয়ে বললেন—কে? কার নামে লিখে দিয়েছে বললি?

—ষষ্ঠীপদ। নিবারণী দিদির ছেলে। ওই যে যেটা সবসময়ে ব্রজকর্তার কাছে ঘুরঘুর করে আর ছড়া কাটে।

—ও। বলে স্তম্ভিত হয়ে থাকেন ননীবালা। বহুকষ্টে ভিতরের জ্বলুনিটা সামলে নিয়ে বলেন- কেন?

বহেরু একটা ধমক দিল নয়নকে। বলল—তোর এসব খোলসা করে বলার দরকার কি?

ননীবালা একটু কঠিন চোখে বহেরুর দিকে চেয়ে বলে—আমার কাছে লুকিয়ে কি হবে? লুকোস না। আর কী কী লিখে দিয়েছে বল।

উত্তরটা নয়নতারাই দিল—আর কিছু নয়। ষষ্ঠীপদর বাপ তো এখানেই ঘরজামাই থাকে। তার কিছু নেই। কপিলদাদা কোকাভাই সব ঠিক করেছে ওদের এখান থেকে তাড়িয়ে দেবে। তাড়িয়ে দিলে আর যাবে কোথা, জায়গা তো নেই, পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াবে। ব্রজকর্তা বড় ভালবাসে ষষ্ঠীকে। তাই মায়া হল, লিখে দিলেন।

খোল বগলে দিগম্বর চলেছে। বাদামতলা থেকে ছেলেপুলেরা পিছু নিয়েছে, হাততালি দিয়ে খ্যাপাচ্ছে—খোল হরিবোল, খোল হরিবোল...

দিগম্বর গালমন্দ পাড়ে না। ভারী অসহায় বোধ করে, আর ছুটে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পৃথিবীতে আর এমন নির্জন জায়গা খুঁজে পায় না দিগম্বর যেখানে নিরিবিলিতে খোলখানা নিয়ে বসবে। আজকাল খোল নিয়ে বসলে গুরুর ছায়া এসে পড়ে খোলে। আশ্চর্য সব শব্দ ফোটে। হরি-হরি বলে খোল কাঁদে, খোল আহ্লাদে আটখানা হয়। কোন মহাজগৎ থেকে সব অজানা বোল ভেসে এসে খোলের শব্দের মধ্যে ফুটে ওঠে। দিগম্বরের বাহ্যজ্ঞান থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ যখন রাসলীলা করেছিলেন, কুঞ্জবনে গোপিনীদের সঙ্গে খেলা করতে করতে কোথায় হঠাৎ মিলিয়ে গেলেন ঠাকুর। চারদিকে তখন কেবল আলো, আর স্বর্গীয় এক শব্দ। হা কৃষ্ণ কোথা -কৃষ্ণ বলে পাগল গোপিনীরা কৃষ্ণকে খোঁজে, পায় না, পাবে কী করে! কৃষ্ণ যে তখন শব্দব্রহ্মে মিলিয়ে আছেন। তাঁর অস্তিত্বের নাদ শুধু শব্দ হয়ে ঘিরে আছে তাদের। ব্রজবামুন বলেন—রাসলীলা মানে হল শব্দলীলা। দিগম্বর সেটা আগে বুঝত না,এখন বোঝে, শব্দ কখন ভগবান হয়ে ওঠে, শব্দ কখন যে দুনিয়াছাড়া করে দেয় দিগম্বরকে। বাবা রে, কোথা থেকে যে সব শব্দ এসে ভর করে খোলে। দিগম্বর তাই আজকাল মাঝে মাঝে খোলখানা জড়িয়ে ধরে, তার গায়ে মাথা ঘরে, কাঁদে আর বলে— আরবার যেন শব্দ হয়ে জন্মাই হরি হে।

ট্যাটন ছেলেগুলো পিছুতে লাগে। কোথাও বসতে দেয় না। যেখানেই গিয়ে খোল নিয়ে বসে দিগম্বর সেখানেই গিয়ে হাততালি দিয়ে নেচে নেচে চেঁচায়—খোল হরিবোল, খোল হরিবোল...। শব্দের যোগ ছিঁড়ে

গেলে বড় যন্ত্রণা হয়। চারধারে একটা ময়লা পৃথিবী, তার মধ্যে যেন মুখ থুবড়ে ভাঙা হাঁড়ির মতো পড়ে আছে, এমন মনে হয়।

কতবার বহেরুকে ডেকে বলেছে—ভাইয়ের পো, তার গাঁয়ে এত লোক আলো কমনে? আগে তো দেখতাম না এতসব কাচ্চা বাচ্চা। বড় ঝঞ্ঝাট করে। আমারে শব্দ শুনতে দেয় না।

বহেরু বলে—গুষ্টি তো বাড়েই খুড়ামশাই, কবো কী? দেবোনে আপনারে একটা টংগী ঘর করে। মাচানের ওপর বসে বাজাবেন, কেউ নাগাল পাবে না।

সেই ঘরটা আর করে দেওয়া হয়নি।

পিছনে কাচ্চা-বাচ্চা লেগেছে, দিগম্বর খোল-বগলে ছুটে আসছিল বাদামতলা থেকে। ননীবালার মুখোমুখী পড়ে হকচকিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি রাস্তা থেকে নেমে দাঁড়াল পাশে। হাত দুখানা জোড় করে মহা অপরাধীর মতো বোকা মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। ঠোঁট দুখানা কাঁপছে। দুনিয়াতে এই যে আছে দিগম্বর, এই যে শ্বাস টানে ছাড়ে, রাস্তায় পা ফেলে হাঁটে এ সবই তার নিজের কাছে মহা মহা আস্পদ্দার কাজ।

বাচ্চাকাচ্চাগুলো একটু পিছনে আসছিল, হাততালি দিয়ে মহানন্দে খোল হরিবোল বলতে বলতে। বহেরুরই নাতিপুতি জ্ঞাতিগুষ্টি সব। তবু বহেরু হঠাৎ হাঁকাড় ছেড়ে দৌড়ে যায়। বড় বড় মাটির ঢেলা আর চাঙড় তুলে দুই হাতে বাচ্চাগুলোর দিকে ছুঁড়তে থাকে। বাচ্চাগুলো ভয়ে আর্তনাদ করতে করতে দৌড়য়। দুটো একটা পড়ে যায়। একটার ন্যাড়ামাথায় বহেরুর ঢেলা গিয়ে লেগে ভেঙে পড়ে। সেটা মাথায় হাতচাপা দিয়ে 'বাপরে' বলে ইঞ্জিনের মতো বেগে ছোটে। চারধারেই নানাজনের ঘর গেরস্তালি, গাছগাছালি, সেসবের মধ্যে পলকে মিলিয়ে যায় সব। দুটো একটা নেহাৎ পুঁটে পুঁটে শিশু পালাতে পারেনি, গুট গুট করে দৌড়চ্ছে। বহেরু তাদের ধাওয়া দিয়ে চেঁচায়—সুমুন্দির পো, খুন করে ফেলব। সেই হাঁক শুনে তারা ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে।

বহেরু হাত ঝেড়ে ফিরে আসে, গামছায় মুখ মুছে দিগম্বরের পিঠে হাত দিয়ে ঠেলে নিয়ে যেতে যেতে বলে--যান খুড়োমশাই, বাগানের মধ্যে চলে যান, জামতলায় বেশ ছায়া আছে। বসে বাজান। সুমুন্দির পোয়েরা আপনার খোলের দাম কী বুঝবে। ওদের কানে গু-মুত ঢুকবে। আপনি যান।

—আহা রে! ননীবালা বলেন—বাচ্চাগুলোকে অমন ধাওয়া দিলি। তুই বড় পাষণ্ড বহেরু |

—ওগুলান মানুষের বাচ্চা নাকি মাঠান? সব কাউয়া। পাপীর বংশ তো। গুণী মানুষের মর্যাদা জানে না।

—তোর সব বাড়াবাড়ি। বাচ্চা মানুষ, ওরা কি ওসব বোঝে!

—বড় হলেও বুঝবে না। আমার ছেলেগুলান তো সব পাকাপোক্ত মানুষ এখন, তারাই কী বোঝে! আমি চোখ বুজলে খুড়োমশাইকে তাড়াবে, বামুনকর্তারে উচ্ছেদ করবে, যত সব আশ্রয় নিয়ে আছে তাদের হাঁকিয়ে দেবে। তারপর নিজেরা সুন্দ উপসুন্দের লড়াই করবে এখানে। আমার দাপে এখনও কিছু করতে পারে না।

ননীবালা হেসে বলেন—তোর এত জ্ঞাতিগুষ্টি, অতিথি-টতিথি, জোটে কোত্থেকে? সবাইকে খাওয়াস-ই বা কী করে?

—আমার গরজেই জোটে সব। মানুষের বড় শখ আমার। ব্রজকর্তাও কন-বহু পালক হও, বহু পোষক হও। তাই করি। গুণী মানুষ পাওয়া-ও চাট্টিখানি কথা নয়। কলের যুগ তো, গুণীরা সব মরে হেজে শেষ হয়ে যাচ্ছে। খুড়োমশাই বা ব্রজকর্তা গেলে আর তেমন মানুষ পাওয়া যাবে না। এই সেদিনও উজিরপুরের এক

কামারকে নিয়ে আসার চেষ্টা করছিলাম। ওদের পূর্বপুরুষ নাকি এমন পোলাদ দিতে পারত যে বিলিতি ইস্পাতও হার মানে। এমন কামান বন্দুক তৈরি করতে যে শ' শ' বছরে জং ধরত না। বংশগত বৃত্তি, ব্যাটা কাজও জানে, কিন্তু সে এখন হাওয়ার ফ্যাক্টরিতে বাঁধা মাইনে পায়, এল না।

বলে বহেরু দুঃখমাখা মুখে তাকায়। ননীবালা বোঝেন, এসবই ব্রজগোপালের মাথার পোকা, এর মাথায় ভর করেছে।

বাস্তুজমিটা ষষ্ঠীচরণের নামে লিখে দেওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে একটা হেস্তনেস্ত করবেন, ননীবালার এমন ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ব্রজগোপাল ঘরে ছিলেন না। দুপুরে ফিরলেন। স্নান করে খেতে বসলেন বাপ-ব্যাটায় পাশাপাশি। সে এক সুন্দর ছবি। বহুকাল মানুষটাকে নিজের হাতে খাওয়াননি ননীবালা। কথাটা বুকে ঠেলাঠেলি করছিল, অম্বলের ঢেঁকুরের মতো উঠে আসত জিভে, ননীবালা কষ্টে ঠেকিয়ে রাখলেন। ব্রাহ্মণ মানুষের দুপুরের খাওয়াটা নষ্ট হয় যদি।

খেয়ে উঠতে না উঠতেই এলেন ফকির সাহেব। মধ্যবয়সি, বেশ ভাল চেহারা, গালে ছাঁটা দাড়ি, চোখে সুরমা, মাথায় ফেজ। পরনে সাদা লুঙ্গি আর সাদা পাঞ্জাবি। রণেনকে দেখতে এসেছেন।

কিন্তু রণেনকে দেখার ধার দিয়েই গেলেন না, ব্রজগোপালের দেখা পেয়েই গম্ভীর হয়ে বললেন—মোস্তাফা চরিত আর কোরাণে যে নূর আর আওয়াজের কথা আছে সে সম্বন্ধে আপনি ঠিকই বলেছিলেন। আর ইমান মোফাচ্ছেলে আছে—আল্লাহ, তাঁহার ফেরেস্তাগণ, কেতাবসকল, প্রেরিত রসুলগণ, কেয়ামত তকদীয় এবং মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন লাভ—এ সকলের ওপর আমি ইমান আনলাম। বিশ্বাস করলাম। কলেমায় একেশ্বরবাদের কথা বলা হচ্ছে। আর্যরাও তাই। 'এরিয়া' কথাটার মানে খুঁজে দেখলাম একেশ্বরবাদ। একেশ্বরবাদীরাই এরিয়ান। আল্লাহ নির্গুণ ঈশ্বর। রসুল ঈশ্বরের মূর্ত অভিব্যক্তি। আর্য হিন্দুদের পুরুষোত্তম। ইসলামে কলেমা তৈয়ব রসুল আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন। রসুল ভিন্ন আল্লাহ অব্যক্ত। গীতায় অব্যক্তের উপাসনার কথা বলা হয়েছে। প্রত্যেকটি কলেমারই মর্মবাণী ঈশ্বরের ও ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ রসুলের প্রতি পূর্ণ আত্মনিবেদন, আর এই আত্মনিবেদনই ইসলাম। ইসলামের সঙ্গে আর্যধর্মের খুব মিল। আপনি বলছিলেন ইসলামই আর্যধর্ম—যা বেদে ও কোরাণে, বব্বর, তৌরাৎ, ইঞ্জিল এইসব ঐশী কেতাবেও প্রচারিত হয়েছে।

ব্রজগোপাল মুখোমুখি বসে খুব নিবিষ্টভাবে শুনছিলেন। একটা শ্বাস ফেলে বললেন— ইমান মোফাচ্ছেলে পুনর্জীবন লাভের কথা আছে না?

ফকিরসাহেব বলেন—প্রেরিত পরম্পরা আছে, ধর্মগ্রন্থ, অদৃষ্ট ফেরেস্তা, আর দেবদূতদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, এই হল ইমান মোফাচ্ছেল। মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ হতে পারে কি! আর যদি রোজ কেয়ামতের কথা তোলেন-

এইভাবে নিবিষ্ট আলোচনা চলতে লাগল। ননীবালা পান খেলেন, রণেন বাইরে গিয়ে দুবার সিগারেট খেয়ে এল। আলোচনা তবু শেষ হয় না। দুজনেই একটা জায়গায় আটকে গেছেন, মিল হচ্ছে না। কিন্তু দুজনেই মিল বের করার জন্য নানা আলোচনা করছেন। পুনর্জীবন ও পুনরুত্থান এক কিনা, পোলশেরাৎ আর বৈতরণী কি অভিন্ন, এইসব নিয়ে কথা হচ্ছিল। সেইসব কথার মাঝখানে ননীবালা বাধা দিয়ে বললেন—ফকির বাবা, আমার ছেলেটাকে দেখবেন না? আমরা সন্ধের ট্রেনে চলে যাব।

ফকিরসাহেব এই প্রথম হাসলেন। চমৎকার হাসিটি। বললেন—হ্যাঁ মা, দেখব। এই বামুনবাবার সঙ্গে আমার খুব জমে। দুই ফকির তো।

রণেনকে একঝলক দেখলেন ফকির সাহেব। মুখখানা গম্ভীর করে ফেলেছেন ফের। একটু গলা খাকারি দিয়ে বললেন—কী হল বাবা?

ননীবালা আগ বাড়িয়ে বলেন—ওর মাথার অসুখ।

—বটে! বলে হাসলেন ফকিরসাহেব। বলেন—মা, ও কি পাগলামি করে?

ননীবালা উত্তর দিতে পারেন না। কারণ রণেন তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছে। কী করে বলেন যে ও পাগল! রণেন তা হলে ভীষণ ঘাবড়ে যাবে।

তাঁকে সে-দায় থেকে উদ্ধার করে ফকিরসাহেব বলেন—কেউ কেউ পাগল সাজে মা।

—না বাবা, ও তা নয়,

ফকিরসাহেব হাত তুলে বলেন—সেও আমি জানি।

বলে কিছুক্ষণ অন্যমনস্কভাবে চুপ করে রইলেন ফকিরসাহেব।

ননীবালা হাতপাখা নেড়ে তাঁকে বাতাস দিচ্ছিলেন। ফকিরসাহেব মাথা নেড়ে বললেন— কোনও কোনও মানুষের মধ্যে পাগল হওয়ার একটা ইচ্ছে থাকে। অবশ্য ঘুমন্ত ইচ্ছে। সে নিজেও হয়তো জানে না যে, মনের গভীরে ওরকম একটা ছোট্ট চাওয়া আছে। কখনও কখনও সেই ইচ্ছেটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। দেখবেন মা, দুর্বল মনের লোকেরা অনেক সময়ে সংকটে পড়লে পাগল হয়ে যায়। এটা ঠিক রোগ নয়, গা-ঢাকা দেওয়ার উপায়। কিন্তু যখন পাগল হয় তখন খাঁটি পাগলই হয়। আমারও একবার হয়েছিল—

বলে ব্রজগোপালের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। বললেন—রঘুনাথপুরে এক পাগল ছিল। লোকে বলত সে নাকি গুপ্ত সন্ন্যাসী। যা বলে তা হয়। মাথায় একটা হাঁড়ি নিয়ে ঘুরত। লোকে সেই হাঁড়িতে চাল ডাল তরকারি মিষ্টি সব দিত। দিনের শেষে হাঁড়ির সব জিনিস একসঙ্গে সেদ্ধ করে খেত। তার পিছু পিছু খুব ঘুরলাম ক'দিন বিভুতি দেখব বলে, কিছু দেখি না। একদিন নদীর ধারে বসে আছি একা, মনটা খুব উদাস, কি ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে ডেকে উঠল একটা ইচ্ছা—আচ্ছা, পাগল হলে কেমন লাগে। যদি পাগল হই তো কেমন হয়! সেই যে মাথায় ভূত চাপল তো চাপলই, ইচ্ছে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা কেমন ঘুলিয়ে উঠল, চারদিকটা কেমন ওলটপালট দেখতে লাগলাম। সবই অবাস্তব মনে হতে লাগল। আল্লা-রসুল ডাকতে ডাকতে মাথা চেপে ধরলাম, কিন্তু সে ইচ্ছে বান্দার বাচ্চার মতো মাথায় ভর করে আছে। তখন কেবল চিৎকার করে বলছি — না আমি পাগল হতে চাই না। চাইনা। সে বিকেলটা বেঁচে গেলাম, কিন্তু ইচ্ছেটাকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে দিয়েছি, তাই সহজে সে আমাকে আর ছাড়ে না। ঘুমোতো ঘুমোতে হঠাৎ স্বপ্ন দেখি, পাগল হয়ে যা তা করে বেড়াচ্ছি। অমনি উঠে বসে ভয়ের কালঘাম ছাড়ি, জেগেও বুঝতে পারি মনের মধ্যে পাগলামির পোকা কিলবিল করছে। এইরকম ভাবখানা কিছুদিন চেপে থাকতে থাকতে একদিন আর পারলাম না, সকালে উঠে একদিন বেমক্কা পাগলামি শুরু করে দিলাম। বহু ওষুধপত্রে মাসখানেক বাদে সেটা সারে।

ননীবালা ধরিয়ে দিয়ে বললেন—ওর টাইফয়েডের পর ছেলেবেলায় একবার সত্যিকারের হয়েছিল।

ফকিরসাহেব মাথা নেড়ে বলেন—এটা সে রোগ নয়। ভাববেন না, ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি, সেরে যাবে।

বলে রণেনের দিকে তাকিয়ে ফিক করে একটু হাসলেন, হাসিটা যেন রণেনের সঙ্গে একটা গোপন বোঝাবুঝির হাসি। কী একটা অভিনয়, ষড়যন্ত্র কী একটা যোগসাজস হয়ে গেল কে জানে। রণেনও একটু হাসল। তারপর গম্ভীর হয়ে গেল।

যাওয়ার সময়ে ফকিরসাহেব ব্রজগোপালকে বললেন—আবার দেখব, রোজ কেয়ামতের মধ্যে পুনর্জন্মের একটা গন্ধ পাচ্ছি বটে।

কোরাণেও আছে। ব্রজগোপাল সোৎসাহে বলেন—একটু দেখবেন।

ফকিরসাহেব ঘাড় নেড়ে চলে গেলেন।

এতকিছুর পরও ননীবালার বুকের মধ্যে কথাটা কাঁটার মতো কুটকুট করে। বাস্তুজমির কথা ভোলেননি। কিন্তু রণেনের সামনে তুলতে ইচ্ছে করে না। বড় নরম মন ছেলেটার। মা-বাপের ঝগড়ায় ফের যদি মনটা বিগড়োয়। তার ওপর আজই চলে যাবেন। যাওয়ার আগে তেতো করে যেতে ইচ্ছে হয় না।

বুকে এই চাপ দুশ্চিন্তাটা নিয়েই দুপুরে একটু গড়িয়ে নিলেন ননীবালা।

দুপুর গড়িয়ে উঠেই টের পেলেন রোদের মুখে কালো ঠুলি পড়েছে। বাইরে এসে দেখেন, স্তরের পর স্তর কালো মেঘ জমেছে আকাশে। গুমোট ভেঙে একটা দমকা হাওয়া দিল। কুটোকাটা আর ধুলোবালি উড়ছে। প্রকাণ্ড মাঠের ওপর প্রকাণ্ড আকাশ। কত দূর পর্যন্ত কালি ঢালা ঘুটঘুটে মেঘের ছায়া পড়েছে। এতদূর পর্যন্ত, এত ব্যাপ্ত মেঘ বহুকাল দেখেননি। মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইলেন। নয়নতারা দৌড়ে এসে বাইরে মেলা জামাকাপড় তুলে দিয়ে গেল ঘরে। কাছে এসে হাসিমুখে বলল—আজ যাওয়া হবে না মা।

ননীবালা মুখ ফিরিয়ে নয়নের মুখে তাকিয়ে বললেন—না হোক গে। জলে পড়েছি নাকি?

—থেকে যান।

—থাকব।

বলে হাসলেন ননীবালা। বলে হাসলেন ননীবালা। 'থাকব' কথাটায় যেন তাঁর বুক হঠাৎ আজ হালকা হয়ে গেল।

॥ পঞ্চান্ন ॥

যেদিন প্রথম কুমারস্বামীর কাছে গিয়েছিল অজিত সেদিন ঘরে ঢুকেই সে এক ভয়ংকর দৃশ্য দেখতে পায়।

গর্চার সেকেন্ড বাই লেনে দোদলায় এক ব্যাবসাদার শিষ্যের ফ্ল্যাটে তখন ছিল কুমারস্বামী, ঘরে ঢুকবার আগে খুব সতর্ক গলায় কুমুদ বোস বলল—ভিতরে ঢুকে কোনওরকম বদমায়েশি করবে না বলে দিচ্ছি। টিটকিরি-ফিটকিরি দিয়োছ কী ঘাড় ভেঙে ফেলব।

জুতো খুলতে খুলতে অজিত হাসল। আর তখন টের পেল বহুকালের অবিশ্বাস ভেদ করে বুকের ভিতরে একটা ভয় ধুকপুক করে নড়ছে। ভক্তি নয়, বিশ্বাসও নয়, কেবলমাত্র একটা ভয়। এইসব ভয় থেকেই ভক্তিরে জন্ম, অজিত জানে।

বন্ধ দরজায় মৃদু শব্দ করতেই দরজা খুলে গেল। ভিতরে একটা একতরফা প্রবল স্বর শোনা যাচ্ছে। চৌকাঠে পা দিয়েই অবাক হয়ে গেল অজিত।

একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে চিত করে ফেলে বুকে হাঁটু দিয়ে বসে আছে কুমারস্বামী। চাপা প্রবল গলায় অলৌকিক চিৎকার করে বলছে—পাপী! পাপী! মহাপাপী। অবিশ্বাসী পাষণ্ড!

পড়ে থাকা লোকটা হাত-জোড় করে ভয়ে নীল হয়ে বলছে— বাবা, রক্ষা করো, রক্ষা করো।

এই দৃশ্য একটু পরে জানতে পেরেছিল অজিত যে, ওই ম্যাজিস্ট্রেট সেদিনই প্রথম এসেছিল কুমারস্বামীর কাছে। লোকটা ঘরে ঢুকতেই কুমারস্বামী আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠে এসে দক্ষ কুস্তিগীরের মতো তাকে ধরে চিতপটাং করে ফেলেছিস।

তারা ঢুকতেই কুমারস্বামী লোকটাকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। একটু আগের প্রবল রাগ আর ঘৃণা ধুয়েমুছে গেছে মুখ থেকে। কী স্নিগ্ধ হাসি হাসল! কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল, তাতে জটা। পরনে হালকা গেরুয়া বহির্বাস আর জামা। গালে যিশুর দাড়ির মতো দাড়ি। বয়স পঞ্চাশ হতে পারে। খুব ফরসা, লম্বা চেহারা। চোখ দুটি দিঘল। অর্থাৎ চেহারাতে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কাজ বাগিয়ে বসে আছে। দুহাত বাড়িয়ে বলল—আয়! আয়!

এক বুকে কুমুদ বোস, অন্য বুকে অজিতকে জড়িয়ে ধরল অনায়াসে। তখন কুমারস্বামীর গা থেকে এত তীব্র চন্দনের গন্ধ প্রায় শ্বাসরোধ করে দিল অজিতের। তার গালে-দাড়িটা ঘসে দিয়ে কুমারস্বামী বলল—তোর বুকটা বড় ফাঁকা। না রে?

প্রথম রাউন্ডে কুমারস্বামীই জিতে গেল। ওই যে কথাটা! তোর বুকটা বড় ফাঁকা, না রে? ওই কথাটাই অজিতের ভিত ভেঙে ফেলে আর কী।

ম্যাজিস্ট্রেট লোকটা উঠে বসে চারদিকে ভ্যাবলার মতো চাইছে। একটা কষ্টের শব্দ করে হঠাৎ কাতরভাবে বলল—বাবা, আমাকে আশ্রয় দিন।

তখন অজিত আর কুমুদ বোসকে ছেড়ে কুমারস্বামী তার দিকে হাত বাড়িয়ে তুলে আনল তাকে। কাঁধে একটা চাপড় মেরে বলল—হাত মুঠো কর।

লোকটা তাই করে। কুমারস্বামী তার মুঠোর ওপর একবার বুড়ো আঙুল বুলিয়ে ছেড়ে দিয়ে বলে—এবার মুঠো খুলে হাতটা শোঁক তো।

লোকটা শুঁকেই চেঁচিয়ে বলে—এ তো গোলাপের গন্ধ! আঃ, কী সুন্দর গোলাপের গন্ধ!

বহু লোক ঘরে বসে আছে। প্রায় সবাই জোড়হাত, আর তাদের চোখ অর্ধেক বোজা। মুখে লোভলালসার ভাবের ওপর একটা ভয়-ভক্তির সাময়িক প্রলেপ পড়েছে। সবই লক্ষ কারণ অজিত। ম্যাজিস্ট্রেট লোকটা বসে বসে হাঁফাচ্ছে, আর হাত শুঁকছে। আর যারা বসে আছে তারাও কোনও না কোনও জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হবে। বাইরে বিস্তর পার্ক করা গাড়ি দেখে এসেছে অজিত। এটা গরিব গুর্বোর জায়গা নয়। দু-চারজন ঝুঁকে ম্যাজিস্ট্রেটের হাতের গোলাপের গন্ধ শুঁকল। কুমুদ বোস সেই হাতটা টেনে এনে অজিতের নাকে ধরে বলল—শোঁকো শালা। স্বর্গের গন্ধ।

একধারে তক্তপোশের ওপর বাঘের গায়ের মতো কালো-হলুদ ডোরা কাটা চাদর পাতা, তার ওপর তাকিয়া। সেখানে কুমারস্বামী বসে, আর ভক্তদের জন্য মেঝেয় ঢালাও কার্পেট পাতা। কুমারস্বামী তক্তপোশে গিয়ে বসেছে, মুখে হাসি। ম্যাজিস্ট্রেটের ওপর চড়াও হওয়াতে ঘরের আবহাওয়ায় ভক্তিভাবের ইলেকট্রিসিটি বয়ে যাচ্ছে। সবাই বেশ চাঙ্গা।

একজন অচেনা লোক অজিতকে চাপা স্বরে বলল—এখানে বসে কুকথা ভাববেন না, অবিশ্বাসী হবেন না। বাবা সব ভাইব্রেশন টের পান।

তাতে বুকে ভয়ের পাখিটা ফের নড়েচড়ে ওঠে। অফিসে সে অনেক ঠাট্টা-ইয়ারকি করে, কিন্তু এখানে আসার পরই কী যেন ঘটছে তার ভিতর। বড় দুর্বল লাগছে নিজেকে, অসহায় লাগছে। সে একটা মন দিয়ে বুঝতে পারছে যে এই ঘরের পরিবেশ, ফুল ও চন্দনের গন্ধে, কুমারস্বামীর রাগ হাসি, বুক-টেনে-নেওয়া এই সব সব কিছুর মধ্যেই একটা অত্যন্ত নিপুণ কৌশল আছে, অন্য একটা মন আবার এই সব কিছুকেই বিশ্বাস করতে চাইছে। অন্য মনটা বলছে এই যে সব সমাজের উঁচুতলার লোক, এরা কী সবাই বোকা? অশিক্ষিত? কোনও চালাকি থাকলে এরা নিশ্চয়ই টের পেত।

তাকে প্রচণ্ড চমকে দিয়ে এই সময়ে কুমারস্বামী বলল—অজিত এস।

বলে হাত বাড়ায় কুমারস্বামী। অজিত মন্ত্রমুগ্ধের মতো কাছে এগিয়ে যায়। মেঝেয় চৌকির নীচে বসে মুখ তুলে তাকায়। কুমারস্বামী সহাস্য মুখে বলে—তুমি ম্যাজিক জানো?

অজিত মাথা নেড়ে বলে—একটু।

কুমারস্বামী তার শূন্য ডান হাতখানা অজিতের দিকে বাড়িয়ে বলল—পামিং আর পাসিং জানো?

অজিত মাথা নাড়ে।

কুমারস্বামী হাতটা অজিতের চোখের সামনে একটা কূট মুদ্রায় ঘুরিয়ে দেখায়, বলে— ম্যাজিসিয়ান দ্যাখো।

অজিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। বিন্দুমাত্র কৌশল, সামান্য মাত্র পেশির সংকোচন বা প্রসারণ সে টের পাবেই।

—দেখছ? কুমারস্বামী বলে।

দেখছে অজিত। হাতে কিছু নেই।

কোনও কৌশল নয়, কুমারস্বামী খুব স্বাভাবিক ভাবে যেন এক অদৃশ্য বাগান থেকে একটা সাদা স্থলপদ্ম চয়ন করে নেয়, অজিতের চোখের সামনে।

—নাও এটা কাছে রাখো। ঝুঁকে কুমারস্বামী তার হাতে ফুলটা দেয়। আর খুব আলতো হাতে তার বুকে নিজের ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা ঘষে দেয় একবার। অমনি ম ম করে উঠল চারধারে চন্দনগন্ধের ঢেউ। কী গন্ধ! কী গন্ধ! এমন তীব্র, অসম্ভব চন্দনগাছ জীবনে কখনও পায়নি অজিত। শ্বাস রোধ হয়ে আসে। গন্ধ সম্মোহিত করে রাখে তাকে।

সেই গন্ধ আর সম্মোহন নিয়েই প্রথমদিন ফিরেছে অজিত। এমনই তার বুকের সেই গন্ধের তীব্রতা যে, যখন সে কুমারস্বামীর কাছ থেকে ফেরার পথে বাসে উঠেছে তখন সবাই চনমনে হয়ে চারদিকে চেয়েছে। দু-একজন বলে ফেলল—কী দারুণ গন্ধ! কোত্থেকে আসছে?

শীলাও অবাক। বার বার তার বুক শুঁকে বলল—উঃ! কী গন্ধ মেখে এসেছ! কে মাখালে?

অজিত কুমারস্বামীর কথা চেপে গেল। বলল—কেউ একজন হবে।

—কে গো?

—গোপন প্রেমিকা। অজিত তীব্র একটু হেসে বলে।

শীলা পায়জামা এগিয়ে দিতে হাত বাড়িয়ে বলল—আহ্। প্রেমিকা যদি অত সস্তা হত।

অজিতের কী হল, হঠাৎ বলে ফেলল—কেন অন্যের প্রেমিক থাকতে পারে, আর আমার প্রেমিকাতেই দোষ?

শীলা থমকে গিয়ে বলে— কী বলছ?

—শুনলেই তো। অজিত নিস্পৃহ মুখে বলে।

—শুনলাম। কিন্তু আমাকে বলছ কী?

—তবে আর কাকে?

শীলা স্তম্ভিত ভঙ্গিতে চেয়ে থেকে খুব মৃদুস্বরে বলে—আমার প্রেমিক কে?

অজিত এ কথার উত্তর না দিয়ে বাথরুমে চলে গেল। কিন্তু শীলা তাতে ক্ষান্ত হয়নি।

রাতে যখন শুতে গেছে শীলা অজিত তখন তার একা ম্যাজিকের ঘরে চুপ করে বসে আছে সিগারেট জ্বেলে। এই একা, বিষণ্ণমনে জেগে থাকা, তার বড় প্রিয়। সামান্য একটু ইনসোমনিয়ার মতো আছে অজিতের। রাত করে শোয়, বেলা করে ওঠে। রাতে যেটুকু সময় জেগে থাকে সে সময়টুকুই তার নিজস্ব। সারাদিনের খানিকটা অফিসের, খানিকটা শীলার, কিছুটা দাড়ি কামানো, স্নান করা, খাওয়ার মতো বাজে কাজের। শুধু এই সময়টুকু তার। এ সময়ে শীলা তাকে শুতে ডাকলে সে ভারী বিরক্ত হয়। গভীর রাত পর্যন্ত সে শুধু জেগে বসে থাকে। নিবিড় একাকী লাগে নিজেকে। তখন টের পায়, তার চারধারে এক অনন্ত অন্ধকার মহাজগৎ।

সেদিনও বসেছিল। ছোট্ট একটা নাইট ল্যাম্প জ্বলছে দেয়ালে। সে সময়ে হঠাৎ মহিমময়ীর মতো শীলা ঘরে এসে দাঁড়াল। মহিমময়ী, কারণ কান্নার জলে তার চোখ ঝলসাচ্ছে, ওঠাপড়া করছে প্রবল বুক, মুখে তীব্র অভিমান থমথম করছে। রাগলে শীলা আর আটপৌরে থাকে না।

তুমি ওকথা কেন বললে? শীলা রুদ্ধ গলায় বলে—আর একদিনও ইঙ্গিত করেছিলে তুমি কি আমাকে সন্দেহ করো?

—করি।

—কেন? শীলা হাঁটু গেড়ে তার সামনে বসে মুখ তুলে বলল।

অজিত একটু ম্লান হাসি হেসে বলে—তার কারণ, আমার বয়স প্রায় চল্লিশ, বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। অনেকদিন একসঙ্গে ঘর করার পর তোমার কাছে আমার চার্মও আর নেই। তা ছাড়া আমি সঙ্গ দিতে পারি না, স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা নাই। আমাকে যে তুমি আর পছন্দ করবে না, এটাই স্বাভাবিক।

শীলা উন্মুখ হয়ে বলে—কে বলল পছন্দ করি না! তুমি কি আমার মনের কথা জানো?

—না। অজিত মাথা নাড়ল, বলল-না জানাই ভাল। মনে কত পাপ থাকে। আমরা দুর্বল মানুষ সব পাপকে ক্ষমা করতে পারি না।

শীলা আস্তে মাথা নেড়ে বলে—আমার মনে কোনও পাপ নেই। বিশ্বাস করো। আমি তোমাকে ভালবাসি। ভীষণ।

এইসব কথার পর শীলা তার হাঁটুতে মুখ গুঁজে কেঁদেছিল। তারা কেউ সেদিন সুভদ্রর নাম উচ্চারণ করেনি। ওই নামটা উচ্চারণ করায় কোথায় যেন একটা লজ্জা ছিল, সংকোচ ছিল, আর ছিল ভয়।

শীলার সঙ্গে সেই রাতে শুয়ে তাকে অনেক আদর করেছিল অজিত। অনেক আবেগ দিয়ে ভালবেসেছিল। আর তাদের আদরে, আবেশে, রতিক্রিয়ায় সারাক্ষণ আবহের মতো কাজ করেছিল সেই চন্দনের পাগল- করা-গন্ধ।

তিন দিন পরও সেই গন্ধ রইল অজিতের বুকে। অফিসের অনেকেই এসে অজিতের বুকে শুঁকে দেখে যেতে লাগল। সেনদা বললেন—অজিত, তুমি বড় ভাগ্যবান। কুমুদ বোস সারা অফিসে তড়পাতে লাগলবলেছিলুম কিনা শালা যে কুমারস্বামীই হচ্ছে আসল লোক! ম্যাজিক হলে আমাদের ম্যাজিসিয়ান ধরে ফেলত না? ওসব যোগের ক্রিয়াকর্ম বাবা, দৈব শক্তি, ইয়ারকির কথা নয়।

শীলার সময় কীভাবে কাটে তা জানে না অজিত। সারাদিনের মধ্যে শীলার সঙ্গে দেখা হয় কতক্ষণ?

আজ কয়েক দিন হল ইস্কুল খুলেছে। শীলা বন্ধের পর ইস্কুলে গিয়েই শুনেছে, মনীষা দিদিমণি রিটায়ার করার আগে দুমাস ছুটি নিয়েছেন। ছুটির শেষে জয়েন করেই রিটায়ার করবেন। তাঁর জায়গায় ফের সুভদ্রকে নেওয়া হবে।

সুভদ্রকে নেওয়া হবে কেন? কারণ, সুভদ্র হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার সময়ে খুব ভাল ম্যানেজ করেছিল সব কিছু।

খবরটা পেয়েই শীলার শরীরের ভিতরে অন্ধকারে আলো জ্বলে উঠল। রঙিন সব আলো। একটা অসহনীয় সুখবোধ। মেয়েদের অনেক ব্যথা স্বামীকে বলতে নেই, কাউকে বলতে নেই। সে সব কথা তাদের মনের মধ্যে চন্দনের হাতবাক্সে লুকনো থাকে।

খুবই উদাসীন সেজে সুভদ্র এল ইস্কুলে একদিন। সেদিন শীলা অখণ্ড মনোযোগে খবরের কাগজ পড়েছে, অবসর সময়ে। তাকায়নি। তাকাতে ভীষণ লজ্জা করছে। সুভদ্রও এড়ানোর ভাব করছে। যেন চেনেই না।

কেবল ছুটির পর ঠিক বড় রাস্তায় এসে সঙ্গ ধরল শীলার। বলল- কী খবর গরবিনী?

শীলা মুখ লাল করে উত্তর দিল—কীসের গর্ব আবার। কথা খুঁজে পান না নাকি? কেবল বাজে কতা।

সুভদ্র উদাস গলায় বলে—কত অহংকার থাকে মানুষের! কারও বা রূপে আছে, কারও বা স্বামী বড় চাকরি করে, কেউ বা টাকার মালিক। এরকম কত রকম।

—সুভদ্র, মারব থাপ্পড়!

এইরকম ভাবে তাদের ফের ভাব হয়ে গেল। ইস্কুলে রোজ দেখা হয়। ঠারেঠোরে দুজনে দুজনের দিকে তাকায়। ভালমানুষের মতো কথা বলে। একটা পিপাসার নিবারণ হয় তাতে। আবার তৃষ্ণা বাড়েও। ইস্কুলের শেষে প্রায়দিনই তারা একসঙ্গে বেরোয়।

তারপর দুজনে ট্রামে বা রিকশায় ওঠে। ভারী পেটটা নিয়ে শীলার একটু হাসিহাসি লাগে, সুভদ্রর সামনে লজ্জাও করে। তবু বেরতে খুব রোমাঞ্চকর আনন্দ হয়।

একদিন সুভদ্র বলে—এই যে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কোনওদিন যদি অজিতদা দেখে ফেলেন, কী ভাববেন?

শীলা একটু ভ্রূ কুঁচকে বলল- কী ভাববে আবার!

—অনেক ভাবার আছে।

—কী ভাববে?

—হয়তো ভাববেন, আপনি আমার সঙ্গে প্রেম করছেন।

শীলা মুখটা ফিরিয়ে বলেছে-ফাজিল!

সেটা মুখের কথা। কিন্তু তাদের ভিতরে ভিতরে এই সব কথাই গুপ্তঘাতকের মতো, চোরের মতো ঘোরে। তাই রিকশায় বসলেই পরদা ফেলে দেয় শীলা, ট্রামে বাসে উঠলে পাশাপাশি বসতে চায় না। বলে—গা-ঘেঁষা পুরুষ আমি দুচোখে দেখতে পারি না।

এক-একদিন সুভদ্র বলে—এবার চাকরিটা তো পাকাই হয়ে গেল আমার। এজেন্সির কমিশনও শতখানেক করে আসছে। এবার ভাবছি একটা বিয়ে করলে কেমন হয়!

শীলা বড় বড় চোখে তাকিয়ে বলে—ও মা, করুন না। খুব ভাল হয়। পাত্রী দেখব?

সুভদ্র ভয়ংকর অসভ্যের মতো হেসে বলে-বুকে সইবে তো?

শীলা লাল হয়, তেড়ে মারতে আসে। আবার কখনও গভীর রাতে বা নির্জনে ভেবে দেখলে বুঝতে পারে, সুভদ্র মিথ্যে বলেনি। বুকে সইবে না। একদিন সুভদ্র মাইনে পেয়ে বলল—চলুন, একটা শার্ট কিনব। পুরনোগুলোতে আর চলছে না। শীলা রাজি। সুভদ্র ফুটপাথ থেকে কিনবে, শীলা রাজি নয়। সে বলে-না, বড় দোকানে চলুন। গড়িয়াহাটায়। গিয়েছিল তারা। অনেক রঙের, স্ট্রাইপের, চেক-এর শার্ট-এর মধ্যে পছন্দ করতে হিমসিম খাচ্ছিল তারা। অনেক রঙের, স্ট্রাইপের, চেক-এর শার্ট-এর মধ্যে পছন্দ করতে হিমসিম খাচ্ছিল তারা। ক্লান্ত দোকানদার একটা শার্ট তুলে দেখিয়ে শীলাকে বলল—আপনার হাজব্যান্ডকে এইটে পরিয়ে দেখুন, খুব মানাবে। যান না, ট্রায়াল রুমে চলে যান দুজনে, পরিয়ে আনুন।

খুব লজ্জা পেয়েছিল শীলা। সুভদ্র অবশ্য দোকানদারের ওপর এক ডিগ্রি যায়। গলা বাড়িয়ে বলল—আমার ওয়াইফ স্ট্রাইপ পছন্দ-করেন। এটা চেক, এটা ওঁর পছন্দ নয়।

এ সব কি খেলা! কেমন খেলা? খুব বিপজ্জনক? সে যাই হোক, দোকানদারের ভুল আর ভাঙেনি তারা। ওইরকমই রয়ে গেল তাদের সম্পর্ক, ওই দোকানে। হয়তো চিরকালের মতো।

অজিত কিছুই জানে না। কিন্তু একবার সে গোপনে ডাক্তার মিত্রের কাছে গিয়ে নিজেকে পরীক্ষা করিয়েছে। তার ঘোর সন্দেহ ছিল, তার নিজের হয়তো সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা নেই। ডাক্তার মিত্র তাকে পরীক্ষা করেছে। রিপোর্ট দেওয়ার সময়ে বলেছে—ডিফেক্টটা মাইনর। এতে আটকানোর কথা নয়। তবু কয়েকটা ওষুধ দিচ্ছি।

সেই কূট সন্দেহটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। শীলার পেটের বাচ্চাটা...।

অজিত আজকাল প্রায় দিনই কুমারস্বামীর কাছে যায়। অনেকক্ষণ থেকে রাত করে ফেরে। তার মুখে চোখে একটা অদ্ভুত তদগত ভাব। বিরলে শ্বাস ফেলে সে। গভীর শ্বাস, চোখ বুজে আবেগভরে বলে—বাবা।

॥ ছাপ্পান্ন ॥

চারদিকে মাইল মাইল জুড়ে মেঘের ঘুটঘুট্টে ছায়া।-বহেরুর খামারবাড়ির ধারে দাঁড়ালে কত দূর যে চোখ চলে যায়। ননীবালা দেখলেন, সেই অফুরান ফাঁকা জমির ওপর দিয়ে একটা ধুলোর পরদা উড়ে আসছে। বাতাসে ভ্যাপসা গরম ছিল এতক্ষণ, হঠাৎ সেই বাতাসে একটা ভেজাল ঢুকে গেল। উত্তুরে বাতাসের মতো ঠান্ডা আর জলগন্ধী হাওয়া এল কোত্থেকে। মুঠো মুঠো ধুলো কাঁকর এসে পড়ছে চোখেমুখে। ছেঁড়া কাগজ, গাছের পাতা, পাখির বাসার খড়কুটো উড়ছে চারধারে। বড় গাছগুলো যেন ধনুষ্টঙ্কারে বেঁকে যাচ্ছে। এক-একবার। প্রবল বাতাস ঠেলে দিচ্ছে তাঁকে, ননীবালা জোর পায়ে ঘরে এসে হুড়কো দিলেন। বাতাসের এত চাপ যে কপাটের পাল্লা দুটো ঠেসে দিতে পারছিলেন না।

ব্রজগোপাল উঠে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখছিলেন। একবার বললেন—ঝড় আসছে। এখন আলো-টালো জ্বেলো না।

ননীবালা দেখেন ঘরময় ধুলোবালি পড়েছে পুরু হয়ে, বিছানায় রাজ্যের কাঠিকুটো নোংরা এনে ফেলেছে বাতাস। বিছানা দুহাতে ঝাড়তে ঝাড়তে শুনতে পেলেন, বাইরে বাতাস গোঙাচ্ছে। বেড়ার ওপর সপাট করে এসে পড়ছে বাতাস, ঠিক যেন চোর ডাকাত ভেঙে ফেলছে ঘর। টিনের চালে একরকমের গুমগুম শব্দ। ঘরটা কেঁকে কেঁপে ওঠে। কলকাতার পাকা বাড়িতে ঝড়বৃষ্টি তেমন টের পান না। এখানে এই কাঁচাঘরে, খোলা মাঠের মধ্যে এমন প্রবল ঝড়ের আভাস দেখে বুকটা কেঁপে কেঁপে ওঠে। বাইরে কারা চেঁচামেচি দৌড়োদৌড়ি করছে। সামাল সামাল ভাব। একবার বহেরু এসে দরজায় কিল দিয়ে চেঁচিয়ে বলল—মাঠান, ঘরে আছেন তো সব?

তখনই ননীবালার খেয়াল হল, রণো তো ঘরে নেই! গেল কোথায় ছেলেটা?

আতঙ্কিত ননীবালা ব্রজগোপালের দিকে চেয়ে বলেন—রণো কোথায় গেল?

ব্রজগোপাল ঘরের আবছায়ায় মুখটা ফিরিয়ে ননীবালার দিকে চেয়ে বললেন-দেখছি।

—দেখবে! কোথায় দেখবে? এই ঝড়ে বেরোবে নাকি?

এই সময়ে প্রচণ্ড শব্দে টিনের চালের ওপর নারকোল পড়ল। বাজের শব্দ হল উত্তরের মাঠে। আর তার আগুনের ঝলক হলুদ আলোয় বিপদের গন্ধ ছড়িয়ে গেল ঘরে।

ব্রজগোপাল হুড়কো খুলতে খুলতে বললেন—দেখি সব কে কী করছে। রণোকেও খুঁজে আনি।

ননীবালা এসে হাত চেপে ধরে বললেন—বয়সটা ভুলে যাও কেন? অন্য ক্ষতি না হলেও এই বাতাসে ঠান্ডা লাগিয়ে আসবে। আমিই বরং দেখছি।

ব্রজগোপাল ঠান্ডা গলাতেই বললেন তুমি তো খামারটা ভাল চেনো না, অন্ধি সন্ধি আমি জানি। আমার ঠান্ডা লাগবে না, অভ্যাস আছে। ছেলেটার মন স্থির নেই, কোথায় চলে যায়।

সে কথাও ঠিক। উদ্বেগ বুকে নিয়ে ননীবালা সরে দাঁড়ালেন। ব্রজগোপাল হুড়কো খুলতেই ঝড়ের ধাক্কায় পাল্লা দুটো পাখনার মতো উড়ে খুলে গিয়ে কাঁপতে থাকে। বাইরে চারদিকে ধুলোটে অন্ধকার। খোলা দরজা দিয়ে রাশি রাশি ধুলো এসে অন্ধ করে দেয় ননীবালাকে। ঠাহর করে তিনি পাল্লা দুটো বন্ধ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু ডাকাতে ঝড় তাঁকে সুদ্ধু ঠেলে ফেলে দেয়, দামাল হয়ে ঘর লুটপাট করতে ঢুকে পড়েছে। ব্রজগোপাল বাইরে থেকে পাল্লা দুটো টেনে ধরেন, তাই অতি কষ্টে ননীবালা দরজা বন্ধ করতে পারলেন। জানলার ঝাঁপগুলো দড়ি দিয়ে বেঁধে গেছেন ব্রজগোপাল, তবু সেগুলো বাঁধন ছেঁড়ার জন্য আকুলি-বিকুলি করছে। হা-হা শব্দে আকাশ পাতাল জুড়ে প্রলয় চলে আসছে। আবার আগুনের আভা, তারপরই কামানের শব্দ করে বাজ ডাকল। শিউরে ওঠে ঘর। কোথায় পড়ল বাজটা। কার সর্বনাশ করল কে জানে! এত কাছে পড়ল। পুবের জানালার ঝাঁপ ফাঁক করে ননীবালা কষ্টে দেখলেন, ভূতপ্রেতের মতো মানুষ দৌড়চ্ছে চারধারে।

বেড়াল কোলে করে উঠোনে বসে আছে গন্ধ বিশ্বেস। মাজায় জোর নেই যে নিজে থেকে উঠবে। বাতাসে উলটে যাচ্ছে বেড়ালের ললাম। তিন-তিনটে ঘেয়ো কুকুর ছুটে গিয়ে ঝড়-বাতাসকে ঘেউ ঘেউ করে দিয়ে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে ফিরে আসছে গন্ধের কাছে থুপ থুপ বসে থাকা একপাল বেড়াল আলিস্যি ভেঙে উঠে ঘরদোরের ভিতর চলে গেল। কুকুরদের যাওয়া বারণ, একমাত্র গন্ধ বিশ্বেসের ঘর ছাড়া। কিন্তু ঝাঁপ বন্ধ বলে যেতে পারছে না।

গন্ধ চেঁচিয়ে বাতাসের শব্দের ওপর গলা তুলবার চেষ্টা করে—আমারে একটু ঘরে দিয়ে আয় শালার পুতেরা! হে-ই কেডা যায় রে?

নয়নতারা হাঁস তাড়িয়ে এনে বাক্সবন্দি করতে করতে চেঁচিয়ে বলল—ও জ্যাঠা, ঘরে যাও। বাতাস দিল।

গন্ধ খেঁকিয়ে ওঠে—আমারে নিবি তো!

—নিই। বলে নয়নতারা এসে হ্যাঁচকা টানে তুলে ফেলে গন্ধকে। গন্ধ উঃ উঃ করে ব্যথায় চেঁচিয়ে ওঠে। সেদিকে কান না দিয়ে নয়নতারা তাকে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে গিয়ে হাঁসের মতোই ঘরে পুরে দেয়। বন্ধ দরজার বাইরে কুকুরগুলো আকাশমুখো চেয়ে চিল্লোতে থাকে। ঝড় দুর্যোগকে ধমক মারে। দাওয়ায় উঠলে গেরস্ত দূর দূর করে। তারা যাবে কোথায়!

নয়নতারা ধুলোর ভিতরে ডুবন্ত মানুষের মতো আবছায়া হয়ে ছুটে আসে চিড়িয়াখানার কাছে। ঘেরা পরদা কিছু নেই। জাল দেওয়া খাঁচার ময়ূরটা কর্কশ স্বরে চেঁচাচ্ছে। একটু আগে পেখম ধরেছিল, এখন বুজিয়ে ফেলে একবারটায় বসে আছে ভয় খেয়ে। পাখিগুলো চেঁচাচ্ছে। হনুমান আর বাঁদর কুক কুক ডাক ছেড়ে লাভ দিচ্ছে এধার থেকে ওধার। বিন্দু কয়েকটা চট জালের গায়ে বেঁধে দেওয়ার চেষ্টা করছে। পারছে না। বাতাসে চট উড়ে যায়।

হেসে ফেলে বিন্দু বলে—ও দিদি, এ মুখপোড়াগুলোর কী হবে?

—খাঁচা খুলে দে, পালিয়ে যাক। নয়নতারা নির্দ্বিধায় বলে।

বিন্দু চোখ গোল করে বলে—জঙ্গুলে জীব, ওরা কত ঝড়বৃষ্টি দেখেছে। ঠিক গাছে-টাছে গিয়ে ঘাপটি মেরে থাকবে। নইলে বন্ধ জায়গায় আঁকুপাঁকু হয়ে মরবে।

নয়নতারাকে দরজা খুলতে হয় না। খোলা মাঠের ওপর দিয়ে একটা ঝাপটা আসে। একমুখ ধুলো খেয়ে দুই বোন বেসামাল। খাঁচার পলকা পাল্লা খুলে যায় মড়াৎ করে। আর একসময়ে ধুলোর ঝড় ভেদ করে দৈববাণীর মতো ব্রজকর্তার গলার স্বর শুনতে পায় নয়নতারা। ব্রজগোপাল চেঁচিয়ে বলছেন—কোথাও কেউ আগুন জ্বালিস না। বাতিটাতি সব নিবিয়ে ফেল।

বেজিটা নিরিক থিরিক দৌড়োচ্ছে। বহেরুর পোষা বেজি, কিন্তু ও ঠিক পোষ মানে না কখনও। সুযোগ হলে, মন করলে জঙ্গলে পালিয়ে যায়। বিন্দু চেঁচিয়ে বলে—ও দিদি, বেজিটাকে ধর।

পরপুরুষের মতো দামাল বাতাস এসে আঁচল উড়িয়ে দেয় গা থেকে। নিশেনের মতো শূন্যে আঁচল উড়িয়ে হাসে হা-হা করে। নয়নতারা আঁচল কোমরে বাঁধে আর তা করতে বেজির পিছু পিছু বিন্দু ধুলোর আস্তরণে কোথায় ঢেকে যায়। একা নয়নতারা একবার দৌড়ে যায় ব্রজগোপালের ঘরের দিকে। চেঁচিয়ে ডাকে—ও মা, ঘরে আছে তো?

ননীবালা ভয়ের গলায় চেঁচিয়ে বলেন—আমি আছি, কিন্তু ছেলে আর বাপ কোথা গেল দ্যাখ।

নয়নতারা হাসে। কে কাকে দেখে, দুর্যোগে আর বিপদে সবাই একা। এই ধুলোটে ঝড় আর মেঘ-বাদলে আজ যেন আবার এক প্রেত তাকে ডাকে। সংসারে পোঁতা তার খুঁটো আজ উপড়ে দিয়েছে ঝড়। নয়নতারা ধুলোর মধ্যে ডুব দেয়, বাতাসে ভাসে। খোঁপা খুলে এলো চুল মুঠো করে ধরেছে দুরন্ত পুরুষের মতো ঝড়। নয়নতারা দৌড়ে যায় এধার-সেধারে। অবিরল হাসে। আগুনের একটা ধমক নেমে আসে আকাশ থেকে। মাটি কেঁপে ওঠে। উত্তরের মাঠে একটা নীলচে বাজ পড়ল, স্পষ্ট দেখতে পেল নয়নতারা। একটু পরে শব্দটা হবে। সে কান চেপে ধরে। আর হি হি করে হাসে।

দমকে দমকে বাতাস বেড়ে গেল। উড়িয়ে আনছে গভীর ঘন গহীন মেঘ। কী বিপুল আকাশ জুড়ে আসছে প্রলয়। এইবার পৃথিবীর সর্বশেষ মহাপ্রলয়টি আসছে। কোনও নোয়া আর নৌকো তৈরি করেনি। টুবাই বুবাই আর মেয়েটাকে শেষবারের মতো চোখের দেখা হল বীণার সঙ্গে ফের ভালবাসার সম্পর্কে ফিরে যাওয়ার সময় হল না মহাপ্রলয় আসছে।

এক মহাভয়ে রণেন জামরুলতলায় দাঁড়িয়ে প্রকাণ্ড ঝড়ের চেহারাটা দেখছিল। চোখ দুটো বড় বড়, ঘন নিশ্বাস পড়ছে তার। বিড় বিড় করে একবার শিশুর মতো ডাকল- বাবা!

জামরুলের পাতায় পাতায় প্রবল শব্দ। পাখির বাসা ভেঙে পড়েছে পায়ের কাছে। প্রথমে লক্ষ করেনি রণেন, হঠাৎ চোখে পড়ল। ভাঙা ডিম ছড়িয়ে ছত্রখান। নিচু হয়ে দেখল ডিমের খোলা থেকে তলতলে তরল পদার্থ বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, আর তার মধ্যে না-হওয়া বকের ছানা গলা টানা দিয়ে মরছে। হায় ঈশ্বর! চমকা ভয়ে রণেনের বুক আঁকুপাঁকু করে ওঠে। ব্যাকুল হাত বাড়িয়ে সে বকের ছানার দলদলে শরীরটা তুলে নেয় হাতে। ন্যাতানো রোমহীন, লাল একটু অদ্ভুত জেলির মতো। হাতের তেলোর দিকে সভয়ে ঘেন্নায় কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে সে। তার দীর্ঘ চুলগুলিকে আঁচড়ে, বিলি কেটে চলে যাচ্ছে বাতাস, ফের মুঠোভর ধরে ছুঁড়ে মারছে কপালে। চুলের চিকের ভিতর দিয়ে নিজের হাতের তেলোর বীভৎস দৃশ্যটা দেখে হঠাৎ আবার হাতঝাড়া দিয়ে ফেলে দিল রণেন।

জামরুলতলা থেকে কয়েক পা হাঁটলে পুকুর। হাত ধুতে এসে অবাক হয়ে রণেন দেখে, কী গহীন গভীর কালো জল। মেঘের নিবিড় ছায়া বুকে ধরে কখন পাতাল-গভীর হয়ে গেছে জল। আর জলের ওপর একটা থিরথির কাঁপন। ক্রমে ঢেউ দুলে দুলে ওঠে। ছপাৎ করে জল উঠে জলে পড়ে যাচ্ছে। রণেন সেই অতল জলের কাছে এসে হাত ধুতে গিয়েও থমকে থাকে। পুকুরটা এক রহস্যময় পাতালের সুড়ঙ্গের মতো তাকে ডাকছে, টানছে, জল ছুঁলেই চুম্বকের মতো টেনে নেবে তাকে। গভীর গভীর এক তলহীন অসীম পাতালে নিয়ে যাবে।

তীব্র ভয়ে উঠে এল রণেন। আর্তস্বরে ডাকল, মা।

ধুলোর ঝড়ের প্রথম দমকটা এল। চোখে হাত চেপে বসে পড়ে রণেন। দুরন্ত বাতাস আসে মহাপ্রলয়ের অগ্রদূত হয়ে। এরপর সমুদ্রের আকাশপ্রমাণ জলরাশি আসবে। একশো তালবৃক্ষের উচ্চতা নিয়ে সমস্ত পৃথিবী ডুবিয়ে দিয়ে যাবে। কেউ থাকবে না। কেবল খুব উঁচু পাহাড়ের ওপর যারা আছে তারা বেঁচে থাকবে। বড় আফসোস হল রণেনের। আগে জানা থাকলে সে এ সময়ে ঠিক দার্জিলিঙে গিয়ে বসে থাকত সবাইকে নিয়ে।

চারদিকে ধূসরতার এক প্রবল রহস্য। তার মধ্যে সব কিছুই ছায়ার মতো অলীক হয়ে যাচ্ছে। গোঙানির শব্দ করে রণেন সাবধানে হাতের পাতার আড়াল করে চোখ খোলে। নাক দিয়ে হুড় হুড় করে তেজি বাতাস ঢুকে বেলুনের মতো ফুলিয়ে তুলছে ফুসফুস। শ্বাস টানতে হচ্ছে না, আপনা থেকেই বাতাস ঢুকে যাচ্ছে বুকের মধ্যে। তীব্র দমবন্ধ করা এক অনুভূতি হয়। ফুসফুসটা একটা পলকা লাল বেলুনের মতোই না ফটাস করে ফেটে যায়।

এখানে বহেরুর খড়ের গাদা। হামাগুড়ি দিয়ে সেই গাদায় উঠে আসে রণেন। মাচাটা মচমচ শব্দ করে। আর গাদার মাচার তলায় কয়েকটা ঘেয়ো কুকুর আর্তস্বরে চিৎকার করতে থাকে। রণেন খড়ের মধ্যে একটা গভীর খাঁজ দেখতে পেয়ে উঠে বসে। চারদিকে প্রকাণ্ড এক শব্দ হচ্ছে, খড় উলটে যাচ্ছে বাতাসে, উড়ে যাচ্ছে। একটা গুলঞ্চ গাছের ডাল মড়াৎ করে ভেঙে পড়ল। গাছে গাছে হাহাকার বেজে যাচ্ছে অবিরল।

অবোধ চোখে খানিকক্ষণ দেখল রণেন। ডানহাতের চেটোয় এখনও সেই ডিমভাঙা তরল পদার্থের চটচটে ভাব। খড়ের গায়ে হাতটা ঘাসে নিয়েও চটচটে ভাবটা যায় না। বড় ঘেন্না। বড় ভয়। কত পাখির বাসা ভাঙছে, ডিম ভাঙছে। কত বাড়িঘর ভেসে জলের অতিকায় ঢেউয়ের মতোই একটা মেঘ দিগন্তে উঠে আসছে। রণেন তীব্র একটা চিৎকার দিয়ে চোখ বুজল। ফের খুলল। ফের বুজল।

আপন মনে নিজেকে বলল—ওই আসছে।

এই সেই ভয়ংকর শেষ দিন। মহাপ্রলয়ের ঢেউ কি ওই? বোজা চোখ ফের খুলে ফেলল রণেন। দেখল, পর্বতপ্রমাণ একটা ঢেউ আকাশে মাথা তুলছে। তার কলকল ঘোর নিনাদ শুনতে পায় রণেন। বিশাল প্রবাহের মতো জলরাশি এসে গেল প্রায়।

এ সময়ে কে যেন চিৎকার করে ছুটে ছুটে বলছে—তোরা সব ফাঁকা জায়গায় গিয়ে দাঁড়া, ঘরে থাকিস না, গাছগাছালির কাছে যাস না।

বাবার গলা না! হ্যাঁ, বাবার গলাই। উৎকর্ণ হয়ে শোনে রণেন। চিৎকার করে ডাকে— বাবা!

কেউ উত্তর দেয় না। কিন্তু বাতাসের শব্দ ছুঁড়ে একটা অদ্ভুত শব্দ রণেনের কানে আসে। কে যেন এই দুর্যোগে খোল বাজাতে বসেছ। কী তীব্র বোল! রণেন শোনে খোল বলছে- ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই..

কী বলছে! বলছে—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল...আয় ব্যাটা, আয় ব্যাটা, আয় ব্যাটা...হরিবোল....

রণেন লাফ দিয়ে নামল। একটা শেষ সাহস তার বুকের মধ্যে জ্বলে উঠেছে মশালের মতো। মরবই যখন, ভয় কী? আয়, জল, আয় ঝড়, আয়...

মুহুর্মুহু আগুনে আগুনে রং ছড়িয়ে বাজ পড়ছে চারধারে। কী প্রবল শব্দ! মহাপ্রলয়ের তীব্র ক্রোধ চারধারে আগুনের রং ধরিয়ে দিল। কে যেন 'ভগবান' বলে চেঁচিয়ে উঠে মূক হয়ে গেল। গভীর ধুলোর স্তরের মধ্যে আবছা হয়ে যায় সব কিছু।

রণেন পরনের কাপড়টায় কাছা মেরে নেয়। তারপর গুটি গুটি খোলা মাঠের মধ্যে এগিয়ে যেতে থাকে। তার সামনে দিয়ে এক বিশাল পেখমের বোঝা টেনে দৌড়ে যায় ময়ূর। কর্কশ একটা ডাক দেয়। আর বাতাসের তুমুল হট্টগোলের মধ্যে কাদের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। একবার কে যেন বুকফাটা চিৎকার দিয়ে ডাকল—রণো।

সে-ডাক শোনার সময় রণেনের নেই। মহাপ্রলয় তাকে ডাকে যে। ওই মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে একবার মুখোমুখি মৃত্যুর প্রকৃত স্বাদ জেনে নেবে। মাঠের মাঝখানটির দিকে বাতাস ভেদ করে রণেন দৌড়োয়।

টিনের চালে টুং টাং করে প্রথম কয়েকটা শিল পড়ল। তারপরেই হুড়মুড় করে পাথরের টুকরোর মতো বড় বড় খাঁজকাটা, হিংস্র শিল পড়তেই লাগল। কয়েক পলকে সাদা হয়ে যাচ্ছিল মাঠ-ঘাট খামারবাড়ি। ভূতের ঢিলের মতো শিল এসে পড়ছে অন্তরীক্ষ থেকে, গড়িয়ে যাচ্ছে মাটির ওপর, লাফাচ্ছে। বরফের ঘর খুলে কে যেন উপুড় করে দিয়েছে।

শিলের প্রথম চোটটা গেল বহেরুর ওপর দিয়ে। কেলে গোরুর বোকা বাছুরটা গোয়ালে যায়নি। সেটাকে টেনে আনতে গিয়ে আধলা ইটের মতো একটা শিল তার বাঁ হাতের কবজি থেঁতলে দিয়ে গেল। আর গোটা দুই পড়ল মাথায় বাঁধা গামছা ভেজ করে ঘিলুতে। দাঁতে দাঁত চেপে বহেরু প্রথমটা সামলে নিল। গোয়ালে ঢুকে বিড় বিড় করে গাল দিল দুর্যোগকে।

কপাল থেকে রক্তের ধারা নেমে ভাসিয়ে দিচ্ছিল নয়নতারার মুখ। রক্তের নোনা স্বাদ জিভে ঠেকাতেই তার সম্বিত ফিরে আসে। ভূতটা ছেড়ে গেল। দৌড়ে গিয়ে আচম্বিতে একটা বন্ধ দরজায় ধাক্কা দেয়। কার দরজা ঠিক ঠাহর হয় না।

ননীবালা দরজা খুলে চেঁচিয়ে বলেন—ও মাগো! কী হল তোর?

—কিছু নয় মা, শিল পড়েছে।

ননীবালা তাকে ঘরে টেনে নিয়ে দরজাটা ফের বন্ধ করে বলেন—ছেলে আর ছেলের বাপের জন্য বুক শুকিয়ে যাচ্ছে মা। কোথায় যে গেল।

—ফেরেনি?

ঘটির জলে কপালটা ধুয়ে নিল নয়নতারা। ননীবালা দেখে বললেন—অনেকটা কেটে গেছে। খুব ফুলেছে। একটু ডেটল দে।

নয়নতারা হেসে মাথা নেড়ে বলল—ওতে কিছু হবে না। যাতে চোপাট, তাতেই লোপাট।

এই বলে ঘোমটা দিয়ে বাইরে থেকে একটা শিল কুড়িয়ে আনল। সেইটে কপালের কাটা জায়গায় চেপে ধরে বলল—ব্রজকর্তার জন্য চিন্তা নেই মা, তবে রণেনবাবু..

শিল পড়ার শব্দ শেষ হয়নি তখনও, বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। দামাল বাতাস পৃথিবীর সব মেঘ উড়িয়ে আজ আকাশে। কলের জলের মতো মোটা ধারায় জল নেমে আসছে। অবিরাম, অবিশ্রাম। চারদিক গভীর অন্ধকারে তলিয়ে যায়। আর তখন ব্রজগোপাল রণেনকে মাঠ থেকে তুলে আনছেন। তার কানের কাছে বলছেন-না বাবা, তোমার খুব চোট হয়নি। শিলটা জোর পড়েছিল। বাবলা গাছটার জন্য বেঁচে গেছ!

—বাবা, মহাপ্রলয় হবে। রণেন বলে। তার ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছে। একটা চোখ ফুলে আছে। ব্রজগোপালের কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটছে।

ব্রজগোপাল অজস্র বৃষ্টির ধারায় ভিজে যাচ্ছেন রণেনের সঙ্গে। তবু হেসে বললেন—হবে হলে। ভয় কী?

—বড় ভয় বাবা। সব মরে যাবে।

ব্রজগোপাল তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেন—বিশ্বাস বাবা, বিশ্বাসই সব সার কথা। যতক্ষণ না মরণ আসছে ততক্ষণ তো তাঁর দয়ায় বেঁচে আছি। আর যতক্ষণ বেঁচে আছি, ততক্ষণ কিছুতেই মৃত্যু নেই।

বৃষ্টি থেমে যায়নি তখনো। পড়ছে। তবে এখন একটানা, একঘেয়ে জলের শব্দ। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া দিচ্ছে। ঘরের মধ্যে হারিকেনের আলো উসকে উঠছে সেই বাতাসে।

রণেন শুয়ে আছে বিছানায়, তার পাশে পা ঝুলিয়ে বসে ননীবালা। মেঝেয় বসে এক বাটি দুধ স্টোভে গরম করছে নয়নতারা। এখনও তার কপাল আব হয়ে ফুলে আছে। বলল—মা, রান্নাঘর তো ভেসে ভেসে গেছে। এ ঘরেই আজ তোলা উনুন জ্বেলে দিই?

ননীবালা পানের পিক ফেলে এসে বললেন—দে। বহেরুকে বলব কালই রান্নাঘরটা মেরামত করতে।

রণেন চোখ বুজে শুয়ে হিজিবিজি ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ভাবল—নয়নতারা কেন তার মাকে মা ডাকে। অ্যাঁ! ভাবতে ভাবতে খুবই উত্তেজনা বোধ করল সে। পাশ ফিরে নয়নতারার দিকে তাকাল।

ব্রজগোপাল ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে এলেন। ছাতা মুড়ে রাখলেন দরজার পাশে।

ননীবালা একবার চেয়ে দেখে বললেন—নিউমোনিয়াটি না বাঁধালে আর চলছে না? এই বয়সে অত ভেজা কি সইবে? কে শোনে কার কার কথা!

ব্রজগোপাল গায়ের পিরানটি খুলে ফেললেন। বললেন—প্রতিবারই ঝড়জলে নানা ক্ষয়ক্ষতি হয়। কাল সকালে সব বোঝা যাবে। বলে ননীবালার দিকে চেয়ে চেয়ে কুণ্ঠিতভাবে বললেন—আজ তো আর যেতে পারলে না। কলকাতার বাসার জন্য খুব চিন্তা করছিলে!

—যাওয়া আর হল কই?

ব্রজগোপাল শুকনো কাপড় পরতে পরতে বললেন—তা হলে কাল যাবে? কখন যাওয়া জানিয়ে রাখলে রিকশা বলে রাখবে বহেরু।

ননীবালা উত্তর দিলেন না। নয়নতারাকে বললেন—কী এক রসকষ ছাড়া পান সেজেছিস বল তো! আর একটা ভাল করে সাজ।

নয়নতারা দুধের বাটির জ্বাল রেখে পান সাজতে বসে।

ব্রজগোপাল ফের বলেন—কল কখন যাওয়া?

ননীবালা হঠাৎ ঝেঁঝে উঠে বলেন—না গেলে তাড়িয়ে দেবে নাকি? কেবল যাওয়া-যাওয়া করছ কেন?

॥ সাতান্ন ॥

বীণা বিরক্ত হয়ে এসে বলে—একটু আগে কে একটা মেয়ে তোমার কাছে এসেছিল বলো তো!

সোমেন ছুটকো কাগজে কিছু লিখবার চেষ্টা করছে, হচ্ছে না। সিগারেটের ধোঁয়ায় চারদিক আবছা। বুকে বালিশ চেপে উপুড় হয়ে শুয়েছিল সোমেন, বীণার দিকে একবার অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে বলল—চা খাওয়াবে নাকি এক কাপ?

বীণা বলে—বেলা এগারোটায় চা? এটা কি রেস্টুরেন্ট! যাও, চান করে এস, ভাত খাবে। এখন আমার অনেক কাজ।

সোমেনের অন্যমনস্কতাটা কেটে গেল, হেসে বলল—মা আর দাদা আউট হওয়ার পর থেকেই তো তোমার সামার ভ্যাকেশন চলছে। অত কাজ দেখিয়ো না।

—ইস, সামার ভ্যাকেশন! তিনটে বাচ্চা আর তুমি একটা বুড়ো খোকা, মোট চারটের ঝামেলা কি কম নাকি! টুবাইটা মার খুব ন্যাওটা, ওটাকে আমি সামলাতেই পারি না। ঠাকুমা গল্প বলে খাওয়ালে বেশ খেত, যেই ঠাকুমা চলে গেছে অমনি ওকে অরুচিতে ধরেছে। আমিও গল্প বলি, কিন্তু সে গল্প ওর পছন্দ নয়। সারাদিন ওকে খাওয়ানোর জন আমার হাড় কালি হয়ে গেল। ওঁরা যে কবে আসবেন!...তিনদিনের নাম করে গেলেন, পাঁচদিন হয়ে ছদিন চলছে।

—চায়ের কথাটা দিব্যি ম্যানেজ করে চাপা দিলে কিন্তু।

বীণা স্নিগ্ধ চোখে দেওরটির দিকে চেয়ে একটু হাসে। এই ছেলেটির প্রতি তার একরকম মা-ভাব আছে। বুবাই টুবাইয়ের মতোই যেন আর একজন।

বীণা ননীবালার চৌকিটায় বসে বলে—আর তুমি যে ওই মেয়েটার কথা চেপে যাচ্ছ! কে মেয়েটা? খুব গাড়ি হাঁকড়ে আসে।

সোমেন কাগজে হিজিবিজি লিখতে লিখতেই বলল—খুব বড়লোকের মেয়ে, বুঝলে! প্রসপেকটিভ!

—সে হোকগে। মেয়েটার কিন্তু মাথায় ছিট আছে।

—কেন? সোমেন হেসে জিজ্ঞেস করে।

বীণা মুখটা গোমড়া করে বলে—বাসায় আসে তো প্রায়ই, একদিনও আমার সঙ্গে কথা বলল না। এমনকী বাচ্চাগুলো কাছে গেলে একটু আদর করা কী কথা বলা দূরে থাক, একবার ভাল করে তাকায় না পর্যন্ত। এ বাড়িতে ও কেবল তোমাকে দেখে, কেন আমরা কী নেই? পুরো ছিটিয়াল।

—ছিট আছে কিনা কে জানে, তবে মাথায় টিউমার আছে। বলে সোমেন বউদির দিকে চেয়ে একটু হাসে, পরমুহূর্তেই হাসিটা মিলিয়ে একটু বিষন্নতার মেঘের ছায়া পড়ে মুখে। বলল—ব্রেন টিউমার। বোধ হয় বাঁচবে না।

—যাঃ। বীণা বিশ্বাস করতে চায় না।

—সত্যি।

বীণা চোখ দুখানা বড় করে বলতে আমি ভাবলাম বুঝি এই মেয়েটাই একদিন আমার জা হয়ে আসবে। তাই আনসোশ্যাল দেখে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

সোমেন খুব হাসল, বলল—মেয়েদের সঙ্গে একটু মিশলেই প্রেম হয়, আর প্রেম হলেই বিয়ে হয়, না? তুমি একদম সরল অঙ্ক।

—আহা, দোষ কী! ভাব হলে বিয়ে হওয়াই তো ভাল। মেয়েটা তোমাকে খুব পছন্দ করে। তোমাকে ছাড়া কাউকে চেনেই না। বিয়ে হলে বেশ হত। আমি তো গরিব ঘরের মেয়ে, তোমার বউ অন্তত বড়ঘরের মেয়ে হলে ব্যালান্স হয়ে যেত। সত্যি বলছ ব্রেন টিউমার?

—সত্যি। না হলে কি আমাকে পাত্তা দিত নাকি? অসুখ হয়েছে বলেই মনটা নরম। সবাইকেই পছন্দ করে ফেলে। যাও, অনেক বকিয়েছ, চা দাও তার বদলে।

বীণা উঠে গেল।

বিকেলে গাব্বুকে পড়াতে গেছে সোমেন। পড়ার ঘরে ঢুকেই চমক খেল। গাব্বু যে চেয়ারে বসে সেখানে খুব সুন্দর মতো একটি মেয়ে বসে আছে। পরনে চমৎকার একটা লালপেড়ে সাদা খোলের বিষ্ণুপুরী শাড়ি। মেয়েটি টেবিলের ওপর ঝুঁকে কী যেন পড়ছে। তার এলোচুলের ঢল নেমে এ পাশে মুখটাকে আড়াল করেছে। সোমেন ঘরে ঢুকতে মেয়েটা মুখ ফেরাল না।

তারপর সেই নিবিড় নরম এলোচুলে ঢেউ দিয়ে মুখটা নড়ে উঠে সোমেনের দিকে চকিতে ফিরল। তখনই ভারী পাওয়ারের চশমাটা চিনতে পারে সোমেন।

অণিমা হেসে বলে—এস সোমেন।

অণিমাকে চেনাই যায় না। ইউনিভার্সিটিতে থাকতে একটু রুক্ষ ছিল, বিয়ের আগে দিল্লি ঘুরে এসে একটু ভাল হয়েছিল চেহারা। কিন্তু এখন কে যেন ওকে নতুন করে গড়েছে। শরীরে মাংস বা চরবি লাগলেই মানুষ সুন্দর হয় না। সুন্দর হওয়া এক রহস্যময় অ্যালকেমি। সৌন্দর্যের সবটুকু শরীরে থাকে না বুঝি। অণিমার শরীরকে ঘিরে এক অদ্ভুত সৌন্দর্যের আবহ। তার চারধারের বাতাসটুকু, আলোটুকু গন্ধটুকু সবই যেন সুন্দর হয়ে আছে। বড় বেশি দূরের আর বড় বেশি অভিজাত হয়ে গেছে অণিমা।

সোমেন হাঁ করে চেয়েছিল। একটা ঢোঁক গিলে বলল—কবে এলে?

কাল।

সোমেন মুখোমুখি চেয়ারে বসে বলল—সিন্ধ্রির জলবায়ু তো বেশ ভালই অণিমা।

অণিমা খুব শান্ত ও সুখী একরকম হাসি হাসল। এবং সোমেন খুব দুঃখের সঙ্গে বুঝতে পারল, অণিমার মনে আর কোনও দুঃখ নেই। খুব অল্প সময়ের মধ্যে ও সোমেনের ঘটনাটা থেকে মুক্ত হয়েছে।

অণিমা বলল—হাওয়া বদল করতে সিন্ধ্রিতে যেয়ো একবার।

সোমেন খুব বিষণ্ণ বোধ করছিল হঠাৎ, তবু যথেষ্ট চতুর হওয়ার চেষ্টা করে বলে-ভাল আছ তো দেখতেই পাচ্ছি। তবু জিজ্ঞেস করি—অণিমা, কেমন আছ?

অণিমা ভ্রু কুঁচকে বলে—ও আবার কী রকম প্যাঁচালো কথা সোমেন?

সোমেন স্থির চোখে চেয়ে বলে—অণিমা, কেমন আছ?

অণিমা খুব হাসল, তারপর হাসি থামিয়ে একটু স্মিতভাবে বলল—ভাল আছি বলতে ভয় করে সোমেন। বললে যদি আর ভাল না থাকি।

সোমেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—অণিমা, পৃথিবীতে মেয়েদের মতো এত সুখী কেউ নেই।

—ওমা! কী বলে রে ছেলেটা!

—সত্যি। যদি মেয়ে হতাম তবে চাকরির চিন্তা থাকত না। এই বয়সে একটা বিয়ে হয়ে যেত। আর বিয়ের আগেকার সব কিছু ভুলে গিয়ে সুখী হতে সময় লাগত না।

—অ্যাই! বলে ধমক দিল অণিমা—বিয়ের আগে তোমার আবার কী ছিল, যন্ত্রণা যা ছিল তা তো আমার ছিল।

সোমেন সেটা জানে, তবু দুঃখও তো কত রকমের হয়। আজ যেমন মনে হচ্ছে সে অণিমাকেই ভালবাসত। ভালবাসাটা আজ যেন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। এক তীব্র টান আজ কূল ভাঙছে, পায়ের নীচের মাটি সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বলল—সে তুমি বুঝবে না।

—মিথ্যে কথা বোলো না সোমেন।

বলে অণিমা চেয়ে রইল সোমেনের দিকে। চোখে বুঝি একটু অনুযোগ, একটু স্নেহ।

সোমেন বলল—অণিমা, এখনও চাঁদ-টাঁদ ওঠে, ফুল-টুল ফোটে, লোডশেডিং হয়...

অণিমা দুটি গায়ে হলুদের সময়কার মতো সুন্দর লালচে-হলুদ রঙের হাতের পাতায় লজ্জায় মুখ ঢাকল। বলল—অ্যাই।

সোমেন ঝুঁকে বলে— কথাটা এখনও বলা হয়নি স্পষ্ট করে। তবু জিজ্ঞেস করি—অণিমা, এখনও কি আমাকে...

অণিমা মাথা নেড়ে বলে—না অমরনাথ, লোকে পাখি পুষিলে যে স্নেহ করে, ইহলোকে তোমার প্রতি আমার সে স্নেহও কখনও হইবেনা। বলে একটু দাঁতে ঠোঁট কামড়ে বলল—বলো তো কোথা থেকে বললাম।

সোমেন মৃদু হেসে বলে— রজনী। তারপর গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করে বলে—এই বুঝি মনের কথা?

—নয় কেন? বলে অণিমা উঠল। টেবিলে ভর রেখে ঝুঁকে বলল—তুমি আমার কে জানিতে চাও? এ পৃথিবীতে তুমি আমার কেহ নও। কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে—

কেউই তেমন হাসতে পারল না। চেষ্টা করল অবশ্য।

অণিমা বলল—দাঁড়াও গাব্বুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বলে চলে গেল অণিমা। আর তখন অপসৃয়মান অণিমার পরনের শাড়িটা লক্ষ করে কী যেন মনে পড়ি-পড়ি করছিল সোমেনের। ভ্রূ কুঁচকে একটু ভাবল সে। তারপর হঠাৎ মাথার ভিতরে বজ্রাঘাতের মতো মনে পড়ল, এ শাড়িটা সে অণিমার কাছ থেকে টাকা ধার কিনে দিয়েছিল অণিমাকেই। সেই দেড়শো টাকা আজও শোধ দেওয়া হয়নি। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল সোমেন। ওই শাড়িটা কি ইচ্ছে করেই পরে বসেছিল অণিমা, সোমেনকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য? ছি ছি, তা নয়। অণিমা ছোট মনের মানুষ ছিল না কোনওদিনই।

গাব্বু আসতেই সোমেন দাঁড়িয়ে বলল—আজ পড়ব না গাব্বু। শরীরটা ভাল নেই।

হতাশা, ব্যর্থতা আর বিস্বাদে ভরা ভিতরটাকে নিয়ে সোমেন বেরিয়ে পড়ল। উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরতে লাগল। দেড়শোটা টাকা এমন কিছু নয়। যখন দেওয়ার কথা মনে করেছে তখন হাতে টাকা ছিল না, যখন টাকা ছিল তখন দিতে ভুলে গেছে। এইসব তুচ্ছ কর্তব্যের অবহেলা কী ভয়ংকর! নিজেকে দেউলিয়ার মতো লাগে। অপমান করতে আর চাবকাতে ইচ্ছে করে নিজেকে। একটু আগে অণিমার সঙ্গে যে চমৎকার সাংকেতিক সংলাপ হচ্ছিল তার সেইটুকুর রেশ গেল কেটে। নিজেকে বড় ছোট লাগছে তার। সোমেন খুব উত্তেজিতভাবে মনে মনে বলল—আই মাস্ট পে হার ব্যাক। আই মাস্ট...

এতই স্তিমিত ছিল সোমেন যে রাতে ঘুমই হল না। নিজেকে অসহ্য বলে মনে হচ্ছে। মানুষের মুশকিল এই যে, দরকার পড়লে সে সব মানুষকে এড়িয়ে থাকতে পারে, কিন্তু কিছুতেই নিজেকে এড়াতে পারে না। অহরহ সোমেনকে একটা অপদার্থ, ছোটলোক সোমেনের সঙ্গ করতেই হবে, মৃত্যু পর্যন্ত।

নির্ঘুম রাতের শেষে সকালের দিকে একটু বুঝি ঘুমিয়েছিল, বউদি এসে তুলে দিয়ে বলল, বাজারে যাও।

চোখ খুলেই সোমেন বলল—দেড়শোটা টাকা দেবে বউদি?

বীণা অবাক চোখে চেয়ে বলল—আগেও একবার চেয়েছিলে। কী ব্যাপার, প্রায়ই দেড়শো করে টাকার দরকার হচ্ছে কেন?

—সেই দরকারটাই। টাকাটা তখন কারও কাছে পেলাম না। দেবে?

বীণা থামল। যদিও হাসিটা বড় কষ্টের। বলল—খুব দরকার থাকলে দেব।

—খুব দরকার, খুব। না হলে সুইসাইড করব।

—আচ্ছা আচ্ছা, তোমার দাম দেড়শো টাকার ঢের বেশি। ওঠো।

সোমেন ঘুমচোখে শুয়ে থেকেই সিগারেট ধরাল। বলল—যাঃ। দেড়শো টাকার দাম আমার চেয়ে অনেক বেশি বউদি, আমি একটা ফ্রড।

—তার মানে?

—অচল পয়সা। তুমি ইংরেজি জানো না কেন বলো তো! সব কথার মানে বলতে গেলে মুড নষ্ট হয়ে যায়।

—যাওয়াই ভাল। আজ তোমার মুড খুব খারাপ। কালও বিকেলে দেখেছি একদম মৌনিবাবা হয়ে আছে। কী হয়েছে?

—আমার মৃত্যু হয়েছে বউদি। আই অ্যাম ডেড।

—সকলবেলাটায় আকথা বলছ? বাজারে যাও তো।

—দেড়শো টাকা দিতে তোমার খুব কষ্ট হবে?

বীণা আবার হাসল। বলল—এসব তোমাকে ভাবতে হবে না। দেব বলেছি যখন ঠিক দেব। আর দিয়ে মরে যাব না।

বাজার করে যখন ফিরছিল সোমেন তখন হঠাৎ একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেল। বাড়ির দরজায় যখন প্রায় পৌঁছে গেছে, তখন দেখল, বড় রাস্তার দিক থেকে মা আর দাদা হেঁটে হেঁটে আসছে। মার হাতে একটা পুঁটুলি, দাদার হাতে চামড়ার ব্যাগ। দুজনেরই পোশাক কেমন আধময়লা। উদ্বাস্তুর মতো ভিখিরির মতো

আসছে। সম্ভবত বাসে এ সে নেমেছে, তারপর এই রাস্তাটুকু হেঁটে আসছে। অথচ একসময়ে দাদা ট্যাক্সি ছাড়া আর কিছু চোখে দেখত না।

সোমেন সিগারেটটা ফেলে দিয়ে এগিয়ে দাদার হাত থেকে ব্যাগটা নিল। মা তাকে দেখে বলল—ইস্ অফিস টাইমে সব বাসে কী ভিড় কী ভিড়! ট্রেনেও থিকথিক করছে লোক। বাব্বাঃ!

খুব একটা খুশি হল না সোমেন। যেন অচেনা লোকজন এল বাড়িতে। এ কয়দিন নিরিবিলিতে বেশ ছিল। এবার উৎপাত হবে।

মাকে কিছু গম্ভীর ও অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। ঘরে এসেই তিনি ছোট নাতিকে কোল-সই করে নিয়ে পানের বাটা খুলে বসলেন। রণেনের মুখে কিছু কাটা দাগ, ক্লান্তির চিহ্ন। সোমেন সবই দেখল, কোনও প্রশ্ন করল না। মনটা শুধু আর এক পোঁচ কালো হয়ে গেল।

ভাইঝিটার নাম আদর করে রেখেছিল বেলকুঁড়ি। বেলকুঁড়ি একটু হইচই ভালবাসে। রেডিয়োগ্রাম ছেড়ে গলা মিলিয়ে গান গায়, নাচে, বাড়িতে লোকজন এলে খুব খুশি হয়। ঠাকুমা আসাতে সে সারা বাড়ি নেচে বেড়াচ্ছে। একবার দৌড়ে এসে ঠাকুমার বুকের মধ্যে হাত পুরে মুনু ধরে গেছে, এখন হাততালি দিয়ে সুর করে গাইছে-‘ঠানু এসেছে, বাবু এসেছে, ঠানু এসেছে, বাবু এসেছে...’

সোমেন তাকে একটা কর্কশ ধমক দিয়ে বলে-যা তো এখন।

ননীবালা পানের রসে রসস্থ মুখটা ঊর্ধ্বপানে তুলে পানের পিক যাতে বের না হয় এরকম সতর্ক হয়ে বলেন—যাবে কোথায়! কলকাতার বাড়িঘরে থাকে, যা বললেই তো আর হুট করে বেরিয়ে যেতে পারে না। কোন মাঠঘাট ময়দানটা আছে এখানে যে যা বলতেই যাবে।

সোমেন গম্ভীরভাবে জামা পরতে পরতে বলে—তা হলে আমিই যাই।

ননীবালা বড় চোখে তাকিয়ে বলেন—কোথায় যাবি?

—তাতে তোমার কী দরকার! যাব কোথাও।

ননীবালা পিক ফেলে এসে বললেন—বাড়িতে এখনও ভাল করে পা দিইনি, ওমনি সব বিষ হয়ে গেল!

সোমেন বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে পড়ল ফের।

কিন্তু জায়গা নেই। কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই।

অনেক ভেবেচিন্তে মধুমিতাকে একটা ফোন করল সোমেন।

ফোনের কাছেই সারাদিন বসে থাকে মধুমিতা। হয় ওকে কেউ ডাকে, অনেকক্ষণ কেউ না ডাকলে ও-ই কাউকে ডাকে।

মধুমিতার উৎসুক গলা, বলল—কে?

—আমি সোমেন। একবার আসব? আড্ডা দিতে ইচ্ছে করছে।

—এক্ষুনি। উঃ, কতক্ষণ একা বসে আছি।

কী চমৎকার বাড়ি মধুমিতাদের! সোমেনদের পচা ভাড়াটে বাড়ি থেকে মাত্র সাত মিনিট হাঁটলেই এই স্বর্গের বাড়ি। রিখিয়াদের চেয়েও এরা অনেক বড়লোক।

মধুমিতা তার ঘরে নিয়ে গেল। চাকরকে ঠান্ডা কিছু দিতে বলে মুখোমুখি বসল সোফায়। ওর প্রিয় ভঙ্গী পা তুলে হাঁটু দুহাতে জড়িয়ে বসা। বসে বলল—ডেট ঠিক হয়ে গেছে।

—কীসের?

—ইমপ্রিজনমেন্ট টিল ডেথ। কাল ভেলোরে চলে যাচ্ছি। সব ঠিক হয়ে গেছে—

—ওঃ। বলে চুপ করে থাকল সোমেন।

মধুমিতাকে খুব বিষন্ন দেখাচ্ছিল না। ওর গোল মুখখানায় একটা চাপা হাসির আলো খেলা করছে। হঠাৎ খুব জোর একটা শ্বাস ফেলে বলল-রিলিফ। একটা একঘেয়ে জীবন থেকে মুক্তি।

—সব ঠিক হয়ে যাবে, দেখো। সোমেন সান্ত্বনা দিয়ে বলে।

মধুমিতা তার বড় চোখে চেয়ে বলল—শোনো তুমি কিন্তু বড্ড মেয়েদের সঙ্গে মেশো।

—কে বলল?

—আমি জানি। তোমার অনেক মেয়ে বন্ধু।

সোমেন এই পুঁচকে মেয়েটার মুখে জ্যাঠা কথা শুনে একটু উত্তপ্ত হয়ে বলে—তাতে কী?

—পুরুষমানুষ মেয়েদের সঙ্গে বেশি মিশলে খারাপ দেখায়। অপরাজিতার সঙ্গে যেদিন তুমি ক্যারাম খেলছিলে, আমার খুব খারাপ লাগছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটা মেয়ের সঙ্গে একটা পুরুষ খুটখাট ক্যারম খেলছে, এই কি পুরুষের মতো কাজ?

সোমেন আর রাগে না। হাসে। বলে—শোনো মধু, তুমি বড় পাকা। আমার বয়স কত জানো?

মধুমিতা মাথা নেড়ে বলে—সে যাই হোক, আমি জানতে চাই না। আমার ওয়েলউইশারদের সকলের ভাল হোক, মরবার আগে আমি সেটুকু চাই।

সোমেন হতাশভাবে চেয়ে থেকে বলে—আমার জন্য কী চাইলে তুমি।

—মেয়েদের সঙ্গে মিশো না। যখন একা লাগবে তখন একাই থেকো। আর একা বসে চিন্তা কোরো যে, তোমার চারদিকে একটা বিশাল দেশ। সে দেশটা কাঙাল আর ভিখিরিতে ভরা। থিংক সামথিং গুড ফর দেম।

সোমেন হেসে বলে—তুমি বড় পাকা মধু।

মধুমিতা মাথা নাড়ল। চাকর ট্রেতে করে ঠান্ডা আমের শরবত দিয়ে গেল। গেলাসটা সোমেনের হাতে তুলে দিয়ে মধুমিতা বলে—সব সভ্য দেশেই আমার বয়সি ছেলেমেয়েরা আরও অনেক বেশি কনশাস। একে পাকা বলে না, জাস্ট ওয়েল ইনফর্মড। সোমেনদা, তোমার কোনও আইডিয়াল নেই কেন? আইডিয়াল না থাকলে মানুষটা স্ট্রং ওপিনিয়ন তৈরি হয় না। ব্যক্তিত্বও থাকে না।

সোমেন ঠান্ডা শরবত খেতে খেতে আবার উত্তপ্ত হল। কান আগুনের মতো গরম। বলল—তাই বুঝি?

মধুমিতা মৃদু একটু হেসে চুলগুলো সরিয়ে দিল পিছনে। কোলের বালিশটা একবার ছুঁড়ে ফেলে ফের কুড়িয়ে নিল। বলল—তুমি টের পাও না যে তুমি কত ডিটাচড? তোমার চারদিকের সঙ্গে তোমার কোনও সম্পর্কই তৈরি হয়নি। কোনও ব্যাপারেই তোমার কোনও ইন্টারেস্ট নেই। কেবল মাঝে মাঝে চাকরির কথা বলো। চাকরিই কি সব? কত ছেলে জেলখানায় পচছে তা জানো? ওরা কিছু করতে চেয়েছিল। ইউ মাস্ট বি কনশাস অ্যাবাউট ইয়োর এনভিরনমেন্ট।

—মধু, আজ তোমাকে কথায় পেয়েছে।

মধুমিতা উঠে এল সোমেনের পাশে। অনায়াসে পুরুষ বন্ধুর মতো কাঁধে হাত রেখে বলল—শোনো সোমেনদা। উই আর কমরেডস। নই কি? অ্যান্ড কমরেডস আর অলওয়েজ লাভারস। আমি সব সময়ে চাই, আমি যাদের ভালবাসি তারা সবাই আরও লাভেবল হোক। তুমি রাগ কোরো না।

সোমেন মুখ ফিরিয়ে মধুমিতার মুখ দেখল। খুব কাছেই ওর মুখ। গোলপানা, সুন্দর। এত কাছে বসে আছে বলে ওর গা থেকে মেয়েদের শরীরের অবধারিত রূপটান এবং সুগন্ধীর গন্ধ আসছে। আর সে গন্ধ ভেদ করে আরও একটা মাদক গন্ধ আসে। কিশোরীর শরীরের স্বেদগন্ধ।কিন্তু তবু ওর প্রতি কদাচিৎ শরীরের আকর্ষণ বোধ করেছে সোমেন।কোথাও যেন ওর মেয়েমানুষির মধ্যে পুরুষালির একটু ভেজাল ঢুকে আছে। প্রথম পরিচয়ের দিন থেকেই মনে হয়। মধুমিতার হাঁ মুখ থেকে মৃদু শ্বাসবায়ু এসে স্পর্শ করল সোমেনের মুখ। সোমেন মাথা নেড়ে বলল—ঠিক মধু। তুমি ভুল বলোনি। আই হেট মিসেলফ। নিজের ওপর আমার মাঝে মাঝে বড় ঘেন্না হয়। কিন্তু নিজের সঙ্গ কি করে ছাড়ি বলো তো।

মধুমিতা তার চুল নেড়ে দিয়ে বলে—তুমি একটু 'নাটি' সোমেনদা। সেইজন্যই তোমাকে ভালবাসতাম।

—বাসতে! এখন বাসো না?

মধুমিতা হেসে বলে—বাসি। এখন আমি কত লোককে যে ভালবাসতে পারি। মরে যাব তো, তাই এখন বড্ড সবাইকে ভালবাসতে ইচ্ছে করে।

মধুমিতার মুখখানা আর একবার ভাল করে দেখে নিল সোমেন। দেয়ালের গায়ে টেলিফোন বাজছে। মধুমিতা চমকে উঠে দাঁড়াল, বলল—কে ডাকছে!

বলে ছুটে গেল। কী গভীর আগ্রহে তুলে নিল টেলিফোন, বলল—জয়! ওঃ জয়! কমরেড, কাল চলে যাচ্ছি। আই লাভ ইউ ডারলিং, ইউ নো...

ঠান্ডা স্রোত নেমে যাচ্ছে কণ্ঠনালী বেয়ে। তবু ভিতরের জ্বর উপশম হচ্ছে না সোমেনের।

সোমেন উঠে দাঁড়াল। টেলিফোন রেখে চলে এল মধুমিতা, অবাক হয়ে বলল—চলে যাচ্ছ! আড্ডা মারবে বললে যে!

—না, যাই। বেলা হল, মা বসে থাকবে।

মধুমিতার চোখ একটু ছলছলে হয়ে এল, কিন্তু হাসিটা অনাবিল রইল মুখে হঠাৎ ডান পাশের গালটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল—কিস মি গুডবাই।

সোমেন ঠোঁট দিয়ে স্পর্শ করল না, হাত দিয়ে ছুঁল ওর গাল, বলল—ভাল হবে। তোমার ভাল হবে।

মধুমিতা তার হাতটা দুহাতে চেপে নিজের গালে ঘষল খানিক। আবেগে, ভালবাসায়। বলল—আর কখনও দেখা হবে না। মধুমিতাকে মনে রেখো।

কোনওদিন কাঁদে না সোমেন। আজ রাতে একা শুয়ে চোখের জলে বালিশ ভেজাল। নিজের মনে নিজেকে ডেকে বলল—কিল ইয়োরসেলফ, কিল ইয়োরসেলফ রাস্কেল।

॥ আটান্ন ॥

কুমারস্বামী সবাইকে জিজ্ঞেস করছেন—কি খাবি তোরা? অ্যাঁ! আম খাবি, নাকি রসগোল্লা? অজিত, তুই?

অজিত আজকাল একটা ঘোরের মধ্যে থাকে। জলে ডুব দিলে যেমন চারদিক আবছায়া দেখায়, তেমনি তার বাস্তববোধ বড় আবছা। সে অপলকে কুমারস্বামীর দিকে চেয়েছিল। প্রশ্ন শুনে একটু নড়ে উঠে গভীর শ্বাস ছেড়ে বলে—আপনি যা দেবেন।

ভক্তবৃন্দ অপলকে চেয়ে আছে কুমারস্বামীর দিকে। সবাই জানে, এবার বাবা বিভূতি দেখাবেন। কারও শ্বাস পড়ে না। কুমারস্বামী খুব সপ্রতিভ হেসে হাতটা শূন্যে তুলে এত দ্রুত আঙুলের একটা ঘূর্ণায়মান মুদ্রা তোলেন যে আঙুলগুলো যেন অদৃশ্য হয়ে যায় বাতাসে। পরমুহূর্তেই দেখা যায় তাঁর হাতে একটা ভ্যাকুয়াম প্যাকড রসগোল্লার টিন।

—জয় বাবা! জয় বাবা! ধ্বনি করে ওঠে ভক্তেরা। সেই প্রথম দিন এসে অজিত যে ম্যাজিস্ট্রেটকে চিত হওয়া অবস্থায় দেখেছিল আজ সে পাশেই বসেছে। সে লোকটা অজিতের উরু খামচে ধরে বলে উঠল—দেখেছেন! ইনিই হচ্ছেন দি গড। দি গড!

এই বলে লোকটা সম্মোহিতের মতো এগিয়ে গিয়ে কুমারস্বামীর পা ধরার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল। কিন্তু তাঁর সব সময়ের জন্য যাঁরা সেবায় নিযুক্ত আছেন এমন অন্তরঙ্গ শিষ্যদের একদল ধমক দিয়ে বলল—ছোঁবেন না! ছোঁবেন না!

লোকটা ফিরে এসে অজিতের পাশে বসে বলল—মনে ছিল না, হাইপারসেনসিটিভ অবস্থায় ওঁকে ছুঁতে নেই।

কুমারস্বামী আবার হাত বাড়িয়ে একই মুদ্রায় দ্রুত কয়েকটা আম পেড়ে আনলেন শূন্য থেকে। ডাকলেন—অজিত!

অজিত মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছিল। পামিং নেই পাসিং নেই, কোটের ভিতর থেকে কোনও গুপ্ত ইলাস্টিকের ব্যান্ড দিয়েও আনা হচ্ছে না, তবু কোথা থেকে আম আসছে। রসগোল্লার টিন আসছে! এই কি তা হলে বহুশ্রুত অলৌকিক? এই কি সিদ্ধপুরুষ!

—আজ্ঞে। অজিত নীলডাউনের ভঙ্গিতে বসে বলল।

—কী খুঁজছিস? পামিং আর পাসিং? বলে চমৎকার ভরাট প্রাণময় হাসি হাসেন কুমারস্বামী। মাথা নেড়ে বলেন—ওসব নয় রে!

বলে কুমারস্বামী খুব অন্যমনস্ক হয়ে বসে রইলেন। যিশুর মতো সুন্দর মুখশ্রী কেমন বিষন্ন হয়ে গেল! তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্যরা কৌটো খুলে রসগোল্লা বিতরণ করছে সবাইকে, আম ভাগ করে দিচ্ছে। মহাপ্রসাদ বলে সবাই কাড়াকাড়ি করে। ঠিক এই সময়ে কুমারস্বামী খুব নিচু, অদ্ভুত কান্নায় ভরা মাদক গলায় গাইতে থাকলেন—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে...। কোথা থেকে একটা ছোট্ট খঞ্জনির শব্দ হতে লাগল। ঘরের আলোটা পালটে সবুজ হয়ে গেল। কী সুর! কী সুর! বুক নিঙড়ে যেন কান্না আর ভালবাসা তুলে আনা হচ্ছে।

অজিত চোখ মুছল। তার সমস্ত মনপ্রাণ জুড়ে একটা উতরোল ঢেউ। সব ময়লা আবর্জনা ধুয়ে গেছে, একাকীত্ব মুছে গেছে! আর সংসারে ফিরতে ইচ্ছে করে না অজিতের। কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না।

গান শেষ হল। কুমারস্বামী অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। রাত হয়েছে, একে একে প্রণাম করে চলে যাচ্ছে সবাই। অজিত একটু এগিয়ে বসে বলল—বাবা, আমার যেতে ইচ্ছে করে না। আর কোথাও এমন শান্তি নেই।

কুমারস্বামী হাসলেন। বললেন—থাকবি? বলে অন্তরঙ্গ একজন শিষ্যের দিকে চেয়ে বললেন—অজিত আজ থাকবে ব্যবস্থা করে দিস।

অজিত একটা শ্বাস ফেলল। শীলা ভাববে, সে কথাটাও খোঁচা দিচ্ছে মনে কুমারস্বামী সেটা টের পেয়েই যেন যারা চলে যাচ্ছিল তাদের একজনকে ডেকে বললেন—অরুণ, তুই তো টালিগঞ্জের দিকেই থাকিস, অজিতের বাড়িতে একটা খবর দিয়ে যাস। ও আজ আমার কাছেই থাকবে।

বলেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কুমারস্বামী বিদায়ী মানুষজনের দিকে চেয়ে বললেন— কারও বাড়িতে আমি বেশিদিন থাকতে পারি না। পচা সংসারের নষ্ট গন্ধ পাই। অন্তরাত্মা ঘুলিয়ে ওঠে। তাই ভাবছি এবার চলে যাব।

ম্যাজিস্ট্রেট সুদ্ধু সব লোকজন ফিরে দাঁড়ায়। চলে যাবেন? কুমারস্বামী চলে যাবেন?

অরুণ ঘোষাল ফিরে এসে প্রায় আছড়ে পড়ে সামনে—কেন বাবা? আমরা কার কাছে যাব তা হলে?

কুমারস্বামী মিষ্টি করে হেসে বলেন—কলকাতায় একটা আশ্রম তৈরি করে দে। থাকব।

—দেব। কথা দিলাম। দেব। ম্যাজিস্ট্রেট বলল।

পেটের মধ্যে বাচ্চাটা নড়েচড়ে। মাঝখানে বর্ষাকালটা শরতের গোড়ার দিকেই ছেলে হওয়ার কথা। বর্ষাটাও এবার জোর নেমেছে। কাল সারারাত বৃষ্টি হয়েছে। সন্ধের কিছু পর একটা লোক গাড়ি করে এসে খবর দিয়ে গেল অজিত আজ ফিরবে না। কুমারস্বামীর কাছে থাকব।

রাতে শীলার ভাল ঘুম হয়নি। দুশ্চিন্তা। কুমারস্বামীর কথা সে আজকাল খুব শোনে অজিতের মুখে। অজিত বলে—এতদিনে একটা যথার্থ মানুষ দেখলাম, যার ক্ষমতা আছে।

শীলা দেখেনি। কিন্তু মনের ভিতর কেমন একটা সন্দেহ মাথা চাড়া দেয়। সে শুনেছে এই ধরনের মানুষেরা সম্মোহন জানে, গুপ্তবিদ্যা জানে। মারণ উচাটন কত কী করতে পারে। তাই একটা অনির্দিষ্ট ভয় আর সন্দেহ হয়। অজিত আজকাল সন্ধের পর ওইখানেই থাকে, অনেক রাতে ফেরে। কাল ফিরল না। তার মানে এখন প্রায় রাতেই এরকম হবে। মাঝে মাঝে ফিরবে না। কালক্রমে একেবারেই ফিরবে না হয়তো। কে জানে!

আজ সকাল থেকেই শরীরটা খারাপ করেছে। অনেকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করে শীলা অনেক বেলায় উঠল। পেটের মধ্যে সারারাত দস্যি ছেলে ফুটবল খেলে আজকাল। পরিষ্কার টের পাওয়া যায়, ছেলেটা একবার

পেটের এপাশে ঠেলে উঠছে, একটু বাদেই আবার ওপাশে মাথা চাড়া দেয়। ওর কি গরম লাগে পেটের ভিতর? ওর কি খিদে পায়? ও কি মাকে দেখার জন্য খুব অস্থির?

পরদিন রবিবার। সারাসকাল অজিত এল না। দুপুর গড়িয়ে গেল। শীলা অল্প একটু খেয়ে এসে শুয়ে রইল। খাওয়ার ইচ্ছেই ছিল না, কিন্তু সে না খেলে ছেলেটাও পেটের মধ্যে উপোসী থাকবে, সেই ভয়ে খেল। প্রাণটা বড় আনচান করে আজ। বিয়ের পর কখনও এমন হয়নি যে তারা প্রায় বিনা কারণে পরস্পরকে ছেড়ে থেকেছে। খুব ভেবে দেখল শীলা, না তারা একদিনও কেউ কাউকে ছেড়ে থাকেনি। কাল রাতেই প্রথম।

ঠিক দুপুর গড়িয়ে সদরের কড়া নড়ে উঠল। একটু ঝিমুনি এসেছিল শীলার, তবু ঝাঁকি খেয়ে উঠল। এতই ত্রস্ত পায়ে ছুটে এল যে আঁচলটা পর্যন্ত কুড়োনোর সময় হয়নি। দীর্ঘ আঁচল মাটিতে লুটোচ্ছিল। আগ্রহে ব্যর্থতায় সে তাড়াতাড়ি ছিটকিনি খুলে খুব হতাশ হল। অজিত নয়। সুভদ্র।

সুভদ্র একমুখ হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে। অথচ শীলা তখন হাঁ করে তাকিয়ে। যেন বা তার বিশ্বাস হচ্ছে না যে, অজিত আসেনি। শীলার মুখের দিকে চেয়েই সুভদ্রর হাসি মিলিয়ে গেল। বলল কী হয়েছে?

শীলা সচেতন হয়ে তার আঁচল কুড়িয়ে নিল। কোনও কথা না বলে পিছু ফিরে চলে এল ভিতরে। পিছনে সুভদ্র। একবার অস্ফুট গলায় সুভদ্রকে বসুন' বলে শীলা বাথরুমে চলে গেল সোজা। দরজায় ছিটকিনি তুলে দিল। দুপুরে যা খেয়েছে সব অম্বল হয়ে উঠে আসছে গলায়। বুকে চাপ ব্যথা। গলায় আঙুল দিয়ে টক জল বমি করল শীলা। ঠান্ডা জলে মুখচোখ ঘাড় গলা ভিজিয়ে নিল।

অনেকক্ষণ বাদে ফিরে এসে বলল—সুভদ্র, আমাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দেবেন?

—কেন বলুন তো! সুভদ্র খুব উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞেস করে—কী হয়েছে আপনার?

এতক্ষণ কেবল দুশ্চিন্তা ছিল। শুকনো গলা শুকনো মুখ নিয়ে সময় কাটিয়েছে শীলা। সুভদ্রর প্রশ্ন শুনে হঠাৎ বুকেরমধ্যে কান্নার বিদ্যুৎ চমকায়। বৃষ্টি আসে।

কান্নাটা কিছুতেই চাপতে পারে না শীলা। ঠোঁট কেঁপে ওঠে, চোখ ভরে নির্লজ্জ জল জমে উঠে গাল ভাসিয়ে নামে। আঁচলে মুখ ঢেকে কিছুক্ষণ থম ধরে থাকে সে তারপর বলে— বাপের বাড়ি যাব।

—কেন?

—ও কাল রাতে ফেরেনি। বলে শীলা শূন্যের দিকে একটু চেয়ে থাকে। সুভদ্র 'ফেরেনি?' বলে যে বিস্ময় প্রকাশ করে তার কোনও উত্তর দেয় না শীলা। অন্যমনস্কভাবে বলে—আমার ছোট ভাইকে পাঠাব একটু খোঁজ নিতে।

—অজিতদা কোথায় গেছেন আপনি জানেন?

—জানি। কুমারস্বামী নামে একজন সিদ্ধপুরুষের কাছে।

সুভদ্র ভারী অবাক হয়ে বলে—কুমারস্বামী? গর্চা লেনের কুমারস্বামী নাকি? ডাক্তার হেমেন বিশ্বাসের বাড়িতে যে থাকে!

শীলা বড় বড় চোখ তুলে বলে—আপনি জানেন?

মুখটা বিকৃত করে সুভদ্র বলে—জানব না কেন? একটা ফ্রড। আমার বাবাও ওর পাল্লায় পড়েছিল। অনেক কষ্টে ছাড়িয়েছি।

শীলা আগ্রহের সঙ্গে বলে—ফ্রড?

সুভদ্র হঠাৎ অদ্ভুত হেসে বলে—অজিতদা ওর পাল্লায় পড়লেন কী করে? উনি তো পলিটিক্স করা লোক, এল আই সিতে ট্রেড ইউনিয়ন করেছেন, পাক্কা মার্কসিস্ট মানুষ, উনি ধাপ্পায় ভুলবার লোক তো নন!

শীলা একটু অসন্তুষ্ট হয়। বলে—সুভদ্র, অত কথা বলছেন কেন? এখন কথার সময় নেই। দেরি হলে আমি গিয়ে সোমেনকে পাব না। ও বেরিয়ে যাবে।

সুভদ্র সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে বলে—আপনার ভাইকে পাঠানোর দরকার কী? প্রয়োজন হলে আমিই যেতে পারি, আপনিও সঙ্গে চলুন, সোজা কুমারস্বামীর ডেরায় গিয়ে কেলো করে দিয়ে অজিতদাকে ধরে আনব। ইয়ারকি নাকি! কার্ল মার্কসের ভক্তকে একটা ফ্রড হামবাগ হিপনোটাইজ করে রেখে দেবে? দরকার হলে....

শীলা ধমক দিয়ে বলল—খুব হয়েছে। এটা কার্ল মার্কস ভারসাস কুমারস্বামীর লড়াই নয় সুভদ্র। এটা আমার খুব ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমি আমার স্বামীকে চিনি, ও ঝট করে কাউকে শ্রদ্ধাভক্তি করে না। হইহই করে ওকে ফেরানো যাবে না।

সুভদ্র বিরক্তির শব্দ করে বলে—সে না হয় হইচই না করলাম, কিন্তু অজিতদা তো খুব লজিক্যাল লোক, ওঁকে তো ব্যাপারটা বোঝাতে পারি! যে লোকটা রিজন মানে তাকে বোঝানো সহজ।

শীলা মাথা নেড়ে বলে—সুভদ্র, ওসবে দরকার নেই। আমি কুমারস্বামীকেও চটতে চাই না। বহুকাল বাদে আমাদের সন্তান হতে যাচ্ছে, আমরা খুব ভয়ে ভয়ে আছি। এ সময়ে কারও অভিসম্পাত আমাদের পক্ষে ভাল হবে না।

সুভদ্র দাঁড়িয়েছিল। হতাশভাবে বসে পড়ে বলল—আপনিও এরকম? অভিসম্পাত বলে কিছু আছে, কিংবা তাতে কারও কোনও ক্ষতি হয় এটা কি আজকাল কেউ মানে?

শীলা বিরক্ত হয়ে বলে—আমি তর্ক করতে চাই না। এটা তর্কের সময় নয়। বিয়ের পর এই প্রথম আমরা একসঙ্গে থাকিনি। প্রবলেমটা আপনি বুঝবেন না। একটা ট্যাক্সি ডেকে আনুন, আমি গিয়ে সোমেনকে পাঠাব।

—যাচ্ছি। বলে সুভদ্র উঠল। দরজার কাছ বরাবর গিয়ে ফিরে বলল—আপনি নিজে যাবেন না?

শীলা মাথা নেড়ে বলল—না।

—কেন? আপনার কিন্তু যাওয়া উচিত।

—না সুভদ্র, আমার এ অবস্থায় ওসব লোকের কাছে যাওয়া উচিত নয়। ওরা কত কী করতে পারে! হয়তো রেগে গিয়ে আমার সন্তান নষ্ট করে দেবে। আমি যাব না।

সুভদ্র একটু হাসল, বলল—কিন্তু অজিতদা আপনি গিয়ে দাঁড়ালেই চেঞ্জ হয়ে যাবেন।

শীলা বড় বড় চোখে সুভদ্রর দিকে চেয়েছিল। কিন্তু সে সুভদ্রকে দেখছিল না। সে চেয়ে থেকে বহুদূর পর্যন্ত নিজের বিবাহিত জীবনটাকেই দেখতে পাচ্ছিল। ক্রমান্বয়ে একসঙ্গে এক বিছানায় থেকেও এই দীর্ঘকালে তারা যেন কিছুতেই স্বামী-স্ত্রী হয়ে উঠতে পারেনি। কোথাও একটা তার আলগা হয়ে আছে। একটা স্ক্রু ঢিলে, তারা পরস্পরের প্রতি গভীর বিশ্বস্ত নয়।

শীলার ঠোঁট কাঁপল, মাথাটা নড়ে উঠল। অস্ফুট গলায় বলল—ও আমাকে ভালবাসে না সুভদ্র। নইলে কেন কাল রাতে ও ফেরেনি? কেন ফেরেনি...।

বলতে বলতে শীলা উঠে দৌড়ে চলে গেল শোওয়ার ঘরে। বিছানায় উপুড় হয়ে শুতে গিয়েই ভুল করল শীলা। আবেগে খেয়াল ছিল না। মস্ত বড় হয়েছে পেট, তার মধ্যে ছেলে। উপুড় হতে গিয়ে বিছানার কানায়

একটু ব্যথা পেল শীলা। ব্যথাটা খেয়াল করল না। কাঁদতে লাগল।

একটু বাদে ট্যাক্সির ভেঁপু বাজতে উঠে শাড়ি পালটাতে লাগল। তখনও পেটে একটা ফিক ব্যথা লেগে আছে। ব্যথার অস্ফুট শব্দ করল শীলা। সাড়ে আটমাস চলছে। আয়নায় দেখল, তার ঠোঁট দুখানা সাদা, মুখটাও কেমন যেন। ক্লিষ্ট একটু হেসে আপন মনে বলল— ও ছেলে, তোর বাপটা এমন পাগল কেন রে? আমাকে কেন একটুও ভালবাসে না বল তো! আমি কি হ্যাক ছিঃ?

ট্যাক্সির এক কোনে সুভদ্র, অন্য কোনে শীলা। মাঝখানে অনেকটা দূরত্ব। শীলার চোখ দুটো এখনও চাপা কান্নায় লাল হয়ে আছে। মাঝেমধ্যে আঁচলে চোখ মুছছে। এ সময়ে কান্না লুকনো যায় না। কাল রাতে বাসায় না ফিরে অজিত যেন শীলার পায়ের তলার মাটি ভয়ংকর ভূমিকম্পে কাঁপিয়ে দিয়েছে। ও কেন অমন করল কাল? ও কি জানে না শীলা ওকে কত ভালবাসে?

—কুমারস্বামী সম্বন্ধে আপনি কী জানেন সুভদ্র? শীলা খুব গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল।

সুভদ্র সস্তা সিগারেট খায়। আজকাল কোনও কোনও গন্ধ শীলার সহ্য হয় না। ছেলেটা পেটে আসার পর থেকেই সে যেমন ভাতের গন্ধ সহ্য করতে পারে না, সেন্টের গন্ধ, সিগারেটের গন্ধ, দেশলাইয়ের গায়ের গন্ধ পেলেই বমি পায়। সুভদ্র সিগারেট ধরিয়েছে, শীলা নাকে রুমাল চাপল। একবার ওয়াক করল। সামলে গেল। সুভদ্র তাকিয়ে আছে। শীলা দ্রুত, নিচু গলায় বলল—সিগারেট ফেলে দিন, প্লিজ।

সুভদ্র সঙ্গে সঙ্গে সিগারেট ফেলে দেয়। বলে—শরীর খারাপ নয়তো শীলাদি।

বহুকাল শীলাকে দিদি বলে ডাকে না সুভদ্র। আজ ডাকল। শীলা একবার তাকিয়ে ফের কাঁপা ঠোঁটে বলল —আমি আর বেশিদিন বাঁচব না, জানেন? এই বাচ্চাটার জন্ম দিতেই আমার সব ভাইটালিটি শেষ হয়ে যাবে।

—কী সব আবোলতাবোল বলছেন!

শীলা বাইরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে রেখে বলে—মরে গেলে খুব ভাল হবে। ও বুঝবে আমি ওর কী ছিলাম। সারা জীবন বুক চাপড়াবে। একথা বলেই শীলা আবার ভ্রু কোঁচকায়। মাথা নাড়ে। আপন মনেই বলে—অবশ্য তা হয় না। পুরুষ-মানুষদের তো চিনি। মাসখানেক কান্নাকাটি করবে, হা-হুতাশ করবে, তারপর ফের টোপর মাথায় ছাঁদনাতলায় গিয়ে দাঁড়াবে। ততদিন যদি বাচ্চাটা থাকে তো সেটা গিয়ে পড়বে সৎমায়ের হাতে। মাগো! ভাবতে পারি না

সুভদ্র খুব হাসল, বলল—কত ভাবনা ভেবে রেখেছেন! মরেই যদি যাবেন তো অত ভাবনা কেন? মরার পর যা খুশি হোক, আপনি তো দেখতে আসছেন না।

শীলা ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে বলে—কে বলল দেখতে আসব না! ঠিক আসব। দরকার হলে ভূত হয়ে এসে সতীনের ঘাড় মটকাব।

সুভদ্র বেসামাল হেসে বলে—একেই বলে উইল পাওয়ার।

শীলা গম্ভীর হয়ে বলে—কুমারস্বামী সম্বন্ধে আপনি কী জানেন বললেন না!

সি এম ডি এ আনোয়ার শা রোড খুঁড়ে ফেলেছে, চওড়া হচ্ছে রাস্তা। তাই ট্যাক্সি রসা রোড ধরে অনেক ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে।

সুভদ্র মৃদু হেসে বলে—লোক ঠকানোর জন্য যা যা দরকার এ লোকটার সব আছে। সুন্দর চেহারা, চমৎকার কথাবার্তা, খুব ভাল কীর্তন করে। একবার'ওর কীর্তন শুনে আমার মতো পাষণ্ডের চোখেও জল

এসেছিল।

—বলেন কী! কীর্তন শুনে! তা হলে আপনারও ওসব দুর্বলতা আছে!

সুভদ্র মাথা নেড়ে বলল—না। কিছুমাত্র ধর্মীয় দুর্বলতা আমার নেই। একজন বাঙালি হিন্দু পরিবারের ছেলের পক্ষে যতখানি অবিশ্বাসী হওয়া সম্ভব আমি ততখানি অবিশ্বাসী। তবে কী জানেন শীলাদি, ওই কীর্তন-টির্তন যারা বানিয়েছে তারা ছিল মস্ত সাইকোলজিস্ট। মানুষের প্রবণতা এবং সেন্টিমেন্টের জায়গায় ঘা দেওয়ার মতো করেই তারা ওইসব গান তৈরি করে গেছে। তেমন তেমন কীর্তন শুনলে ঘোর নাস্তিকেরও চোখে জল আসবে। তার কারণ ধর্মভাব নয়, কতগুলি মানবিক ভাবপ্রবণতা। আর আমিও তো পাষণ্ড নই। বলে হাসল সুভদ্র, হঠাৎ চমৎকার সুরেলা গলায় একটা লাইন গাইল শীলাকে চমকে দিয়ে— রন্ধনশালাতে যাই, তুয়া বঁধু গুণ গাই, ধূয়রি ছলনা করি কাঁদি...গেয়ে উঠেই বলল—এ গান শুনলে কার না হৃদয় কোমল হয়।

শীলা মাথা নেড়ে বলল-বুঝেছি।

সুভদ্র বেখেয়ালে আবার সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিল, শীলার চোখে চোখ পড়ায় 'সরি' বলে আবার প্যাকেটে ঢুকিয়ে রাখল সিগারেট। বললে—ওই লোকটা, ওই কুমারস্বামীর এরকম কিছু গুণ আছে। খুব স্মার্টও বটে। একবার শুনেছি কালকা মেল-এ কোথাও যাওয়ার জন্য। হাওড়ায় গেছে। টিকিট-ফিকিট নেই। করল কী, গার্ডের ব্রেকের সামনে গিয়ে পায়চারি করতে লাগল। পরনে গেরুয়া পোশাক, গেরুয়া পাগড়ি, ভাল চেহারা। গার্ড সাহেব বোধ হয় গাড়ি ছাড়বার আগে কাগজপত্র দেখছিলেন। গার্ডকে জানালা দিয়ে ভাল করে স্টাডি করে নিল লোকটা। মানুষকে স্টাডি করার ক্ষমতা এদের অসাধারণ। বুঝল গার্ড লোকটা দুঃখী, চিন্তাগ্রস্ত।কী একটু অনুমান করে নিয়ে হঠাৎ গার্ডের জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল—ভাবছিস কেন, সেরে যাবে। শুনে গার্ড আত্মহারা হয়ে এসে চেপে ধরল কুমারস্বামীকে—বাবা, তুমি কে? আমাকে বাঁচাও বাবা। কুমারস্বামী তখন ভারী মজার হাসি হেসে বললেন—তোর টানে আটকা পড়েই এখানে ঘোরাফেরা করছিলাম। আমি সাউথ ইস্টার্নের গাড়ি ধরতে যাব, কিন্তু কিছুতেই তোর কামরা আর ছাড়তে পারি না। এই শুনে গার্ড কি আর ছাড়ে! জোর করে নিজের ব্রেকভ্যানে তুলে নিল কুমারস্বামীকে। বলল—বাবা, ওসব হবে না। আমি তোমাকে মাথায় করে রাখব। আমার সব সমস্যার কথা তোমাকে শুনতেই হবে। কুমারস্বামী তখন কেবলই কাতরভাবে বলে—ওরে, এগারো নম্বর প্ল্যাটফর্মে আমার শিষ্যরা সব দাঁড়িয়ে আছে ফার্স্ট ক্লাশের টিকিট কেটে, আমাকে আজ রাতেই জগন্নাথধাম রওনা হতে হবে যে! কে শোনে কার কথা! গার্ড সাহেব কুমারস্বামীকে ব্রেকভ্যানে তুলে নিয়ে গেল। পরে শুনেছি, সেই গার্ডের বউ ভাল হয়েছে, গার্ডেরও প্রমোশন হয়েছে। কাকতালীয় ব্যাপার। কিন্তু তাতে কুমারস্বামীর নাম যা ফেটেছিল!

শীলা খুব মৃদু একটু হেসেই গম্ভীর হয়ে গেল। খুব চাপা কিন্তু দৃঢ়স্বরে বলল—সুভদ্র, আপনাদের অজিতদা কিন্তু গার্ড সাহেব নন। ওঁকে ঠকানো অত সোজা নয়।

সুভদ্র ঈষৎ গম্ভীর হয়ে ঘাড় হেলিয়ে বসে বলল—বুঝলাম, আপনি পতিগর্বে গরবিনী। অজিতদাকে আমিও খুব শ্রদ্ধা করি ওঁর পলিটিক্যাল আইডিয়ালের জন্য। তাই খুব অবাক হয়েছি। কিন্তু আমি জানি শীলাদি, কুমারস্বামী ইজ এ ফ্রড।

ট্যাক্সি ঢাকুরিয়া ব্রিজ পার হতেই শীলা বল—সুভদ্র, আপনি কি আমার সঙ্গে যাবেন আমার বাপের বাড়িতে?

সুভদ্র কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল—যেতে পারি।

শীলা কিন্তু অস্বস্তি বোধ করছিল। তার বাড়িতে কেউ সুভদ্রকে চেনে না। মা, বউদি এরা সবাই একটু সেকেলে। হুটহাট ছেলেছোকরাদের সঙ্গে ওঠা বসা ভাল চোখে দেখে না। কে কী মনে করবে কে জানে! সুভদ্রই বা ওরকম বেহায়া কেন? ও কি বুঝতে পারছে না যে, এখন শীলা ওর সঙ্গ চাইছে না? পুরুষেরা চিরকালই কি একটু ভোঁতা, কম সেনসিটিভ? না শীলা ভেবে দেখল তা নয়। তার স্বামী অজিত খুব আত্মসচেতন। কখনও মেয়েদের সঙ্গে গায়ে পড়ে মেশে না। মরে গেলেও কোনও মেয়ের সঙ্গে কখনও যেচে আলাপ করেনি অজিত। শীলার মনে পড়ল, বিয়ের পর দীর্ঘকাল অজিত শীলার কাছে শরীরের দাবিই করেনি। তারা এক বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে আদরে সোহাগে গল্প করত। অজিত শরীর চাইত না। সেটা শীলার খুব ভাল লেগেছিল। প্রথম কত সংকোচ থাকে মেয়েদের। সেটা কেটে গেলে একদিন শীলাই অজিতের বুকে মুখ রেখে আধোস্বরে বলেছিল—এবার পাথরটা ভাঙুক। তুমি নাও আমাকে।

মনে পড়ার পরই শীলা আপনমনে একটু হাসল। বড় সুখের স্মৃতি। পরমুহূর্তেই মনে পড়ল, কাল রাত থেকে অজিত ফেরেনি। ঠোঁট কেঁপে উঠল শীলার। পোড়া চোখ গলে যায় বুঝি কাঁদতে কাঁদতে। এত কান্না শীলা কখনও কাঁদেনি। পেটের দুধার থেকে চিন চিন ব্যথা উঠছে।

॥ উনষাট ॥

তিন দিন যেন এই সামান্য পৃথিবীর কেউ ছিল না অজিতের। তার জীবনের সাধারণত্ব থেকে ওই তিন দিন সে বিদায় নিয়েছিল। রবিবারে অজিত ফেরেনি। সোমবারেও না। ফিরতে ফিরতে বুধ হয়ে গেল। সোমবার থেকেই সে কীর্তনের দল নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। সুখচরে আশ্রমের জন্য জমি দেখা হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটই খবর এনেছে। হাজার দশেকের মতো জমির দাম পড়বে, আশ্রমের জন্য আরও না হোক ষাট-সত্তর হাজার টাকা কুমারস্বামী হেসে বললেন—ওসব তোমরা বোঝো গিয়ে। টাকার হিসেব আমি জানি না। শুধু বলি, আমার বড় ইচ্ছে তোমাদের কাছে থাকি। তোমরা কীভাবে রাখবে তা তোমরা জানো।

পরের সকালেই অজিত পাঁচ হাজার টাকার চেক কেটে দিল। যখন চেক সই করছিল তখন হঠাৎ একটু দুর্বলতা এল বুঝি! এত টাকা, রক্ত জল করা টাকা চলে যাচ্ছে! কুমারস্বামী তারদিকেই চেয়েছিলেন। তীব্র কিন্তু বরদা, শঙ্কাহরণ দৃষ্টি। অজিত সই করে দিল। আরও অনেকেই দিয়েছিল। দুই দিনে জমির দাম উঠেও হাজার দশেক টাকা বাড়তি হল। ম্যাজিস্ট্রেট নিজেই জমি কিনতে চলে গেলেন। সবাই বলাবলি করছিল, শুভ কাজ আটকে থাকা ঠিক নয়, জমি কিনলেই ভিতপত্তন করতে হবে। বাকি টাকা আসবে কোথেকে? একজন মেজো-মধ্যম ফিলম স্টার আসেন রোজই। বয়স্ক লোক। তার বাজার পড়তির দিকে। তিনি বললেন—এ আর বেশি কথা কী? বাবার জন্য না হয় রাস্তায় নেমে পড়ব। আমি একসময়ে স্ট্রিট সিংগার ছিলাম, সেই অবস্থা থেকে উঠেছি। আমার কোনও সংকোচ নেই। যদি সবাই রাজি থাকে তো কীর্তনের দল নিয়ে ভিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

তো তাই হল। অজিত গানবাজনা প্রায় জানেই না। তবু এক ভক্তের কাছ থেকে ধুতি চেয়ে নিয়ে পরল, খালি গায়ে খুঁটটা জড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল দলের সঙ্গে। সে কী উল্লাস! কী আনন্দ! দুধারে গৃহস্থ মানুষেরা দোকান পসারে ঘুরছে, সওদা করছে, বিষয়কর্মে রত রয়েছে, আর সে এক সুমহান উদ্দেশ্যে পথের ধুলোয় নেমে মহানন্দে ভিক্ষা করতে করতে চলেছে। নিজেকে এই প্রথম বড় মহৎ লাগল অজিতের। কীর্তনের সঙ্গে গলা মেলানোর কষ্ট নেই। সেই উদ্দণ্ড কীর্তনে গলা ছাড়লেই মিলে যায়। চোখে জল আসে। গায়ের কাপড় খসে খসে পড়ে। আর মনে হয়, আমিই তো নিমাই। ঘরে শচীমাতা কাঁদছেন, বিষ্ণুপ্রিয়া মূর্ছিতা, তবু নিমাই চলেছে প্রেম বিতরণে। নদীয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছেন নদের নিমাই।

সেই যে ভাব এল অজিতের তিন দিন সে আর স্বাভাবিক অজিত ছিল না। অফিস থেকে এসে কুমুদ বোস আর সেনদাও দেখে বলে গেছে—তাজ্জব! অজিতের মধ্যে যে এত বড় ভক্ত লুকিয়ে ছিল কে জানত! তুমি বড় ভাগ্যবান হে অজিত আমরাই পিছটান ছিঁড়ে আসতে পারলাম না। এই বলে কুমুদ বোস কেঁদেও ফেলেছিল।

তিন দিন অফিস করেনি অজিত। বাড়িতে আসেনি। তিন দিন বাদে বিকেলের দিকে সে ট্যাক্সিতে ফিরছিল টালিগঞ্জে। বুকটা অল্প কাঁপছে। যদিও নিশ্চয়ই শীলাকে কেউ না কেউ খবর পাঠিয়েছে, তবু মনটা বড় অশান্ত

লাগে। শীলাকে ছেড়ে সে কখনও থাকেনি। একা বাড়িতে শীলা ভয় পায়নি তো! পা পিছলে পড়েটড়ে যায়নি তো! শীলা কি ভাল আছে? বুকটা কাঁপে, একটা শ্বাসকষ্ট হয়। আবার কুমারস্বামীকে দেওয়া পাঁচ হাজার টাকার কথা ভাবে। এ টাকাটার কথা শীলার কাছে গোপন করতে হবে। শীলা টের পেলে...।

বাড়িতে এসে অজিত অবাক। বাচ্চা ঝিটা দরজা খুলেই সরে গেল। অজিত ঢুকে দেখে ঘরদোর খাঁ খাঁ করছে। অজিত বলল—কী রে? তোর বউদি কোথায়?

মেয়েটা খুব বিপন্ন মুখ করে বলে—বউদি নেই।

—কোথায় গেছে?

—হাসপাতালে।

অজিত স্তম্ভিত হয়ে থাকে। কিছু জিজ্ঞেস করতে আর সাহস হয় না।

মেয়েটা নিজ থেকেই বলে—সোমবার সেই যে দাদাবাবু আসে, তার সঙ্গে ট্যাক্সিতে চলে গেল। আর আসেনি। বউদির ছোট ভাই রাতে এসে খবর দিল—বউদি হাসপাতালে। বউদির ভাই এসে রাতে থাকে, আর সারাদিন আমি একা।

অজিত ধপ করে বসে চোখ বুজে বলল—কী হয়েছে জানিস?

—না। বউদির ভাই শুধু বলে, খুব খারাপ অবস্থা।

অজিতের শরীরে বিদ্যুৎ খেলে আতঙ্কের। একবার তড়িৎ গতিতে উঠে বসল ও। যাবে! এক্ষুনি যাবে! পরমুহূর্তেই বুঝল, তার হাত পা কাঁপছে, অবশ লাগছে। তিন দিনের সুগভীর ক্লান্তি কাকের কালো ডানার মতো শরীর আর মনের সব শক্তিতে ঢেকে রেখেছে। সে একবার ককিয়ে উঠল যন্ত্রণায়। চুপ করে বসে রইল। ঘড়িতে সময় দেখল, কিন্তু কটা বেজেছে তা বুঝতেও পারল না। ঢক ঢক করে অনেক জল খেয়ে গেল, তবু বুকটা যেমন শুকনো ছিল তেমনই রইল। শীলা কি বেঁচে আছে এখনও?

টেবিলের ওপর কয়েকটা চিঠি পড়ে আছে। তার মধ্যে একটা লক্ষ্মণের এয়ারোগ্রাম। সেটা খুলে অজিত আরও অবাক। প্রথমেই লিখেছে—বুধবার সকালে দমদমে পৌঁছেছি। এয়ারপোর্টে থাকিস।

ফের লাফিয়ে উঠল অজিত। বুধবার! বুধবারটা কবে?

তারপরই হতাশ হয়ে বসে পড়ল ফেরা সময় নেই। আজই বুধবার। লক্ষ্মণ আগে এসে গেছে।

তিনদিন ধরে রোজ ননীবালা তিন বেলা খাবার সাজিয়ে টিফিনের বাক্সে ভরে দেন। তিনবেলা খাবার বয়ে নিয়ে হাসপাতালে আসছে সোমেন। কিন্তু খাবে কে? শীলার ভাল করে চেতনা আসছে না। যতক্ষণ ভাল থাকে ততক্ষণ যন্ত্রণায় চিৎকার করে। দম ফুরিয়ে গেলে গোঙায়। মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যায়। বিকেলের ভিজিটিং আওয়ারসে ননীবালা। এসে বসে থাকেন মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে। জ্ঞান থাকলে শীলা মায়ের হাঁটু চেপে ধরে ফুপিয়ে উঠে বলে—মাগো, আমাকে বিষ এনে দাও। নয়তো ডাক্তারকে বললা বাচ্চাটাকে নষ্ট করে দিক। এ যন্ত্রণা সহ্য হয় না।

ননীবালা পাঁচবার মা হয়েছেন, তার মধ্যে একটা সন্তান বাঁচেনি। সেই রণো হওয়ার সময়ে একরকমই চার-পাঁচদিন ধরে ব্যথায় কষ্ট পেয়েছেন তিনি। আঁতুড়ঘরের চারধারে সে এক গেঁয়ো বর্ষা নেমেছিল সেবার। অকালের বর্ষা, সৃষ্টি রসাতলে যায় যায়। ব্রজগোপাল বাউণ্ডুলেপনা করতে কোন মুলুকে উধাও হয়েছেন,

সাতদিন ধরে পাত্তা নেই, শ্বশুর-ভাসুরদের উকি দেওয়া বারণ, এক জগদ্ধাত্রীর মতো শাশুড়িই তখন আগলে রেখেছিলেন ননীবালাকে। একজন হোমিওপ্যাথ ওষুধ দিত। আর ধাই ছিল মোতায়েন,কিন্তু হুট বলতেই পেট কেটে ছেলে বের করে দেবার যে রেওয়াজ এখন চালু হয়েছে সে সব তখন কারও মাথাতেও আসেনি গাঁয়েগঞ্জে, ছেলে হতে গিয়ে কত মা মরেছে। চারদিন ধরে নাগাড়ে ব্যথা সহ্য করার পর পাঁচদিনের দিন চাঁদমুখ দেখে সব জ্বালা জুড়িয়ে গেল। কোলজোড়া শান্তশিষ্ট ছেলে। শাশুড়িকে এইটুকুই দেখাতে পেরেছিলেন ননীবালা। সেই অকালের বর্ষা থামল, আর শাশুড়িও চলে গেলেন। যেন রণোকে নিজের আত্মা দান করে গেলেন।

ননীবালা মেয়ের মাথায় জপ করে দিতে দিতে বলেন—ওসব বলিস না। হলে দেখবি, বাচ্চার কত মায়া। চাঁদমুখ দেখলে সব ব্যথার কথা ভুল পড়বে।

শীলা ব্যথায় নীল হয়ে মার গায়ে কিল মেরে বলে—উঃ মা, ওসব বোলো না, বোলো না এ ব্যথা যেন শত্রুরও না হয়। আমি বাচ্চা চাই না, আমার ব্যথা সারাতে বলো ডাক্তারদের। আবার ওই ব্যথার মধ্যেও অনুযোগ দেয় শীলা—আমাকে কেন নার্সিং হোমে রাখোনি তোমরা? হাসপাতালে কেউ থাকতে পারে? আমি ঠিক মরে যাব। তোমাদের জামাইকে খবর দাও, সে ঠিক এসে ভাল নার্সিং হোমে নিয়ে যাবে আমাকে, সে কখ্খনো এভাবে হাসপাতালে ফেলে রাখত না আমাকে? কেন তোমরা ওকে খবর দিচ্ছ না? নিশ্চয়ই ওর কিছু হয়েছে। বলতে বলতে ফের জ্ঞান হারায় শীলা। আবার যখন চেতনা আসে তখন পূর্বাপর কিছু ভাবতে পারে না, যন্ত্রণার কথা বলে, আবার যখন মনে পড়ে তখন অজিতের কথা বলে কেঁদে ওঠে—ওর ঠিক অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। আমার এ সময়ে নাহলে ও আসছে। না কেন? ওর এত সাধের সন্তান, ও আসছে না কেন?

ননীবালা এ সবের কী উত্তর দেবেন? অজিতকে কতবার খুঁজতে গিয়ে ফিরে এসেছে সোমেন আর সুভদ্র। গর্চার কোন গলিতে সে সাধু থাকে। সেখানে অজিত আছে বটে কিন্তু কেউ তার হদিশ দেয় না। ওরা থানা-পুলিশের ভয় পর্যন্ত দেখিয়েছে, উলটে ওদের ভয় দেখিয়েছে এক ম্যাজিস্ট্রেট যে বাড়াবাড়ি করলে মানহানির মামলা করবে। অজিতের মতো ছেলে সাধু-সন্নিসির পাল্লায় কী করে যে গিয়ে পড়ল তা কে জানে? হয়তো অজিতকে গুণ করে রেখে দিয়েছে সাধু, আর আসতে দেবে না। অজিত যে পলিটিকস করত সেটা ননীবালা পছন্দ করতেন না বটে, কিন্তু এর চেয়ে সেটা বরং শতগুণে ভাল ছিল। মেয়েকে নার্সিং হোমে রাখার কথা, কিন্তু সে সাধ্য এখন আর নেই। রণো যখন এরকমটা হয়ে যায়নি তখন হলে কলকাতার ভাল নার্সিং হোমেরই ব্যবস্থা হত। কিন্তু এখন তা পারেন না ননীবালা, অনেক লজ্জার মাথা খেয়ে মেয়েকে হাসপাতালেই পাঠাতে হয়েছে। সে বিকেলটাও বড় ভয়াবহ। বাইরে ট্যাক্সি থামবার আওয়াজ হল, তারপরই সিড়িতে জুতোর শব্দ। দরজায় কড়া নড়তে বীণা গিয়ে খুলল। শীলা ঘরে এসে দাঁড়াল, পিছনে, একটা সুন্দরপানা ছেলে। শীলার মুখ খানিকটা গম্ভীর, বলল—সোমেন কই বলো তো মা! ওকে আমার ভীষণ দরকার। বলতে বলতেই হঠাৎ দু'পা এগিয়ে এসে ননীবালাকে আঁকড়ে ধরল দুহাতে, তীব্র ফিসফিসানির স্বরে কানে কানে বলল—মা, ব্যথা উঠেছে, আর পারছি না, বলতে বলতে ঢলে পড়ল গায়ে। ব্যথা ওঠার কথা নয়। এখনও সময় তো হয়নি। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ডাক্তার এসে দেখল, বলল—হাসপাতালে পাঠান। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ডেলিভারি হবে।

তাই পাঠালেন ননীবালা। সুভদ্র সোমেন ট্যাক্সি করে নিয়ে এল, সঙ্গে ননীবালাও। সুভদ্রর জোরেই পি জি হাসপাতালে জায়গা পাওয়া গেল। ছেলেটা খুব দাপুটে, চেনাজানাও অনেক। একে ধমকে, তাকে হাত করে

চোখের পলকে সব ব্যবস্থা করে ফেলল। একটা দিন অবশ্য মেঝেতে থাকতে হয়েছে শীলাকে। সকালেই ভাল বেড পাওয়া গেছে। কিন্তু তিন দিন ধরে ছটফট করছে মেয়েটা। দুবেলা ডাক্তার দেখে বলে যাচ্ছে—এ ব্যথা ডেলিভারির পেইন নয়। তা ছাড়া ম্যাচুরিটিও খানিকটা বাকি ছিল, অন্তত আরও চার পাঁচ সপ্তাহ। নার্সদের ডেকে বলে গেছে—ওয়াচ করবেন। মেমব্রেন যদি বার্স্ট করে আর ডেলিভারি পেইন যদি না হয় তা হলে সিজারিয়ান করতে পারে।

ননীবালা পাঁচ সন্তানের মা হয়েছেন। ডাক্তারদের কথায় বড় একটা ঘাবড়ান না। ওরা কত অলক্ষুণে কথা বলে। রাস্তায় পড়ে গিয়ে বাচ্চা বুড়ো কারও হাত পা ছড়ে কেটে গেলে ধনুষ্টঙ্কারের ইঞ্জেকশন দেয়। জ্বরজারি হলেই পেনিসিলিন ঠাসে, হুট বলতেই টিকা নিতে বলে। ওসব বড় বাড়াবাড়ি। ননীবালা ছেলে হওয়া নিয়ে ভাবেন না। তিনি মেয়ে জামাইয়ের সম্পর্কটা নিয়ে ভাবেন। অজিত কেন সাধুর কাছে গিয়ে পড়ে আছে, মেয়ের যখন এখন-তখন অবস্থা! তবে কি ওদের সম্পর্ক এখন ভাল নয়? ঠিক বটে, তিনি নিজেও এক বাউণ্ডুলের সংসার করছেন চিরকাল। তবু সে তোক কিন্তু এরকম ছিল না। নিজের সংসারের দিকে না তাকালেও পরের সংসারের জন্য করেছে অনেক। কোমর বেঁধে মানুষের দায়ে দফায় খাটত। না ডাকলেও গিয়ে হাজির হত। সংসারে থেকেই সে ছিল সন্ন্যাসী। কিন্তু তার বুকে ভালবাসা বড় কম ছিল না। আর আজকাল হুট বলতেই ডিভোর্স, না কি যেন ছাই মাটি হয়। স্বামী-স্ত্রী আলাদা হয়ে যায়। ভাবতে পারেন না ননীবালা। বুকটা বড় কাঁপে। অজিত কেন এ বয়সে সাধু-সন্নিসির পিছনে ঘুরে মরছে। এর মধ্যেই কবে যেন টুকাই তার ইস্কুল থেকে ফেরার পথে বাস থেকে দেখেছে যে পিসেমশাই গড়িয়াহাটা দিয়ে কীর্ত্তন করতে করতে একটা দলের সঙ্গে যাচ্ছে। টুকাই ছেলেমানুষ, দেখার ভুল হতে পারে, কিন্তু যদি সত্যি হয় তো ভাবনার কথা। অমন চালাক চতুর চৌখোস ছেলে, সে কেন কীর্ত্তন গাইবে রাস্তায়? এসব ভাবেন ননীবালা, আর কেবলই মনে হয়—আর না এবার সংসারের ভাবনা সংসারকে বুঝিয়ে দিয়ে তিনি ছুটি নেবেন। আর না। যা হয় হোক গে। তিনি দেখতে আসবেন না।

ভিজিটিং আওয়ারস শেষ হলে ননীবালা ফিরে আসেন বাড়িতে। আসতে বড় কষ্ট হয়। বাসে তখন অফিসের ভিড়। তবু নিজের চিন্তায় এত বিভোর থাকেন যে শরীরের কষ্ট টের পান না। তিন দিন ধরে এসে ফিরে যাচ্ছেন। মেয়েটা কাটা পাঁঠার মতো দাপাচ্ছে। এ সময়ে জামাই এসে শিয়রে দাঁড়ালেও মেয়েটা ভরসা পেত। জামাইয়ের কথা ভাবতেই ফের বুকটা মোচড় দেয়। আজকাল তাই ননীবালা বড় গম্ভীর। বাসায় ফিরে কথাটথা বলেন না। জপ সেরে ছোট নাতিকে কোলে করে বসে থাকেন।

সুভদ্রর সঙ্গে এই তিন দিনে খুব ভাব হয়ে গেছে সোমেনের। বয়সে সুভদ্র কিছু বড়, কিন্তু তাতে বন্ধুত্ব আটকায় না। তিনবেলা সোমেন আসে। শুধু দুপুরটা বাদ দিলে, দুবেলাই সে সুভদ্রকে দেখতে পায়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। কার্ডফার্ড ছাড়াই ও ওয়ারডে ঢুকে যেতে পারে, যখন-তখন ডাক্তার ডেকে আনতে পারে। সিস্টারদের সঙ্গে ও দু-মিনিটে ভাব জমিয়ে ফেলে। কখনও সুভদ্র অপ্রস্তুত হয় না। চেহারাটা চমৎকার বলেও বোধ হয় ওর সুবিধে আরও বেশি। সোমেন জানে যে, সে নিজেও সুন্দর। কিন্তু তার চেহারায় বা সৌন্দর্যে কোথাও একটা মেয়েলিপনা আছে, একটু দুর্বলতা বা লজ্জাসংকোচের ভেজাল আছে। সুভদ্রর তা নেই। ও শতকরা একশো ভাগউপুরুষ। টান জোরালো চেহারা, মারকুট্টা ভাবভঙ্গি, গলা বজ্রগম্ভীর। যে কোনও পরিস্থিতিতে চেঁচামেচি করে লোক জমিয়ে ফেলতে ওর সংকোচ নেই। প্রথম দিন শীলাকে ভরতি করতে এসে

ও এমার্জেন্সিতে তাণ্ডব করে ফেলে। এমার্জেন্সির কাউন্টার চাপড়ে আলটিমেটাম দিয়ে বলল—আধ ঘণ্টার মধ্যে আমার রুগি ভরতি না হলে হেলথ মিনিস্টারকে এখানে আসতে হবে। তাতে এমার্জেন্সির লোকেরা আপত্তি করায় তাদের ফোন তুলে নিয়ে সুভদ্র বাস্তবিক ফোন করেছিল মিনিস্টারকে। তারপর পুলিশ কমিশনারকে, এক বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকার সম্পাদককেও। কাউকেই পায়নি, অবশেষে ওর এক রিপোর্টার বন্ধু এসে হাজির হল, আর একজন ডাক্তারও বেরিয়ে পড়ল চেনা। তাতেই কাজ হয়ে গেল। কিন্তু তাতে না হলেও সুভদ্রর ওই রুদ্রমূর্তি দেখেই হাসপাতালে একটা শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। বিস্তর রবাহূত লোকজন কোথেকে এসে জড়ো হয়ে সুভদ্রর পক্ষ নিয়ে কথাবার্তা বলতে শুরু করে। তখন শীলার মাথা কোলে নিয়ে অসহায়ভাবে বসে আছেন ননীবালা, আর সোমেন ভেবে পাচ্ছে না কী করবে। তাদের কিছু করতে হয়নি। সুভদ্র, অনাত্মীয় এবং অচেনা সুভদ্রই সব করে দিয়েছিল। তাই সুভদ্রর সামনে সোমেনের একটা কমপ্লেকস কাজ করে। নিজেকে সুভদ্রর চেয়ে ছোট বলে মনে হয়

কুমারস্বামীর ডেরায় গিয়েও সুভদ্র একটা কেলো করেছিল। কিন্তু সেটা কাজে লাগেনি। সোমবার শীলাকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত ছিল, অজিতের খোঁজ করার সময় হয়নি। কিন্তু হাসপাতালে ভরতি হওয়ার পর থেকেই শীলা ওই ব্যথা-যন্ত্রণার মধ্যেও কেবলই বলেছে— ওরে, তোরা ওকে খবর দে। ও না এলে আমি বাঁচব না।

মঙ্গলবার শীলার বেড পাওয়া গেল। খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে সুভদ্র বলল—চলুন সোমেনবাবু, আজ কুমারস্বামীর ডেরায় হুটোপাটি করে আসি। জোর কেলো করে আসব। বাস্তুঘুঘুদের সব ক'টা বাসা ভেঙে দেওয়া দরকার।

সোমেন দাঙ্গাহাঙ্গামায় ভয় পায়। খুব সাহসের কাজ সে কিছু করেনি কখনও। তা ছাড়া কুমারস্বামীর কিছুই সে জানে না যাতে লোকটার ওপর রাগ করা যায়। তবু বিকেলের দিকে সে সুভদ্রর সঙ্গে গর্চার গলিতে এক বড়লোকের বাড়িতে হানা দিয়েছিল। সুভদ্রর প্রথম চালটাই ছিল ভুল। দোতলায় উঠে সে বন্ধ দরজায় প্রচণ্ড শব্দ করে চেঁচাতে লাগল—কে আছেন, দরজা খুলুন।

দরজা খুলল। একটি বিস্মিত বিরক্ত মুখ উঁকি দিয়ে বলল—আস্তে। বাবা বিশ্রাম করছেন, ব্যাঘাত হবে। কাকে চাইছেন?

সুভদ্র অনায়াসে বলল—আমরা এই বাড়ি সার্চ করতে এসেছি। এখানে আমাদের একজন লোককে আটকে রাখা হয়েছে।

লোকটা ভীষণ অবাক হয়ে বলে—এখানে কাউকে আটকে রাখা হয়নি।

কিন্তু কে শোনে কার কথা! সুভদ্র তখন গলা তুলে চেঁচাচ্ছে—আলবাত আটকে রাখা হয়েছে। এখানে বহু লোককে হিপনোটাইজ করে আটকে রাখা হয়, সব আমরা জানি। আমাদের দেখতে দিন, নইলে পুলিশে খবর দেব।

হুজ্জৎ করার ইচ্ছে সোমেনের ছিল না। সে ভেবেছিল বড়দির অসুখের খবর দিয়ে জামাইবাবুকে নিয়ে যাবে। কিন্তু অসুখের খবরটাই দেওয়া হল না। সুভদ্র ব্যাপারটাকে এত বেশি বাড়িয়ে তুলেছিল যে সেখানেও লোকজন জুটে গেল। অবশেষে এক বেঁটে মতো ভদ্রলোক কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বেরিয়ে এসে বলল—আমি হাওড়ার ম্যাজিস্ট্রেট। বেশি বাড়াবাড়ি করলে পুলিশে ধরিয়ে দেব, মানহানির মামলাতেও পড়ে যাবেন।

এত গোলমালেও কুমারস্বামী বেরিয়ে আসেনি। সোমেন ম্যাজিস্ট্রেট দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। সুভদ্র অবশ্য ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে আরও কিছু বিতর্ক করতে যাচ্ছিল। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট আঙুল তুলে সিঁড়ি দেখিয়ে দিয়ে বলল—ক্লিয়ার আউট ক্লিয়ার আউট। এটা গুণ্ডামির জায়গা নয়।

আশ্চর্যের বিষয়, দুজন কনস্টেবলও কোত্থেকে এসে গেল সে সময়ে। তাড়া খেয়ে সোমেন আর সুভদ্র নেমে এল। সুভদ্র অপমান-টান গায়ে মাখে না, একটু হেসে বলল— লোকটা জেনুইন ম্যাজিস্ট্রেট। আমি ওকে চিনি। একবার ওর এজলাসে যেতে হয়েছিল। খুব কড়া লোক। বলে একটু চিন্তিতভাবে চুপ করে থেকে বলল—কুমারস্বামীর ক্ষমতা দেখলেন। সব রকম সেফগার্ড রেখে দিয়েছে!

সোমেন হতাশ হয়ে বলে—কিন্তু অজিতদা? দিদির অসুখের কথা বলে অজিতদাকে আনা উচিত ছিল।

সুভদ্র ঠোঁটে প্রচণ্ড তেতো বিরক্তির ভঙ্গি করে বলে—অসুখের কথা-টথা বলে নিচু হয়ে ভিক্ষে চাইতে হবে নাকি! দাঁড়ান না, এবার অন্য রকম কেলো করব।

সুভদ্রর এই মনোভঙ্গি সোমেনের পছন্দ ছিল না। কিন্তু সুভদ্র ওই রকম।

কখন কী হয়, তাই সোমেন প্রায় সারাদিনই হাসপাতালে থাকল বুধবারে। সকালেই শীলার আয়া জানাল—জল ভাঙছে। কথাটার মানে সোমেন জানে না, তাই ভয় পেয়ে নার্সকে গিয়ে ধরল। নার্স গা করল না, বলল—ও তো হবেই।

শীলা অসহনীয় যন্ত্রণায় বার বার বেঁকে যাচ্ছে। সোমেনকে দেখেও যেন চিনতে পারল না, শুধু বলল—আমাকে এখান থেকে অন্য কোথাও নিয়ে যা। কিছু করছে না, আমি মরে যাব।

অবস্থা দেখে মরে যাওয়ার কথাটা বিশ্বাস হচ্ছিল সোমেনের। কিন্তু এ অবস্থায় কী করা উচিত তা ঠিক করতে না পেরে সে কেবলই নার্স আর ডাক্তারদের কাছে ছোটাছুটি করল।

কাল রাতেও অজিতদা ফেরেনি। অনেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে সোমেন। আজ কদিন সোমেন ওদের বাসায় রাতে গিয়ে শোয়।

একটু বেলায় সুভদ্র এল। সোমেন সব কথা বলতে খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ঠান্ডা মাথায় সুভদ্র ডাক্তার ডেকে আনল কোথা থেকে। ডাক্তার দেখে-টেখে বলে—মেমব্রেনটা বার্স্ট করেছে, কিন্তু ডেলিভারির পেইন শুরু হয়নি। আমি এটাকেই ভয় পাচ্ছিলাম। একটা ইঞ্জেকশন লিখে দিচ্ছি, এনে দিন। যদি তাতে না হয় তবে কাল সকালে সিজারিয়ান হবে। এঁর হাজব্যান্ডকে দরকার, বন্ডে সই করতে হবে।

এই বলে গম্ভীর ডাক্তার চলে গেলেন। কিন্তু চলে যাওয়ার সময়ে তাঁর গম্ভীর মুখশ্রী থেকে সোমেনের ভিতরে একটা ভয় জন্ম নেয়। সে পরিষ্কার বুঝতে পারে ডাক্তার উদ্বিগ্ন, চিন্তিত। কোথাও একটা অস্বাভাবিকতা লক্ষ করছেন উনি। সোমেন বুঝল, বড়দির অবস্থা ভাল নয়।

বুঝতে পেরেই তার হাত পায়ে একটা শিউরানি খেলে গেল। বারান্দায় তখনও দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল সুভদ্র। তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে সোমেন সিগারেট ধরিয়ে বলল— সামথিং ইজ ভেরি মাচ রং।

সুভদ্র একবার চোখ কুঁচকে তাকাল মাত্র। তারপর মাথা নেড়ে বলল—ভাববেন না। প্রেসক্রিপশনটা দিন, ওষুধ এনে দিচ্ছি। বলে প্রেসক্রিপশন নিয়ে চলে গেল।

সোমেন চুপ করে রইল। সামনে একটু লন, তারপর লাল রঙের হাসপাতালের বাড়ি। কয়েকটা গাছগাছালি। খুব বৃষ্টি গেছে কাল, আজ গাছপালা ঘন সবুজ। ছেঁড়া বাদলমেঘের ফাঁকে ফাঁকে গভীর নীল

আকাশ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সবকিছুই একটা বিষন্নতায় মাখানো। এই বিপুল পৃথিবীতে সোমেন বড় একা ও অসহায় বোধ করে। আজ সে বড় বেশি নিজের অপদার্থতা বুঝতে পারছে। কিছু শেখেনি সে। যদি অন্তত ডাক্তারিটা পড়বার চেষ্টা করত তবে আজ এত অসহায় লাগত না। অচেনা এক সমবেদনাহীন যান্ত্রিক ডাক্তারের হাতে দিদির আয়ু—ভাবতেই কেমন লাগে! যদি কোনও ভুল করে ডাক্তার? যদি ঠিকমতো ব্যথার কারণটা ধরতে না পারে? যদি নার্সরা সময় মতো ডাক্তারকে খবর না দেয়? সমস্ত হাসপাতালের ব্যবস্থার মধ্যেই একটা রুক্ষ উদাসীন এবং বিরক্তির ভাব রয়েছে। যেন এরা রুগি কিংবা রোগ পছন্দ করে না। যেন এদের সবাইকে জোর করে, ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজে লাগানো হয়েছে। ছেলেবেলা থেকে যে বড়দিকে সে চেনে যাকে নানা সুখে-দুঃখে, রাগে-অভিমানে আপনার লোক বলে জেনেছে, তাকে এরা তো সেভাবে চেনে না। এদের কাছে বড়দি এক অচেনা রুগি মাত্র, যার বেঁচে থাকা দরকার, তা বুঝবে কি করে? রাগে অসহায়তায় সোমেনের হাত পা নিশপিশ করে। দারোয়ান গোছের কিছু লোক বাইরের লোকজনকে সরিয়ে দিচ্ছে। সোমেন তাই নীচে নেমে এল। সামনের মাঠে দাঁড়িয়ে রইল বোঝার মতো। তার কিছু করার নেই। সে ডাক্তারির কিছুই জানে না, এই ভেবে তার চোখে জল এল হঠাৎ।

দুপুরের আগেই সুভদ্র চলে গেল, ইস্কুল আছে। সোমেন কোথাও গেল না। খোলা মাঠের মধ্যে বসে ভাবতে লাগল, বড়দিকে সে বরাবর খুব অবহেলা করেছে। কত ডাকত বড়দি, কতবার বলেছে—একা থাকি, আমাদের কাছে এসে কদিন থাক না সোমেন! কতবার বড়দি তাকে দামি জামা প্যান্ট দিয়েছে, নগদ টাকাও দিয়েছে অনেক। সেই বড়দি কোথায় কোন বিপুল অলক্ষ্যে মিশে মিলিয়ে যাবে! আর কখনও, কোনওদিন দেখা হবে না।

দুপুরে শীলার খাবার নিতে একবার বাসায় ফিরল সোমেন। খাবার নেওয়া বৃথা। বড়দি তো খায় না, আয়াই খেয়ে নেয়। তবু খাবার নিতে বাসায় না গেলে ননীবালা চিন্তা করবে। বাসায় এসে কোনওক্রমে কাকস্নান সেরে দু-গ্রাস অনিচ্ছের ভাত খেয়ে নিল সোমেন। ননীবালা উদ্বেগের গলায় জিজ্ঞেস করেন—কেমন আছে রে?

ভেঙে বলল না সোমেন। কেবল বলল—ওইরকমই।

টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে ফের হাসপাতালে এসে ওয়ার্ডে ঢুকে ভয়ংকর চমকে গেল সোমেন। বড়দির বিছানার পাশে স্ট্যান্ডে সেই স্যালাইন বা গ্লুকোজের ওলটানো শিশি, রবারের নল ঝুলছে। লাল কম্বলে দিদিকে চেপে ধরে আছে বুড়ি আয়া। আর বড়দির প্রচণ্ড একটা কাঁপুনি উঠেছে। মুখ সাদা, ঠোঁট মরা মানুষের মতো ফ্যাকাশে, দুটো চোখে দৃষ্টি নেই। কেবল মুখে একটা অবিরল 'হু—হু—হু—হু' শব্দ করছে। আয়া বলল, শিরায় ছুচ ফোটানোর সঙ্গে সঙ্গে রিগার উঠেছে। তাই উঁচ খুলে ফেলা হয়েছে। কিন্তু একটু বাদেই আবার দেবে। ইঞ্জেকশনটা ওই শিশির তরল পদার্থের সঙ্গে মেশানো আছে।

সোমেন দৃশ্যটা দেখতে পারল না। খাবার রেখে বেরিয়ে এল। কী অমানুষিক কষ্ট পাচ্ছে বড়দি, ভেবে বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সোমেন ফের চোখের জল মুছল।

বিকেলের দিকে ওয়ার্ড ভরে গেল লোকে। রণেন, ননীবালা, সুভদ্র, আর সুভদ্রর সঙ্গে শীলার স্কুলের আরও পাঁচ ছজন দিদিমণি। এত লোককে ঢুকতে দেয় না। কিন্তু সুভদ্র কী করে ম্যানেজ করেছে। শীলার জ্ঞান প্রায় নেই। মুখে গ্যাঁজলা উঠছে। আর গভীর বেদনার দীর্ঘ ধ্বনি বুক থেকে উঠে আসছে কখনও।

একবার সেই অবস্থাতেই বড় বড় চোখ মেলে কাকে যেন খুঁজল চারদিকে। পেল না। ব্যথায় প্রচণ্ড মুখ বিকৃত করে চোখ বুজল। দুটো হাতের মুঠো মাঝে মাঝে ভীষণ শক্ত হয়ে যাচ্ছে। বালিশের ওয়াড় খিমচে ধরে টানছে এক-একবার। ফের নরম হয়ে যাচ্ছে শরীর। আবার ব্যথার ঢেউ আসছে।

ননীবালা শীলার হাতের আঙুল টেনে দিচ্ছেলেন। মাঝে মাঝে মেয়ের কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলছেন—ও শীলা, ব্যথাটা কি একটু অন্যরকম টের পাস? ঝলকে ঝলকে ব্যথা আসছে কি?

শীলা সে কথা শুনতে পায় কিনা কে জানে! এক-একবার ককিয়ে ওঠে। শুধু ননীবালার হাতটা খিমচে ধরে বলল—ও কোথায় মা? ও কেন আসছে না? যার জন্য আমার এত কষ্ট সে একবার এসে দেখে যাক যে আমি মরে যাচ্ছি। ও কি রাগ করেছে মা? অ্যাঁ!

বলেই ফের ব্যথায় ডুবে গেল শীলা। প্রবল ককিয়ে উঠল।

সোমেন পালিয়ে এল। পিছন থেকে সুভদ্র এসে ধরল তাকে। সামনের লনে দাঁড়িয়ে দুজনে সিগারেট ধরায়।

॥ ষাট ॥

সরকার একটা খেলা দেখাতেন। বার্ডস ফ্রম নোহোয়ার। চমৎকার খেলা। একেবারে শূন্য থেকে অজস্র সজীব ডানা-ঝাপটানো পাখি ধরে আনতেন। নিস্তব্ধ মঞ্চ হঠাৎ ভরে যেত ডানার শব্দে, কাকলিতে। কী চমৎকার খেলা! তার কৌশলটা আজও অধিকাংশ ম্যাজিশিয়ানের কাছে অজানা।

অনেকবার চেষ্টা করেছে অজিত। পারেনি।

কয়েকটা পাখি কিনে রেখেছে সে। বারান্দায় খাঁচায় ঝোলানো আছে। ঝি মেয়েটা তাদের দানাপানি দেয়। অজিত সন্ধেবেলা চুপ করে সেই খাঁচাগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে পাখিরা ডানা ঝাপটাল কয়েকবার। ভয়ের শব্দ করল। এখন ঝিমোচ্ছে। অজিত চেয়ে থাকে। সে পাখি দেখছে না, সে ম্যাজিকের কথা ভাবছে না। তার কেবল মনে হচ্ছে শীলাকে সে বড় অন্যায় সন্দেহ করেছিল। শীলা যদি না বাঁচে তবে তাকে অন্তত এ কথাটা জানিয়ে দেওয়া দরকার যে, অজিত বড় অন্যায় করেছিল তার প্রতি। পাখিদের দেখে কেন কথাটা মনে হল, কে জানে।

ঘরে এসে সে ঝিকে চা দিতে বলল। এই নিয়ে বোধ হয় পাঁচবার চা হল। আর সিগারেট? না, তার কোনও হিসেব নেই। বিকেল থেকে সে অবিরল সিগারেট টানছে। এখন আর ধোঁয়ার কোনও স্বাদ নেই। আলোতে একবার দুটো হাত চোখের সামনে তুলে ধরল। দেখল, আঙুল স্থির নেই। হাত কাঁপছে। একটু বাদেই কেউ আসবে। বলবে—শীলা নেই। সেই অমোঘ ক্ষণটির জন্য অপেক্ষা করছে সে। কী করবে? কিছু করার নেই। যা হওয়ার হোক।

মনে পড়ে, এ বাড়িটা শীলার তাগাদাতেই করেছিল সে। কত প্ল্যান করে, কত শখের নকশায় তৈরি করা বাড়ি! শীলা নিজের গয়না দিয়েছে, কষ্টের রোজগারও ঢেলেছে কম নয়। বুকের পাঁজরের মতো আগলে থেকেছে। মানুষ কী ভীষণ মরণশীল: কেমন হুট বলতেই সব রেখে চলে যেতে হয়!

গরম চায়ে জিব পুড়ে গেল অজিতের। গ্রাহ্য করল না। তিন চার চুমুক খেয়েই উঠে হঠাৎ ফুলপ্যান্ট পরতে লাগল। না, যাই গিয়ে একবার দেখে আসি। ফুলপ্যান্ট আর গেঞ্জি পরে। জামাটা গায়ে দিতে গিয়েই ফের মনে হয়—থাকগে। ও দৃশ্য আমি দেখতে পারব না।

ফের চায়ের কাপ নিয়ে বসে অজিত। চা ঠান্ডা হয়ে গেছে। আবার ঝিকে ডেকে চা দিতে বলে। সিগারেট ধরায়। হাত দুটো দেখে। আর বিড়বিড় করে বলে—তোমার ওপর নেই ভুবনের ভার...।

হঠাৎ বিদ্যুৎ স্পর্শে চমকে ওঠে অজিত। তাই তো! আজ লক্ষ্মণ এসেছে। বহুকাল পরে, বহু যুগ পরে। সম্ভবত জন্মান্তর থেকে এসেছে লক্ষ্মণ। তার কাছেই কি চলে যাবে অজিত। লক্ষ্মণের কাছে গেলে মাঝখানের এই কটা বছর মুছে যাবে। সেই কলেজের ছোকরা হয়ে যাবে অজিত! লক্ষ্মণের কাছে গেলে আর চিন্তা নেই, বয়স নেই। দুজনে চিনেবাদাম ভাঙতে ভাঙতে আজ ময়দানে হাঁটবে। আর লক্ষ্মণ তাকে আকাশতত্ত্ব বোঝাবে।

বলবে অসীম শূন্যতা আর নিরবধি সময়ের কথা। সংসারের স্মৃতি থাকবে না, মৃত্যুর ভয় থাকবে না, শীলার কথা মনে পড়বে না! অজিত উঠে জামা পরল। ঝিকে ডেকে বলল—আমি বেরোচ্ছি। সদর বন্ধ করে দে।

—ও মা! চা করতে বললে যে!

—করতে হবে না।

বলে অজিত বেরিয়ে গেল।

রাস্তায় বেরিয়েই তার মনে হল, সে বড় অপরাধ করেছে শীলার প্রতি। সে চার দিন বাড়ি ফেরেনি। চারটে দিন সে উপেক্ষা করেছে, অবহেলা করেছে। শীলা তো তেমন কিছু অন্যায় করেনি। বড় ভাল মেয়ে শীলা। ভাবতে বুকের মধ্যে এক চৈত্রের ফাঁকা মাঠে হু হু করে যেন শুকনো খড়-নাড়া তৃণের জঙ্গলে আগুন লেগে গেল। বড় দহন। বড় জ্বালা। চার দিন সে কি করে আসন্নপ্রসবা শীলাকে ভুলেছিল?

এ সময়ে বাস-টাস চোখেই পড়ে না অজিতের। বড় রাস্তা থেকে ট্যাক্সি নিল। কোথায় যাবে তা হঠাৎ এখন আবার ঠিক করতে পারছিল না অজিত। শীলা কোন হাসপাতালে আছে তা জানে না। জানলেও লাভ নেই। ভিজিটিং আওয়ার সব হাসপাতালেই শেষ হয়ে গেছে। ভাবল, কালীঘাটে লক্ষ্মণের বাসায় যায়। পরক্ষণেই মনে হয়, শীলার একটা খোঁজ পেলে। নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, তারপর লক্ষ্মণের কাছে যেতে ভাল লাগবে।

দু-তিনবার মত পালটে অবশেষে ঢাকুরিয়ার শ্বশুরবাড়ির কাছেই চলে আসে অজিত। ভিতরে ঢুকতে সাহস হয় না। ট্যাক্সিটা দোরগোড়ায় দাঁড় করিয়ে নামে। ওপরদিকে তাকিয়ে উৎকর্ণ বুঝতে পারে না। তারপর মনে হয়, একটা মেয়ে-গলার কান্নার আওয়াজ খুব ক্ষীণ শোনা যাচ্ছে। মনটা নিভে গেল। তা হলে শীলা...! ওপরে আলো জ্বলছে, জানালায় পরদা, বাইরে থেকে স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। কিন্তু কান্নার শব্দটাই জানান দিচ্ছে, এ বাড়ির কেউ...।

মাথাটা গরম। ফের ট্যাক্সিতে বসে সে বলল—গাড়ি ঘুরিয়ে নিন। কালীঘাট যাব। একটু তাড়াতাড়ি।

ট্যাক্সি চলে। অজিত চুপ করে বসে থাকে। তার চারধারে কলকাতার কোলাহল নেই, আলোর অস্তিত্ব নেই, বর্তমান নেই। এক নিস্তব্ধ, সময়হীন অনন্ত পরিসরে ভিতরে কেবল তাকে গতিময় রেখেছে বেঁচে থাকাটুকু। নিস্তব্ধতায় ভাসমান শব্দহীন একটা স্পেসক্রাফটে বসে আছে সে। সে বেঁচে আছে, কিন্তু কিছু বোধ করছে না।

লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ ঠিক ফিরেছে তো! নাকি গিয়ে দেখবে যে লক্ষ্মণ গিয়েছিল তার নির্মোক পরে অন্য একজন সুখী মোটা সাহেবি মানুষ এসেছে! লক্ষ্মণকে নিয়ে তার বড় ভয়।

ট্যাক্সি ঠিক জায়গায় থামল। অজিত ভাড়া মিটিয়ে নামল। কিন্তু রাস্তার নির্দেশ দেওয়া থেকে ভাড়া মেটানো, বা দরজা খুলে নামা, এ সবই সে করেছে এক অবচেতন অবস্থায়। সে। টের পাচ্ছে না যে সে কী করছে।

লক্ষ্মণদের দরজা খোলাই রয়েছে। খুব আলো জ্বলছে আর অনেক লোকের ভিড়। অজিত দরজায় দাঁড়িয়ে ভিতরে তাকাতেই একদম সোজা লক্ষ্মণের চোখে চোখ পড়ল। খালি গা, একটু ধুতি পেঁচিয়ে বসে আছে। তাকে দেখেই লাফিয়ে উঠল—এলি? এসকেপিস্ট কোথাকার! এয়ারপোর্টে তোকে কত খুঁজেছি।

একলাফে এসে লক্ষ্মণ তাকে জড়িয়ে ধরল। কানের কাছে মুখ, বলল—চলে এলাম। বুঝলি?

অজিত চোখের জল কষ্টে সামলায়। হেসে বলে—চলে এলি মানে? পার্মানেন্টলি?

লক্ষ্মণ মাথা নাড়ল—না, আর একবার যাব। তারপর ফিরে আসব।

অজিত নিবে গিয়ে বলে—তোকে বিশ্বাস নেই। গেলে যদি আর না আসিস!

ঠিক বটে, লক্ষ্মণ কিছু মোটা হয়েছে, একটু ফরসাও। কিন্তু মুখচোখের সেই দীনভাব আজও যায়নি। ওর ঠোঁটের গঠনে লুকনো আছে একটা চাষির সরলতা, চোখ এখনও স্বচ্ছ ও অকুটিল। সেই লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণ বলল—আমি ভাবছিলাম, তুই তো এসকেপিস্ট, বরাবর ঘটনা এড়িয়ে চলিস। তাই বুঝি এয়ারপোর্টে ভিড়ের মধ্যে পাছে দেখা হলে একটা সিন হয় সেই ভয়ে যাসনি।

অজিত মাথা নেড়ে বলে—না রে। আমি আজ বিকেলে ফিরেছি। তখন চিঠি পেলাম।

লক্ষ্মণ চারদিকে চেয়ে বলল—এখানে বড় ভিড়। খবর পেয়ে সবাই এসেছে। এখানে তো কথা হবে না।

অজিত খুব আন্তরিকতার সঙ্গে বলল—শোন লক্ষ্মণ, শীলা হাসপাতালে। অবস্থা খুব খারাপ। হয়তো এতক্ষণ বেঁচেও নেই বলতে বলতে অজিতের গলা বন্ধ হয়ে গেল।

লক্ষ্মণ চরকির মতো ঘুরে দাঁড়াল—বলিস কী? তুই এই অবস্থায় শীলাকে ফেলে এসেছিস?

—এলাম। বলতে গিয়ে চোখ ভেসে গেল অনিচ্ছাকৃত অশ্রুতে। ঠোঁট কাঁপল, তবু হাসবার চেষ্টা করে অজিত বলে—এলাম। তোর কাছে। তোকে দেখতে। আজ চলি। পরে দেখা হবে।

অজিত বেরিয়ে এল। এখন বয়স হয়ে গেছে। এখন কি আর সেই বয়ঃসন্ধির কালের মতো বন্ধুর আশ্রয় ভিক্ষে করতে হয়! এই বয়সে নিজের আশ্রয় হতে হয় নিজেকেই।

বেরিয়ে আসছিল, পিছন থেকে লক্ষ্মণ চেঁচিয়ে বলল—দাঁড়া। এক মিনিট।

অজিত দাঁড়াল। লক্ষ্মণ তার সেই লুঙ্গি করে পরা ধুতির ওপর একটা পাঞ্জাবি চড়িয়ে বেরিয়ে এল, পিছন ফিরে কাকে যেন বলল—আমি অজিতের সঙ্গে যাচ্ছি। আজ হয়তো ফিরব না।

বলে অপেক্ষা করল না। চলে এল।

সেই লক্ষ্মণ। ডাকলে বরাবর বেরিয়ে আসত।

অজিত এইটুকুই চায়। আর কিছু নয়। আর কেউ না হলেও খুব ক্ষতি নেই। কেবল লক্ষ্মণ হলেই চলে যায়। ডাকামাত্র সে আসে। যাকে বলতে হয় না হৃদয়ের দুঃখ বিষাদের কথা। বুঝে নেয়।

ট্যাক্সিতে লক্ষ্মণের পাশে বসে, নিজের হাতের আঙুলে কপাল ছুঁইয়ে জিত তার কান্নার বাঁধ ভেঙে দিচ্ছিল। নিঃশব্দ কান্না। কেবল লক্ষ্মণ টের পায়। চুপ করে থাকে। অজিতের ভিতরটা জুড়িয়ে যাচ্ছে। চৈত্রের সেই আগুন লাগা ক্ষেতের ওপর ঘন মেঘ। ধারাজলে নিভে যাচ্ছে আগুন।

॥ একষট্টি ॥

এইখানে এক পিরের কবর। তার চার ধারে বাঁশঝাড়, আর শিমূল আর শিরীষ গাছের জড়াজড়ি। একটা ভাঙা বাড়ির ইটের স্তূপের ওপর সবুজ শ্যাওলা জমেছে। তার ভিতর দিয়েই মেঠো রাস্তা। ভাঙা বাড়িটার ভিতরবাগে এখনও গোটা দুই নোনা-ধরা ঘর খাড়া আছে। ছাদ ধসে পড়ে গেছে, তাই ওপরে টিনের ছাউনি। মেঝেতে অজস্র ফাটল, অশ্বত্থের শিকড় দেখা যায় দেওয়ালের ফাটলে। দিনে-দুপুরে ঘরের চারপাশে পায়রা ডাকে, রাতে চামচিকে আর বাদুড়। হাতখানেক লম্বা পাকা তেঁতুলের রঙের তেঁতুলবিছে লসলস করে হেঁটে যায় এক ফাটল থেকে অন্য ফাটলে। বর্ষায় উঁচু হুল বাগিয়ে তুরতুর করে তেড়ে যায় কাঁকড়া বিছে। আর ইটের স্তূপে ইদুরের গর্তে, ভিতের ফাটলে বাস্তু সাপের প্রকাণ্ড সংসার। মুহুর্মুহু দেখা যায় ধূসর রঙের গোখরো দাওয়া পেরিয়ে যাচ্ছে, বর্ষার রোদ উঠলে অজস্র জাত সাপের বাচ্চা ফাঁকায় বেরিয়ে কিলবিল করে, মাটির ওপর ঢেউ খেয়ে খেয়ে ধীরে ধীরে চলে যায় চন্দ্রবোড়া।

এইখানে থাকেন ফকিরসাহেব, হাজি শেখ গোলাপ মহম্মদ ওস্তাগার। ব্রজগোপাল ছাড়া এ নাম আর কেউ জানে না। সবাই জানে ফকিরসাহেব বলে। এই ভাঙা বাড়ি তাঁর নয়। এক ভক্ত মুসলমান মরবার আগে সমস্ত সম্পত্তি দিন দুনিয়ার মালিক আল্লাহর নামে ওয়াকফ করে দিয়ে যায়। সম্পত্তি বলতে অবশ্য ভাঙা বাড়িটাই —যা একসময়ে প্রকাণ্ড ছিল, জাঁকজমকও ছিল হয়তো। এখন দাবিদার কেউ নেই। সেই ভক্তজনই ফকিরসাহেবকে এখানে বসিয়ে দিয়ে যায়। ফকির থাকেন। প্রতি পদক্ষেপে সাপের দাঁত, বিছের হুল, পাখি-পক্ষীর পুরীষ। ফকিরসাহেব গ্রাহ্য করেন না।

সন্ধেয় আজ প্রকাণ্ড পূর্ণিমার চাঁদ উঠল। ফকিরসাহেব মোমবাতি নিভিয়ে দিয়ে বললেন—চলুন, দাওয়ায় গিয়ে আল্লার আলোতেই বসি, সেই ভাল।

ব্রজগোপাল গম্ভীর ভাবে বললেন—হুঁ।

দুজনে বাইরের খোলা চাতালে এসে বসলেন। ফকিরসাহেব জ্যোৎস্নার আভায় ব্রজগোপালের মুখখানা দেখে নিয়ে বলেন—কীরকম আওয়াজ শোনেন ধ্যানের সময়ে।

ব্রজগোপাল বলেন—সে বড় ভীষণ আওয়াজ। সহস্র ঘণ্টার ধ্বনি, সহস্র শাঁখের আওয়াজ। পাগল করে দেয়। আর একটা নীল আলোর পিণ্ড হঠাৎ ফেটে গিয়ে চারধারে আলোর ফুলঝুরি ছড়াতে থাকে। তখন বড় ভয় করে, আবার আনন্দও হয়।

ফকিরসাহেব মাথা নেড়ে বলেন—গুরুর কৃপা।

ফিসফিস করে ব্রজগোপাল বলেন—যত দিন যাচ্ছে তত স্পষ্ট হচ্ছে। কান বন্ধ করলে একরকমের শব্দ শোনা যায়, ছেলেবেলায় শুনতাম সে নাকি রাবণের চিতার শব্দ। বলে। হাসলেন ব্রজগোপাল। ফকিরসাহেব মাথা নাড়লেন। ব্রজগোপাল বলেন—আসলে তা তো নয়। আমাদের দেহযন্ত্রের মধ্যে যে অবিরল বেঁচে

থাকার কারখানা চলছে ও হচ্ছে তারই শব্দ। আমাদের বহির্মুখী ইন্দ্রিয়গুলি তা ধরতে পারে না। তেমনি ধ্যানে বসে মনটা কূটস্থে ফেলে দিলে সৃষ্টির মূল শব্দ পাওয়া যায়। আপনি বিশ্বাস করেন না?

ফকিরসাহেব মৃদু হাসলেন, বললেন—ব্রজঠাকুর, পথ একই, বিশ্বাস করব না কেন? আমি কি অবিশ্বাসী বিধর্মী? শব্দ শব্দেই তাঁর লীলা টের পাই।

বলে একটা শ্বাস ফেললেন ফকিরসাহেব। মুখে পান ছিল। সেটা আবার চিবোতে চিবোতে এক টিপ দোক্তা ফেললেন মুখে। জ্যোৎস্নায় একটা মোরগ ভুল করে ডেকে উঠল। হাত কয়েক দূরে জ্যোৎস্নায় একটা সাপকে দেখা গেল খোলা হাওয়ায় বেড়াচ্ছে। ফকিরসাহেব একটা হেঁচকি তুলে বললেন—যা যা...

সাপটা আস্তে ধীরে ইটের পাঁজার ওপর উঠে গাছের ছায়ায় মিলিয়ে গেল। সেদিকে চেয়ে থেকে ফকিরসাহেব নিমীলিত নেত্রে বললেন—ব্রজঠাকুর, শব্দের কথা মানুষকে বলবেন না। ওরা বিশ্বাস করবে না, ভাববে বুজরুকি।

—বুজরুকেরও অভাব নেই। ব্রজগোপাল উদাস গলায় বলেন—এখন শুনি অনেক ম্যাজিকওয়ালা সব গুরুঠাকুর সেজে বসেছে। আহাম্মকেরা তাদের কাছে ভগবান বলে ধেয়ে যায়। বুদ্ধিমান লোকে তাই বুজরুকি বলে পুরো ধর্মকেই অগ্রাহ্য করে। এ বড় ভীষণ অবস্থা।

জ্যোৎস্নাতে কাক ডেকে উঠছে। নিঃশব্দ বাদুড় ঝুলে পড়ল শূন্যে, চাঁদের চারধারে পাক খেয়ে মিলিয়ে গেল। ভারি নিঃঝুম চারদিক। কেবল মাঝে মাঝে রাতের শব্দ হয়। পাখির অস্পষ্ট ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ, ঝিঁঝি ডাকছে অবিরল, গাছে গাছে ফিসফিস কথা, আর কখনও টিকটিকি ডাকে, কখনও তক্ষক। চারধারে গাছগাছালির ছায়া নিবিড় হয়ে পড়ে আছে। পাতানাতা মাড়িয়ে একটা শেয়াল দৌড়ে গেল, পিছনে দূরে কোনও গেরস্তর কুকুর তাড়া করে এল খানিক দূর।

দুজনেই আসনপিঁড়ি হয়ে মুখোমুখি বসে আছেন। চারধারে মানুষের সাড়া নেই কোথাও। কিন্তু পৃথিবীর গভীর ও রহস্যময় প্রাণস্পন্দনে সজীব আবহ। আকাশে বৃক্ষে ও মাটিতে কত কোটি কোটি প্রাণ বেঁচে আছে। টের পাওয়া যাবে।

ফকিরসাহেব মাথা নেড়ে বলেন, ইটিন্ডাঘাটে এক বুজরুক ছিল, ঘরে বসে সে নাকি কলকাতার নামি দোকানের রসগোল্লা কিংবা অসময়ের ল্যাংড়া আম খাওয়াত। লোকে বলত, তার পোষা ভূত আছে, সে-ই সব এনে দেয়। খবর পেয়ে দেখতে গেলাম লোকটাকে, কিন্তু আমার ফকিরি চেহারা দেখেই লোকটা ঘেবড়ে গেল। কিছুতেই আর রসগোল্লা বা আম আনারস আনতে রাজি হয় না। লোকজনের বিস্তর ঝোলাঝুলি সত্ত্বেও বলে আজ আমার শরীর ভাল না। পরে আমাকে আড়ালে ডেকে বলল—আপনি তো সবই জানেন, ভাঙবেন না। বলে ফকিরসাহেব হাসলেন, বললেন—ব্রজঠাকুর, আদতে কিন্তু আমি কিছুই জানি না। আমি লোকটার ঐশী শক্তি দেখতেই গিয়েছিলাম, ভাল হাতসাফাই হলে ধরতেও পারতাম না।কিন্তু লোকটা ভয় খেয়ে সব স্বীকার করে ফেলল।

ব্রজগোপাল বলেন—আমার বড় জামাইও কার পাল্লায় পড়েছে শুনছি। ছোকরার ধর্মকর্মের ওপর খুব রাগ ছিল, এখন নাকি পথে পথে কেত্তন করে চাঁদা তোলে, কোথায় আশ্রম করবে। ঘরে পোয়াতি বউ পড়ে থাকে, আর সে বাবা বাবা' বলে গুরুর নামে চোখের জল ফেলে নামগান করে। তা গুরুর নামে চোখের জল আসে সে ভালই, কিন্তু এসব তপ্ত আবেগ তো বেশিক্ষণ টেকে না। একদিন চটকা ভাঙলেই ছিটকে যাবে। তখন হয়

ধর্মকর্মের ওপর মহা খাপ্পা হয়ে উঠবে, নয়তো সাত গুরু ধরে বেড়াবে। এও বড় ভয়ংকর অবস্থা। তারচেয়ে নাস্তিক ছিল, সে ঢের ভাল ছিল। নিষ্ঠাবান নাস্তিকেরও উদ্ধার আছে, দুর্বলচিত্তরাই উদ্ধার পায় না।

ফকিরসাহেব নিমীলিত চোখে চেয়ে রইলেন।

পিরের কবর অনেক দূর। গাছগাছালির আড়াল পড়েছে। সেই দূর থেকে কে যেন হাঁক পাড়ে—ব্রজকর্তা, ও ব্রজকর্তা!

কোকা কিংবা কালিপদ হবে। আজকাল একটুক্ষণ বাইরে থাকলে বহেরু চারধারে লোকজন পাঠাতে থাকে। তা সেই লোকজনেরা কেউ এতদূর আসতে সাহস পায়নি। গাঁ গঞ্জের মানুষ সব, এমনিতে সাহসের অভাব নেই। কিন্তু ফকিরসাহেবের আস্তানায় সন্ধের পর ঢুকতে চায় না কেউ। পায়ে পায়ে সাপ ঘোরে। তার ওপর লোকে জানে, এ সময়টায় ফকিরসাহেব ভূত আর পরি নামান। অনেকে দেখেছে ক্ষুদে ক্ষুদে পরি গাছের পাতায় পাতায় দোল খায়। জিন ঘুরে বেড়ায়, ভূত এসে ফকিরসাহেবের পা দাবায়, পাকা চুল বেছে দেয়। সেইসব ভয়ে কেউ ঢোকে না। ভূতের গায়ের গন্ধ অনেকটা বুড়ো পাঁঠার গায়ের গন্ধের মতো, সেই বিদঘুটে গন্ধে নাকি তখন জায়গাটা ম ম করে। মরার পর মেঘু ডাক্তারও নাকি এখানে থানা গেড়েছে। তাই কেউ আসে না।

একমাত্র ব্রজগোপাল আসেন। সঙ্গে একটা টর্চবাতি থাকে, আর একটা মজবুত লাঠি।

ফকিরসাহেব বললেন—ওই আপনার শমন এসেছে।

—হ্যাঁ। যাই।

ফকিরসাহেব হেসে বলেন—আমরা দুই ফকির এক ঠাঁই থাকতে পারতাম তো বেশ হত। তাঁর দয়ায় কথা বলতে বলতে একটু কাঁদতাম দুজনে। কী বলেন?

ব্রজগোপাল একটা শিহরিত আনন্দের দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—ওই হচ্ছে কথা। তাঁর কথাই হচ্ছে কথা।

টর্চবাতি আর লাঠি নিয়ে উঠলেন। টর্চ ফেলতেই একটা বিশাল দৌড় দিল। চাতালের ঠিক নীচেই মাথা তোলা দিল বাদামি রঙের গোখরো। টর্চ আর লাঠি দু-বগলে চেপে নিয়ে হাততালি দিলেন ব্রজগোপাল। সাপটা ধীরেসুস্থে উত্তরবাগে সরে গেল। ব্রজগোপাল মুখ ঘুরিয়ে বললেন—এ জায়গায় বড় মধু। পরম পিতা খোদার ভক্ত থাকেন তো, ইতরজীবও তাই টের পায় এ জায়গায় ভালবাসার তাপ রয়েছে।

—আল্লা মালিক। ফকিরসাহেব বললেন।

ব্রজগোপাল হাঁটতে থাকেন।

ঘরে এসে একটা পোস্টকার্ড পেলেন তিনি। লণ্ঠনের আলোটা উসকে পড়তে লাগলেন। বুধবার রাত বারোটা কুড়ি মিনিটে শীলার একটি ছেলে হয়েছে। প্রসবে খুব কষ্ট পেয়েছে শীলা, রক্ত দিতে হয়েছে। শীলার কষ্টের কথা আরও অনেকখানি লিখেছেন ননীবালা। জামাই বাড়ি ছিল না। ছেলে হওয়ার পর সে খবর পেয়েছে। তারপর জামাইয়ের সাম্প্রতিক স্বভাবের ওপরেও অনেকটা লেখা, ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষর পড়তে গিয়ে চোখে জল চলে আসে। আরও লিখেছেন, ছেলেরা আজকাল তাঁর খোঁজখবর করে না। বীণার ব্যবহার ভাল নয়। ইত্যাদি।

ব্রজগোপাল চিঠি রেখে পঞ্জিকা খুলে বসলেন। কাগজ কলম নিয়ে নিবিষ্টমনে কোষ্ঠীর ছক তৈরি করতে লাগলেন নাতির। মনটায় বেশ একটা ফুর্তির হাওয়া খেলছে। নাতি হয়েছে। আরও তো কটা নাতি-নাতনি

আছে তাঁর, তবু এই যে একটা রক্তের সম্পর্কিত মানুষছানা জন্মাল, এই খবরটাই কেমন একটা মায়া সৃষ্টি করে বুকের মধ্যে।

একটা লোক এনেছে বহেরু যে মাটি ছাড়াই গাছ গজিয়ে দিতে পারে। সেই শুনে বহেরু তাকে হাওড়া না কোত্থেকে ধরে এনে কদিন জামাই আদরে রেখেছে। একটা বেশ বড়সড় জায়গা বাঁশ-বাঁখারি দিয়ে ঘিরে বাঁশের খুঁটি পুঁতে কী সব কাণ্ড মাণ্ড হচ্ছে। এই রাতেও সেখানে দু-দুটো ডে-লাইট ঝুলছে জাম আর সজনে গাছের সঙ্গে। মেলা লোকজন তামাশা দেখতে ভিড় করেছে। এখন সেখানে মাটি কেটে কেটে সিমেন্ট জমিয়ে চৌখুপি করা হচ্ছে সেইখানেই চাষ হবে।

ব্রজগোপাল বাইরে এসে দূর থেকে ভিড়টা দেখলেন। সেই ভিড়ে একমাথা উঁচু বহেরু কোমরে হাত দিয়ে জমিদার-টমিদারের মতো দাঁড়িয়ে।

ব্রজগোপাল ডাকতেই বহেরু ছুটে আসে।

—কর্তা ডাকলেন নাকি?

—তুইও ছেলেমানুষ হলি নাকি?

বহেরু হাসে, বলে—না, কায়দাটা দেখে রাখছি, কী করে করে। দরকার হলে নিজেরাই করতে পারব।

—তোর মাটি ছাড়া চাষের দরকার কি? তোর কি মাটির অভাব?

বহেরু ঝুপ করে সুমুখে বসে পড়ে। লাজুক হেসে বলে—তা হতেও পারে একদিন। শুনি, এই সেদিন তারাদাস মাস্টারমশাই কচ্ছিলেন যে, এত মানুষ জন্মাবে পৃথিবীতে যে সব গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। শোওয়া বসার জায়গাটুকুও থাকবে না। তা তখন পৃথিবীর জমিতে তো টান পড়বেই। শিখে রাখা ভাল।

ব্রজগোপাল গম্ভীর হয়ে বলেন—তুই যে সেই মোড়লটার মতো কথা বলিস। আমার সেই যজমান মোড়লকে একদিন বলেছিলাম—বাপু হে, মাছ মাংস খেলে শরীরে টকসিন হয়, রোগবালাই হলে সহজে ছাড়তে চায় না, ওসব আর খেয়ো না। সে তখন হাতজোড় করে বলে—দাদা, মাছমাংস খাওয়া সবই ছেড়ে দিলে যে নদী পুকুর সমুদ্দুর সব মাছে মাছে মাছময় হয়ে যাবে, ঘটি ডুববে না জাহাজ চলবে না। আর ডাঙায় পাঁটা ছাগল মোরগে সব ভরে যাবে, দিনরাত চারধারে ভ্যা-ভ্যা ম্যা-ম্যা কোঁকর কোঁ আওয়াজে কান ঝালপালা। যেন বা সেই ভয়েই ব্যাটা মাছমাংস খাওয়া ছাড়তে পারে না।

বহেরু হেসে বলে—তা হলে তত্ত্বটা কী কর্তা?

—তুই তো কেবল চিরকাল তত্ত্ব শুনতে চাস। মাথায় তো কিছুই সেঁধোয় না। তবে জেনে রাখিস এই দুনিয়াটা যার সে সব দিক নিয়ে ভেবে রেখেছে। তোর আমার ওপর দুনিয়াটা পুরো ছেড়ে দেয়নি। গায়ে গায়ে মানুষ দাঁড়িয়ে থাকবে, শোওয়া বসার জায়গা থাকবে না—তাই হয় নাকি রে হারামজাদা? তার অনেক আগেই মানুষে মানুষের মাংস খেতে শুরু করবে।

বহেরু বুঝল। ব্রজঠাকুরের কথা শুনলেই তার বুকের মধ্যে একটা বলভরসা এসে যায়।

ব্রজগোপাল তার হাতে কুড়িটা টাকা দিয়ে বললেন—একটু মিষ্টিটিষ্টি কিনে বাচ্চাগুলোকে খাওয়াস। আমার নাতি হয়েছে একটা, বড়মেয়ের ঘরে।

বামনবীরটাকে এনে ফেলেছে বহেরু। তার খুব ইচ্ছে ছিল লম্বা সাঁওতাল আর বেঁটে বামনকে জোড় মিলিয়ে বহেরু গাঁয়ে ছেড়ে দেবে। তারা যেখানে যাবে হাঁ করে দেখবে সবাই। কিন্তু সেটা হচ্ছে না।

সাঁওতালটা শয্যাশায়ী রয়েছে কমাস, এখনও মরেনি বটে কিন্তু গোবিন্দপুর আর বৈঁচী থেকে ডাক্তার এসে দেখে বলে গেছে যে, এ আর খাড়া হবে না। যে কদিন বাঁচে বিছানাতেই বাঁচবে। তাই বামনবীর লোকটা একা-একাই ঘোরে। তার ধারণা লোক হাসানোই তার একমাত্র কাজ। রঙচঙে জামা কাগজের টুপি পরে সে নানা কসরত করে তোক হাসায়। ব্রজগোপাল তাকে ভাল চোখে দেখেন না। তোক হাসানোর তাগিদে সে একবার ব্রজগোপালের কাছা টেনে আলগা করে দিয়ে দৌড়েছিল। বহেরু তাকে মারতে গেলে ব্রজগোপালই ঠেকিয়েছিলেন। কিন্তু লোকটাকে এড়িয়েই চলেন তিনি। নিজের শরীরের খুঁত বাজিয়ে ব্যাবসা করে যে লোক তাকে তাঁর পছন্দ নয়।

ব্রজগোপাল ঘরমুখো হতেই কোত্থেকে একটা শিশুর মতো বামনটা ছুটে এল। সামনে দাঁড়িয়ে একটা স্যালুট ঠুকল। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে একধরনের অদ্ভুত সরু মেয়েলি গলায় বলল—ব্রজকর্তা, আপনাকে একটা কথা বলব।

ব্রজগোপাল একটু অবাক হয়ে বলেন—কী?

ঘরে এসে লোকটা টিনের চেয়ারে হামা দিয়ে উঠে বসল। বলল—আমার বয়স কত বলুন তো!

ব্রজগোপাল অনেকক্ষণ চেয়ে থাকলেন। কোনও আন্দাজ করতে পারলেন না। বললেন—কত আর হবে। বেশি নয়।

॥ বাষট্টি ॥

বামনবীরের পেটটি নাদা। দু-হাতে ঢোলের মতো চাটি মেরে পেট বাজিয়ে খি-খি করে হেসে বলে—বেশি নয়? অ্যাঁ! বেশি নয়? বেঁটে বলে সবাই ভাবে মতিরামের বয়স বুঝি বারো তেরো। তা নয় গো!

বলে বামনবীর মতিরাম খুব হাসে।

ব্রজগোপাল কিছু বিরক্ত হন। মুখে কিছু বলেন না।

মতিরাম হাসতে হাসতে চোখের জল মুছে বলল—তা ব্রজকর্তা, তোমার বয়স কত শুনি!

একটু আগে আপনি আজ্ঞে করছিল, এখন স্রেফ তুমি বলছে। তাতে ব্রজগোপাল অসন্তুষ্ট হন না। সাধারণ মানুষেরা ওরকমই বেশিক্ষণ আপনি আজ্ঞে চালাতে পারে না, মানা মানুষ দেখলে কিছুক্ষণ প্রাণপণে আপনি আজ্ঞে করে, তারপরই তুমি বেরিয়ে পড়ে।

ব্রজগোপাল বলেন—তা পঁয়ষট্টি ছেষট্টি হবে।

মতিরাম হেসেটেসে চোখ কুঁচকে, ছোট দু-খানা হাতে ব্রজগোপালকে বক দেখিয়ে বলে—দুয়ো! হেরে গেলে।

ব্রজগোপাল অসহায় ভাবে চেয়ে থাকেন।

মতিরাম মাথা নেড়ে বলে—পাল্লে না তো!

ব্রজগোপাল শান্ত গলায় বলে কীসে পারলাম না?

—বয়সে। বলে মতিরাম আবার বিকট মুখভঙ্গি করে বলে—আমারও পঁয়ষট্টিই।

কথাটা ব্রজগোপাল বিশ্বাস করলেন না। কিন্তু কিছু বললেনও না।

মতিরাম চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে এক পা তুলে দু-খানা হাত নুলোর মতো পেটের দুদিকে ভাঁজ করে, দাঁত বের করে চোখ পিটপিট করল কিছুক্ষণ। তারপর হুপ করে মেঝেয় লাফিয়ে নেমে বিচিত্র কায়দায় হাতের ওপর ভর করে পা দুটো পিছন দিকে ঘুরিয়ে নিজের কাঁধের ওপর তুলে দিয়ে ব্যাঙের মতো লাফাল খানিক। মুখে অবিরল ব্যাঙ ডাকার শব্দ। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে হাতটাত ঝেড়ে বলল—দেখলে, মতিরামের বয়স হলে কী হয়। এখনও অনেক খেলা দেখাতে পারে।

—দেখলাম। ব্রজগোপাল উদাস উত্তর দেন।

মতিরাম আবার হামাগুড়ি দিয়ে চেয়ারে উঠে বসে ঠ্যাং দোলাতে দোলাতে খুব বিরক্তির সঙ্গে বলে তুমি হাসো না কেন বললা তো! সার্কাসে আমি বিশ বচ্ছর জোকার ছিলাম, কত লোককে হাসিয়েছি। এখনও গাঁয়েগঞ্জে সব জায়গায় আমাকে দেখলেই লোকে হাসে। আর যখন মজাটজা বা খেলাটেলা করি তখন তো কথাই নেই। হাসতে হাসতে গর্ভবতীর প্রসব হয়ে যায়, মানুষ পুত্রশোক ভুলে যায়, মরা মানুষ পর্যন্ত শ্মশানে যাওয়ার পথে ফ্যাক ফ্যাক করে হেসে ফেলে। তুমি হাসো না কেন বাবু? ব্যারাম-ট্যারাম নেই তো?

ব্রজগোপাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন—বাপু, তোমাকে দেখে আমার হাসি পায় না।

মতিরাম ভারী অবাক হয়ে বলে—পায় না? অ্যাঁ! পঁয়ষট্টি বছর বয়সে এইটুকুন একটা মানুষ, বামনবীর—বলে নিজের লম্বার মাপ হাত দিয়ে দেখিয়ে মতিরাম বলে—এ দেখেও হাসি পায় না।

ব্রজগোপাল মাথা নেড়ে বলেন—বেঁটে লম্বা কতরকম মানুষ আছে, মানুষের শরীরের খুঁত দেখে হাসি পাবে কেন? আমার পায় না।

—এই যে এত কেরানি দেখালাম তাও হাসি পেল না?

—না।

—তোমার বাপু ব্যারাম আছে।

ব্রজগোপাল সে কথার উত্তর না দিয়ে বলেন—লোক হাসানোর অত দরকার কি তোমার?

মতিরাম একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ অভিমানভরে বলে—সার্কাসে এক জন্ম এই তো করেছি। কাজ বাজ কেউ তো আর দেয়নি। তোক না হাসালে পেট চলে কেমন করে? সাকাসটা উঠে গেলে হাটে-বাজারে এইসব করে ভিক্ষেসিক্ষে জুটত।

—আর কিছু করোনি?

—করেছি। মতিরাম পা দোলাতে দোলাতে বলে—পদ্য-টদ্য লিখতে পারতাম, বুঝলে ব্রজকর্তা? উদ্বাস্তু আর নেতাজি নিয়ে পদ্য ছাপিয়ে ট্রেনে বিক্রি করতাম। লোকে আমাকে দেখে হাসত, পদ্য কিনত না। দুই বাড়িতে দুবার চাকরের কাজও করেছি। সে সব পোষায় না। তারপর পাণ্ডুয়ার বাজার থেকে বহেরু ধরে নিয়ে এল, খোরাকি দেবে আর হাত খরচা। তো ভাবলাম বুড়োবয়সে আর যাই কোথা! মরার আগে কিছু জিরেন নিয়ে হাঁফ ছাড়ি বাবা। সকাল থেকে আর পেটের চিন্তা করতে হবে না। এইটুকুন তো মোটে পেট, একমুঠো ভাত দিলে ভরে যায়। তা এইটুকুনের জোগাড় করতেও কত নাচনকোঁদন লাগে বাবা।

ব্রজগোপাল বললেন—তা থাকো, এইখানেই থেকে যাও।

মতিরাম অভ্যাসবশত ফের চোখ নাচায় মুখ বিকৃত করে। বলে—তা হলে আর ভাবনা কী ছিল? এ বেশ জায়গা, কাজকর্ম নেই, ঘোরোফেরো, লোক হাসাও, খাও দাও বগল বাজাও। বহেরু বিশ্বেস মানুষের চিড়িয়াখানা খুলেছে, নতুন রকমের গ্রামপত্তন করবে—এ সবাই জানে। কিন্তু ছেলেরা বড় হারামজাদা। যেখানে যাই কপিল শালা আর ওই কোকা খুনে হুড়ো দেয়। ওরাও তোমার মতো, হাসে না। কেবল বলে—যা যা, নিষ্কর্মা গতরখাস। বহেরু পটল তুললে এরা ঠেঙিয়ে তাড়াবে। পারলে এখনই তাড়ায়। কাক শালিক, শেয়াল কুকুরেও গেরস্তর ভাত খেয়ে যায় বাবা, তেমনি কাঙাল ফকির অভাগাও খায়। এদের সহ্য হয় না। বড্ড ছোট মানুষ। আমার চেয়েও। বলে হাসে মতিরাম।

ব্রজগোপাল উত্তর দেন না। ব্যাপারটা তিনি জানেন।

মতিরাম বলে—তাই তো ভাবি বসে বসে। আমার বয়স সত্যিই পঁয়ষট্টি। লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি আর তেমন পারি না। চোখেও ছানি পড়ছে। দেখবে? দেখো না!

বলে মতিরাম লাফ দিয়ে নেমে কাছে এসে আঙুল দিয়ে চোখের পাতা তুলে দেখায়। ব্রজগোপাল দেখেন, সত্যিই বাঁ চোখের মণির মাঝখানে সাদাটে ছানি। ডান চোখেও আসছে, তবে অতটা নয়।

মতিরাম ফের চেয়ারে গিয়ে উঠে বসে বলে—আন্দাজে আন্দাজে চলাফেরা করি, কেরানি দেখাই। কোনদিন হুট করে পড়েটড়ে গেলে বুড়ো বয়সে শয্যা নিতে হবে। মাগ-ছেলে নেই যে দেখবে।

বলে ফের দুঃখের কথাতেও খি-খি করে হাসে। বোধ হয় মাগ-ছেলের কথাতেই হাসিটা আসে।

ব্রজগোপাল কোনও প্রশ্ন করেন না। মতিরাম হাসতে হাসতে নিজে থেকেই বলে—বিয়ে করতে গিয়েছিলাম দুবার। সার্কাসে থাকতে পয়সাকড়ি পেতাম কিছু এক গরিব মেয়ের বাপকে রাজি করাই পয়সাকড়ি দিয়ে। কিন্তু বিয়ে করতে যেই গেছি গাঁয়ের ছেলেছোকরা একজোট হয়ে খুব ঠ্যাঙালে আমাকে। টাকাটাও গেল। আর একবার বছর দশ আগে সিমলাগড়ের একটা পশ্চিমা ঘুঁটেউলি বিয়ে বসল। তার আগের পক্ষের বড় বড় ছেলেপুলে ছিল। তো সেই মেয়েছেলেটা আমার পয়সা হাতাত, খেতেটেতে দিতে চাইত না। শেষপর তার ছেলেরা আর সে মিলে খুব মারধর করত আমাকে। মারের চোটে পালিয়ে বাঁচি। সে কী মার বাবা!

ফের খুব হাসতে থাকে মতিরাম।

ব্রজগোপাল আস্তে করে বলেন—কেউ নেই?

মতিরাম বলে—আমিই আছি আর কাকে দরকার বাবা! একাই চলতে পারি না তো আর কেউ! বুঝলে ব্রজকর্তা, দরজির কাজ খানিকটা জানি। জামা পায়জামা বানাতে পারি, লোক হাসাতে পারি। দেখো তো একটু। কেউ রাখলে থাকব।

বলে মতিরাম উঠে দাঁড়িয়ে একটা স্যালুট করে। তারপর লেফট রাইট করতে করতে বেরিয়ে যায়। পঁয়ষট্টি বছর বয়সে ছানিপড়া চোখ নিয়ে দিব্যি আছে।

কয়েকদিনের মধ্যেই ভারী ন্যাওটা হয়ে গেল মতিরাম। এমনিতে ভাঁড়ামি করে বেড়ায়। কিন্তু ফাঁক পেলেই ব্রজগোপালের কাছে এসে বসে থাকে। পিছনে পিছনে ঘুর ঘুর করে বেড়ায়। যেমন ষষ্ঠীপদ তেমনি মতিরাম দুজনেই সারাক্ষণ ব্রজগোপালের গন্ধ শুঁকে শুঁকে তাঁর শরীরের ছায়ায় ছায়ায় ঘোরে। ব্রজোগাপাল তাকিয়ে মাঝে মাঝে হাসেন। প্রায় সমান মাপের দুজন। একজনের বয়স পঁয়ষট্টি, অন্যজন নেহাত শিশু। দুজনে ঝগড়াও লেগে যায় মাঝে মাঝে।

ষষ্ঠীপদ বলে—আমার দাদুকে যন্তন্না করবে না বলে দিচ্ছি।

মতিরাম মুখ ভেঙিয়ে বলে—ইঃ দাদু। বাপের সম্পত্তি নাকি রে ব্যাটা!

বড় মায়া জন্মায়। বুকের মধ্যে প্রাণপাখি ডানা ঝাপটায়। কবে খাঁচা ছেড়ে যায়। তবু কেন যে অবোধ মায়া!

শরীরটা কিছুদিন যাবৎ ভাল নেই ব্রজগোপালের। বেলপুকুরে যজমানবাড়ি ঘুরে যাজন সেরে এসে বুকে ব্যথাটা টের পেলেন ফের। ফকিরসাহেব খবর পেয়ে এসে বিছানার ধারে বসে বলেন—ওষুধ কি দেব ব্রজঠাকুর? অনুমতি পেলে দিই।

ব্রজগোপাল হেসে বলেন—পরমপিতা খোদার নাম করুন।

ফকিরসাহেব দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন—শিব স্বয়ম্ভু।

এক রাতে শীলাকে স্বপ্ন দেখলেন। ঘুম বড় একটা হয় না। তবু ভোরবেলার তন্দ্রায় এক আলো-আঁধারিতে শীলা যেন সামনে এসে দাঁড়াল। কোলে একটা বাচ্চা। বাচ্চাটার মুখ হুবহু শীলার মতো। শীলা বলল, বাবা আমার ছেলের নাম রাখবে না?

ব্রজগোপাল কষ্টের সঙ্গে বললেন—আমি নাম রাখলে কি তোদের পছন্দ হবে? পুরনো দিনের মানুষ আমরা। রণোর বড় ছেলের নাম রেখেছিলাম, তা সে ওরা পালটে দিয়েছে।

শীলা বলল—না বাবা, এ ছেলের নাম তুমিই রাখো। তুমি তো ভগবানের লোক বাবা, তুমি নাম রাখলে ও বাঁচবে।

ব্রজগোপাল বললেন—তবে নাম রাখো ঋতম্ভর।

—মানে কী বাবা?

—সত্যপালক। বিষ্ণু।

এই দেখে ঘুমের চটকা ভাঙল, উঠে বসলেন। ভোরের স্বপ্ন। ভাবলেন, নামটা আজই লিখে পাঠাবেন শীলাকে। আবার ভাবলেন, নাতির মুখশ্রী একবার দেখে আসবেন গিয়ে। হয়তো শেষ কথা। শরীরটা এখনও পড়ে যায়নি। এইবেলা না দেখে এলে আর হয়তো দেখাই হবে না। ওরা তো আর আসবে না বুড়ো বাপের কাছে।

॥ তেষট্টি ॥

দিন দুই আগে সোমেন ডাকে একটা খাম পেয়েছিল। তাকে চিঠি বলা যায় না। খামের মুখ ছিঁড়তে একটা কেবলমাত্র রঙিন সিনেমার টিকিট বেরিয়ে এল। দু-দিন পরের তারিখ। সঙ্গে একটা চিরকুটও নেই যে বোঝা যাবে টিকিটটা কে পাঠিয়েছে।

পঁচিশ বছরে পা দিয়ে সোমেন আজকাল টের পায় তার জীবনে খুব একটা রহস্য বা চমকে ওঠার মতো কিছু নেই। এই তো সেদিন সে মোটে তার শৈশব পেরিয়ে এল। শীতের সকালে মা একটা ছোট্ট ছেঁড়া আলোয়ান গায়ে জড়িয়ে পিঠের দিকে গিঁট বেঁধে দিত, আর সোমেন একটা বড় টিনের কৌটো আর খুচরো পয়সা মুঠো করে নিয়ে মুদির দোকান থেকে মুড়ি আনতে যেত। ঢাকুরিয়ার রেল লাইনের ওপর ওভারব্রিজটা তখনও হয়নি। যোধপুরের দিকে ফাঁকা জমি পড়ে আছে। শীতের সকালে কুয়াশামাখা ঝিল-এর মলিন জল ছুঁয়ে কনকনে বাতাস আসত। সেই দূরটুকু কুয়াশায় হারিয়ে যাওয়া দিগন্তটা আর রেল ইঞ্জিনের কহুধ্বনি সবই গায়ে কাঁটা-দেওয়া রহস্য জাগিয়ে দিতে যেত। লেভেল ক্রসিংয়ের কাছে বাস থেমে আছে, গেট বন্ধ, আর ঠিন ঠিন করে দূরের দমকলের মতো ঘণ্টি বাজছে। সেই ঘণ্টির শব্দ কি একটা অজানা আনন্দের সংবাদ নিয়ে আসত মনের মধ্যে। মুদির দোকানে একটা কেমন মশলাপাতির ঝাঁঝাল গন্ধ উঠত। বুড়ো মুদিচরণ সাহা একটা রঙিন খদ্দরের চাদরে মাথা মুখ ঢেকে জিনিস ওজন করে দিত। চরণ সাহা কখনও ফাউ দিত না, বরং মাপা জিনিস থেকে এক চিমটে তুলে রাখত বরাবর। তার ওপর একটা রাগ ছিল সোমেনের। কিন্তু খুব বেশি দোকান তখনও ওদিকে ছিল না। রাস্তাঘাট অনেক ফাঁকা ছিল, এত বাড়িঘর হয়নি। স্টিম-ইঞ্জিন ঝিক ঝিক করে কাঠের গাড়ি টেনে নিয়ে গেছে লাইন দিয়ে। সন্ধেবেলা কতদিন রেলগাড়ির শব্দ দূরে মিলিয়ে যেতে মন উদাস হয়ে গেছে সোমেনের। তখন মনে হত পৃথিবী কি ভীষণ গভীর গহীন। এর মধ্যে না জানি কত অজানা অচেনা রহস্য লুকিয়ে আছে। শীতে কত পাখি আসত, বর্ষার ব্যাঙ ডাকত। এখন আর সে-সব দেখে না, শোনে না সোমেন। আজকের যারা শিশু তারা হয়তো এই আবরণহীন, যান্ত্রিক পৃথিবীর কিছু রহস্য টের পায় এখনও। সোমেন পায় না।

টিকিটটা অনেকবার হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করল সোমেন। কোনও হদিশ করতে পারল না। কিন্তু রহস্যটা বেশ ভাল লাগছিল তার কাছে। যে-ই পাঠাক সে অন্তত দু-দিন সোমেনকে মনে মনে উদ্‌গ্রীব রাখছে।

আজ সকালে উঠেই টিকিটটা বের করে দেখল সোমেন। আজই ম্যাটিনি শোয়ের টিকিট মেট্রোয়। টিকিটের ওপর মেট্রো কথাটা দেখে ফের শিশুবেলার কথা মনে পড়ে সোমেনের। মেট্রো হল-এর নাম তখন মা-মাসির মুখেও শোনা যেত। সে নাকি এক আশ্চর্য মায়াপুরী। মেট্রো হল-এর চূড়ায় যে খাঁজকাটা প্যাটার্ন আছে তারই অনুকরণে তখনও মেট্রো প্যাটার্নের নেকলেস বা গলার হার গড়াত বাঙালি মেয়েরা। আজ মেট্রোর সেই

কারুকাজ কেউ চোখ তুলেও দেখে না। ওই হল-এর সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো অনেক হল হয়েছে কলকাতায়। তবু তখনও সোমেনের কাছে ওই নামটার একটা চমক আছে।

আজকাল সোমেনের বড় পুরনো কথা মনে পড়ে। একদিন অনিল রায় তাকে বলেছিলেন—দেখো সোমেন, যখনই দেখবে তোমার খুব বেশি পুরনো কথা মনে পড়ছে তখনই বুঝবে যে তুমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছ। নস্টালজিয়া বলো, শৈশবের স্মৃতি বলো—ওর খুব বেশি ভাল নয়। ও মানুষকে শেখায় বর্তমানকে উপেক্ষা করতে, ভবিষ্যতের প্রচেষ্টা থেকে নিশ্চেষ্ট রাখতে। বাঙালি মাত্রই বড় বেশি নস্টালজিয়ায় ভোগে। আসলে যারা নিজেরা চারপাশকে উপভোগ করতে পারে না, যারা নিজেদের জীবনকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে বিস্তৃত করতে পারে না, যারা ঘরকুনো তারাই দেখো, বর্তমানকে উপেক্ষা করে অতীত নিয়ে থাকে।

সোমেনের আজকাল তাই মাঝে মাঝে মনে হয়, পঁচিশেই বুঝি বা তার যৌবন ফুরল। আর কিছু হওয়ার নেই। কিছু করার নেই। দাদার এই দুঃসময়ে সে সংসারের কোনও কাজে আসে না। একটা পয়সাও দিতে পারে না সংসার খরচ। তাই সোমেন দুবেলা বড় লজ্জার ভাত খায়। রাতে গোপনে কখনও বা চোখের জল ফেলে।

সকাল থেকেই টিকিটটা ঘিরে তার একটা পিপাসা জেগেছিল। মনে হচ্ছিল গিয়ে যদি দেখে চেনা কেউ নয়, একজন অচেনা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রতীক্ষায়! কিংবা যদি এমন হয় যে, এই টিকিটের সূত্রেই তার জীবনের মস্ত পরিবর্তন আসছে?

ভাবতে গিয়ে আপন মনেই হেসে ফেলল সোমেন। তাই কি হয়? চেনা মানুষই পাঠিয়েছে টিকিট। একটু শুধু রহস্য জড়িয়ে দিয়েছে টিকিটের গায়ে। তাই শৈশবের সব হারিয়ে যাওয়া রহস্যের গন্ধ আজ মেট্রোর তুচ্ছ টিকিটটার গা থেকে শুঁকে নিচ্ছিল সোমেন।

ননীবালা এসে বললেন—পাগল ছেলে, একা-একা হাসছিস কেন?

সোমেন গম্ভীর হয়ে বলল—ও কিছু না।

ননীবালা বললেন—একবার শীলার বাড়ি যা। ছেলে হওয়ার পর থেকেই মেয়ের বড় খিদে হয়েছে। ঝি-ছুঁড়িটা কী ছাইমাটি রেঁধে দেয়, ও দিয়ে কি আর পোষ্টাই হয়! এখন হুড় হুড় করে বুকের দুধ নামাতে হলে বাটি বাটি দুধ-সাগু খাওয়াতে হয়, ফলি মাছের ঝোল, লাউ। তা সে-সব আর কে করছে! কয়েকটা গোকুল পিঠে করে রেখেছি, বউমা কৈ-মাছ করছে, টিফিন ক্যারিয়ারে করে দিয়ে আয় গে।

সোমেন মুখটা বিকৃত করে বলে—দিদির শাশুড়ি আর কে যেন এসে ওখানে আছে শুনলাম। তারা থাকতে দিদির জন্য আমাদের ভাববার কী?

ননীবালা একটা তাচ্ছিল্যের 'হুঃ' দিয়ে বললেন—সে যেই হোক, পেটে তো আর আমার মতো ধরেনি মেয়েটাকে। তারা সব অতিথির মতো এসে আছে। আলগোছে কদিন থেকে চলে যাবে।

সোমেন বিরক্ত হয়ে বলে—তুমি খাবার পাঠালে তারা বিরক্ত হতে পারে। প্রায়ই তো পাঠাচ্ছ শুনি।

ননীবালা অবাক হয়ে বলেন—ও মা! বিরক্ত হবে কেন? বরং না পাঠালে খোঁজ না নিলে উলটে বলত। এমনিতেই নার্সিং হোমে রাখা হয়নি, হাসপাতালে দেওয়া হয়েছে বলে জামাই সুদ্ধু সকলেরই গাল ফুলে আছে। বিপদের সময় সব কোথায় হাওয়া হয়েছিল, তাই ভাবি। কাজ উদ্ধার হয়ে যাওয়ার পর খুঁত ধরতে সবাই পারে।

সোমেন বেশি কথা বলতে চান না। টিকিটের রহস্যচিন্তা ছিঁড়ে যেতে চায়। বলল—উঃ বড্ড বেশি কথা বলো তুমি। খাবার দিয়ে আসতে হবে, দিয়ে আসব। অত কথায় কাজ কি?

ননীবালা আজকাল এই ছেলেটাকে বড় ভয় পান। রণোর মতো শান্ত নয়, বড্ড রাগী। অবশ্য চাকরি-বাকরি পায় না বলেই বোধ হয় মেজাজটা খিঁচড়ে থাকে। বয়সকালে স্থিতু হতে না পারলে পুরুষমানুষের ওরকম হয়ই, মেয়েদের হয় বয়সকালে বিয়ে না হলে। শীলার কিছু দেরিতে বিয়ে হয়েছিল, শেষ দিকটায় বড্ড মুখ করত।

ননীবালা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—তোমরা বাবা সব ভি আই পি, কথা বলতে গেলেই ভয় পাই।

সোমেন মার মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলে। বলে—ওঃ বাবা, আজকাল যে ইংরেজি বলছ! ভি আই পি-টা কোত্থেকে শিখলে?

ননীবালা উদায় হলায় বলেন—শুনে শুনেই শেখা।

সোমেন বহুকাল পর হঠাৎ উঠে ননীবালাকে দু-হাতে জড়িয়ে মাটি থেকে তুলে নিয়ে শূন্যে একটা পাক খাওয়াল। ননীবালা 'ছেড়ে দে, ছেড়ে দে' বলে চেঁচালেন, হাসলেনও। সোমেন বলল—খুব আপ-টু-ডেট হয়ে যাচ্ছে, বুড়ি, অ্যাঁ?

যখন শীলার বাড়ি যাবে বলে বেরোতে যাচ্ছে সোমেন তখন বীণা টিফিন ক্যারিয়ার দিতে এসে বলল—হই-হুজ্জুতে মনে পড়েনি সোমেন, সেই যে টাকাটা চেয়ে রেখেছিলে সেটা নাওনি এখনও। লাগবে নাকি?

বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে পড়ে সোমেনের। অণিমার সেই শাড়ির দাম।

বলল—লাগবে বউদি। দেবে? নইলে প্রেস্টিজ থাকবে না।

—দেব না কেন? বহুদিন ধরেই খামে ভরে রেখে দিয়েছি। এক মিনিট দাঁড়াও এনে দিই।

—তোমার কষ্ট হবে না তো বউদি?

বীণা একরকম অদ্ভুত ঠাট্টা আর বিষণ্ণতা মাখানো হাসি হেসে বলল—প্রেস্টিজটা তো এখন রাখি। আর কষ্ট? সে তো আছেই। দেড়শো টাকায় তার কিছু সুরাহা হবে না।

ননীবালা কথাবার্তা শুনে এগিয়ে এসেছিলেন—কী কথাবার্তা হচ্ছে রে সোমেন? ও বউমা, টাকার কথা কী বলছ?

—ও কিছু নয়। বীণা বলল। এক ঝটকায় কোত্থেকে একটা পুরনো চিঠির খামে ভরা দশটাকার নোটের গোছা এনে সোমেনের প্যান্টের পকেটে গুঁজে দিল।

অণিমা এখনও কলকাতায় আছে কিনা সোমেন জানে না। কয়েকদিন গাব্বুকে পড়াতে যায়নি।

অজিত কদিন ছুটি নিয়ে আজকাল বাড়িতেই থাকে। একটা ইজিচেয়ার টেনে শীলার বিছানার পাশেই বসে থাকে। আঁতুর টাঁতুর বড় একটা মানে না। নিজের মা আর এক বুড়ি বিধবা খুড়িমা এসে আছে কদিনের জন্য, তাদের সামনেই লজ্জাহীনের মতো বসে থাকে বউয়ের কাছে।

আজও ছিল। জানালার ধারে একটা চেয়ারে লক্ষ্মণ বসে আছে।

শীলার বাচ্চাটা দিব্যি মোটাসোটা হয়েছে, ফরসা রং, নাকমুখ এখনও ফোলা-ফোলা, তাই আদল বোঝা যায় না। বাচ্চাটা কাঁদে না, কেবল ঘুমোয়। আর পাঁচ সাত মিনিট অন্তর অন্তর কাঁথা ভেজায়।

শীলা কিছু কষ্টে নেই। হাসপাতাল থেকে ডাক্তাররা এত তাড়াতাড়ি ছাড়তে চায়নি। কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই অজিত প্রায় জোর করে নিয়ে এসেছে। বত্রিশ টাকা ভিজিটের গায়নোকোলজিস্ট প্রতিদিন এসে দেখে যাচ্ছে, হামেহাল পাশ করা নার্স বহাল আছে। ফ্রিজ ভরতি ফলটল কিনে রেখেছে অজিত, রাশি রাশি ওষুধ, ভিটামিন, কৌটোভরতি গুঁড়ো প্রোটিন আর পুষ্টিকর সব ফুড আসছে রোজ। প্রতিদিন বিকেলের দিকে কিছু ঘরে-করা খাবার নিয়ে ননীবালা, বীণা বা রণেন দেখতে আসে।

সোমেন এসব লক্ষ করে ননীবালার কথা ভেবে মনে মনে রাগ করে। বড়দি কিছুমাত্র অযত্নে তো নেই-ই, উপরন্তু খুব বেশি যত্নে আছে, তবু ননীবালা খুঁত বের করবেনই।

সোমেন ঘরে ঢুকতেই শীলা তাকিয়ে হাসল—আয়।

সোমেন বলল—তোর জন্য মা খাবার পাঠিয়েছে, রান্নাঘরে দিয়ে এসেছি।

—কত খাব রে? শীলা হেসে লক্ষ্মণের দিকে চেয়ে বলল—একে চেনেন? আমার ভাই।

—চিনি, ছোট দেখে গেছি। সেদিনও আবার পরিচয় হল। বড় হয়ে গেছে। লক্ষ্মণ বলে।

লক্ষ্মণদার গলার স্বরটা অদ্ভুত সুন্দর লাগে সোমেনের। এত ভদ্র, আন্তরিক আর ভরাট গলা যে, শুনলেই মানুষটার দিকে আকর্ষণ জন্মায়। চেহারাটা খুব লম্বা চওড়া, কিন্তু কোথাও কোনও কর্কশতা নেই। মুখে সরল একটা হাসি। সেদিনও দেখেছে সোমেন, শীলার খবর পাওয়া মাত্র কেমন চটপট সব খবরাখবর নিল, ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলল, চেহারা এবং কথাবার্তায় সকলের সম্ভ্রম এবং মনোযোগ আকর্ষণ করার নিহিত একটা গুণ আছে লক্ষ্মণদার। শরীরে একবিন্দু আলস্য নেই, বরং খুব কেজো লোকের লঘু গতি আছে।

লক্ষ্মণ তাকে কাছে ডেকে বসাল। বলল—কী করছ?

সোমেন তার উত্তরে বলে—আমাকে আমেরিকা থেকে একটা জব ভাউচার পাঠাবেন লক্ষ্মণদা?

শুনে লক্ষ্মণ চমৎকার করে হেসে বলে—পালাতে চাও? বলে দুহাতে মুখটা একটু ঘষে নিয়ে বলে—সবাই পালাতে চাইছে কেন বলো তো!

—এখানে থেকে কী করব? কিছু হচ্ছে না।

লক্ষ্মণ ফের হাসে। বলে—ওখানে গিয়েই বা কী হবে? কদিন একটু ভাল খাওয়াপরা জুটবে। গুড লিভিং। তারপর দেশে ফিরে এলে বড্ড মুশকিল হয়। বড়লোকের দেশ থেকে এসে নিজের গরিব দেশকে আর ভাল লাগতে চায় না। সেটা ভাল নয়। ও এক ধরনের ব্যাঙ্করাপসি। তারচেয়ে নিজের দেশটাকে বড় করার চেষ্টাই ভাল।

সোমেন কথাটার উত্তর দেয় না।

লক্ষ্মণ তার কাঁধে হাত রেখে বলে—আমিও চলে আসছি।

—কবে?

—এবার গিয়েই চলে আসব।

সোমেন কিছু উৎসুক হয়ে বলল—অত বড় চাকরি ছেড়ে আসবেন?

লক্ষ্মণ মাথা নেড়ে বলে—আসব। আসতেই হবে।

—বউদিকে নিয়ে আসবেন?

লক্ষ্মণ একটু থমকাল। ফের সেই অপকট হাসি হেসে বলল—না। সে আসবে না। ও ঠিক আমাকে বোঝে না, আমি ওকে বুঝি না। আমাদের বিয়েটা ভেঙে গেছে সোমেন।

॥ চৌষট্টি ॥

সোমেন যাবে বলে উঠে দাঁড়িয়েছিল, অজিত মুখ তুলে বলল—শালাবাবু, ভাগ্নেটিকে কেমন দেখছ? তোমার মতো সুন্দর হবে?

সোমেন লজ্জা পেয়ে বলে—আমি আবার সুন্দর নাকি? ও আরও বেশি সুন্দর হবে।

অজিত খুব একটা তৃপ্তির হাসি হেসে বলল—তা হলে বলছ বয়সকালে আমার ছেলের পিছনে বিস্তর মেয়ে লাইন দেবে?

শীলা ভ্রূ কুঁচকে বলে—অত আদেখলাপনা কোরো না তো! লোকে হাসবে।

অজিত উঠে নতুন কেনা একটা দামি নাইলনের মশারি খাটের স্ট্যান্ডে টাঙাতে শুরু করলে শীলা বলল—বাব্বাঃ, পারোও তুমি। এখন মশারি টাঙালে দমবন্ধ লাগবে না?

—লাগুক। এখানে দিনের বেলাতেই মশা বেশি লাগে। আজ বেরিয়ে ওর জন্য একা ক্ষুদে ফোল্ডিং মশারি কিনে আনবে।

শীলা বাহ্যত রাগ কিন্তু অন্তর্লীন প্রশ্রয়ের গলায় বলে—আর কি কি কিনবে লিস্ট করে নিয়ে যেয়ো। ছেলে যেন আর কারও হয় না।

লক্ষ্মণ উঠে বলল—চলো সোমেন, আমিও যাই।

—তুই যাবি? বোস না! অজিত বলে।

—না রে, কাজ আছে। মোটে তো মাসখানেক সময়, কত লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ বাকি আছে, বউঠান, আজ বিদায় হই। সময় পেলে কাল আসব।

—আসবেন। শীলা পাশ ফিরে বলে—আপনার বিরহে আপনার বন্ধু এতকাল শুকিয়ে যাচ্ছিল।

লক্ষ্মণ ম্লান একটু হেসে বলে—আমরা খুব বন্ধু বউঠান। জীবনে একজন দুজনের বেশি বন্ধু কারওই বড় একটা জোটে না। আমরা সেই রকম বন্ধু। তবে দুঃখ করবেন না, এখন তো অজিতের ছেলে হল, এবার আর বন্ধুর জন্য তেমন উতলা হবে না। মানুষ যার মধ্যে নিজেকে পায় তাকেই আঁকড়ে ধরে। এককালে অজিত আমার মধ্যে নিজেকে পেত, এবার ছেলের মধ্যে আরও বেশি সেটা পাবে। সন্তান মানে তো নিজেরই পুনর্জন্ম।

শীলা হেসে বলে—বাবাঃ, আপনার কথা ভীষণ শক্ত। বুঝতে পারি না।

লক্ষ্মণ বলে—অজিত বোঝে, না রে অজিত?

অজিত খাটের চারধারে ঘুরে ঘুরে খুব যত্নের সঙ্গে মশারি গুঁজছিল। মুখ না তুলেই বলল—সোমেন না থাকলে তোকে এমন একটা গাল দিতাম না।

লক্ষ্মণ সভয়ে বলে—ওর মুখটা বড় খারাপ বউঠান, সামলে রাখবেন।

অজিত মশারির আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বলে—তুমি শালা খুব সবজান্তা হয়েছ। ছেলে কি বন্ধুর জায়গা নিতে পারে? ছেলে একরকম, বন্ধু অন্যরকম। কাল আসিস কিন্তু।

—দেখি।

বলে লক্ষ্মণ বেরিয়ে আসে, সঙ্গে সোমেন।

যে মানুষ বিদেশে থাকে তারদিকে বরাবরই আকর্ষণ সোমেনের। লক্ষ্মণের গায়ে সেই অদ্ভুত সুদূরের গন্ধ, যে রহস্যময় দূর বরাবর মানুষের রক্তে জীবাণুর মতো নিহিত থাকে। দূরত্বই রহস্য, দূরত্বই আকর্ষণ। যে মানুষ পৃথিবীর সব দূরত্ব অতিক্রম করেছে সেও আকাশের দিকে তাকালে বুঝি ফের দূরত্বের রহস্য টের পায়। আমেরিকা, ইয়োরোপ, এই শব্দগুলো শুনলেই সোমেনের বুকে অদৃশ্য ঢেউয়ের ধাক্কা এসে লাগে, তীরভূমি ভেসে যায়।

লক্ষ্মণ একটা ট্যাক্সি নিল। বলল—চলো, তোমাকে একটা লিফট দিই। কোথায় যাবে?

—আমি যাব বালিগঞ্জ সারকুলার রোড। আপনি আমাকে কালীঘাটে নামিয়ে দেবেন। ওখান থেকে চলে যাব। ট্যাক্সিতে উঠে বসে সোমেন খুব লজ্জার সঙ্গে বলল—আমরা ভেবেছিলাম আপনি আর ফিরবেন না লক্ষ্মণদা, ওখানেই থেকে যাবেন।

লক্ষ্মণ অবাক হয়ে বলে—কেন? ফিরব না কেন?

সোমেন বলে—শুনলাম ওখানে বিয়ে করেছেন, বাড়ি করেছেন। আপনার এখানকার জমিটাও তো বিক্রি করে দিলেন।

লক্ষ্মণ মাথা নেড়ে বলল—না। ফিরতাম। আমি খুব বেশিমাত্রায় ভারতীয়। কখনও পুরোপুরি বিদেশি হতে পারলাম না। অবশ্য হতে পারলেই সুখী হওয়া যেত। প্রথম গিয়ে আমি তো ঠিকই করেছিলাম হয় কানাডা কিংবা স্টেটসে সেটল করব। হুইমসিক্যালি বিয়েও করে ফেললাম। কিন্তু তারপরই কতকগুলো ভুল ধরা পড়তে লাগল। প্রগ্রেসিভ দেশগুলোতে মেয়েরা বড্ড বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে। বলে লক্ষ্মণ হঠাৎ পাশে মুখ ঘুরিয়ে সোমেনের দিকে চেয়ে বলে—আচ্ছা সোমেন, বলো তো স্বাধীনতার সন্ধিবিচ্ছেদ কী হবে!

সোমেন হেসে ফেলে, বলে—স্ব প্লাস অধীন।

—হল না। লক্ষ্মণ মাথা নাড়ে—নিজের অধীন হওয়া মানে যথেচ্ছাচারের অধীন হওয়া। স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ হল স-এর অধীন। স্বাধীনতা তাই শুভ বা মঙ্গলের অধীনতা। সে যাকগে। যেখানে মেয়েরা স্বাধীন, তারা সমাজে পুরুষের সমান সব অধিকার ভোগ করে, পুরুষের সঙ্গী হয়, বন্ধু হয়, পার্টনার হয়। তাদের ভাবপ্রবণতা খুব কম। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মান-অভিমান জিনিসটা প্রায়ই দেখা যায় না। ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি মায়ের সঙ্গে ঝগড়া হলে বাবা কিংবা কাকিমার সঙ্গে ঝগড়া করে কাকা ভাতের ওপর রাগ করেছে, খায়নি। আর মা কাকিমা কত সাধ্যসাধনা করে খাইয়েছে, ওদেশে এটা ভাবাই যায় না। অভিমান করে থাকলে লোকে অবাক হয়, রাগ ভাঙানোর সময় কারও নেই। বিয়ে করলেই বউ আপন হয়ে গেল, এই আমরা জানি। আমার তা হয়নি। সোমেন, তুমি তো যোলো বছর বয়স পার হয়ে এসেছ, তোমাকে বলতে আপত্তি কী যে ও দেশে সবাই বড্ড বেশি অ্যাডাল্ট। আদর ভালবাসার ক্ষেত্রেও কেউ খুব ছেলেমানুষ বা ইললজিক্যাল হয়ে যায় না। আমার স্ত্রী চাকরি করত, ক্লাবে যেত, তার আলাদা পুরুষ আর মেয়ে বন্ধু ছিল, আলাদা একটা জীবনও ছিল যেখানে আমি ঢুকতে পারতাম না। অর্থাৎ স্বামীর অধিকারও সীমাবদ্ধ ছিল। হয়তো এরকমই হওয়া

উচিত স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। কিন্তু আমি তো ওদের মতো করে ছোট থেকে বড় হইনি, তাই আমার পদে পদে নিজের ভুল চোখে পড়ত। আমার দাবি-দাওয়া ছিল বেশি। আর একটা কথা, আমাদের দেশে যেমন সাধারণত বিয়ের পরই ছেলেমেয়েদের প্রথম সেক্সের অভিজ্ঞতা হয় ওখানে তো তা নয়। অল্পবিস্তর যৌন অভিজ্ঞতা ওখানে প্রায় সকলেরই বয়ঃসন্ধিতে ঘটে যায়। অন্তত যৌনতার কারণে বিয়ে সেখানে আবশ্যিক নয়। বিয়ে হচ্ছে কমপ্যানিয়নশিপ, সঙ্গ, বন্ধুত্ব—যা বলো। সবই আবার পারস্পরিক সম্মান ও অধিকার বজায় রেখে। সে ভারী জ্বালা হয়েছিল আমার। তাকে ভালও বাসতাম খুব, সেও বাসত, কিন্তু পরস্পরের গভীরে যাওয়ার কোথায় যেন বাধা হচ্ছিল। উই হ্যাড রিলেশন, বাট উই ওয়্যার নট রিলেটিভস। তুমি ঠিক বুঝবে না। সোজা কথা, আমার ভিতরকার একটা ভারতীয় মনোভাবই সব ভণ্ডুল করছিল। আর সেই মনোভাবটাই আমাকে ওখানে পাকাপাকিভাবে থাকতে দেয় না। কেবলই বলে—মন, চলো নিজ নিকেতনে।।

রাস্তাটুকু ফুরিয়ে গেল চট করে। লক্ষ্মণ গলিতে ঢুকবে, তার আগে সোমেনকে বড় রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে বলল—অনেক কথা বলে ফেললাম, এসব মনে রেখো না।

সোমেন হেসে বলল—সেই যাই বলুন, আমার কিন্তু আপনার মতো হবে না। আমি আমেরিকায় গেলে ঠিক ওদের মতো হয়ে যাব।

—বটে! বলে লক্ষ্মণ হাসে খুব।

সোমেন বলে—আমাকে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করুন, জব ভাউচার দিন, দেখবেন আমি কীরকম ওই লাইফ অ্যাডপ্ট করে নিই।

—তা হলে তো তোমাকে কিছুতেই যেতে দেওয়া যায় না। লক্ষ্মণ ট্যাক্সির দরজাটা বন্ধ করবার আগে বলল—খুব যদি যেতে ইচ্ছে করে তা হলে একটু সিরিয়াসলি ভেবে আমাকে বোলো, চেষ্টা করব।

এই বলে লক্ষ্মণ দরজা বন্ধ করে দিল। ট্যাক্সি মোড় নিল। সোমেন রাস্তাটা পার হতে হতে বুকের মধ্যে বহুদূর ছুঁয়ে আসা সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে টের পেল। তার চেতনার বেলাভূমি ভেসে যাচ্ছে। যাওয়া হবে কি? বড় বেশি অল্পের মধ্যে আটকে আছে সোমেন। জীবনটা বড় ছোটের মধ্যে ছবির ফ্রেমে আটকানো। ফ্রেমটা ভাঙা দরকার। লক্ষ্মণদার মনে থাকবে তো?

আজকাল বর্ষার মেঘ কেটে গেলেই কেমন আচমকা চারধারে একটা শরৎকালের আভা এসে পড়ে। চারদিকে একটা পুজোর আয়োজন। এসময়ে গ্রাম গঞ্জে নদীর ধারে কাশফুল আসছে, শিউলি ফুটি-ফুটি করছে। কলকাতাতেও বাতাস বৃষ্টির পর পরিষ্কার। আকাশের ময়লা ধুয়ে গভীর নীল দেখা যায়। মনটা হঠাৎ ভাল হয়ে যায়।

বাস থেকে নেমে বালিগঞ্জ সারকুলার রোডের দিকে হাঁটতে হাঁটতে সোমেন সিগারেট ধরাল। আর তক্ষুনি মনে পড়ল, মা বলেছিল খাবার দিয়ে বড়দির বাসা থেকে টিফিন ক্যারিয়ারটা ফেরত আনতে। বাসায় একটা বৈ দুটো টিফিন ক্যারিয়ার নেই। কাল ফের খাবার দেওয়ার দরকার হলে কে তখন টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে যেতে আসবে? মা খুব রাগ করবে হয়তো।

কিন্তু এই চব্বিশ পূর্ণ পঁচিশে-পা জীবনে বেশিক্ষণ টিফিন ক্যারিয়ারের চিন্তা মাথায় থাকতে চায় না। কত আনন্দে শিউরে ওঠার মতো আচমকা চিন্তা মাথা ভাসিয়ে দিয়ে যায়। অনিল রায়ের বাড়িতে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক পত্রিকায় দেখা হাজার হাজার সুন্দর দৃশ্যের ছবি চোখের সামনে বৃষ্টিপাতের মতো ঝরে পড়ছে!

চারদিকে শরৎকালের মতো আলো। একটা রহস্যময় সিনেমার টিকিট। সব মিলিয়ে বড় অদ্ভুত আজকের দিনটা। এক-একটা দিন আসে এরকম। খুব ভাল দিন।

মেট্রোতে আজ কার সঙ্গে দেখা হবে?

অন্যমনস্ক সোমেন পিছনে একটা মোটরের হর্ন শুনে ফুটপাতে উঠে এল। গাড়িটাও তার পাশাপাশি ধীরে ধীরে হাঁটছে। সোমেন ভেবেছিল, গাড়িটা থামবে বুঝি। থামল না, চলছিল।

সোমেন সম্বিত পেয়ে তাকিয়ে দেখল, গাড়ির জানালায় অণিমা তারদিকে তাকিয়ে খুব হাসছে।

—কার কথা ভাবছ সোমেন? উঠে এসো।

গাড়িতে একা অণিমাই, সামনে শুধু ড্রাইভার।

—ওঃ, তোমাদের বাড়িতেই যাচ্ছিলাম। বলে সোমেন উঠে বসল অণিমার পাশে।

রাজ্যের মার্কেটিং করেছে অণিমা, স্তূপাকার সব জিনিস পড়ে আছে সিটে, সিটের পিছনে পিছনের উঁচু থাকটায়, সামনের সিটেও।

—বাব্বাঃ, কতক্ষণ ধরে হর্ন দিচ্ছি, শুনতেই পাচ্ছিলে না? কার কথা ভাবছিলে সোমেন?

—তোমার কথা।

—বাজে বোকো না, কোনওদিন ভাবোনি।

—সত্যি বলছি। তোমাকে ছুঁয়ে—

বলেই চমকে গেল সোমেন।

অণিমা অমনি তার একখানা অপরূপ রঙিন, সুন্দর ডৌলের হাত বাড়িয়ে বলল—ছোঁও। ছুঁলে কিছু হয় না। জাত যায় না।

—দূর! আমি ওসব ভাবিনি। আমার মনে হল, তোমাকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে লাভ কী? তুমি আমার কে?

অণিমা মুখ টিপে হেসে বলে—এ জন্মে তুমি আমার কেহ নও অমরনাথ, কিন্তু যদি পরজন্ম থাকে—

সোমেন মুখ তুলে অণিমার চোখে চোখ রেখে বলল—কিন্তু যদি পরজন্ম না থাকে অণিমা? এ জন্মেই যদি শোধবোধ হয়ে যায়?

—বোলো না সোমেন, বোলো না।

সোমেন ভ্রূ কুঁচকে বলে—বলা হল না অণিমা। এখনও চাঁদটাঁদ ওঠে, ফুলটুল ফোটে, লোডশেডিংও হয় মাঝে মাঝে...

অণিমা হাসল।

সোমেন হঠাৎ বলল—আমি আমেরিকা চলে যাচ্ছি অণিমা।

—ওমা! কেন?

—দুঃখে, এদেশে কেউ পাত্তাই দিল না। নিজের ভ্যালুয়েশনটাই বুঝতে পারলাম না।

অণিমা চোখ বড় বড় করে বলে—কেউ দেয়নি?

সোমেন হেসে ফেলে, বলে—তুমি একটু দিয়েছিলে, তারপর সুট করে কেটে পড়েছ, সেটাই তো দুঃখ।

—ইয়ারকি হচ্ছে?

সোমেন প্যান্টের পকেট থেকে খামটা বের করে হাতে রেখে বলে—অণিমা, বাড়িতে কদিন ধরে একটা ক্রাইসিস চলছিল বলে আসতে পারিনি, ভেবেছিলাম, তুমি বুঝি চলে গেছ।

অণিমা পা নাচিয়ে পা-তোড়ার একটা ঝুমুর ঝুমুর শব্দ তুলে বলল—বিয়ের প্রথম বছরে শ্বশুরবাড়িতে শ্রাবণের জল মাড়াতে নেই। তাই শ্রাবণ মাসটা কাটিয়ে যাচ্ছি।

সোমেন অবাক হয়ে বলে—এটা কি শ্রাবণ মাস অণিমা, আশ্বিন নয়?

অণিমা সেই ইউনিভার্সিটির সময়কার মতো হেসে বলে—তুমি আমেরিকা যাওয়ার আগেই আমেরিকান হয়ে গেছ। বাংলা মাস জানো না। আজ পয়লা ভাদ্র, আমি কাল চলে যাচ্ছি।

সোমেন বলল—খুব লাকি অণিমা। তুমি চলে গেলে একটা ঋণ শোধ হতে আবার দেরি হত।

—কীসের ঋণ?

—সে তুমি বুঝবে না। বলে খামটা অণিমার কোলে ফেলে দিয়ে বলল—এটা আমার আড়ালে খুলো, আর আমাকে এখানে নামিয়ে দাও।

অণিমা খামটা খুলল না, কেবল হাতে ছুঁয়ে একটু গম্ভীর হয়ে বলল—আমি জানি সোমেন এতে কী আছে।

সোমেন একটু লাল হল। এখন তার হঠাৎ খুব লজ্জা করছিল। বলল—গাড়িটা থামাতে বলো।

—ঋণটা না হয় থাকত সোমেন, সব ঋণ শোধ করে ফেললে আমেরিকা গিয়ে তুমি সব ভুলে যাবে।

—ভুলব না অণিমা। সোমেনের গলাটা ধরে বসে গেল। কতকটা ফিসফিসানির মতো করে বলল—টাকা পয়সার প্রসঙ্গটা বড্ড বাজে, তবু বলি, ওই ঋণটা আমাকে বড় জ্বালাতন করত। কিছু মনে কোরো না।

অণিমা একটা গভীর শ্বাস ফেলে বলল—তুমি ভীষণ বাজে হয়ে গেছ। এমন জানলে কক্ষনো ভাবই করতাম না তোমার সঙ্গে।

বলে অণিমা চোখে চোখ রেখে ম্লান হাসল। সোমেনের হাসতে খুব কষ্ট হচ্ছিল, তবু হাসল। বলল—থ্যাঙ্ক ইউ।

—কেন?

—খুব বেশি প্রশ্ন করোনি বলে। ঋণ শোধ করতে দিয়েছ বলে। আর, সারাজীবন ধরে ভাববার জন্য আমাকে একটা অদ্ভুত আচমকা জিনিস দিয়েছিল বলে!

অণিমার বাড়ির দরজার কাছে নেমে চলে এল সোমেন। মনটা বড় খারাপ লাগছে।

॥ পঁয়ষট্টি ॥

অনেকদিন এমন এক সুন্দর দিন আসেনি। বাদল-মেঘ ছিঁড়ে মাঝে মাঝে শরৎকালের মতো আকাশ দেখা যাচ্ছে। শরৎকালই তো! ভাদ্র পড়ে গেল। বরাবরই শরৎকাল সোমেনের সবচেয়ে প্রিয় ঋতু। শরতের আবহাওয়া তো আছেই, তা ছাড়া বহু দিনকার লজ্জাকর ধারটা শোধ দেওয়া গেল। ফের অবশ্য ধার হয়েছে বউদির কাছে। তো সোমেনের জীবনটা বোধ হয় এইভাবেই যাবে। একজনের কাছে ধার নিয়ে অন্যজনকে শোধ করবে। তবু দিনটা আজ ভালই। যদি লক্ষ্মণদা চেষ্টা করে, যদি হয়ে যায় আমেরিকায় একটা চাকরি!

দাড়িটা কামানো দরকার। আজ সেই ভূতুড়ে সিনেমার টিকিটের দিন। মনে পড়লেই বুকটা লাফিয়ে ওঠে রহস্যের গন্ধে।

পাড়ার সেলুনে আজ বড্ড ভিড়। চেনা নাপিত ফুলেশ্বর দুঃখ করে বলল—সারা সকাল দোকান খালি গেল বাবু, তখন তো এলেন না! এখন ভরদুপুরে যত ভিড়। বাবুদের সব সময় হয়েছে।

অগত্যা বাসায় ফিরে দাদার রেজারে কামিয়ে নেবে বলে রণেনের ঘরে ঢুকেছিল সোমেন। দাদা একটা ঝকঝকে নতুন জিলেট-এর ওয়ান পিস সেট কিনেছে। পুরনো সেটটা দিয়েছিল সোমেনকে। কিন্তু সেটার প্যাঁচফ্যাঁচ কেটে গেছে। পড়েছিল, বুবাই টুকাই খেলতে নিয়ে কোথায় ফেলেছে কে জানে! নতুন সেটটায় কামিয়ে আরাম, দারুণ সব উইলকিনসন ব্লেডও আছে দাদার।

রণেন বিছানার একপাশে গম্ভীর হয়ে বসে আছে। খালি গা, পরনে দারুণ একটা বাটিকের কাজ-করা ছেলেমানুষি লুঙ্গি। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা এঁটে বই পড়ছে। আজকাল রণেন একদম কথা বলে না। সে যে বাড়িতে আছে তা টের পাওয়াই ভার। বরাবরই সে শান্ত ছিল, কিন্তু এখানকার নীরবতা প্রায় নিশ্ছিদ্র।

সোমেনের খেয়াল হল, গত প্রায় দিন দশেক সে দাদার সঙ্গে কোনও কথা বলেনি। আজ বলল।

—দাদা, তোমার সেভিং সেটটা নেব?

—রণেন একবার তাকিয়ে ঘাড় নাড়ল।

এধার-ওধার কোথাও খুঁজে পাচ্ছিল না সোমেন। ড্রেসিং টেবিলের টানায় সাধারণত থাকে।

হাতের মোটা বইটা খুব জোর শব্দ করে বন্ধ করে দিল রণেন। বিরক্ত হয়ে বলল—কী খুঁজছিস? জমির দলিল? সে তো মার কাছে।

—জমির দলিল! একটু অবাক হয়ে সোমেন বলে—না তো। বললাম যে শেভিং সেটটা!

—ও! বলে রণেন উদাস হয়ে বলল—আমার কাছে নেই। তোর বউদিকে জিজ্ঞেস করিস।

—না হলেও চলবে। বলে একবার গালে হাত বোলায় সোমেন, বলে—না হয় বেরনোর সময়ে সেলুনে কামিয়ে নেব।

—তুই কী করিস আজকাল? রণেন যেন খানিকটা জবাবদিহি চাইবার মতো করে বলে—শুধু ঘুরে বেড়াস?

সোমেন দাদার দিকে তাকিয়ে থাকে। দুপুরে রোদে ঘোরা শরীরটা তেতে আছে। মাথাও গরম। একটু চুপ করে থেকে বলল—কিছুই করি না। কী করব বল?

খুব বিরক্তির সঙ্গে রণেন বলে—এতগুলো ইন্টারভিউ আর রিটন টেস্ট দিলি, কিছু হয় না কেন? সকলের হয়, তোর হয় না?

সকলের হয় না, কারও কারও হয়। এ সত্য রণেনও জানে। তবু তার মুখে একথা শুনে বিস্মিত সোমেন বলে—না হলে কী করব?

—কিছু তো করতেও হবে। বসে থাকা কি ভাল? নানারকম বদ দোষ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তোকে যে আই এ এস দিতে বলেছিলাম।

বদ দোষ কথাটা কানে খট করে লাগল। তবু মাথাটা স্থির রেখে সোমেন বলে—সে সব আমার দ্বারা হবে না। কম্পিটিটিভ পরীক্ষা কি সকলের দ্বারা হয়? তা ছাড়া বয়সও বোধ হয় নেই।

রণেন চশমাটা খুলে তার দিকে গম্ভীর চোখে চেয়ে বলে—তোর বয়স কত হল যেন?

—পঁচিশ-টচিশ হবে। ভাসা ভাসা উত্তর দেয় সোমেন। সঠিক উত্তর দিলে যদি আই এ এস পরীক্ষাটা আবার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয় দাদা!

—পঁচিশ! বলে রণেন ভাবনায় পড়ে—তোরও পঁচিশ হয়ে গেল? অনেক বয়স হল তো তোর। সেদিনও ছোট্ট ছিলি। আমার তা হলে কত হল? মাকে একবার জিজ্ঞেস করে আয় তো।

—জিজ্ঞেস করার দরকার কী? তুমি আমার চেয়ে কত বছরের বড় সেটা হিসেব করলেই তো হয়।

—তোর কি সার্টিফিকেটে বয়স বাড়ানো আছে?

—না তো! বরঞ্চ কমানো আছে বোধ হয়।

রণেন অবাক হয়ে বলে—তাই বা হয় কী করে! সার্টিফিকেটেও তো বয়স বেশি বা কম থাকবার কথা নয়। বাবা নিজে ইস্কুলে ভরতি করে দিয়ে এসেছিলেন। বাবা তো আর বয়স ভাঁড়ানোর লোক নয়। তোর সার্টিফিকেটটা একটু দেখিস তো, ওইটেতেই ঠিক বয়স আছে। আচ্ছা দাঁড়া—

বলে রণেন উঠে খাটের তলা থেকে একটা পুরননা কব্জাভাঙা তোরঙ্গ টেনে আনল। তার ভিতরে গুচ্ছের পুরনো কাগজপত্র ঘেঁটে কয়েকটা পাকানো কোষ্ঠীপত্র বের করে আনল। খুলে খুলে দেখতে লাগল।

মাথা নেড়ে বলল—তোরটা নেই। আমারটাও দেখছি না। মাকে একটু জিজ্ঞেস করিস তো কোথাও রেখেছে কিনা।

—করব।

—এত বয়স হওয়ার কথা তো তোর নয়। পঁচিশ। বলিস কী? তা হলে আমি কি চল্লিশ পার হলাম নাকি? তোরঙ্গটা খাটের তলায় ঠেলে দিয়ে রণেন খাটে উঠে বসে বলল— এখানে বোস।

সোমেন বসে। কিন্তু রণেন কিছু বলে না। কেবল অন্যমনস্কভাবে কী ভাবতে ভাবতে বিষণ্ণমুখে আঙুল মটকাতে থাকে।

এ সময়ে স্নান করে বউদি ঘরে আসে। শায়া ব্লাউজের ওপর শাড়িটা ভার করে পরা হয়নি, স্তূপ করে ধরে রেখেছে। চুলে গামছা জড়ানো। সেটা খুলতে খুলতে বলল—যাও তো, বাথরুম খালি আছে এখন, তাড়াতাড়ি স্নান সেরে এস। আমি ঠাকুরকে ফুলজল দিই।

রণেন সে কথায় কান না দিয়ে খুব অসহায়ভাবে বীণাকে বলে—সোমেন বলছে ওর বয়স না কি পঁচিশ!

বীণা একটু ভ্রূ ভঙ্গি করে বলে—পঁচিশ! যাঃ বলে আয়নার সামনে দাড়িয়ে মুখে কোল্ড ক্রিম মাখতে মাখতে বলে—বাইশ-তেইশ হবে বড়জোর।।

সোমেন বলল—বাঃ রে, তুমিই তো সেদিন হিসেব করে বললে আমার চব্বিশ পূর্ণ হয়ে পঁচিশ—

আয়নার ভিতর দিয়ে বীণা তাকে চোখ টিপে একটা ইশারা করল।

রণেন খুব টালুমালু চোখে এদিক-ওদিক চাইছিল। বলল—পঁচিশ হলে আমারও তো অনেক হয়ে গেল। ওর চেয়ে আমি বয়সে—

বীণা ধমক দিয়ে বলল—স্নান করতে যাবে না কি! তোমার আদুরে মেয়ে বাথরুমে ঢুকলে কিন্তু একটি ঘণ্টা। সে আজকাল খুব সাজুনী হয়েছে। যাও।

—যাচ্ছি। রণেন বলে—তুই যেন কি খুঁজছিলি সোমেন?

—তোমার রেজারটা।

—আমার রেজারটা ওকে দাও তো। বলে কী যেন বিড়বিড় করতে করতে রণেন উঠে যায়।

বউদি ড্রেসিং টেবিলের আয়নার পিছন দিক থেকে শেভিং সেটটা বের করে দিয়ে বলে—ওর সামনে বয়সটয়সের কথা কখনও তুলো না। বয়স হওয়াকে ও ভীষণ ভয় পায়। কেবল মৃত্যুচিন্তা করে তো, তাই বয়সকে ভয়।

সোমেন আলটপকা কিছু না ভেবেই বলে ফেলল—দাদাকে বাবার কাছে পাঠিয়ে দাও না। বাবা মন্ত্র-টন্ত্র দিলে ভাল হয়ে যেতে পারে।

বীণা একবার মুখটা ফেরাল। ভ্রূ কুঁচকে একটু তাকে দেখে মুখঠা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল— সোমেন, শ্বশুরমশাই তাঁর গুরুর মন্ত্র বিলিয়ে বেড়ান। অনেকে তাঁকে বিশ্বাসও করে। এসব আমি জানি। কিন্তু তুমি কি তাঁর মন্ত্রে বিশ্বাস করো? কিংবা তাঁর আদর্শে? ঠিক করে বলো তো!

সোমেন একটু লজ্জা পেয়ে বলে, ঠিক ভেবে দেখিনি। তবে থাকতেও পারে কিছু।

আয়নাতেও বীণার কোঁচকানো ভ্রূ দেখা যাচ্ছিল, বলল—তা হলে ওরকম বললে কেন? আজকাল সবাই না ভেবে না চিন্তে বড্ড আলটপকা কথা বলে। বলে হোমিওপ্যাথি করাও, কেউ বলে জ্যোতিষের কাছে যাও, কিংবা দীক্ষা দাও। আমি জানতে চাই, কোনটা ঠিক রাস্তা! কোন চিকিৎসাটা ঠিক চিকিৎসা। যে যা বলছে করছি, কিছু তো হল না। এখন ঘরের মানুষ তুমিও ওরকম সব উপদেশ দেবে নাকি?

সোমেন বড় অপ্রতিভ হয়ে বলে, দাদার অসুখটা তো আমি জানি না বউদি।

বীণা খুব ব্যথাতুর মুখে বলে—জাননা না কেন? এক ছাদের তলায় থাকো, এক রক্তের সম্পর্ক, তবু কেন জানো না? তোমরা যদি একটু জানবার চেষ্টা করতে তা হলে আমাকে এত ভেবে মরতে হত না। একা আমিই ভাবছি, ছোটাছুটি করছি, আর সবাই বাইরে থেকে কেবল 'এটা করো সেটা করো' বলে। আমার মাথার ঠিক

থাকে না। শ্বশুরমশাইয়ের কাছে মন্ত্র নিলেই যদি ভাল হত তো উনি সেটা দিয়ে দিলেই পারতেন। আমার অনুমতির দরকার ছিল না। তোমরা যদি ওর এত পর হয়ে যাও তো কী করে হবে?

সোমেন কথা বলতে পারল না। নিঃশব্দে উঠে এল।

ঝকঝকে শেভারটা নিয়ে যখন নিজের ঘরে দাড়ি কামাতে বসেছে, তখন কী জানি কেন তার দুচোখ ভরে জল এল। উঁচু নিচু, অসমান হয়ে গেল তার প্রতিবিম্ব। আবছায়ায় কাঁপতে লাগল। ভাবল, দাড়িটা কামাবে না আজ। থাক। সিনেমায় যাবে না।

এক গালে সাবান লাগানো হয়ে গিয়েছিল। সেটা গামছায় মুছে ফেলল সোমেন। শেভারটা দাদার ঘরে রেখে এল। সিগারেট খেতে লাগল শুয়ে শুয়ে। আর ঠ্যাং নাচাল। বাস্তবিক সে না ভেবেচিন্তে বলেছে ও কথাটা সত্যিই তো দাদার অসুখের জন্য তার তেমন মাথাব্যথা নেই। সে কেমন দিব্যি আছে, খাচ্ছেদাচ্ছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেন দাদার সব দায় বউদিরই। আর কারও নয়। মাঝে মাঝে দাদার কথা মনে করে কষ্ট হয় বটে। কিন্তু যৌবনের নানা দিকের ডাক এসে সব ভুলিয়ে দেয়। এবার এখন থেকে সে দাদার কথা একবু বেশি ভাববে।

খাওয়ার পর দুপুরে শুতে গিয়ে সোমেন মার সঙ্গে ঝগড়া করল। বলল—বউদি ঠিক বলে। আমরা কেউ দাদার জন্য কিছু করছি না। দাদার জন্য আমাদের একটুও সিমপ্যাথি নেই। একা বউদি কত দিক সামলাবে?

শুনে ননীবালা অবাক। বলেন—বলিস কী! কে ভাবছে না? দিনরাত ঠাকুরের কাছে মাথা কুটছি। এই সেদিন গোবিন্দপুর নিয়ে গেলাম। ফকিরবাবার ওধুধ খাইয়ে আনলাম। তোর বাবা কোষ্ঠী বিচার করল ভাল করে। ওর এ সময়টা ভাল নয়, বলে দিল। ভাবছি না বললেই হল!

সোমেন খুশি হল না। বলল—আমি তো শুনি কেবল বাড়ি-বাড়ি আর টাকা-টাকা করছ দিনরাত। দাদার কথা ভাবলে কখন?

ননীবালা বলেন—তা বাড়ি বা টাকাই কি ফ্যালনা নাকি! সংসারে থাকতে গেলে নিজের একটা কুঁড়েঘর হলেও লাগে। সে হল সংসারের স্থিতু: লক্ষ্মীর থান। আর টাকার জোরেই মানুষ চলে, বড় হয়।

—তত্ত্ব কথা রাখো তো মা। সংসারের সবকিছুই মানুষের জন্য। মানুষটাই যদি কষ্ট পায় তো ওসব দিয়ে কী হবে!

—ছাই ভগবান। বলে উঠে পড়ল সোমেন। প্রায় আড়াইটা বাজে। ঘরে থাকলে আরও মাথা গরম হবে। পোশাক পরতে পরতে বলল—আমার আর এসব ভাল লাগে না। সংসারের কথা শুনলেই মাথা গরম হয়ে যায়।

ননীবালা একটু নরম হয়ে বলেন—তো করবি কী? সংসারে থাকতে গেলেই একটু ভালমন্দ শুনতে হয়।

—আমার শুনতে বয়ে গেছে। আমি পালাচ্ছি শিগগিরই। আমেরিকায় গিয়ে আর খোঁজও নেব না, দেখো।

ননীবালার হতবাক ভাবটা তখনও যায়নি, সোমেন আর ভেঙে কিছু বলল না। বেরিয়ে গেল।

সিনেমায় যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু রাস্তায় বেরোনোর পর গরম মাথাটা টপ করে ঠান্ডা হয়ে গেল। আর তখন ভূতগ্রস্তের মতো তাকে সিনেমার টিকিটটা টানতে লাগল।

মেট্রোর তলায় যখন পৌঁছল সসামেন তখন তিনটে বাজতে মিনিট পাঁচেকও নেই। লবিতে বহু লোক দাঁড়িয়ে। একটা চেনামুখ দেখা গেল না। তবু যে টিকিট পাঠিয়েছে তার জন্য একটু দাঁড়ায় সোমেন। হয়তো

এখনও আসেনি। নিউজরিলের পরে ঢুকলেও ক্ষতি নেই।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েও যখন কেউ এল না তখন হল-এ ঢুকল সোমেন। অন্ধকারে টর্চ বাতি এসে পড়ল তার গায়ে। অচেনা হাত এসে টিকিট নিল। পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল রো-এর কাছে। প্রথম সিটটাই তার। পরদার প্রতিফলিত আলোয় সে পাশে-বসা মেয়েটাকে দেখবার চেষ্টা করল। বাইরের আলো থেকে অন্ধকারে এসে চোখ ধাঁধিয়ে আছে। ঠিক দেখতে পেল না।

বসবার পর হঠাৎ নরম, আলতো একটা হাত এসে তার হাতের ওপর চাপ দিল। মেয়েলি হাত।

॥ ছেষট্টি ॥

নরম হাতটা তার হাত ওইভাবে স্পর্শ করেই সরে গেল। সোমেন একটু অবাক হয়ে তাকায় পাশের মহিলার দিকে। আর তখনই পাশাপাশি সিটে বসা পাঁচ-ছজনের মধ্যে একটা চাপা হাসি খেলে যায়।

ওপাশের কে একজন বলে—আহা বেচারা! কত কী ভেবে এসেছিল!

আবছায়ায় পাশে-বসা অপালাকে তখন চিনতে পারে সোমেন। ভীষণ সেজেছে তাই চিনতে পারছিল না এতক্ষণ। তার ওপাশে পূর্বা, অণিমা, একটা অচেনা মেয়ে, তারপর অনিল রায়, তার ওপাশে শ্যামল আর মিহির বোস।

—জানতাম তোরাই। সোমেন নিস্পৃহ গলায় বলে।

—আহা জানতিস! বলে অপালা একটা চিমটি দিল সোমেনের উরুতে। পূর্বার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল—ও নাকি জানত! শুনলি!

—গাঁট্টা মার না। বলে পূর্বা।

অণিমা কিছু বলল না। একবার কেবল আবছায়ায় মুখ ফিরিয়ে দেখল। অণিমার পাশেই অচেনা মেয়েটি। সেইখানেই একটু রহস্য থেকে গেল। কে মেয়েটা?

সিনেমাটা ভালই। দেখতে দেখতে সোমেন রহস্য ভুলে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে কেবল অপালার চিমটি টের পাচ্ছিল। একবার চাপা গলায় বলল—বডড জ্বালাচ্ছিস তো। যা ওপাশে গিয়ে পূর্বাকে আমার পাশে দে।

—ইল্লি। তোমাকে প্ল্যান করেই এখানে বসানো হয়েছে বাবু। আমার পাশেই থাকতে হবে।

সোমেন চাপা গলায় বলে—ভাগ্যিস চিরকাল পাশে থাকতে হবে না।

—হবে না কে বলল? হতেও তো পারে!

—মিহির বোস তা হলে আমাকে আস্ত রাখবে?

পূর্বা খুক করে হেসে ফেলল। আশপাশের লোকেরা বিরক্ত হচ্ছে। অনিল রায় ওপাশ থেকে একবার বললেন—চুপ।

—মেয়েটা কে রে? সোমেন খানিক বাদে জিজ্ঞেস করে।

—হবে কেউ। তোর দরকার কী তাতে?

—কৌতূহল।

—ইঃ। যদি একদিন পার্ক স্ট্রিটে খাওয়াস তা হলে বলব।

—খাওয়াব।

—বলে যদি না খাওয়াস?

—ওয়ার্ড ইজ ওয়ার্ড। সোমেন বলে।

অপালা একটা শ্বাস ফেলে বলল—বটে! এত কৌতূহল? হ্যাংলাও বটে তুই! আমরা এতগুলো মেয়ে পাশে থাকতেও ওই একজনের কথা জানতেই হবে!

—তোরা মেয়ে নাকি? শাড়িপরা পুরুষ।

—মারব। বলে অপালা ফের চিমটি দেয়।

সোমেন 'উঃ' করে ওঠে।

ছবির পরদায় তখন এক সাহেব এক মেমসাহেবকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে। হলসুদ্ধ লোক শ্বাস বন্ধ করে আছে। চুমুর পর মেমসাহেব হঠাৎ রেগে গিয়ে সাহেবের গালে একটা চড় মারল।

—ওইরকম একটা থাপ্পড় তোর গালে দিতে পারলে—অপালা বলে।

—থাপ্পড়ের আগেরটা কী হবে?

—কী বলছে রে? পূর্বা মুখ এগিয়ে জিজ্ঞেস করে।

—ওই একটু আগে যা হল তাই চাইছে। অপালা বলে।

—থাপ্পড় দে না।

—দেব, ছবিটা শেষ হোক।

ছবিটা টপ করেই শেষ হয়ে গেল। বাইরের লবিতে বেরিয়ে এসে অনিল রায় পাইপ ধরালেন। তামাকের ধোঁয়ার সঙ্গে অ্যালকোহলের গন্ধ পাওয়া গেল। বললেন—ওঃ সোমেন, তোমার কাছে একটা ক্ষমাপ্রার্থনা বাকি আছে।

—কেন স্যার?

—একদিন তুমি আমার বাড়ি গিয়েছিলে। আমি তোমার সঙ্গে রিয়্যাল খারাপ ব্যবহার করেছিলাম। আই ওয়াজ ড্রাঙ্ক।

—ও কিছু না স্যার। আমি ভুলে গেছি।

—না, না। আমি সত্যিই খুব খারাপ ব্যবহার করেছিলাম। ইদানীং মাত্রাটা বড্ড বেশি হয়ে যাচ্ছিল। একা-একা বড্ড ফাঁকা লাগত তো! আমার আবার খানিকটা ভূতেরও ভয়ও আছে।

—বলেন কী? বলে সোমেন অবাক।

—সত্যি স্যার? বলে চেঁচিয়ে ওঠে পূর্বা। অপালাও চেঁচায়।

—আস্তে। অনিল রায় বলেন—সবাই শুনতে পাবে। আমার ভূতের ভয়ের ব্যাপারটার বেশি পাবলিসিটি দিয়ো না। চলো রেস্টুরেন্টে বসে বলছি।

দঙ্গলটা পার্ক স্ট্রিটের দিকেই এগোয়। আগে আগে শ্যামল আর মিহির বোস। বোধ হয় আগামী নাটকের ব্যাপার নিয়ে ওরা খুব উদ্বিগ্ন আর মগ্ন হয়ে কথা বলতে বলতে দলছুট হয়ে হাঁটছে। একটু পিছনে অনিল রায়ের দুপাশে সোমেন আর অপালা, পিছনে ম্লানমুখ অণিমা, সেই অচেনা মেয়েটি, পূর্বা। মেয়েটাকে লক্ষ্য করল সোমেন। সুন্দরী নয়, রোগা বেঁটে। তবে বয়স খুব অল্প। কুড়ি বাইশের মধ্যেই মুখখানায় খুব একটা হাসিখুশি আনন্দের ভাব। গেঁয়ো বলে মনে হয়।

অনিল রায় হঠাৎ দাঁড়িয়ে বললেন—বাই দি ওয়ে। অপালা সোমেনকে কি আর রহস্যের মধ্যে রাখা ঠিক হচ্ছে? ও হয়তো এ দলে একটি নবাগতাকে দেখে খানিকটা বিমূঢ় না কি যেন বলে হয়ে আছে। না?

—না স্যার, ওকে বলবেন না। চেঁচিয়ে ওঠে অপালা—ওর কাছ থেকে আগে খাওয়া আদায় করি তারপর বলব।

অনিল রায় স্মিত হেসে বললেন—খুব তো খাওয়া খাওয়া করো, কিন্তু খাওয়ার সময়ে তো দেখি সব পাখির আহার। তোমাদের তো আবার ডায়েট কন্ট্রোল না কি ছাই যেন আছে, তবে অত খাওয়ার আওয়াজ কেন?

—সোমেনটা হাড় কিপটে স্যার, খরচ করে না। অপালা বলে।

—থাকলে তো করব। সোমেন মৃদু হাসি হেসে বলে—দেখছিস তো চাকরি নেই।

—চাকরি হলেই বুঝি খাওয়াবি?

—সোমেন চাপা গলায় বলে—আমারটা তো তুই-ই সারাজীবন খাবি বাবা!

—ইস, কী অসভ্য স্যার, দেখুন সোমেন আমাকে অসভ্য কথা বলছে! অপালা কাঁদো কাঁদো গলায় বলে।

—বলেছ সোমেন? অনিল রায় স্মিত হেসে জিজ্ঞেস করেন।

—না স্যার, যা বলেছি তা ওর বাপের জন্মে ওকে কেউ বলেনি। অসভ্য কথা! এঃ। বলে সোমেন মুখ ভেঙিয়ে বলল—কেউ বলবে না, ওই মিহির বোসও না। এই শর্মাই বলল। যখন কেউ জুটবে না তখন এসে আমার দোরগোড়ায় বসে কাঁদবি।

—বয়ে গেছে। কাকের ঠোঁটে কমলালেবু! শখ কত!

—আমি কাক? তুই কমলালেবু? শুনুন স্যার, কত বড় আস্পর্দা!

অনিল রায় হাত তুলে দুজনকে থামান। বলেন—তুমি কি অপালাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলে সোমেন?

সোমেন মাথা চুলকে বলে—ঠিক তা নয় স্যার।

—এর আগেও যেন কয়েকবার তুমি কাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছ বলে শুনেছি। ওটাই কি তোমার 'হবি' নাকি?

সোমেন ম্লান মুখ করে বলল—কেউ রাজি হয় না স্যার, তাই সবাইকে বাজিয়ে দেখছি। যদি কেউ রাজি হয়ে যায়! বান্ধবীরা সব এসে একে খসে পড়ছে। এরপর আর কে থাকবে।

অনিল রায় অন্যমনস্ক হয়ে বলেন—তাও বটে। আমিও অনেককে দিয়েছিলাম প্রস্তাব। কিন্তু আমি বড় ফান্টুস টাইপের ছেলে ছিলাম বলে কেউ রাজি হত না। তোমার অবশ্য অন্য প্রবলেম, কাউকেই বোধ হয় কনভিনসড করাতে পারছ না যে তোমারও ভবিষ্যৎ আছে!

—ঠিক স্যার।

অনিল রায় উদার কণ্ঠে বললেন—অপালা, বি জেনেরাস। ওর প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাও। যদি বোঝো ও সত্যিই অপদার্থ তা হলে বরং পরে একটা ডিভোর্স করে নিয়ো।

অপালা গম্ভীর মুখ করে বলে—শুভদৃষ্টির সময়ে ওকে দেখলেই যে আমার হাসি পাবে!

—হেসো। তবু রাজি হয়ে যাও।

—ভেবে দেখি স্যার। অপালা গম্ভীর মুখে বলে—না হয় একটা জীবন আত্মত্যাগ করেই কাটবে।

সোমেন চোখ তাকিয়ে বলে—এঃ, আত্মত্যাগ!

অপালা চোখ গোল করে বলল—তারচেয়েও বেশি। প্রাণত্যাগও করতে হতে পারে। তোকে বিয়ে করে শেষ পর্যন্ত সুইসাইড না করতে হয়।

পূর্বা পিছন থেকে করুণ স্বরে ডাকছিল—স্যার, স্যার, আপনারা কোথায়? এঃ মা, আমি কাউকে খুঁজে পাচ্ছি না।

এসপ্ল্যানেডের অফিস-ভাঙা ভিড়ের শব্দের মধ্যে ডাকটা খুব ক্ষীণ হয়ে সকলের কানে পৌঁছায়। ফুটপাথে নাচুনি পুতুল দেখে কিনতে বসে গিয়েছিল পূর্বা। পিছিয়ে পড়েছে।

সোমেন গিয়ে তাকে ধরে আনতে আনতে অনিল রায়কে বলে—এদের সব সময়ে একজন করে গাইড দরকার। তবু ছাড়া গরুর মতো ঘুরবে, কাউকে অ্যাকসেপ্ট করবে না।

পার্ক স্ট্রিটের দারুণ একটা রেস্তোরাঁয় সবাই এসে বসে হাঁপাচ্ছিল। অনেক দূর হাঁটা হয়েছে।

অচেনা মেয়েটি আর অনিল রায় পাশাপাশি।

অনিল রায় জিজ্ঞেস করেন—কেউ ড্রিঙ্কস নেবে?

সোমেন মাথা নাড়ল। নেবে না। শ্যামল আর মিহির প্রায় একসঙ্গে বলল—জিন।

সেই রহস্যময়ী মেয়েটি বলল—আবার খাচ্ছো কেন?

অনিল রায় বললেন—খাচ্ছি কোথায়? এ ঠিক মদ্য পান নয়। জাস্ট অ্যাপেটাইজার।

মেয়েটা মুখটা একটু বিকৃত করে বলে—বড্ড বেশি হয়ে যাচ্ছে। রাতে তো বাসায় খাবার খেতেই পারো না।

সোমেন হঠাৎ হেসে বলল—স্যার, আমি কিন্তু বলতে পারি উনি কে!

—কে বলো তো!

—নতুন মিসেস রায়।

—অপালা বলল—আহা! কী বুদ্ধি তোর!

—কী ভীষণ বোকা রে বাবা! বুঝতে এত সময় লাগল? পূর্বা বলে।

—ঠিক বলেছি স্যার? সোমেন একটু বোকা-হাসি হেসে জিজ্ঞেস করে।

অনিল রায় একটু ভেবে বলেন—ঠিক! হ্যাঁ সেন্ট পারসেন্ট। এ হচ্ছে আমার স্ত্রী মিলু রায়। আর এই হচ্ছে সোমেন লাহিড়ি।

সোমেনের মনে হল অনিল রায় একটা অদ্ভুত বিয়ে করেছেন। বয়সে মেয়েটি প্রায় অর্ধেক, দেখতেও তেমন কিছু নয়। তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করার মতো। মেয়েটি বেশি সাজেনি। নতুন বউরা যেমন সাজে মোটেই সেরকম নয়। একটা হালকা ক্রিম রঙা শাড়ি পরেছে, মুখে প্রসাধন নেই, একটা এলো খোঁপায় চুল বাঁধা, বেশি সাজলে তাকে ভাল দেখাত না। একটু অহংকারী মেয়েটি। নমস্কার করে একটু হাসল মাত্র। কথা বলল না।

অনিল রায় বললেন—তুমি কিছু নিলে না সোমেন? একটু জিনও নয়!

—বড্ড মাথা ধরে স্যার।

—একটু বেশি করে খাও, সেরে যাবে। নাহলে বরং হুইস্কি নিতে পারো।

সোমেন একটু দ্বিধা করে বলল—আচ্ছা, একটু খাই।

সোমেনের ডান ধারে ম্লানমুখী অণিমা বসেছে। আজ বিকেলে সে প্রায় কথাই বলছে না! অনেকক্ষণ ধরে তাকে লক্ষ্য করছে সোমেন। বুকটা মাঝে মাঝে শূন্য লাগছে।

হঠাৎ অণিমা সোমেনকে কনুই দিয়ে অল্প একটু ধাক্কা দিল।

সোমেন প্রথমে বুঝতে পারেনি। তাই একটু সরে বসে। তারপর নির্ভুল টেবিলের তলায় অণিমার হাত সোমেনের হাঁটু স্পর্শ করে। অণিমা প্রায় শ্বাসবায়ুর শব্দে সোমেনের দিকে না ফিরে বলে—খেয়ো না।

সোমেন ফের দ্বিধায় পড়ে। মদ খেতে বারণ করছে নাকি অণিমা? একবার মুখ ফিরিয়ে নতমুখী ও লাজুক মুখখানা দেখে নেয় সোমেন। অণিমা খুব গম্ভীর, মুখে ভ্রূকুটি।

সোমেনও আস্তে করে বলে—খাবো না।

—না।

—কেন?

—কেন আবার! আমি বলছি তাই খাবে না।

সোমেন সামান্য হাসল। বুকের মধ্যে, মনের মধ্যে আজও কেন যে একটা থেমে যাওয়া ঝড় জেগে ওঠে।

সোমেন বলে—আচ্ছা।

বেয়ারা সোমেনের সামনে হুইস্কির গেলাস রেখে গেল। সোমেন সেটা হাতে নিল, দেখল, রেখে দিল আবার। বলল—স্যার, ভূতের গল্পটা বলবেন না?

—ও! হ্যাঁ! বলে হাসলেন অনিল রায়। বললেন—কে বিশ্বাস করবে বলো যে আমার ভীষণ ভূতের ভয় আছে! খুব ছেলেবেলা থেকেই ছিল অবশ্য, কিন্তু ইদানীং সেটা খুব বেড়েছিল। কাউকে বোলো না।

—না স্যার।

—সেদিন রাতে শুয়েছি, বেশ নেশা ছিল, তবু কেন যেন ঘুম আসছিল না। যতবার ঘুমোই ততবার চটকা ভেঙে যায়। কে যেন জাগিয়ে দিচ্ছে। চাকরটার বাড়িতে অসুখ বলে একবেলার ছুটি নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেও রাতে ফেরেনি। বার বার জেগে উঠে কান পেতে শুনছি যদি চাকরটা রাতের শেষ গাড়িতেও আসে বারুইপুর থেকে। একদম একা একাটা ফ্ল্যাটে আমি, এটা ভাবতেই ভারী গা ছমছম করে। খোলা জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘরে, বেশ ভূতুড়ে দেখাচ্ছে সবকিছু। খুব নিস্তব্ধও চারদিক। এক-একবার চোখ খুলে ঘরটার আলোছায়া দেখি। ফের চোখ বুজে ফেলি ভয়ে। পাছে কিছু দেখা দেয়! এরকম কয়েকবার হল। বালিশের কাছেই রিভলভার থাকে, সেটা হাতে নিয়ে শুয়ে রইলাম। আবার ভয়ও করছে, যদি ওটা হাতে নিয়েই ঘুমিয়ে পড়ি তো ঘুমের মধ্যে ট্রিগারে চাপ দিলে অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে। কিন্তু কী করি! জেগে চোখ বুজে রিভলভার হাতে শুয়ে আছি। এমন সময়ে ঠিক একটা টরেটক্কার মতো শব্দ পেলাম। না, শব্দটা বাইরে কোথাও নয়, আমার মাথার মধ্যে, বুকের মধ্যেই কোথাও হচ্ছিল। সে খুব নিস্তব্ধ শব্দ। যেন আমাকে চোখ খুলতে বলছে। একবার চোখ চাইলাম। ফাঁকা ঘর। কিন্তু মনে হল, কে যেন এসেছে। সে এসে বসল আমার বিছানার একটা ধারেই। আমি রিভলভারটা তুললাম। ফের সেই টরেটক্কার ভাষা শুনলাম, অস্ত্র নামাও। নামালাম। যে এসেছে সে আমার দিকে চেয়ে আছে। তাকে দেখতে পাচ্ছি না। ঘরে শুধু ভূতুড়ে চাঁদের আবছা আলো। খুব ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম—কে? ফের সেই টরেটক্কা বলল—তোমার একাকীত্ব। আজ রাতে সেই একাকীত্বের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে।

সবাই হেসে ওঠে।

অনিল রায় হাসলেন না। হাত তুলে বললেন—শোনাই না। খুব সিরিয়াস ব্যাপার।

॥ সাতষট্টি ॥

অনিল রায় বড় চট করে মাতাল হয়ে যান।

টপাটপ চার পাঁচ পেগ খেয়ে আজও গেলেন। গেলাস রেখে বললেন—কী যেন বলছিলাম! একটা ভূতের কথা না!

—হ্যাঁ স্যার। সোমেন বলে।

অনিল রায় সামান্য ভ্রূ কুঁচকে ভেবে নিয়ে বলেন—খুব অদ্ভুত। পরিষ্কার সেই ভূতটাকে টের পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি না। ভয়ে পাগল হয়ে যাই আর কী! ভীষণ ভূতের ভয় আমার। তো ভূতটাকে টের পেয়েই আমি ভর ভরতি রিভলভার থেকে গুলি ছুঁড়তে থাকি। চেম্বার খালি হয়ে গেল, সটাক সটাক বুলেট বেরিয়ে আমার ক্যাবিনেট ফুটো করছে, দেওয়ালের ছবি ভাঙছে, শার্সি চৌচির করছে, চুনবালি খসাচ্ছে—সব টের পাচ্ছি। আর নিস্তব্ধতার মধ্যেই এক নিঃশব্দ হা-হা হাসি টের পাচ্ছি। আমার পিস্তলের গুলিতে তার কোনও রি-অ্যাকশনই হল না। কলকাতায় সব সময়ে বোমা বন্দুকের শব্দ হয় বলে লোকে গা করে না, তাই প্রতিবেশীরাও কেউ দৌড়ে আসেনি। সে যে কী ভয়ংকর অবস্থা! আমার একটা খাওয়ার টেবিল আছে, পুরনো। এক সাহেবের কাছ থেকে সেটা কিনেছিলাম। আসল মেহগিনী। সেই টেবিলটাকে আমার বরাবর কিছু ভয় ছিল। সন্দেহ হয়, সেই টেবিলটার সঙ্গে এক মেমসাহেবের আত্মার কিছু যোগাযোগ আছে। সোমেন, তুমি মুখ লুকিয়ে হাসলে নাকি?

—না স্যার।

অপালা বলে—হ্যাঁ স্যার, হাসল!

অনিল রায় গম্ভীর হয়ে তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলেন—তোমার কি সন্দেহ হচ্ছে যে আমি মাতাল হয়ে গেছি?

—একটু হয়েছ, আর খেয়ো না।

—সবাই হাসছে নাকি? আমি খুব ভাল লক্ষ্য করতে পারছি না, তুমি একটু দেখো তো!

—না তো, কেউ হাসছে না।

অনিল রায় মাথা উঁচু করে সবাইকে বললেন—হেসো না। এটা সিরিয়াস ব্যাপার।

—সেই টেবিলটা স্যার! সোমেন বলে।

—কোন টেবিলটা? বলে ভ্রূ কোঁচকালেন অনিল রায়। পরমুহূর্তেই মাথা নেড়ে বললেন—ইয়েস। সেই মেহগিনী টেবিলটা। আমি অনেকদিন টের পেয়েছি, নিশুত রাতে কে যেন আসে। মেয়েলি হাই হিল জুতার শব্দ। এসে ঘুরে ঘুরে টেবিলটার চারধারে পাক খায়। সে টেবিলটার একপাশে চেয়ার টেনে বসে। তারপর টেবিলে মাথা রেখে অনেকক্ষণ কাঁদে।

—মাগো! বলে অপালা মিহির বোসের হাত খামচে দেয়।

—সত্যি স্যার? পূর্বা উত্তেজিত হয়ে বলে।

অনিল রায় মাথা নাড়লেন। বললেন—সত্যি। অনেকদিন ধরেই আমি তার আনাগোনা টের পাচ্ছি। বান্টির মা যখন ছিল, তখনও। তখন ওকে কতবার ডেকে বলেছি সে কথা। কিন্তু বড় বেশি মডার্ন ছিল বলে গা করত না। আমাকে মাতাল ভাবত।

—ওসব কথা থাক না, দ্বিতীয়পক্ষ আস্তে করে বলে।

বিরক্ত হয়ে অনিল রায় বললেন—ওরা সব জানে। লজ্জার কিছু নেই। বলে সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন—তো টের পেলাম সেই রাতেও আমার রিভলভারের গুলি ফুরিয়ে যাওয়ার পর একটা হাই হিলের শব্দ পাশের ঘরে আস্তে জেগে উঠল। কী পরিষ্কার টনটনে শব্দ। পরদা সরালেই যেন দেখতে পাব। ঘুরল, বসল চেয়ার টেনে। তারপর কাঁদতে লাগল। আমি পাগলের মতো সেই ঘরের দিকে রিভলভার তাক করে গুলি ছুঁড়বার চেষ্টা করি, আর কেবলই নিলা ট্রিগারের ক্লিক ক্লিক শব্দ হয়। কীভাবে রাতটা কেটেছিল কে জানে! তবে আমি অনেকবার চিৎকার করতে চেষ্টা করছি, দৌড়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি, পারিনি।

—তারপর স্যার? পূর্বা শ্বাস বন্ধ করে শুনছে।

অনিল রায় আরও একটা নিট হুইস্কি খেয়ে নিলেন। মুখটা ওয়েস্টার্ন ছবির নায়কের মতো হাতের পিঠ দিয়ে মুছে নিয়ে বললেন—তো সকালে এই মেয়েটি এসে হাজির। তোমাদের জুনিয়ার, এ বছরই পরীক্ষা দিচ্ছে। হাতে বইখানা, একটু ডিসকাস করতে এসেছে। আমি ওকে দেখে ধড়ে প্রাণ পেলাম। সোজা সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বললাম—তুমি যেয়ো না, থাকো। তোমার পায়ে পড়ি।

বলে অনিল রায় মিলুর দিকে তাকালেন, বললেন—ঠিক বলিনি?

মিলু মাথা নেড়ে বলল—ঠিক।

অনিল রায় আর একটু মাতাল হয়ে বললেন—ও আমার চেহারা আর অ্যাটিচুড দেখে ভীষণ ঘাবড়ে গেছে, কিন্তু আমারও তো উপায় নেই। সারাদিন কেবল চাকরটাই থাকে। তো সেও আসেনি। একটু ভূতুড়ে রাত্রির পর আমার ইমিডিয়েটলি একজন বিশ্বস্ত সঙ্গী দরকার—যে থাকবে, ছেড়ে যাবে না। আমি ওকে দেখেই বুঝতে পারলাম, ও ঈশ্বরপ্রেরিত, ও আমার জন্যই নির্দিষ্ট, মেড ফর ইচ আদার। ও ভয় খেয়ে বলল—থাকব কী করে, আমি যুবতী মেয়ে, লোকে বলবে কী? আমি তখন বিনা দ্বিধায় বললাম—বিয়ে করো আমাকে। বিয়ে করো, বিয়ে করো। বলেই ফের মিলুর দিকে তাকিয়ে বলেন—ক'বার কথাটা বলেছিলাম যেন মিলু?

—অনেকবার, মিলু বলল।

—হ্যাঁ অনেকবার, বলতে বলতে ও রাজি হয়ে গেল। আর সেইদিনই আমরা মিলুর অভিভাবকের অনুমতি নিই, রেজিষ্ট্রি করি আর একসঙ্গে থাকতেও শুরু করি। বিশ্বাস করো সোমেন, তুমি বড্ড বেশি হাসছ।

—এ যে ভাবা যায় না স্যার।

উদারভাবে অনিল রায় বললেন—আমিও ভাবতে পারি না। দেয়ার ওয়াজ নো লাভ, নো থট, নো অ্যাট্রাকশন। ওনলি ওয়ান অর টু ঘোস্টস মেড আস হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ। না মিলু?

মিলু মাথা নত করে বসেছিল। সোমেন আচমকা লক্ষ্য করে যে মিলু কাঁদছে। বড় বড় ফোঁটা দু-একটা ঝরে পড়ল টেবিলে। ব্যতিব্যস্ত হয়ে কী একটা বলতে যাচ্ছিল সোমেন, অণিমার নির্ভুল হাতটি তার হাঁটুতে চাপ দিল।

চুপ করে গেল সোমেন।

বহুকাল সে-দৃশ্যটা ভুলতে পারেনি। আর হাঁটুর ওপর অণিমার ওই মৃদু স্পর্শ, কী বলতে চেয়েছিল অণিমা! সোমেন, ওকে কাঁদতে দাও। বোকা, মেয়েমানুষের বুকে কত কান্না জমা থাকে জানো না তো।

অণিমার সেই চপলতা নেই, ইয়ারকি নেই। কেমন বিষণ্ণ গম্ভীর আর সুন্দর মহিলা হয়ে গেছে। বন্ধুদের সঙ্গে মিশবার মধ্যেও একটা আলগা ভাব। কেবল অপালা আর পূর্বার সঙ্গে যা একটু ফিসফাস করে।

বিকেলটা খুব অন্যরকমভাবে কেটে গেল সেদিন। পরদিন অণিমা চলে গেল।

ঠিক যেমন একটা সিনেমার টিকিট ডাকে এসে চমকে দিয়েছিল সোমেনকে, তেমনি হঠাৎ এসে চমকে দিল মধুমিতার চিঠি লিখেছে—ডার্লিং, এখানে আসার পর বেশ লাগছে। হাসপাতালে অনেক চেক-আপ করাতে হচ্ছে। আমি বাপির সঙ্গে এর মধ্যেই কন্যাকুমারিকা ঘুরে এসেছি, কী ভাল যে লাগল! একদিন ব্যাঙ্গালোরে ছিলাম, খুব বেড়াতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু উপায় কী বলো! আজ কদিন হাসপাতালে শুয়ে আছি। পরশু অপারেশন হবে, শুনছি। বাপি রোজ প্রায় সারাদিন আমার কাছাকাছি থাকে। বাপি খুব শক্ত মানুষ। এত শক্ত মানুষ আমি আর একটাও দেখিনি। ধরো, আমাকে যে অত ভালবাসে বাপি তা কিন্তু কখনও বাইরের আদর দিয়ে বুঝতে দেয় না। ছেলেবেলায় পর্যন্ত আমি বাপির কোলে উঠবার সুযোগ পাইনি। বাপি কোলে নিত না, হামলে আদর করত না, এমনকী সারাদিনে হয়তো মাত্র এক-আধবার দেখা হলে এক-আধ পলক তাকিয়ে দেখত মাত্র। কিন্তু তাইতেই বুঝতে পারতাম, পৃথিবীতে এই মানুষটাই আমাকে সরচেয়ে ভালবাসে। কী করে বুঝতাম বলো তো! এই ভালবাসার ব্যাপারগুলো ভারী অদ্ভুত, ঠিক বোঝা যায়, বলতে হয় না। এই যে এখন বাপি আমার কাছে কাছে আছে, এখনও মুখে কোনও আদর নেই। কিন্তু দেখতে পাই, বাপি খুব অস্থির, চিন্তিত। ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলছে, আলোচনা করছে, ফাঁকে ফাঁকে আমাকে বেড়াতে নিয়ে গেছে। তেমন বেশি কথা বলে না বাপি, মাঝে মাঝে কেবল সকালে উঠে গীতার শ্লোক ব্যাখ্যা করে শোনায়। হাসপাতালে বেড নেওয়ার আগে কয়েকদিন হোটেলে ছিলাম। মস্ত হোটেল। পুরো একটা অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে আমরা ছিলাম। একদিন মাঝ রাতে মাথার যন্ত্রণা হতেই জেগে বাপিকে ডাকতে গিয়েই অবাক হয়ে দেখি, বাপি আমার মাথার কাছে চুপ করে বসে আমার মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। এই বোধ হয় প্রথম বাপির মধ্যে একটা স্পষ্ট আবেগ বা দুঃখবোধ যা তোক দেখলাম। কোনওদিন কঁদি-টাঁদি না, বুঝলে? কান্না-টান্না আমার আসেই না, কী করে কাঁদে লোক তাও জানি না। সেই রাতে হঠাৎ বাপির সেই চেয়ে থাকা দেখে আমার গলা-ব্যথা, চোখ জ্বালা করে কী একটা অদ্ভুত ব্যাপার হতে লাগল, বুকটা ধড়ফড় করছে। তারপর হঠাৎ ঠোঁটটোঁট কেঁপে, ফুঁপিয়ে একাকার কাণ্ড। কোনওদিন কাঁদি না তো, তাই সেই আচমকা কান্নাটা আমাকে একেবারে ভাসিয়ে নিল। ডার্লিং, বিশ্বাস করো, নিজের জন্য একটুও দুঃখ নয়, কেবল মনে হচ্ছিল—আমি মরে গেলে বাপি বড় দুঃখ পাবে। শুধু বাপির সেই শোকের কথা ভেবে ভয়ংকর ভেঙে পড়েছিলাম। কিন্তু সে মাত্র ওই একবার। এখন আবার হেইল অ্যান্ড হার্টি আছি। বাপি যতক্ষণ কাছে থাকে, সারাক্ষণ নানা মজার

গল্প বলে আমাকে খুশি রাখছে। আমি খুশিও হই। হবো না কেন বলো? পৃথিবীটা কি কারও জন্য থেমে থাকে? কারও মৃত্যু শোক পালন করতে সে কি এক সেকেন্ডও তার আহ্নিক গতি বন্ধ করে? পৃথিবীতে কেউ অপরিত্যাজ্য নয়। এমন কেউ নেই যাকে ছাড়া পৃথিবী চলে না। আমরা নিজেদের যত ইম্পর্ট্যান্ট ভাবি মোটেই তা নই আমরা। তোমাকে একটা ছেলের কথা বলি। ভীষণ ভাল ছেলে, একস্ট্রিমিস্ট। অপরাজিতাদের বাইরের দেওয়ালে যে লেখাটা আছে, দেখেছ? প্রতিশোধ, প্রতিরোধ, প্রতিবাদ। কমরে, গড়ে তোলো, গড়ে তোলো, গড়ে তোলো ব্যারিকেড। ওই কথাটা সে লিখেছিল। সেই ছেলেটাকে আমার ভীষণ ভাল লাগত। একদিন থাকতে না পেরে আমি তাকে বলে বসলাম—জিতু, আমি তোমাকে চাই, বিয়ে করব। সে ভারী অবাক হয়ে বলল—বিয়ে করবে? কিন্তু বিয়ে পর্যন্ত আমি তো বাঁচব না। আমি বললাম—কেন বাঁচবে না? সে কেবল হাসে আর বলে—আমার তো বাঁচার কথা নয়। আমি যত তাকে বলি—তোমাকে বাঁচতেই হবে। সেও তত বলে বাঁচতে তো খুব ইচ্ছে হয়, কিন্তু মরবার দরকার হলে মরব নাই বা কেন?

ডার্লিং, সে কিন্তু মরেনি। জীবনে প্রথম যে খুনটা ও করে সেইটের শক্ ও সামলাতে পারেনি। যারা ওকে খুন করতে উত্তেজিত করে তোলে তারা জানত না যে, ওর প্রকৃতি খুব দুর্বল, নার্ভ ভীষণ সেনসিটিভ। শুনেছি তিলজলার কাছে ও একটা ছেলেকে খুন করে তখন এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে, চিৎকার করে নাচ গান করতে থাকে। তারপরও ও ছেলেটার হাত দুটো কেটে নিয়ে সেই কাটা হাত থেকে রক্ত মাংস চিবিয়ে খেতে খেতে চিৎকার করে বলতে থাকে—এই দ্যাখ, আমি শ্রেণী-শত্রুর রক্ত খাচ্ছি, মাংস খাচ্ছি।

সেই থেকে ও উন্মাদ পাগল। এখনও ওকে সি আই টি রোডের কাছে দেখা যায়। আধ ন্যাংটো, গায়ে ভীষণ ময়লা পড়েছে, মস্ত চুল-দাড়ি, সারাদিন বিড়বিড় করে ঘুরে বেড়ায়। এর ওপর কেউ প্রতিশোধ নেয়নি। হয় পাগল বলে ছেড়ে দিয়েছে নয়তো প্রতিশোধ নেবে যারা তারাও কেউ নেই।

ডার্লিং, জিতুর কথা কেন বললাম বলো তো! ওই যে ও একটা কথা বলেছিল—মরবার দরকার হলে মরব নাই বা কেন? তার মানে মরে যাওয়াটাই ও ধরে নিয়েছিল, একমাত্র সত্য বলে। কেউ ওর মাথায় সেই বিশ্বাসটাই সেট করে দেয়। আমার মাথাতেও সেই রকম একটা বিশ্বাস সেট হয়ে গেছে। তাই আর তেমন দুঃখ হয় না। কেবল একটা কথা ভেবে মন খুব খারাপ লাগে ডার্লিং। আমাকে তোমরা ভুলে যাবে না তো! প্লিজ, ভুলো না। যদি ভোলো তবে ধূপকাঠি নিবে যাওয়ার পর যে একটু গন্ধের রেশ থাকে, আমার সেটুকুও থাকবে না।

বাপি আমাকে সুন্দর সুন্দর লেখার প্যাড, আর হ্যান্ডমেড কাগজের খাম এনে দিয়েছে চিঠি লেখার জন্য। সবাইকে চিঠি লিখছি—ভুলো না, ভুলো না, মধুমিতাকে ভুলো না।

পরশু আমার অপারেশন হবে বোধ হয়। তারপরে কী হবে ডার্লিং। ব্রেন অপারেশন বড্ড শক্ত। কয়েকজন অচেনা, অনাত্মীয় ডাক্তারের হাতে আমার জীবন। ডাক্তারদের মধ্যে একজনের মুখে অনেকটা বাপির মুখের আদল দেখদে পাই। খুব ইচ্ছে হয়, ওই লোকটাই আমার অপারেশন করুক। ভুলো না।

তোমারই মধুমিতা।

বিকেলের আলোয় চিঠিটা পড়ছিল সোমেন। দীর্ঘ সন্ধ্যাটা তারপর যেন কাটতে চায় না। জীবন ভরে এক আলো-আঁধারি নেমে এল বুঝি।

চিঠি পাওয়ার কয়েকদিন পর একদিন উত্তরটা লিখতে বসল সোমেন। পুরো একটা ফুলস্ক্যাপ কাগজের ওপর দিকে লিখল—প্রিয় মধুমিতা,

তারপরই খেয়াল হল, কাকে লিখছে। এতদিনে মধুমিতার অপারেশন হয়ে গেছে। কি হয়েছে? যাই হোক, মধুমিতা এ চিঠি পড়তে পারবে না নিশ্চই। তাই আর লিখল না সোমেন। একটা সাদা কাগজের ওপর দিকে কেবল ছোট্ট করে লেখা রইল—প্রিয় মধুমিতা, ব্যস আর কিছু নেই। বাকি সাদা কাগজটা ধু-ধু মরুভূমি।

যত্ন করে কাগজটা ভাঁজ করে সঞ্চয়িতার মধ্যে রেখে দিল সোমেন। দিনের আলোতেও এক অদ্ভুত আঁধার পৃথিবীতে নেমে এসেছে, সোমেন টের পায়। ফুসফুস ভরে বাতাস টেনেও যেন শ্বাসের তৃপ্তি হয় না। হাঁফধরা হয়ে থাকে বুক। সোমেন তাই ছটফট করে।

না, এ দেশে আর থাকবে না সোমেন। এই যে এত প্রিয়জন চারদিকে, এদের মধ্যে বেশিদিন থাকা ভাল নয়। কে কবে বুক ঝাঝরা করে দিয়ে চলে যাবে! বাবা মা বুড়ো হয়েছে, দাদার শরীর ভাল নয়। তা ছাড়া কার কখন নিয়তি কে জানে! মৃত্যু তার টিকিটঘর খুলে বসে আছে, ঘুলঘুলি দিয়ে উঁকি মেরে দেখছে মানুষের মুখ। যখন যার মুখ পছন্দ হয় তখনই তাকে ধরিয়ে দেয় টিকিট। তাই প্রিয়জনদের কাছে বেশিদিন থাকা ভাল নয়।

॥ আটষট্টি ॥

এদিককার জমিতে ভাল আখ হয় না। যৌবনকালে ব্রজগোপালের খুব প্রিয় ছিল আখ। বলতেন—মিষ্টি লাঠি। কেষ্টঠাকুরের মত ধুতিটা কোমরে বেঁধে, খালি গায়ে এক গা থেকে অন্য গাঁ চলে যেতে যেতে যৌবন বয়সে কতবার ক্ষেত থেকে আখ ভেঙে নিয়েছেন। চিবতে চিবতে লম্বা পথ ফুরিয়ে গেছে। এখন দাঁত নেই বলে চিবনোর প্রশ্নই ওঠে না। তবু রান্নাঘরের মুখোমুখি একটু জমিতে কয়েকটা আখ গাছ লাগিয়েছিলেন। ভাতের ফ্যান, তরকারির খোসা এই সব দিয়ে বেশ ফনফনে হয়ে উঠেছে গাছগুলি। গোড়াগুলো বাঁশের মতো মোটা। ষষ্ঠীচরণ বুক দিয়ে দাদুর আখ গাছ পাহারা দেয়, সেও আবার নিজের বিবেচনা মতো পচা গোবর, খোল যা পারে এনে আখের গোড়ায় দেয়। জমি নিয়ে নানারকম পরীক্ষা করেছেন ব্রজগোপাল। আপেল ন্যাসপাতি লাগিয়ে দেখেছেন, ডালিম লাগিয়েছেন, কমলালেবুও। ষষ্ঠীচরণ সে সবও আগলে আগলে বেড়ায়। তার ধারণা, দাদুর সব গাছেই ফল ফলবে। সে খাবে। পেয়ারা গাছটায় এবার কেঁপে ফল ধরেছে, দিন রাত পাখি-পক্ষীর অত্যাচার, দু-চারটে হনুমান আছে, তারাও এসে হামলা করে। ষষ্ঠীচরণ লগি হাতে দিন রাত পাহারা দেয়। বহেরুর অন্য সব নাতিপুতির সঙ্গে সেই কারণেই তার ঝগড়া হয় রোজ। দৌড়ে এসে দাদুকে নালিশ করে—ও দাদু, অমুক আমাকে এই বলল, কী সেই বলল।

ব্রজগোপালের আর তেমন মায়া হয় না ফলপাকুড়ের প্রতি। তিনি বলেন—তা পেয়ারাগুলো যতদিন কষ্টা ছিল ততদিন পাহারা দিয়েছিস, এবার সব পেকে উঠেছে, এখন সবাইকে দিবি। দেখিস যেন গাছ না ভাঙে।

ষষ্ঠীচরণের সে কথা পছন্দ নয়। সে বলে—ও তো তোমার গাছ, ওরা খাবে কেন?

ব্রজগোপাল বলেন—তুই বড় কৃপণ মানুষ হবি তো! যা ব্যাটা, গিয়ে পেয়ারা পেড়ে ওদের সব হাতে হাতে দে। নিজে গাছে উঠবি না। বরং কালিপদকে বল, পেড়ে দেবে। কয়েকটা পাকা পেলে আমাকে এনে দিয়ে যাস, কলকাতায় যাব আজ, ওদের জন্য নিয়ে যাব।

এই বলে ব্রজগোপাল দা হাতে বেরিয়ে গোটা দুই মস্ত আখ কেটে আনেন। আগার পাতাটাতাগুলো ছাড়িয়ে ছোট ছোট টুকরো করে নেন। রসে টসটস করছে মিষ্টি লাঠি। তা শহুরে ছেলেরামেয়েরা এ সব তেমন পছন্দ করে না বেশি। অথচ ব্রজগোপালের যৌবন বয়সে এ সবই ছিল প্রিয়। ক্ষেত থেকে কাঁচা ছোলা গাছ থেকে এক ঝড় তুলে খোসা খুলে মুখে ফেলতে ফেলতে মাইল মাইল পার হয়ে গেছেন। এমনকী দণ্ডকলস গাছের ফুলের মধুটুকুও চুষে খেতে কত ভালবাসতেন। দেশ মাটির সঙ্গে ওইরকমভাবে বাঁধা পড়ে যেতেন গভীর মায়ায়। কলকাতায় বড় হওয়া তার ছেলেপুলেরা জীবনের এ সব মজা কখনও উপভোগ করেনি, কিছুটা করেছিল কেবল রণেন। গাছের ফুটি কিংবা মাদারফল, পানিফল কতবার দিয়ে এসেছেন কলকাতার বাসায়। কেউ খায়নি, পচে ফেলা গেছে। এই সরস আখের স্বাদও ওরা বুঝবে কি?

না বুঝুক, তবু নিজের হাতে করা এই সব ফলপাকুড় প্রিয়জনদের কাছে পৌঁছে না দিয়েও পারেন না তিনি। দেওয়া নিয়ে কথা। ওরা যদি ফেলে দেয় তো দেবে।

ষষ্ঠীচরণ আর তার বাপ বিশাল ধামা ভরতি রাজ্যের পেয়ারা নিয়ে আসতেই ব্রজগোপাল রেগে উঠে বলেন—গাছশুদ্ধ পেড়ে নিয়ে এলি নাকি বোকারা?

—তাই তো বলেছেন শুনলাম। কালিপদ মাথা চুলকে বলে।

—দূর ব্যাটা! পাখিপক্ষীর জন্যও তো কিছু রাখতে হয় গাছে, না কি! তোরা বড় স্বার্থপর হয়েছিস, সব কেবল নিজে দখলাতে চাস। এরকম কৃপণ হলে তোদের সব বাড়িঘরে আর পাখিটাখিও আসতে চাইবে না, ভূতের বাড়ি হবে সব। যা, সবাইকে বিলি করে দে। আমি এত নিয়ে কী করব, গুটি দশেক বেছেছে রেখে যা। যাদের জন্য নিয়ে যাই তারা এ সব আদর করে খাবে কিনা কে জানে!

ব্রজগোপাল পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে তৈরি হচ্ছিলেন। সেদ্ধ ভাত খেয়ে নিয়েছেন এক চিমটি। হাতেকাচা পরিষ্কার ধুতি পরেছেন, ফতুয়ার ওপর পাঞ্জাবিটা চাপাবেন কেবল, এই সময়ে বহেরু এসে রাগারাগি শুরু করল—কর্তা, এই শরীর নিয়ে বেরোচ্ছেন, ভালমন্দ কিছু হলে তখন সবাই বলবে, বহেরু কর্তাকে দেখেনি। এই তো সেদিনও বুকের ব্যথাটা উঠল আপনার।

সত্য বটে, কদিন আগেও ব্যথাটা উঠেছিল। সেদিনও শীলার ছেলের নামটা দিয়ে আসবেন বলে একটা পরিষ্কার কাগজের উপরে ঠাকুরের নাম লিখে, নাতির নামটা গোটা গোটা অক্ষরে মাঝখানে লিখেছিলেন। কোষ্ঠীর ছকটাও করেছিলেন সেই সঙ্গে। কোষ্ঠীপত্র তৈরি করতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে। ছকটা বিচার করেও একটু ভাবনায় পড়েছিলেন। নাতিটার ভবিষ্যৎ খারাপ নয়, কিন্তু ছবছর বয়স থেকে কেতুর দশা পড়বে, তখন ভোগাবে। এ সব বিষয়ে আগে থেকেই শীলাকে সতর্ক করে আসাও দরকার।

সেদিড়ও এরকম তৈরি হয়ে বেরোবার মুখে হঠাৎ যেন একখানা ভারী দৈত্যের হাত এসে বুকটাকে চেপে ধরল। সে কি শ্বাসকষ্ট, ব্যথা। সেই হাতটাই তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল বিছানায়। দিন চারেক উঠতে দেয়নি। যাদের কাছে কলকাতায় যাচ্ছেন, তারা জানেও না। জানার চেষ্টাও নেই।

ব্রজগোপাল একটু গম্ভীর হয়ে বলেন—শুয়ে মরার চেয়ে হেঁটে মরা ভাল। যা তো এখন, দিক করিস না। আমার কোনওখানে যাওয়ার নাম হলেই তোর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে।

বহেরু খুব কূট চক্ষে চেয়ে আছে। মনে মনে নানারকম প্যাচ কষছে, যাতে ব্রজঠাকুরকে আটকানো যায়, এটা ওর মুখ দেখেই বুঝতে পারেন ব্রজগোপাল। তবে চাষাড়ে মাথায় বেশি বুদ্ধি খেলে না। তাই কিছুক্ষণ ভেবে হাল ছেড়ে দিয়ে বলে—তবে যান, আমাদের ওপর তো আপনার মায়া নাই। মানুষ না কি আমরা!

ব্রজগোপাল মৃদু হাসেন। বহেরু অভিমান করে চলে যায়। অত বড় মানুষটার অভিমানী মুখ দেখলে মজা লাগে।

গাড়ির এখনও ঢের দেরি আছে। কদিন হল বহেরু একটা ঝকঝকে রিকশা কিনেছে। খুব বাহারি রিকশা। তার হুড-এ নানারকম রঙিন কাপড়ের ফ্রিল লাগান। বেলদার সাইনবোর্ড লিখিয়ে অম্বিকাচরণ নানা রঙের আঁকিবুকি নকশা করে দিয়েছে গায়ে। রিকশার পিছনে একটা আকাশের গায়ে বক উড়ে যাওয়ার ছবি এঁকে তলায় লিখে দিয়েছে—পথবান্ধব, বহেরু গ্রাম। সেই রিকশাটা এনে দরকারমতো ব্যবহার করে এখানকার লোকেরা, কে চালায় তার ঠিক নেই। কখনও কোকা বা কপিল, কখনও কোনও মুনিশ কিংবা কালিপদ।

আজকাল ওই রিকশাতেই স্টেশনে বেশ যাওয়া চলে। অবশ্য ব্রজগোপাল হাঁটতেই ভালবাসেন। কিন্তু বহেরু হাঁটতে দেয় না। ডাক্তারের বারণ।

কিছুক্ষণ বাদে রিকশাটা এসে দরজার সামনে ঘণ্টি মারে। মুনিশটা সিট থেকে নেমে এসে জানান দিয়ে যায় যে, রিকশা তৈরি আছে। ব্যাগ আর একটা পোটলা নিয়ে গিয়ে রিকশায় তুলে রাখে।

ঠাকুরের ছবির কাছে একটি সর্বাঙ্গীণ প্রণাম করলেন ব্রজগোপাল। প্রণাম রোজই করেন, কিন্তু প্রণাম কি আর রোজ হয়? মাথা নিচু হয় বটে, কিন্তু মনটা তার সর্বস্ব নিয়ে ওই পায়ে ঢেউয়ের মতো ভেঙে পড়ে না তো! দেহ প্রণাম করে তো মনটা আলগা আনমনা হয়ে সরে বসে থাকে। সংসারী মানুষের এ বড় বাধা। যদিও সংসার বলতে কিছুই নেই তাঁর। তবু মনের মধ্যে কেবলই এক সংসারের ছায়া ঢুকে বাস করে। কত কী চিন্তা আসে, কত উদ্বেগ, কত দখলসত্ত্ব, কত অভিমান ও ক্ষোভ আজও মনের মধ্যে ইঁদুরের গর্তের মতো রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়ে গেছে। সবাইকে পরিপূর্ণ ক্ষমা করে নেওয়া হল না আজও। এখনও কত পাওনাগণ্ডা যেন আদায় হয়নি, কত প্রতিশোধ নেওয়া হয়নি, কত ঋণ শোধ করেনি লোকে। এই সবই বাধা হয়ে দাঁড়ায়, পিছুটান প্রণামকে প্রণাম হতে দেয় না। আজ বহুকাল বাদে একটা সুন্দর প্রণাম হল। যখন মাথা নিচু করলেন তখন যেন তার সঙ্গে পূর্ণ জগৎটাও ঝুঁকে পড়ল ঠাকুরের পায়ের উপর। ঢেউ উঠে ভিজিয়ে দিল তাঁর পা।

যখন উঠলেন তখন দুই চোখে জল, মুখটা তৃপ্ত, মনটা বড় শান্ত ও উদাস। তুমি আজ প্রণাম নিয়েছ, সে তোমারই দয়া। ঠাকুর, আর কিছু না, রোজ যেন একবার আমার প্রণাম প্রণামের মতো হয়।

কপালের আড়াল থেকে ছোট্ট একটা মাথা সাবধানে উঁকি দিচ্ছে।

উদার আনন্দে ব্রজগোপাল ডাকলেন—কে রে, ষষ্ঠী? আয়।

—না। আমি মতিরাম।

এই বলে বামন মতিরাম ঘরে ঢোকে। মুখটা বিষন্ন। ওকে ঠিক এরকম গম্ভীর মুখে মানায় না সব সময়ে ফষ্টিনষ্টি ইয়ারকি করে, তাই ওটাই ওর স্বাভাবিক ব্যাপার।

—কী গো মতিরাম? বলো।

—আমাকে কলকাতায় নিয়ে যাবেন ব্রজকর্তা? আমি পালাব।

—সে কী?

—বড় মারে এরা। কালও কপিল লাথি মেরেছে। তাদের কেবল ওই কথা, চলে যা, বসে খেতে পারবি না। আমি খাই কতটুকু ব্রজকর্তা? পেটটা দেখুন না, কতটুকু।

—তাই পালাবি? বহেরুকে বলগে যা না।

—ও বাবা, সে বড় কড়া মনিব। তার ওপর ছেলেদের ভয় খায়। আপনি রিকশায় যান, আমি বেলদার বাজার পর্যন্ত ছুটে চলে যাব, সেখানে আমাকে রিকশায় তুলে নেবেন। কলকাতার রাস্তায় ছেড়ে দেবেন। ঠিক পেট চালিয়ে নেব। কলকাতার লোকে মজা দেখতে ভালবাসে।

—বহেরু শুনলে রাগ করবে।

—করুক রাগ। তখন তো আমাকে খুঁজে পাবে না

ব্রজগোপালের মনটা খারাপ হয়ে যায়। ডাকাত বহেরুরও একটা গৃহস্থ মন ছিল। সে কাউকে ফেলত না। তার সময় শেষ হয়ে গেছে। এখন যারা তার জায়গায় দখল নিচ্ছে তারা লম্বায় চওড়ায় কম নয়, কিন্তু

মনুষ্যত্বে ওই মতিরামের মতোই বামন।

ব্রজগোপাল বললেন—যাবি তো চল।

—একগাল হেসে মতিরাম চলে যায়।

ব্রজগোপাল ঘড়ি দেখে রিকশায় উঠতে গিয়ে দেখেন বহেরু সাজগোজ করে এসেছে। গায়ে পিরান, পরনে পরিষ্কার ধুতি, পায়ে একটা দেশি মুচির তৈরি চটিও। ব্রজগোপাল উঠতেই সেও উঠে রিকশার পা রাখার জায়গায় ব্রজগোপালের পা ঘেঁষে বসে পড়ে বলল— চলুন আমিও যাচ্ছি। একা আপনাকে ছাড়ব না।

॥ উনসত্তর ॥

একটা দানোর মতো বিশাল বহেরু উবু হয়ে পায়ের কাছে বসে আছে। এবড়ো-থেবড়ো রাস্তায় রিকশাটা জোর ঝাকুনি দিচ্ছে মাঝে মাঝে, বহেরু গাড়োয়ান যেমন তার গরুর গাড়ির গরুকে ধমকায়, ঠিক তেমনই ধমক মারে রিকশাঅলাকে'—র', র', হেই!

মুনিশটা রিকশা চালাচ্ছে, সে তেমন পাকা লোক নয়। রাস্তাটা খারাপ। বর্ষার পর রাস্তার খানাখন্দ সব বেরিয়ে পড়েছে। কবে যে কে এ রাস্তা মেরামত করবে তার ঠিক নেই।

বহেরু মুখটা তুলে ব্রজগোপালের দিকে চেয়ে বলে—বহুকাল কলকাতায় যাই না।

ব্রজগোপাল ভ্রুকুটি করে বলেন—যাওয়ার দরকারটা কী ছিল?

—সেখানকার মচ্ছবটা দেখে আসি একটু। কালিমায়ের মন্দিরেও যাব। মাথাটা ঠুকে দিয়ে আসি। বহুকাল যাই না।

ব্রজগোপালের অবশ্য অন্য চিন্তা। মতিরাম বলেছিল বেলদার বাজারের কাছে এসে রিকশায় উঠবে। একটু কষ্ট হল ব্রজগোপালের। বহেরুকে দেখলে ভড়কে যাবে মতিরাম। বেঁটে মানুষ বলে তাকে কেউ পাত্তা দেয় না, ছেলেছোকরারা পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে গাঁট্টা মারে, খামোখা চড় চাপড় দেয়। ওসবই মজা। কিন্তু মতিরামের জীবনটা এইসব মজায় তিতিবিরক্ত হয়ে গেছে। এখন আবার দোটানায় পড়ে বেচারার প্রায় যায়। বহেরু তাকে রাখে। তো ছেলেরা তাড়াতে চায়। তা আজ বোধ হয় মতিরামের পালানো হল না।

ওই সামনে বেলদার বাজারের বড় বটগাছটা দেখা যাচ্ছে।

ব্রজগোপাল বলেন—গাড়ির দেরি আছে নাকি রে?

বহেরু বলে—অনেক দেরি।

বটগাছের কাছে মুনিশটা রিকশা থামিয়া গামছা ঘুরিয়ে হাওয়া খায়। রিকশা চালিয়ে অভ্যাস নেই। হেদিয়ে গেছে। বলে—একটু চা মেরে আসি। গাড়ির দেরি আছে। বসেন!

বহেরু নেমে পড়েছে। ময়লা ধুতির ওপর ফরসা পিরানে তার চেহারায় পেঁয়ো ভ.বটা ফুটে উঠেছে। বলল—এই ঝ্যাঁকোর-ম্যাকোর করে রিকশায় আসতে মাজাটা ধরে গেল। হাঁটাচলা না করলে জুৎ পাচ্ছি না।

গাঁ-গঞ্জের লোকের স্বভাবই এই, কোথাও যাওয়ার তাড়া থাকে না, রাস্তায়-ঘাটে দশবার জিরোয়, দশবার চেনা লোকের খবর করে।

ব্রজগোপাল বিরক্ত হয়ে বলেন—মুনিশটাকে তাড়া দে। নইলে ঠিক গাড়ি ফেল করাবে। তারপর ঘণ্টাভর বসে থাকো পরের গাড়ির জন্য।

বহেরু হুমহাম করতে করতে মুনিশকে তাড়া দিতে গেল। ব্রজগোপাল জানেন বহেরু এখন বাজারের বিস্তর লোকের খবর করবে, বিষয়কর্মের ধান্ধা মেটাবে, তারপর আসবে।

ব্রজগোপালও রিকশা থেকে নেমে পড়েন। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রী বুড়ো রাম কবিরাজ বলেছিল গোলমরিচ দিয়ে একটা পেটের অসুখের ওষুধ তৈরি করে দেবে। বাজারের পশ্চিম ধারে তার একটা টিমটিমে দোকানঘর আছে।

একটা গোরুর গাড়ি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে সামনেই। গরু দুটো গাছের সঙ্গে বাঁধা। গাড়িটা পেরিয়ে যাচ্ছিলেন ব্রজগোপাল। হঠাৎ শুনলেন মতিরামের গলা—ব্রজকর্তা!

ব্রজগোপাল একটু চমকে চারদিকে তাকালেন। দেখতে পেলেন না। বেঁটে মানুষ, কোথায় কোন আড়ালে পড়ে গেছে?

বললেন—সামনে এসো, অত ভয়ের কী?

গরুর গাড়ির চাকার আড়ালে দাঁড়িয়েছিল মতিরাম, ডাক শুনে বেরিয়ে এল। তার মুখ ঘামে জবজবে। একটু কেমনধারা কষ্টের হাসি হাসছে।

বলল—রিকশায় বহেরুকে দেখে ঘাবড়ে লুকিয়ে পড়লাম।

ব্রজগোপাল বললেন—বরং ফিরে যাও মতিরাম। মাথা ঠান্ডা করে ভাবো গে যাও। পরে না হয় বলেকয়ে যেও। পালিয়ে গেলে লোকে নানা সন্দেহ করে। তার ওপর ধরো যদি কোনও জিনিসপত্র বা টাকা পয়সা এধার-ওধার হয় তো তোমাকে চোর বলে সন্দেহ করবে। তারচেয়ে আমিই বরং বহেরুকে বলবখন, সে তোমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেবে।

মতিরাম কোমরে হাত রেখে দাড়িয়ে থাকে অসহায়ভাবে। তারপর উবু হয়ে বসে পায়ের একটা ফাটা আঙুলের ক্ষতটা নিবিষ্টভাবে দেখার চেষ্টা করে বলে—দৌড়ে এসেছি। কোথায় যে হোঁচট খেয়ে চোটটা লাগল, বুঝতে পারলাম না। এখন ব্যথা করছে বড়।

এই বলে রাস্তার ধুলো তুলে ক্ষতে চাপা দিচ্ছিল।

ব্রজগোপাল ধমক দিয়ে বললেন—ওটা কী করছ। বিষিয়ে যাবে যে!

—ধ্যৎ! ব্রজকর্তা কিছু জানেন না। ধুলোর মতো ওষুধ নেই। যখনই কাটবে একটু ধুলো চাপান দিয়ে দেখবেন, একদম ফরসা।

ব্রজগোপাল আর কিছু বলেন না। যার যেমন বিশ্রাম।

মতিরাম খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কয়েক পা হেঁটে দেখল। বলল—একটা রিকশা হলে চলে যেতে পারতাম। এ পা নিয়ে কি হঁটা যায়!

রিকশা তো আছেই, ফিরতি পথে তোমাকে নিয়ে যাবেন, আমি বলে দেব।

মতিরাম হাসে—ব্রজকর্তার যেমন কথা। নিয়ে যাবে কি! বললে এমনিতে না করবে না। কিন্তু মুনিশ ব্যাটাদের আমাকে দেখলেই নানারকম মজা চিড়বিড়িয়ে ওঠে। ঠিক মাঝপথে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে। নয়তো এই বেলদার বাজারেই লোক জড়ো করে আমাকে বাঁদর নাচ নাচাবে। তার ওপর বহেরু যদি টের পায় যে পালিয়ে এসেছি তো বড্ড রেগে যাবে। রিকশায় কাজ নেই ব্রজকর্তা, হেঁটেই মেরে দেব।

এই বলে মতিরাম কোথায় যেন লুকিয়ে পড়ল সট করে। ব্রজগোপাল দেখলেন বহেরু আটাচাক্কির দোকান থেকে বেরিয়ে আসছে। মুনিশটাও রিকশার ভেঁপু বাজাচ্ছে প্যাঁ প্যাঁ করে।বহেরু বলল—কর্তা, সময় গড়িয়ে গেছে, গাড়ি এল বলে।

ভিড়ের গাড়ি। অফিসের লেক ঠেসেটুসে উঠেছে। তার মধ্যেই বহেরু একটা চেনা লোক পেয়ে হেঁকে বলল —ওঠো তো কালাচাঁদ, উঠে এই বুড়ো মানুষটাকে বসতে দাও। ব্রাহ্মণ মানুষ দাঁড়িয়ে যাবেন নাকি!

কালাচাঁদ নামে লোকটি তাড়াতাড়ি উঠে ব্রজগোপালকে সত্যিই জায়গা ছেড়ে দেয়।

ব্রজগোপাল লজ্জা পান, বিরক্তও হন, বলেন—তোর যত গা-জোয়ারি ব্যাপার বহেরু। লোকটাকে ওঠালি, দরকারটা কী ছিল?

—না না, ও দাঁড়িয়ে যাবেন আমার সঙ্গে গল্পগাছা করতে করতে। আপনি বুড়ো মানুষ। ব্রজগোপাল হেসে ফেলেন। বলেন—বয়েস কি তোরই কম নাকি!

—চাষার আবার বয়েস! বলে বহেরু মাথা চুলকোয়।

সারাক্ষণ দরজার কাছে বসে ব্রজগোপালের চোখের আড়ালে ওরা গাঁজা টানল দুজনে। ব্রজগোপাল স্পষ্টই টের পেলেন। হাওড়ায় নেমে দেখেন, বহেরুর চোখ দুটো ভারী ঝলমল করছে, মুখখানা টসটসে। তার অর্থ বেশ নেশা হয়েছে।

—কোনদিকে যাবি? ব্রজগোপাল জিজ্ঞেস করেন।

—কালিমায়ের থানটাই আগে দেখে আসি।

বাইরে বেরিয়ে এসে বহেরু অবাক মানে।

বলে কর্তা, এ শহর যে থিক থিক করছে লোকে!

—হুঁ।

—ই বাবা, কতদিন, কতদিন পরে এলাম! তা এত পালটে গেছে বুঝব কী করে! সবই অন্যরকম লাগছে।

বাসে উঠবার হুড়োহুড়ি চলছে। একটা বাস চলে গেল। আর নেই। লোকজন হাপিত্যেশ করে দাড়িয়ে আছে।।

—এত গুঁতোগুঁতি আপনার সইবে না কর্তা, চলুন হেঁটে মেরে দিই। কতদূর আর হবে!

ডালহৌসি পর্যন্ত হেঁটেই এলেন ব্রজগোপাল বহেরুর সঙ্গে। সেখান থেকে বাসে উঠে কালিঘাট পর্যন্ত একসঙ্গে। বহেরু নেমে যাওয়ার আগে বলল—ছটা পাঁচের ট্রেনে থাকব কিন্তু কর্তা।

ব্রজগোপাল স্নিগ্ধস্বরে বলেন—আচ্ছা। দুপুরে কোথাও দুটি খেয়ে নিস।

বেশ লাগছে। শরৎকালটা বেশ সুন্দর গোবিন্দপুরের তুলনায় কলকাতায় একটু গরম বেশি। তা হোক, তবু এই বর্ষার ভারী চমৎকার লাগে চারদিক। মনটাও ভাল, কারণ এখন আর কারও কাছে কোনও প্রত্যাশা নেই।

ঢাকুরিয়ার বাড়িতে পা দিয়েই কিন্তু বড় থতমত খেয়ে গেলেন ব্রজগোপাল। দরজা খুললেন ননীবালা নিজেই। খুলে বিষন্ন অদ্ভুত একটা মুখ বের করে খুব অবাক হয়ে দেখলেন ব্রজগোপালকে। চিরকালের সেই বড় বড় টানা চোখ ননীবালার, এই চোখই পেয়েছে সোমেন। এই বুড়ো বয়সেও ননীবালার চোখ দেখলে মন জুড়িয়ে যায়।

কিন্তু সেই বড় বড় চোখ দুটো হঠাৎ জলে ভরে টসটস করছিল। ননীবালা আঁচলে আড়াল করলেন মুখ। কথা বলতে পারলেন না। একবার কেবল ফুপিয়ে উঠলেন।

বুক কাঁপছিল। তবু ব্রজগোপাল গুলা ঝেড়ে বলেন—কী হল?

॥ সত্তর ॥

এ ঠিক একমুহূর্তের কান্না নয়। ননীবালা বহুকাল আগে তাঁর ছেলেবেলায় হাজারিবাগের ওদিক বেড়াতে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে একটা কুণ্ড দেখেছিলেন। পাথরের ভিতরে গর্তমতো, নানা ফাটল দিয়ে চুইয়ে জল বয়ে এসে সেইখানে জমছে নিরন্তর। ননীবালারও তাই। সংসারের কত ফাটা ভাঙা গুপ্তপথ দিয়ে কান্না চুইয়ে এসে বুক ভরে রাখে। ব্রজগোপালের হঠাৎ দেখা পেয়ে সেই কান্নাটাই বেরিয়ে এল।

আজ কেউ বাড়িতে নেই। সকালেই ছেলেমেয়ে নিয়ে রণেন আর বীণা গেছে দক্ষিণেশ্বরে। সোমেনও এ সময়ে বাড়ি থাকে না। ননীবালা একা। সেই একা থাকার মধ্যে হঠাৎ পর মানুষটা এল। বুকটা ভার হয়েই ছিল, ব্রজগোপালকে দেখে সেই ভারটা নড়ে উঠল, ফুলিয়ে তুলল বুক।

দরজা ছেড়ে ভিতরে পিছিয়ে এসে ননীবালা বললেন—এস।

ব্রজগোপাল ইতস্তত করেন। বুকটা বেসামাল লাগে। ননীবালা কঁদছে কেন? কোনও খারাপ খবর নেই তো? রণেন, সোমেন, শীলা, ইলা নাতিনাতনিরা সব ভাল আছে তো?

গলাখাঁকারি দিয়ে ব্রজগোপাল বলেন—খবরটবর কী?

—এস, বলছি।

ব্রজগোপাল ঘরে এলে ননীবালা দরজা বন্ধ করে দেন।

ব্রজগোপাল শূন্য বাসার নির্জনতা আর স্তব্ধতা টের পান। ভয় লাগে। সবাই ঠিকঠাক আছে তো! সংসারী মানুষের বুকে মায়ার পাথার দিয়ে রেখেছেন ঠাকুর। এত যে ছেড়ে থাকেন তবু ভুল পড়ে না। বিশ্বসংসারকে আপন করতে পারা সোজা নয়, তেমনি শক্ত নিজের জনকে পর করা। এ বড় ধন্ধ।।

—খারাপ খবর নেই তো!

ননীবালা হঠাৎ উভরে বলেন—খারাপ নয় তো কী? ভাল খবর আসবে কোত্থেকে?

ব্রজগোপাল ধুতির খুঁটে মুখের ঘাম মুছে হাতের বোঝা নামিয়ে বলেন—ভাল আর কী হবে? ভাল চাই না, খারাপ কিছু না হলেই হল। সংসারী মানুষের তো ওই সারাক্ষণ ভয়, ভাল না হোক খারাপও যেন কিছু না হয়।

ননীবালা বলেন—তুমি আবার সংসারী নাকি!

ব্রজগোপাল মাথা নেড়ে বলেন—ভেক বোঝা যায় না। কিন্তু আমিও যেমন জানি তুমিও তেমনি জানো, আমার মায়াদয়া ঠাকুর কম দেননি। তোমাদের শান্তির অভাব হবে বুঝেই আমি বেড়াল-পার হয়েছি। এসব তো কেউ বুঝবে না।

ব্রজগোপাল বাইরের ঘরের সোফাটায় বসতে যাচ্ছিলেন, ননীবালা বললেন—ওখানে বসছ কেন? ঘরে এস। আমার ঘরে।।

—এই তো বেশ। দুটো কথা বলে চলে যাব।

ননীবালা ঝংকার দিয়ে বলেন—কেন, বাইরের লোক নাকি যে বাইরের ঘরে বসে দুটো কথা বলে চলে যাবে! কোনওদিন তো অন্দরমহলে ঢোকো না। বাইরে থেকে বুঝে যাও যে আমরা খুব ভাল আছি।

—তা ভাবি না। স্মিত হেসে ব্রজগোপাল বলেন—দেশকালের যা অবস্থা তাতে ভাল কেই বা আছে। সবাই বাইরেটা চকচকে রাখার চেষ্টা করে, তবু ঢাকতে পারে না। তুমিও পারোনি।।

ননীবালা অবাক হয়ে বলেন—কী পারিনি?

—ননীবউ, তুমি ছেলেদের কাছে বড় আদরে সম্মানে আছো, এটাই আমাকে বোঝাতে চেয়েছিলে বরাবর। কিন্তু আমি বরাবরই টের পেয়েছি, তুমি নিজেকে ধোঁকা দিচ্ছো। তাই কি হয়! মা-বাপকে ছেলেমেয়েরা কবে আর বুঝতে শিখল! মা বাপের মনের মধ্যে কত মান-অভিমান জমা থাকে, ওরা কী তা বোঝে! স্নেহ নিম্নগামী, বড় সত্য কথা। তুমি ওদের জন্য যতই করো ওরা তোমাকে কোনওদিন বুঝতে পারবে না। অভিমান করে লাভ নেই।

ননীবালা কী উত্তর দেবেন! সত্য কথার কী উত্তরই বা হয়। তিনি আবার হঠাৎ চোখে-আসা জল আঁচল চেপে সামলান। বলেন—দোষ কার বলো তো! কে আমাকে ছেলেদের সংসারে যুতে দিয়ে সরে গেল?

—সে কি আমি ননীবউ

—তুমি ছাড়া কে

ব্রজগোপাল বললেন—আমাকে এত বড় মানুষের সম্মান তো তুমি কোনওদিন দাওনি। আমি যে তোমার কেউ তা তো শেষ দিকটায় বুঝতেই পারতাম না। তুমি ছেলেপুলে, নাতিনাতনি নিয়ে দিনরাত ব্যস্ত ছিলে, সংসারে বুক দিয়ে পড়ে জমি তৈরি করছ, আমার দিকে মনোযোগ ছিল না। উপরন্তু ছেলেমেয়েদের কাছে আমার কত দোষের কথা বলে মন বিষিয়ে দিতে। মনে পড়ে?

ননীবালা স্তব্ধ হয়ে থাকেন। যেন ব্রজগোপাল যে সেসব কথা কখনও তুলবেন এটা তাঁর বিশ্বাস ছিল না।

ব্রজগোপাল বললেন-"ভালই করেছ। আমার ক্ষোভ নেই। কিন্তু আমি বাড়ি ছাড়া হয়ে যেমন বনবাসী, তুমি ঘরে থেকেও তেমনি বনবাসী। ছেলেরা বড় হলে মা-বাপ অপ্রয়োজন হয়, আর সেই বুঝে মা-বাপেরও অপ্রয়োজন হয়ে সরে আসা উচিত।

ননীবালা উম্মাভরে বলেন—আমার ছেলেরা সে রকম নয়।

—না, ছেলেরা বোধ হয় ভালই। ব্রজগোপাল বলেন—তবু বলি, বুড়ো বয়সের মা-বাপকে যদি ছেলেরা নিজের ছেলেমেয়ের মতো না দেখে তবে সংসারও বনবাস। ভাত-কাপড়টাই কি বড় কথা, মর্ম না বুঝলে ভাত কাপড় দিয়ে কী হবে!

ননীবালা শ্বাস ফেলে বলেন—ভিতরের ঘরে এস বোসো। ওভাবে বাইরের ঘর থেকে চলে যাও, ও আমার ভাল লাগে না।

ব্রজগোপাল উঠলেন।

ননীবালা ঘরে এসে নিজের বিছানাটা ঝেড়েঝুড়ে বসালেন ব্রজগোপালকে। বললেন— শরীরটা তো ভাল নেই দেখছি।

—না। ব্রজগোপাল বলেন—গত সপ্তাহেও ব্যথাটা উঠেছিল। নইলে তখন আসবার কথা।

—বুকের ব্যথাটা নাকি?

—হ্যাঁ।

—প্রায়ই হচ্ছে, চিন্তার কথা।

—ব্রজগোপাল শান্তস্বরে বলেন—ওটা ছাড়া আর কোনও উপসর্গ নেই।

—নেই কেন? এবার তো নিজের চোখে দেখে এলাম, খাওয়া অর্ধেকেরও কম হয়ে গেছে। অত কম খেলে চলে নাকি?

—নেই কেন? এবার তো নিজের চোখে দেখে এলাম, খাওয়া অর্ধেকেরও কম হয়ে গেছে। অত কম খেলে চলে নাকি?

—ওতেই বেশ থাকি।

—দুধ-টুধও তো পেটে পড়ে না। বহেরুর কত গরু!

ব্রজগোপাল হাসলেন—ওর মধ্যে আমারও আছে দুটো। হরিয়ানার দুটো গাই কিনেছিলাম দুহাজার টাকায়। দেখোনি, না?

—না! বলোনি তো!

—ভুলে গেছি হয়তো! বুড়ো বয়সে সব মনে থাকে না।

—তা সে গরুর দুধ খায় কে?

—বহেরু বেচে দেয়, কিছু আমাকেও দিয়ে যায়।

ননীবালা আবার একটা শ্বাস ফেলে বলেন—সবই তো করলে, কিন্তু ভোগ-দখল যে কে করবে!

—কে আর করবে! যেই করুক, ভাবব যে আমার আপনজনই করছে। দুনিয়ার কেউ পর নয়।

ননীবালা মেঝেয় বসে চৌকির তলা থেকে সুটকেস টেনে বের করে সযত্নে ধুলোটুলো ন্যাকড়া দিয়ে মুছছিলেন। ব্রজগোপাল বসে আছেন চৌকির ওপর। আড়চোখে দেখলেন।

ননীবালা ডালা খুলে টুকিটাকি জিনিসপত্র বের করে রাখলেন। ট্রাঙ্ক খুলে শাড়ি সেমিজ বের করে থাক করতে থাকেন বিছানায়। কাজকর্ম করতে করতেই বললেন—আর মন টিকছে না।

—কোথায়?

—এখানে।

—কেন? সবিস্ময়ে ব্রজগোপাল বলেন।

—বঝতেই তো পারো। এতকাল গতর পাত করে দিলাম যাদের জন্য তারা মা বলে ভাল করে ডাকে না পর্যন্ত। বউমা এমন কথাও বলে, রণো যে পাগল হল সে নাকি আমার জন্যই। ছোট ছেলেও কত কথা শোনায়! এখন শুনছি, সে নাকি আমেরিকা না কোথায় চলে যাবে।

ব্রজগোপাল চমকে উঠে বলেন—তাই নাকি?

—বলছে তো। ভাল করে জিজ্ঞেস করিনি কেন যাবে। করলে হয়তো বলবে, আমার জন্যই সংসারে অশান্তি, তাই পালাতে চাইছে।

ব্রজগোপাল করুণাভরে বলেন—এখন তবে কী করবে?

—তোমার মতো বেড়াল-পার হব।

—তার মানে?

—ননীবালা একটা গভীর শ্বাস ছেড়ে বলেন—শেষ পর্যন্ত মেয়েমানুষের জায়গা কোথায় তা কি জানো না?

—জানি। সেটা কি বুঝতে পেরেছ ননীবউ?

—না বুঝে যাব কোথায়? দুরমুশ দিয়ে ঘাঁচা ঘাঁচা করে সংসার জানিয়ে দিচ্ছে। তা ছাড়া—

বলে থামেন ননীবালা।

ব্রজগোপাল উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকান।

ননীবালা ম্লান হাসি আর চোখের জলে উজ্জ্বল একরকম অদ্ভুত মুখে চেয়ে বলেন— তোমার জন্যও তো কিছু করিনি। খুব স্বাবলম্বী মানুষ হয়েছ, দেখে এসেছি। তবু আমি বেঁচে থাকতে তুমি নিজের হাতে রাঁধলে বাড়লে, কাপড় কাচলে আমি যে পাপের তলায় পড়ি।

॥ একাত্তর ॥

ছেলেটা সারাদিন ঘুমোয়। আর ঘুমের মধ্যে কখনও-সখনও গাল ভরে হাসে, কখনও ভ্রূ কুঁচকে কান্না কান্না মুখভাব করে।

শীলা বলে—ওদের পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে, জানো!

কথাটা অবিশ্বাস করতে পারে না অজিত। সে যদিও পূর্বজন্ম মানে না, তবু এখন তার মনে হয়—হবেও বা। নইলে একমাসও পুরো বয়স হয়নি যে শিশুর সে অমন চমৎকার ঘুম-হাসি হাসে কী করে! আধখানা ঠোটে বেশ একটু শ্লেষ বা বিদ্রুপের হাসি।

অজিত যেটুকু সময় পায় বিছানার পাশে বসে থাকে। এই এতদিনে সে নিজস্ব একটা মানুষের জন্ম দিতে পারল। নিজস্ব মানুষ, ছেলে। তারই অন্তর্গত বীজ থেকে প্রাণ পেয়ে শীলার জঠর বেয়ে এসেছে। কি সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড! ভাবতে বসলে থই পাওয়া যায় না। তার ভিতরে ছিল, শীলার ভিতরে ছিল! তাদেরই রক্ত মাংস প্রাণ থেকে, ঠিক যেমন একটা আগুনের শিখা থেকে আর একটা ধরিয়ে নেওয়া, সেরকম।

শীলা আজকাল হাঁটাচলা করে অল্পস্বল্প। এ-ঘর ও-ঘর করে। নতুন একটা রান্নার মেয়েছেলে রাখা হয়েছে, বাচ্চা ঝিটা সারাদিন বাচ্চার খিদমদগারী করে।

ছেলের নাম রাখার জন্য একটা পৌরাণিক অভিধান কিনে এনে কদিন ধরে ঘাঁটছে অজিত। রামায়ণ মহাভারত আর পুরাণ যা পাচ্ছে কিনে আনছে। কোনও নামই পছন্দ হচ্ছে না।বই রেখে কখনও ছেলের মুঠো পাকানো ঘুমন্ত হাত দুখানার দিকে চেয়ে থেকে বলে— ব্যাটা বক্সার হবে নাকি শীলা? সব সময়ে ঘুষি পাকিয়ে থাকে কেন?

শীলা বলে—গুন্ডার ছেলে গুন্ডাই হওয়ার কথা।

—আমি গুন্ডা?

—গুন্ডাই তো। যা গুন্ডামিটা করো আমার সঙ্গে!

অজিত দাঁতে ঠোঁট কামড়ে বলে—ছেলেটা খুব চিন্তাশীল বলেও মনে হয়। ভ্রূ কুঁচকে কী ভাবে বলো তো সবসময়ে?

শীলা ধমক দিয়ে বলে—সব সময়ে অত চেয়ে থেকো না তো! বাপ-মায়ের নজর খুব খারাপ। মা-ও সেদিন আমাকে বলে গেছেন, জামাই অত ছেলের দিকে চেয়ে থাকে কেন রে! ও সব ভাল নয়।

ছেলেটার গা থেকে পাতলা চামড়া উঠছে। তালুতে আর গায়ে চুপচুপে করে তেল মাখাননা। ঘানির সর্ষের তেল টিন ভরে কিনে এনে রেখেছে অজিত। ইটালিয়ান অলিভ অয়েলও। যে যা বলছে কিনে আনছে।

শীলা বলে—আদেখলা।

অজিত বলে— তুমিও কম কী?

দুজনেই তারপর হাসে।

ঘুমের মধ্যেই বাচ্চাটা দুধ খায়, ঘুমের মধ্যেই কাঁথা ভেজায় দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার, ঘুমের মধ্যেই চমকে চমকে ওঠে।

অজিত বিরক্ত হয়ে বলে—ও এত ঘুমোয় কেন?

শীলা বলে—চুপ চুপ। বাচ্চারা যত ঘুমোয় ততই ভাল। দশমাস ধরে পেটের মধ্যে যা ফুটবল খেলেছে তোমার গুন্ডা ছেলে, ঘুমোবে না?

একটা হালকা বালিশ বুকের ওপর চাপিয়ে রাখে শীলা। অজিত ভয় পেয়ে বলে— সাফোকেশন হবে যে!

—না গো, ভার রাখলে আর চমকায় না।

অজিত ছেলেটার শব্দ শুনতে চায়, হাসি কান্না কথা বা যেমন হোক শব্দ। কিন্তু অত ঘুম বলে বাড়িটা নিস্তব্ধ থাকে। বাচ্চাটা কাঁদেও কম। যতটুকু সময় জেগে থাকে ততটুকু সময় ধরে অল্প অল্প হাত পা নাড়ে। ভাল করে কোনও কিছুর দিকে তাকাতে পারে না। কী ভীষণ অসহায়! এসব ভাবলে বুকের মধ্যে মায়া চলকে চলকে ওঠে। প্রতিদিন ভয়ংকর প্লাবনের মতো বুক ভাসিয়ে দিয়ে মায়ার জল বাড়ে। পিপাসা বাড়ে। এই তার ছেলে, তার আপন মানুষ। তার সৃষ্ট।

সৃষ্ট? না, তা তো নয়। অজিত ভ্রু কুঁচকে ভাবতে বসে। এই ছেলেটার জন্মরহস্যটুকুই মাত্র সে জানে। জানে, সে এর জন্মের কারণ। কিন্তু ওর ওই ছোট্ট শরীরের লক্ষ কলকব্জা, ওর চেতনা ও প্রাণ—এ তো তার সৃষ্টি নয়। তাকে দিয়ে কে যেন ওকে সৃষ্টি করেছে। যে করেছে সে কে? ঈশ্বর?

—শোনো শীলা।

—উঁ।

—জায়া মানে জানো?

—জানি। বউ।

—দূর! হল না।

—তবে কী?

—জায়া মানে যার ভিতর দিয়ে পুরুষ আবার জন্মায়। এই যেমন আমি তোমার ভিতর দিয়ে ওই ছেলেটো হয়ে জন্মেছি।

—ও।

এইসব অদ্ভুত রহস্য ক্রমে ধরা পড়ছে অজিতের কাছে। সে আজকাল অল্পস্বল্প টের পায় যে, বাস্তবতার অতিরিক্ত একটা শক্তির অস্তিত্ব আছে। সে শক্তিই হয়তো প্রকৃতি বা ঈশ্বর।

কদিন আগে ছেলেটা খুব হচত। ভয় পেয়ে গিয়েছিল অজিত। খুব শিশুদের সর্দি হলে বাঁচানো মুশকিল। ওরা তো শ্লেষ্ম তুলতে পারে না, দম আটকে মরেটরে যেতে পারে। শিশুদের সর্দি বড় ভয়ের।

তাই ছেলের হাঁচি দেখে অজিত উদ্বিগ্ন হয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠেছিল—হায় ভগবান! ওর যে সর্দি হয়েছে।

লক্ষ্মণ ঘরে বসেছিল। বলল—দূর বোকা, ও সর্দি নয়। সদ্য হয়েছে তো, ওদের বুকে গলায় নানারকম কনজেশন থাকে। হাঁচি দিয়ে বের করে দেয়।

অজিত রুখে বলল—তুই জানলি কী করে? তোর কখনও ছেলে হয়েছে?

—ওসব বুঝতে কমন সেন্স যথেষ্ট।

পরে অজিত জেনেছে, লক্ষ্মণের কথাই ঠিক। লক্ষ্মণের কমন সেন্স বরাবরই অদ্ভুত। মানুষকে অনেক ভয়-ভীতি থেকে মুক্তি দিতে পারে লক্ষ্মণ। অজিতকে বরাবর দিয়েছে।

ছেলেটার গায়ে একটা অদ্ভুত আঁতুড়ের গন্ধ। এত মিষ্টি গন্ধ আর কখনও পায়নি অজিত। প্রায়ই সে ছেলের শরীরে নাক ডুবিয়ে বুক ভরে গন্ধ নেয়। আর খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে ওর গা। তেল চোবানো বলে ছেলেটার গলার খাঁজে ময়লা, মুঠো খুললে হাতের রেখায় রেখায় ময়লা জমে থাকতে দেখা যায়। প্রায়দিনই ওকে স্নান করানো হয় না। শীলা গ্যাদড়া বাচ্চাকে নাড়াচাড়া করতে ভয় পায়। দু-চারদিন পর পর ননীবালা আসেন, রোদ্দুরে নিয়ে গিয়ে গরমজলে স্নান করান। দৃশ্যটা ভয়াবহ। এক হাতের চেটোয় বাচ্চাটাকে অনায়াসে ধরে থাকেন, বাচ্চাটা ন্যাতার মতো বেঁকে ঝলে কাদতে থাকে, অন্য হাতে গামছায় জল নিয়ে ওর শরীর ঘষতে ঘষতে ননীবালা নাতির উদ্দেশ্যে কত যে কথা বলেন। স্নান করিয়ে পাউডার আর কাজল দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে যান।

অনেকদিন স্নান হয়নি বাচ্চাটার। ননীবালাকে একটু খবর দিতে হবে।

লক্ষ্মণ দিন দশেক ধরে মুম্বই আর দিল্লি ঘুরে এল। একবছরের মধ্যেই ও পাকাপাকিভাবে দেশে ফিরে আসতে চায়। সেটা ঠিক করে যাওয়ার জন্যই এবার এসেছে।

দিল্লি থেকে ফিরে একদিন ম্লান মুখে এসে বললে—অজিত, বড় মুশকিলে পড়ে গেলাম।

কীরে?

ভাবছিলাম, এ দেশে একটা চাকরি বা পজিশন পেলে ফিরে আসব। কিন্তু পাচ্ছি না।

—কেন?

—আমার লাইনের বেশি প্রজেক্ট তো এখানে হয়নি। যা দু-চারটে আছে সেখানে সব উপযুক্ত লোক রয়েছে। তাই ভাল পজিশন পাচ্ছি না।

—তা হলে?

—মুশকিল হল। এরকম হলে ফিরে আসা শক্ত। ওখানে আমার মাইনেই শুধু বেশি নয়, কাজ করারও অঢেল সুযোগ। কী করি বল তো!

—কী করবি?

—আমি তো চলে আসতেই চাই। কিন্তু মোটামুটি একটু ভাল জায়গা না পেলে চলবে কী করে? ওখানে আমি অনায়াসে সিটিজেনশিপ পেয়ে যেতে পারি এখন। ইচ্ছে করেই নিইনি। কিন্তু যদি এখানে কিছু মেটেরিয়ালাইজ না করে তবে বাধ্য হয়ে এবার সেটা নিয়ে ওখানেই থেকে যেতে হবে।

—যাঃ

খুব মন খারাপ হয়ে যায় অজিতের। লক্ষ্মণ আশা দিয়েছিল যে ও ফিরে আসবে। সেটা একটা মস্ত জিনিস অজিতের কাছে। লক্ষ্মণ নিজেও বুঝি জানে না যে ও অজিতের কী ভীষণ প্রিয় ও আপন।

লক্ষ্মণ, এ কিছুতেই হতে পারে না। আমি ভীষণ লোনলি ফিল করি।

লক্ষ্মণ হেসে বলে—জানি।

—তোকে আসতেই হবে।

—আমিও তো চাই। কিন্তু পারছি না যে।

—লক্ষ্মণ প্লিজ! অজিত ভীষণ অস্থির হয়ে বলে।

॥ বাহাত্তর ॥

ননীবালা কেন স্যুটকেস গোছাচ্ছেন তা অনুমান করতে ভয় পাচ্ছিলেন ব্রজগোপাল। নিপাট ভালমানুষের মতো বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে করে বললেন—শোনো, এখন বয়স হয়েছে। তোমারও আমারও।

ননীবালা মুখ তুলে বলেন—সে তো জানি। বলছ কেন?

—এখন হুট করে কিছু করতে নেই, দৃষ্টিকটু দেখায়।

ননীবালা একটু শ্বাস ছাড়লেন। স্যুটকেস যেমন গোছাচ্ছিলেন তেমনই গোছাতে লাগলেন। বললেন—হুট করে নয়। অনেকদিন ধরেই এটা ভেবে আসছি। আজকাল আর মন টেকে না এখানে। ছেলেপুলে নাতিনাতনি সব থেকেও কেমন হাঁফ ধরে যায়। মনে হয় আমি বুঝি বাড়তি মানুষ।

ব্রজগোপাল ধীরগম্ভীর স্বরে বলেন—সে তো ঠিকই। তবু এমন কিছু করো না যাতে ওদের সামনে একটা কু-দৃষ্টান্ত থাকে। সংসারে সবসময়েই সব কাজেরই নিন্দে হয়।

ননীবালা তাঁর বিখ্যাত বড় বড় চোখে অপলক চেয়ে রইলেন ব্রজগোপালের দিকে। তারপর আস্তে করে বলেন—আমাকে বোকা ভাবছ!না? ভাবছ আমি এই বুঝি ঘাড়ে চেপে বসলাম পেতনির মতো।

ব্রজগোপাল উদারভাবে হেসে বলেন—আমি এই কথাটারই ভয় পাচ্ছিলাম। তোমাকে তো চিনি। আর তোমারই বা কথা কী, দুনিয়ার বোধ হয় সব মেয়েমানুষই ওইরকম করে ভাবতে শেখে। সংসারে কারও কাছে তার ওজন কমে গেল বুঝি কখন।

ননীবালা স্যুটকেসের ডালা বন্ধ করে বলেন—আমি ঠিক জানতাম, তুমি ভাল মনে আমাকে আর নিতে পারবে না। একেবারেই কি সংসারের বাইরে চলে গেলে? আর কি কখনও বাউণ্ডুলেপনা ছাড়তে পারবে না?

ব্রজগোপাল তটস্থ হয়ে বলেন—ওসব কথা থাক না। আমার কথা তো একটা জীবন ধরে সবাইকে বলে বেড়িয়েছ। আমি যা ঠিক তাই। ও নিয়ে আর উত্তেজিত হয়ো না। বলি কী, যাবেই যদি তো সবাইকে আগে থেকে বলেকয়ে রাজি করিয়ে তারপর চলো। আমিও তো পথ চেয়েই আছি। বুকে মাঝে মাঝে ঠেলা ধাক্কা লাগছে, কবে কী হয়ে যায়। শেষ বয়সটা না-হয় তুমি আমার কাছেই একটু কষ্ট করে...

ব্রজগোপাল আর বলতে পারলেন না। গলাটা ধরে এল। সহজে বিচলিত হন না। কিন্তু এখন হলেন। বারবার গলাটা ঝেড়ে পরিষ্কার করতে লাগলেন। এ সব দুর্বলতা কেন যে এখনও রয়ে গেছে! সকালে খুব সুন্দর একটি প্রণাম নিবেদন করে এসেছেন ঠাকুরকে। ভেবেছিলেন, সংসারের কাছে তার সব প্রত্যাশা বুঝি চুকেবুকে গেছে। কিন্তু যায়নি তো। বুকের কোন গর্ত থেকে এই দুর্বলতার কালসাপ বেরিয়ে এল!

ননীবালা অত্যন্ত কূটচক্ষে চেয়েছিলেন। হঠাৎ উঠে পাশে এসে বসে পিঠে আলতো হাত ছুঁইয়ে বললেন—কেন অত পাষাণ হওয়ার চেষ্টা করো বলো তো! তোমার মতো মানুষ কি কখনও এরকম হতে পারে।

সংসারের দিক থেকে যতই চোখ ফিরিয়ে থাক, তোমাকে আমি চিনি।

ব্রজগোপাল সামলে গেলেন। হেসে বললেন—ভাল, ভাল।

—ভালই তো। তুমি ভেবো না, আমি যে তোমার কাছে চলে যাব এ কথা আমি আগে থেকেই গেয়ে রেখেছি। আমার আর ভাল লাগে না। তোমার ছোট ছেলেটা কোনওদিনই আমাকে দেখতে পারে না। তার ধারণা তোমাকে আমিই পর করেছি। তাই ভাবি, তোমার কাছে গিয়ে থাকলে বোধ হয় তার মন পাব। নইলে ও ডাকাত ঠিক আমেরিকা না কোথায় চলে যাবে।

ব্রজগোপাল আবার হেসে বলেন—বেশ ব্যাবসাবুদ্ধি তোমার। ছেলের মন পাওয়ার অত চেষ্টা করো কেন? এটা ঠিক জেনো, তুমি যত ওদের ভালবাসবে তার অর্ধেক তোমাকে ভালবাসার ক্ষমতাও ওদের নেই। স্নেহ নিম্নগামী, এ তো জানোই।

ননীবালা ব্রজগোপালের পিঠ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে পানের বাটা খুলে বসলেন।

বললেন—ছেলেদের জন্য অনেক করেছি। তুমি ঠিকই বলেছ, অত করতে নেই। তাই এবার একটু দূরে সরে যেতে চাইছি। তাইতে হয়তো সম্পর্কটা ভাল থাকবে।

ব্রজগোপাল হাসিমুখে মাথা নেড়ে বললেন—কিংবা হয়তো সম্পর্ক থাকবে না সোমেন যখন আমার কাছে প্রথম গেল তখন চিনতে কষ্টই হচ্ছিল। বাবা বলে ডাকল, খুব আশ্চর্য লাগছিল শুনে। আমারই ছেলে, তবু সম্পর্ক রাখত না বলে কত পরের ছেলের মতো হয়ে গেছে। ছেলেরা সম্পর্ক রাখবে কেন, ওটা তো তাদের দায় নয়। চোর-দায়ে ধরা পড়েছে যত মা বাপ।

ননীবালা মুখখানা ম্লান করে বললেন—না গো, ওরকম ভাবা তোমার ভুল হয়েছে। সোমেন ফিরে এসে থেকেই তোমার কথা কত বলেছে। আমার ওপর সে কী চোটপাট! বড় হয়ে বুঝতে পেরেছে তো বাপ কত আপন! সেই বাপকে সংসার পর করে দিয়েছে এটা ও সইতে পারে না। ওকে খারাপ ভেবো না। একটু রাগী আর গোয়ার ঠিকই, কিন্তু মনটা ভাল।

ব্রজগোপাল পায়ের ওপর পা তুলে বসেছিলেন। গ্রীষ্মকালে ডাবের জল খেলে যেমন ভিতরটা ঠান্ডা হয়ে যায়, এ কথা শুনে তাঁর ভিতরটাও তেমনি ঠান্ডা হচ্ছিল। কথাগুলি তিনি পান করছিলেন পরম আনন্দে।

বললেন—মায়েদের ওই দোষ। ছেলেদের কেউ কিছু ভালমন্দ বলতে পারবে না, এমনকী বাপও নয়। ওই করেই তোমরা ছেলেপুলে নষ্ট করো।

ননীবালা ব্রজগোপালের কণ্ঠের স্নিগ্ধতা লক্ষ্য করে হেসে ফেলে বলেন—সেও ঠিক কথা। আমরা মায়েরাই নষ্ট করি। তুমিও তো ওইরকম মায়ের আদর পেয়েই বাউণ্ডুলেপনা করে বেড়াতে। সে কথা ভুলে যাও কেন!

ব্রজগোপাল অন্যমনস্কভাবে মনশ্চক্ষে এক জগদ্ধাত্রীর রূপ দেখতে পেলেন। বয়সের ভার, বিস্মৃতির কুয়াশা ভেদ করে সেই বিসর্জিত প্রতিমার স্মৃতি আজও দেখা দেয়। গাঢ়স্বরে বললেন—মা! মায়ের মতো জিনিস আছে!

বহুকাল পরে সেই মা-ন্যাওটা শিশুর মতোই বুকটা আকুল হয়ে ওঠে। মনে হয় মরার তো দেরি নেই। মরে মায়ের কাছে যাব। মা কত নাড় মোয়া করে রেখেছে!

ননীবালা বললেন—শোনো, আমি যা ঠিক করেছি তার আর নড়চড় হবে না। আমি যাবই। তুমি একটু বসো, সোমেন দুপুরে খেতে আসবে। ওকে সব বুঝিয়ে বলে আমি যাব। বীণা আর রণোকে দুই খোট চিঠি

লিখে রেখে যাচ্ছি। ভয় পেয়ো না, ওরা কিছু মনে করবে না।

—যাবেই?

—হুঁ। নইলে সম্মান থাকে না। তোমারও আমাকে দরকার। বহেরুর ওই ভূতের রাজ্যে কে তোমাকে দেখে বলো তো! ঘাড়ের বোঝা মনে করো, পেতনি ভাবো, তবু জেনো আমার চেয়ে আপনার তোমার কেউ নেই।

ব্রজগোপাল উত্তর করলেন না। শুধু অস্ফুট 'হুঁ' দিলেন।

ননীবালা উৎকণ্ঠায় বললেন—কী? কিছু বলছ না যে!

—বড় হুট করে ঠিক করলে তাই ভাবছি। ঠিক আছে গুছিয়ে নাও।

ননীবালা অবহেলার ভাব করে বললেন—গোছানোর আর কী! তেমন কিছু নিজের বলতে নেইও। সবই রণোর সংসারের। এই দু-চারখানা জামাকাপড়...

কড়া নড়ল। ননীবালা উঠে গিয়ে সদর খুললেন। বিভ্রান্তের মতো সোমেন ঘরে এসে ঢুকেই থমকে গেল।

—বাবা!

—আয়।

সোমেন ভরদুপুরের ক্লান্ত মুখশ্রী ভেঙে ফেলে খুব খুশির একটা হাসি হেসে বলল— কখন এলেন? কেমন আছেন বাবা!

ব্রজগোপাল মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলেন।

॥ তিয়াত্তর ॥

ননীবালা সোমেনকে বললেন—তুই স্নান করে আয় খেতে দিই।

সোমেন জামা গেঞ্জি ছেড়ে প্যান্ট পরে পাখার তলায় মেঝেয় বসে বলল—উঃ, দাঁড়াও একটু জিরিয়ে নিই। দাদা বউদিরাও তো দুপুরেই ফিরবে, একসঙ্গে খেতে দিয়ো।।

বলে চৌকিতে বসা বাবার দিকে মুখ তুলে চেয়ে বলল—আপনার সেই বুকের ব্যাথাটা আর হয় না তো বাবা?

—না না। বেশ ভাল আছি।

বলে ব্রজগোপাল চোখ সরিয়ে নিলেন।

সোমেন অন্যমনস্কভাবে মেঝেয় রাখা স্যুটকেশ দেখছিল। মা হয়তো কিছু বেরটের করছিল। হাত দিয়ে সে স্যুটকেশটা চৌকির তলায় ঠেলে দিল ফের।

ননীবালা পানের পিক ফেলে এসে বসলেন। বললেন—বুঝে সমঝে থাকিস। তোর তো আবার হুট বলতেই মাথা গরম হয়। কিন্তু মা ছাড়া তো আর কেউ তোমার রাগের মর্ম বুঝবে না। তাই বলছি, রাগ-টাগগুলো এবার যেন কম করো।

সোমেন অবাক হয়ে বলল—তার মানে? কীসের রাগের কথা বলছ?

ননীবালা চোখের জল মুছলেন আঁচলে। তারপর ভার-ভার মুখখানা সোমেনের দিকে ফিরিয়ে খুব অস্ফুট গলায় বললেন—আমি চলে যাচ্ছি বাবা।

সোমেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। এতকালের মা, যাকে ছাড়া তার একমুহূর্ত চলে না, সেই মা কোথায় যাবে?

সে বলল—কোথায়? বাবার কাছে নাকি!

ননীবালা আঁচলে মুখ চেপে ফুপিয়ে উঠলেন।

ব্রজগোপাল সামান্য অস্বস্তি বোধ করে বললেন—ওঁর খুব ঝোঁক চেপেছে বনবাসী হবেন আমার মতো। আমি বলছিলাম যা করুন একটু ভেবেচিন্তে করুন। তোমাদেরও মতামতের দরকার। মা বাপ বুড়ো হলে ছেলেপুলেরাই তাদের অভিভাবক হয়। এখন তোমরা বিবেচনা করে দেখো—

অবাক ভাবটা সামলে নিল সোমেন। হঠাৎ তার খুবই ভাল লাগছিল ব্যাপারটা। এতকাল তাদের সংসারে কোথায় যেন একটা ছেড়া তারে বেসুর বেজেছে। কী যেন একটা অসঙ্গতি দৃষ্টিকটু হয়ে থেকে গেছে বরাবর। এতকাল পরে সেটা বড় স্পষ্ট ধরা দেয়। ঠিকই তো! মা কেন বাবাকে ছেড়ে থাকবে! থাকা উচিত নয়। বোধ হয় এই একটা কারণেই, মাকে ভালবেসেও এতকাল ধরে মার প্রতি একটা অলক্ষ্য বিতৃষ্ণাও রয়ে গেছে তার বুকের মধ্যে। তাই সে মা থাকবে না জেনেও খুব একটা দুঃখ পায় না।

ব্রজগোপালের দিকে চেয়ে সোমেন বলে—আপনার মত-ই মত।

ব্রজগোপাল মাথা নেড়ে বলেন—না না, সেটা কোনও কাজের কথা নয়। আমাদের বুড়ো বয়সে কত মতিভ্রম হয়।

সোমেন হাসল একটু। বড় হয়ে প্রথম যেদিন বাবার কাছে গিয়েছিল গাঁয়ে, সেদিনই তার মনে হয়েছিল, এই ব্রজগোপাল মানুষটির মধ্যে কিছু মৌলিক মানবিকতা আছে, যা তাদের নেই। ব্রজগোপাল অনেক কথা বলেন যা গ্রহণীয় নয়, যা কখনও হাস্যকর। তবু এ মানুষটা যে-মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছেন তা বড় দেশজ।

সোমেন হেসেই বলে—কিন্তু আপনি তো না ভেবেচিন্তে কিছু করেন না। আমরা হুটহাট অনেক কথা বলে ফেলি, তাড়াতাড়ি ডিসিশন নিই। আপনি সবই আগে থেকে ভেবে রাখেন। মায়ের যাওয়া যদি আপনি ভাল বোঝেন আমারও খুব সায় আছে। আরও আগে হলে ভাল হত। অবশ্য সবচেয়ে ভাল হত, আপনি আমাদের কাছে চলে এলে।

এই কথায় ননীবালা হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন—না না, সংসারে না থেকে উনি ভালই করেছেন। এ বড় ছোট জায়গা বাবা। এতকাল ধরে দেখছি।

ব্রজগোপাল ছেলের চিক্কণ সুন্দর মুখশ্রী অবলোকন করতে করতে কিছু ধীরস্বরে বলেন—সংসারে বাইরে একটা জায়গা করে রাখা সব মানুষের পক্ষেই দরকার। ঠিক সময় বুঝে সরে যেতে হয়। এই সরে যাওয়াটার মানে অনেকে বোঝে না। আমার মনে হয় সময় মতো সরে যাওয়াটাই হচ্ছে বিচক্ষণের কাজ, তাতে কারও ভালবাসা হারাতে হয় না, নিরন্তর মানুষের সংসারে জায়গা ছোট হয়ে আসে—সেই জায়গা দখল করে থেকে বিরক্তি উৎপাদন করারও দরকার পড়ে না। বানপ্রস্থের ব্যবস্থা খুব মনোবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞানসম্মত। বন মানে বিস্তার। সংসার ছেড়ে বৃহৎ সংসারে চলে গেলে আনন্দও পাওয়া যায়। মনটাও সজীব থাকে।

সরে যাওয়ার কথাটা ভালই লাগছিল সোমেনের। বানপ্রস্থের কথাটা খট করে কানে লাগল। বুড়ো বয়সের ওই দোষ। সব প্রাচীন প্রথার মধ্যে আশ্রয় খোঁজার অভ্যাস। তবু বাবাকে ঠিক সেরকম ভাবতে কষ্ট হয় সোমেনের। যদিও বাবাকে খুব ভাল করে জানা হয়নি তার আজও, কারণ তারা মানুষ হয়েছে মায়ের আঁচলের তলায়। বাবাকে ঠিকমতো চেনাই হয়নি। বাবা শাসন করতেন না, আদরও বড় একটা নয়। তবে খুব শান্ত গলায়, ভালমানুষের মতো কথা বলতেন ছেলেদের সঙ্গে। কারও সম্মান কখনও ক্ষুণ্ণ করেননি। ছেলেপুলেরাও যে সম্মান পাওয়ার অধিকারী এটা ব্রজগোপাল বরাবর বুঝতেন। বাবার হাতে চড়চাপড় বা ধমক খেয়েছে এমনটা মনেই পড়ে না তার। ব্রজগোপাল যখন স্থায়ীভাবে গোবিন্দপুরে চলে গেলেন তখনও তেমন কোনও দুঃখ পায়নি তারা। কিন্তু সোমেন বড় হয়ে ব্রজগোপালকে দেখেই এই নির্বাসিত লোকটির প্রতি বড় একটা আকর্ষণ টের পেয়েছে। সফল এবং ধনী পিতাকে সব ছেলেই কিছু সমীহ করে, ব্রজগোপালের সেদিক থেকে কিছু নেই। যা আছে তার কোনও মূল্য এখনকার সমাজ দেয় না। সে হল চরিত্র। আজ সোমেন বাবার ভিতরে সেই খাঁটি সোনার পুরনো গয়নার মতো অপ্রচলিত জিনিসটির প্রতিই আকর্ষণ অনুভব করে। বাবার আর কিছু না থাক, লোকটি বড় ভাল। এ লোকটা ভুলেও এক পয়সা চুরি করবে না, একটা মিথ্যে কথা বলবে না, কাউকে আঘাত করবে না।

সোমেন বলল—কেন বাবা, আপনাকে কি আমরা অনাদর বা অসম্মান করব এই ভাবেন?

—না, তা নয়। ব্রজগোপাল হাসে—তোমরা তা করবে কেন? তেমন বাপের ছেলে নও তোমরা। ব্যাপারটা হল, আমি তো বরাবরই একটু বারমুখী। আমার কেমন আটক থাকতে ভাল লাগে না। কিন্তু তা বলে স্নেহ কিছু কম ছিল না তোমাদের প্রতি, ঠাকুর জানেন। তো আমি ভাবলাম, এই স্নেহটুকুই মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সংসারে এই স্নেহটুকু বুকে নিয়েই সরে যাওয়া ভাল। তা হলে সেটুকু বাঁচে। নইলে নানা স্বার্থের দ্বন্দ্বে কবে মন মরে যায়। আমি বাবা, বড় ভিতু মানুষ। স্নেহের কাঙাল। তুমি বরং স্নানটান করে নাও। বেলা হল, আমি বসিয়ে রাখছি।

সোমেন উঠল। মুখ কিছু বিষন্ন। আবার বিষন্নতার ভিতরেও একটু তৃপ্তিময় আনন্দ।

শরতের বেলায় বড় রোদ। সারা সকালটা সসামেন পুড়েছে ঘুরে ঘুরে। বাথরুমে খুব বেশি জল নেই। তাই সাবধানে জল বাঁচিয়ে স্নান করছিল। আর ভাবছিল। মা চলে গেলে ঘরটা তার একার হবে। আবোল-তাবোল বকে মাথা ধরিয়ে দিত মা। আর দেবে না। মাকে অনেক বকেছে সোমেন। ইদানীং সবচেয়ে বেশি রাগ হত মায়ের প্রতি। একটামাত্র নিরাপদ রাগের জায়গা। সত্যি কথা, আর কে তার রাগ অভিমানকে পাত্তা দেবে? তা হোক গে, সংসারে চিরকাল মা-মা করলে হবেও না। তার সামনে বিপুল পৃথিবী পড়ে আছে। সে না আমেরিকায় চলে যাবে চিরদিনের মতো? সংসারের ছোটখাটো দড়িদড়া ছিঁড়ে এবার জেটি ছেড়ে বার দরিয়ায় গিয়ে পড়তে হবে। সে তো আর ছেলেমানুষ নেই! কয়েকটা দিন একটু ফাঁকা লাগবে, কষ্ট হবে। তা হোক গে।

স্নান করতে করতেই টের পেল, দাদা বউদি আর বাচ্চারা ফিরেছে। খুব হইচই হচ্ছে।

স্নানের ঘর থেকে বেরোতেই বউদি তাকে নিজের শোওয়ার ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। নিচু গলায় বলল—কী ব্যাপার বলো তো! মা নাকি আজই চলে যাচ্ছেন!

—তাই তো শুনছি।

—রাগটাগ করেননি তো!

—আরে না। মা তো অনেকদিন থেকেই যাব যাব করছে।

বীণা মুখখানা শুকনো করে বলে—সে তো অনেক কথা বলেন রাগের মাথায়। সব কি ধরতে আছে?

সোমেন আস্তে বলল—যেতে দাও। তাতে ভালই হবে।

বীণা মাথা নাড়ল। একটু ধরা গলায় বলল—না সোমেন, এটা ভাল হল না। লোকে মনে করবে, বউ শাশুড়িকে তাড়িয়েছে।

—দূর। লোকের ভাবতে বয়ে গেছে। এটা কলকাতা, বনগাঁ নয়।

বীণা তেমনি বিষন্ন গলায় বলে—সেটা না হয় মানলাম, কিন্তু আমরাই বা কী করে থাকব? কদিন উনি ছিলেন না, তাইতেই বাচ্চারা ঠাম্মা ঠাম্মা করে অনাথ শিশুর মতো ঘুরে বেড়িয়েছে। এখন কী হবে?

সোমেন নিঃশ্বাস ফেলে বলে—ও সব সেন্টিমেন্ট ছাড়ো তো। বাচ্চাদের সব সয়ে যায়। তা বলে মাকে আটকে রেখো না। বাবার কথা ভেবে ছেড়ে দাও। একা বাবার বড় কষ্ট।

বীণা উদাস গলায় বলে—কষ্ট হলেও ওঁর সয়ে গেছে। আমাদেরই কষ্ট হবে বেশি।

কথাটা শুনে একটু অবাক মানে সোমেন। বউদির সঙ্গে মায়ের সম্পর্ক তো কোনওকালে! তেমন ভাল ছিল না! মুখ ফসকে সে বলে ফেলল—কষ্ট হবে মানে? মা গেলেই তো তোমার সুবিধে, ক্যাটক্যাট করার লোক

থাকবে না।

জলভরা চোখে, কান্না আর ভর্ৎসনা মেশানো চোখে তারদিকে তীব্রভাবে মুখ ফেরাল বীণা। চোখের জল গড়িয়ে নামল, সেটা মুছবার চেষ্টাও না করে বলল—তাই মনে হয় না? আমি পরের মেয়ে, তোমাদের মনে তো হবেই। আমার কথা না হয় বাদ দাও, তোমার দাদাকে গিয়ে দেখে এস, তোমাদের ঘরে মার কোলে মুখ গুঁজে কেমন কঁদছে। পাষাণ গলে যায়। যাও, দেখে এস।

সোমেন উঠে এল।

সত্যিই দৃশ্যটা সহ্য করা যায় না। চৌকির ওপর মা বসা, তাঁর কোলে মাথা গুঁজে রণেন লম্বা হয়ে পড়ে হাউমাউ করে কাঁদছে। মা তার চুলের মধ্যে আঙুল ডুবিয়ে বসে আছে পাথর হয়ে। দুচোখে জলের ধারা। ছেলেমেয়েরা ঠাকুমা আর বাবার দৃশ্যটার সামনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে।

রণেন কাঁদতে কাঁদতে বলে—আমিই তোমাকে তাড়ালাম মা। আমার সংসারে তুমি থাকতে পারলে না মা। কি করেছি বলো, আমাকে কেন ছেড়ে যাচ্ছো?

ননীবালা আকুল হয়ে বলেন—ওরে, ওসব কী বলছিস? বলিস না, বলিস না। আমি সে-যাওয়া যাচ্ছি নাকি? বুড়ো মানুষটা গতরপাত করে খায়, তার দিকটা একটু দেখে আসি।

সোমেন কিছু বিরক্ত হয়ে বলে—এ তোমরা কী শুরু করলে বলো তো? যাবে তো একটুখানি দূরে। এবেলা-ওবেলা ঘুরে আসা যায়।

রণেন মাথা তুলল না। পড়ে রইল।

ননীবালা তার চুলের মধ্যে বিলি কেটে দিতে থাকেন।

ব্রজগোপাল খুব গম্ভীর আর অন্যমনস্ক হয়ে বসেছিলেন। বোধ হয় ভাবছিলেন যে, তিনি যখন চলে যান তখন কেউ এভাবে তাকে ধরে রাখার চেষ্টা করেনি।

সোমেন বাবার দিকে চেয়ে বলে—বাবা, আপনি একটু দেখুন। এত কান্নাকাটি ভাল লাগে না।

ব্রজগোপাল ছেলের দিকে তাকালেন। মাথা নেড়ে বললেন—ও খারাপ নয়। কান্না জিনিসটা ভাল। তুমি বরং খেয়ে নাও গে। যদি তোমার অসুবিধে না হয়, বরং হাওড়ায় তুলে দিয়ে এস। তোমার মা যাবেনই, তাঁকে আটকানো যাচ্ছে না।

রণেন মুখ তুলে বলে—বাবা, আমাকেও নিয়ে যান সঙ্গে। আমি মাকে আর আপনাকে ছাড়া থাকতে পারব না।

ব্রজগোপাল একবার কী বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। তারপর আবার সময় নিয়ে বললেন—তুমি বড় ভাল মানুষ বাপকুমোনা, তাই অত কষ্ট পাচ্ছো। মনটাকে শক্ত করো। মনকে বেশি প্রশ্রয় দিতে নেই। পুরুষ মানুষ, ওঠো।

রণেন কোলে মাথা রেখেই বলে—আমার কেমন যেন মনে হয় বাবা যে, আমি খুব ছোট্ট হয়ে গেছি। আদুরে ছেলে। বড় মা-মা আর বাবা বাবা করে প্রাণটা।

শুনে বুবাই হেসে ফেলল। টুকাই-ও। শুধু মেয়েটা ঠাকুমার দেখাদেখি কাঁদছিল। মেয়েরা কান্নার অভ্যাস নিয়েই জন্মায়। আর বীণা কখন অলক্ষ্যেতে নিঃশব্দে এসে দরজা ধরে দাঁড়িয়েছিল, দুচোখে অঝোর জল,

ফেঁপাচ্ছে। একটা হাত বাড়ালেন ননীবালা, বীণা নিঃশব্দে এসে বুক ঘেঁষে বসল।

ননীবালা তাকে বুকের সঙ্গে সিটিয়ে নিয়ে বললেন-বউমা, এই একটা অবোধকে রেখে যাচ্ছি, বুক-বুক করে রেখো। আর ওই ছোটটা ওকে ছেলের মতো—বুঝলে? কোনওটাই আমার পাকা মানুষ নয়, ন্যাংলা হাবলা।

বুবাই টুকাই ফের হেসে ওঠে ন্যাংলা হাবলা শুনে। সোমেন ওদের নড়া ধরে টেনে নিয়ে যায় ঘর থেকে। বাইরের ঘরে এনে ধমক দেয়—হাসছিলি কেন? খুব হাসির ব্যাপার হচ্ছে ওখানে, না? দেব থাপ্পড়?

কাকাকে ওরা ভীষণ ভয় খায়। ভয়ে অবশ হয়ে দাড়িয়ে আছে। চোখের পাতা ফেলছে।

—যা, ঘরে গিয়ে জামাকাপড় ছেড়ে হাত-মুখ ধো।

সোমেন বাইরের ঘরে বসে সিগারেট ধরায় দাদার প্যাকেট থেকে।

এ-ঘর থেকেই শুনতে পাচ্ছিল সোমেন, ননীবালা বীণাকে বলছেন—না গো বউমা, হঠাৎ নয়। মনে মনে ঠিকই ছিল। যোগাযযাগটা হঠাৎ হয়ে গেল। আজকের দিনটা পঞ্জিকায় সকালে দেখলাম বড় ভাল দিন। অমৃত যোগ আছে আর এই দিনেই হঠাৎ উনিও এসে পড়লেন। ভাবলাম, ঠাকুরই বুঝি যোগাযোগ করিয়ে দিলেন। তা এই যোগাযোগ ছাড়ি কেন? রোজই যাব-যাব ভাবি, যাওয়া আর হয়ে ওঠে না। এইবার হঠাৎ মনটা ‘যাই’ করে উঠেছে যখন, তোমরা তখন আর আটকে রেখো না। এই তো কাছেই, যখন খুশি আসব, তোমরাও যাবে।

খেতে খেতে অনেক দেরি হয়ে গেল। গল্প আর কথা আজ যেন আর শেষ হতে চায় না। বীণা নিজে ননীবালার বিছানা সাজিয়ে দিল, রণেন বাঁধল। গোছগাছেরও শেষ নেই।

কান্নাও চলছে। ফাকে ফাকে হাসিঠাট্টার কথাও। ননীবালা বললেন একবার—ও বউমা, সব জিনিস যে দিয়ে দিচ্ছো বড়! তোমরাই তো পর করে দিলে দেখি!

এইরকম ভাবে সারাক্ষণ বাড়ি সরগরম রইল। বিস্তর পোঁটলাপুঁটলি বাক্স বিছানা সদরে জড়ো করে রেখে সোমেন ট্যাক্সি ডেকে আনল। কান্নাকাটিটা আর বেশি দীর্ঘায়িত করতে দিল না সে। মাকে প্রায় কোলে করে টেনে নিয়ে ট্যাক্সিতে বসাল। ননীবালা কাঁদতে কাঁদতে রণেনকে বলেন—বাড়িটা শেষ করিস। পরের বাড়িতে আর কতকাল পরবাসী থাকবি? আমরা যেন দেখে যেতে পারি।

রণেন কাঁদছিল ছেলেমানুষের মতো হাউহাউ করে। কান্না দেখেই বোঝা যায়, তার ভিতরটা এখনও সুস্থির নয়। বীণা কঁদছে, বাচ্চারাও। পাড়া-প্রতিবেশী বেশ কিছু লোক জড়ো হয়েছিল। কয়েকজন বয়স্কা মহিলা চোখের জল ফেলে গেলেন।

গাড়ি গড়িয়াহাটা ছাড়িয়ে এলে আর কাঁদছিলেন না ননীবালা। পানের বাটা খুলে একটা পান খেলেন। সোমেন ড্রাইভারের পাশে সামনে বসেছিল। পিছন ফিরে একবার মাকে দেখে নিয়ে বলল—উঃ বাবা, তোমরা কাঁদতেও পারো। আমার মাথা ব্যথা করছে।

ননীবালা তাঁর বড় বড় চোখে ছেলেকে স্থিরভাবে একটু দেখে বললেন—শোনো ছোটকা, তুমি মাথা থেকে আমেরিকা তাড়াও।

খুব আদরের সময়ে কখনও-কখনও সোমেনকে ছোটকা বলে ডাকেন ননীবালা।

সোমেন বলে—কেন?

—না। অতদূরে তোমাকে ছাড়তে পারব না। তা ছাড়া, রণেনের কী অবস্থা তা তো দেখছই! এ অবস্থায় ওকে ছেড়ে তোমার কোথাও যাওয়া চলবে না। সুস্থির মাথায় সবটা বিবেচনা করো।

—বাঃ, আমার ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই?

ব্রজগোপাল গলা খাকারি দিয়ে বললেন—বাবা, ওটা ঠিক কথা নয়। আমেরিকা তৈরি দেশ, তারা টাকা দিয়ে বিদেশি চাকর রাখবে। আর তোমার দেশ তোমারই, গরিব মায়ের হাল দেখে কুপুত্রই পালায়। পালানোর জন্য যেয়ো না। যদি বোঝো গিয়ে জ্ঞানী মানী হবে তো যেয়ো। সব কাজের পিছনে নিজের উদ্দেশটা যাচাই করা ভাল। উদ্দেশ সৎ ও সাধু হলে মঙ্গলার্থে সব কাজই করা যায়। অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে মন্ত্রোচ্চারণও পাপ। আর সৎ উদ্দেশে নারীহরণও পুণ্য।

সোমেন উত্তর দিল না। মনটা খারাপ লাগছে।

হাওড়ায় বড় ঘড়ির নীচে বহেরু দাড়িয়েছিল বশংবদ। ব্যাপার দেখে হইচই করে উঠল— মা ঠাকরুন যাবেন! অ্যাঁ! চন্দ্রসূর্য ওঠে তা হলে! কী ভাগ্য আমাদের! ও ঠাকুর, কালই রাজমিস্ত্রী লাগাব ঘর পাকা করতে। ব্রাহ্মণকে গৃহদান করব। মহাপুণ্য!

টানা-হ্যাঁচড়া করে সেই মালপত্র তুলল গাড়িতে।

সন্ধের মুখে মুখে গাড়িটা ছাড়ল। মা বাবাকে প্রণাম করে প্রায় চলন্ত গাড়ি থেকে নেমে এল সোমেন।

তারপরই খুব ফাঁকা লাগতে লাগল। বহুক্ষণ সিগারেট খাইনি। সিগারেট ধরাতেই মাথাটা চন-ন করে পাক খেল একটা। হু-হু করে উঠল বুক। ফাঁকা লাগছে।

অনেকদিন বাদে তার মনে হল, আজ বাসায় ফিরে খারাপ লাগবে। রোজই লাগে। তবু আজ যেন আগে থেকেই লাগছে।

ষোলো নম্বর বাস ধরে সোমেন আজ ইচ্ছে করেই রিচি রোডে নেমে গাব্বুকে পড়াতে না গিয়ে রিখিয়াদের বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে। অনেককাল দেখা হয় না।

॥ চুয়াত্তর ॥

অন্যমনস্ক সোমেন আজও গেট পেরিয়ে ঢুকে যাচ্ছিল রিখিয়াদের বাড়িতে। হঠাৎ একটা মোটরের হেডলাইট পড়ল এসে সেই লেখাটার ওপর—প্রতিশোধ, প্রতিরোধ, প্রতিবাদ। কমরেড, গড়ে তোলো, গড়ে তোলো, গড়ে তোলো ব্যারিকেড। লেখাটা নজরে পড়তেই চমকে উঠল সোমেন। এই লেখাটার কথাই চিঠিতে তাকে জানিয়েছিল মধুমিতা। দেওয়ালে এ কটা কথা লিখেছিল জিতু নামে একটা ছেলে, যে প্রথম মানুষ খুন করার শক সামলাতে পারেনি। খুন করে নিহত মানুষের হাত কেটে নিয়ে যে শ্রেণীশত্রুর রক্ত মাংস খেয়েছিল, তারপর উন্মাদ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আজও। সেই জিতুকে ভালবাসত মধুমিতা।

জিতুকে চেনেও না সোমেন। তবু আজ মধুমিতার চেয়েও বেশি হঠাৎ করে জিতুর কথা মনে হয়। কেমন ছিল ছেলেটা! সোমেনের মতোই কি? হয়তো এরকমই বয়স, একমাথা বোঝাই নানা অবাস্তব স্বপ্ন আর চিন্তা নিয়ে ঘুরে বেড়াত। রোমান্টিক বিপ্লবী। হঠাৎ কেউ ভুল করে তাকে শ্রেণীশত্রুর রক্তপাত করতে প্ররোচিত করে। সেটা খুবই ভুল হয়েছিল। পৃথিবীতে যারা জন্মায় তাদের মধ্যে কেউ কেউ আছে যাদের খুনির ইনস্টিংট থাকে, আর কারও তা থাকে না। সেই জিতুকে একবার দেখতে খুব ইচ্ছে হয় সোমেনের। ছেলেটা কি আজও বেঁচে আছে? থাকলেও নেই। ওরকম উন্মত্ত অস্তিত্বের কোনও মানে হয় না। সোমেন শুধু অনুভব করে, দেশময় লক্ষ লক্ষ অল্পবয়সী ছেলে কিছু একটা করতে চাইছে, এমন কিছু—যার জন্য সর্বস্ব পণ করা যায়, প্রাণ দেওয়া যায়, নেওয়া যায়। শুধু সেই মহৎ কারণটি তাদের হাতে দাও, তারা লড়ে যাবে। কিন্তু তা তো হল না। কেউই আদর্শ বলে কোনও জিনিস দিতে পারল না যুবাদের। তারা তাই আদর্শের পিপাসা মেটাতে ভিনদেশ থেকে রাজনৈতিক মত ধার করে আনল, আর তার জন্যই কত কাণ্ড করল তারা। বেকারকে চাকরি দেওয়ার চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল তাদের একটা সুন্দর আইডিয়াল দেওয়া, বাস্তববাচিত চিন্তা ও ব্যাপকতার ধারণায় সমৃদ্ধ একটি কার্যকরী আদর্শ। কে বুঝবে সে কথা? সস্তা কথা শুনে শুনে সকলের কান পচে গেল।

অচেনা এক জিতুর জন্য প্রাণটা হঠাৎ হু হু করতে থাকে তার। অবশ্য সেই হুহু করা বুকে মায়ের জন্যও খানিকটা অভাব বোধ আছে, বাবার জন্যও আছে একরকম ব্যথা। আর আছে তার সারা জীবনের নানা ব্যর্থতা ও অসফলতার স্মৃতিও। কোনও ক্ষরণে মনে একটু দুঃখ এলেই হাজারে' দুঃখের স্মৃতি ভিড় করে আসে।

মধুমিতার চিঠিটার কোনও জবাব দেয়নি সোমেন। ও কেমন আছে?

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে রিখিয়ার ঘরের দিকে যাচ্ছিল সোমেন। খেয়াল হল, বাড়িটা বড় নিস্তব্ধ। এত চুপ কেন সব? মিটমিট করে ভূতুড়ে সব কম পাওয়ারের আলো জ্বলছে বড় বাতিগুলো সব নেবানো। শৈলীমাসির কিছু হয়নি তো? একটু অসঙ্গতি দেখলেই আজকাল কেবল অজানা ভয়ে বুক চলকে রক্ত ঝরে যায়।

রিখিয়া তার ঘরে নেই, পড়ার ঘরেও নয়। একা-একা এঘর থেকে ওঘর খুঁজে দেখল সোমেন। চারধারে দামি জিনিস ছড়ানো। ক্যামেরা, ঘড়ি, কলম, ট্রানজিস্টার সেট, স্টিলের জগ। সে যদি এর কিছু তুলে নিয়ে চলে যায় তো কেউ ধরতে পারবে না। বড় অসাবধানী এরা।

সোমেন করিডোরে এসে ডাকল—রিখিয়া।

গলাটা কেঁপে গেল। সোমেন একটু চুপ থেকে আবার ডাকল।

অপ্রত্যাশিতভাবে শৈলীমাসির ঘরের দিক থেকে রিখিয়ার বাবা বেরিয়ে এলেন। খুবই উদভ্রান্ত ও অন্যমনস্ক মুখ চোখ। দরজা খুলে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন সোমেনের দিকে। খুবই গম্ভীর তাঁর মুখ।

সোমেন চমকে গিয়ে স্থির দাঁড়িয়ে রইল। দুজন দুজনের দিকে খামোখা চেয়ে আছে। কেউ কথা বলতে পারছে না। কথা নেই বলে। এমনি সময়ে হঠাৎ একটা অদ্ভুত শব্দ করে সেই অন্ধ কুকুরটা এসে সোমেনের পায়ে কুঁই কুঁই করে চেটে চেটে লেজ নেড়ে অসম্ভব আদর জানাতে থাকে। কুকুরেরা ভোলে না।

রিখিয়ার বাবা আজও নেশা করেছেন। কুকুরটাকে ধমক দিয়ে বললেন—স্টপ!

সেই স্বর শুনেই বোঝা গেল, গলাটা অন্যরকম।

সোমেনের দিকে চেয়ে বললেন—কুকুরটা তোমাকে চেনে দেখছি! তুমি কি এ বাড়িতে প্রায়ই আসো?

—মাঝে মাঝে। শৈলীমাসি আমাকে চেনেন।

উনি হাত তুলে বললেন—বুঝেছি। আর পরিচয় দিতে হবে না। তুমি বোধ হয় ওঁর সইয়ের ছেলে! না?

খুব বিস্মিত হয়ে সোমেন বলে—হ্যাঁ।

সে ভাবতেই পারে না যে, এ লোকটার অত মনে থাকে। কিন্তু তার চিন্তাকে আর একবার চমকে দিয়ে লোকটা বলে—একদিন সন্ধেবেলা তোমাকে দেখেছিলাম এখানে, সোমেন লাহিড়ি না তোমার নাম?

সোমেন এত অবাক হয় যে, বাতাস গিলে বলে—হ্যাঁ। আপনার আমাকে মনে আছে?

উনি তেমনি একটা উদাসীন ভ্যাবলা চোখে চেয়ে থেকে বললেন—আমার সবই মনে থাকে। এসো। এ ঘরে শৈলী আছে, রাখু আছে। আমরা সবাই বসে একটু গ্যাদারিং করছি। কাম অ্যান্ড জয়েন দি ক্রাউড।

সোমেন দ্বিধাভরে বলল—আমি বরং চলে যাই।

উনি বললেন—যাবে কেন? ইউ আর এ ভেরি হ্যান্ডসাম ইয়ং ম্যান। তবে একটু লিন অ্যান্ড থিন। তবু তোমাকে দেখলেই বেশ একটা ফ্রেশনেস আসে। চলে এস।

বলে উনি দরজার পাল্লাটা মেলে ধরলেন। কুকুরটা আগে গেল। পিছনে সোমেন!

প্যাসেজ দিয়ে ঢুকলে শৈলীমাসির ঘরের আগে আর একটা ঘর পড়ে। সেটা বসবার ঘর বলে মনে হয়। এখন সেখানে ধুলো পড়ছে। কেউ ব্যবহার করে না। এদের কত ঘর অব্যবহৃত পড়ে থাকে।

সেই ঘরে এসে রিখিয়ার বাবা একটু দাঁড়ালেন। পাঞ্জাবি আর পায়জামা পরনে। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দামি গ্যাসলাইটার বের করে সিগারেট ধরিয়ে বললেন— তুমি কার কাছে আসো বলো তো? রাখুর কাছে, না শৈলীর কাছে?

সোমেন লজ্জা পেয়ে বলে—কারও কাছে পার্টিকুলারলি নয়। আসি।

—ও। তোমার বয়সি আমার একটা ছেলে আছে, জানো?

—জানি।

—সেটা একটা হতচ্ছাড়া ছেলে। হি রাইটস টু আস অল দি ক্রুয়েল থিংস। সে নাকি আর কখনও আসবে না। আমরা তার প্রতি কোনও অন্যায় ব্যবহার করিনি, স্বাধীনতা দিয়েছি, তার পিছনে টাকাও কম খরচ করিনি। তবু হি হ্যাজ বিকাম আনবিকামিং...

সোমেন ইংরেজি কথাটা ভাল করে বুঝল না। ইংরেজিটা এখনও তার খুব রপ্ত হয়নি। আমেরিকায় যাওয়ার আগে রামকৃষ্ণ মিশনে স্পোকেন ইংলিশের ক্লাসে ভরতি হয়ে শিখে নেবে, এরকম ইচ্ছে আছে।

উনি বললেন—আজও তার চিঠি এসেছে। শৈলী খুব কাঁদছে। তুমি এ ঘরে একটু অপেক্ষা করো, আমি শৈলীকে একটু খবর দিই, তুমি এসেছ শুনলে ও নিশ্চয়ই শান্ত হবে।

—আমি বরং—

বলে সোমেন উৎসুক হয়ে চলে যাওয়ার কথা বলতে যাচ্ছিল। উনি মাথা নেড়ে বললেন—না, যাবে কেন? উই উইল লাইক ইওর কম্পানি। এ সময়ে আমার ছেলের বয়সি কেউ সামনে থাকলে ভাল লাগবে। তুমি কী করো?

—কিছু করছি না।

—বেকার?

—হ্যাঁ।

—সবাই বেকার আজকাল। আমার অফিসে আর কারখানায় কত ছেলেছোকরা রোজ এসে কাজ খুঁজে যায়। অত কাজ কে কাকে দেবে?

সোমেন মৃদু একটু ম্লান হাসল।

—কি করবে ঠিক করোনি

সোমেন একটু ইতস্তত করে বলে—আমি বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করছি।

উনি ভ্রু কুঁচকে বলেন—কোথায়? অ্যাব্রড?

—হ্যাঁ। আমেরিকায়।

—ওঃ। বলে উনি স্তব্ধ থেকে দেয়ালের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর গভীর একটা শ্বাস ছেড়ে বললেন—আমি কয়েকবার গেছি। বেশ ভাল দেশ। যাও।

সোমেন মাথা নত করে।

উনি বললেন—এই বুড়ো বয়সে আবার হয়তো যেতে হবে।

—কোথায়?

—লন্ডন। ছেলের খোঁজ খবর করতে। কেন যে আর আমাদের পছন্দ করে না তা জেনে আসতে। আমি নিজের ইচ্ছেয় যাচ্ছি না, শৈলীর জন্য যেতে হচ্ছে। দাঁড়াও ওদের খবর দিই—

বলে উনি ও ঘরে চলে গেলেন।

মুহূর্ত পরেই রিখিয়া দৌড়ে আসে, পরদা সরিয়েই উদ্ভ্রান্ত একটা আনন্দে শ্বাসরুদ্ধ অস্ফুট স্বরে বলে—তুমি!

তুমি শুনে একটু হাসে সোমেন। এবং তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারে, এই বালিকাটিকে সে...সে বোধ হয়...হ্যাঁ...ভীষণ

ভাবতেই সোমেন—যে সোমেন মেয়েদের সঙ্গে বহুকাল ধরে অন্তরঙ্গভাবে মিশেছে, কারও কারও শরীরও ছুঁয়ে রেখেছে—সেই সোমেনের কান মুখ ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে লজ্জায়। বুকে ডুগডুগি বাজে।

সোমেন বলে—কেমন আছো?

—এতদিনে মনে পড়ল? কথা বলব না তো, কিছুতেই না।

—আমি খুব ব্যস্ত ছিলাম।

—কী নিয়ে শুনি!

সোমেন কী উত্তর দেবে! সে কিছু নিয়েই ব্যস্ত ছিল না, আবার ছিলও।

—প্রায় একমাস। রিখিয়া বলে।

—তুমিও তো খোঁজ নাওনি। সোমেন বলে।

রিখিয়া মুখ ভার করে বলে—আমাকে কোথাও বেরোতে দেয় বুঝি! আজকাল খুব কড়া ডিসিপ্লিনে রেখেছে মা। কোথাও ছাড়ে না। দাদা ওরকম করেছে বলেই এখন আমার ওপর সকলের নজর। বলে মৃদু আদুরে হাসি হাসে। আবার গম্ভীর হয়। বলে—অবশ্য রাস্তাঘাটও ভাল চিনি না। তা হলেও ঠিক একদিন চলে যেতাম ঢাকুরিয়ায়। রোজ ভাবি, আজ আসবে। ওমা, কেউ আসে না।

—তুমি কোনওদিন যাওনি বলেই আসিনি। সোমেন মিথ্যে করে বলে। পরমুহূর্তেই যোগ করে দেয়—তুমি না গেলেও মধুমিতা কিন্তু যেত।

একটু যেন শিউরে ওঠে রিখিয়া। বড় চোখে চেয়ে বলে—কে গিয়েছিল? মধুমিতা?

সোমেন মাথা নাড়ল। মধুমিতার কোনও খবর সে এখনও জানে না। বুকের মধ্যে মেঘের মতো ভয় জমে ওঠে স্তরে স্তরে। আস্তে করে বলল—সে কথা থাক।

রিখিয়া বোধ হয় বুঝল। সেও বলল—থাক গে। কিন্তু আপনার বাসায় যেতে আমার খুব লজ্জা ছিল। মধু তো আমার মতো নয়। ওর কোনও লজ্জা নেই। এমনকী ও স্কুলের দেয়াল টপকে ক্লাস থেকে পালাত ছেলেদের সঙ্গে মিশবে বলে। পুলিশ দেখলে ঢিল ছুঁড়ত।

—তাই নাকি!

রিখিয়া মুখ গম্ভীর করে বলে—আমি অত স্মার্ট নই। আপনি তো জানেন।

—আবার আপনি করে বলছ কেন?

রিখিয়া অবাক হয়ে বলে—আপনি করেই তো বলি!

—একটু আগেই 'তুমি' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলে যে!

—যাঃ! ভুল হয়েছিল তবে।

—ভুল!

—ভুলই। আসুন, মা বসে আছে আপনার জন্য।

সোমেন ঘরে ঢুকে দেখে, শৈলীমাসি খুব রোগা আর শুকনো হয়ে গেছেন। তাঁর শরীরে যেটুকু জীবনীশক্তি অবশিষ্ট আছে, সেটুকু সব জমা হয়েছে চোখে। বোঝা গেল একটু আগেও কাঁদছিলেন। এইমাত্র চোখ মুছে হাসিমুখে বসেছেন। চোখ সজল।

ভারি গলায় বললেন বাবা, তুমি কেন আমেরিকায় যাবে? উনি এসে এইমাত্র বললেন, তুমিও চলে যাচ্ছো।।

সোমেন হেসে বলে—এখনও ঠিক নেই, তবে চেষ্টা করছি।

—না, না। কেন যাবে? ননী তোমাকে যেতে দিচ্ছে কেন? ও কি রাজি হয়েছে।

—না।

—ওকে শীগগীর একদিন আসতে বোলো। আমি ওকে বলে দেবো, যেন কিছুতেই তোমাকে যেতে না দেয়।

—কেন মাসি? ছেলেরা কী চিরকাল ঘরে থাকে?

শৈলীমাসি হঠাৎ চুপ করে কী যেন ভেবে বলেন—সে কথাও ঠিক। ছেলেদের আটকে রেখে আমরা তাদের ক্ষতিই তো করি। কিন্তু, তোমরা সব দূরে গিয়ে পর হয়ে যাও যে! আমার ছেলেটা বলে শৈলীমাসি বিছানা হাতড়ে একটা এয়ারোগ্রাম খুঁজে পেয়ে সোমেনের দিকে বাড়িয়ে বললেন—দেখো।

সোমেন চিঠিটা নিল না, বলল—থাক মাসি।

চিঠিটা হাতে নিয়ে বসে থেকে শৈলীমাসি অনেকক্ষণ বাদে বললেন—উনি যাচ্ছেন লন্ডনে। কিন্তু তাতে কিছু হবে না। আমি নিজে যদি যেতে পারতাম! বলে সোমেনের দিকে চেয়ে বলেন—কি করে যাব বলো তো! কত দূর! আমি এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যেতে পারি না। পৃথিবীটা যে আমার কাছে কি বিরাট জায়গা হয়ে গেছে তা তোমরা বুঝবে না। কেবল। মনে হয় চারদিকটা আমার কাছ থেকে কত কত ভীষণ দূরের হয়ে গেছে!

রিখিয়ার বাবা কোনের দিকে অন্ধকারে একটা ইজিচেয়ারে বসেছিলেন, পায়ের কাছে কুকুর, হাতে গেলাস। আস্তে, সেই এড়ানো গলায় বলেন—অত অ্যাটাচমেন্ট বলেই তো ছেলে তোমাকে পছন্দ করে না। ছেলেরা একটু বয়স হলে আর মা-বাপের অতিরিক্ত স্নেহকে ভাল চোখে দেখে না। তখন তারা অনেকের ভালবাসা আর মনোযোগ চায়। কিন্তু এসব সাইকোলজি তুমি তো মানেন না।

—মানি। শৈলীমাসি বলেন—ওকে ফিরিয়ে আননা, দেখো আমি আর অত ছেলেছেলে করব না। করার আর সময়ও নেই। বেশিদিন কি বাঁচব বলে ভেবেছ নাকি তোমরা? |

—মা, চুপ! রিখিয়া ধমক দেয়।

আজও সেই অদ্ভুত অনুভূতিটা হচ্ছিল সোমেনের। শৈলীমাসির অস্তিত্ব থেকে যেন মৃত্যুর জীবাণু উড়ে আসছে ঝাঁক বেঁধে। শ্বাসে শ্বাসে ঢুকে যাচ্ছে বুকের ভিতরে।

শৈলীমাসি বলেন—যাও সোমেন, রিখিয়া, ওকে নিয়ে যা। রুগির ঘরে অত বসে থাকতে নেই।

সোমেন হাঁফ ছেড়ে উঠে এল।

রিখিয়ার ঘরে এসে উজ্জ্বল আলোয় রিখিয়ার দিকে তাকাতে সংকোচ হচ্ছিল সোমেনের।।

রিখিয়া কথা বলছিল না। হুট করে এক ফাকে বেরিয়ে গিয়ে বোধ হয় চাকরকে চা খাবারের কথা বলে এল। এসে গোমড়ামুখে বসে থাকল সামনে। অ্যালবামের পাতা। ওলটাচ্ছে। উপেক্ষা নয়, অভিমানের ভঙ্গি।

সোমেন বলে—রিখিয়া, মধুমিতা তোমাকে চিঠি লেখেনি?

—লিখেছিল। কেন?

—এমনিই।

—ওর কথা ভুলতে পারছেন না?

সোমেন মাথা নেড়ে বলে—ভুলব কেন? ও একটু অদ্ভুত মেয়ে ছিল।

—ওর কোনও খবর পাননি?

—না।

—আমিও না। ও আসে না। বোধ হয়—

বলে খুব বিষন্ন চোখে চেয়ে রিখিয়া চোখ নামিয়ে নিল। বলল—জানাই ছিল।

—হ্যাঁ। কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে কথা বলছ না কেন?

—বলব কেন? আপনি আমেরিকায় কেন যাবেন?

সোমেন বিষন্ন মুখে বলে—কেন যাব না বলো তো? কেউ যেতে দিতে চাইছে না। মা, বাবা না, তোমরা নও। কেন?

—উই হ্যাড বিটার এক্সপিরিয়েন্স। কিন্তু সে কথা থাক।

রিখিয়া অ্যালবাম বন্ধ করে বলে—আমেরিকায় আমারও খুব যেতে ইচ্ছে করে। বিদেশ কার না ভাল লাগে বলুন? কিন্তু এখন আমি মত পাল্টে ফেলেছি। দাদার জন্যে।

—জানি। কিন্তু আমার তো তা নয়!

—না তোক গে। আপনি যাবেন না। আমার তা হলে ভীষণ খারাপ লাগবে।

এ খুবই গোলমেলে কথা। কিন্তু সোমেন কথাটা বুঝল। তবু দুষ্টুমি করে বলে-কেন খারাপ লাগবে রিখিয়া?

—আমার চেনা জানা লোকের সংখ্যা খুব কম। আমার ভাল লাগে এমন লোক হাতে। গোনা যায়। তার মধ্যেও যদি একজন চলে যায় তো খারাপ লাগবে না!

—তোমার ভাল লাগা লোক কে কে রিখিয়া? | রিখিয়া হাসছিল। এ কথা শুনে হেসে উপুড় হয়ে পড়ল। বলল—আপনাকে দেখে। বোঝাই যাচ্ছে যে আপনি কিছুতেই আমেরিকায় যাবেন না।

—সে কী।

—আপনি যেতে চাইছেন না।

—কী করে বুঝলে?

—আমি বুঝি।

—তুমি থট রিডার?

রিখিয়া ঠ্যাং নাচিয়ে বলে—নয় কেন?

সোমেন খুব নিস্পৃহভাবে যেন ভুল বুঝতে পেরে বলে—তাই তো! নয় কেন?

রিখিয়া বলে—বাবা অনেক মহাপুরুষের বই এনে মাকে শোনান। এর মধ্যে একটা বং থেকে বাবা পড়ছিলেন। একজন মহাপুরুষ বলেছেন—আমি যে তোমার অন্তর্যামী তাক। এমনিতে নয়। তুমি যতক্ষণ আমাকে ভালবাসো ততক্ষণই আমি তোমার অন্তর্যামী। তোমার ভালবাসাই আমাকে অন্তর্যামী করেছে নইলে আমি তোমার কেউ নই।

বলে রিখিয়া হাসল। সোমেন ওর বুদ্ধি দেখে অবাক। তারপর অনেক ভেবে বলল—শোনো রিখিয়া, আমি মাত্র বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করছি। আমার এক চেনা ভদ্রলোক কতগুলো ফার্মের ঠিকানা দিয়েছেন, আমি অ্যাপ্লাই করেছি অ্যামেরিকায়। সেই ভদ্রলোক ওখানেই থাকেন, তিনি ফিরে গিয়েও চেষ্টা করবেন যাতে আমি একটা চাকরি পেয়ে যাই। ওখানে অনেক প্রসপেক্ট। এখানে আমার কিছু হবে না।।

—যান না, কে বারণ করছে।

—তুমিই তো করছ।

—আমার বারণে কার কি যায় আসে?

সোমেন অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। এই সব ভাবপ্রবণতাকে কি সে প্রশ্রয় দেবে? দিয়ে কী লাভ? সেই গাব্বুকে পড়িয়ে জীবন কেটে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে রিগ্রেট লেটার পাবে। বয়স গড়িয়ে যাচ্ছে, সরকারি চাকরি আর পাবে না, প্রাইভেট ফার্মেও না। কি হবে থেকে! বড়জোর কয়েকজন মানুষ খুশি হবে।

—আমাকে যেতে হবে রিখিয়া।

রিখিয়া অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে—তা হলে আমি খুব কাঁদব।

অনেকটা রাত করে সোমেন বাড়ি ফিরল।

সবাই শুয়ে পড়েছে, বউদি এসে দরজা খুলে দিল। বলল—তোমার খাবার ঢাকা আছে। সোমেন।

—হুঁ।

—তোমার দাদাকে সামলাতে পারছি না। কি কান্না! এ অবস্থায় ওঁকে ফেলে মার চলে যাওয়াটা বোধ হয় ভাল হল না সোমেন।

সোমেন অন্যমনস্কভাবে বলে—দাদা অত কাদছে কেন? আমারও তো মন খারাপ, কাদছি না তো।

—তোমার সঙ্গে ওঁর তুলনা করছ কেন? ও তো নরমাল নয়। সব সময়ে একটা শিশুর মতো হাবভাব, শিশুর মতোই খুঁতখুঁতে। এখন ওঁর মা বা বাবাকে দরকার। নইলে খুব হেলপলেস ফিল করে।।

সোমেন বুঝে মাথা নাড়ল। বউদি চলে গেলে সে একা একা খেয়ে নিয়ে ঘরে এসে সিগারেট নিয়ে বসে। মার বিছানাটা ফাকা। তার খুব খারাপ লাগছেনা। এ ঘরটা আজ থেকে। তার একেবারে একার ঘর হয়ে গেল। কেউ ডিস্টার্ব করবে না।

আজ অনেকক্ষণ জেগে থাকতে ইচ্ছে হল সোমেনের। অন্য দিন এ সময়ে ঘুম পায়। মা পানের বাটা নিয়ে কথার ঝুড়ি খুলে বসে। সে সব কথা শুনতে ইচ্ছে করে না সোমেনের। আজ কেউ বলার নেই, তাই বুঝি ঘুম আসে না।

অনেকগুলো সিগারেট খেল সোমেন। আমেরিকায় যাবে কি যাবে না তা নিয়ে অনেকবার লটারি করল। ছোট্ট ছোট্ট কাগজে কয়েকবার যাব' আর 'যাব না' লিখে কাগজগুলো ভাঁজ করে দু' হাতের তেলো জড়ো করে ভাল করে মিশিয়ে দিয়ে টেবিলের ওপর ফেলল ছড়িয়ে। চোখ বুজে একটা তুলে নিয়ে খুলে দেখল, লেখা আছে—যাব না। দ্বিতীয়বার উঠল—যাব। বারবার তিনবার। তিনবারের বার কাগজ তুলতে যাচ্ছে এমন সময়। তাকে ভীষণ চমকে দিয়ে কে যেন কাছ থেকে ডাকল—সসামেন।

সোমেন ঘুরে বসে দেখে, দাদা।

—দাদা!

—মা চলে গেল? বলে উদ্ভ্রান্ত রণেন ঘরের চারদিকে তাকায়।

সোমেন উঠে বলে—রাত একটা বাজে দাদা, ঘুমোবে না?

—তুই কী করছিস?

—ও কিছু নয়। ঘুম আসছিল না।

—আমারও আসছে না। মা যাওয়ার সময় কেঁদেছিল?

—হ্যাঁ।

রণেন মায়ের চৌকিতে বসে বলে—আমার হার্ট খুব খারাপ। ডাক্তার বলেছে। আমি মা। বাবাকে ছেড়ে থাকতে পারব না। তা হলে হার্ট আরও খারাপ হবে। আমাকে মার কাছে কাল পৌঁছে দিয়ে আসবি।

—বাঃ, তা হলে চাকরি করবে না?

—চাকরি করব কী করে? শরীর যদি ভাল না থাকে!

—বউদি আছে, দেখবে। ডাক্তার ওষুধ দেবে। চিন্তা কী?

—না। রণেন খুব জোরে মাথা নাড়ে। বলে—আমি যাবই।

—আচ্ছা, এখন গিয়ে শুয়ে থাকো।

রণেন চলে গেল। কিন্তু একটু বাদেই সোমেন শুনল, বাইরের ঘরে রেডিয়োয়াগ্রামে খুব মৃদুস্বরে বাজছে রবি ঠাকুরের নিজের গলায় গাওয়া সেই অবিস্মরণীয় গান—অন্ধজনে। দেহো আলো, মৃতজনে দেহে প্রাণ...

চোখ ভরে জল আসে সোমেনের। কি করবে সে? কিছু করার নেই।

তবু উঠে গিয়ে বাইরের ঘরে দেখে, রণেন সোফা কাম-বেডে বসে আছে চুপ করে। ভূতের মতো। তাকে দেকে ঠোটে আঙুল তুলে চুপ থাকতে ইঙ্গিত করল।

সোমেন আস্তে আস্তে গিয়ে দাদার পাশে বসে থাকে।

গান শেষ হয়। রেকর্ডে পিনের একটা ঘটানির শব্দ হতে থাকে।

রণেন মুখ ফিরিয়ে বলে—ভাল না?

—কী দাদা?

—গানটা?

—খুব ভাল।

রণেন মাথা নেড়ে বলে—খুব। আমাকে একটা সিগারেট দে। আমার প্যাকেটে আর। নেই।

খুব লজ্জা পায় সোমেন। দাদা তার কাছে সিগারেট চাইছে! কত বড় দাদা তার চেয়ে!

তবু সোমেন উঠে গিয়ে নিজের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট এনে দেয় রণেনকে।। সিগারেটটা নিয়ে বসে থাকে রণেন। অনেকক্ষণ বাদে বলে কাঁদবি না?

—কেন কাদব?

—মার জন্য? আয় দুই ভাই মিলে একটু কঁদি।

সোমেন হেসে বলে—পাগলামি কোরো না দাদা। কেঁদে লাভ কি? মা গিয়ে ভালই হয়েছে। নইলে বাবার বড় কষ্ট।

রণেন কয়েকবার ফুপিয়ে উঠল। তারপর অতি কষ্টে সংযত হয়ে বলে—মাকে তুই চিনবি কী করে? তোর বয়সে কতদিন মাকে দেখেছিস! আমি প্রায় চল্লিশ বছর ধরে...

বলেই রণেন থমকায়, হঠাৎ বলে—কত বয়স হল আমার বলো তো! অ্যা!

বীণা অন্ধকারেই নিঃশব্দে উঠে আসে।

কোনও ভূমিকা না করেই এসে রণেনের হাত ধরে বলে—চলো তো।

রণেন সন্ত্রস্ত চোখে তাকায়, তারপর ওঠে। রেডিয়োগ্রামের খুব মৃদু আলোতেও ওর মুখ। দেখতে পায় সোমেন। অদ্ভুত একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় বিদ্ধ মুখ।

সোমেন দাদার মুখটা ভুলতে পারে না। তার সারারাত ভাল ঘুম হল না। আজেবাজে স্বপ্ন। দেখে উঠে বসল বার বার। ভোরের দিকে ঘুমলো খানিকক্ষণ। বেলা করে উঠল।

সকালে উঠেই তার মনে হল, দাদা এখনও তার আমেরিকায় যাওয়ার প্ল্যান জানে না। জানলে? আবার চেঁচামেচি করবে, কাঁদবে, বলবে—তুই যাস না। গেলে আমি বাঁচব না। দাদা কীরকম স্পর্শকাতর আর স্যাঁতসেঁতে মানুষ হয়ে গেছে।।

সকালবেলাতে আবার সে ভাবতে বসল। কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারল না। কী করবে?

তার এই বয়সে, এখন মাত্র দুটো জিনিস খুব ভাল লাগে। এক হল, রিখিয়ার কথা। আর একটা, আমেরিকার কথা।

একটা শ্বাস ফেলল সে। দুটোই পরস্পরকে শত্রুতা করছে। হঠাৎ কেন যেন খুব বাবার কথা মনে পড়ছিল। খুব ইচ্ছে করছে কাউকে সব উজাড় করে বলতে। সে শুনবে, ভাববে, সিদ্ধান্ত নিয়ে সোমেনকে বলে দেবে পথ। এরকম ঈশ্বরের মতো মানুষ একজনকেই সে চেনে। বাবা।

যাবে নাকি একবার বাবার কাছে?

যাবে। আজ না হয় কাল। মার জন্য মনটা খারাপ লাগে। মা চলে যাওয়ার পর একটা দিন চলে গেল। আরও দিন যাবে। তারপর আর খারাপ লাগবে না।

॥ পঁচাত্তর ॥

অনেকরকম ভয়ভীতি ছিল ব্রজগোপালের মনে। ঠাকুর যেমন চাইতেন তেমনি জীবনটাকে খুব সাদামাটা করে এনেছিলেন তিনি। খুব কম আয়োজন তাঁর জীবনে। যত অল্প উপকরণে দিন কাটানো যায় ততই মনটা ভাল থাকে, বিষয়লগ্ন হয় না বলেই ঊর্ধ্বমুখী হয়। এখন ননীবালা এলেন, ব্রজগোপালকে বুঝি আবার সংসারী করে ফেলেন।

টর্চ জ্বেলে অন্ধকারে পথ দেখিয়ে রাস্তা থেকে ঘর পর্যন্ত যখন ননীবালাকে নিয়ে আসছিলেন তখনই এরকমটা মনে হল। এখটু ভয়, একটু সংশয়। অবশ্য ভাল না লাগলে ননীবালা ফের চলে যাবেন এবং ব্রজগোপালও আবার যেমন তেমন হয়ে যাবেন। তবু মনটা উদ্বিগ্ন লাগছিল।

ঘরে একটা চৌকি ছিলই। সেটাতে বিছানা পাতা হল ননীবালার। নিঝুম রাত। ঘুম আসে নতুন জায়গায়। কয়েকদিন বার বার রাতে উঠে পান খেতেন, ব্রজগোপালকে সজাগ করে বাইরে যেতেন।

ব্রজগোপাল জিজ্ঞেস করেন—মন খারাপ করছে তো ওদের জন্য? বরং আবার কিছুদিন গিয়ে থেকে এস।

ননীবালা মাথা নেড়ে বলেন—না। এখানে এসে পৌঁছে সংবাদ দিলাম, সে চিঠিটারও উত্তর আসেনি। ওরা কি আমার কথা ভাবে নাকি? আমারও আর দরকার নেই যাওয়ার।

—ওরা না ভাবুক, তুমি তো মা, তোমার তো আর ছাড়ান কাটান নেই।

ননীবালা অন্য কথা পাড়েন—শোনো, খুব তো পরের জমিতে আর পরের ঘরে বাস করে কর্তাত্তি করছ, বহেরু চোখ বুজলে উৎখাত হবে। বরং বাস্তুজমিটায় একটা কুঁড়েঘর হলেও তোলো। এরকম থাকা আমার ভাল লাগে না। পাকিস্তান হয়ে অবধি পরের দরজায় পড়ে আছি।

ব্রজগোপাল গম্ভীর হয়ে বলেন—গুচ্ছের টাকা নষ্ট। আমরা চোখ বুঝলেই সব ফরসা। ছেলেরা কি এতদূর আসবে?

ননীবালা বলেন—আসল কথাটা কী বলো তো? এর আগেরবার এসে বহেরুর মেয়ের কাছে শুনেছিলাম ষষ্ঠীচরণকে নাকি সব উইল করে দিয়েছ!

ব্রজগোপাল মাথা নেড়ে বলেন—দিয়েছি কিছু। দুকাঠা বাস্তু, সে ওই পুবধারে। ও জমিটা দিইনি, ও তোমার নামে কেনা। কুয়ো কাটিয়ে, বাঁধিয়ে, চারধারে বেড়া দিয়ে যত্নে রেখেছি।

—সে বেশ করেছ। এবার ঘর তোলো। বহেরুকে আজই বলব, বাঁশ টিন সব জোগাড় করবে।

বহেরু পরদিন এসে সব শুনল, রামভক্ত হনুমানের মতো। তারপর লাফ দিয়ে উঠে বলল—কর্তার এক পয়সা খরচ করতে হবে না। বাড়ি আমি তুলে দেব।

ব্রজগোপাল ধমক দিয়ে বলেন—তুই তুলবি কেন?

—ব্রাহ্মণকে গৃহদান মহাপুণ্য। ও আপনাকে ভাবতে হবে না। আমার কর্মফল কিছু কাটুক। অনেক খুনজখম করেছি কর্তা, এই দুই হাতে আপনার মতো সৎ-ব্রাহ্মণের জন্য কিছু করি। তারপর আপনি গুরুস্থানীয়ও বটে।

ব্রজগোপাল আরও ধমকালেন। বহেরু শোনে না। সে বলে—বাঁশ টিনের পলকা জিনিস বছর বছর পালটাতে হয়। গতবারে ইট কেটেছিলাম, তার হাজার দশেক পড়ে আছে। এখনও। সিমেন্ট না পাই চুন সুরকির গাঁথনি দিয়ে পাকা ঘর তুলে দেব।

বিশাল দলবল নিয়ে বহেরু গিয়ে জমিটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মচ্ছবের মতো ব্যাপার। লাগিয়ে দিল, তার চোখেমুখে একটা প্রচণ্ড আনন্দ। দিনে পাঁচবার এসে ননীবালাকে ডাকে—মাঠান, এসে দেখে যান কেমন হচ্ছে।

ব্রজগোপাল গা করেন না। কিন্তু ননীবালা যান, বলেন—ও বাবা বহেরু, পায়খানা বাথরুম সব, অতদূরে করিস না। শহরে থেকে অভ্যাস, সব সেখানে এক ছাদের তলায়। তোদের এখানে শেয়াল কুকুর সাপ ভূতের তো অভাব নেই, রাতবিরেতে বেরোতে ভয়। করে। তারওপর বুড়োবুড়ি, কে কখন হোঁচট খেয়ে পড়ে হাড়গোড় ভাঙি।

বহেরু রাজি, বলে—তাই হবে। বাংলো প্যাটার্ন।

শুনে ননীবালা হাসেন। এক ছাদের তলায় হলেই তা বহেরুর কাছে সাহেবি বাংলো।। অনেককাল আগে কলকাতায় বাসা দেখে ও বলেছিল—এ হচ্ছে বাংলো প্যাটান। কার থেকে যেন শিখেছিল ইংরেজি কথাটা! তাই শুনে কত হেসেছে রণেন আর সোমেন।

ব্রজগোপাল ঘরেদোরে বেশি থাকেন না। বেরিয়ে পড়েন যাজনে। ঘরবাড়ি তার জন্য। নয়। মানুষ যে আছে সে হল তার অস্তিত্ব, আর মানুষ যে কিছু হয় সে হল তার বৃদ্ধি। এই অস্তি-বৃদ্ধির মামলোত সংগ্রহ করতে হয় আবার পরিবেশ থেকে। সার কথা, নিজের পরিবেশকে সেবা দিয়ে, সাহায্য দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে পরিপুষ্ট করে তোলো। তা নইলে সে। যদি শুকিয়ে যায় তো জীবনের রস টানবে কোত্থেকে? তুমিও শুকিয়ে মরবে যে, তা যতই তুমি কেষ্টবিষ্ট হয়ে থাকো। সিধে মানুষ, বড় মানুষ বড় একটা দেখা যায় না আজকাল, সব পোকা লাগা। হাত-পাওলা মানুষও কেমন যেন নুলোন্যাংলা, ধনীও ভিখিরির সামিল হয়ে হা-পয়সা জো-পয়সা করে খাবি খাচ্ছে। আঝকাল লোকজনের চোখেমুখে সব সময়ই একটা মাতলা ভাব লক্ষ করেন ব্রজগোপাল, কেমন একটা মানসিক নেশার ঘোরে চলেছে। কলকাতার মতো বড় শহরে সে-ভাবটা আরও বেশি। মানুষ বড় তিতিবিরক্তি, রাগী, লোভী, বড় বেশি অস্থির। কীসে ভাল হবে বুঝতে পারে না। যত মানুষ তত সমস্যা। এইরকম গোলমেলে সমাজে ব্রজগোপাল সুস্থির হয়ে বসে থাকেন কী করে! ঘুরে ঘুরে পচনের ধারাটা দেখেন, লক্ষ করেন কতটা নিরাময়ের যোগ্য, আর কতটাই বা কেটে বাদ দিতে হবে। দেখে শঙ্কিত হন। অবসাদও আসে। ঠাকুরই আবার শক্তি যুগিয়ে দেন। এই বয়সেও ব্রজগোপাল ফের কষ্টসহিষ্ণু হচ্ছেন।

ননীবালা বলেন—অত সইবে না, এখন বসে বিশ্রাম নেওয়ার বয়স।

ব্রজগোপাল শান্তস্বরেই বলেন—ঠাকুর শরীর দিয়েছেন, বসিয়ে রাখার জন্য নয়, কাজ করার জন্য।

ভূতের বেগার। ধর্মকথা আজকাল কেই বা শুনছে?

ব্রজগোপাল ভেবে বলেন—ঠিক, তবু বলি, আজকাল ধর্মের বড় দাপট বেড়েছে। কত ম্যাজিকঅলা দু-পয়সা করছে দেখছ না! দেশে এখন দীক্ষার বান ডেকেছে। গুরু গুরু করে পাগল হচ্ছে লোক। নিরাপত্তার অভাববোধ থেকে এরকম ক্ষেপে যায় মানুষ। ম্যাজিক না। দেখলে কিছু বিশ্বাস করে না। সবাই কৃপা চাইছে। বোঝে না যে কৃ অর্থে করা, তারপর পা অর্থাৎ পাওয়া। করে না পেলে কি ঠাকুরের কৃপা এমনি হয়! মানুষকে এটুকু বোঝানো দরকার যে সেই চির-রাখাল আজও বসে আছেন কদম্ববৃক্ষের তলায়, কত বাঁশি বাজাচ্ছেন, তবু তাঁর হারানো গোধন দূরের চারণক্ষেত্র থেকে ফিরে আসবার পথ পাচ্ছে না। তাঁর সেই হারানো গোধন ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করি। আর কী করব?

দু'মাসের মধ্যেও চিঠিপত্র এল না কলকাতা থেকে। কেউ দেখা করতেও এল না। মনটা বড় উচাটন লাগে ননীবালার। দিনরাত প্যাঁচাল পাড়েন—কে কীরকম আছে কে জানে! খবরবার্তা নেই। খোঁজ না নিলি, নিজেরা কেমন আছিস তা তো দুখোট লিখে জানাতে পারিস?

ব্রজগোপাল শুনে মাথা নেড়ে বলেন—তোমার মন কেমন করছে। যাও বরং গিয়ে দু-চারদিন থেকে এস।

ননীবালা ঝামড়ে ওঠেন—কেন যাব? ওদের যদি টান না থাকে তো আমারই বা কি দায় ঠেকেছে? দুমাস হয়ে গেল! একটা পোস্টকার্ড পর্যন্ত লিখতে পারল না।

ব্রজগোপাল হেসে বলেন—এ হল অভিমানের কথা। ওরা তো দায়িত্বজ্ঞানহীন হবেই, জানা কথা। দায় তোমারই।

ননীবালা মাথা নেড়ে বলেন—না। দেখি, কতদিনে বুড়োবুড়ির কথা মনে পড়ে।

সারাদিনটাই প্রায় নয়নতারা এসে ননীবালার আশেপাশে ঘুরঘুর করে। বেড়ালের মতো। বিন্দু আসে রোজ, রান্নার কাঠ দিয়ে যায়, ক্ষেতের কলাটা মুলোটা রেখে যায়, কোটা চিড়ে, ভাজা মুড়ি পৌঁছে দেয়। আসে মতিরাম বামনবীর, কালীপদ ষষ্ঠীচরণ এসে খেলা করে দোরগোড়ায়। বামুনবাড়ির পেসাদের লোভে হামাগুড়ি দিয়ে গন্ধ বিশ্বেসও এসে বসে থাকে। রান্নাঘরের দরজায়। চোখে দেখে না, কিন্তু নাকে গন্ধ টেনে বলে—উরেব্বাস, কী গন্ধ। মাঠান, তোমাদের চচ্চড়িতে! কোকা, কপিল যেমন-তেমন হোক একবার দিনান্তে এসে খোঁজ নেবেই। বৃহস্পতিবার সন্ধেয় লক্ষ্মীর পাঁচালি শুনে বাতাসা, শশা আর ফলটলের প্রসাদ নিতে সবাই জুটে যায়। হরির লুটের বাতাসা কুড়োতে আসে। এসব ভুলে গিয়েছিলেন। ননীবালা কলকাতায়। এখানে এসে আবার সব করতে শুরু করেছেন। সকলের সঙ্গে। জড়িয়ে পড়েছেন খুব। ছেড়ে যেতে মন চায় না। এ বছর প্রথম দুর্গাপূজা করল বহেরু। পুজোর আগেই চলে এসেছিলেন ননীবালা। দুঃখ ছিল। বহেরু পুজোয় মেতে গিয়ে সে দুঃখ ভুললেন। বেশ লাগল গাঁয়ের পুজো, অনেককাল পর। একটু একটু করে কলকাতাকে ভুলছেন। কত বড় জায়গা এটা, আর কি শীতটাই পড়েছে এবার!

বহেরু ময়দানবের মতো খেটে বাড়িটা খাড়া করে দিল। ছাদ ঢালাইয়ের অনেক ঝামেলা বলে ওপরটায় টিন লাগাল। জানলা দরজা বসে গেছে। গৃহ প্রবেশের নেমন্তন্ন করে ফের কলকাতায় চিঠি দিলেন ননীবালা। বুকটা দুরদুর করে। আসবে তো কেউ?

ননীবালা সবিস্ময়ে একটা জিনিস বুঝতে পারেন। আগে ভেবে রেখেছিলেন যে, হাভাতে স্বামীর ঘর করতে এসে বুড়ো বয়সে বড় অভাবের কষ্ট পাবেন। কিন্তু এসে দেখছেন, কোনওদিন অভাবের ছায়াও মাড়াতে হচ্ছে না। যা চাইছেন তাই জুটে যাচ্ছে। শুধু যে বহেরু দেয় তা নয়, হঠাৎ কোত্থেকে কোন দূরান্তের মানুষ এসে

ঝপাস করে একজোড়া চওড়াপেড়ে শাড়ি পায়ে ফেলে উবু হয়ে প্রণাম করে যায়। কেউ বা একঝুড়ি তরকারি এনে ফেলে গেল। ব্রজগোপাল যাজনে বেরিয়ে যখন ফেরেন তখন কত কী বয়ে আনেন। বলেন, সব জোর করে গছিয়ে দেয়, ফেলতে পারি না। তা দেওয়ার অভ্যেস ভাল। যে দিতে শেখে, তার বুদ্ধি অনেকটা ঠিক আছে। ব্রজগোপাল নিজে গুরু নন, গুরুর নাম বিলিয়ে বেড়ান ঋত্বিক বা পুরোহিত হিসেবে। কেউ তাঁকে গুরু বলে ভুল করলে হেসে বুঝিয়ে দেন—গুরু মানে হচ্ছে। ওজনে ভারী। যার জ্ঞানের ওজন, উপলব্ধির ওজন যত বেশি সে তত বড় গুরু। সেই হিসেব। ধরলে দুনিয়ার কে গুরু নয় বলো, কাঙালের কাছেও শেখবার আছে, তার নিজস্ব অর্জিত জ্ঞানও তো কম নয়! কিন্তু সদগুরু যিনি, সন্ত যিনি, তাঁর মধ্যে থাকে সর্বজ্ঞত্ব বীজ। আমি তাঁর পাঞ্জাধারী পুরুত, লোককে তাঁর ঠিকানা দিয়ে বেড়াই। তোমরা নিজের চেষ্টায় পৌঁছেও বাবারা। তো পুরুত হয়ে তাঁর যজমান কম নয়। ব্রজগোপালকে হাত পাততে হয় না, লোকে হাত পাতবার আগেই দেয়। তাই ব্রজগোপালের কোনও অভাব নেই।

এইটে দেখে বড় বিস্ময় ননীবালা। হাড়-হাভাতে বাউণ্ডুলে তাঁর স্বামী। তিনি কষ্ট পাবার জন্য তৈরি হয়েই এসেছিলেন। এসে দেখেন, ঘরে সোফাসেট বা রেডিয়োগ্রাম না থাকলেও ব্রজগোপালের ঘরে লক্ষ্মীর গায়ের গন্ধ ছড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে তরিতরকারি বিলিয়ে। দিতে হয়। দুমাসে প্রায় তিরিশখানা মিহি জমির শাড়ি পেয়েছেন। প্রণামীর টাকা প্রতি মাসেই অন্তত শখানেক কেবল তাঁর হাতে এসেছে। ননীবালা এসব নিয়ে খুব খুশি। বলেন—তোমার। যে খুব রবরবা গো।।

ব্রজগোপাল গম্ভীর হয়ে বলেন, এ কী দেখছ। বিবেকানন্দের নামে কত হাজার বিদেশি কারেন্সির প্রণামী আসে একবার জেনে এস। চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যাবে। তাই ভাবি, ফরেন ক্যাপিটালের জন্য হা-পিত্যেশ করে না থেকে যদি একশো বিবেকানন্দ তৈরি হত দেশে তো টাকাপয়সায় ভাসাভাসি কাণ্ড হত। লোককে যদি ধর্মদান করতে পারো তো পঞ্চভূত এসে তোমার সংসারে বেগার খেটে যাবে।

গৃহপ্রবেশের আয়োজন নমোনমো করে সারতে চাইলেও হল না। ব্রজঠাকুরের বাড়ি হচ্ছে শুনে বৈঁচী, গোবিন্দপুর, বর্ধমান থেকে বিস্তর লোক খোঁজখবর করতে এল। জানালা দরজার কাঠ পাওয়া গেল বিনা পয়সায়, রং পাওয়া গেল, সস্তায় কিছু লোহালক্কড়ও দিল একজন। সবাইকে বলতে হয়, তাই বলেন ননীবালা, বাদ রাখলেন না।

উৎসবের দিন মচ্ছব লেগে যাবে আন্দাজ করে বহেরু বলে দিল—কর্তা, সোজা খিচুড়িভোগ, লাবড়ার তরকারি, আর চাটনির ব্যবস্থা করুন। শেষ পাতে কিছু মিহিদানা আর দই।

কলকাতার জমিতে বাড়ি হবে-হবে করেও হল না। কত আশা ছিল ননীবালার। একবার কৌশল করে রণেনের বউ জমিটা নিজেও কিনতে চেয়েছিল। জমিটায় অভিশাপ আছে বোধ হয়। কতকাল পড়ে থাকবে কে জানে! ছেলেরা কী করবে তাও ঠাকুর জানেন। কিন্তু এখানে। এতদিন পর স্বাধীন হতে পেরেছেন তিনি। যেমন হোক, তবু নিজের বাড়ি। চারদিকে অনেকটা জমি। বাচ্চারা জমি কুপিয়ে এরমধ্যেই গাছ লাগিয়েছে কত! বাড়ি তৈরি শেষ হওয়ার আগেই জমির ক্ষেতে ফুল ফল আসতে লেগেছে। এখানে জীবনটা শান্তিতে না হোক স্বস্তিতে কাটবে। একটু একা লাগবে কি! লাগুক। বলতে কী, জীবনটা তো তাঁর একাই হয়ে গেছে। ছেলেরা খোঁজ নিল না।

গৃহপ্রবেশের দিনটায় সকাল থেকে পুজোর শেষ অবধি উপোস করে থাকা ছাড়া আর কোনও ঝক্কি পোয়াতে হয়নি ননীবালার। রাশি রাশি জিনিসপত্র জড়ো হয়েছে। কে কুটছে, কে বাটছে বোঝা মুশকিল। তবে চেনা-অচেনা সবাই খাটছে। বিশাল এক তেরপলের তলায় যজ্ঞির রান্না হচ্ছে। পুজো চলছে উঠোনে। ব্রজগোপাল নিজে পুজো করলেন না, পুরুত করছে। তিনি গা আলগা দিয়ে বহেরুর উঠোনে বসে আছেন। খোলা রোদে তাঁকে ঘিরে বিস্তর লোক ঠাকুরের কথা শুনছে। উপপাসী মুখে কোনও ক্লান্তি নেই, বৈকল্য নেই। পারেও বটে লোকটা—ননীবালা ভাবেন। প্রতি মাসে একবার করে চতুরহ সহ শিশু প্রাজাপত্য করেন। সে ভারী কষ্টের। প্রথম দিন পূর্বাহ্নে হবিষ্যান্ন মাত্র, দ্বিতীয় দিন অপরাহ্নে একবার হবিষ্যান্ন, তৃতীয় দিন অযাচিত —অর্থাৎ কেউ ব্রতর কথা জেনে কিছু দিলে তাই দিয়ে হবিষ্যান্ন, চতুর্থ দিন কাঠ-উপোস। ননীবালা আপত্তি করলে বলেন—কত অজানিত অপরাধ করছি প্রতিদিন, তার প্রায়শ্চিত্ত করে রাখি। প্রায়শ্চিত্ত মানে দণ্ড নয়, পুনরায় চিত্তে গমন, স্বাভাবিকতায় প্রকৃতিতে ফিরে আসা।

ননীবালা তত্ত্বকথা বোঝেন না, কষ্টটা বোঝেন। মানুষটা চিরজীবন তাঁর অচেনা রয়ে গেল। এখন অবশ্য আর বাধা দেন না। এখানে এসে বুঝেছেন, ব্রজগোপাল খুব হালকা লোক নন। চারদিকে তাঁকে গুরুত্ব দেওয়ার লোকের অভাব নেই। ফকির সাহেব পর্যন্ত এসে কত সম্মান আর আদর দেখিয়ে যান রোজই। স্বামীর সম্মানের ভাগ এই প্রথম পাচ্ছেন ননীবালা। এর আগে কয়েকদিনের জন্য এসে এত বুঝতে পারেননি।

উৎসবের এত হইচইয়ের মধ্যেও ননীবালা উদগ্রীব হয়ে আছেন রাস্তার দিকে। কেউ কি আসবে না? বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। কলকাতার গাড়ির খোঁজ নিচ্ছেন বার বার। মনে মনে। নিজেকে বোঝাচ্ছেন—ওরা তো সব দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে। তারপর চা-টা খেয়ে রওনা হবে, হাওড়া তো কম দূর নয়। হাওড়া থেকে প্রায় দুঘণ্টা গাড়িতে এসে আবার এতখানটা পথ। সময়ের হিসেব করে ননীবালা দেখেন, বারোটা একটার আগে এসে পৌঁছোবে না। কেউ। তবু যদি আসে। কাউকে জোর করার নেই, দাবিদাওয়া নেই, দয়া করে যদি আসে।। বড় অভিমান হয় ননীবালার। একটা জীবন বুক দিয়ে ছেলেপুলে আগলে রেখে মানুষ। করলেন, ওরা তবু কী করে সব ভুলে যায়!

ব্যাপার-বাড়িতে কিছু গণ্ডগোল হবেই। কপিলের ছেলে গাছে উঠেছিল, পড়ে গিয়ে তার। ড্যানা ভেঙেছে! হইচই কাণ্ড। বৈচীর হাসপাতালে তাকে নিয়ে রওনা হল কজন। এর মধ্যে রব উঠল, নন্দলালের পাঞ্জাবির সোনার বোতাম চুরি হয়েছে। নন্দলাল থানা-পুলিশ করবে। বলে চেঁচাচ্ছে। বিন্দু এসে ননীবালাকে বলে—এ হচ্ছে মেঘু ডাক্তারের ছেলেদের কাজ। ওরা বড্ড চোর! নন্দলাল ঘেমো পাঞ্জাবি খুলে বেড়ার গায়ে রোদে দিয়ে পাশ ফিরতে না। ফিরতে চুরি। এত চটপটে হাত আর কার হবে! ফকিরসাহেবের ভূতুড়ে বাড়িতে দিনমানে লোক যায় না, সেইখানে পর্যন্ত গিয়ে ওরা ফকিরসাহেবের পেতলের মোমদানী চুরি করেছিল। অমন ডাকাবুকো আর কে আছে!

এই সব গোলমালে ননীবালা একটু আনমনা হয়েছেন, ঠিক এই সময়ে নয়নতারা ধেয়ে এসে চেঁচিয়ে বলল —ও মা, তোমার ছেলেরা সব এসেছে, নাতিপুতি সব। দেখো গে যাও, চার রিকশা বোঝাই।।

ননীবালা বড্ড তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়েছেন উঠে। মাথাটা চন করে পাক মারল, বুকটায় ধরল। চাপ। শ্বাসকষ্ট। উপোসী শরীরের দুর্বলতাও আছে। চোখ অন্ধকার করে ধীরে ধীরে এসে বসে পড়েন ফের। নয়নতারাই এসে ধরে তাঁকে—ও মা, কী হল গো?

ফ্যাকাসে ঠোঁটে ননীবালা বলেন—নয়ন, তুই যা, ওদের নিয়ে আয়। আমার বুকটা —

কিছুক্ষণ কথা বলতে পারেন না। বুড়ো বয়সের শরীর, বেশি সয়বয় না। নয়নতারা হাপুর-হুপুর হাতপাখার হাওয়া করে, বুক মালিশ করে দেয়। বলে—চিন্তা করো না মা, এসেছে যখন সবাই ঠিক তোমার কাছে আসবে।

—তবু তুই যা। বলে ননীবালা নিজেই ওঠেন আবার। বলেন—এখন একটু ভাল। লাগছে।

ননীবালা বাইরে আসেন। বিশ্বাস হয় না, তবু দেখেন, কুঞ্জলতায় ছাওয়া শুড়ি পথ ধরে অবাক চোখে চেয়ে চেয়ে চারদিক দেখতে দেখতে সব আসছে। পথ দেখিয়ে আনছে বহেরু। সে ননীবালার দিকে চেয়ে একটা ডাকাতে হাঁক পেড়ে বলে—মাঠান, সব আসে পড়েছে! দেখেন। জয় ভগবান।।

ভগবানের বড় দয়া। বড় দয়া। ননীবালার বুকের অন্তস্থলে থিতিয়ে ছিল চোখের জল। নাড়া খেয়ে তারা উঠে এল। চোখ ঝাপসা, কণ্ঠায় আটকে আছে কান্নার দলা।

প্রথমে সোমেন, তার হাত ধরে টুবাই, পিছনে রণেন, বীণা, বুবাই আর বেলকুঁড়ি। কিন্তু তার পিছনে ছেলে কোলে সুন্দর মেয়েটা কে? ও মা! শীলা নাকি! কী সুন্দর হয়েছে শীলা! কোল ভরা মোটাসোটা ছেলেটাই বা কী সুন্দর! স্বয়ং গোপাল। ও কি অজিত? তাই তো! হায় সর্বনাশ, এ আবার কাকে দেখছেন ননীবালা? এ কি সত্যি? ইলা না! মুম্বই থেকে ইলা আবার কবে এল? হাত ধরে গুটগুটিয়ে তার ছেলেও আসছে। ইলার পিছনে ইলার বরকেও দেখা যাচ্ছে যে! এ কি স্বপ্ন দেখছেন ননীবালা? সত্যি তো! ভগবান এটা যেন স্বপ্ন না হয়। এটুকু দয়া করো ভগবান।

রণেনের হাতে বিশাল এক মিষ্টির হাঁড়ি, সোমেনের হাতে মস্ত সন্দেশের বাক্স, রণেন। এসে সোজা পায়ের ওপর পড়ে কান্না—মাগো, আমাদের কি আর মনে পড়ে না?

তাকে ধরে তুলবেন কী, তার আগেই রক্তের ছানাপোনারা সব ঘিরে ধরেছে তাঁকে—মা ঠাকুমা ডাকে অস্থির করে তুলল বাতাস। এত সুখ বুঝি সইবে না শরীরে। বুজি দম ফেটে মরে যাবেন। বুকের ভিতর তুফান ছুটছে। নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে অবিশ্বাস্য আনন্দে। অবিরল বয়ে যাচ্ছে চোখের জল। ফোঁপাচ্ছেন।

ইলা এসে জড়িয়ে ধরে ঘরে নিয়ে যায়। টুবাই কোলে চড়ে বসে থাকে। শীলা তার। ছেলেকে বিছানায় শুইয়ে নিয়ে বলে—বাব্বা! কী রাস্তা!

ননীবালা একটাও কথা বলতে পারেন না। অবিশ্বাস্য বোবা হয়ে যান। ছেলেরা জামাইরা প্রণাম করে যাচ্ছে, আশীর্বাদটুকু পর্যন্ত মনে করতে পারছেন না। কেবল মাথায় হাত রাখছেন। কাঁদছেন। বিশ্বাস হয় না।

ব্রজঠাকুরের ছেলেপুলে শহর থেকে এসেছে শুনে বিস্তর ভিড় হয়ে গেল ঘরের মধ্যে। বহেরুর বউরা সব ঘোমটা টেনে এসে দাঁড়াল, বড় মেয়ে এল, পড়শিরা এল। বামন মতিরামও ঝলমলে পোশাক পরে এসে কয়েকটা ডিগবাজি দেখিয়ে দিল সবাইকে।

ব্রজগোপাল এসে দাঁড়ালেন একটু দূরে পর মানুষের মতো। তিনি জানেন একটু দূরত্ব থাকলেই সঠিক নিরীক্ষণ হয়। যত মাখাজোখা করবে, যত কাছে টানবে, তত দেখাটা হবে। অস্পষ্ট। তাঁর মুখে স্মিত সংযত ভাব। ছেলেমেয়ে জামাই আর নাতি-নাতনিরা প্রণাম করছে, তিনি চোখ বুজে দয়াল ঠাকুরকে স্মরণ করছেন। দয়াল, ওরা যেন সুখে থাকে। যেন ওরা কারও দুঃখের কারণ না হয়। ওদের সুখ যেন কাউকে দুঃখী না করে। নিজে সুখী হয়ে ওরা যেন সবাইকে সুখী করে।

এই সুখ-দুঃখের তত্ত্বের মধ্যেই পৃথিবীর সব সত্য নিহিত আছে। বড় শক্ত ব্যাপার। নিজে সুখী হও, সবাইকে সুখী করো—এ কি পারবে তোমরা?

ছোট জামাই বিদেশ ঘুরে এসেছে। হাসিমুখে সে বলল—এ খুব খাঁটি জায়গায় আছেন বাবা। গাছপালা মাটি—এ সবই হচ্ছে মানুষের এলিমেন্টাল জিনিস।

—তোমরা কবে এলে?

—আমি মুম্বই ফিরেছি দিন-দশেক আগে। লন্ডনের এক কোম্পানি চাকরি অফার করেছে কলকাতায় তাদের অফিসে। তাই চলে এলাম কন্ডিশন দেখতে। মাসখানেক পরে এসে জয়েন করব। কলকাতায় এলে মাঝে মাঝে উইক এন্ডে চলে আসব এখানে। কী সুন্দর জায়গা!

অজিত বেশি কথা বলে না। ব্রজগোপাল তারদিকে চেয়ে বলেন—অজিত, তোমার শাশুড়ির বাড়ি দেখেছ?

—দেখব। বাইরে থেকে দেখেছি। খুব ভাল লাগছে।

ব্রজগোপাল গম্ভীর হয়ে বলেন—ভালই। তিনচারখানা ঘর হয়েছে শেষ অবধি। আমার প্রথমে খুব ইচ্ছে ছিল এখানে বাড়ি করার, পরে নানা কারণে আর ইচ্ছে হয়নি। তোমার শাশুড়ি এসে পড়ায় শেষ পর্যন্ত হল। অনেকগুলো ঘর আছে, কলকাতার ওপর কখনও বিরক্তি এলে তোমরা চলে এস এখানে, যতদিন খুশি থেকে যেয়ো।

—আসব। জায়গাটা বড় ভাল। অ্যাওয়ে ফ্রম ম্যাডেনিং ক্রাউড।

—চলো, দেখবে। বলে ব্রজগোপাল জামাইদের নিয়ে এগোনে। চোখের ইঙ্গিতে সোমেনকে ডাকেন, সেও আসে।

নতুন চুনের সোঁদা গন্ধঅলা ঘর। চারদিকে জানলা দরজা খোলা। ফটফটে রোদ আর হাওয়ায় ঝলমল করছে। সামনের ঘরে যজ্ঞ হচ্ছে, পুরুতের মন্ত্রোচ্চারণের শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। পেঁয়ো উচ্চারণে সংস্কৃত মন্ত্র, তবু শুনতে শুনতে শৈশব ফিরে আসে। ঘুরে ঘরে। ঘরদোর দেখান ব্রজগোপাল। সোমেনের দিকে চেয়ে বলেন—কেমন?

সোমেন তার সুন্দর মুখশ্রীতে চমৎকার হাসির আলোটি ছড়িয়ে দিয়ে বলে—আমাদের। কোথাও একটা বাড়ি আছে, এটা ভাবতেই ভাল লাগবে এখন থেকে।

ব্রজগোপাল ভ্রু কুঁচকে একটু ভেবে আস্তে করে বলেন—কথাটা শুনতে ভাল, কিন্তু ওর অর্থ ভাল নয় বাবা, তুমি তো অসহায় নও যে দুনিয়ার কোথাও তোমার আশ্রয় নেই এ বাড়িটা ছাড়া।

—আমাদের নিজের বলতে তো কিছু নেই বাবা।

ব্রজগোপাল শ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে বলেন—জানি। তবু বলি, পুরুষমানুষ হয়েছ, নিজেকে কখনও নিরাশ্রয় ভেবো না। ঠাকুর সকলের জন্যই সব দিয়ে রেখেছেন, খুঁজে পেতে অর্জন করে নিতে হয়। আবার স্বার্থপরও হতে নেই। তোমার ঘর যেন হয় মন্দিরের মতো।

ননীবালার কান্না থেমেছে। শরীরে শক্তির জোয়ার এল বুঝি। নাতিদের, ছেলেপুলেদের, নাড়ু-মোয়া দিচ্ছেন, জল গড়িয়ে আনছে নয়নতারা। ননীবালা বলেন—এটুকু খেয়ে নে সব। ভাতে বসতে দেরি আছে।

বীণা বলে—এবার পুজোয় আপনাকে কাপড় দিতে পারেনি আপনার ছেলে। মাইনে-টাইনে সব কেটে নিত তো কামাইয়ের জন্য। এখন কিনে এনেছে।

ননীবালা বলেন—কাপড়! সে কথা বোলো না বউমা, কাপড়ের অভাব নেই। এসে অবধি এ পর্যন্ত কতগুলো যে পেয়েছি। এক ছেলে দেয়নি তো কি হয়েছে, কত ছেলে আমাকে। দিয়ে যায়।

ঝোলা ব্যাগ থেকে বীণা শাড়ি বের করে দেখায়। বেশ শাড়ি, খুব চওড়া পাড়ে মুগার সুতোর টান রয়েছে। অন্তত ষাট পঁয়ষট্টি তো হবেই। শীলা আর ইলাও শাড়ি এনেছে। ননীবালা বলেন—তোরা কি আমাকে শাড়িতে ঢেকে দিবি নাকি?

ভারী আনন্দ। ঘর ভরতি। আপনজনদের কথার কলরোল, হৃৎপিণ্ডের শব্দ, রক্তের গুঞ্জন। বাতাসটা পবিত্র হয়ে গেল।

শীলার ছেলেটা চিত হয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। একরাশ জুই ফুল পড়ে আছে যেন। ননীবালা বলেন—ও শীলা, আমার এই বরটির নাম কী রেখেছিস শুনি!

শীলা মোয়ায় কামড় দিয়ে বিষম খেয়ে হেসে ফেলল। ননীবালা বললেন—ষাট ষাট।

সামলে নিয়ে শীলা বলে—আবার কী! বাবা নাম লিখে পাঠিয়েছিল, সেই নামই রাখল। তোমার জামাই। বলল—শ্বশুরমশাই শাস্ত্রজ্ঞ লোক, জেনেশুনে বুঝেই নাম রেখেছেন নিশ্চয়ই। তাই নাম রাখা হয়েছে ঋতম্ভর।

—বেশ নাম। ইলা, তোর ছেলের?

—আর বোলো না, আমার শাশুড়ি নাম রেখেছেন ননীচোর। সেই নামই নাকি থাকবে। বড় হয়ে ছেলে আমাদের মারতে আসবে দেখো। চোর-টোর দিয়ে কেউ নাম রাখে! তার ওপর আবার দিদিমার নামও ননীবালা। কিন্তু কে কাকে বোঝাবে! বরং স্কুলে ভরতি করার সময়ে চুপ চুপ করে নাম পালটে দিয়ে আসব।

নাম শুনে সবাই হাসে।।

কিছু সময় পার হয়ে যায়। বেলা হল। ননীচোরকে নিয়ে বেলকুঁড়ি বাইরে কাক বক দেখাচ্ছে। ননীবালা তাকে ডাক দিয়ে বলেনননীবালাকে চুরি করবি নাকি ও ভাই? নিয়ে যা চুরি করে। তোর দাদু বুড়ো বয়সে একটু কাঁদুক।

শীলা বলে—মা, বেশ তো থেকে গেলে এখানে! একবার খবরটাও দিয়ে আসোনি! আমি শুনে তো হাঁ। বিশ্বাসই হয়নি প্রথমে যে, তুমি সবাইকে ছেড়ে বাবার কাছে চলে। আসতে পারো।

ননীবালা চুপ করে রইলেন খানিক। ভেবে বললেন—হুট করে এলাম বটে, কিন্তু কাজটা খারাপ হয়নি মা। এখানে এসে বেশ আছি। মনটা হু-হু করে বটে, তবু বেশ লাগে। তোরা। আসবি, থাকবি, বেড়িয়ে যাবি। হ্যাঁ রে, সোমেন কী বলে। আমেরিকা না কোথাকার পোকা। যে ঢুকেছিল মাথায়!

শীলা মাথা নেড়ে বলে—লক্ষ্মণবাবু ফিরে গিয়ে সোমেনকে লিখেছেন—না আসাই ভাল। লক্ষ্মণবাবুও ফিরে আসছেন। চাকরিবাকরি করবেন না, নিজেই একটা কোম্পানি খুলবেন বলে ঠিক করেছেন এখানে। সোমেনকে সেখানে চাকরি দেবেন।

—ওমা, তাই নাকি?

শীলা হেসে বলে—গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল। তবে লক্ষ্মণবাবু মানুষটা তো খুব খাঁটি। যা বলেন তাই করেন।

ননীবালা বলেন—সে যেমনই হোক, তুইয়েবুইয়ে ভুলিয়ে রাখিস ওকে। কোথাও যেতে দিস না। ওর জন্যই আমার চিন্তা। বলতে কী, ওর জন্যই আমার এখানে আসা।|

—কেন মা?

—ও বড্ড বকত আমাকে। বুঝতাম, বাবাকে আলাদা রেখে মা ছেলের সংসারে থাকে—এটা ও ভাল চোখে দেখে না। তাই বুঝি আমাকে ইদানীং সহ্য করতে পারত না। তাই অনেক ভেবেচিন্তে সব দিক বজায় রাখতে চলে এসেছি। এখন যদি আবার দূরান্তে চলে যায় তবে বড় দুশ্চিন্তা নিয়ে মরব।

ঘুরে ঘুরে সব দেখে সোমেন। এর আগে এমনি এক শীতকালে সে এসেছিল এখানে। এর মধ্যে তেমন কোনও পরিবর্তন হয়নি। শুধু সেই বিশাল মানুষ বহেরু একটু যা বুড়িয়ে গেছে। গন্ধ বিশ্বেসেরও বাঁচার শেষ নেই। এখনও টিকে আছে। মচ্ছবের গন্ধে-গন্ধে এসে বসে আছে গাবগাছের তলায়। দিগম্বরকেও ভিড়ের মধ্যে এক-আধবার দেখা গেছে। খোলটা সঙ্গেই আছে, যখন নির্জনতা পাবে বাজাতে বসবে। বিন্দুর সঙ্গেও চোখাচোখি হয়েছে। কয়েকবার। সেবার যখন এসেছিল তখন বিন্দুর শরীরের অসহ্য উত্তাপ টের পেয়ে গেছে। এবার তাই লজ্জা-মেশানো ভয় করল তাকে। সে বড় ভীতু। হেমন্ত বা অন্য বন্ধুরা কেউ হলে, এমনকী শ্যামল যদি আসত তা হলেও একটা কিছু প্র্যাকটিক্যাল প্রেম করতই। সে পারে না। ব্রজগোপালের ছেলে তো, তাই কতগুলো ভয়-ভীতি ছেলেবেলা থেকেই বাসা বেঁধে আছে ভিতরে।

চারদিকেই গুরুজন বলে সে উত্তরধারে কাঁটাঝোপের পাশে একটা টিবির ওপর এসে নির্জনে সিগারেট ধরিয়ে বসল। এখান থেকে অনেকটা দেখা যায়। বহেরুর বাড়ি ক্ষেত, আর একটু দূরে তাদের নতুন বাড়িটা। যজ্ঞধূমের গন্ধ আসছে, থিক থিক করছে লোকজন। হাল্লা-চিৎকার শোনা যাচ্ছে। শীতের বাতাস এই দুপুরেও হাড় কাঁপিয়ে দিয়ে যায়। দেখা যাচ্ছে, পুকুরের জলে বিশাল জলহস্তীর মতো রণেন সাঁতার কাটছে। না, জলহস্তী বলাক। হল না। রণেন আর তেমন মোটাসোটা নেই। অনেক রোগা হয়ে গেছে। প্রায়ই বলে—আমি মা বাবার কাছে চলে যাব। এছাড়া আর কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। হ্যাঁ, আর একটা আছে।। এখনও রাতেরবেলা চুপি চুপি উঠে কলের গান শোনে। নইলে, সবই ঠিক আছে।।

সোমেন অনেকক্ষণ বসে থাকে, টিবিটার ওপর। মনে কত রকমের চিন্তা শরতের মেঘের। মতো ছায়া ফেলে যায়। এত চিন্তা সোমেনের ছিল না কখনও। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে। এই তো কিছুদিন আগে ম্যাক্স চলে গেল। তাকে দমদমে তুলে দিতে গিয়েছিল, সোমেন, যাওয়ার সময়ে ম্যাক্স তার হাত ধরে বলেছিল—নোংরা গরিব ঠিকই, তবু তোমার দেশের বেশি কিছু শিখবার নেই বিদেশ থেকে, একসেপ্ট সাম টেকনিক্যাল নলেজ, এনডিভার, অ্যান্ড এ প্র্যাকটিক্যাল আউটলুক ইন সাম ম্যাটার্স।

কথাটা শুনে খুব অহংকার হয়েছিল সোমেনের। নিজের দেশ সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানে না সোমেন, কিন্তু ম্যাক্স জেনে গেছে। ম্যাক্স সারা ভারতবর্ষ কয়েকবার ঘুরেছে, কাশীতে সংস্কৃত শিখে বেদ-বেদান্ত পড়েছে, ভিখিরি কাঙাল থেকে সমাজের উচ্চস্তরের মানুষদের সঙ্গে অবাধে মিশেছে, উগ্রপন্থীদের সঙ্গে বিপ্লব করতে গিয়ে কিছুদিন জেলও খেটে গেছে। রোগা সাহেবটা অল্প কদিনে যা করে গেছে সোমেন হয়তো সারা জীবনেও করতে পারবে না। উলটেপালটে এদেশকে দেখে গেছে ম্যাক্স। তাই তার কথায় নিজের দেশের ওপর আবার আস্থা ফিরে আসে সোমেনের। লক্ষ্মণকে এইসব কথা বলেছিল সোমেন। লক্ষ্মণ অনেক চিন্তা করে বলেছিল—

সেক্স আর টেকনোলজি ছাড়া ওদেশে কিছু নেই, এমন নয় সোমেন। তবে ভাল যা আছে তা সবই একটু থমকে গেছে। কিন্তু যেহেতু ওরা খুব উদ্যোগী মানুষ সেইহেতু যেদিন ভুল ধরা পড়বে সেদিনই ভূতের মতো খেটে ভুল শোধরাতে কাজে লেগে যাবে। আমাদের মতো ম্যাদামারা মানুষ ওরা নয়। বারংবার ম্যাক্সও বলে গেছে—সোমেন, ইওর্স ইজ এ গুড কান্ট্রি। আমি বুড়ো বয়সে বেনারসে এসে সেটেল করব দেখো।

বাতাসে সিগারেটটা তাড়াতাড়ি পুড়ে যাচ্ছে। দাদা এখনও সাঁতার কাটছে। বোধ হয় বার দুই-তিন পুকুরটা এপার-ওপার করল। আর বেশিক্ষণ জলে থাকলে ওর ঠান্ডা লেগে যাবে। সোমেন তাই ঢিবির ওপর থেকে নেমে আসে আস্তে আস্তে পুকুরধারে গিয়ে ডাকে—দাদা!

রণেন গলা-জলে দাঁড়িয়ে মুখে জল সমেত বলে—আয় আসবি? তোকে সাঁতার শিখিয়ে দিই।

—আমি জানি দাদা। তুমি উঠে এস।

—আর একটু থাকি। খুব ঠান্ডা।

—সর্দি লাগবে যে।

রণেন তার দিকে তাকিয়ে বলে—পাগলের কখনও সর্দি লাগে না, বুঝলি, সর্দি লাগলে। পাগলামি সেরে যায়।

সোমেন বিরক্ত হয়ে বলে—তা হলে বউদিকে ডেকে আনি।

রণেন কোমর থেকে গামছা খুলে ছপাং করে জলে লম্বা করে ফেলে বলে—দাঁড়া, উঠছি।

গৃহপ্রবেশ হয়ে গেল। অনেক লোক জুটে ব্রজগোপালের সামান্য জিনিসপত্র মুহূর্তের মধ্যে বয়ে এনে দিল নতুন বাড়িতে। শীলা আর ইলা সাজাতে লাগল। বীণা রান্নাঘর গুছোয়। বলে—মা, আমাদের একটা জায়গা হল এতদিনে।।

ননীবালা গভীর শ্বাস ফেলে বলেন—আর জায়গা! কখনও কি এসে থাকবে বউমা? আমরা বুড়োবুড়ি মাটি কামড়ে পড়ে থাকব মরা ইস্তক। যদি মনে হয় তো এস। আমাদের বুক জুড়িয়ে দিয়ে যেয়ো। মা দুর্গার মতো ছানাপোনা নিয়ে ঝুমঝুমিয়ে আসবে যাবে, তা কি আমার ভাগ্যে হবে বউমা!

সোমেনকে দেখে নিরালায় ডাকেন ননীবালা, বলেন—কিরে, রোগা হয়ে গেছিস নাকি?

—না, তোমাদের সবসময়েই রোগ দেখা।

—হ্যাঁ রে, একা লাগে না ঘরটার মধ্যে ওখানে, অ্যাঁ? মায়ের কথা মনেও পড়ে না বুঝি?

সোমেন হেসে লজ্জার ভাব করে বলে—পড়বে না কেন?

—খুব সিগারেট খাস, না? ঠোঁট কালো হয়ে গেছে। চোখ বসা কেন? রাগবাগ করিস না তো বউদির সঙ্গে?

—না না। তুমি যে কি ভাবো!

ননীবালা কাঙালের মতো বলেন—এখন তো তোর হাতে কোনও কাজ নেই, থাকবি এখানে কদিন?

—এখানে?

—তবে কোথায় বলছি! থেকে যা, একটু শরীরটা সারিয়ে দেবখন। আমাদের দু-দুটো গোরু রোজ পনেরো যোললা সের দুধ দিচ্ছে। কত তরিতরকারি, মাছ, ফল খায় কে! এত। ঘি আর ক্ষীর করে রেখেছি। আজ সবাইকে দিয়ে দিচ্ছি কলকাতার জন্য। তুই কদিন থেকে যা।।

সোমেন উদাস গলায় বলে—পাগল হয়েছ! কলকাতায় কত কাজ!

—আহা! কী কাজ তা তো জানি! একশো টাকার একটা টিউশানি।

সোমেন মৃদু হেসে বলে—না মা, তুমি খোঁজ রাখো না। সেই টিউশানি আছে বটে, আবার এক বন্ধুর সঙ্গে ঠিকাদারির কাজে নেমেছি।

—তাই নাকি?

অবশ্য আমার তো টাকা নেই, তাই খুব কিছু হয় না। টাকা থাকলে হত।

—তোর বাবার কাছ থেকে নিস।

—বাবা! সোমেন অবাক হয়ে বলে—বাবা কোত্থেকে দেবেন?

জবাব দিতে গিয়ে ননীবালার গলাটা অহংকারি হয়ে যায়, তবু আস্তে করে বলে—তাঁকে ভিখিরি ভাবিস না। আমার এখানে লক্ষ্মীর বাস। চেয়ে দেখিস, দেবেন।

সোমেন মাথা নেড়ে বলে—এখন থাক। পরে দরকার মতো দেখা যাবে।

খাওয়া-দাওয়া সারতেই শীতের বেলা ফুরিয়ে গেল। দূর মাঠপ্রান্তরে সন্ধ্যার ঘনায়মান। আবছায়া। পাখি উড়ে যাচ্ছে বাসার দিকে। দিনশেষ। সারাদিন লোকজন ছিল, তারা সব। বিদায় নিয়েছে। কুকুরেরা এখনও ঝগড়া করছে এঁটো পাতা নিয়ে, কাক ওড়াউড়ি করছে। হু-হু করে শীতের বাতাস কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে সবকিছু।

মেয়েরা তাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে। সাজও শেষ। ছেলেরা জামাইরা পোশাক। পরে বসে আছে নতুন বাড়ির বারান্দায়। ননীবালা কাঁদছেন শীলার ছেলেকে বুকে চেপে, অন্য হাতে ধরা আছে টুবাই। আঁচল ধরে টান দিচ্ছে ননীচোর। সারাদিনে তার দিদিমার মত খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। বেলকুঁড়ি আর বুবাই কাঁদছে, রণেন ভ্যাবলার মতো বাপের পাশে বসে আছে বারান্দায়। দুই জামাই নিচু স্বরে কথা বলছে পরস্পর। সোমেন বাড়ির বাগানে। কুয়োর ধারে আড়ালে সিগারেট খায়।

কে যেন রাস্তায় হাঁক পাড়ছে—কলকাতার লোকেরা ফিরবে, চারটে রিকশা নিয়ে আয় গগাবিন্দপুর থেকে। ছটার গাড়ি ধরবে সব।।

সোমেন ঘড়ি দেখে বিরক্ত হয়। খুব বেশি সময় নেই। মেয়েছেলে যেখানে, সেখানেই। দেরি।

রিকশা এসে গেল। হর্ন মারছে। ছেলেরা এগিয়ে গেল। মেয়েরা ননীবালাকে ঘিরে কাঁদছে এখনও।।

—আবার কবে আসবি সব? ননীবালা জিজ্ঞেস করেন।

—আসব মা, এখন তো আমাদেরই বাড়ি এটা।

—ওসব মুখের কথা। ননীবালা বলেন—শোন, তোদের বাড়ির সব উৎসব অনুষ্ঠান যখন করবি, তখন এ বাড়িতে এসে করিস। আমি খরচা দেব। কলকাতার মানুষদের না হয় পার্টি। দিবি।

এ সবই স্তোক। জানেন ননীবালা, ওরকম হয় না। হবে না। চোখের জলের ভিতর দিয়ে ভাঙাচোরা দেখায় চারধার। সেই অস্পষ্ট দৃষ্টির ভিতর দিয়েই ওরা চলে গেল। রিকশা। যোজন-বিস্তৃত অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। পৃথিবীটা কী বিশাল!

একা-একা ঘরের দিকে ফিরছিলেন দুজন। ব্রজগোপাল বললেন—আজ আর কোথাও বেরবো না।

ঘরে এসে অন্ধকারেই বসলেন ননীবালা। বুকটা খামচে ধরে আছে চাপা একটা দুঃখ, একটা ব্যথা। একটু বাদেই নয়নতারা এসে লণ্ঠন জ্বালে। বিন্দু এসে ননীবালার চুল আঁচড়ে দিতে থাকে। বহেরু এসে বাইরের ঘরে তক্তপোশের তলায় মেঝেতে ব্রজগোপালের পায়ের কাছে বসে থাকে। তত্ত্বকথা শোনে। ষষ্ঠীচরণ তার বইপত্র নিয়ে এসে গুটি গুটি খোলা। দাওয়ায় মাদুর পেতে বসে। মতিরাম আনাচ-কানাচ দিয়ে ঘুরঘুর করে আর কুকুর বেড়াল তাড়ায়। দিগম্বর খোল নিয়ে এসে বসে বাইরের ঘরের কোনে। ষষ্ঠীর মা আসে খোঁজ নিতে, বহেরুর বউ আসে। ঘর ভরে যায়। মানুষজন বড় ভালবাসেন ব্রজঠাকুর। মানুষজনও তাই তাঁকে ভালবাসে। ননীবালার খারাপ লাগে না। ওরা এসে চলে গেল বলে যে দুঃখটা ছিল। তা উবে গেল মুহুর্তের মধ্যে। একটু বাদেই তিনি হেসে কথা বলতে থাকেন। এখানে তিনি কর্ত্রী, ব্রজবামুনের বামনি ঠাকরুন, তাঁর দাম অনেক।

॥ ছিয়াত্তর ॥

বিখিয়াদের বাড়ির ফোন অনেকক্ষণ ধরে বাজল। এ-পাশে সোমেন কান পেতে সেই গুড়ুক গুড়ুক তামাক খাওয়ার মতো শব্দ শুনছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন কেউ ধরল না। ঘড়ি ধরে প্রায় সাত মিনিট।

কী আর করে সোমেন, হতাশ হয়ে ফোন রেখে দিল। ওরা হয়তো কেউ বাড়িতে নেই।

রিখিয়ার সঙ্গে একবার মুখোমুখি দেখা হলে বড় ভাল হত। কিন্তু আর তো সময় নেই। কাল বিকেলের ডাকে বিজয়নগর ইস্কুল থেকে একটা চিঠি এসেছে! আজকের তারিখে চাকরিতে যোগ দিতে হবে।

জায়গাটা কত দূরে তা সঠিক জানে না সোমেন। তবে, ইস্কুলের চিঠিতে পথের হদিশ দেওয়া আছে। ট্রেনে ক্যানিং, সেখান থেকে লঞ্চ ধরে গোসাবা। গোসাবার ঘাটে ওরা নৌকো। রাখবে। নৌকোয় আরও ঘণ্টাখানেকের পথ, তারপর খানিকটা হাঁটা। সুন্দরবনের একদম কোলের মধ্যে।

কত কিছু হওয়ার কথা ছিল সোমেনের। হল না। না হল আমেরিকায় যাওয়া, না হল বন্ধুর সঙ্গে ঠিকাদারি ব্যাবসা। লক্ষ্মণদা গিয়ে কোনও আশা ভরসার চিঠি দিলেন না। সোমেনকে। বোধ হয় ভুলেই গেছেন।

বাড়িটা আজকাল খাঁ-খাঁ লাগে। যতদিন যায় তত মায়ের কথা মনে পড়ে। আর শুধুই মা নয়, আরও একটা কী যেন অভাবের হাহাকার বুকের মধ্যে কুয়ো খোঁড়ে দিনরাত। সেটা যে কী তা বোঝা যায় না, ভাষা দিয়ে কিছুতেই তার চেহারা ফোটে না। মনে হয়, কী যেন নেই, কী যেন থাকার কথা ছিল। যখন অপালা, পূর্বা, শ্যামদের সঙ্গে রইরই আড্ডা হয়, সিনেমায় যায়, বন্ধুদের সঙ্গে ঘোরে, ফুটবল মাঠে গিয়ে চেঁচায়, টেস্ট ক্রেকেট দেখতে ভোর রাতে গিয়ে রঞ্জি স্টেডিয়ামে লাইন দেয়, তখনও হঠাৎ হঠাৎ ওই এক ভূতুড়ে কী-নেই কী-নেই ব্যাকুলতায় বুকটা খালি খালি লাগে।

সোমেন সবচেয়ে কম যায় রিখিয়াদের বাড়িতে। বরাবরই সে স্বভাবে লাজুক। আজকাল সে অমোঘভাবে বুঝে গেছে, রিখিয়ার মতো কেউ তাকে এত চুম্বকের মতো টানে না। সমস্ত কাজকর্ম, অন্যমনস্কতার ভিতরেও অলক্ষিতে তার ভিতরে একটা কাঁটা থর থর করে কেঁপে কেঁপে একটা দিক নির্দেশ করে। যে ঘরে কাঁটাটা গিয়ে কাঁপে সেই হচ্ছে রিখিয়ার ঘর। যখনই এটা টের পেল সোমেন তখনই হাতে-পায়ে লজ্জার ভার এসে চেপে ধরল। আজকাল সে কেবলই ভাবে—ছিঃ, বেশি গেলে ও আমাকে হ্যাংলা ভাববে।

কলকাতায় থেকে আর লাভও নেই সোমেনের। পত্রিকা দেখে মফঃস্বলের স্কুলে কয়েকটা দরখাস্ত পাঠিয়েছিল। কয়েকটা স্কুল থেকে ইন্টারভিউ এল। শুধু বিজয়নগর স্কুলই সরাসরি নিয়োগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছে। চিঠিটা পেয়ে অনেক ভেবেছে সোমেন। বউদি আর দাদাও শুনেছে।

রাত্রে দাদা খেতে বসে বলল—সুন্দরবন! সেখানে তো খুব বাঘের উপদ্রব হয়েছে শুনি।

বউদি প্রতিবাদ করে বলল—আহা, মানুষ বুঝি তা বলে আর সেখানে নেই!

দাদা মাথা নেড়ে বলে—থাকগে। সোমেনকে যেতে হবে না অত দূরে। মা চলে গেল, বাবা চলে গেল, এখন সসামেন গেলে বাড়িতে টেকা যাবে না। তুই যাবি না সোমেন।

বউদি অবশ্য চুপ করে রইল। কিন্তু সসামেন জানে, বউদির এ ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না। সূক্ষ্ম এক ধরনের অনাদর যেন সে আজকাল টের পায়।।

রাতে ঘুম হয়নি। সারারাত প্রায় সিগারেট খেতে খেতে ভেবেছে। যাবে কি যাবে না! এতদিনকার কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে হবে ভাবতে বড় কষ্ট হয়। আবার ভাবে, থেকেই বা হবে কী!

খুব ভোরবেলার দিকে হঠাৎ খুব শান্তভাবে সে সিদ্ধান্ত নিল। যাবে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পিছনে ম্যাক্স-এর একটা সুদূর প্রভাব কাজ করেছিল তার মনে। সে ম্যাক্সকে দেখেছে। পড়াশুনো ফেলে রেখে যখন-তখন বেরিয়ে পড়ত গ্রামে গঞ্জে, সুদূর দুর্গম অঞ্চলে। পয়সাকড়ির চিন্তাও করত না। কখনও গাড়িতে, কখনও পায়ে হেঁটে, যেমন-তেমন করে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে দেখে গেছে ম্যাক্স। শরীরে কোনও আলস্য ছিল না রোগা সাহেবটার। মনে ছিল না কোনও জড়তা বা বন্ধন। সে যেন এই বিশাল দুনিয়ায় এক সদানন্দ মুক্ত পুরুষ, কোথাও নোঙর বাঁধেনি। অনেক চোখে দেখা, উপলব্ধি করা জ্ঞান ঝুলি ভরে নিয়ে গেছে। ম্যাক্স। সোমেনকে সে প্রায়ই বলত—তোমরা কি করে বসে বসে অলস সময় কাটাও? তোমার দেশের লোকের অনেক কাজ পড়ে আছে। শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের কর্মের কথা। বলেননি? আর কিছু না পারো, বেরিয়ে পড়ো দেশ দেখতে। তোমার দেশটা কেমন তাও তুমি জানো না সোমেন। শুধু কলকাতা নিয়ে পড়ে আছে।

ম্যাক্স-এর সেসব কথা বড্ড মনে পড়ে সোমেনের। সত্যিই তো, দেশটার কিছু অন্তত তার দেখা দরকার। তা ছাড়া, ইদানীং সংসারের ওপর তার একটা অবুঝ অভিমান জন্ম নিয়েছে। কেবলই তার মনে হয়, কেউ তাকে বোঝে না, ভালবাসে না, আপন বলে ভাবে না। তার নিজের মানুষ কেউই বুঝি নেই।

বিজয়নগর যাওয়ার ব্যাপারে মনস্থির করে সে ভোরে উঠে স্যুটকেস গুছিয়েছে নিজেই। বিছানা বেঁধেছে।

ঘুম থেকে উঠে বউদি বলল—ও মা! এ কি! যাচ্ছো না কি?

—যাই বউদি। কিছু একটা করা দরকার।

—আমি তো তাই বলি। কিন্তু তোমার দাদাকে বুঝিয়ে বলে যাও, নইলে আবার অস্থির হবেন।

রণেন উঠে সব শুনেটুনে কেমন উদাস হয়ে যায়। বলে—চলে যাচ্ছিস? তোকে এখনও আমি খাইয়ে পরিয়ে রাখতে পারি।

—সে তো রেখেছই। তবু একটু ছেড়ে দাও এবার। ভাল না লাগলে চলে আসব।

রণেন কি ভেবে অনেকক্ষণ বাদে বলল—যা।

ক্যানিং-এর গাড়ি পৌনে সাতটায়। স্টেশনে এসেই রিখিয়ার বাড়িতে ফোন করবে বলে। ডাক্তারখানায় গেল। দোকানটা খোলেনি তখনও। দরজায় ধাক্কা দিয়ে বিপিন কম্পাউন্ডারকে। তুলে নিল টেলিফোন করে সোমেন ফিরে আসে স্টেশনে। গলায় একটা কান্নার দলা ঠেলা মারছে। চলে যাচ্ছে রিখিয়া।।

গাড়ি আসে।

স্বপ্নের ভিতর দিয়ে সোমেন যেতে থাকে। ভাবনার ঘোরের আচ্ছন্নতার ভিতর দিয়ে গেল। ক্যানিং-এর দীর্ঘ বাঁধের রাস্তা পার হয়। পুরনো আমলের লঞ্চ, জোয়ার ঠেলে ঘাটে ঘাটে ঠেকে আস্তে ধীরে তাকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে কলকাতা থেকে দূরে। দেশের গভর বুকের মধ্যে।

গোসাবার ঘাটে নৌকো ছিল। একজন কালো, লম্বামতো সরল লোক, ধুতি পাঞ্জাবি পরা, দুজন মাঝি সমেত অপেক্ষায় ছিল। পরিচয় দেওয়ার আগেই তারা কী করে যেন চিনে। ফেলল সোমেনকে। লম্বা লোকটা বলল—যেতে তো দেরি হয়ে যাবে। এখনই বেলা একটা। প্রায়। এখানেই এক বাড়িতে আপনার জন্য রান্না করা আছে।

এ জায়গাতে একসময়ে লন্ডন অফ দি ইস্ট বলা হত। হ্যামিলটন সাহেবের কুঠিবাড়ি আছে এখানে। কিন্তু এ গঞ্জে একটুও ভাল রাস্তাঘাট নেই, মোটরগাড়ি বা রিকশা নেই। এক আদিম পৃথিবীর দরজা খুলে গঞ্জটা বসে আছে। যে বাড়িতে খেলো সোমেন তা গেরস্তবাড়ি।। খুব যত্ন করল।

গোসাবা ছেড়ে পড়বেলায় ছোট নদী বেয়ে নৌকো তাকে নিয়ে চলল কোন অজানা। রাজ্যের মধ্যে। দুধারে হেতালের বন, গোমমা গাছের সারি, শুকনো পাতা ঝরছে। নিচ্ছিদ্র নীরবতা। ঘনিয়ে আসছে মৃত্যুর মতো হিম শীত।।

কলকাতায় এখন আর তত শীত নেই। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ চলছে। কিন্তু এখানে শীতের কামড় বসে আছে। নদীর ওপরে একটি ভাসা বাতাস। ঘোলাটে কুয়াশা। লালচে রোদ গাছগাছালির দীর্ঘ ছায়া ফেলেছে।

লম্বা লোকটা ওই স্কুলের সেক্রেটারি। বলল—এখন কোনও ভয়টয় নেই। সাপখোপ এ সময়ে থাকে না।

—বাঘ?

লোকটা হেসে বলে—বাঘ কোথায়? সে অনেক দূর সেই রিজার্ভ ফরেস্টে। দুই আড়াই মাইল হবে।

বাঘের কথা অবশ্য মোটেই চিন্তা করছিল না সোমেন; এমনিই মনে পড়ল বলে বলল। সে ঝুকে নদীর ঠান্ডা চলন্ত জলে হাত দিয়ে এককোষ জল তুলে ছিটিয়ে দিল। দুলে দুলে নৌকো যাচ্ছে।

সেক্রেটারির চিঠিতে গোটা তিনেক ভুল ইংরেজি ছিল, মনে পড়ল। সোমেনের একটু হাসি পেল। কিন্তু লোকটা এমনিতে বেশ আলাপী। ভাল লোক, না মন্দ লোক তা বুঝতে কিছু সময় লাগবে সোমেনের।

লোকটা ইস্কুলের এক গণেশবাবুর নিন্দে করছিল খুব। বার বার বলল—ওদের গ্রুপের সঙ্গে একদম মিশবেন না কিন্তু। ইস্কুলটার ওরাই সর্বনাশ করছে।

এসব কথা সোমেনের গভীরে পৌঁছোয় না। সে শুধু ভাবে, এখানকার নিচ্ছিদ্র অন্ধকার, গভীর নিস্তব্ধতা, আর নিঃসঙ্গ সময় তার কেমন লাগবে?

মাইলের পর মাইল কোনও গ্রামের চিহ্ন প্রায় নেই। এক-আধটা ছোট গাঁ-ঘর দেখা যায় বটে, তারপর অনেকটা ফাঁকা। নদীর ধারে কোনও মানুষ, কুকুর, বেড়াল কিছু চোখে পড়ে না।

নৌকো ভিড়ল এক আঘাটায়। ভাটির টানে জল সরে গিয়ে গোড়ালি-ডুব কাদা বেরিয়ে পড়েছে। টকটকে লাল রঙের হাজার হাজার কাঁকড়া হালকা পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কাদার ওপর। মানুষের সাড়া পেয়ে মাটিতে সেঁধিয়ে গেল।

কাদায় পা দিতে হল না সোমেনকে। মাঝি দুজন তাকে কাঁধে বয়ে পিছল খাড়া পাড় বেয়ে বাঁধে দাঁড় করিয়ে দিল। মালপত্র তুলে নৌকোটা টেনে হড় হড় করে কাদায় এনে ফেলল। তারপর রওনা দিল সবাই। আদিগন্ত মাঠ ভেঙে পথ আর ফুরোয় না। টিয়ার ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে। গভীর ছায়া ঘনিয়ে আসছে মাঠে। দূরে এক সবুজাভ গভীর বনের রেখা দেখা যায়। সেক্রেটারি দেখিয়ে বলল—ওই ওখানে বড় নদীর ধারে রিজার্ভ ফরেস্ট।

সোমেন বৈরাগ্যভরে দেখল। এদিকে রাস্তাঘাট নেই। যানবাহন চলে না। বহেরুর গ্রাম এর তুলনায় অনেক আধুনিক।

সেক্রেটারি বলল—ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। এখনও তেমন কিছু হয়নি।

কলকাতা থেকে কত দূরে যে এসে পড়ল সোমেন! শীতের সন্ধ্যার মতোই ভার আর বিষন্ন হয়ে গেল মনটা। বড় অনাত্মীয় এই গ্রাম। বড় অচেনা। মনটা খারাপ হতেই ফের ম্যাক্স-এর মুখ মনে পড়ে গেল। রোগা, তীব্র কৌতূহলে ভরা একখানা মুখ। পোড়-খাওয়া। রোদে জলে ঘাতসহ একটা চেহারা। পৃথিবীর মানুষ।

ইস্কুলের সায়েন্সরুমের এক পাশে চৌকি পাতা। হারিকেন জ্বলছে।

—এইখানে থাকবেন। ইস্কুলের বেয়ারাও থাকে, রান্নাবান্নাও সেই করে দেবেখন।

সন্ধেবেলা কয়েকজন দেখা করতে এল। অন্যরকম মানুষ সব। কেউ বেশি চালাক-চালাক। কথা বলে। কেউ একটু ঠেশ দিয়ে দু-চারটে বাকা বলে। দু-একজন বেশ গম্ভীর। সে এসেছে। বলে কেউ কি খুশি হয়েছে? কিংবা দুঃখিত? বুঝল না সোমেন। হারিকেনের আলোয় সে তো ভাল দেখতে পায় না। অভ্যাস নেই।

দিন যায়। রাত যায়। ক্যালেন্ডার দেখে না সোমেন। ইস্কুলের সময়ে মাঠ-ঘাট পেরিয়ে বহুদূর থেকে ছেলেদের আসতে দেখে। যেন ওরা মাটির ভিতর থেকে উদ্ভিদের মতো জন্ম নিয়ে চলে আসছে, আবার ছুটি হলে ফিরে যাবে মাটির তলায়। রাত হলে সারা ইস্কুলবাড়িটায় ফাঁকা নির্জনতায় হাওয়া বয়ে আসে অদূর সমুদ্র থেকে। কত দেশ দেশান্তরের কথা বলে।

কয়েকবারই পৌঁছে সংবাদ দেবে বলে পোস্টকার্ডে ঠিকানা লিখে বসেছিল। শেষ পর্যন্ত কাউকেই চিঠি দিল না। বুকজোড়া কেন যে এই অভিমান! মনে হয়, তাকে কেউ বুঝল না, চিনল না, কেউ ভালবাসল না। তার জন্য কে ভাবছে বুকভরা দুঃখ নিয়ে? কেউ না।।

সারাটা দিন প্রায়ই কাজ থাকে না। চার-পাঁচটা ক্লাস করে সোমেন। তারপরই কর্মহীনতা। দু-চারজন তাস খেলতে নিয়ে গেছে কয়েকবার। এক রাতে যাত্রা দেখল দুটো বিয়ের প্রস্তাব এসে গেল এর মধ্যেই। ছাত্রদের বাড়ি থেকে প্রায় সময়েই নানারকম ফল, সবজি বা মাছও আসে। মাসখানেকের মধ্যে দু-চারজন ছেলে লণ্ঠন ঝুলিয়ে চলে এল প্রাইভেট পড়তে, সন্ধেবেলাটায় কাজ পেয়ে বেঁচে গেল সোমেন। মাথাপিছু কুড়ি টাকা মাসে, তাতে প্রায় আশি। টাকা বাড়তি রোজগার।

প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই একদিন ঠিক করল, কলকাতা যাবে। ভেবে শনিবার টিফিনে ছুটি করে নিয়ে সাজগোজও করে ফেলল সে। ব্যাগ গুছিয়ে তৈরি। হঠাৎ বেরোবার মুখে। হার্ট অ্যাটাকের মতো একটা অভিমানের যন্ত্রণা দেখা দিল বুকে। কেন যাব? কার কাছে যাব? আমার তো কেউ নেই!

সাজ খুলে না ফেলেই অনেকক্ষণ বসে রইল সোমেন। জানলা দিয়ে পুকুরঘাটে গাছের ছায়ায় চেয়ে রইল। একটা গরিব মেয়ে কচুর শাক তুলছে। অনেকক্ষণ চেয়ে রইল সোদকে। ভাবল, এ জায়গায় যতদিন মন না বসছে ততদিন কলকাতায় না যাওয়াই ভাল। তা হলে আর ফিরতে ইচ্ছে করবে না।

গেল না সোমেন। সে কাউকে চিঠি দেয়নি, ঠিকানা জানায়নি। সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ হয়ে। আছে। এ অবস্থাটা আরও কিছুদিন চলুক। চারদিকে তার খোঁজ হোক। তারপর দেখা যাবো।

একদিন ছুটির দুপুরে শুয়ে শুয়ে সিগারেট খাচ্ছিল সোমেন। ব্রাহ্মণভোজনের একটা নিমন্ত্রণ ছিল এক বাড়িতে। খুব খাওয়া হয়েছে। এক টাকা দক্ষিণাও পেয়েছে। একজন বুড়ো। লোক নেমতন্ন বাড়িতে তাকে

ডেকে বলল—আমার বাবার বাৎসরিকে মন্ত্রটা সামনের। রোববার একটু পড়িয়ে দেবেন মাস্টারমশাই।

সোমেন বলে—মন্ত্র তো জানি না।

লোকটা বিশ্বাস করে না, কেবল বলে—ও আর জানাজানি কী! বিপ্রের ছেলে। আপনারা অং বং যা বলবেন তাই মন্ত্র। রক্তটা তো গায়ে আছে।

সোমেন সেই কথা ভেবে আপনমনে হাসে। ক্ষতি কি? একখানা পুরোহিত দর্পণ জোগাড় করে অবসর সময়ে বসে শিখে নেবে। তার বাবা ব্রজগোপাল এরকম কত করেছেন।

ভেবেই হঠাৎ থমকে গেল সোমেন। মনটা পাশ ফিরল। বাবা! আরে, সোমেনও যে ঠিক তার বাবার মতোই হয়ে যাচ্ছে। এই রকমই এক অভিমানে তার বাবাও গিয়েছিলেন। স্বেচ্ছানির্বাসনে। দূরে বসে একটা জীবন সকলের মঙ্গল চেয়েছেন। ডায়েরিতে লিখে রেখেছিলেন—ভগবান, উহারা যেন সুখে থাকে।

সোমেন ঠ্যাং নাচানো বন্ধ করে উঠে বসল। বুকে একটা চাপা বেদনার দম আটকানো ব্যথা। সবাইকে ছেড়ে সে চলে এসেছে কত দূরে। এই নিঝুম দুপুরে বসে সে হঠাৎ বুঝতে পারে আজ, কারও ওপর রাগ করে থাকার, অভিমান করে থাকার কোনও মানেই হয় না। সেটা ভীষণ বোকামি হবে।

একটা বাঁধানো খাতায় কয়েকটা কবিতা লিখেছিল সে। সেই খাতাখানার মাঝখানে একটা সাদা পাতা বের করে সে গভীর মনোযোগে সুন্দর হাতের লেখায় লিখল—ভগবান, উহারা। যেন সুখে থাকে।

লিখে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল লেখাটার দিকে। একসময়ে চোখের জলে দৃষ্টি ছেয়ে গেল। ঝাপসা হয়ে আসে বাক্যটি। সোমেন উপুড় হয়ে পড়ে বালিশে ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে একটু কাঁদে।

তিন মাস পেরিয়ে চার মাসে পড়ল সোমেনের চাকরি। এবার গ্রীষ্মের ছুটি হবে। বড় অসহায় লাগে সোমেনের। দুঃসহ এই ছুটি কি করে কাটাকে সে।

এর মধ্যে সে অনেকবার গোসাবায় গেছে। সুন্দরবনে ঘুরে বেড়িয়েছে, পক্ষী-আবাস দেখতে গেছে। এ অঞ্চলটা ক্রমশ তার অভিজ্ঞতায় চলে আসছে। স্কুলের সবাই তাকে পছন্দ করছে আজকাল। তার সুন্দর চেহারাটি, তার নম্র কথাবার্তা, এ সবই তার বরাবরের মূলধন ছিল। কদাচিৎ কেউ তার শত্রু হয়েছে। সোমেন জানে, মানুষকে ভোলাবার সহজাত ক্ষমতা রয়েছে তার। কয়েকটা মেয়ের বাপ বড় জ্বালাতন করে আজকাল, তার বাবার ঠিকানা চায়। এ ছাড়া এ অঞ্চলে তার আর কোনও ঝামেলা নেই। কিন্তু এই ছুটি কাটানো বড় মুশকিল হবে।

কলকাতায় যাবে? না, সেটা ঠিক হবে না। সোমেন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

মে মাসের গোড়ায় কলকাতার নামজাদা এক সাপ্তাহিকে তার একটা কবিতা বেরল। ক্যানিংয়ে লোক গেলে সে মাঝে মাঝে পত্র-পত্রিকা আনিয়ে নেয়। একদিন এরকমই। আনানো কাগজে নিজের কবিতা দেখে বড় অবাক হয়ে গেল সে। অনেক জায়গায় পাঠিয়েছিল কবিতা, এই প্রথম ছাপা হল বড় কাগজে।

খুব কি আনন্দ হল সোমেনের?

না। কারণ, এখানে তার আনন্দে আনন্দ করার কোনও ভাগীদার নেই। আনন্দ তো একার জন্য নয়।

নিজেকেই সে প্রশ্ন করল—জীবনের সব ক্ষেত্রেই কি কথাটা সত্যি নয় সোমেন? জীবনে একা-একা কোনও উপভোগ হয় না। জীবনে যত রকমের আনন্দ আছে তার সবই ভাগ করে নিতে হয়।

মাঝখানে দাড়ি কেটে ফেলেছিল সোমেন। এখন আবার রাখছে। তার দাড়ির রং অল্প লালচে আর নরম। গালে হাত বোলালে রেশমের স্পর্শ পাওয়া যায়। চুলও ছাঁটে না। অনেকদিন। অল্প ঢেউ-খেলানো চুল প্রায় কাঁধে নেমে এল। তার কাছে আয়না নেই। চিরুনিরও ব্যবহার খুব কম। চেহারাটা কেমন দেখতে হয়েছে আজকাল তা তার জানা হয় না। চেহারা নিয়ে কোনও ভাবনাও নেই তার। তাকে সুন্দর দেখলে খুশি হয় এমন মানুষজন। থেকে সে বহুদূরে রয়েছে। এখন তার কেমন একটা আপনভোলা অবস্থা।

সে আজকাল মাছের জাল ফেলতে শিখেছে, নৌকো বাইতে পারে, অল্পস্বল্প চাষবাসেরও অভিজ্ঞতা হয়েছে। আগে গাছপালা চিনত না, অড়হর গাছকে ভাঙ গাছ বলে ভুল করত। এখন সে সব ভুল বড় একটা হয় না। ইস্কুলের জমি কুপিয়ে চমৎকার বাগান বানিয়ে ফেলেছে। এইভাবে সে এখানকার আবহাওয়ায় নিজেকে ছড়িয়ে দিতে চাইছে প্রাণপণে।। মাঝে মাঝে ভাবে—এখানেই একটা যে কোনও মেয়েকে বিয়ে করে ফেলি না কেন? হয়ে যাই এখানকার স্থায়ী লোক?

যেই ভাবে অমনি অলক্ষ্যে মেঘগর্জনের মতো ডেকে ওঠে এক অন্ধ ও সতর্ক কুকুর। চোখে ঝলসে যায় একটা ক্যামেরার লেনস। এ তার একটা মনোরোগ। কেন যে বার বার সেই কুকুরটার কথা মনে পড়ে, আর সেই ক্যামেরার মস্ত একচক্ষু গভীর কাচ!

সে কি খুব বিখ্যাত কবি হবে একদিন? কিছু একটা হবে? মানুষের মতো মানুষ কোনও? নাকি, হয়ে থাকবে এক অসফল ও অভিমানী মানুষ? কিংবা এক ব্যর্থ প্রেমিক? আস্তে আস্তে সে কি হয়ে যাবে একদিন গেঁয়ো কবিয়াল।

বেশ সোরগোল তুলে রবীন্দ্রজয়ন্তী করাল সে ছেলেদের দিয়ে। গ্রীষ্মের ছুটির দিন। নিজের লেখা একটা নাটক অভিনয় করাল। লোক ভেঙে এল দেখতে। সারাক্ষণ দেখলেও সবাই চোখ কান মন দিয়ে। খুব একটা আত্মবিশ্বাস পেয়ে গেল সে। নাটকের পর অনেকে এসে পিঠ চাপড়াল।

তবে কি তার ভবিষ্যৎ বাঁধা আছে নাটকের সঙ্গে?

ঠিক বুঝতে পারে না।

গ্রীষ্মের ছুটি পড়তেই দুরন্ত গরমের মধ্যে সে একবার বেরোল পদযাত্রায়। গাঁয়ে গায়ে। অনেক চেনা হয়ে গেছে। কোথাও তেমন অসুবিধে হয় না। রাস্তাঘাট নেই, যানবাহন নেই, মাঠ ময়দান পেরিয়ে তবু চলে যেতে আজকালতার অসুবিধে হয় না। বর্ষার কাদা অনায়াসে। ভাঙে। চার মাসে সে এক জীবনের অভ্যাস অর্জন করছে।

একদিন গোসাবার নদীর ধারে জ্যোৎস্নারাত্রে বসেছিল আদিনাথ নামে আর একজন মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে। গত দুদিন সে আদিনাথের বাড়িতে আছে। খুব খাতিরযত্ন করে আদিনাথ, কিন্তু তার সঙ্গে সোমেনের মনের পার্থক্য অনেক। সোমেন যেমন গভীরভাবে ভাবতে পারে, অনুভব করতে পারে, আদিনাথ তা পারে না। রাত বারোটার বিপুল জ্যোৎস্নার রহস্যানুভূতি সোমেন যেমন টের পায়, আদিনাথ পায় না। বার বার সে একটা নৌকো চুরির গল্প বলার চেষ্টা করে অবশেষে কাত হয়ে শুয়ে ঘাসে ঘুমোতে লাগল। একা বসে জেগে থাকে সোমেন। পৃথিবীতে এখন সে সম্পূর্ণ একা। যেখানে সে বসে আছে তার বিস হাত পিছনে আদিনাথের ঘুমন্ত বাড়ি। কেউ কোথাও জেগে নেই। বসে থেকে সোমেন জলে জ্যোৎস্না দেখে। কোনও মানে হয় না এই জেগে

বসে থাকার, তবু থাকে। একটা আচ্ছন্ন মাতলা ভাব। ভিতরে এক অবিরল অস্থিরতা। কেবলই মনে হয়, কী নেই! কী একটা। নেই যেন!

সে কি মেয়েমানুষ সোমেন? নিজেকেই প্রশ্ন করে সে। নিজেই ভেবেচিন্তে বলে, হবেও বা। মেয়েমানুষ বউ হয়ে এসে জীবনের অনেকখানি একাকীত্ব কেড়ে নেয় বটে, কিন্তু সবটুকু কি পারে নিয়ে নিতে? পারবে কি কিশোরী রিখিয়া?

রিখিয়ার কথা কেন যে ভাবে সোমেন! ভাবার কোনও মানেই হয় না। সে তো এক পেঁয়ো ইস্কুলমাস্টার হয়ে গেল ক্রমে। রিখিয়াদের বাড়ির মাপ মতো পাত্র তো সে নয়। তবে ভেবে কি হবে। তার ভাগ্য তাকে সফলতা দেয়নি, কিছুই হতে দেয়নি জীবনে। তবে কেন এই চাঁদের দিকে দুহাত বাড়ানো ভিখিরির মততা? দেশে তার মতো কত লক্ষ লক্ষ ছেলে তারই মতো অসফল জীবনযাপন করছে। সে তবু যা হোক একটা কাজ পেয়েছে, কত ছেলে তাও পায়নি। গণেশবাবুর দলের সঙ্গে সেক্রেটারির গণ্ডগোল ছিল বলেই সেক্রেটারি তাড়াহুড়ো করে বাইরের ছেলে সোমেনকে চাকরি দিয়েছিল। নইলে এই সামান্য মাস্টারিটুকুর জন্যও উমেদার কম ছিল না, এখানে এসেই সে খবর পেয়েছে। এ কি তার সৌভাগ্য নয়?

সোমেন নিজেকে বলে, এর চেয়ে বেশি কিছু হওয়ার ছিল না তোমার।

গাব্বকে এখন কে পড়াচ্ছে। অণিমা কি ফিরল শ্বশুরবাড়ি থেকে? ওর বাচ্চাটাচ্চা হবে কি? অপালা কি মিহির বোসকে এখনও খেলাচ্ছে? পূর্বার বুঝি এখনও কোনও প্রেম হল না, বিয়ে হবে কি? অনেকদিন হেমন্তকে দেখে না সোমেন, গেস্ট কিন ছেড়ে মুম্বই যাবে বলেছিল, চলে গেছে নাকি! একে একে বুবাই টুবাই বেলকুঁড়ি, ননীচোর, বড়দির বাচ্চাটা সকলের কথা মনে পড়ে।

বাঁ পায়ের কড়ে আঙুলের খাঁজে একটা জোঁক লেগেছে। প্রথম প্রথম এ অঞ্চলে এসে গায়ে জোঁক লাগলে টের পেত না সে, আজকাল পায়। জোঁকটা আঙুলে টিপে ধরে ছাড়িয়ে আনল সে। ছুঁড়ে জলে ফেলে দিল। তারপর আদিনাথের ডেকে বলল—চলো, শুয়ি পড়ি ঘরে।

হাই তুলে আদিনাথ উঠে বসে বলল—জ্যোৎস্নার আর হাওয়ায় ঘুমটা এত জমে!

ঘুমের সঙ্গে জ্যোৎস্নার কী সম্পর্ক তা না ভেবেই সোমেন অন্যমনস্কভাবে হু' দিয়ে হাঁটতে থাকে। তখন টের পায়, বুকে এখনও একখানা আস্ত পাথরের মতো অভিমান জমে আছে। সকলের ওপর, গোটা পৃথিবীর ওপর তার রাগ।

রিখিয়ার ওপরও। কিন্তু রিখিয়া তো কোনও দোষ করেনি। সোমেনের তবু অভিযোগ, কেন রিখিয়া অত বড়লোকের ঘরে জন্মাল? যদি আমাদের মতো ঘরে জন্ম নিতে তুমি রিখিয়া, তবে কবে তোমাকে বউ করে নিয়ে আসতাম এই সুন্দরবনের গাঁয়ে। কুঁড়েঘরে ডেরা বাঁধতাম।।

মাস ছয়েক আগে এক শীতের বিকেলে রিখিয়াদের বাড়ি গিয়েছিল সোমেন। সেই শেষবার। তারপর আর যাওয়া হয়নি।

রিখিয়া বসেছিল দোতলার বারান্দায়, রেলিঙে হাত, হাতের ওপর থুতনি। একটু কৃশ হয়েছে, একটু গম্ভীরও। তাকে ফটক দিয়ে ঢুকতে দেখেই উঠে ঘরে চলে গেল। হাসল না। পর্যন্ত। রাগ হয়েছিল সোমেনের।

স্বভাবসংকোচের সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে যেমনি দোতলায় পা দিয়েছে সোমেন, অমনি এক কপাটের আড়াল থেকে আধখানা বেরিয়ে এসে থমথমে মুখে রিখিয়া বলল—খুব, না?

কী খুব?

এমনিতেই আমাদের মন ভাল নেই, তার ওপর আবার একজনের এমন অহংকার হয়েছে। আজকাল।

সসামেন একটু লাল হয়ে বলে—মন ভাল নেই কেন?

বাবা লন্ডন থেকে ঘুরে এল। দাদা ওখানে বিয়ে করেছে।

ওঃ। সোমেন খুব অবাক হয় না। বলে—আমার অহংকার কীসে দেখলে? বরং আমি। লজ্জায় আসতে পারি না।

তুমি ভীষণ অহংকারী।।

'তুমি' শুনে কেঁপে গেল সোমেন। কথা এল না মুখে।

রিখিয়া তক্ষুনি ভুল সংশোধন করে বলল—মা পথ চেয়ে থাকে, রোজ জিজ্ঞেস করে—ওরে, সোমেন আসে না? মার ধারণা, আমি একজনের সঙ্গে ঝগড়া করেছি, তাই একজন। আসছে না।

সেই 'একজন' যে সে নিজেই তা ভেবে এই এতদিন পরেও গা শিউরে ওঠে। মন আনচান করে সোমেনের।

সসামেন রিখিয়ার দিকে চেয়ে বলল—আবার আপনি-আজ্ঞে হচ্ছে কেন? দিব্বি তো। তুমি করে বলে ফেলেছ। ওটাই চলুক।

রিখিয়া জিভ কেটে বলে—ওমা, কখন বললাম! যাঃ। ওটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে।

সেদিন চলে আসবার আগে রিখিয়া পরদার কাছে কেমন একভাবে দাঁড়িয়েছিল। অকপট চোখে নির্লজ্জের মতো দেখছিল সোমেনকে। দুটি বড় বড় চোখ ভরে নিথর মুগ্ধতা। নিচু স্বরে বলল—শোনেনা, বিদেশে যেয়ো না।

—যাচ্ছি না।

আমার মন ভীষণ খারাপ। তুমি কেন আসো না?

সোমেন বলল—লজ্জা করে। ভীষণ।

একদিন তোমাদের বাসায় নিয়েও গেলে না বেড়াতে। বেশ!

সোমেন একটা গভীর শ্বাস চেপে রেখে বলল—নিয়ে যাব একদিন।

দেখব কেমন নিয়ে যাও!

নিশুত রাতে আদিনাথের বাইরের ঘরে একা বিছানায় উঠে বসল সোমেন। চলে যেতে ইচ্ছে করছে। এক্ষুনি চলে যেতে ইচ্ছে করছে।

প্রবল মনের জোরে নিজেকে ঠেকাল সোমেন, যেমন স্রোতের উজানে নৌকাকে কষ্টে। নিয়ে যেতে হয় তেমনি এক অসম্ভব কষ্টে উজিয়ে আনল নিজের মনকে। তবু স্রোত টানে।। অন্ধের মতো টানে।

॥ সাতাত্তর ॥

স্কুল খুলতে আর মোটে দশ দিন বাকি। বাসন্তী থেকে লঞ্চ-এ ফিরতে একটা লোকের বগলে খবরের কাগজ দেখে চেয়ে নিয়েছিল সোমেন। রবিবারের বড় কাগজ দেখতে দেখতে দুইয়ের পাতায় 'নিরুদ্দিষ্টের প্রতি কলমে চোখ আটকে গেল। এ কলমে অনেক মজার বিজ্ঞাপন বেরোয় বলে সোমেন নিয়মিত পড়ে। আজ দেখল, প্রথম বিজ্ঞাপনেই তার একটা অস্পষ্ট ছবি, নীচে লেখা—সোমেন, কোথায় আছ ঠিকানা জানিয়ে চিঠি দাও। সবাই আমরা চিন্তিত। মা বাবা শয্যাশায়ী। দাদা রণেন।।

বিজ্ঞাপন দেখে হঠাৎ হেসে ফেলে সোমেন।

তারপর গম্ভীর মুখে দাড়িতে হাত বোলায়। খবর না দেওয়াটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে।

কলেজ-ঘাটে লঞ্চ লাগতেই নেমে পড়ল সোমেন। সেখান থেকেই ক্যানিংয়ের ফিরতি লঞ্চ ধরল দুপুরে।

সন্ধেবেলা যখন ঢাকুরিয়ার বাড়িতে ঢুকছে তখন তার পরনে সাধারণ পাজামা আর পাঞ্জাবি, গালে দাড়ি, কাঁধে ঝোলা, মুখে একটু অপরাধী হাসি।

দাদা বউদি প্রথমে চিনতেই পারেনি কয়েক সেকেন্ড, তারপর হইচই বেধে গেল। রণেন। রেগে গিয়ে চেঁচাতে থাকে—এ তুই কী হয়েছিস! আমার হার্ট অ্যাটাক হওয়ার জোগাড়। প্রত্যেক দিন শীলা আর ইলা খবর নিয়ে যাচ্ছে। চারদিকে কান্নাকাটি। তোর বউদির অবস্থা নিজের চোখে দ্যাখ, কী রকম শুকিয়ে যাচ্ছে সব। |

কথাটা মিথ্যে নয়। বউদি কেঁদেও ফেলল কথা বলতে গিয়ে। বলল—তোমাকে যেতে। তো আমিই বলেছিলাম সোমেন। সেই অপরাধে দিনে দশবার মাথা খুঁড়ছি।

—মা বাবা শয্যাশায়ী বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছ। সত্যি নাকি?

ন। খবর দিলে দুজনেরই স্ট্রোক হয়ে যেত। প্রতি সপ্তাহেই চিঠিতে তোমার কথা লেখেন দুজনে। তোমার চাকরির খবর দিয়েছি নিরুদ্দেশ হওয়ার কথা জানাইনি।

সোমেন ফের আড্ডা দিতে বেরল। কলকাতাকে অনেক ঘিঞ্জি, ময়লা আর দূষিত বলে মনে হয়। জীবাণুর মতো মানুষ। এ কয় মাসে তো আর কলকাতা পালটায়নি। সোমেনের মন আর.চোখই গেছে পালটে।

পরদিন সকালে বউদি সেফটি রেজার, জল আর আয়না সাজিয়ে দিয়ে বলল—জঙ্গল। সাফ করো তো বাপু, সুন্দর মুখখানা একটু দেখি। নইলে বুঝতে পারছি না, আমার দেওরটাই এল না অন্য লোক দেওর সেজে এসেছে। কী কালো হয়ে গেছ সোমেন! |

রোগা হইনি তো বউদি?

ন।, একই রকম।

সোমেন হাসল। বলল—তার মানে, একটু গত্তি লেগেছে গাছে কি বলল? তোমরা তো নজর লাগার ভয়ে কাউকে মোটা হয়েছ' বলতে পারো না।

থুঃ থুঃ। বলে বউদি গায়ে থু থু ছিটোনোর ভাব করে বলল —রং-টা একদম জ্বলে গেছে। অমন রং কি আর ফিরে আসবে?

নোনা জল-হাওয়ায় ওরকম হয়। রং দিয়ে হবেই বা কি বলো! কেউ তো পছন্দ করল ন।।

তাই বুঝি! বলে বউদি ঘরে গিয়ে তক্ষুনি দুটো নীল মুখবন্ধ খাম নিয়ে ফিরে এসে। বলল—মনে ছিল না, কতদিন হল এসে পড়ে আছে। ঠিকানার লেখা দেখে তো মনে হয় পছন্দের লোকই লিখেছে।।

সোমেন খাম দুটো নিয়ে সস্নেহে বীণার দিকে চেয়ে বলে—খুলে পড়োনি তো!

তেমন ভাব নাকি? আচ্ছা যা হোক। পড়লে পড়েছি। ঠিকানা দেবে না, নিরুদ্দেশ হয়ে থাকবে, তো আমরা করব কী? ঠিকানা জানা থাকলে কবে রি-ডাইরেক্ট করে দিতাম।

রিখিয়ার হাতের লেখা সসামেন চেনে। ঝরঝরে। পরিষ্কার, গোটা গোটা অক্ষর। প্রথম। চিঠিটা এসেছিল দুমাস আগে। ছোট্ট চিঠিতে লেখা—কতদিন দেখা নেই। ভয় হচ্ছে বিদেশে চলে যাননি তো? যাবেন না প্লিজ, তা হলে আমার কেউ থাকবে না।...

দ্বিতীয় চিঠিটা বড়। মাত্র সাত আটদিন আগে এসেছে। রিখিয়া লিখেছে..যদি কখনও। এমন ঘটে যে, আপনার সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক রইল না। আমার কথা আপনার মনেও। পড়বে না, জানি। আমার খুব মনে হবে। একদিন অনেক খুঁজে খুঁজে গিয়েছিলাম আপনাদের বাসায়। শুনলাম, মাস্টারি নিয়ে সুন্দরবনে গেছেন। কী ভীষণ কান্না পেয়েছিল শুনে। ঠিকানাটা পর্যন্ত জানাননি। কত ভয় হয় জানেন না তো! আপনি এরকম কেন? যদি চিঠি পান, তবে? তবে কী করবেন? বলে দিতে হবে? নাকি নিজের বুদ্ধিমতো কাজ করবেন? আমি বড় একা। কেন বোঝেন না?...

সোমেন মুখ তুলে বীণাতে বলল—রিখিয়া এসেছিল নাকি বউদি?

বীণা ভ্রু কুঁচকে বলল—রিখিয়া মানে? মায়ের সেই সইয়ের মেয়ে তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ, মস্ত গাড়ি করে একদিন তোমার খোঁজে এসে হাজির। বাচ্চাদের জন্য এত মিষ্টি আর খেলনা এনেছিল। ও কি তারই চিঠি?

হুঁ। সোমেন আস্তে বলে।

বেশ দেখতে। শ্যামলার মধ্যে মিষ্টি চেহারা। ভীষণ লাজুক। বিয়ে করো না ওকে সোমেন! করবে? তোমার দাদাকে বলি?

দূর! ওরা আমার সঙ্গে বিয়ে দেবে কেন? আমার কী আছে?

বাজে বোকো না। ভালবেসে বিয়ে করবে, কার কী? দরকার হলে রেজিস্ট্রি করে রাখো, আমি সাক্ষী দেব।

দেবে? বলে হেসে ফেলল সোমেন। বলল—খুব চালাক হয়েছ। শহরে থেকে থেকে অ্যাঁ!

করবে বিয়ে? করো না, লক্ষ্মীটি। দাও তো চিঠিগুলো, দেখি কী লিখেছে।

সোমেন চিঠিগুলো দিয়ে দিল অনায়াসে।

বউদি পড়তে লাগল। পড়ে ভিজে চোখে চেয়ে বলল—আহা রে, কত প্রাণ দিয়ে তোমাকে ভালবাসে মেয়েটা। ওকে যদি ফিরিয়ে দাও সোমেন, তোমার সঙ্গে আমি আর কোনওদিন কথা বলব না।

সোমেন চুপ করে রইল।

সোমেন দাড়ি কামাল না, ফরসা জামাকাপড় পরল না। খুব সাধারণভাবে একদিন চলে গেল রিখিয়াদের বাড়ি। তার শরীর জুড়ে এক তপ্ত জ্বরভাব। সমস্ত স্নায়ুগুলো টনটন করছে এক ক্ষ্যাপাটে আবেগে। যে কোনও সময়ে সে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে পারে।

রিখিয়া কোত্থেকে কীভাবে তাকে দেখেছে কে জানে, কিন্তু বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতেই, নীচের প্রকাণ্ড টবে একটা দেড় মানুষ উঁচু ঘর-সাজানো পামগাছের আড়াল থেকে লুকিয়ে ভরা চোখে দেখছিল তাকে। তখনও হাঁফাচ্ছে রিখিয়া।

সোমেন তাকে দেখতে পায়নি, স্নায়বিক এক অসহ্য তাড়নায় খুব দ্রুত উঠে গিয়েছিল। মাঝসিড়ি অবধি।

তখন চাপা, জরুরি গলায় রিখিয়া ডাক দিল—শোনো!

ক্ষ্যাপা বাঘের মতো ঘুরে দাঁড়াল সোমেন। পাজামা, পাঞ্জাবি পরা, দাড়িতে চুলে এক জবরজং মূর্তি। খুব চেনা লোকও হুট করে চিনতে পারবে না। কিন্তু রিখিয়ার চোখ ভুল করবে কেন! আর, সেই ঘুরে দাঁড়ানোর মধ্যে এমন একটা সতেজ সৌন্দর্য ফুটে উঠল সোমেনের যা রিখিয়া কখনও দেখেনি। সোমেনের সৌন্দর্যের মধ্যে এতকাল ছোট্ট একটু অবাক ছিল বুঝি, সে অভাব পূর্ণ হয়ে সোমেন এখন কানায় কানায় সেই পুরুষ, যার সম্পর্কে। রিখিয়ার আর কোনও দ্বিধা নেই।

পামপাতার আড়ালে খুব সাধারণ একটা সাদা খোলের কালোপেড়ে শাড়ি পরে রিখিয়া দাঁড়িয়ে। হাতে পোর মোটা বালা, কানে পলার টব, এলো চুল ঢলের মতো নেমেছে। পিছনে। কচি মুখখানা একটা হাসি কান্নার আলোছায়া ফুটে আছে।

মাঝসিঁড়ি থেকে নিজের লম্বা চুলে হাত বোলাতে বোলাতে অপ্রতিভ হাসি মুখে সোমেন নেমে এল হলঘরে। বলল—খুব মুডে ছিলাম, তাই তোমাকে দেখতে পাইনি।

রিখিয়া কোত্থেকে ছুটে এসে এখানে লুকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখনও হাঁফাচ্ছে অল্প। নাক ফুলে ফুলে উঠছে ঘন শ্বাসে। কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে একটু হাসল, তারপর দুধারে মাথা নেড়ে বলল—ওপরে যেতে হবে না।

কেন?

পরে যেয়ো। অন্য দিন। তুমি কখনও আমাকে কোথাও নিয়ে যাওনি। আজ নিয়ে যাবে?

শৈলীমাসির সঙ্গে দেখা করব না?

পরে কোরো। আজ আমার অনেক কথা আছে।

কোথায় যাবে?

বাঃ, তার আমি কী জানি? একজন যেখানে নিয়ে যাবে।

তা হলে মাসিকে বলে নাও। পোশাক পালটাবে না?

কিছুই করব না।

সোমেন হেসে ফেলে বললএক—বস্ত্রে চলে যাবে?

রিখিয়ার চোখ ঝিকমিকিয়ে উঠল, বলল—রাজি।

কলকাতার কোথাও বেড়ানোর তেমন জায়গা নেই। লেক-এ গুচ্ছের লোক আর ফিরিওলা, ময়দানে ভিড়, রাস্তাঘাটে অসম্ভব আলো।

অনেক টাকা ট্যাক্সি ভাড়া গুণল সোমেন। কথা তো ভারী!কখনও দুজনে বয়সের হিসেব করে অবাক হয়ে দেখল, সোমেনের চেয়ে রিখিয়া প্রায় বছরের ছোট।

থিয়েটার রোডের একটা দামি রেস্তোরাঁয় নিয়ে গিয়ে রিখিয়া হুকুম করল—খাও তো। তোমার খিদে পেয়েছে।

তুমি?

আমি শুধু আইসক্রিম।

এ রকমই সব তুচ্ছ, সামান্য কথাবার্তা। রিখিয়াকে কুড়ি টাকা দিয়ে একটা চামড়ার ব্যাগ কিনে দিল সোমেন। ফিরিওলা প্রথমে বত্রিশ টাকা দাম চেয়েছিল। রিখিয়া তাতেই বাজি। সোমেন তাকে ঠেকিয়ে দরাদরি করে কিনল।

রিখিয়া অবাক হয়ে বলল—ইস, রোজ আমি তা হলে কত ঠকি!

ভীষণ। আরও ঠকবে তুমি।

কেন ঠকব?

আমাকে প্রশ্রয় দিচ্ছ বলে।

নতুন কেনা ব্যাগটা ঠাস করে তার পিঠে মারল রিখিয়া। বলল—সেটাই একমাত্র জিৎ। বাবাঃ, যা অহংকারী! পাত্তাই দিতে চায় না।

ঘুরেটুরে একটুও ক্লান্ত হল না দুজনে। কিন্তু রাত সাড়ে আটটায় সাদার্ন অ্যাভেনিউ ধরে। হাঁটতে হাঁটতে সোমেন বলল—রিখি, এবার বাড়ি যাও, সবাই ভাববে।।

রিখিয়া মুখখানা পাশে ঘুরিয়ে তাকাল। মৃদু একটু দুষ্টুমির হাসি হেসে বলল—আগে। বলো, আমাদের কী হবে!

বড় জটিল প্রশ্ন। বড় জরুরি প্রশ্ন।

সোমেন তাকায় রিখিয়ার দিকে। কচি বয়সের ভালবাসা আর মায়া মেশানো মুখ। আর। একটু বয়স হলে ও যখন হিসেবি হবে তখন ঠিক এরকম বলতে সাহস পাবে না হয়তো। তখন অনেক সুখ দুঃখের ভবিষ্যৎ-চিন্তা এসে ভর করবে মনে।

সোমেন তার দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলল—রিখি, তুমি আমার দাড়ি সম্বন্ধে আজ একটাও কথা বলেনি।

রিখিয়া হেসে বলল—তাতে কী হবে? আমার ভাল না লাগলে যেদিন কেটে ফেলতে বলব সেদিনই তো তুমি ঠিক কেটে ফেলবে।

তাই বুঝি?

তা নয় বুঝি?

সোমেন একটা ত্রাস ফেলে বলে—হ্যাঁ, তাই।

তবে মশাই? শোনে, কখনও আমার অবাধ্য হবে না।

না হলাম।

সোমেন একটা ট্যাক্সি থামানোর চেষ্টা করে। পারে না। সব ট্যাক্সি অন্য লোক নিয়ে চলে যাচ্ছে।

রিখিয়া নিরুদ্বেগে হাঁটে। এক-একবার হেসে বলে—আমার চেয়ে ওঁর ভয়টা বেশি হল বুঝি?

শৈলীমাসি ভাববে যে।

কেউ ভাববে না। আমি তো প্রায়ই ল্যাংগুয়েজ ক্লাসে বা বন্ধুর বাসার যাই।

সে তো গাড়িতে যাও। আজ তো গাড়ি নিয়ে বেরোওনি, ঠিক ভাববে সবাই।

ভাবুকগে। আগে বলো, আমাদের কী হবে!

সোমেনের মুখ শুকিয়ে যায়। বিবেকানন্দ পার্কের পাশে অন্ধকারে একটু দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরায় সে। ততক্ষণ ভাবে। তারপর বলে—রিখি, যা স্বাভাবিক তাই হওয়া উচিত।

স্বাভাবিকটা কী?

বিয়ে।

এই ছোট্ট কথাটায় যেন ঢেউ হয়ে গেল রিখিয়া। লজ্জায়, হাসিতে ভরে গেল তার মুখ।। সামান্য অসংলগ্ন পা ফেলল কয়েকবার। এলো খোঁপা ঠিক করল অকারণে।

রিখিয়া আজ একটুও সাজেনি। সাদামাটা ঘরোয়া পোশাকে বেরিয়ে এসেছে। তবু তার স্বাভাবিক শ্রী থেকে একটা বিকিরণ বেরিয়ে তাকে ঘিরে ধরে।

কিন্তু আমি তো কিছু হতে পারিনি রিখি। আমাকে...

রিখিয়া পাশমুখে তাকিয়ে বলল—হতে বারণ করেছে কে?

কী চাও বলো তো! কেমন চাও আমাকে?

যেমন আছো।

ঠিক?

ঠিক।

—যদি সারাজীবন আর সুন্দরবনের মাস্টারি ছেড়ে আসতে না পারি?

রিখিয়ার এখনও হিসেবি বুদ্ধি হয়নি। অকপটে বলল—আমাকে অত ভয় দেখিয়ো না। তুমি পুরুষমানুষ, ভাবনা-টাবনা তোমার। আমি নিশ্চিন্ত।

সোমেন দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলে—কবে এত পাকলে বলো তো রিখি! এই সেদিনও খুকিটি ছিলে।

এখন আর নেই কিন্তু।

॥ আটাত্তর ॥

ভরদুপুরে ননীবালা কাঁচা আম কেটে রোদে শুকোতে দিয়েছেন। আমশির ডাল ব্রজগোপাল বড় ভাল খান। কিছু কলকাতাতেও পাঠানো যাবে।

ব্রজগোপাল দুদিন হল যাজনে বেরিয়েছেন। আজ কালই ফেরার কথা। ননীবালার একটু একা- ফাঁকা লাগে ঠিকই, কিন্তু এখানে জনের অভাব টের পান না। বহেরুর ছেলেমেয়ে নাতিনাতনি অনবরত আসছে যাচ্ছে। যজমানদেরও আনাগোনা কম কী! তা ছাড়া কামলা, মুনিশ, চাষাভূষোরা অনবরত কাজটাজ করছে। একা লাগে না। পাখি-পক্ষী, কুকুর-বেড়াল, গাছপালা, মাটি-আকাশ নিয়ে বড় প্রাণবন্ত জগৎ। সবাই যেন সঙ্গে থাকে। সঙ্গী হয়।

আমের টুকরো রোদে দিয়ে উঠে আসছেন, উঠোনে একটা লম্বাপানা ফরসা দাড়িঅলা ছেলে হুড়মুড়িয়ে এসে ঢুকেই ডাক দিল—মা!

হাসবেন কি কাঁদবেন তা ভেবে পান না ননীবালা।

ওরে, আয় আয়। বলে নিজে গিয়েই সাপটে ধরেন ছেলেকে। যেন কতকাল দেখেন না।

হাঁকডাক শুনে লোকজন এসে পড়ল। ননীবালা কোকাকে ডেকে বললেন—একটা মাছ। পুকুর থেকে ধরে আন তো।

বলে সোমেনের দিকে চেয়ে বলেন—তোর বাবা কিন্তু মাছ ঢুকতে দেয় না বাড়িতে।

সঙ্গে সঙ্গে সোমেন গম্ভীর হয়ে বলল—তা হলে কেন মাছ রাঁধবে মা? বেঁধো না।

বলে কোকাকে ডেকে নিজেই বারণ করে দিল সোমেন।

ননীবালা বলেন—তা হলে কী দিয়ে দুটো ভাত খাবি? ঘি তো খুব ভালবাসিস, গরম ভাতে এক খাবলা তাই দিয়ে খা তো আগে, তারপর দুটো ডাল ডালনা দিয়ে খাস। দুধ আছে।

সোমেন কৃত্রিম রাগ করে বলে—ভাল করে বাসায় পা না দিতেই খা-খা করতে লাগলে!

খাওয়া নিয়েই তো তোর যত পিটির পিটির। কোথায় যেন মাস্টারি পেয়েছিস, সে কি অনেক দূর?

না, কাছেই।

চিঠি লিখতে তোদের যে কি আলিস্যি। হাকুচ কালো হয়ে গেলি কী করে? অমন টকটকে রং একদম জ্বলে গেছে। নিজের ছেলেটা বলে চিনতে কষ্ট হয়। জামাটা খোল তো দে। হাড়পাঁজরা কেমন বের হয়েছে।

বোকো না মা। তিন কেজি ওয়েট বেড়েছে।

—উরে বাবা, তাই নাকি? হ্যাঁ। কনুইয়ের তিনকোনা হাড় বেরিয়ে আছে। ওয়েস্ট বেড়েছে কি না সে আমি জানি। এখন এখানে ক'দিন থাকবি। ইচ্ছেমতো খেয়েদেয়ে ঘরে। শরীর সারিয়ে তবে মনে করলে যাবি। বুঝেছিস?

সোমেন কেবল হাসে।

ননীবালা বলেন—হাসলে হবে না বাবা। চিরদিন হাসি দিয়ে আমাকে ভোলাও। কদিন। আমি এখন কাছে কাছে রাখবই। ওই দাড়ি গোঁফ রেখে সন্নিসী হলে চলবে না। কি, ভেবেছিস কি তুই?

চিরকালই যত গোপন কথা মার কাছে বলে সোমেন। আজ দুপুরে মায়ের কাছ ঘেঁষে ছোট্ট শিশুর মতো শুয়েছিল। তখন একটি দুটি প্রশ্নের উত্তরে মা কেমন করে সব কথা বের করে নিল। অবশ্য বলার আগ্রহ সোমেনেরই ছিল আগে থেকে।

শুনে ননীবালা উঠে বসে বললেন—শৈলীর মেয়ের কথা তত তোকে কত জিজ্ঞেস করেছি। তখন গা করতিস না।

এখন কী করব মা?

কী আবার করবি! বিয়ে করবি। আমি আজই শৈলীকে চিঠি লিখব।

দূর। ওসব করো না। ওরা ভীষণ বড়লোক। যদি রিফিউজ করে তো অপমানের একশেষ।

দূর বোকা! ছেলের কোনও কাজে মায়ের আবার মান-সম্মান কী? আমি ওর মেয়েকে ভিক্ষে চাইব।

না মা। অপমান তোমার একার নয়, আমারও। তা ছাড়া, বাবার পরামর্শ আগে নিয়ে। নাও।

এর মধ্যে আবার ওঁকে টানিস কেন? উনি সেকেলে লোক। ভাবের বিয়ে শুনলে খুশি হওয়ার মানুষ নয়।

সোমেন তবু মাথা নেড়ে বলল—শোনো মা, আমার বুদ্ধি স্থির নেই, তুমিও দুনিয়ার কিছু জানো না। এসব ব্যাপারে স্থিরবুদ্ধির লোক চাই। বাবার অভিজ্ঞতা অনেক বেশি।

বিস্মিত ননীবালা ছেলের দিকে চেয়ে বলেন—ছোটকা, কবে থেকে এত বাপভক্ত হলি বল তো! চিরটাকাল তো মায়ের আঁচলের তলায় বড় হলি, বাপকে চিনলি কবে?

সোমেন পিঠটা মার দিকে ঘুরিয়ে বলে—বাঁ ধারটা চুলকে দাও। জোরে।

ননীবালা একহাতে পিঠ চুলকে দেন, অন্য হাতে পাখার বাতাস করেন। বলেন—সব। শুনে তোর বাবা যদি অমত করে?

এ কথার কোনও উত্তর দেয় না সোমেন। বাবার ডায়েরিতে লেখা একটা বাক্য শুধু মনে পড়ে—ভগবান, উহারা যেন সুখে থাকে।

একটু ঝুম হয়ে পড়ে থেকে ভাবল সোমেন। তারপর মুখ তুলে মার দিকে চেয়ে একটু হাসল। বলল—তুমি কি ভাবো, আমার মনের জোর নেই?

সে আছে থাক। তা বলে অমন লক্ষ্মীমন্ত মেয়েটাকে হাতছাড়া করতে হবে নাকি? এই তো বললি, কথা দিয়েছিস। কথার খেলাপ করবি শেষে? তার চেয়ে ওঁকে না জানানোই ভাল।

সোমেন মাথা নেড়ে বলল—না মা, তা হয় না। আমার বড় অহংকার। কোনও অপমান আমার সহ্য হবে না, তার চেয়ে বিয়ে না হওয়া ভাল। সেইজন্যই আমি বাবার পরামর্শ চাইছি।

ননীবালা পাখাটা ফেলে দিয়ে একটু হতাশ গলায় বললেন—তোর মধ্যে ঠিক তোর। বাবার ছাপ দেখতে পাই। হুবহু। যে-ই তোর বউ হোক সে বড় কষ্ট পাবে।

ব্রজগোপাল এলেন সন্ধে পার করে। সোমেন বেরিয়েছিল বাঁধের দিকে। বহেরুর। খামারবাড়ির অনেক উন্নতি দেখল ঘুরে ঘুরে। গন্ধ বিশ্বেস এখন আর তোক চিনতে পারে ন।। দিগম্বরের খোলের আওয়াজ বড়

মৃদু, তাও কচিৎ শোনা যায়। নানা রকমের লোক আমদানি হয়েছে এখানে। একটা কামারশালা বসিয়েছে বহেরু, একজন পুতুলের কারিগরকে জমি দিয়েছে। একটা পাঁচ মন ওজনের পেল্লায় মোটা লোককে কচ্ছপের মতো ঘোরাফেরা করতে দেখা গেল। বিন্দু সেই আগের বারের মতোই সঙ্গে ছিল আজও। বলল—ও লোকটা সত্যিই একটা আস্ত খাসির মাংস খেয়ে নেয় একবারে।

চিড়িয়াখানায় একটা কাকাতুয়া এসেছে নতুন, সাতশো টাকা দাম। একটা হরিণ এসেছে। একটা বনবেড়াল।

বিন্দু বলল—চলে যাচ্ছি।

কোথায়?

আর কোথায়? কোকাদাদা বলে দিয়েছে, বাবা মরলে ঝেটিয়ে তাড়াবে। যা চুলের মুঠি ধরে কিল দেয় কোকাদাদা! এখানে ঠাঁই হচ্ছেনা। তাই সেই ম্যাদামাকা লোকটার বাড়িঘরেই যাব, আর জায়গা কোথায়?

বিন্দুকে খুব দুঃখী মনে হল না। নিজে থেকেই বলল—কেবল নয়নদিদিরই গতি হল না। কিলটা, চড়টা খেয়ে মরবে। আমি তবু পালিয়ে বাঁচব।

সন্ধেবেলা ঘরে ফিরতেই বাবাকে দেখে মনটা কেন যে বেশ ভাল লাগল।

প্রণাম আশীর্বাদ সব হয়ে যাওয়ার পর ব্রজগোপাল হঠাৎ খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন—তোমার মার কছে সব শুনেছি। তোমার সৎসাহস দেখে অবাক হই বাবা, এ যুগে কেউ ভাব ভালবাসার ব্যাপারে বাপ মাকে টানে না, পরামর্শটর্শ করে না।

সোমেন মাথা নিচু করে থাকে।

ব্রজগোপাল চৌকিতে সিধে হয়ে বসে গলা সাফ করে নিয়ে বললেন—ছেলেদের অবশ্য কোনও মেয়েকে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া ঠিক নয়। সেটা পৌরুষের বিরোধী। তোমার মা বলছিলেন, প্রস্তাবটি সেই মেয়েই দিয়েছে।

সোমেন চুপ করে থাকে।

ব্রজগোপাল বলেন—ভাল। সে মেয়েটি কি তোমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে?

কী বলবে সোমেন! ননীবালা বলেন করে না আবার! ওর মধ্যে চরিত্রওলা ছেলে পাবে। কোথায়?

ব্রজগোপাল বললেন—শ্রদ্ধা বড় সাঙ্ঘাতিক জিনিস। তোমার সঙ্গে তার বয়সের কত তফাত হচ্ছে হিসেব করেছ?

সোমেন চুপ। ননীবালা বললেন—ন-বছরের মতো। না রে সোমেন?

সোমেন ক্ষীণ মাথা নাড়ে।

আর একটু হলে ভাল হত। বউ ইয়ার বন্ধুর মতো হলে ভাল হয় না। বয়সের তফাত বেশি হলে শ্রদ্ধাটা আপনি আসে।

ননীবালা মাঝখানে পড়ে গেলেন—তোমাদের সব সেকেলে নিয়ম বাপ।

ব্রজগোপাল মৃদু হেসে বলেন—তুমি কবে থেকে আবার মডার্ন হলে?

ননীবালা লজ্জা পেয়ে পানের বাটা নিয়ে বসেন। বলেন—ছেলে ছোকরাদের ব্যাপারে। অত খুঁত ধরলে হয়!

ব্রজগোপাল লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলোতে একটু দূর চোখে চেয়ে বলেন—শিক্ষা, দীক্ষা। আর বিয়ে, এ তিন ঠিক না হলে জাতি পতিত হয়ে যায়। বিয়ে কি সোজা কথা! ওই বিয়ে থেকেই বিপ্লবের শুরু।

সোমেন একবার তাকাল বাবার দিকে। চোখ সরিয়ে নিল ফের।

ব্রজগোপাল বলেন—মেয়েটির পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুব ভাল শুনেছি।

ননীবালাই বললেন—টাকার লেখাজোখা নেই। দেবেথোবে অনেক।

সোমেন রাগত চোখে মার দিকে তাকাল।

ব্রজগোপাল বিরক্ত হয়ে বলেন—কাকে দেবে? তোমার ছেলেরা কাঙাল না কি? বলে একটু চুপ করে থেকে বলেন—ঠাকুর জানেন, আমি কখনও চাইনি যে, আমার ছেলেরা অর্থবান তোক, বরং চিরকাল চাই, ছেলেরা চরিত্রবান হোক, শ্রদ্ধাবান হোক, ধর্মশীল,হোক।

সোমেন বাবার মুখের দিকে তাকায়। এই এক মানুষ, যেমন মানুষ পৃথিবীতে বিরল হয়ে আসছে ক্রমে।।

ব্রজগোপাল বললেন—অকপটে বলো বাবা, মেয়ের বাড়ির স্বচ্ছলতা তোমাকে আকর্ষণ করেনি তো?

না, না। ছিঃ। সোমেন লজ্জায় মরে গিয়ে নিচু স্বরে বলে।

জেনে রাখলাম। এখন নিশ্চিন্তে এগোতে পারি।

ননীবালা জরদার হেঁচকি তুলে বলেন—না হয় কিছুই চাইব না আমরা। কিন্তু বিয়ের প্রস্তাবের কী করবে?

ব্রজগোপাল তেমনি উদাস ভঙ্গিতে বসে থেকে বলেন—বিষয়আশয়ে অনেক তফাত হয়ে যাচ্ছে দুই পরিবারের। ভয় হয় মেয়েটা এত বড় পরিবর্তন সইতে পারবে কিনা। তার মা বাপও যেন খুশি হয়ে মেয়ে দেন তাও আমাদের দেখতে হবে। সবদিক ভেবে দেখা কাজ বড় সোজা নয়।

সোমেনের মধ্যে একটা মরিয়া ভাব এল। সে হঠাৎ বলল—বাবা, আপনি যা ভাল বুঝবেন, করবেন। আমার কোনও মতামত নেই।

এক অদ্ভুত স্নিগ্ধতায় ব্রজগোপালের মুখ ভরে গেল। মাথা নেড়ে বললেন—তোমায়। জ্বালাযন্ত্রণা নিয়ে আমার চেয়ে বেশি কেউ ভাববে না। নিশ্চিন্ত থাকো বাবা, তোমার সুখের জন্য, ভালর জন্য যতখানি করা যায় সব আমি দেখব। আমি শুধু বাপের চোখের জগৎ দোৰ। ন।, একটা আদর্শের চোখ দিয়ে দেখি। আমাকে দেখতে হবে, তোমার ভিতর দিয়ে যেন পারিপার্শ্বিকের কল্যাণ আসে। সব ঘটনারই ভাল মন্দ দুটো দিকের জন্যই নিজেকে প্রস্তুত। রেখো। যদি মন্দটা ঘটে তা হলেও ভেঙে পোড়ো না।

পরদিন দুপুরে ফিরে যাচ্ছে সোমেন। ব্রজগোপাল রিকশা করে স্টেশন পর্যন্ত এলেন তার। সঙ্গে।

গাড়ি আসবার আগ মুহূর্তে শুধু বললেন—স্থির থেকো।

কথাটা বুঝল না সোমেন।।

গাড়ি এল। গাড়ি ছেড়ে দিল।

যত বড় করে সমস্যাটাকে দেখেছিল সোমেন আসলে তা মোটেই তত বড় ছিল না। সে সমস্যাকেই দেখেছিল, ভেবেছিল রিখিয়াকে বিয়ে করার সব দায়িত্বই বুঝি তার। অবোধ মেয়ে রিখিয়া, সে আর কী করবে?

কলকাতার বাসায় ফিরে এসেই সে পেল শৈলীমাসির চিঠি। লেখা—বাবা সোমেন, রিখি আমাকে সব বলেছে। জানো না তো, সে যা চায় তাই হয়। সে তোমাকে চেয়েছে। আমিও কতদিন তোমার কথা ভেবেছি

রিখির জন্য। আমার নিজের ছেলে পর হয়েছে। তুমি পরের ছেলে আপন হও। ননীর কাছে চিঠি লিখেছি। রিখির বাবা তোমার বাবাকে চিঠি দিল আজ। কতদিন দেখি না তোমাকে। শুনলাম, খুব কালো হয়ে গেছ? রবিঠাকুরের মতো দাড়ি রেখেছ, তাও শুনেছি। বিয়ের দিন কিন্তু ওভাবে এস না। তার আগে এস একদিন, তোমার সন্তপুরুষের মতো মুখখানা একবার দেখব। আসবে তো?...

চিঠি পড়ে বউদিকে ডেকে দেখাল সোমেন।।

বীণা একটা চাপা হর্ষের চিৎকার করে ওঠে। সোমেনের দিকে হাঁক করে চেয়ে থেকে বলে—আচ্ছা চালাক ছেলে যা হোক, বড়লোকের মেয়েটাকে ঠিক বেঁধে ফেলেছ।

বাঃ রে, তুমিই তো বললে!

ন। বললে বুঝি ছেড়ে দিতে?

দুদিন পরেই ব্রজগোপাল আর ননীবালা এলেন।

বাড়িতে উৎসবের হাওয়া বয়ে যেতে লাগল।

সুন্দরবন থেকে আর একবার ঘুরে এল সোমেন। শ্রাবণের মাঝামাঝি রিখিয়ার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল তার।

বিয়ের পর বউভাতের দিন ভাড়াটে বিয়ে বাড়ির ছাদে তাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে অপালা বলল—বিট্রে করলি তো! তোর আশায় ছিলাম ঠিক, এখন মিহির বোস ছাড়া আর কোন শালা বিয়ে করবে আমাকে বল তো!

ভাগ। সোমেন বলে—বিট্রে করেছি বলে দুঃখের তো চিহ্নও দেখলাম না। আট পিস ফিস ফ্রাই খেলি বসে বসে দেখলাম।

এঃ মা, হোস্ট কখনও খাওয়ার খোঁটা দেয় বুঝি! আর কখনও যদি তোর নেমন্তন্ন খাই দেখিস।

আমিও আর বিয়ে করছি না।

অনিল রায় আজ একদম মদ খাননি। হার্ট অ্যাটাকের পর খানও কম। পাইপ ধরিয়ে ঘুর ঘুর করছিলেন চারদিকে। সোমেনকে ডেকে বললেন—বিয়েতে খাওয়ানোর সিস্টেমটা কেন তুলে দিচ্ছ না তোমরা? নিতান্তই যদি না পারো তো বক্স সিস্টেম করো। বাই দি ওয়ে সোমেন, তোমার সেই পুরনো হবিটার কী হবে?

কী হবি স্যার?

সেই যে প্রায়ই একে-ওকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে।

সোমেন হেসে ফেলে। বলে—হবিটা এখন মিহির বোসকে দিয়ে দিয়েছি স্যার। শুনেছি ও নাকি প্রায়ই একবার অপালাকে আর একবার পূর্বাকে প্রোপোজ করে। দুজনেই কেবল রিফিউজ করছে।।

পূর্বা তেড়ে এসে বলল—ইঃ, আমাকে করুক তো প্রোপোজ।

করেনি তোকে? সোমেন অবাক।

মোটেই না। অত সাহস আছে?

করলে কী করবি?

অনেকদিন বাদে পূর্বা খুব বুদ্ধি করে উত্তর দিল আজ। ফচকে হেসে বলল—মাইরি। রাজি হয়ে যাব।

দারুণ হাসল সবাই। মিহির বোস নিজেও।

অণিমা আসেনি। ওর বাড়ি থেকে গান্ধু আর তার মা এল। প্রায় দুই ভরি ওজনের। সোনার হার দিয়ে গেল। অণিমা পার্সেলে একটা বালুচর শাড়ি পাঠিয়েছে, চিঠিতে। লিখেছে—যাওয়া হল না সোমেন। খুব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমার শরীরটা ভীষণ খারাপ যাচ্ছে। মেয়েদের যে কত বাধা!

রাতে শুতে গিয়ে আর এক বিপদ। দুই দিদি আর বিস্তর আত্মীয়া পাশের হলঘরে ডেকরেটারের শতরঞ্জিতে চিল্লাচিল্লি করছে। শতবার তারা এসে বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলে—ও সোমেন, আমাদের বালিশ কম পড়েছে, দরজা খোল। এমনকী ছোড়দি পর্যন্ত এসে দরজার গোড়ায় বসে গান গাইতে থাকে।

সোমেন গিয়ে দরজা হাট করে খুলে দিয়ে বলে—নে বাপু, কোনও সিক্রেসি রইল না আর। এবার একটু ঘুমোতে দে। বড় ধকল গেছে।

বিয়ের পরই সুন্দরবনে ফিরে গেল সোমেন। একা। মনে একটা লজ্জা আর অপরাধবোধ কাজ করে সব সময়ে। ভাবে, ছিঃ, আমি কেন বড়লোকের ঘরে বিয়ে করতে গেলাম! কী। দরকার ছিল? লোকে ভাববে, লোভি সোমেন এইভাবে নিজের প্রবলেম সলভ করে নিল। ভাববে, শ্বশুরের পয়সায় বড়লোক হয়ে গেল সোমেন। ছিঃ ছিঃ, যদি তাই ভাবে?

বড় যন্ত্রণা গেল এদিন। এসব যন্ত্রণার কথা কাকে আর জানাবে। রিখিয়াকেই মস্ত চিঠি লিখল সে।

রিখিয়ার, এখন কোনও স্থায়ী ঠিকানা নেই। বাপের বাড়ি দুদিন থাকল, রণেন এসে নিয়ে। গেল ঢাকুরিয়ায়। ঢাকুরিয়ায় তিনদিন কাটবার আগেই শীলা এসে ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে যায়। তার বাড়িতে, চারদিন পাঁচদিন আটকে রাখে। খারাপ লাগে না রিখিয়ার। তার নিলেন। বাড়িতে এত লোক, এত আদর করার মানুষ সে পায়নি কখনও। মা চিরকাল বিছানায়, বা। ব্যস্ত, সংসার ছিল গভর্নেস, আয়া, ঝি আর চাকর দারোয়ানের হাতে। এদের বাড়িতে ল সব নেই। সম্পূর্ণ অন্য রকম লাগে। বড় ভাল লাগে দিদি, বউদি, দাদা ডাকতে।

ব্রজগোপাল এলেন একদিন। রিখিয়াকে দেখে বললেন—মাগো, চেহারাটা ভাল সেন। এরা বিশ্রাম দিচ্ছে না তোমাকে, ওদিকে তোমার শাশুড়িও তোমার জন্য অস্থির। বাক্সটাক্স গুছিয়ে নাও তো। বেলা তিনটেয় অমৃতযোগ।

বিন্দুমাত্র আপত্তি হয় না রিখিয়ার। ব্রজগোপাল অসম্ভব কর্তব্যপরায়ণ মানুষ, নিজেই বেয়াইবাড়িতে ফোন করে অনুমতি নিয়ে আসেন।

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের ঠিকানায় লেখা সোমেনের চিঠি রি-ডাইরেক্ট হয়ে গোবিন্দপুরে রিখিয়ার হাতে গেল। চিঠি পড়ে রিখিয়া কেঁদে অস্থির। চিঠির শেষে সোমেন লিখেছে—আমি পুজোর ছুটিতে যাব না। এখন কিছুদিন আমাকে দূরে থাকতে দাও। বিয়ের পর থেকে আমার মন খুব অস্থির।...আরও সব অনেক কথা লিখেছে। বড়লোকের ঘরে। বিয়ে করা গরিবের ছেলের ঠিক হয়নি। আরও কত কী!

রিখিয়ার কান্না সামলে নিলেন ননীবালা। তারপর গোপনে, চুরি করে বউকে লেখা। ছেলের চিঠি পড়লেন দুপুরে। একটা গভীর শ্বাস ফেলে আপনমনে বললেন—বউটাকে কষ্ট দেবে, আগেই জানি। হুবহু বাপের মতো হল কেন যে ছেলেটা!

তারপর ননীবালা রিখিয়াকে স্বামী বশ করার নানা কৌশল শেখাতে থাকেন। কত উপদেশ দেন। সোমেনের স্বভাবের নানা কথা শতখান করে বোঝাতে থাকেন। তাঁর প্রাণে বড় ভয় এই ছেলেটাকে নিয়ে। যত বড় হচ্ছে তত ওর মধ্যে বাপের অবশ্যম্ভাবী প্রতিবিম্ব ভেসে উঠছে।

রিখিয়া সোমেনকে লেখে—শোননা, আমার সত্যিকারের আপনজন কেউ কখনও ছিল না। জন্মের পর থেকে আমি একা। একা একা খেলতাম, ঘুমোতাম, গান গাইতাম। তেমন আদর পাইনি কারো। বিছানায়, বাবা বাইরে, দাদা নিজের পড়াশুনা খেলা আর বন্ধু নিয়ে ব্যস্ত। ভেবেছিলাম, বিয়ে করলে বুঝি এই অসহ্য একাকীত্ব কাটবে। তা বুঝি হল না আমার। তুমি এত নিষ্ঠুর কেন? কেন তুমি আমাকে বোঝো না একটুও পাগল?... পুজোয় না এলে বিষ খাব...

সোমেন আবার দাড়ি রেখেছে। চুল বড় হয়েছে। গায়ের রঙে চাষাভুষোর মতো কালো। কিন্তু চেহারাটা অনেক শক্তপোক্ত হয়েছে তার। মেদহীন রুক্ষ পৌরুষের চেহারা। মুখে একটু লজ্জার হাসি নিয়ে পঞ্চমীর দিন এসে গোবিন্দপুরে পৌঁছল ননীবালা আর রিখিয়া ঢেউ। হয়ে এখানে-সেখানে ধেয়ে যাচ্ছেন আয়োজন করতে।

নির্জনে পেয়ে সোমেন রিখিয়াকে বলে—আর কখনও বিষ খাওয়ার কথা লিখবে?

অকপটে রিখিয়া তাকিয়ে থেকে বলে—কেন আসবে না লিখেছিলে?

—বড় লজ্জা যে!

—ছিঃ। ওরকম আর ভেব না। আমি কিন্তু অনেকবার বিষ খাওয়ার কথা ভেবেছি। জীবনে। সেটা মনে রেখো।

—কেন ভেবেছ?

—একা থাকা অসহ্য লাগত যে!

—আর ভেব না।

—আমাকে একবার তোমার ওখানে নিয়ে যাবে না।

সোমেন হেসে বলে—হায়ার সেকেন্ডারি পাস করেছ কতদিন হয়ে গেল, কলেজে ভরতি হলে না যে বড়? ভেবেছ কী?

—কী হবে আর পড়ে? আমার ভাল লাগে না। শ্বশুরমশাই বলেছেন, আমি যেন কখনও চাকরি-টাকরি না করি।

—চাকরি না করলে। কলেজ ভরতি হয়ে যাও।

রিখিয়া মাথা নেড়ে বলল—আচ্ছা।

—লেখাপড়া অনেক কাজে লাগে।

—তা হলে তুমিও এম এ পরীক্ষা দাও।

—দেব।

দুজনে হাসে।

অবসর সময়ে সোমেন তার বাবার সব পুঁথিপত্র খুলে বসে হাঁটকায়। বাবার অনেক | লেখাপত্র আছে। টীকা, ভাষ্য, ব্যাখ্যা। সেসব খুলে পড়ে। ব্রজগোপাল যখন বাসায় থাকেন তখন নিবিষ্ট হয়ে বসে বাবার সঙ্গে সমাজ সংসারের হাজারো সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। ব্রজগোপালের মুখ চোখ দীপ্ত হয়ে ওঠে। বলেন—সারাটা জীবন এইটুকুর অপেক্ষায় থেকেছি বাবা। আমার কুড়োবামুনের কথা যদি আমার ছেলেদের কেউ কখনও জানতে চায়। তবে শোননা...

অবিরল বোঝাতে থাকেন ব্রজগোপাল। সোমেন শোনে।

তারপর একদিন বাপের ছায়ার মতো বেরিয়ে পড়ে সোমেন। ব্রজগোপালের সঙ্গে যজমানদের বাড়ি বাড়ি ফেরে। যাজন শোনে, নানা সমাবেশে যায়। ব্রজগোপালের পরিচিতির বহর দেখে বড় অবাক মানে সে। চাষাভুষো থেকে সমাজের সবচেয়ে উঁচুতলার লোক সবাইকেই চেনেন বাবা। সবাই বাবাকে চেনে এক ডাকে। ব্রজগোপাল হাত পাতলে একবেলায় চার-পাঁচহাজার টাকার দান উঠে আসে।

রহস্যটা সোমেনকে জানতেই হবে।

॥ উনআশি ॥

এসব দেখে ননীবালা বড় হতাশ হন।

রিখিয়াকে বলেন—ও বউ, আমার ছেলেকে সামলিও। এ আমি ভাল বুঝছি না। বাপের রোগ।

রিখিয়া অবাক চোখে তাকায় ননীবালার দিকে। বলে—কীসের রোগ মা?

—পরভুলানি রোগ মা। ওরা সংসারের কেউ নয়, ওরা সব বিশ্বসংসারের জন্য জন্মেছে।

রিখিয়ার একরকমের লাজুক, মিষ্টি হাসি আছে। মাথা নেড়ে বলে—আমার বেশ লাগে তে।।

দুহাতে রিখিয়ার মুখখানা তুলে চোখের কাছে এনে ননীবালা নিবিড় দৃষ্টিতে দেখেন। রিখিয়া হেসে ফেলে। গভীর শ্বাস ছেড়ে ননীবালা বলেন—তুমি একটু অন্যরকম। তুমি ঠিক আমাদের মতো নও মা।

—কেমন মা?

—বোধ হয় ভাল। খুব ভাল।

রিখিয়া হেসে গড়িয়ে পড়ে। বলে—অত ভাবো কেন মা? ওকে পথ খুঁজে নিতে দাও। সবাই একরকমের জীবন কাটাবে?

রিখিয়াকে তুমি ডাকতে ননীবালাই শিখিয়েছেন ইদানীং। 'তুমি' শুনলে একদম মেয়ের মতো লাগে।

আদর ভালবাসার একটা একটা দলা এল গলায়। এখন কাঁদবেন ননীবালা। তাই রিখিয়াকে ছানার ডালনা রাঁধতে শেখাতে বসেও বললেন—যা তো মেয়ে, ঘরে গিয়ে একটু দুধ খেয়ে আয়।

—না, অত খেতে পারি না।

—যা না। দুটো হাত ধরছি, যা।

রিখিয়া অনিচ্ছায় উঠে যায়।

ননীবালা কাঠের জ্বাল ঠেলে তুললেন। তারপর আগুনের দিকে চেয়ে রইলেন ঠায়। দুচোখ বেয়ে অবিরল জলের ধারা বুক ভাসিয়ে নেয়।

মশলামাখা দুহাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে প্রাণভরে ঠাকুরকে ডাকেন, বিড়বিড় করে বলেন—ওদের সুখে রেখো ঠাকুর।

তারপর হঠাৎ মনে হল, কথাটা স্বার্থপরের মতো শোনাল না তো! ব্রজঠাকুরের বামনি কি শুধু নিজের জনের সুখ চাইতে পারে? তাতে ঠাকুর হয়তো বিমুখ হবেন।

তাই আবার প্রাণভয়ে দুহাত জড়ো করে বলেন—ঠাকুর, বিশ্বসংসারের সবাই যেন সুখে থাকে।

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

অনেকের গল্প।
অসুখের পরে
আদম ইভ ও অন্ধকার
আলোয় ছায়ায়
আলোর গল্প, ছায়ার গল্প
আশ্চর্য ভ্রমণ
উজান
উপন্যাস সমগ্র (১ম-৯ম খণ্ড)
ঋণ
কাগজের বউ
কাপুরুষ
কালো বেড়াল সাদা বেড়াল
কোনও দিন এরকমও হয়
কোলাজ
কীট
ক্ষয়
খেলনাপাতি
গতি
গয়নার বাক্স
গুহামানব
ঘুণপোকা
ঘটনাক্রমে
চক্র
চুরি
চোখ
দ্বিচারিণী
দ্বিতীয় সত্তার সন্ধানে
ধন্যবাদ মাস্টারমশাই
নরনারী কথা
নানা রঙের আলো
নীচের লোক উপরের লোক
নীলু হাজরার হত্যারহস্য
পরিহাটির হরিণ
পারাপার
পার্থিব
পিদিমের আলো
প্রজাপতির মৃত্যু ও পুনর্জন্ম
ফজল আলি আসছে।
ফুলচোর
বনদেবী ও পাঁচটি পায়রা
বাঁশিওয়ালা
বিকেলের মৃত্যু
ভুল করার পর
মাধব ও তার পারিপার্শ্বিক
মানবজমিন
ম্যাডাম ও মহাশয়
রহস্য সমগ্র
লাল নীল মানুষ
শিউলির গন্ধ
শ্যাওলা

জাল
ঝাপি
দশটি উপন্যাস
দিন যায়
দূরবীন

সতীদেহ
সন্ধি প্রস্তাব।
সাঁতারু ও জলকন্যা
সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে
হৃদয়বৃত্তান্ত